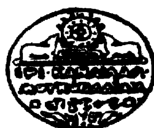
ইতিহাস অনুসন্ধান ১৮

সম্পাদনা

অনিরুদ্ধ রায়



ফার্মা কেএল্‌এম প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা * * * * * ২০০৪

ITIHAS ANUSANDHAN - 18

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ২০০৪

প্রকাশক : ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১২

বর্ণ সংস্থাপনা ও মুদ্রণ :
জেনিথ অফসেট
২০বি, শাঁখারীটোলা স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১৪

সূচীপত্র

বিভাগ ঃ মধ্যযুগের ভারত

বিভাগ ঃ আধুনিক ভারত

আর্থ সামাজিক — রাজনৈতিক ইতিহাস

আন্দোলন ও সমাবেশের ইতিহাস

আঞ্চলিক ইতিহাস

চিন্তা-চেতনার ইতিহাস

সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য কেন্দ্রিক ইতিহাস

নারী ইতিহাস

বিভাগ ঃ ভারত বহির্ভূত

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ব্যতীত

সুলতানী আমলে বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস ঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

অনিরুদ্ধ রায়

ঐতিহ্যমন্ডিত মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরের জিয়াগঞ্জ পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের বার্ষিক অধিবেশনে কার্যকরী সমিতি মূল প্রবন্ধ পাঠ করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানোয় আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় বিলুপ্ত মধ্যযুগের ইতিহাসের এক গবেষককে আমন্ত্রণ জানানো তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমি বাংলার মধ্যযুগের একটি বিশেষ বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

এক

মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে, যদিও সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। বাংলার সামাজিক অবস্থা নিয়েও কিছু কিছু আলোচনা করেছেন বেশ কিছুকাল আগে কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, দীনেশ চন্দ্র সেন ইত্যাদি।[১] সুকুমার সেন[২] বহুকাল আগে একটা ছোট পুস্তিকায় এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। দুর্গাচরণ সান্যালের *বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে*[৩] তথ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। এ সবের মধ্যে দুটি দিকের কথা ভাবা দরকার। প্রথমত মুঘল আমল নিয়ে যতটা আলোচনা হয়েছে, সুলতানী আমল নিয়ে অনেক কম। দ্বিতীয়ত অর্থনৈতিক ইতিহাসের চর্চা এখনো উপেক্ষিত। এই দুটি ফাঁক পূরণের জন্য আমি সুলতানী আমলের অর্থনৈতিক ইতিহাসের কয়েকটি ধারার আলোচনা এখানে উপস্থাপিত করছি। নিষ্প্রয়োজন যে এখানে এই আলোচনা খণ্ডিতভাবে এসেছে — সালতামামির হিসাব নিয়ে আসেনি।

এটা বলার বোধহয় প্রয়োজন হবে না যে সুলতানী আমলের (সাধারণত বক্তিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয় থেকে ধরা হয় যেটি হয়েছিল ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের শেষে বা ১২০৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথমে এবং ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত চলেছিল বলে ধরা যেতে পারে) সূত্র বা ইতিহাসের উপাদান খুবই কম। অগণিত শিক্ষা লেখ বা তাম্রপত্র থেকে শাসনকর্তাদের নাম, পদবী ও শাসনের সীমারেখা পাওয়া যায় যা এই যুগে সুলতানী শাসনের প্রসারতার ইঙ্গিত দেয়। এ যুগের প্রথম দিকের প্রামাণ্য ঐতিহাসিক মীন হাজ - আস সিরাজের,[৪] যিনি বাংলায় এসেছিলেন, ইতিহাস থেকে এই প্রসারতার ইতিহাস পরিষ্কার। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মরোক্কার পর্যটক ইবনে বতুতার লেখায় কিছু সূত্র পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে যে চারটি চৈনিক দল[৫] আসে তাদের আখ্যান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ষোড়শ

শতাব্দীর প্রথম থেকে পর্তুগীজদের লেখা থেকে বিশদ তথ্য মেলে। যে সূত্রগুলি এখনো প্রায় অব্যবহৃত, সেগুলি হল সমকালীন বাংলা কাব্য। সাধারণত ঐতিহাসিকরা এগুলি ব্যবহার করেননি। কোন কোন বর্তমানের ঐতিহাসিক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে খণ্ডিতভাবে ও পটভূমি ছাড়া এগুলি ব্যবহার করে তাঁদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে দুজন ঐতিহাসিকের লেখায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন ধারার উল্লেখযোগ্য মিশ্রণ দেখিয়েছেন, যদিও আমি তাঁদের বক্তব্যর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একমত নই। প্রথমজন বাংলাদেশের প্রয়াত ঐতিহাসিক মমতাজুর রহমান তরফদার,[৬] যিনি হোসেন শাহী আমলের ইতিহাস লিখেছেন। দ্বিতীয়টি পশ্চিমবঙ্গের রীণা ভাদুড়ি,[৭] যিনি সারা সুলতানী যুগের সামাজিক (এবং অর্থনৈতিক) কাঠামো তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা রয়েছে, যার মধ্যে অতি সম্প্রতি আমি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর লেখায় (ষোড়শ শতাব্দীর শেষ) সুলতানী আমলের অর্থনৈতিক ইতিহাসের কয়েকটি ধারা[৮] ধরার চেষ্টা করেছি। এখানে ঐ ও অন্যান্য লেখার কিছু অংশ উপস্থাপনা করব যাতে পরবর্তীকালের আলোচনার বিশদক্ষেত্র তৈরি করা যায়।

দুই

স্বভাবতই প্রথমে একটি প্রশ্ন উঠে আসে। সেটি হল যে প্রাক-সুলতানী বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা কিরকম ছিল এবং কতটা ও কোন শক্তি সুলতানী আমলের গোড়ার দিকে চলেছিল কি না। অর্থাৎ বাংলার সুলতানী যুগের শেষদিকে যে অর্থনৈতিক শক্তির জোয়ার এসেছিল, সেটা সবটাই নূতন কিনা। প্রশ্নটির মীমাংসা পরিষ্কারভাবে হয়নি, আলোচনাও কম হয়েছে। ইতিহাসের ঘটনাবলীকে চলমান স্রোতের মধ্যে না ফেলে ঐতিহাসিকরা যুগ বিভাজন করার জন্য বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে ইতিহাসের মোড় বলে ধরেছেন। কয়েকজন ঐতিহাসিক এর বিরুদ্ধে সঙ্গত কারণে সোচ্চার হয়ে আদি-মধ্যযুগ পর্ব নিয়ে এসেছেন।[৯] কিন্তু এই আদি মধ্যযুগের শক্তি মধ্যযুগে প্রকাশ পেয়েছিল কিনা তার হিসাব তাঁরা এখনো কষেন নি।

ইউরোপীয় ইতিহাস - চর্চ্চায় যুগের উত্তরণ নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে, যার মধ্যে এই স্বল্প পরিসরে আমাদের যাবার প্রয়োজন নেই। শুধু বলা যায় যে বেলজিয়ামের ঐতিহাসিক হেনরী পিরেন সামন্তযুগের থেকে উত্তরণের যে চরিত্র ও কারণ দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে নানা মতবাদ গড়ে উঠেছিল।[১০] সামন্তযুগের উদ্বৃত্ত উৎপাদন থেকে কিভাবে বাণিজ্যর পথ বেয়ে নগরায়ণ ও উত্তরণ হল তার ছবি নিয়ে বিতর্ক আছে। সর্বভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে রামশরণ শর্মা[১২] যে সামন্ত—যুগকে নিয়ে এসেছেন, সেটি তিনি প্রসারিত করেছিলেন সপ্তম খ্রিস্টাব্দ থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলেছিল, অর্থাৎ মধ্যযুগে নূতন ধারা আসে যেটি আবার বাণিজ্য, নগরায়ণ, মুদ্রার ব্যবহার ইত্যাদি শুরু করে। শর্মা সামন্তযুগে নগরের অবক্ষয়, বাণিজ্যর অপ্রতুলতা মুদ্রার বদলে জমি দান প্রধানত ধর্মাশ্রমে — এগুলি দেখিয়ে উনি সামন্তযুগকে অবিহিত করেছেন। পরবর্তী কালে তিনি এই যুগের

প্রসার অষ্টম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত করেন যার মধ্য থেকে উনি বাংলাকে বাদ দিয়েছেন।[১৩]

প্রাক - সুলতানী বাংলার অর্থনৈতিক শক্তি ও তার পরিবর্তনের চিত্র নীহাররঞ্জন রায়ের[১৪] লেখায় পাওয়া যায়। উনি দেখিয়েছেন যে বাংলার বহির্বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবার ফলে নগরগুলির অবক্ষয় শুরু হয়; মুদ্রার প্রচলন কমে যাওয়ার ফলে জমির উপরে চাপ পড়েছিল বেশি এবং রাষ্ট্রের কাছে বণিকদের থেকে সামন্তদের গুরুত্ব বেশি বেড়ে গিয়েছিল। উনি অবশ্য সময় ধরেছেন অষ্টম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত, যখন কোন কোন নগরের অবক্ষয় না হলেও প্রসার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[১৫] ওঁর বক্তব্যের সঙ্গে রামশরণ শর্মার বক্তবের মিল আছে। এই দুই ঐতিহাসিকের বক্তব্যর বিরোধিতা করা হয়েছে সাম্প্রতিক কালে। নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্যর বিরুদ্ধে মমতাজুর রহমান তরফদার ও ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অন্য চিত্র দিয়েছেন। শর্মার বক্তব্যর বিরোধিতা করেছেন আন্দ্রে উইনক, যিনি দেখাচ্ছেন যে পিরেনের বক্তব্যর বিরুদ্ধে বহু ঐতিহাসিক কলম ধরেছিলেন, যাদের মধ্যে ছিলেন ঐতিহাসিক মরিস লোম্বার্ড।[১৬] নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্য ও বিরোধিতা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন রীণা ভাদুড়ি[১৭] এবং এখানে ঐ বিতর্কের পুনর্বার উপস্থাপনা অপ্রয়োজনীয়। শুধু এইটুকু বলা যায় যে একাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে বাংলার নগর জীবনের যে উজ্জ্বল ছবি পাওয়া যায় তার সঙ্গে নগর অবক্ষয়ের বক্তব্য মেলে না। যে সব পণ্য ও দ্রব্যর ব্যবহার ঐ সব নগরের মধ্যে পাওয়া যায়, কবির অতিশয়োক্তি বাদ দিলেও, বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের সন্ধান মেলে। সুতরাং প্রাক-সুলতানী যুগে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এটা বিনা বিচারে মেনে নেওয়া অসঙ্গত। এটা ঠিক যে তমলুকের পতনের পর (সম্ভবত অষ্টম শতাব্দীর শেষ) আর কোন সামুদ্রিক বাণিজ্য বন্দর ঐ সময়ে পাওয়া যায় না। আর লেখকদের লেখায় ঐ সময়ে ''সমন্দর'' বলে যে বন্দরের কথা পাওয়া যায়, তাকে অনেকেই চট্টগ্রাম বলে ধরেছেন।

কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায় নদীয়া[১৮] শহরে, যখন বক্তিয়ার খলজী এসেছিলেন বলে মীনহাজ বলছেন, যে সমৃদ্ধশালী শহর ছিল তার সমকালীন প্রমাণ আছে। মীনহাজের রচনায় দেখা যায় যে নদীয়াতে প্রচুর বণিক ও ব্যবসায়ী ছিলেন, যারা বক্তিয়ার খলজীর আসার আগেই পালিয়ে যায়। নদীয়া লুঠ করেছিলেন বক্তিয়ার তিনদিন ধরে এবং লুঠের টাকায় লক্ষণাবতীতে অনেক মসজিদ ও মাদ্রাসা করে দেন, যেগুলি মীনহাজ পরে এসে দেখেছিলেন।[১৯] দ্বাদশ শতাব্দীর শেষেই আমরাও নদীয়ার মত শহরের কথা পাই।।

নীহাররঞ্জন রায় সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার একটা ছবি দিয়েছেন। এই ছবির সঙ্গে দশম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে লেখা চর্যাপদের বর্ণনার বিশেষ ফারাক নেই।[২০] সাধারণ লোকেদের সুখ-সমৃদ্ধির ইঙ্গিত হয়ত নেই, কিন্তু তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ, কাজ-কারবার, কান্না-হাসির কথা আছে। এমন কি বাণিজ্যর কথাও আছে, যদিও

সেটা বহির্বাণিজ্যর কথা নয় বলেই মনে হয়। আমার অনুমান এই চিত্র ত্রয়োদশ শতকের শেষ বা বেশি হলে চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি থেকে চিত্রটা বদলাতে থাকে। কোন কোন লেখক বলেছেন যে রাজ্যপাঠ পরিবর্তনের ফলে অর্থাৎ সুলতানী শাসন শুরু হবার ফলে "কৃষক পিষ্ট ও জর্জরিত" হয়েছিল।[২১] এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অবশ্য এটা মনে রাখতে হবে যে নদীয়া বিজয়ের পর প্রায় একশ বছর সেন বংশ পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেছিল। এমনকি গঙ্গা-সরস্বতীর উপরে সপ্তগ্রাম অঞ্চল সুলতানরা জয় করেছিলেন ১২৯৮ সালে। সুতরাং সতের জন অশ্বারোহী নিয়ে বক্তিয়ার খলজী সারা বাংলা জয় করেছিলেন, এই বহুল-প্রচলিত মত মানা যায় না।।

তিন

সুলতানী যুগের প্রথম থেকেই একটা পরিবর্তনের আভাষ পাওয়া যায়। শাসনতন্ত্রের উপরের স্তরে পরিবর্তন ছাড়াও, রাজস্ব আদায়ের প্রথা বদলের আভাষ পাওয়া যায়। উত্তর ভারতের প্রথা অবলম্বন করে সুলতানী শাসনের গোড়া থেকেই আমীরদের উপর ভার দেওয়া হয় ভূমি-রাজস্ব (আসলে জমির খাজনা নয়, ফসলের উপর কর) সংগ্রহ করার ও আঞ্চলিক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার। একেই উত্তর ভারতে ইক্তা প্রথা বলা হত, যদিও কালক্রমে এর পরিবর্তন হয়েছিল।

প্রাক-সুলতানী যুগের ইতিহাসে নীহাররঞ্জন রায় ভূমধ্যকারীদের বিভিন্ন স্তর-বিন্যাস দেখিয়েছেন।[২২] এটিও অবিকৃত অবস্থায় ছিল বলে বোধ হয় না। তুর্কী আমীরদের মধ্যে অঞ্চলভাগ করে ঐ সব ভূমধ্যকারীদের উপরে বসিয়ে দেওয়া হল। বলা প্রয়োজন যে এই প্রথা সুলতানী যুগের গোড়া থেকে শুরু হলেও, চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই ফার্সী সাহিত্যে ও ইতিহাসে "ইক্তা" শব্দটি পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে "জমিদার" শব্দটিও গোড়ার দিকে ফার্সী লেখায় পাওয়া যায় না। ফলে বলা যায় যে তুর্কী আমীরদের তলায় পুরানো ভূম্যধিকারী। তাদের তলায় ছিল *মুকদ্দম, চৌধুরী* ইত্যাদি, যারা প্রথমে ছিল গ্রামের মোড়ল ও পরে হয়ে যায় জমিদার। ঐ তুর্কী আমীররাও ততদিনে "ইক্তাদার" বা "মুক্তি" বলে পরিচিত হয়েছেন। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন স্তরের ক্ষমতা ও অধিকার পরিষ্কার হয়ে এসেছে।[২৩]

উত্তরভারতের তুলনায় বাংলার শাসনতন্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহার করা হত। মমতাজুর রহমান তরফদার দেখাচ্ছেন যে বাংলার বিভিন্ন অংশে *ইকলিম, আরসা, দিয়ার* ইত্যাদি শব্দ ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। এগুলি *সর-ই লস্কর-ওয়া ওয়াজিরের* অধীনে ছিল। কিছুকাল পরে ওয়াজিরের হাতে আর্থিক ক্ষমতা রাখা হয়েছিল।[২৪] এটা মেনে নিলে মানতে হবে যে কার্যকরী ক্ষমতা (Executive) ও আর্থিক ক্ষমতা একজন আমলার হাতে চলে আসে,

যেটি উত্তরভারতের প্রথার বিপরীত। অবশ্য এমন হতে পারে যে বাংলাতে প্রথম থেকেই এই দুটি ক্ষমতা আলাদা আমলাকে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু বিশ্বাসী লোকের অভাবে আবার দুটি ক্ষমতা একজনকে দেওয়া হয়।

সপ্তগ্রামের ও অন্যান্য শিলালেখ থেকে *আরসা সজলা মাথনাবাদ* শব্দটি পাওয়া যায়। *আরসা* নিয়ে কিছু বিতর্ক হয়েছে। ব্লখম্যান ধরেছেন যে *আরসা পরগণা* নয়, এটি মুঘল যুগের *সরকারের* সমতুল্য। শেরশাহ ও মুঘলরা *সরকার* শব্দটি প্রদেশের অন্তর্গত এলাকা বলে ধরেছেন এবং বাংলাতে প্রাক-মুঘল যুগে এ শব্দটি পাওয়া যায় না। মমতাজুর রহমান তরফদার বিস্তৃত আলোচনা করে দেখাচ্ছেন যে *আরসা* ও *ইকলিম* সমার্থক এবং এ শব্দদুটি প্রদেশ বোঝায়। *আরসা* মুঘলদের *সরকার* নয়, কারণ সরকার প্রদেশের অন্তর্গত। অন্তত হোসেন শাহী বাংলায় *আরসা* সরকারের থেকে বড় এবং এটি একটি প্রদেশ যার মধ্যে আর্থিক অঞ্চলও ছিল। ঐ একই ভাবে *মূলককে* দেখা যেতে পারে।[২৫] সুতরাং প্রাক-মুঘল যুগে বাংলায় কোন একটি শব্দ পাওয়া যায় না যার দ্বারা প্রাদেশিক বিভাজন বোঝায়।

প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে *সর-ই লস্কর ওয়া ওয়াজির* বলে বলা হচ্ছে। ওঁর অধীনে *শিকদার* ও *জংদার* এর কথা পাওয়া যায়। মনে হয় প্রদেশের নীচুস্তরে সামরিক ও আর্থিক ক্ষমতা ভাগ করা হয়েছিল। *জংদার* সামরিক ক্ষমতা ব্যবহার করতেন। *শিকদারের* উল্লেখ সমকালীন বাংলা সাহিত্যে আছে। তবে তিনি ক্ষমতা বা পদ-মর্যাদায় শের শাহর শিকদারের সমকক্ষ নন।[২৬]

এছাড়া আমরা আরো দুজন আমলার নাম পাই — একজন কোতোয়াল ও অন্যজন কাজী। প্রথমজন সম্বন্ধে বাংলার কবিরা বিশেষ কিছু না বললেও, কাজী ছিলেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে "দুষ্ট" চরিত্র। ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব লেখকরা ব্রাহ্মণদের "পাষন্ড' বললেও কাজী সম্বন্ধে ভালো কথা বলেননি। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ও কাজীর সংঘাত এই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[২৭] যেটি উল্লেখযোগ্য সেটি হল যে সপ্তগ্রামের অধীনে নদীয়া শহরে আমরা ষোড়শ শতাব্দীতে কোতোয়াল ও কাজী ছাড়া আর কোন আমলা পাই না। এর থেকে মনে করা যেতে পারে যে যেখানে মুসলমানদের বসতি শুরু হয়েছে সেখানে কাজীকে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে কাজীর অত্যাচারের কথা সুবিদিত হয়ে যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মনে করা যায় যে কাজীদের ক্ষমতা কিছুটা খর্ব করা হয়েছিল, যার পরিচয় পাওয়া যায় কৃষ্ণ দাস কবিরাজের লেখা থেকে।[২৮] মনে হয় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই কাজীদের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা কমে যায়। সুলতানী যুগের প্রথম দিকে স্থানীয় ভূস্বামীদের হাতে ক্ষমতা থাকলেও, সুলতানী শাসনতন্ত্রের প্রসারের ফলে এই ক্ষমতা কমতে থাকে বলে মনে করা যায়।

শাসনতান্ত্রিক কাঠামো যে তখনো ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি এটা বোঝা যায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে *ইজারাদারী* প্রথার প্রচলন থেকে, যাকে বাংলায় *মজুমদারী* প্রথা বলে ধরা

যেতে পারে।[২৯] সরকারী আইন মোতাবেক এদের রাজস্ব সংগ্রহ করার কথা। কিন্তু সবসময়ে তারা যে সেটা করতেন না তার প্রমাণ রয়েছে। ষোড়শ শতকে সপ্তগ্রামের ইজারাদার বার লক্ষটাকার কড়ার করে বিশ লক্ষ টাকা তুলেছিলেন এবং ধরাও পড়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই বিশ লক্ষ টাকা শুধু সপ্তগ্রাম বন্দরের কর থেকেআসেনি; এর মধ্যে সপ্তগ্রামের অধীনের আশেপাশের এলাকার ভূমি-রাজস্ব ছিল। বন্দরের শুল্ক নেওয়া ও বন্দর দেখাশোনার জন্য রাজকর্মচারী ছিল যাদের কথা ষোড়শ শতাব্দীর পর্তুগীজ ভ্রমণকারীদের লেখায় পাওয়া যায়। এরা শুল্ক সংগ্রহ করে ইজারাদারদের দেবেন, এটা ভাবার কারণ নেই। এছাড়া বলা যায় যে সপ্তগ্রাম বন্দরের শুল্ক থেকে বার লক্ষ বা বিশ লক্ষ টাকা হওয়া সম্ভব নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সুরাটবন্দর যখন মধ্য গগনে, তখন ঐ বন্দরের আয় ছিল ষোল লক্ষ টাকা। ঐ সময়ের আয়ের মধ্যে ছিল বন্দরের সঙ্গে লাগোয়া জমির ভূমি-রাজস্ব ও অনান্য কর।[৩০] ষোড়শ শতাব্দীর শেষে আবুল ফজল *আইনই আকবরীতে*।[৩১] যে চিত্র দিয়েছেন সেটি ১৫৮৭ সালে টোডরমল্লর *বন্দোবস্ত*-এর উপর নির্ভর করা। টোডরমল্লর সময়ে বাংলায় মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং এটাই স্বাভাবিক যে টোডরমল্ল পুর্বতন কারবারীদের কাগজপত্র থেকে হিসাব করেছিলেন। সেখানে প্রতি শহরের সঙ্গে লাগোয়া জমির কথা পাওয়া যাচ্ছে। শহরের আয়ের ফারাক হচ্ছে ঐ লাগোয়া জমির পরিমাণ ও উর্বরতার উপর। সম্ভবত বন্দরগুলির আয় এতটা বেশি ছিল না যার থেকে বন্দরের খরচ চলতে পারে। ঐ ঘাটতি খরচ মেটানোর জন্যই জমি লাগিয়ে দেওয়া হত, যাতে তার আয় থেকে বন্দর শহরের ব্যয় নির্বাহ করা যায়।

চার

বাংলার গ্রামাঞ্চলে ইক্তাদার, ইজারাদার ও শাসনতান্ত্রিক আমলা বসে যাওয়ার ফলে ভূস্বামীদের ক্ষমতা কমেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের আয় কমেছিল কিনা বলা শক্ত। ভাগীরথীর তীরে ভূস্বামীদের কথা বিশেষ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাদের সংগৃহীত খাজনার একাংশ যে শাসনতন্ত্রের হাতে তুলে দিতেহচ্ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। প্রাক-সুলতানী যুগের শিলালেখ থেকে বহু আমলার কথা পাওয়া যায়। সুতরাং আগেও ভূস্বামীদের সংগৃহীত খাজনার একাংশ চলে যেত। কৃষি- প্রধান দেশে কতটা কর কৃষকরা দিত তার তথ্য সুলতানী যুগে বিরল। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের পর্যটক ইবনে বতুতা সিলেটে ফসলের অর্ধেক কর হিসাবে দিচ্ছে — বলেছেন।[৩২] এটা যে সারা বাংলার প্রথা সেটা বলেননি। সম্ভবত প্রান্তিক এলাকায় কর বেশি নেওয়া হত, যার ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে সিলেটে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয় ও লোকে ভাগীরথীর পারে চলে আসতে থাকে, যার মধ্যে চৈতন্যর বাবা-মা ছিলেন। ওঁরা আসার আগেই সিলেট থেকে বহু লোক নদীয়াতে এসে পড়েছিল।[৩৩]

ইবনে বতুতা জমি জরীপ করার কথা বলেননি, যদিও পরবর্তীকালের লেখা থেকে মনে হয় জমি জরীপ কোন কোন জায়গায় করা হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে

মুকুন্দরাম বলছেন "হাল পিছু এক তঙ্কা" কর বছরে দিতে হত।[৩৪] অন্যধরণের প্রথাও চালু ছিল বলে মনে হয়। ঐ সময়ের লেখক আবুল ফজল লিখছেন *নজর* প্রথা ছিল। অর্থাৎ চোখে দেখে কতটা ফসল উৎপাদন হচ্ছে সেটা স্থির করে সম্ভবত উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ কর হিসাবে নেওয়া হত।[৩৫] ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড একে *নাসক* প্রথা বলে ধরেছেন, মূলত *নাসক* প্রথা আগেকার প্রথাই অপরিবর্তনীয় রাখে। ইরফান হাবিব দেখাচ্ছেন যে উত্তর ভারতে এটি ছিল মুঘল যুগের গোড়ার দিকে *জাবতী* প্রথার অংশ। কিন্তু এটি কোনমতেই *মুকন্দমের* সঙ্গে সমগ্র গ্রামের খাজনার বন্দোবস্ত নয়।[৩৬]

আবুল ফজলের লেখা থেকে পাওয়া যায় যে কৃষকরা বিভিন্ন কিস্তিতে সরাসরি নগদ টাকায় খাজনা দিচ্ছে।[৩৭] এটি সম্ভবত *খালিসা* এলাকা বা সরকারী জমিতে প্রযোজ্য। অন্যরকম হলে জমিদার বা তালুকদারের কাজ বদলে যাবে। এছাড়া কৃষকের পক্ষে নগদ রূপোর টাকা বা মোহরে খাজনা দেওয়া সম্ভব নয়, *শিকদার* এই খাজনা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করতেন। মুঘলরা দুয়েক জায়গায় জমি জরীপ করা শুরু করলে সে কাজও তিনি করতেন।[৩৮]

ইবনে বতুতা শস্যভাগ করার কথা বলেছেন এবং বাংলায় যে ঐ সময়ে উত্তর ভারতের তুলনায় পণ্যের মূল্যমান অত্যন্ত কম ছিল, মূল্যের তালিকা দিয়ে তিনি সেটা বুঝিয়েও দিয়েছেন।[৩৯] সারা মধ্যযুগ ধরেই উত্তর ভারতের তুলনায় বাংলায় পণ্যের মূল্যমান অনেক কম ছিল। মুহম্মদ আবদুর রহিম[৪০] প্রাক-সুলতানী যুগের বাংলার কড়ি ও টাকার (তঙ্ক) মূল্যমানের সঙ্গে ইবনে বতুতার দেওয়া মূল্যমানের তুলনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে রূপোর তুলনায় কড়ির মূল্যমান সুলতানী বাংলায় প্রায় ছয়গুণ কমে গিয়েছে যার জন্য তিনি বেশি রূপোর আমদানিকে সঙ্গতভাবেই দায়ী করেছেন। বলা বাহুল্য এই রূপোর আমদানি বাণিজ্যের ফলে হয়েছিল। অবশ্য একটা প্রশ্ন থেকে যায় রহিমের পদ্ধতি মেনে নিলেও। দেড়শ বছর ধরে বাংলাতে এই পরিমাণ রূপো এলে পণ্যর দাম উর্ধমুখী হওয়ার কথা কিন্তু সেটা হয়নি। মজুরীর বিষয়টি ধরলে এটি হয়ত পরিষ্কার হতে পারে। আবুল ফজল উত্তর ভারতে মজুরীর হার দিয়েছেন। এর থেকে দেখা যায় যে নিম্নতম মুজুরী ছিল বছরে আঠার টাকার সমান (অবশ্য এই হার আবুল ফজল তামার মুদ্রা দামে দিয়েছেন এবং রহিম সেটি টাকায় পরিবর্তিত করেছেন)।[৪১] ইবনে বতুতার লেখা থেকে দেখা যায় যে বাংলায় তিনজন লোক বছরে সাত টাকায় প্রযোজনীয় জিনিষ কিনে সুখে বাস করতে পারত।[৪২] এর আড়াইশ বছর পরে এই মূল্যমান দ্বিগুণ বা তিনগুণ হলেও ঐ ধরণের পরিবারের অসুবিধা হবার কথা নয়। অসুবিধা হচ্ছে এই যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাংলার মজুরীর হার আমরা জানি না এবং অদক্ষ শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা কি ছিল, তাও জানি না।

এর সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। সেটি হল চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলায় টাকার প্রচলন কিরকম ছিল। সাধারণ কথায় বলতে গেলে দাঁড়ায় যে বাংলার এই মূল্যমান সাধারণ লোকেদের কাছে বেশি বা কম বলে মনে হয়েছিল কি না। ইবনে বতুতা বলছেন

যে স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁকে জানিয়েছে যে ঐ মূল্যমান তাদের কাছে বেশ বেশি বলে মনে হয়েছে।[৪৩] এর থেকে বোঝা যায় যে বাংলায় মজুরী উত্তর ভারতের তুলনায় নীচু ছিল, আরো মনে হয় যে উত্তর ভারতের তুলনায় নীচু মূল্যমান হলেও, বাংলায় মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে যার জন্য রূপোর আমদানি দায়ী।[৪৪] কিন্তু এই রূপো সাধারণের হাতে পৌঁছাছে না, সমাজের সম্ভবত দুটি অংশে ভাগ হয়ে জমা হচ্ছে। শাসকশ্রেণী ও বণিকশ্রেণী এই আমদানি থেকে ফায়দা তুলেছে, কিন্তু এই রূপো নীচুস্তরে না যাওয়ায় সাধারণ লোক বা অদক্ষ শ্রমিক এর কোন সুবিধা পায়নি। সীমাবদ্ধ টাকার প্রচলনের ফলে মূল্যমান ততটা বাড়েনি এবং মজুরীও ততটা বাড়েনি। বিশদ তথ্য না থাকায় আরো বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নয়।

পাঁচ

পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায় বিভিন্ন সূত্র থেকে পরিষ্কার যে বাংলার অর্থনৈতিক জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসে গিয়েছে। পঞ্চদশ শতকের প্রথম চার দশক ধরে চারটি চীনা দল বাংলাতে এসেছিল। ওদের লেখা[৪৫] থেকে দেখা যাচ্ছে যে রাজধানী পাণ্ডুয়ার শহরতলীতে পথের দুপাশে সারিবদ্ধ দোকান, যেখানে দেশ বিদেশের সব পণ্য পাওয়া যাচ্ছে।[৪৬] ১৪৩০ এর দশকের চীনা দূত মা-হুয়ান বিভিন্ন রকম তাঁতের কাপড়ের উৎপাদনের কথা বলেছেন। যেটি নূতন বলেছেন সেটি হল রেশম শিল্প ও তার কাপড়। গুটিপোকা থেকে রেশম মনে হয় তখন উত্তরবঙ্গে সবে শুরু হয়েছে এবং চীনা রেশমের মত যে এই রেশম নয় সে কথারও উল্লেখ করেছেন মা-হুয়ান। এছাড়া উনি বলেছেন যে বাংলায় বড় বড় বণিকের জাহাজ আছে এবং বহির্বাণিজ্যর মাধ্যমে তারা ধনী। তাদের পরিবারের ছেলেরা ও মেয়েরা নানান রত্ন পরে।[৪৭] এই রেশম শিল্পকে কেন্দ্র করে এই সময়ে ঐ বহির্বাণিজ্যর প্রসার হচ্ছিল কিনা সেটা উনি বলেননি। পরে আমরা বহির্বাণিজ্য নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব। এখানে বলা দরকার যে নূতন শিল্প আসায় বাংলার অর্থনৈতিক জগতের যে ছবিটা পাওয়া যায়, সেটা চতুর্দশ শতাব্দীর চিত্র থেকে আলাদা। অবশ্য চতুর্দশ শতাব্দীর সূত্র কম থাকায় ঐ শতাব্দীর ছবি পরিষ্কার নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই বাংলার বণিকদের যে সমৃদ্ধির ছবি পাওয়া যায়, তার শুরু চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ থেকে আমরা ধরে নিতে পারি।

বাংলার চতুর্দশ শতাব্দীর ইতিহাস খুব পরিষ্কার না হলেও এটা বলা যায় যে ইলিয়াস শাহর রাজত্বে (১৩৪২---১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দ, মতান্তরে ১৩৫৫ খ্রিঃ) সারা বাংলা শুধু একটা শাসনের মধ্যেই আসেনি, একদিকে সোনারগাঁও ও চট্টগ্রাম দখল ও অন্যদিকে সুবর্ণরেখা থেকে গোদাবরী হতে বালাসোর ও সমুদ্রতীর পর্যন্ত দখল করার ফলে বহির্বাণিজ্যর জন্য বন্দরের অভাব হয়নি। পাটনার বিপরীত দিকে হাজীপুরে শহর বসিয়ে গঙ্গার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। এই উল্লেখযোগ্য বিজয়ের পর ইলিয়াস শাহ উত্তর দিকে বারাণসী, তিরহুত (মিথিলা) ও ডইরচ দখল করে নেপাল আক্রমণ করেছিলেন বলে বলা হয়। মনে

হয় পার্বত্য ও স্থল বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যই ছিল প্রধান, এই বিশাল এলাকা জয় করার ফলে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ-তুঘলকের আক্রমণ হয়। ইলিয়াস শাহর পরে সিকান্দার শাহ ও বারবাক শাহর সময়েও এই বিশাল রাজত্ব চলতে থাকে। সুতরাং বলা যায় যে চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার রাজনৈতিক জগতে একটা গুণগত পরিবর্তন আসতে থাকে যার ফলে বাংলার রাজনৈতিক জীবন ও অর্থনৈতিক জীবন পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বদলাতে থাকে। উল্লেখযোগ্য যে বাংলার সুলতানদের বিরল কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা যা পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে ইলিয়াস শাহর স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে যার গুণগত মান দিল্লীর মুদ্রার সমতুল্য ছিল।[৪৮]

পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় যে রাজনৈতিক গোলমাল বিশেষ ছিল না, তারও আভাষ চীনা লেখকদের লেখায় পাওয়া যায়। মাঠে চাষবাস হচ্ছে, কোথাও কোন গোলমাল নেই। বাংলা ভাষায় অভিজাত ও অন্যান্য লোকেরা কথাবার্তা বলছে, কেবল দুচারজন বড় অভিজাত ছাড়া। এটা পরিষ্কার যে একটা বাঙালী সত্তা গড়ে উঠেছে, যার মধ্যে এঁরা হিন্দু-মুসলমান বিভাজন করেননি।

মনে হয় ইবনে বতুতার সময় থেকে পণ্যের মূল্যমান বিশেষ বাড়েনি। চীনারা বলছেন যে টাঁকসাল থেকে তঙ্কা বের হলেও, সাধারণ লোক কড়ি ব্যবহার করে তাদের দৈনন্দিন কাজে। এই মূল্যমান না বাড়ার একটা কারণ হতে পারে যে বহির্বাণিজ্যের ফলে যেমন রূপোর আমদানি বেড়ে গিয়েছিল, তেমনি তার তাগিদে উৎপাদনও বেড়েছিল, যার ফলে মূল্যমান খুবই ধীরে বাড়ে। এর ফলে নূতন নগরায়ণের ছবি পাওয়া যায়।

ছয়

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও জয় করে সারা বাংলাকে একটা শাসনের মধ্যে নিয়ে আসেন। সম্ভবত এই সময়েই উনি রাজধানী লক্ষ্মণাবতী থেকে সরিয়ে পান্ডুয়াতে নিয়ে আসেন। কোন কোন ঐতিহাসিক এর জন্য পান্ডুয়ার কাছে নদী সরে এসেছিল বলে মনে করেছেন যদিও পরিষ্কার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুকনো একটা খাত পান্ডুয়ার বর্তমানে অপসৃয়মাণ পাঁচিলের কাছে দেখা যায়, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায় নদী যে পান্ডুয়ার কাছে ছিল না তার প্রমাণ আছে। চীনা দূতরা নবাবগঞ্জ থেকে নেমে প্রায় বিশ মাইল পথ হেঁটে পান্ডুয়া শহরে পৌঁছেছিলেন। ঐ বাঁধানো পথের ভগ্নাংশ এখনো বর্তমান।[৪৯]

রিয়াজ উস সালাতিনের (১৭৮৮) লেখক গোলাম হোসেন সলীম বলছেন যে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই পান্ডুয়া ও গৌড়ে জনসমাগম বাড়ছিল। দুবার দিল্লীর সুলতানের আক্রমণ থেকে বাঁচলেও পাঁচিল ঘেরা পান্ডুয়াতে স্থান সঙ্কুলান হচ্ছিল না। এর ফলে নাসিরুদ্দীন মাহমুদের সময়ে গৌড়ে রাজধানী চলে যায় পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। ঐ সময় থেকেই সপ্তগ্রাম বন্দরের আত্ম-প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।[৫০] অর্থাৎ গৌড়ে রাজধানী

সরে যাওয়ার পিছনে ভাগীরথীর একটা বড় ভূমিকা আছে —সমুদ্র, সপ্তগ্রাম ও গৌড় একটি নদীর মাধ্যমে যোগাযোগ করা যায়।[৫১] উল্লেখযোগ্য যে পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই আমরা ভাগীরথীর পাড়ে ছোট ছোট শহর তৈরির কথা পাই, যেগুলি প্রধানত তাঁতের কাপড়ের উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে। বলা বাহুল্য যে ভাগীরথী ধরেই এই শহরগুলির যোগ সপ্তগ্রাম ও গৌড়ের সঙ্গে। সম্ভবত ঐ দুটি শহরের বাণিজ্যিক চাহিদার ফলেই ভাগীরথীর পাড়ের ছোট ছোট শহরগুলি তৈরি হয়েছিল। এই শহরগুলির মধ্যে নদীয়া, শান্তিপুর ইত্যাদি শহরগুলির উল্লেখ করা যায়।[৫২]

এই শহরগুলির চরিত্র ও গঠন পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম বা গৌড়ের থেকে আলাদা। এই ছোট শহরগুলির কোন পাঁচিল নেই এবং আশেপাশের গ্রামের জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত। এর ফলে এই সব ছোট শহরগুলিতে একটা মিশ্র নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে যার মধ্যে গ্রামীণ জীবনের প্রভাব রয়েছে। পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদ থেকে সমকালীন বাংলা সাহিত্যে এই সব ছোট নগরজীবনের ছবি পাওয়া যায়। দুএকটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ছাড়া, সুখ ও সমৃদ্ধি (অবশ্যই সীমাবদ্ধ) বিরাজ করছে।[৫৩] পরের শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই চৈতন্যর আবির্ভাব ও পর্তুগীজদের আগমনের ফলে ভাগীরথীর পাড় চঞ্চলা হয়ে উঠলেও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার চলমান প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যায়নি। ঐতিহাসিক ফারনান্দ ব্রোদেলের কথামত রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ঘূর্ণাবর্ত আসার ফলে কাল দ্রুত লয়ে চলতে থাকে, কিন্তু অর্থনৈতিক জীবনের নিস্তরঙ্গ জীবনে কাল তার নিজের ধীর লয়েই চলে।

কিন্তু সারা বাংলার ছবি এটা নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন ভাগীরথীর পাড়ে নূতন জীবন শুরু হচ্ছে, তখন সিলেটে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ চলছে, যার ফলে সিলেটের লোকেরা পালিয়ে ভাগীরথীর পাড়ে চলে আসছে। বলা যেতে পারে যে হিন্দুরা নদীয়ায়, যার প্রমাণ সমকালীন বৈষ্ণব সাহিত্যে রয়েছে, এবং মুসলমানরা গৌড়ে চলে এসেছিল। ১৪৭০ খ্রিঃ থেকে ১৪৮০ খিস্টাব্দের মধ্যে গৌড়ের প্রাসাদের চারপাঁচ মাইলের মধ্যে অন্তত চার বড় মসজিদ তৈরি করা হয়, যার থেকে একটা বিশেষ সময়ে গৌড়ে লোক আসার আভাষ পাওয়া যায়।[৫৪]

সিলেট থেকে চৈতন্যর বাবা-মা আসার আগেই সিলেটের লোক নদীয়াতে এসে একটা বিশেষ মহল্লা তৈরি করেছিল। এটা ঠিক হিন্দুদের উপর মুসলমানী অত্যাচার নয়। কটকের রাজা ছিলেন হিন্দু। এসত্ত্বেও কটক থেকে বহু লোক নদীয়াতে এসে বসবাস শুরু করে। বাংলা-উড়িষ্যা যুদ্ধ এই ধরণের আসার কারণ বলে ধরা যায়। কিন্তু এক হিন্দু রাজার হিন্দু অধিবাসীরা তাদের বাড়ি ছেড়ে আক্রমণকারী মুসলমান রাজার রাজত্বে কেন যাবে সেটা বোঝা শক্ত। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণে তারা এসেছিল এটা বলা বোধ হয় সঙ্গত। এর আলোচনা আমরা পরে করব।

সমগ্র ভারতের মতই বাংলায় জমি ও মানুষের অনুপাত মানুষের পক্ষে ছিল। অর্থাৎ চাষযোগ্য অনাবাদী জমি প্রচুর পড়ে রয়েছে। কিন্তু এসত্ত্বেও ভূস্বামী, স্বচ্ছল কৃষক ও

ভূমিহীন চাষীর উদ্ভব হয়েছে। পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকের কবি বিপ্রদাস পিপলাই "লাখে লাখে ধেনু চরছে" বলেছেন।[৫৫] কবির অতিশয়োক্তি বাদ দিলেও বলা যায় যে গবাদি পশুর চারণ ক্ষেত্রের অভাব ছিল না এবং সম্ভবত গবাদি পশুর উপর কর ছিল না। কবি হাসান-হুসেনের কথায় বলেছেন যে তারা "শতেক কিষাণ" লাগিয়ে চাষ করাত।[৫৬] এই "শতেক কিষাণ" হচ্ছে উত্তর ভারতের *পাহিকস্থ* বা ভূমিহীন কৃষক, যারা মূলধনের অভাবে, (অর্থাৎ গরু, বীজ ইত্যাদি) অন্যদের জমিতে দিনমজুরী করছে। এর ফলে স্বচ্ছল কৃষক ও সেখান থেকে ভূস্বামীদের উত্তরণ কিছু শক্ত নয়। কবির দেওয়া সংখ্যা মেনে নিলে বলা যায় ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা স্বচ্ছল কৃষকের (*খুদকস্থ*) তুলনায় বেশি। উত্তর ভারতেও ঐ একই ছবি পাওয়া যায়[৫৭] এবং ঐ ছবি যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে অপরিবর্তনীয় ছিল তা মুকুন্দরামের রচনায় পাওয়া যায়, যদিও উনি সংখ্যা দেননি।

মমতাজুর রহমান তরফদার বলছেন যে এদের তুলনায় তাঁতীর অবস্থা ভালো ছিল। পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে আর এক কবি বিজয় গুপ্তের লেখা থেকে বলা হচ্ছে যে তাঁতী বাজারে মাছ ও তরকারী কিনছে, যে ধরণের জীবন যাত্রা মধ্যবিত্ত জীবন যাত্রার সঙ্গে তুলনীয়।[৫৮] এই একটি ঘটনার উল্লেখ মেনে নিলেও স্বচ্ছল তাঁতীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল বলে ধরা যেতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন মুঘল বাংলার উজ্জ্বল বাণিজ্য ছিল, তখন ইউরোপীয় কোম্পানীর বণিকরা তাঁতীদের চরম দুরবস্থার কথা বলেছেন।[৫৯]

বাংলার শহরগুলি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে জনসমাজে দ্রুত পরিপূর্ণ হতে থাকে। গোলাম হোসেন সলীমের পরবর্তী কালের লেখায় এ ছবি পাওয়া যায়।[৬০]

সপ্তদশ শতাব্দীর আগে সারাভারতে ও বাংলাতে মানুষের তুলনায় জমি ছিল বেশি। আগেই আমরা দেখেছি যে গবাদি পশুর চারণ ক্ষেত্র পঞ্চদশ ও ষষ্ঠ শতকে বেশি ছিল। ফলে গ্রামাঞ্চলে জনবসতি ঘন হয়নি। ষষ্ঠদশ শতকের লেখক চূড়ামণি দাস বলছেন যে চৈতন্য যখন তীর্থযাত্রায় বের হল, তখন গাছের জঙ্গলে তাঁকে দেখা যাচ্ছিল না।[৬১] সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকের কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গৌড়ের কাছের রামকেলী গ্রাম থেকে কানাই নাঠশালা যাবার পথে ছাড়া ছাড়া বসতির কথা বলেছেন। পথের দুপাশে বকুলের শ্রেণী, মাঝে মাঝে পুকুর।[৬২] ১৫২১ সালে অনামা পর্তুগীজ দোভাষী গৌড় শহরের কাছের জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিলেন।[৬৩]

বলা যায় যে গ্রামগুলি জঙ্গলে ঘেরা, যার মধ্যে বিভিন্ন উপজাতি বাস করে। একমাত্র মুকুন্দরাম ছাড়া বাকি কবিরা এদের নিয়ে মাথা ঘামাননি, দুই একটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া। কবি জয়ানন্দ[৬৪] শ্রীহট্ট দেশের জাজপুর গ্রামের মধ্যে মন্দির, পুকুর, মঠ, বাড়ি, চারপাশে নানান ধরণের ফলের গাছ ইত্যাদির কথা বলেছেন। কবি খালিকাপুর গ্রামের মধ্যে যে হাট বসত তার উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী কালে মুকুন্দরাম বলেছেন যে এই সব হাট থেকে কিভাবে তোলা সংগ্রহ করা হচ্ছে।[৬৫]

সারা বাংলার গ্রামের চেহারা এক রকম নয়। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকের পর্তুগীজ দোভাষী চট্টগ্রাম থেকে গৌড়ে যাবার বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি পূর্ববঙ্গতে ছোট ও বড় গ্রাম, দ্বীপ, ছোট ও বড় শহরের কথা বলেছেন। ছোট গ্রামের মধ্যে আখের চাষ হচ্ছে দেখেছেন। কাপড় তৈরি হচ্ছে দেখেছেন, যদিও লোকজন বড় কম বলে ওঁর মনে হয়েছে।[৬৬] মনে হয় পূর্ববঙ্গে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করার উদ্যোগ এই সময়ে শুরু হয়েছিল। এর ব্যাপক প্রসার লাভ করে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর ক্রান্তিকালে আধা-স্বাধীন জমিদারদের উদ্যোগে। সুতরাং তরফদার যে অপরিবর্তনীয় গ্রাম্য জগতের কথা বলেছেন, সেটা বদলানো দরকার। এটাও বদলানো দরকার যে মধ্যযুগে গ্রামেই অধিকাংশ লোক বাস করত।

সাত

সুলতানী যুগে বাংলার অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মূলে ছিল রেশম শিল্প, আখের ও তুলোর চাষের প্রসার যার জন্য জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করা শুরু হয়েছিল। এই সময় থেকেই বহির্বাণিজ্যর উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর তুলনায় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বহির্বাণিজ্যর যে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল, সেটা চীনাদের লেখা থেকে আগে আমরা দেখেছি। আরো পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের পর্তুগীজদের লেখা থেকে। নীহাররঞ্জন রায় ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এই পুনরুত্থানের জন্য দায়ী দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নূতন রাজ্যগুলির উত্থান ও তার সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক যোগাযোগ।[৬৭] এই বক্তব্য আপাতগ্রাহ্য হলেও কালক্রম খুঁটিয়ে দেখা হয়নি। চতুর্দশ শতাব্দীর আগে ঐ বাণিজ্যর তথ্য খুব কম। পঞ্চদশ শতাব্দীতেও বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। নির্ভরযোগ্য তথ্য আমরা ষষ্ঠদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে পাই।

ঐ সময়কার ইতালীয়ান ভ্রমণকারী লুডভিকো দ্য ভারথেমার[৬৮] লেখা থেকে জানা যায় যে সপ্তগ্রাম বন্দর থেকে তাঁতের ও রেশমের কাপড় নিয়ে বছরে পঞ্চাশটি জাহাজ ছাড়ে। সারা ভারত, তুর্কী দেশ, সিরিয়া, পারস্য ও আরব দেশে জাহাজগুলি যায়। উল্লেখযোগ্য যে ভারথেমা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যর কোন উল্লেখ করেননি।

ওঁর লেখাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উল্লেখ না থাকলেও পরবর্তী ভ্রমণকারীদের লেখায় প্রচুর উল্লেখ রয়েছে। দুয়ার্ত বারবোসা[৬৯] বলেছেন যে ভারতীয় জাহাজ বাংলা থেকে করমণ্ডল, খাম্বাজ, মালাক্কা, সুমাত্রা, পেগু, সিংহল ইত্যাদি দেশে যাচ্ছে। ওঁর লেখা থেকে মনে হয় যে এই বণিকরা মুসলমান, কারণ এদের বিলাসী জীবন যাত্রার কথাও বলেছেন। এর থেকে মনে করা যেতে পারে যে গুজরাতী হিন্দু ও জৈন বণিকরা এসময়ে বাংলায় বসতি করে বাণিজ্যে করত না। এই মুসলমানরা ভারতীয় কিনা বলা শক্ত। বারবোসা বলছেন যে দেশের ভিতরে বড় শহরে (সম্ভবত গৌড়ের কথা বলছেন) বহু আরবিক ও পারসিক বণিক থাকে। এটা যে অনুমান নয় সেটা বোঝা যায় ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের পর্তুগীজ দোভাষী গৌড় দরবারে সুলতান নসরৎ শাহর সময়ে উনি তুর্কী ও পারসিক

বণিকদের উপস্থিতির কথা বলেছেন যারা চাইছিল পর্তুগীজদের বাংলাতে বাণিজ্য অধিকার দেওয়া বন্ধ করতে।[৭০]

উল্লেখযোগ্য যে বারবোসা প্রধানত তাঁতের কাপড়ের কথা বলেছেন, রেশমের কাপড় নিয়ে বিশেষ কিছু বলেননি। আরো উল্লেখযোগ্য যে ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে রেশমের উল্লেখ বিরল। বলা যেতে পারে যে সপ্তদশ শতাব্দীতে রেশমের বাণিজ্য যে উচ্চশিখরে পৌঁছেছিল, সে অবস্থা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে বা ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ছিল না। সুতরাং ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ সুলতানী যুগের শেষ পর্যন্ত বাংলায় তাঁতের কাপড়ই ছিল বহির্বাণিজ্যের মূলস্তম্ভ। সপ্তগ্রাম থেকে কলিকাতা পর্যন্ত ভাগীরথীর দুপাড় ধরে যে ছোট ছোট শহরগুলি গড়ে উঠেছিল, তাঁতের কাপড়ের উৎপাদন ও বাণিজ্যর তাগিদেই এগুলি হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।[৭১] এই বাণিজ্যর বিস্তৃতির কথা পর্তুগীজ লেখক জোয়াও দ্য ব্যারোস[৭২] বলেছেন, যাঁর মতে বাংলার বাণিজ্য গুজরাট ও বিজয়নগরের সম্মিলিত বাণিজ্যর থেকে বেশি।

আগেই আমরা দেখেছি যে চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলার অর্থনীতি একটা নূতন মোড় নিতে শুরু করেছিল। এর জন্য কিছুটা দায়ী ছিল চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে চরকার আবির্ভাব। তাঁতের কাপড়ের উৎপাদনের বিস্তার লাভের জন্য যে চরকা দায়ী সে নিয়ে সন্দেহ নেই। ইরফান হাবিব[৭৩] দেখাচ্ছেন যে চরকা ব্যবহার করার ফলে উৎপাদন প্রায় ছয়গুণ বেড়ে গিয়েছিল। বারবোসা চরকার উৎপাদনের কথা বললেও, আশ্চর্য হননি। চরকা ততদিনে বাঙালী জীবনে অভ্যস্ত যন্ত্র হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এরপরেও বহির্বাণিজ্যর চাহিদা বাড়ছিল কারণ মেয়েরা চরকার কাজ করতে শুরু করে দেয়। অর্থাৎ ছয়গুণ উৎপাদন বেড়ে যাবার পরও বাণিজ্যর চাহিদা বেড়ে চলেছিল। এই বহির্বাণিজ্যর প্রসারের ফলে বাংলায় মূল্যমান বিশেষ বাড়েনি, যা নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। উৎপাদন বেড়ে যাবার ফলে মূল্যমান বাড়েনি, যদিও প্রাক-সুলতানী যুগের সঙ্গে এই যুগের ফারাক ছিল বেশি।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের পর্তুগীজ লেখক টমে পিরেস[৭৪] মালাক্কা থেকে লিখছেন যে এখানে প্রচুর বাঙালী বণিক বাস করে। কিন্তু তিনি বলেননি যে এরা হিন্দু না মুসলমান। সম্ভবত এরা মুসলমান কারণ এই শতাব্দীর শেষ দিকে মুকুন্দরাম লিখছেন যে সপ্তগ্রামের বণিকরা কোথাও যায় না।[৭৫] উনি যে হিন্দু বণিকদের তালিকা দিয়েছেন[৭৬], তারা সবাই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বণিক, এরা ঐ বাণিজ্য ছাড়াও, বহির্বাণিজ্যর বণিকদের মাল জোগান দেয়। সমকালীন বাংলা সাহিত্যে "দালাল" শব্দটি পাওয়া যায় না। সুতরাং এঁরা ঐ কাজ করতেন এটা মনে করা অসঙ্গত হবে না।

চৈতন্যর আবির্ভাবের পরে বহু বণিক সপ্তগ্রাম ছেড়ে নদীয়া, শান্তিপুর ইত্যাদি জায়গায় বসবাস করতে শুরু করেন। বৈষ্ণবরা দাবী করে যে এরা বৈষ্ণব হয়ে সপ্তগ্রাম ছেড়ে চলে আসে। এ মত কতটা মেনে নেওয়া যায় এটা ভাবা দরকার। অন্তত আলাউদ্দীন হোসেন

শাহর আমল থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমান শাসকরা বৈষ্ণবদের কাজে কোন বাধা দেননি, সম্ভবত এই কারণে যে বৈষ্ণবরা ব্রাহ্মণদের বিরোধী। যদিও বৈষ্ণবরা মুসলমান শাসকদের সন্দেহ করত, কিন্তু হিন্দু সমাজের এই বিভাজন ও ব্রাহ্মণদের আধিপত্য খর্ব করার প্রচেষ্টায় মুসলমান শাসকরা বাধা দেয়নি। এর বড় প্রমাণ পাওয়া যায় চৈতন্যর "কাজীদলনের" প্রচেষ্টার মধ্যে। নদীয়া শহরে সন্ধ্যায় মশাল নিয়ে শোভাযাত্রা করে সারা শহর প্রদক্ষিণ করলেও নদীয়ার কোতোয়াল শোভাযাত্রা থামানোর কোন চেষ্টা করেনি। এর পরে কাজীর বাড়ি আক্রমণ করে বাগান ধ্বংস করার পরেও সপ্তগ্রামের শাসকরা বৈষ্ণবদের কিছু বলেনি।[৭৭] সুতরাং সপ্তগ্রামের বণিকরা কেন সপ্তগ্রাম শহর ছেড়ে ভাগীরথীর পাড়ে ছোট ছোট শহরগুলিতে আসতে আরম্ভ করলেন, এটা ভেবে দেখা দরকার।

চৈতন্য চেষ্টা করেছিলেন যে উৎপাদনকারী, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটা সমন্বয় গড়ে তোলা, যাতে এই বৈষ্ণব বণিকরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকেই সপ্তগ্রামে গোলমাল শুরু হয়ে যায়। মুঘল - আফগান যুদ্ধের ফলে শের শাহর দুবার গৌড় আক্রমণ ও লুট সপ্তগ্রামের প্রধান পশ্চাদভূমিকে বিনষ্ট করে দেয়। এর পরে হুমায়ুণের আবির্ভাব ও হোসেন শাহী বংশের লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় গৌড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে উঠে। এর সঙ্গে দেখা যায় সরস্বতীর ধীরে ধীরে মজে যাওয়ার কাহিনী। এর ফলে পর্তুগীজরা বেতোড়ে বড় জাহাজ থেকে ছোট ছোট নৌকা করে মাল নিয়ে সপ্তগ্রামে আসছে।[৭৮] ভাগীরথী বা হুগলী নদীতে তত জল নেই তখনো যে বড় জাহাজ যেতে পারে। ১৫৬৩ সালে পর্তুগীজরা ভাগীরথীর উপরে হুগলীর পত্তন করলে সম্ভবত বড় জাহাজ ভাগীরথী দিয়ে আসতে পারে। এই অবস্থায় বৈষ্ণব বণিকরা ভাগীরথীর উপরের ছোট ছোট শহরে আশ্রয় নিচ্ছে, কারণ তারা বুঝতে পারছে যে সপ্তগ্রামের ভবিষ্যৎ নেই। সুতরাং এটা যে শুধু বৈষ্ণব ধর্মের তাগিদে ছিল না এটা বলাই বাহুল্য।।

বৈষ্ণব বণিকরা সপ্তগ্রাম ছেড়ে চলে গেলেও সপ্তগ্রাম হিন্দুশূন্য হয়ে যায়নি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে ফরাসী পরিব্রাজক ভিনসেন্ট ল্য ব্লঁ[৭৯] সপ্তগ্রামের বাজারের কাছে মুরগী কিনতে গিয়ে বহু মন্দিরে পুজোর আওয়াজ শুনেছেন। কিছু লোক ওঁকে জীবন্ত পাখী ছেড়ে দেবার কথাও বলেছিল। উল্লেখযোগ্য যে শেষ যুদ্ধের আগে বাংলার শেষ সুলতান দাউদ কাররানী তাঁর পরিবার ও ধনরত্ন সপ্তগ্রামে পাঠিয়েছিলেন। ১৬৩২ সাল পর্যন্ত সপ্তগ্রাম বন্দর যে চলছিল, তার প্রমাণ রয়েছে।[৮০]

হোসেন শাহী আমলে সুলতানরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে নিজের জাহাজে বাণিজ্য করতেন।[৮১] সম্ভবত এই কারণেই বাংলার বন্দরের আমলাবা বণিকদের উপর অত্যাচার করত।[৮২] এর মধ্যে পর্তুগীজরা বাংলায় কুঠি বানানোর ও বাণিজ্য করার অধিকার চাইলে বাংলার কর্জনা সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়।[৮৩] এরা প্রধানত মালের জোগানদার হলেও,

এরা তুর্কী, আরবী ও পারসিক বণিকদের সঙ্গে ছিল, যারা পর্তুগীজদের বিপক্ষে। পর্তুগীজরা মালাক্কা দখল করলে ছবিটা বদলে যায়।।

পিরেসের লেখা[৮৪] থেকে বোঝা যায় যে বাংলাতে মধ্যপ্রাচ্যর বণিকরা ছাড়াও গোয়া, দাভোল ও চাউলের বণিকরা আসতেন, যাঁরা ছিলেন সম্ভবত পর্তুগীজ। পিরেস বলছেন যে বাংলা থেকে বছরে দুটি জাহাজ মালাক্কাতে যায় ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নানারকম পণ্য বাংলাতে নিয়ে আসে। বাংলার বন্দরের শুল্ক মালাক্কা বন্দরের তুলনায় বেশি। মালাক্কার তুলনায় বাংলাতে রূপোর দাম কম, কিন্তু সোনার দাম বেশি। এটা পরিষ্কার যে শুল্ক বেশি থাকা সত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রচুর পরিমান রূপো বাংলাতে আসছে। সম্ভবত দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে রূপো বেশি আসছে না, বেশি আসছে পণ্য। পর্তুগীজরা মালক্কা দখল করার পর বাংলার প্রধান বাজার হয়ে দাঁড়ায় মধ্যপ্রাচ্য। পর্তুগীজরা সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহর দুটি জাহাজ মালাক্কাতে লুঠ করলে মধ্যপ্রাচ্যের বাজার প্রধান হয়ে যায়। সম্ভবত এই পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে গুজরাতী বণিকরা পশ্চিম উপকূলে যেমন পর্তুগীজদের সঙ্গে হাত মেলায়, তেমনি পূর্ব উপকূলেও পর্তুগীজ বাণিজ্যকে সাহায্য করতে থাকে। এর ফলে তারা বাংলায় বাণিজ্য আবার শুরু করে। চীনের বাণিজ্য পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বন্ধ হয়ে গেলেও মালাক্কা পর্তুগীজদের দখলে গেলেও, বাংলার বাণিজ্যর বিশেষ ক্ষতি হয়নি। পর্তুগীজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গুজরাতীরা মালাক্কার মধ্য দিয়ে বাণিজ্য চালাতে থাকে।

আট

বক্তিয়ার খলজীর সতেরজন অশ্বারোহীকে নদীয়ার দ্বাররক্ষকরা মনে করেছিল অস্ত্র বিক্রেতা।[৮৫] এ রকম মনে করা স্বাভাবিক কারণ লক্ষণাবতীর কাছে একটা ঘোড়া বিক্রীর বাজার ছিল। হিমালয় অঞ্চল থেকে আসতটাঙ্গন ঘোড়া, যেগুলি পরবর্তীকালের বাংলার *মঙ্গলকাব্যে* জমিদার - বণিক নৌকা করে বাণিজ্যর জন্য নিয়ে যেত। বাংলার সুলতান ইলিয়াস শাহ্ পাটনার বিপরীত দিকে হাজীপুরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি উত্তর ভারত থেকে আসা ঘোড়া বিক্রীর কেন্দ্র হয়ে যায়। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ হাজীপুরে লোক রেখেছিলেন ঘোড়া কেনার জন্য । কিপথে লক্ষণাবতীতে প্রথম দিকে ঘোড়া আসত পরিষ্কার নয়। পার্বত্য অঞ্চল পেরিয়ে আর একটি পথ ছিল নদীপথে চট্টগ্রামে ঘোড়া আনা। মনে হয় চীনদেশের বহির্বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলে স্থলপথের এই বাণিজ্য জোর ধাক্কা খায়। ততদিনে বর্মা থেকে রূপো আসাও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে।[৮৬] পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই আরাকান ও ত্রিপুরার আগ্রাসী ভূমিকার ফলে চট্টগ্রামের শাসনের হাত বদল হচ্ছে। পর্তুগীজদের আসার পর অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকেই চট্টগ্রাম বন্দর বাংলার সুলতানদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকে।[৮৭] এর ফলে বাংলার বহির্বাণিজ্য ভাগীরথী দিয়ে চলতে থাকে, যার ফলে গৌড় সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি হয়েছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই ভাগীরথীর দুপাড়ের নগরায়ণের কথা পাওয়া যায়। সম্ভবত ভাগীরথী দিয়ে পণ্য চলাচল শুরু হয়েছিল বলেই এই নদীর পাড়ের নগরায়ণ শুরু হয়। দুপাশের ছোট ছোট শহরে চাল ও তাঁতের কাপড়ের উৎপাদন চলছে এবং এগুলিই ছিল প্রধান পণ্য। সমকালীন বাঙালী কবিদের জমিদার - বণিক অবশ্য বিভিন্ন ধরণের ফল, টাঙ্গন ঘোড়া ও অন্যান্য পণ্য নিতেন যার মধ্যে মশলাও ছিল। এ সবের থেকে আমরা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত কারিগরদের কথা পাই। পর্তুগীজদের, চীনাদের ও মুকুন্দরামের দেওয়া কারিগরী পেশার তালিকা থেকে বলা যায় যে পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায় কারিগরদের যে পেশা ছিল, যোড়শ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে তার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। এই অপরিবর্তনীয় উৎপাদন পদ্ধতির ব্যাপক বিস্তৃতি বিস্ময়কর। মধ্যযুগের বাংলার নগরের প্রত্নতাত্ত্বিক কাজ না হওয়ায় কারিগরদের কর্মপদ্ধতি ও কুশলতা বিশেষ জানা যায় না। ১৫৩৮ সালে হুমায়ুণের সহযোগী[৮৮] বলেছেন যে হুমায়ুণ গৌড়ে ঢুকে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং গৌড়ের নাম বদলে জিন্নতাবাদ রাখেন। যেটি স্বর্গের সমান। বাড়ির মধ্যে বিভিন্ন রঙের টালী বসানো দেওয়ালের কথা বলেছেন। এই ধরণের একটি মেঝে গৌড় প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে বেরিয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে গৌড় ও সপ্তগ্রাম থেকে একই ধরণের পোর্সিলিনের খোদাই করা পাত্র পাওয়া গিয়েছে। এখনো বলা হচ্ছে, যদিও প্রচুর বিতর্ক হয়েছে, যে এগুলি চীন দেশেই করা হয়েছিল। ১৫২১ সালে পর্তুগীজ দোভাষী গৌড় শহরের যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেটি উত্তর ভারতের শহরের মতই।[৮৯]

আলাউদ্দীন হোসেন শাহর আগে মাত্র দুটি সোনার মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। হোসেন শাহর রাজত্বকালে আর দুটি পাওয়া যায়। ওঁর পরে আর কারুর সোনার মুদ্রা এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই উত্তর ভারতের তুলনায় বাংলার রূপোর তঙ্কায় রূপোর পরিমান বেশি। এর থেকে পরিষ্কার যে বাংলায় বাইরে থেকে রূপোর আমদানি কমেনি। বহির্বাণিজ্য ঠিকমত চলছিল বলে রূপোর ঘাটতি হয়নি। তুলনায় সোনা কম আসছে, ফলে বাংলায় সোনার দাম বেশি। তরফদারের মতে সোনার মুদ্রা আনুষ্ঠানিকভাবে বের করা হত ও বাকিটা জমানো হত। প্রথমটা মেনে নিতে দ্বিধা নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সোনার অলংকার করার প্রবণতা ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে চিরকালই ছিল। সেটা সোনা-রূপার মূল্যমানের হারের উপর নির্ভর করত না।[৯০]

নয়

ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকের পর্তুগীজদের লেখা থেকে উচ্চবিত্তদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ছবি পাওয়া যায়। উঠতি মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর সম্পর্কেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর মধ্যে ধরা যায় রাজকার্যে নিযুক্ত কায়স্থদের, যাদের উল্লেখ বৈষ্ণব কাব্যে রয়েছে, ছোটখাট বণিক এবং পেশাদারী কিছু লোক, যেমন কবিরাজ, শিক্ষক ইত্যাদি। এছাড়া এই গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলা যায় ছোটখাট ভূস্বামীদের (প্রধানত তালুকদার) এবং স্বচ্ছল কৃষকদের, যারা ভূমিহীন কৃষকদের দিয়ে কাজ করায়।[৯১] তরফদার সঙ্গতভাবেই

এই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্রাহ্মণ শিক্ষকদেরও ধরেছেন, যারা টোল চালিয়ে ও চন্ডীমন্ডপে শিক্ষা দিয়ে জীবন নির্বাহ করতেন। এদের কারুরই বিলাসবহুল জীবন-যাত্রা ছিল না, কিন্তু স্বচ্ছল অবস্থা ছিল।[১৩] গ্রামে যাঁরা থাকতেন, তাঁদের জমিজমা ছিল। নদীয়া শহরে কোন শিক্ষকের নিজের বাড়ি ও চন্ডীমন্ডপ ছিল যেখানে একশোর বেশি ছাত্র পাঠ নিত।

নীচুতলার লোকেদের কথা খুব কম পর্যটকই লিখেছেন। ১৫২১ সালের পর্তুগীজ দোভাষী দেখেছেন যে শীতের সকালে গৌড়ের রাস্তায় লোক মরে আছে। আর এক সময়ে তিনি দেখেছেন যে সুলতান খাদ্য বিতরণ করছেন।[১৪] ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যে এই শ্রেণীর লোকেরা নবদ্বীপের প্রান্তে বাস করত বিভিন্ন মহল্লায়। এদের একজনের বাড়িতে চৈতন্য যেতেন যিনি খড় বেচে সংসার চালাতেন। শহরের হিন্দুরা একে গালিমন্দ দিত। এই ধরণের লোকেদের কথা সব থেকে ভালো পাওয়া যায় মুকুন্দরামের লেখায়।

মুকুন্দরামকে সব সমালোচকই মঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলেছেন। বর্ধমান জেলায় রত্না নদীর ধারে দামুন্যা গ্রামে ওঁর পুর্বপুরুষের জমিজমা ও ভিটেবাড়ি ছিল। সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ মুকুন্দরাম লোক দিয়ে চাষবাস করে সুখে কালপাত করছিলেন।[১৫] মুঘল বিজয়ের পর রাজা মানসিংহ সুবাদার হয়ে এসে *জাবতী* প্রথা চালানোর চেষ্টা করা হয় বর্ধমানে, যার মধ্যে জমি জরীপ করা ছিল অত্যাবশীয় অঙ্গ। মুকুন্দরামের আত্মকথাতে জানা যায় যে ডিহিদার মাহমুদ শরীফের অত্যাচারের ফলে তিনি সপরিবারে গৃহত্যাগ করেন ও নদী পার হয়ে জমিদারের কাছে আশ্রয় পান। ওখানেই উনি *চন্ডীমঙ্গল* লেখেন। এই লেখার মধ্যেকার কিছু বক্তব্য আমরা এখানে আলোচনা করলে সমকালীন বাংলার একটা অংশের ছবি পাব। ওঁর বক্তব্য নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে, নানারকম মত প্রকাশ করা হয়েছে।[১৬] আমরা এখানে ঐ সব বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে ওঁর বক্তব্যর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

মুকুন্দরাম বলেছেন যে ডিহিদার মাহমুদ শরীফের অত্যাচারের ফলে তিনি সপরিবারে গৃহত্যাগ করেছিলেন। গৃহত্যাগের কাল নিয়ে বিতর্ক আছে।[১৭] যেহেতু মান সিংহের উল্লেখ আছে, অতএব মান সিংহর প্রথম সুবাদারীর সময় (১৫৯৪ খ্রি) এই গৃহত্যাগ হয়েছিল ধরা যেতে পারে। রচনাটি সম্ভবত শেষ হয় আরো পরে।

বিতর্ক আছে "ডিহিদার" শব্দটি নিয়ে। উত্তর ভারতে এ শব্দ বিরল। একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধে ক্ষুদিরাম দাস লিখছেন যে "ডিহিদার" হচ্ছেন গ্রাম-প্রধান বা দু-চারটি গ্রাম নিয়ে গঠিত একটি অঞ্চলের শাসন কর্তা।[১৮] নানা কারণে এমত মানা যায় না। সুলতানী যুগের শেষদিকে বা মুঘল যুগের প্রথমে বা পরে কয়েকটি গ্রামের সমষ্টিকে কখনো "ডিহি" বলা হয়নি। সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে সুলতানী যুগের শিলালেখ থেকে বোঝা যায় যে "ডিহ" বলতে বড় অঞ্চলকে বোঝায়। এটিও মানা শক্ত।[১৯] সপ্তদশ শতকের শেষে "ডিহি কলকাতা" বলে যে অঞ্চলকে বোঝানো হচ্ছে, সেটি একটি গ্রাম

মাত্র, যার লাগোয়া অন্য গ্রাম ছিল অন্য নামে। মুঘল যুগে ফার্সী শব্দ "দেহ" থেকে "ডিহি" শব্দটি এসেছে। এখানে জমি জরীপ করার ব্যবস্থা হলে ডিহিদার নিয়োগ করা হয়, যিনি জমি জরীপ করে করের হার নির্ধারণ করবেন ঐ গ্রামের জমিতে।[১০০] এর ফলে ডিহিদারের হাতে লস্কর পেয়াদা ইত্যাদি ছিল, কিন্তু তিনি যে ঐ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন এটা মুকুন্দরামের রচনায় পাওয়া যায় না।

মুকুন্দরাম বর্ণিত উজীরকে ক্ষুদিরাম দাস সমগ্র বাংলার উজীর বলে ধরেছেন। সুখময় মুখোপাধ্যায় সঙ্গত কারণেই এমত গ্রহণ করেননি।[১০১] মুঘল যুগে বাংলায় কোন উজীর ছিল না। ঐ সময়ে যে দুটি উচ্চপদ ছিল, সেগুলি হচ্ছে *সুবাদার* ও *দেওয়ান-ই সুবা*। সুলতানী যুগের সাহিত্য ও শিলালিপিতে বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন সময়ে উজীরের কথা পাওয়া যায়। সুলতানী যুগে উজীর ছিলেন কোন বিশেষ অঞ্চলের আর্থিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণের আমলা। এদের উপরেই সম্ভবত কেন্দ্রীয় উজীর ছিলেন।[১০২] কিন্তু দামুন্যা গ্রামের আর্থিক ভারপ্রাপ্ত উজীরের সঙ্গে সারা বাংলার উজীরের কোন মিল নেই।

ডিহিদার মাহমুদ শরীফের অত্যাচার কিরকম ছিল তার বর্ণনা কবি দিয়েছেন। প্রধানত জমি জরীপ করে বিঘা কম দেখিয়ে খাজনা নগদ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছিল।[১০৩] ক্ষুদিরাম দাসই প্রথম যিনি এটিকে জাবতী প্রথা প্রবর্তন বলে ধরেছেন। আমরা আগেই দেখেছি যে সুলতানী যুগে জমি জরীপ করার রেওয়াজ ছিল না। হাল পিছু একটা নির্দিষ্ট টাকা খাজনা হিসাবে নেওয়া হত।[১০৪] এই প্রথার বদল করে ডিহিদারের লোকেরা বিশ কাঠার বিঘা ধরার বদলে পনের কাঠা হিসাবে বিঘা ধরেছে এবং বিঘা প্রতি ফসলের উপর কর নির্ধারণ করেছে। এছাড়াও অনাবাদী জমিকে আবাদী ধরে তার উপর কর নেওয়া হতে থাকে।[১০৫]

বিভিন্ন পন্ডিতরা এই সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দিয়েছেন, সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কার করা দরকার। প্রথমেই বলা দরকার যে মধ্যযুগের ভারতে এবং বাংলাতেও ভূমির উপর কোন কর ছিল না। কর সব সময়ই নেওয়া হত ফসলের উপর থেকে *খারাজ, মাল* ইত্যাদিভাবে বলা হত। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ার সব জমিই রাজার বলে ধরেছেন এবং ইউরোপীয় প্রথায় জমির উপর করকে "রেন্ট" (Rent) বলে ধরেছেন।[১০৬] ইংরাজরা ক্ষমতা পাবার পর জমির উপর কর বসায়, যার থেকে ভূমি রাজস্ব কথাটা এসেছে। মুঘলদের সময়ে ফসল না হলে কর দেওয়া হত না বলে রাজশক্তি সব সময়ে চেষ্টা করেছে অনাবাদী জমি আবাদী করার জন্য এবং লোক বসতি করলে বিশেষ ছাড় ও অন্যান্য সুবিধাও পাওয়া যেত। বিভিন্ন ধরণের ফসলের উপর বিভিন্ন ধরণের করের হার ছিল। রাজা মান সিংহ বাংলায় আসার আগে (১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দের আগে) আকবর *আইন-ই দশশালা* চালু করেন (দশ বৎসরের নিয়ম)। যে প্রদেশে সবটা জমি জরীপ করা যায়নি, যেমন বাংলাতে, সেখানে বিভিন্ন জায়গার অংশ বিশেষ জরীপ করে কত ফসল হচ্ছে তা নির্ধারণ করা হত। এরপর ঐ ফসলের পরিমান ও খাজনার হার একই পরিমান অনাবাদী জমিতে লাগানো

হত খাজনা সংগ্রহ করার জন্য। উদ্দেশ্য ছিল অনাবাদী জমিতে ফসল করা যাতে খাজনা বাড়ে।[১০৭] মুকুন্দরাম করের হার বাড়ানোর কথা বলেননি, স্বভাবতই মনে করা যায় যে পুরানো হারই বিঘা প্রতি হিসাব করে নেওয়া হচ্ছিল। যেটিকে অত্যাচারের অঙ্গ বলে মুকুন্দরাম ধরেছেন, সেটি করের হার নয়। সেটি ছিল জোর করে নগদে খাজনা আদায় করা।[১০৮]

মুকুন্দরামের প্রধান অভিযোগের একটি ছিল যে কুড়ি কাঠায় এক বিঘা না ধরে পনের কাঠায় এক বিঘা ধরা হচ্ছে ও তার উপর বিঘাপ্রতি ফসলের জন্য কর নেওয়া হচ্ছে। এই বিঘার মাপ করা হচ্ছে দড়ি দিয়ে। সিকান্দার লোদী নূতন মাপ তৈরি করেন যাকে *সিকান্দারী গজ* বলা হত এবং যেটি শের শাহ ও ইসলাম শাহর সময়ে বলবৎ ছিল। ১৫৮৩ সালে আকবর *গজ-ই ইলাহী* চালু করলে *সিকান্দারী গজ* বাতিল হয়ে যায়। এই *ইলাহী গজে* যে নূতন বিঘা তৈরি হয়, সেটি ছিল পুরানো বিঘার থেকে ১০১/২ % ভাগ কম। অর্থাৎ আবুল ফজল বলছেন যে নূতন বিঘা পুরানো বিঘার থেকে ছোট। এই নূতন বিঘা হওয়া উচিত ছিল ১৭১/২ কাঠায়। কিন্তু মুকুন্দরাম বলছেন যে ডিহিদার এই বিঘাকে নূতন ভাবে মেপে পনের কাঠায় নিয়ে এসেছে।[১০৯] বিঘা ছোট করা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই, তবে আকবরী মাপ থেকে ২১/২ কাঠা কমিয়ে ডিহিদারের কোন লাভ নেই বলে মনে হয়। মুকুন্দরাম ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ডিহিদার ঘুষও নেয় না।[১১০] বলা যেতে পারে যে বহু পরে মুকুন্দরাম এটি লিখছেন বলে তাঁর আড়াই কাঠা ভুল হয়েছিল। এটি যে সুবাদারের ব্যাপার নয়, সেটা মুকুন্দরাম বুঝেছিলেন, কারণ মান সিংহর প্রশস্তি (হিন্দু বলে নয়) করেছেন। এটি সাম্রাজ্যর নীতি ও সেটি রূপায়ণ করছিলেন *দেওয়ান-ই সুবা*।[১১১] পরবর্তী কালে জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত পূর্ববঙ্গে, জমি জরীপ ও *জাবতী* প্রথার প্রসার হয়।

বিঘা কমানো ছাড়া আর একটি অভিযোগ মুকুন্দরামের ছিল। উনি বলেছেন যে ওঁর গ্রামে পোদ্দার ছিল, যার কাজ ছিল টাকা বদল করা।[১১২] এটা আশ্চর্যর বিষয় যে দামুন্যার মত একটা সাধারণ গ্রামে এই ধরণের লোক রয়েছে। ততদিনে অবশ্য গ্রামের অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ডিহিদারের "অত্যাচারের" ফলে প্রজারা ধান, গরু ইত্যাদি বেচে পালাতে চেষ্টা করছে যার ফলে টাকার মূল্য কমে যাচ্ছে। ডিহিদার গ্রামের সীমানায় পাহারা বসিয়েছেন। ধান বা গরু কেউই কিনতে রাজি হচ্ছে না। পোদ্দার টাকায় আড়াই আনা কম দিচ্ছে বা বাট্টা কেটে নিচ্ছে, যেটি খুব বেশি। গ্রামের তালুকদার গোপীনাথ নন্দী এর বিরুদ্ধতা করায় কারারুদ্ধ হয়েছেন। প্রজাদের নানান অনুরোধ - উপরোধে কোন কাজ হয় না। ফলে অন্যদের মত মুকুন্দরাম গ্রামের লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে গ্রাম ত্যাগ করেন।[১১৩]

এখানে পোদ্দারের উপস্থিতি আশ্চর্যজনক। মনে করা যেতে পারে যে নগদ টাকায় গ্রাম থেকে খাজনা তোলার কথা হলে পোদ্দারকে আনা হয়েছিল। মুকুন্দরাম পোদ্দারকে

চিনতেন না এবং তার নামও দেননি বলে এই সন্দেহ আসে। অন্যদিক থেকে বলা যায় যে দামুন্যা গ্রামটি ছিল বড় এবং সঙ্গে বাজার ছিল। রত্না নদীর ধারে গ্রামটি থাকায় এ মত গ্রহণ করা যায়। এর ফলে পোদ্দারের উপস্থিতিতে আশ্চর্যর কিছু নেই। এই "অত্যাচারের" কাহিনীর মধ্যেও মুকুন্দরাম বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জগতের যে ছবি দিয়েছেন, সেটি অনন্য। বাংলায় ষষ্ঠদশ শতকের শেষে যে নূতন প্রাণ-স্পন্দন হচ্ছে এবং সেটি যে পরম্পরার সঙ্গে মিলে মিশে রয়েছে,তার ইতিহাস আমরা এবার দেখব।

দশ

মুকুন্দরামের অনন্য চিত্র দেখার আগে আমরা একটি লেখা আগে দেখব, যেটি মূলত রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার কথা বললেও সুলতানী যুগের চরিত্র নিয়ে বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। ১৫৭৫ সালে লেখা দ্বিজ বংশীদাস[১১৪] কাজীর সঙ্গে হিন্দুদের যে সংঘাতের বর্ণনা দিয়েছেন, সেটি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার মতই চেহারা নিয়েছিল। কাজী সব মুসলমানকে ডাকছেন ব্রাহ্মণদের ধর্মান্তরিত করার জন্য। কাজী হিন্দুদের লেখায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মান্ধ ও নিষ্ঠুর ব্যক্তি। সমকালীন বৈষ্ণব সাহিত্য অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে কাজীকে নরম করে দেখিয়েছে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে কাজীর সাম্প্রদায়িক চেহারা বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। সমকালীন বাংলা সাহিত্যে ও পরবর্তীকালের কোন কোন ঐতিহাসিক কাজীকে সরকারী আমলা হিসাবে ধরেছেন। এটি সঠিক বলে ধরা যায় না। সরকার কাজীকে নিয়োগ করে ঠিকই, তবে কাজীর নীতি সরকারী নীতি নয়। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারানী[১১৫] বলেছেন যে কাজী মুখীসুদ্দীন আলাউদ্দীন খলজীর রাষ্ট্রনীতি ধর্মের পথে চালিত করে হিন্দু কাফেরদের উচ্ছেদ বা দমন করার কথা বলেছিলেন। সুলতান জানিয়েছেন যে রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি আলাদা এবং রাষ্ট্র ধর্মের সব অনুশাসন মানে না। সুলতানী যুগের কবিরা এটা জানতেন। তাঁরা কাজীকে ধর্মান্ধ ও অত্যাচারী বলে বর্ণনা করলেও, সুলতানের প্রশস্তি করেছেন।[১১৬] এখানে বলা দরকার যে প্রধানত ক্রান্তিকালে ও প্রান্তিক গ্রামাঞ্চলে কাজীর অত্যাচার সংঘটিত হয়েছিল যার মূলে ছিল কেন্দ্রের প্রশাসনিক দুর্বলতা। নবদ্বীপ শহরে কাজী কীর্তন বন্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন প্রধানত শহরের ব্রাহ্মণদের অভিযোগক্রমে। কাজীর সঙ্গে গোলমালের পর চৈতন্যর কোন শাস্তি হয়নি। সাম্প্রতিক কালের কোন কোন ঐতিহাসিক কাজীর অত্যাচারকে সমগ্র হিন্দুদের উপরে মুসলমান রাষ্ট্রর অত্যাচার বলে ধরেছেন।[১১৭] এটা মেনে নেওয়া যায় না। এটুকু অবশ্য বলা যায় যে রাষ্ট্রের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রান্তিক গ্রামাঞ্চলে কাজীরা অত্যাচার করেছিলেন। বাংলার বা দিল্লীর সুলতানরা যে ঐ নীতি মেনে চলেছিলেন এর দৃষ্টান্ত বিরল।

এগারো

মুকুন্দরামের রচনায় দুটি বিপরীত চিত্র দেখা যায়। প্রথমটি তাঁর আত্মকাহিনীর অন্তর্গত, যেখানে ডিহিদার মামুদ শরীফের অত্যাচারে প্রজারা গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে। ওঁর দ্বিতীয়

চিত্র হচ্ছে নূতন নগর বসানো হচ্ছে, তার বর্ণনা। এই নূতন নগরের নাম উনি দিয়েছেন গুজরাট। এখানেও শহরের সঙ্গে লাগোয়া জমি আছে, যেটি মধ্যযুগের চিরাচরিত প্রথা। বলরাম মন্ডল জমির বিলিব্যবস্থা করে লোক বসাচ্ছে, এমন কি কৃষকদের পাট্টা দিচ্ছে।[১১৮] একাজ বলরাম করার অধিকারী ছিল কিনা বলা শক্ত। সাধারণত সরকার এই পাট্টা দিতেন। নূতন জন-বসতিতে যে জমিদার বা মোড়ল বিশেষ অধিকার পেয়েছিল সন্দেহ নেই। মুঘল আক্রমণের আগে বা পরে জমিদার ও মোড়লরা যে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এটি তারই ইঙ্গিত। এই বলরাম মন্ডল বিগত শতাব্দীর বিপ্রদাস পিপলাইর "প্রধান কিষাণ", যদিও বিপ্রদাস জনবসতি তৈরি করার কথা বলেননি। মুকুন্দরামের বলরাম কৃষকদের কৃষি ঋণ দিচ্ছে (*তাকাভী*) গরু, বীজ, ধান, দড়িদড়া কেনা ও বাড়ি তৈরি করার জন্য। বলা হচ্ছে যে বসতির জন্য সালামির প্রয়োজন নেই। ধানের বিক্রীর উপরও কর নেই।[১১৯] ভাগীরথীর তীরে যে বসতিগুলি গড়ে উঠছিল, এটি তার এক পরিষ্কার বর্ণনা।

মুকুন্দরামের বসতির মধ্যে মধ্যবিত্ত রয়েছে। বলা হচ্ছে যে কায়স্থদের জমি আলাদা করে চিহ্নিত করে দেওয়া হবে।[১২০] সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বৈষ্ণব কবি বলছেন যে কায়স্থরা রাজকার্য করে ও অত্যন্ত লোভী।[১২১] এর থেকে মনে করা যেতে পারে যে বসতি স্থাপন করার পিছনে সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও, উৎসাহ ছিল। সম্ভবত কায়স্থরা তার সুযোগ নিত বলেই এই বসতিতে সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল।

উল্লেখযোগ্য যে এই বসতিতে শাসনকর্তা কে সেটা বলা হয়নি। বলরাম লোক বসানোর পর জমিদার হয়ে যাবার কথা এবং সেক্ষেত্রে জমিদার / তালুকদার শাসনাধীনে এটি চলবে। কিন্তু মুঘল সরকারের নীতি এখানে চালানো হবে না সেটা পরিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে এখানে জমি জরীপ করা হবে না এবং স্বভাবতই ডিহিদার বসানো হবে না।[১২২] অর্থাৎ এটি হবে জমিদারী / তালুকদারী এলাকা যেখানকার অভ্যন্তরীণ নীতি মুঘল সরকারী আইন মেনে চলবে না। এরা হচ্ছে *ঘাইর-আমলা* জমিদার যারা শুধু পেশকাস দেয় ও প্রয়োজনে যুদ্ধ করে।[১২৩] শেষ দুটি অংশ মুকুন্দরামে অনুপস্থিত থাকলেও, এই ধরণের বসতি যে কবির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৈরি সেটা পরিষ্কার হয়ে যায়।।

শহরের নাম গুজরাট দিলেও, মুকুন্দরাম তাঁর শহরের মধ্যে বণিকদের বসাননি। উনি বৈশ্যদের কথা বলেছেন যারা প্রধানত ব্যাপারী ও মহাজনী।[১২৪] বিপ্রদাস শহরের মধ্যে যে "ছত্রিশ আশ্রমের লোক"[১২৫] কথা বলেছেন, সেটিও মুকুন্দরামের শহরে পাওয়া যায় না।

দ্বিজ বংশী দাসের লেখার মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী পাওয়া যায়, মুকুন্দরামের লেখায় সেটা পাওয়া যায় না। ডিহিদার মামুদ শরীফের অত্যাচার যে মুসলমান রাষ্ট্রের অত্যাচার এরকম কোন ইঙ্গিতও তাঁর লেখার মধ্যে নেই। দামুন্যা গ্রামে মুসলমান ছিল ওঁর লেখায় পাওয়া যায় এবং এটা পরিষ্কার যে মুসলমান সমাজের সঙ্গে মুকুন্দরামের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পাঠানদের মধ্যে যে ভাগ ছিল সেটা উনি বলেছেন। কোন কোন ফকীর যে দশভাঁজ করা টুপী পরে তার কথাও বলেছেন। মোল্লারা মুরগী বা বখরী ঠিকমত জবাই

করা হচ্ছে কিনা সেটা সুপারিশ করার জন্য একটা মূল্য পায়। কবির গুজরাট শহরের পশ্চিমদিকে মুসলমানদের জন্য আলাদা মহল্লা করা হয়েছিল। ওখানে মসজিদ ও শিশুদের জন্য মক্তব তৈরি করা হয়েছিল। ধর্মান্তরিত মুসলমানদের প্রতি তাঁর একটা ক্ষোভ ছিল কারণ তারা মুসলমানদের ধার্মিক অনুষ্ঠান ঠিক মত জানে না। মুসলমানদের বিভিন্ন পেশার কথা বলে কাজীর উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোন বিরূপ মন্তব্য করেননি।[১২৬] দ্বিজ বংশীদাস যে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমকালীন বাংলার সমাজকে দেখেছেন, সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ মুকুন্দরামের লেখায় তার কোন আভাষ নেই। ক্রান্তিকালের এই দুই কবির দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী সমকালীন বাংলার সমাজের মধ্যেকার বিভাজনকে সামনে নিয়ে আসে।

বার

মঙ্গলকাব্যের কবিরা পরম্পরা অনুযায়ী লেখার চেষ্টা করতেন, যার থেকে মুকুন্দরাম পৃথক নন। ওঁর জমিদার-মহাজন পসরা নিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যে যায় সপ্তডিঙা সাজিয়ে। এই ডিঙা ছিল লম্বায় একশ গজ ও চওড়ায় বিশ গজ, যেটি সমুদ্রের অভ্যন্তরে যাবার মত নয়। ডিঙাতে একটি মাস্তুল আছে। ডিঙা তৈরির ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু হত সেপ্টেম্বর - অক্টোবর মাসে এবং শেষ হত নভেম্বর মাসে।[১২৭] ঐ সময় মৌসুমী বাতাস পশ্চিম থেকে পুবে আসছে। সুতরাং বলা যায় যে পুবে যাওয়ার রেওয়াজ অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব দেশে যাওয়ার প্রথা চালু ছিল, যদিও উড়িষ্যা ও সিংহল ছাড়া আর কোন দেশে যাবার কথা পাওয়া যায় না। যেটা ইতিহাসের সঙ্গে মেলে না সেটা হচ্ছে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকে বাংলার একটা হাত যে মধ্যপ্রাচ্যর দিকে ছিল, তার কোন হদিস বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। মুকুন্দরাম পাটন বন্দরের কথা বলেছেন।[১২৮] এটি সম্ভবত অনিলওয়াড়া-পাটন যেটি একাদশ শতাব্দীতেই শেষ হয়ে যায় ও খাম্বাজ বন্দর তার জায়গায় চলে আসে। সুতরাং মঙ্গলকাব্যে বৈদেশিক বাণিজ্য কেবল পরম্পরাগত লেখা। মুকুন্দরাম ব্যাপারী, বণিক, বাণিয়া ও সওদাগরের মধ্যে কোন তফাৎ করেননি। তাঁর উল্লেখ্য বণিকদের মধ্যে - অধিকাংশই রাঢ়ের অধিবাসী, যদিও রাঢ় সম্বন্ধে মুকুন্দরাম ভালো কথা বলেননি।[১২৯] এরা ছিলেন ব্যাপারী। মুসলমান ব্যাপারীরা যে সাপ্তাহিক হাটে জিনিষপত্র কেনা করছেন, তার কথা বলেছেন।[১৩০]

মুকুন্দরাম সপ্তগ্রাম বা হুগলীর পর্তুগীজদের উল্লেখ না করলেও, ভাগীরথীর মোহনায় হার্মাদের কথা বলেছেন।[১৩১] ভালো করে পড়লে বোঝা যায় যে কবি ঐ জলদস্যুদের উড়িষ্যার কাছে রেখেছেন। এটিই সঠিক অবস্থান। ভাগীরথীর মোহনা দিয়ে ষষ্ঠদশ শতকের শেষে সমুদ্রপথ ছিল না। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বড় জাহাজ বালাসোরে এসে ছোট নৌকা করে মাল ভাগীরথীতে নিয়ে যেত। এই ধরণের যাত্রার অভিজ্ঞতা যে কবির নেই এটাও পরিষ্কার।

মুকুন্দরামের লেখায় শহরে মধ্যবিত্তদের প্রধান হয়ে দাঁড়ানোর কথা পাওয়া যায়।

শহরের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোকেদের কথাও পাওয়া যায়। এর থেকে শহরে যে দুটো অর্থনৈতিক ধারা চলছিল, এটাও বোঝা যায়। একটি ধারাকে বাজারী অর্থনীতির ধারা বলে ধরা যেতে পারে, যেখানে পণ্য টাকায় বা কড়িতে ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে।[১৩২] সাপ্তাহিক হাট বসছে যেটা মিশ্র গ্রামীণ ও শহর সভ্যতার অঙ্গ। এখানে সব কিছু নগদ টাকা বা কড়িতে চলে। নদী পার হতে গেলে পারানীকে কড়ি দিতে হয়; কয়েক কড়িতে ঘাস কাটানো যায়। কিন্তু এখানেও চতুর্বর্ণ রয়েছে যার মধ্যে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য। শহরের প্রান্তে বেশ্যারা রয়েছে। আর এক প্রান্তে দর্জীরা (সম্ভবত মুসলমান) রয়েছে যারা মাস মাহিনাতে কাজ করে। কারিগর মিষ্টান্ন তৈরি করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিক্রী করে — উৎপাদক ও মালিক আলাদা হয়ে যায়নি এবং দোকান বসানোর মত লগ্নী নেই। কয়েকধরণের কারিগর শহরের বাইরে থাকে যাদের মধ্যে রয়েছে *মলঙ্গী* বা নুন তৈরির কারিগর। এদের সঙ্গে আছে ডোমেরা যারা অবসর সময়ে কৃষকদের জন্য খড়ের টুপী তৈরি করে। শহর বিন্যাসে চতুর্বর্ণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। মুহম্মদ হাবিব[১৩৩] বলেছিলেন যে তুর্কীরা আসার পর কারিগররা মুক্ত হয়েছিল, তার চেহারা নগর - বিন্যাসে পাওয়া যায় না। এই বাজারী অর্থনীতির মধ্যে মধ্যবিত্ত পেশাগত লোক উঁকি ঝুঁকি দেয়।

বাজারী অর্থনীতির সঙ্গে শহরে আর একটা সমান্তরাল ধারার কথা মুকুন্দরাম বলেছেন।[১৩৪] এটি বহু প্রাচীন *যজমানী* প্রথা, যার মধ্যে টাকা পয়সার লেনদেন নেই। প্রধানত ব্রাহ্মণরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার জন্য চাল, ডাল ইত্যাদি পেয়ে থাকেন। প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন জায়গায়, প্রধানত মহারাষ্ট্রে, এটি চালু ছিল। এটা পরিষ্কার যে মুকুন্দরামের শহরে এই দুই ধারার কোন বিরোধ নেই।

বাজারী অর্থনীতির যে নূতন প্রাণের স্পন্দনের কথা পাওয়া যায়, সেটি এই সময়ে পূর্ববঙ্গে দেখা যায়। এই বঙ্গেয় শহরের উন্নতির চেহারাটা একটু অন্যরকম পশ্চিমবঙ্গের তুলনায়। দাউদ কাররানীর মৃত্যুর পর কিছু আফগান ও হিন্দু আমলারা পূর্ববঙ্গে পালিয়েছিল। এরা ওখানে আধা স্বাধীন জমিদারী গড়ে তোলে ও মুঘলদের বিরুদ্ধাচরণ করে বাংলা সাহিত্যে "বার ভুঁইয়া" নামে অমর হয়ে রয়েছে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে জেসুইট পাদ্রীদের লেখা চিঠি থেকে দেখা যায় যে এই সব ভূস্বামীরা চাল, কাপড় ও চিনির উৎপাদন ও ব্যবসা করে প্রচুর উন্নতি করছে।[১৩৫] এখানে মনে হয় পরাক্রান্ত ভূস্বামীদের থাকার সুবাদে চৈতন্যর আদর্শবাদ বিশেষ আসেনি। উল্লেখযোগ্য যে পূর্ববঙ্গের শহরগুলিতে এই সময়ে মধ্যবিত্তর দেখা পাওয়া শক্ত যেটা আমরা এই সময়ে ভাগীরথীর পাড়ের শহরগুলির মধ্যে পাই। পেশাদার লোক ও কারিগরদেরও বিশেষ উল্লেখ পূর্ববঙ্গের শহরগুলিতে এই সময়ে পাওয়া যায় না।

সুতরাং নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে মধ্যযুগের বিশেষত সুলতানী যুগের বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস অপরিবর্তনীয় নয়, যদিও এর কাল খুব ধীর লয়ে চলেছিল। এই সময়ের অর্থনৈতিক ইতিহাস সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত।

আমাদের প্রয়োজন সমকালীন সূত্রগুলির উপর নির্ভর করে অর্থনৈতিক ইতিহাসের ধারাগুলিকে পরিষ্কারভাবে দেখা।

সূত্রনির্দেশ

১। কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, *মধ্যযুগে বাঙলা*, কলিকাতা, ২০০১; (পুনর্মুদ্রণ); দীনেশ চন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, কলিকাতা, দুই খন্ড, ১৯৯৩ (পুনর্মুদ্রণ ১৯৩৫ সংস্করণ); নগেন্দ্র নাথ বসু, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কলিকাতা, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ (পুনর্মুদ্রণ ১৩৩৪ সংস্করণ); জগদীশ নারায়ণ সরকার, *বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক* (মধ্যযুগ), কলিকাতা, ১৩৯৮ (পুনর্মুদ্রণ ১৩৮৮ সংস্করণ)।

২। সুকুমার সেন, *মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী*, বিশ্বভারতী, ১৩৬৯ (পুনর্মুদ্রণ ১৩৫২ সংস্করণ।

৩। দুর্গাচরণ সান্যাল, *বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, কলিকাতা, দুই খন্ড, ১৯১১।

৪। মীনহাজ - আস সিরাজ, *তবাকৎ-ই নাসিরী* (বাংলায় অনুবাদ ও সম্পাদনা এ.কে.এম জ্যাকেরিয়া) ঢাকা, ১৯৮৩।

৫। P.C. Bagchi, "Political Relations between Bengal and China in the Pathan period", *Viswa - Bharati Annals*, 1945, Vol-I, ৯৬-১৩৪, এছাড়া দ্রষ্টব্য Haraprasad Ray, *Trade and Diplomacy in India-China Relations*. New Delhi, 1993.

৬। Mamtajur Rahman Tarafdar, *Hussain Shahi Bengal*, Dacca University, 1999, 2nd revised ed. (first published 1965)

৭। Reena Bhaduri, *Social Formation in Medieval Bengal*, Kolkata, 2001.

৮। অনিরুদ্ধ রায়, "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসের উপাদান ঃ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী", *নন্দন*, আগষ্ট ২০০২, ৩৮ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, ২০-২৪।

৯। B.D. Chattopadhya, "Political Processes and Structure of Polity in Early Medieval India Problems of Perspective" in *The Proceedings of the Indian History Congress*, 44th session, 1983, 25-63.

১০। মরিস লোমবার্ড ও কয়েকজন সমকালীন জার্মান ঐতিহাসিকরা হেনরী পিরেনের তত্ত্ব (*Historic Ewortmique et Social de l'Inrope*, Belgium 1934) মানতে চান নি (দ্রষ্টব্য ঃ Maurice Lombard, L'Islam Dans sa Premiere Grandeur, Paris, 1971.)

১১। M. Dobb, *Studies in the Development of capitalism*, London, 1970, reprint; M.M. Postan, *Medieval Trade and Finance*, Cambridge, 1973.

১২। R.S. Sharma, *Indian Feudalism*, Calcutta, 1965, অনেকে এর বিরুদ্ধাচারণ করেছেন যাদের মধ্যে দ্রষ্টব্য André Wink, *Al-Hind*, Oxford University Press, 1990.

১৩। R.S. Sharma, *Urban Decay in India*, C: 300-C.1000, New Delhi, 1987.

১৪। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৪০০ (পুনর্মুদ্রণ, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৬)।

১৫। ঐ, পৃঃ ৩০৮-১০।

১৬। দ্রষ্টব্য টীকা ১০, ১১।

১৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০-৩২।

১৮। Maqbul Ahmed, *Arabic classical Accounts of India and China*, Simla, 1980; G.F. Hourani, Arab Seafaring in the Indian Ocean, Princeton, 1951.

১৯। মীনহাজ, প্রাগুক্ত, ২৫-২৭।

২০। নীহার রঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, ৪৪১ হইতে। চর্যাগীতির জন্য দ্রষ্টব্য সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, কলিকাতা, চার খন্ড, ষষ্ঠ সংস্ক রণ ১৯৭৮ (পুনর্মুদ্রণ ১৯৯১। প্রথম খন্ড ৫৪-৭৫।

২১। সুকুমার সেন, *প্রাগুক্ত*, ৭৮-৭৯।

২২। নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, ২৬৮ থেকে।

২৩। Irfan Habib, "Agrarian Economy" in I. Habib & T. Ray Choudhury (ed), *The Cambridge Economic History of India*, Orient Longman, 1984, 2 vol, vol. I, 55-56; A.B. Shamsuddin Ahmed, "Administram Units under the Early Iliyas Shahi Sultans of Bengal" in *Bangladesh Historical Studies*, 991-95, Vol. *XV-XVI*, 1-14.

২৪। তরফদার, *প্রাগুক্ত*, ১১৩-১২৬।

২৫। ঐ।

২৬। ঐ।

২৭। বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্য ভাগবৎ*, নদীয়া, তৃতীয় সংস্করণ, ৮০৩-৮০৪।

২৮। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *চৈতন্য চরিতামৃত*, বসুমতি সংস্করণ, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৭২-৭৩।

২৯। তরফদার, *প্রাগুক্ত*, ১১৩-১১৬। তরফদারের বক্তব্য যে আবুল ফজল ইজারাদারী ও জমিদারী প্রথা গুলিয়ে ফেলেছিলেন (পৃঃ ১১৮) মানা যায় না।

৩০। Ashin Dasgupta, *Indian Merchants and the Decline of Surat, c. 1700-1750*, Weisbaden, 1979. অসীন দাশগুপ্ত সুরাটের খাজনার মধ্যে বন্দরের লাগোয়া জমির খাজনা ধরেননি।

৩১। Abul Fazl. *Ain-i Akbari* (tr. by Garret and annotand by J.N. Sarkar), The Asiatic Society, 1993, II, (reprint), 129-162 for Bengal Suba.

৩২। H.A.R. Gibb (tr.), *Ibne Battuta*, New Delhi, 1986 (1st ed. 1929), 271. বতুতার মতে এরা হিন্দু এবং এ ছাড়াও তারা অন্যান্য কর দিত।

৩৩। জয়ানন্দ, *চৈতন্যমঙ্গল* (এস. মুখোপাধ্যায় ও বি.বি. মজুমদার সম্পাদিত), কলিকাতা, ১৯৭১, ১০-১১।

৩৪। মুকুন্দরামের গুজরাট নগরে এই প্রতিশ্রুতি (*প্রাগুক্ত*, ৩৩৫)। তপন রায় চৌধুরী বলছেন যে বাংলায় জমি জরীপ করা হত (দ্রষ্টব্য, Tapan Roy Choudhury. "Revenue

Administration of Bengal in the Early Days of Mughal Rule" in *Journal of Asiatic Society of Bengal*, 17, No. 1, 1951. এ নিয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Aniruddha Roy, Adventurous, *Landowners and Rebels, Bengal, c.1575-c. 1715,* New Delhi, 1998.

৩৫। আবুল ফজল বলছেন জমি জরীপ করার জন্য জোর করা হত না এবং চোখে দেখে ফসলএর পরিমাপ নির্ধারণ করা হত। আবুল ফজল আরো বলছেন যে সম্রাট এই প্রথা মেনে নিয়েছিলেন, (*প্রাগুক্ত*, দ্বিতীয় খন্ড, ১৩৪)।

৩৬। বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Irfan Habib, The Agrarian System of Mughal India, 1556-1707, Oxford University Press, 1999 (প্রথম সংস্করণ ১৯৬৩), ২৫৪-২৫৯।

৩৭। আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, ১৩৪। উনি বলছেন যে কৃষকরা আট ক্ষেপে খাজনা দেয় এবং সরাসরি মোহর ও রূপোর টাকা নিয়ে আসছে।

৩৮। হাবিব বলছেন যে উত্তরভারতে চতুর্দশ শতাব্দীতে বড় এলাকাগুলি *শিক* বলা হত যার অধিকর্তা ছিলেন *শিকদার*। এর খাজনা সংগ্রহ করার, প্রধানত পরগণা থেকে, কাজ পান ও ক্রমে ছোট খাজনার আমলাতে পরিণত হন (*প্রাগুক্ত*, ৩১৮-১৯)। বাংলাতে ষোড়শ শতাব্দীতে *শিকদারের* বিচার করার ক্ষমতা ছিল (বৃন্দাবন দাস, *প্রাগুক্ত*, ১১৯-১২১)।

৩৯। বতুতা, *প্রাগুক্ত*, ২৬৭, এ সম্পর্কে নীরদভূষণ রায়ের মনোজ্ঞ আলোচনা (Jadunath Sarkar (ed.), *History of Bengal*, Vol.II, Dacca University, 1971 (পুনর্মুদ্রণ ১৯৪৮)। ১০০-১০৩।

৪০। মুহম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৮২, প্রথম খন্ড, ৩৫৭-৩৬০।

৪১। ঐ, ৩৬১-৩৬২।

৪২। বতুতা, প্রাগুক্ত, ২৬৭।

৪৩। ঐ।

৪৪। তরফদার আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন এই দেখে যে আলাউদ্দীন হোসেন শাহর আমলে অস্বাভাবিকভাবে রূপোর আমদানি ঘটেছিল (প্রাগুক্ত, ১৫১)। কড়ির বেশি ব্যবহার ছিল কিনা উনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নীচুস্তরে, দৈনন্দিন জীবনে কড়ির প্রচলন বাংলায় সারা মধ্যযুগ ধরেই চলেছিল, তার প্রমাণ আছে।

৪৫। প্রবোধ বাগচীর প্রবন্ধ, *প্রাগুক্ত*, ৯৬-১৩৪।

৪৬। ধ্বংসস্তুপ থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজান্ডার কানিংহাম পান্ডুয়ার শহরতলীর দুপাশে দোকানের সারির কথা বলেছেন (*Archaeological Report : A Tour in Bihar and Bengal in 1879-80,* Calcutta, 1882, 81) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বুখানন হ্যামিলটন এগুলি দেখতে পান (আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, এইচ.ই.ষ্টেপলটন (সম্পা), এম আবিদ আলি খানের *মেময়ার্স অফ গৌর এ্যান্ড পান্ডুয়া*, কলিকাতা, ১৯৮৬, পুনর্মুদ্রণ, ৮০-৮১)।

৪৭। J.V.G. Mills (Tr. & ed.) *Ma Huan*, Cambridge University Press, 1970, 160-165.

৪৮। আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস ঃ সুলতানী আমল* ঢাকা ১৯৮৭ (প্রথম সংস্করণ ১৯৭৭), ১৪২ থেকে। এ ছাড়া, তরফদার, প্রাগুক্ত, ১৫৮-১৬৩।

৪৯। M.M Chakrabarty, "Notes on the Geography of Old Bengal," *Journal of Asiatic Society of Bengal*, May 1908, II, No. 5, 217. উনি দেখাচ্ছেন যে রেণেলের সময়ে এক মাইল দূরে নদী ছিল। ১৮৪৮ সালে সার্ভে যে মানচিত্র করেছিল তাতে দেখা যাচ্ছে যে নদী পাঁচিলের কাছে ছিল (Map showing remains of Pandua, Malda, office of the Settlement Officer, M.P. 913 (5415). এখন National Library, No. M 292 Pan. কিন্তু চীনারা কেন নবাবগঞ্জে নৌকা থেকে নেমে হেঁটে পাণ্ডুয়া গিয়েছিলেন, সেটা পরিষ্কার নয়।

৫০। গৌড় ও সপ্তগ্রামের প্রায় একই সঙ্গে উত্থানের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Aniruddha Ray, "Urbanization in Medieval Bengal, C. AD 1200 to C. AD 1600" in *The Proceedings of The Indian History Congress,* 53rd Session. Warangal, 1982-83, 150-151.

৫১। Aniruddha Ray, "Morphology of Medieval Saptagram" in *Journal of Bengal Art*. Dhaka, 1999, Vol-4, 220-222.

৫২। আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, অনিরুদ্ধ রায়, "ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বাংলাদেশে নগর বিন্যাস ও সামাজিক বিবর্তন", অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টপাধ্যায় (সম্পা) *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, কলিকাতা, ১৯৯২, ৬১-৮৬।

৫৩। ঐ।

৫৪। এম. আবিদ আলি খান, প্রাগুক্ত, ৫১-৬০।

৫৫। সুখময় মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) *বিপ্রদাসের মনসা বিজয়*, এশিয়াটিক সোসাইটি। কলকাতা, ৫৮।

৫৬। ঐ, পৃঃ ৬৩; তরফদার, প্রাগুক্ত, ১৪৪-১৪৫।

৫৭। Satish Chandra, *Medieval India*, Macmillan India, 1982, article "The Structure of Village Society in Northern India : The Khud Kasht and Pahi Kasht", 29-45.

৫৮। তরফদার, *প্রাগুক্ত*, ১৫৫-১৫৭; রহিম, *প্রাগুক্ত*, ৩৫৫ (প্রধানত বিজয় গুপ্ত ও মুকুন্দরামের লেখার উপর নির্ভর করে)।

৫৯। Aniruddha Ray, "The French Establishment in Bengal" in Om Prakash & D. Lombard (ed), *Commerce and Culture in the Bay of Bengal, 1500-1800*, New Delhi, 1999, 211-212 ফরাসী বণিক দেলান্দের চিঠি, হুগলী, ১৯ নভেম্বর ১৭০০।

৬০। গোলাম হোসেন সলীম, *রিয়াজ-উস সালাতিন* (বাংলা অনুবাদ), ঢাকা, ১৯৭৪।

৬১। সুকুমার সেন (সম্পা), *চূড়ামণি দাস ঃ গৌরাঙ্গ বিজয়*, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৫৭, ৭৮।

৬২। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *প্রাগুক্ত*, ৮২।

৬৩। G. Bouchan & L.F Thomaz (Tr. & ed.), *Voyage*, Paris, 1988 (এখানে *ব্রিটো দলিল* বলে বলা হবে), ৩১৬-৩১৮।

৬৪। জয়ানন্দ, *প্রাগুক্ত*।

৬৫। মুকুন্দরাম, *প্রাগুক্ত*, ৩৬২-৩৬৩।

৬৬। *ব্রিটো দলিল*, ৩১৬-৩১৮।

৬৭। আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Arun Dasgupta, "Aspect of Bengal's Sea-borne Commerce in the pre-European period", presented to Bengladesh Historical Conference, 1973. প্রবন্ধটি ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য আমি শ্রী দাশগুপ্তের কাছে কৃতজ্ঞ।

৬৮। J.W. Jone (tr.), *The Itinerary of Ludvico de Varthema*, A.E.S. 1997 (reprint of 1863 ed.) 79-80 ভারথেমা ১৫০২ থেকে ১৫০৮ সাল ভারতে ছিলেন।

৬৯। M.L. Dames (tr.), *The Book of Duarte Barbosa*, AES, 1989, 2 vols., II, 135-147.

৭০। *ব্রিটো দলিল*, ৩৩২।

৭১। দ্রষ্টব্য র‍্যালফ ফিচের বক্তব্য ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে (W. Foster (ed), *Early Travels in India*, New Delhi, 1985, 24-28)।

৭২। আলোচনার জন্য তরফদার, প্রাগুক্ত, ১৪১,ব্যারোসের বক্তব্য কতটা নির্ভরযোগ্য এটা ভেবে দেখা দরকার।

৭৩। ইরফান হাবিব, "ইতিহাস গবেষণায় প্রযুক্তি চর্চার গুরুত্ব", ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, কলিকাতা, ১৯৯০, ১৮।

৭৪। A. Courtesao (ed.), *The Suma Oriental of Thome Pires*, AES, 1990, 2 Vols., I, ৮৮-৯৫।

৭৫। মুকুন্দরাম, প্রাগুক্ত (এলাহাবাদ সংস্করণ), ১৯২১, ২০১।

৭৬। ঐ, ১৭৯।

৭৭। বৃন্দাবন দাস, প্রাগুক্ত, ৮০৩-৮০৪।

৭৮। Caeser Fredrick (Purchas, Edinburg, 1911. V, 410-411).

৭৯। Vincent Le Blanc, *Voyage*, Paris, 1648, 133-34.

৮০। ষষ্ঠদশ শতকের শেষে আবুল ফজল বলেছেন যে সপ্তগ্রাম বন্দরের বার্ষিক আয় ছিল ত্রিশহাজার টাকা (*আইন*, দ্বিতীয় খন্ড, ১৫৪)। ১৬২২ সালে পাটনা থেকে লেখা দুটি চিঠিতে ইংরাজরা বলছে যে পর্তুগীজরা দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে মাল সপ্তগ্রামে নিয়ে এসেছে (উদ্ধৃত, L.S.S. O'Malley & M. Chakrabarty, *Bengal District Gazetteer, Hooghly*, Calcutta, 1912, Vol. 29, 187-191.

৮১। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায় মা-হুয়ান বলেছিলেন যে বাংলার সুলতান নিজের জাহাজে বাণিজ্য

করেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহর দুটি জাহাজ মালাক্কাতে পর্তুগীজরা দখল করে নেয় (*ব্রিটো-দলিল*, ৩৩৩)।

৮২। টমে পিরেস, প্রাগুক্ত, ৯৩-৯৫।

৮৩। মহাশ্বেতা সান্যাল, "সপ্তগ্রাম (আনুমানিক ১৩০০-১৬৩২)", *ঐতিহাসিক*, জানুয়ারী ১৯৭৭, নং ৪, ১-২৬।

৮৪। টমে পিরেস, *প্রাগুক্ত*, ৯৩-৯৫।

৮৫। মীনহাজ, *প্রাগুক্ত*, ২৬-২৭।

৮৬। মঙ্গোলদের আক্রমণে চীন দেশের সঙ্গে স্থলবাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে গেলে পাভুয়া ও দেবকোটের গুরুত্ব কমতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে ও উত্তরবঙ্গে পার্বত্য ঘোড়া আসছিল সম্ভবত কম সংখ্যায়। মুকুন্দরামের সওদাগর গৌড় থেকে দুটো চাঙ্গন ঘোড়া কিনেছিল (প্রাগুক্ত, ১৫৬)।

৮৭। S.B. Qanungo, *A History of Chittagong*, Chittagong, 1988, Vol. I.

৮৮। I. H. Siddiqui (tr. 2 ed.), *Wakiat-e-Mustaenqui*, New Delhi, 1993, 126.

৮৯। আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Aniruddha Ray, "Archaeological Reconnaissance at the city of Gaiur", *Pratna-Samiksha*, 1995, Vol. 2-3, 245-263.

৯০। আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, তরফদার, *প্রাগুক্ত*, 158-63, লোদীদের যেখানে মুদ্রায় ১৪৫ গ্রেণ এর বেশি নেই, সেখানে হোসেন শাহীদের গড়পড়তা ছিল ১৬৬ (পৃঃ ১৬১)। হোসেন শাহী আমলে এত বেশি রূপো আসায় তরফদার আশ্চর্য হয়েছেন এবং এর জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যকে দায়ী করেছেন (পৃঃ 159)। হঠাৎ বৈদেশিক বাণিজ্য এত বাড়ল কেন, সেটা আলোচনা করা হয়নি।

৯১। বারবোসা প্রধানত মুসলমান বণিকদের কথা বলেছেন, যাদের নিজেদের জাহাজ ছিল। প্রধানত তাঁতের কাপড় ও চিনি থেকে এই বাণিজ্য চলছে বলেছেন (*প্রাগুক্ত*, ১৪২-১৪৮)।

৯২। উত্তরভারতে সুলতানী যুগের শেষ দিকে কারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পড়বে, এজন্য দ্রষ্টব্য I.A. Khan, "Middle Class in the Mughal Empire", *Proceedings of the Indian History Congress*, 1975, 36th Sessian, Aligarh, 113-141.

৯৩। তরফদার বলছেন যে এরা অনেকে ছিলেন ধনী (*প্রাগুক্ত*, ১৫৯-১৬০)। কিন্তু এদের জীবনযাত্রা বিলাসবহুল ছিল তার কোন প্রমাণ নেই।

৯৪। *ব্রিটো দলিল*, ৩৩৩।

৯৫। কালক্রম নিয়ে আলোচনা, দ্রষ্টব্য সুখময় মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম*, কলিকাতা, ১৯৮৮, দ্বিতীয় সংস্করণ। জীবনীর জন্য দ্রষ্টব্য, পঞ্চানন মন্ডল (ভূমিকা ও সম্পানা) *মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত চন্ডীমঙ্গল*। কলিকাতা, ১৯৯২ (পুনর্মুদ্রণ ১৯৯১) পৃঃ ক-চ।

৯৬। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেন ক্ষুদিরাম দাস তাঁর প্রবন্ধে "মুকুন্দরামের গ্রামত্যাগ ও কাব্য রচনা প্রসঙ্গ", বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, কার্তিক - পৌষ, ১০৫-১১৫। সাম্প্রতিক

আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য অনিরুদ্ধ রায়, "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসের উপাদান; মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল, *নন্দন*, আগষ্ট, ২০০২, ৩৮ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, ২০-২৪।

৯৭। সুকুমার সেন মনে করেন যে কবি ১৫৪৪-৪৫ *খিস্টাব্দে* গৃহত্যাগ করেন ও ১৫৫৫-৫৬ সালে তাঁর প্রথম *পাঁচালী* গান করা হয় (সুকুমার সেন, *প্রাগুক্ত*, ৪২১-৪২৩। পঞ্চানন মন্ডল ১৫৮৬ সাল গ্রন্থ রচনাকাল বলে ধরেছেন (*প্রাগুক্ত*, পৃঃ জ-ঝ। ভিন্ন ভিন্ন পুঁথিতে ভিন্ন পাঠের ফলে এই সমস্যা জটিল হয়েছে। ক্ষুদিরাম দাস গৃহত্যাগের সময় ১৫৯৪ সাল ধরেছেন।

৯৮। ক্ষুদিরাম দাস, প্রাগুক্ত।

৯৯। সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ১৫৭।

১০০। গ্রামভিত্তিক খাজনার পরিমান কত হবে (জমা) তাকে *দেহ বা-দেহি* বলা হত (Irfan Habib, *The Agrarian System of The Mughal Empire*. প্রাগুক্ত, ৩০৩ টীকা ১৯। উল্লেখযোগ্য যে ডিহিদার শব্দটি উত্তরভারতে পাওয়া যায় না।

১০১। মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ১৬৭-১৬৮।

১০২। তরফদার একে প্রধানত সেনাপতি বলে ধরেছেন, যদিও প্রথমে উনি এসেছিলেন অর্থ-বিভাগের কর্তা হিসাবে (*প্রাগুক্ত*, ১০৮-১০৯)। উল্লেখযোগ্য যে এখানে মুকুন্দরাম উজীরের ক্ষমতা বেড়েছে বলে দেখাচ্ছেন (উজীর হল রায়জাদা, এলাহাবাদ সংস্করণ, ৪)। প্রশ্ন থাকে যে খালিসা জমিতে জরীপ না করে তালুকদারী জমিতে কেন জরীপ করা হচ্ছে।

১০৩। মুকুন্দরাম, *প্রাগুক্ত*, ৪-৫।

১০৪। আলোচনার জন্য অনিরুদ্ধ রায়, মুকুন্দরাম, *প্রাগুক্ত*, ২১-২২।

১০৫। "মাপে কোনে দিয়ে দড়া, পনের কাঠায় কুড়া"। আবার "খিলভূমি লিখে লাল", প্রাগুক্ত, ৪।

১০৬। অনিরুদ্ধ রায়, *ফ্রাসোয়া বার্ণিয়ারের দেখা ভারত*, কলিকাতা, ২০০৩, ৭৯-৯৭।

১০৭। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, ইরফান হাবিব, *এ্যাগ্রারিয়াম সিস্টেম*, *প্রাগুক্ত*, ২৪৬-২৪৭।

১০৮। মুকুন্দরাম পরিষ্কার করে এ কথা বলেননি। কিন্তু প্রজারা যে গরু, ধান রোজ বেচছে। তার থেকে এটা বোঝা যায় (*প্রাগুক্ত*, ৫)।

১০৯। *প্রাগুক্ত*, ৪ ("পনের কাঠায় কুড়া")।

১১০। "ডিহিদার অবোধ খোজ টাকা দিলে নাহি রোজ" (ঐ)।

১১১। *আইন-ই দশশালার* জন্য-দ্রষ্টব্য, ইরফান হাবিব *এ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম*, ২৪৬-২৪৭। ইলাহী গজ চালু করার জন্য দ্রষ্টব্য, ঐ, ৪০৬-৪১২।

১১২। "পোদ্দার হইল যম, টাকায় আড়াই আনা কম" (*প্রাগুক্ত*, ৪)।

১১৩। ঐ, ৫।

১১৪। আশুতোষ ভট্টাচার্যর গ্রন্থে উদ্ধৃত (*বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২, ৫৮-৬০)।

১১৫। জিয়াউদ্দীন বারানী, *তারিখ-ই ফিরোজশাহী*, (বাংলা অনুবাদ), ঢাকা, ১৯৮২, ২৩৮-৩৯।

১১৬। বিজয় গুপ্ত, *পদ্মাপুরাণ*, কলিকাতা, ১৯৬২, ১২২-১২৬। একই সঙ্গে বিজয় গুপ্ত সুলতান জালালুদ্দীন ফতে প্রশংসা করেছেন।

১১৭। R.C. Majumder, *History of Medieval Bengal*, Calcutta, 1973, 247-52 (সমালোচনা জন্য দ্রষ্টব্য, সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশ বছর*, কলিকাতা, ১৯৯৮, চতুর্থ সংস্করণ, ৪৮২-৮৩); অনিলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, কলিকাতা, ১৯৬৮, ৫০-৫৮।

১১৮। মুকুন্দরাম, প্রাগুক্ত, ৮৫-৮৭।

১১৯। ব্রাহ্মণদের উপর নেই এবং ডিহিদার বসাবেন না বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রথম তিন বছর কর লাগবে না ও তারপরে বছরে "হাল পিছু এক তঙ্কা" অর্থাৎ পুরানো প্রথায় কর নেওয়া হবে যেখানে জমি জরীপ করা হবে না (ঐ, ৮৫)।

১২০। ঐ, "প্রজাগণে দেহ দান, ভূমি বাড়ী করিয়া চিহ্নিত" (৮৯)।

১২১। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *চৈতন্য চরিতামৃত*, নবম বসুমতি সংস্করণ, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, ২০০-২০১।

১২২। মুকুন্দরাম, *প্রাগুক্ত*, ৮৫।

১২৩। S. Nurul Hasan, "Zamindars Under the Mughals", R.E. Frykenberg (ed), *Land Control and Social Structure in Indian History*, New Delhi, 1979, 17-31.

১২৪। মুকুন্দরাম, *প্রাগুক্ত*, ৮৮ ("বৈদ্য বসে মহাজন")।

১২৫। বিপ্রদাস, *প্রাগুক্ত*, ১৪৩।

১২৬। মুকুন্দরাম, *প্রাগুক্ত*। ৮৬-৮৭।

১২৭। ঐ, ২২৭।

১২৮। ঐ, ২৩০। কবি দক্ষিণ পাঠনের কথাও বলেছেন।

১২৯। "আমি নীচু কূলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়, কেহ না পরশে জল লোকে বলে রাড়", (ঐ, ৭৩)।

১৩০। ঐ, ১৮১।

১৩১। "রাত্রিদিন বাহে যায় হার্মাদের ডরে" (ঐ, ২০৫)।

১৩২। ঐ, ৮৮-৯১।

১৩৩। Muhammed Habib, "History of India", Aligarh, 1952 (reprint), 55 এর কিছু পরিবর্তন করেছেন Irfan Habib, "History of Delhi Sultanate", *The Indian Historical Review*, 1978, Vol. 4, No. 2, 287-303.

১৩৪। মুকুন্দরাম, *প্রাগুক্ত*, ৯০-৯১।

১৩৫। অনিরুদ্ধ রায়, "ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেসে নগর-বিন্যাস", *প্রাগুক্ত*, ৭৫-৮৬।

নৃতত্ত্বের পটভূমিকায় বাঙালীকে দেখা
ও
বঙ্গসংস্কৃতির দিগ্‌দর্শনে স্রষ্টার প্রতিফলন

অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়

বাঙালী জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় পাওয়া যায় অগণিত উপজাতি ও বহু ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর শারীরবৃত্তের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। বাংলা ভাষাভাষী জনগণ যে ভূখণ্ডে বাস করতো তা বৃহৎ অর্থে বঙ্গ বঙ্গদেশ নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বঙ্গ সমগ্র দেশকে বোঝাতো না। সুক্ষ্ম, রাঢ়, সমতট, হরিকেল ইত্যাদি জনপদের ন্যায় বঙ্গ একটি জনপদ। ক্রমে বঙ্গ নাম মুসলমান ও ইংরাজ শাসনকালে সমগ্র ভূখণ্ডের নামে পরিণত হল।[১] আজকের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ নিয়ে যে ভূখণ্ড সেই বঙ্গদেশে সুপ্রাচীনকাল থেকে বহুবিধ ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ঘটেছিল। ঐসকল নরগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখনীয় অস্ট্রিক, কোল, মুন্ডা ভাষী অস্ট্রালয়েড, দ্রাবিড় ভাষাভাষী মেডিটেরেনিয়ান, ইন্দো-চীন ও ইন্দো-তিব্বতীয় ভাষাভাষী মঙ্গোলয়েড, ইন্দো-ইউরোপীয় অর্থাৎ ভারতবর্ষে ও বঙ্গে সংস্কৃত ভাষাভাষী অ্যালপিনয়েড, ডিনারিক, নর্ডিক ইত্যাদি নরগোষ্ঠী ঐ সকল নরগোষ্ঠীর মিলন মিশ্রণেই বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়। আবার ঐ সকল নরগোষ্ঠীর শারীরবৃত্তের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। যথা অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীরা খর্বকায়, লম্বা থেকে মাঝারি বা মধ্যমকরোটীযুক্ত (dolicho-cephalic and brachycephalic), প্রশস্ত নাসিকা, গায়ের রং কালো, মাথার চুল ঢেউখেলানো। মেডিটেরেনিয়ান নরগোষ্ঠী যারা দ্রাবিড়ভাষী তাদের আকৃতি মধ্যম থেকে লম্বা করোটীযুক্ত। গায়ের রং কালো, নাক উন্নত ও চ্যাপ্টা ইত্যাদি। মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠী খর্বকায়, স্বল্প শ্মশ্রু, চ্যাপ্টা নাক ও পীতাভ বর্ণ, চক্ষু ছোট ও ভিতরদিকে ঢোকানো। ইন্দো-আর্যভাষী হোমো অ্যালপাইন, নর্ডিক, ডিনারিকগোষ্ঠী গোল ও মধ্যম মুণ্ডাকৃতি, তীক্ষ্ম, উন্নত ও মধ্যম নাসাকৃতি, দেহের গঠন লম্বা, গায়ের রং ফর্সা।[২] উপবিউক্ত শারীরবৃত্তের বৈশিষ্ট্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় জানার প্রচেষ্টা করা যায়।

এই প্রসঙ্গে বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি সম্পর্কে যে সকল ইতিহাসবিদ্ তাঁদের মনোজ্ঞ চিন্তা পরিবেশন করেছেন সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা অপরিহার্য। ইতিহাসে নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি সম্পর্কে সচেতনতার আভাস দিয়েছেন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ঐতিহাসিক রাখালদাস

বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'প্রিহিস্টোরিক এ্যানসিয়ান্ট এ্যাণ্ড হিন্দু ইণ্ডিয়া' গ্রন্থটিতে। এই গ্রন্থে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন নরগোষ্ঠী ও বহুবিধ ভাষার আলোচনা করেছেন। ভারতবর্ষে মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভবের ইঙ্গিত দিয়েছেন। পরে বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে একটি অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত হলেও গুরুত্বপূর্ণ। আলোকপাত করেছেন ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁর সম্পাদিত 'হিস্টি অব-বেঙ্গল', ভল্যুম ওয়ানে (প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৩), হিস্ট্রি অব এ্যানসিয়ান্ট বেঙ্গল ও (চ্যাপ্টার টু, প্রি হিস্টোরিক পিরিয়েড, অরিজিন অব দি বেঙ্গলিজ, প্রকাশিত কলিকাতা, ১৯৭১) ও সংক্ষিপ্ত আকারে বাংলা দেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ, প্রকাশিত কলিকাতা, ১৩৭৩) গ্রন্থসমূহে। প্রথিতযশা ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাসে' ইতিহাসের গোড়ার কথায় ৬০/৬২ পৃষ্ঠা জুড়ে বাঙালীর জনতত্ত্ব ও বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন। (রিপ্রিন্ট, কলিকাতা, ১৯৮০) অর্থনীতি ও নৃতত্ত্বে পণ্ডিতপ্রবর অতুল সুরের 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' ও 'বাঙালী জীবনের নৃতাত্ত্বিক রূপ' গ্রন্থদ্বয় নিঃসন্দেহে উল্লেখনীয় (প্রকাশিত কলিকাতা যথাক্রমে ১৯৭৭ ও ১৯৯২)। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ নির্মলকুমার বসুর 'হিন্দু সমাজের গড়ন' (প্রকাশিত বিশ্বভারতী কলিকাতা, ১৩৫৬, লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা) গ্রন্থটি নৃতত্ত্বের পটভূমিকায় বাঙালীকে দেখার আলোকবর্তিকা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারততীর্থ কবিতার প্রতিটি ছত্রে বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ইঙ্গিত বিদ্যমান।

কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এ'ল কোথা হ'তে
সমুদ্রে হ'ল হারা
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড় চীন
এক দেহে হ'ল লীন।

নিবন্ধকার কবির এই ইঙ্গিতের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করেছে 'দি পিপ্‌ল এ্যাণ্ড কাল্‌চার অব বেঙ্গল—এ স্টাডি ইন ওরিজিন্‌স্ এ (প্রকাশিত কলকাতা, ২০০২) বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বঙ্গে মানুষের সংস্কৃতির নিদর্শনের উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রাচীন প্রস্তরযুগের সংস্কৃতির নিদর্শন স্বরূপ বাংলার নানা স্থানে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। যে সকল গ্রামে এইরূপ অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখনীয় মেদিনীপুর জেলার শিল্‌দা, ঝাড়গ্রামের পরিহাটি, চিলকিগড়, বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া, কাল্লা, বনআসুরিয়া, বাউরিডাঙ্গা, শিলাবতী নদীর অববাহিকায়, বর্ধমান জেলার গোপালপুর ও কুমিল্লার লালমাই পাহাড় প্রভৃতি অঞ্চলে।[৫] নব্যপ্রস্তরযুগের আয়ুধসমূহ বিশেষকরে পাওয়া গিয়েছে দামোদর নদীর উপত্যকায় অবস্থিত বীরভানপুরে, বর্ধমান ও মেদিনীপুর

জেলার নানাস্থানে।[৪] এইসকল আবিষ্কার থেকে একথা বলা যায় যে, ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকেই সম্ভবত প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগের নরগোষ্ঠী খাদ্যের সন্ধানে এসব অঞ্চলে বিচরণ করতো। পরবর্তীযুগে যখন ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হয় তখন তামার তৈরি বিভিন্ন হাতিয়ার ও জিনিসপত্র যেমন বালা, চাঙারি, পরশু ইত্যাদি প্রত্ননিদর্শন সমূহ পাওয়া গিয়েছে।

বাঙলার তাম্রাশ্ম সভ্যতার সব চেয়ে বড়ো নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে বর্ধমান জেলার অজয় নদীর তীরে অবস্থিত পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে। মহিষাদল, মঙ্গলকোট, অজয়, কুন্নুর ও কোপাই নদীর উপত্যকার অন্যত্র ও বীরভানপুরে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।[৫] বিশেষ করে ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালের উৎখননে বর্ধমান জেলার বীরভানপুরে তাম্রাশ্ম সভ্যতার স্থান আবিষ্কৃত হয়েছে।[৬] এ প্রসঙ্গে তাম্রনির্মিত প্রত্নসম্পদে সমৃদ্ধ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রামের নাম উল্লেখ করছি। এগুলি যথাক্রমে মেদিনীপুর জেলার বিনপুর থানার সিজুয়া, পরিহাটি, তামাজুড়ি, গড়বেতা থানার চাত্‌লা, সবং থানার পেরুয়া, তমলুক ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।[৭] এতদ্ব্যতীত তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি প্রত্নরত্নের উল্লেখ করছি। পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামের উত্তর পশ্চিমে বিনপুর থানার তামাজুড়ি গ্রাম থেকে ১৮৮৩ সালে প্রথম একখানি তাম্রকুঠার ফলক আবিষ্কৃত হয়।[৮] ১৯৬৫ সালে এগ্রা থানার চাত্‌লা গ্রাম থেকেও একই ধরণের তাম্রকুঠার আবিস্কৃত হয়েছে।[৯] ১৯৬৮ খিস্টাব্দে পুরুলিয়ার ফুলগড়া থানার হাড়া গ্রামেও ঐরূপ কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।[৯ক] ১৯৭৬ সালে এই জেলার গড়বেতা থেকে কিছু দূরে আগুইবানিতে পাওয়া গিয়েছে তামার কয়েকটি স্কন্দযুক্ত কুঠার ও আরো কিছু জিনিসপত্র যেমন বালা, চাঙ্‌রা ইত্যাদি।[১০] বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে মেদিনীপুর জেলার সবং থানা হতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে পেরুয়া গ্রাম থেকে একটি স্কন্দযুক্ত তামার কুঠার ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। কুঠারটির পরিমাপ ২৫.৫×২৫ সেন্টিমিটার এবং ওজন সাড়ে চার কিলোগ্রাম। এই কুঠারটি হয়তো বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি দুর্লভ নিদর্শন। এ ধরণের কুঠার কোন কিছু কাটা বা যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত।[১১] এই স্কন্দযুক্ত তাম্রকুঠারটি এখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষের বৃহত্তম তাম্রকুঠার। উল্লেখনীয় তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় ১৯৭৮ সালে জানুয়ারী মাসে বিনপুর থানার সিজুয়া গ্রাম (মেদিনীপুর শহরের সন্নিকটে) কংশাবতী নদীতটে মনুষ্য জীবাশ্মের চোয়ালের কিয়দংশ আবিষ্কৃতা হয়েছে। এই নিদর্শনটি প্রাচীন মানব বসতির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, উক্ত জীবাশ্মটি হলোসিন পর্বের অর্থাৎ আজ থেকে ১০,০০০ হাজার বৎসর আগের। অধিকন্তু পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এই অভিমতও পোষণ করেন যে এটি ভারতে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম মানুষের জীবাশ্ম (earliest fossil in India).[১২] কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ জীবাশ্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য পাওয়া যায় নি। সুতরাং সঠিকভাবে ও

দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করা যায় না যে ঐ জীবাশ্মই ভারতের ও সেই সঙ্গে বঙ্গের মানুষের অস্তিত্বের প্রাচীনতম নজির। পান্ডুরাজার ঢিবি থেকেও মানুষের নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে। নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এই নরকঙ্কালে দুই রকমের নরগোষ্ঠীর রক্তের মিশ্রণের উপাদান পরিস্ফুট।[১৩] ঐতিহাসিকযুগে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের কাছে চিরুটাতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক সুধীররঞ্জন দাশের তত্ত্বাবধানে রাজবাড়িডাঙার উৎখননে (১৯৬৩-৬৫) ভাঙ্গা ভাঙ্গা নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে। নৃতত্ত্ববিদ্ শশাঙ্ক শেখর সরকার কঙ্কালগুলি নৃতাত্ত্বিক পরীক্ষার পর মন্তব্য করেছেন যে, কঙ্কালগুলি মধ্যম করোটীযুক্ত নরগোষ্ঠীর অর্থাৎ brachycephalic.[১৪] ১৯৬৪-৬৫ সালে উৎখননে বীরভূমে হরাইপুরেও শিশুর সমাধির কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে।[১৫] এইভাবে উৎখনন ও নৃতাত্ত্বিক পরীক্ষায় বঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগে মনুষ্য বসতির নিদর্শন পাওয়া যায়। তদুপরি তারা কোন্ নরগোষ্ঠীভুক্ত তাও কিছুটা স্থিরিকৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সুপ্রাচীনকাল থেকে বঙ্গদেশ নামে ভূখন্ডের চতুর্দিক থেকে বহুবিধ নরগোষ্ঠী এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। এই বঙ্গদেশ উত্তর ভারতের জনগোষ্ঠী কর্তৃক অপবিত্র (un-holy) ও অশুদ্ধ দেশ বলে পরিগণিত হতো। কারণ এই ভূখন্ডের আদিম অধিবাসীদের ভাষা, জীবনযাত্রা প্রণালী ও সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠান উত্তর ভারতের জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও অন্যরকম। যে সমস্ত উপজাতি হিমালয়ের উত্তরাঞ্চল থেকে বঙ্গে প্রবেশ করেছিল তারা অধিকাংশই দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। এই উপজাতিরাই ভোটিয়া, গুরুং, লেপচা, নেওয়ার, দামাই, কামিজ, খাস অর্থাৎ স্থানিয়া ইত্যাদি। নৃতাত্ত্বিক বিচারে ঐ সকল উপজাতিরা তিব্বতীয় মঙ্গোলয়েড (Tibeto Mongoloid)। তিপ্রা, লুসাই, ম্রু, খিয়াং, খামি, চাক্‌মা, কুকি ইত্যাদি উপজাতিগণ ব্রহ্মদেশ, আরাকান, চিন পার্বত্য অঞ্চল থেকে বঙ্গে প্রবেশ করে চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও নোয়াখালিতে বসবাস করে। গারো, কাচারি, হাড়ি, দালুস, দোয়াইস, হাজাং, মেচ, রাভাস প্রভৃতি উপজাতিগোষ্ঠী ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসামে প্রবেশ করে বঙ্গের নানাস্থানে বসতি স্থাপন করে।[১৬] নৃতাত্ত্বিক বিচারে দেখা যায় উপরিউক্ত উপজাতিগোষ্ঠীসকল মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত।[১৭] আবার পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা থেকে সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, খাড়িয়া, খারওয়ার, বীরহোর, ভূমিজ, চুয়াড়, মালপাহাড়িয়া, বেদিয়া ইত্যাদি নামে উপজাতিবৃন্দ বঙ্গে প্রবেশ করে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করতে আরম্ভ করে।[১৮] এই গোষ্ঠীভুক্ত জনগণ অস্ট্রিকভাষাভাষী পরিবারভুক্ত কোল বা মুণ্ডাভাষী অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত বলে অভিহিত করা যেতে পারে।[১৯] ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার কিছু অঞ্চল সুপ্রাচীন অস্ট্রিকভাষাভাষী অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর আবাসস্থল ছিল বলে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থিরীকৃত করেছেন। উল্লেখনীয় বিষয় এই যে, ছোটনাগপুর অঞ্চলে অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর সঙ্গে দ্রাবিড়ভাষী মেডিটেরেনিয়ান নরগোষ্ঠীর

মিশ্রণ ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ ওঁরাঁওদেব কথা বলা যেতে পারে। এরা দ্রাবিড়ভাষী।[২০] আবার উত্তর বঙ্গে উত্তর দিক থেকে আগত মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীর সঙ্গে দ্রাবিড়ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণও পরিলক্ষিত হয়।

এ প্রসঙ্গে ছোটনাগপুর থেকে আগত ভূমিজ নামক উপজাতির কথা বলা যেতে পারে। তাদের ঘনবসতি কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিশেষ করে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ২৪ পরগণা, বিহারের ধলভূম, বরাভূম, পাত্‌কুম ইত্যাদি সংলগ্ন অঞ্চলে দেখা যায়।[২১] নৃতাত্ত্বিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা গিয়েছে ভূমিজরা অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত ও মুণ্ডা বা অস্ট্রিকভাষী।[২২] কিন্তু পরে বঙ্গের জনস্রোতে মিশ্রিত হয়ে তারা বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে। ফলে এদের দৈহিক গঠনে, ভাষায় ও আচার আচরণে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ভূমিজদের একটি শাখাই 'চুয়াড়' বা 'চোয়াড়' নামে পরিচিত। চুয়াড় শব্দের অর্থ দস্যু, চোর, লুণ্ঠনকারী ইত্যাদি। 'চোয়াড়' শব্দটি নিঃসন্দেহে আর্যেতর ও অস্ট্রিক শব্দ।[২৩] বাংলা চোর শব্দটি চুয়াড় শব্দ থেকে উদ্ভূত। শারীরিক গঠন ও প্রকৃতিতে তারা ভূমিজদের অনুরূপ। ভূমিজদের মতো এরাও অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত। ওঁরাঁও গোষ্ঠীর কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এরা শারীরিক বৈশিষ্ট্যে অস্ট্রালয়েড ও ভাষায় দ্রাবিড়ভাষী মেডিটেরেনিয়ান। আর একটি উপজাতি মাল বা মালপাহাড়িয়া। মাল মালে দ্রাবিড় ভাষার শব্দ।[২৪] এই মালেরা দ্রাবিড়ভাষা ও মেডিটেরেনিয়ান ও অস্ট্রালয়েডগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উদ্ভূত। মালেরা বঙ্গে নিম্নবর্গীয় জনগণের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল। ফলে তারা চণ্ডাল, বেদিয়া বা বেদে, কৈবর্ত, তুরি, মুচি প্রভৃতিতে পর্যবসিত হয়েছিল।[২৫]

উপরিউক্ত উপজাতিগোষ্ঠীর বঙ্গে অনুপ্রবেশ ও বসতি ছাড়াও সুপ্রাচীনকালে বঙ্গ দেশে আরো অনেক আদিম উপজাতিগোষ্ঠী বসবাস করতো। তন্মধ্যে এই প্রসঙ্গে নিষাদ, শবর ও পুলিন্দ নামক আদিম উপজাতিদের কথা বলা যেতে পারে। নিঃসন্দেহে এরা বঙ্গের আদিম অধিবাসী। লিখিত ও প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদানে এই সকল উপজাতির বসতি ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় পাওয়া যায়।[২৬] শুধু মাত্র দু/একটি দৃষ্টান্ত পরিবেশন করছি। শবর শবরীর শারীরিক গঠনের নিপুণ প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকে। শবরীরা কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে গুঞ্জ ফুলের মালা, মাথায় ময়ূরের পালক ও ঝিনুক দিয়ে কেশ বিন্যাস করে সুন্দর করে সাজতো।[২৭] চর্যাপদে বর্ণিত আছে "মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ শবরী গীবত গুঞ্জরী মালী (চর্যা ২৮), কানে পরতো কর্ণকুণ্ডল (কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী, চর্যা ২৮) ইত্যাদি।[২৮] বঙ্গে এই শবর গোষ্ঠীর বর্তমান বংশধরই আদিম জনগোষ্ঠী 'লোধা', 'লোধ' বা নোধ নামে পরিচিত। লোধাদের বহুল বসতি দেখা যায় অঙ্গুল, উড়িষ্যা, সিংভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর বিশেষ করে ঝাড়গ্রাম মহকুমায় ও বাঁকুড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে। মেদিনীপুরের লোধাদের সঙ্গে শবরগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মেদিনীপুরের চিড়িয়ামারগণ শবরগোষ্ঠীর একটি শাখা।[২৯] নিষাদ ও শবরগোষ্ঠীর মতো পুলিন্দ নামে

অরণ্যচারী বঙ্গের আদিম জনগোষ্ঠী। সেনরাজা বল্লালসেনের নৈহাটী তাম্রশাসনে তাদের জীবনচর্চ্চা কিরূপ ছিল জানা যায়।[৩০] উক্ত তাম্রশাসনে পুলিন্দদের সুস্বাস্থ্যের ও পুলিন্দ মহিলাদের অপূর্ব দৈহিক সৌন্দর্যের নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায়।[৩১] বঙ্গে পুলিন্দদের বংশধর সম্ভবত পালিয়া নামক জনগোষ্ঠী। যাই হোক্ নৃতাত্ত্বিক বিচারে নিষাদ, শবর ও পুলিন্দ জনগোষ্ঠী অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত অস্ট্রো এশিয়াটিক পরিবারভুক্ত অস্ট্রিকভাষাভাষী।[৩২] এরা বঙ্গজনগোষ্ঠী রূপায়ণে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিল। বাঙালীর শারীরিক বৈশিষ্ট্যে মূল উপাদান তাদেরই অবদান। বঙ্গে আর এক শ্রেণীর সুপ্রাচীন উপজাতি বা উপজাতিতুল্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুণ্ড্র, বঙ্গ, সুক্ষ্ম, রাঢ়া, গৌড় ইত্যাদি উল্লেখনীয়। বঙ্গ বা বঙ্গদেশে যারা সুপ্রাচীনকালে বাস করতো তারা বঙ্গজনগোষ্ঠী। লিখিত ও অগণিত লেখতে বঙ্গজনের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৩] বঙ্গজনগোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্বন্ধে মহাকাব্যে বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য, ভাগবত ইত্যাদি পুরাণে যে উপাখ্যান বর্ণিত রয়েছে তার থেকে জানা যায় অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, সুহ্ম এই পাঁচটি সন্তান রাজা বলির পত্নী সুদেষ্ণা ও অন্ধ বৃদ্ধ ঋষি দীর্ঘতমার।[৩৪] এই উপাখ্যান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় বঙ্গজনগোষ্ঠী আর্য ও আর্যেতর সংমিশ্রণে অর্থাৎ দৈহিক মিলনের ফলশ্রুতি। লিখিত ও প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদান থেকে বঙ্গজনগোষ্ঠীর শারীরিক গঠন ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা সম্বন্ধে খুব অল্পই জানা যায়। মঞ্জুশ্রীমূলকাল্প থেকে জানা যায় তারা অসুর ভাষায় কথা বলতো।[৩৫] এর থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে বঙ্গজনগণ আর্যেতর ভাষায় কথা বলতো।

ঠিক বঙ্গজনগোষ্ঠীর মতো প্রাচীন বঙ্গে পুণ্ড্র, সুক্ষ্ম, রাঢ়া, গৌড় ইত্যাদি উপজাতিগোষ্ঠী বসবাস করতো 'পুণ্ড্র' নাম বাংলা আখ ও সংস্কৃত ইক্ষু থেকে এসেছে। এই পুণ্ড্র উপজাতিগোষ্ঠীর নামে সম্ভবত তাদের নগরের নাম পুণ্ড্রনগর হয়েছিল। পুণ্ড্রদের অধুনা বংশধর মালদহ, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমের পুণ্ডারি, পুন্‌রো পদবিযুক্ত লোকজন।[৩৬] বীরভূমের পুন্‌রো জনগণই সম্ভবত ২৪ পরগণা জেলার পোদ্ জাতি অর্থাৎ কাস্ট (caste) বা বর্ণ।[৩৭] বঙ্গ ও পুণ্ড্রজনগোষ্ঠীর ন্যায় সুক্ষ্মগোষ্ঠীও প্রাচীন বঙ্গদেশের একটি সুপরিচিত উপজাতি। এই সুক্ষ্মজনগোষ্ঠী প্রাচীনকালে যে অঞ্চল জুড়ে বসবাস করতো বর্তমানে তা বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, নদিয়া, মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ ও ২৪ পরগণা জুড়ে সমুদ্র পর্যন্ত অঞ্চল।[৩৮] সুক্ষ্মদেশই রাঢ়দেশ। জ্যাকোবি বজ্জভূমি ও সুক্ষ্মভূমিকে সংযুক্ত করে সুক্ষ্মদের রাঢ়ী বা রাঢ়াবাসী বলে অভিহিত করেছেন। সুক্ষ্মঃ রাঢ়াঃ অর্থাৎ সুক্ষই রাঢ়দেশ। সুক্ষ্মগোষ্ঠীকেই রাঢ়গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মকরণ করা হয়েছে।[৩৯] আচারঙ্গসূত্র থেকে জানা যায় রাঢ়বাসীরা সব রকম নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করতো।[৪০] এর থেকে মনে হয় তারা অরণ্যজাত খাদ্যদ্রব্য আহরণ করে ও জীবজন্তু শিকার করে তাদের মাংস ভক্ষণ করতো। তারা যে আর্যভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। আচারঙ্গসূত্র থেকে আরো জানা যায় রাঢ়বাসীরা জৈন সাধুদের প্রতি কুকুর লেলিয়ে দেওয়ার সময় যে শব্দগুলি উচ্চারণ করতো সেগুলি হচ্ছে 'চু', 'চু', 'খু', 'খু'। আজও

বাঙালীরা কুকুরকে ডাকবার সময় যে শব্দ ব্যবহার করে তাহলো 'চু', 'চু' অথবা 'তু', 'তু'। তাৎপর্যের বিষয় এই যে, দক্ষিণ এশিয় সেমাং, মন্‌খমের, সকাই ভাষাভাষীরা কুকুরকে 'ছিকে', 'ছুকে', 'ছো', 'অচ্ছো', 'ছু', 'চৌ', 'চুয়ো' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে থাকে। কাজেই মনে হয় বাংলা শব্দ 'ছু', 'ছু', বা 'চু', 'চু' ও 'তু', 'তু' মূলত অস্ট্রিকভাষার অন্তর্ভুক্ত।[৪১] এখানে উল্লেখ্য বীরভূম বা বরাভূমির 'বীর' শব্দটি হচ্ছে মুণ্ডা বা অস্ট্রিক ভাষার।[৪২] এসব থেকে অনুমিত হয় রাঢ়ারা বা সুহ্মরা অস্ট্রিক বা মুণ্ডা ভাষায় কথা বলতো। এইভাবে নৃতাত্ত্বিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় ও বিশ্লেষণে ও পরোক্ষ নানাবিধ তথ্যের ভিত্তিতে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, রাঢ়া জনগোষ্ঠী অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত ও অস্ট্রিক বা মুণ্ডা ভাষা ভাষী।[৪৩]

বঙ্গের বহুবিধ উপজাতিগোষ্ঠীর মধ্যে আর একটি উল্লেখনীয় উপজাতি গৌড়। গৌড় দেশ বা রাজ্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। গৌড়দেশে গৌড়জন বাস করে। ক্রমে গৌড় সমগ্র বঙ্গদেশকে বোঝাতো। উপজাতি অর্থে গৌড় একটি মিশ্রিত জনগোষ্ঠী যারা মালব, খস, কুলিক, হুণ ইত্যাদি উপজাতিদের সংগে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ থেকে সৈনিক রূপে উত্তর-ভারতের মধ্য দিয়ে বঙ্গে প্রবেশ করেছিল। বঙ্গের পালরাজা ধর্মপালের নালন্দা তাম্রশাসন থেকে গৌড় সমেত অন্যান্য উপজাতিদের বঙ্গে আগমণের তথ্য পাওয়া যায়।[৪৪] যদি ধরে নেওয়া যায় উত্তর-পশ্চিম ভারতের ঐ সকল উপজাতি মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত ছিল, তাহলে ঐ সকল উপজাতি উত্তর-ভারতে ইন্দো-আর্যভাষী অ্যালপিনয়েড নরগোষ্ঠীর সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়।[৪৫] পরে ঐ মিশ্রিত উপজাতি বঙ্গে প্রবেশ করে অস্ট্রালয়েড ও মেডিটেরেনিয়ান নরগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলেমিশে যায়। পৃথকভাবে তাদের ও তাদের বংশধরদেরও চিহ্নিত করা যায় না। সংস্কৃত, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ইন্দো-চীন ভাষাভাষী জনগণের মিশ্রিত ফলশ্রুতিই গৌড়জন। মিশ্রণের ফলে ক্রমে গৌড়জন নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলেছিল ও ক্রমান্বয়ে এক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। এই জনগোষ্ঠী বঙ্গে রাজ্য ও রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে। তাদের রাজধানীর নাম গৌড়পুর বা গৌড়। পরবর্তীকালে বঙ্গদেশ গৌড়দেশ নামে পরিচিতি লাভ করে। বঙ্গের রাজা মহারাজা, গৌড়েশ্বর, গৌড়াধিপতি বিশেষণে ভূষিত হতেন। যেমন মহারাজাধিরাজ গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক ইত্যাদি। এই সকল উপজাতিগোষ্ঠী ছাড়াও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এমন কি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এমন কি ভারতবর্ষের বাইরে থেকে অসংখ্য উপজাতিগোষ্ঠী বঙ্গে প্রবেশ করেছিল। তন্মধ্যে কতিপয় উপজাতিগোষ্ঠীর নামোল্লেখ করছি। ভারত বহির্ভূত উপজাতিসমূহ পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে বঙ্গে প্রবেশ করেছিল। উত্তর-পূর্ব দিক থেকে যেসকল উপজাতি বঙ্গে প্রবেশ করেছিল তন্মধ্যে কিরাত, কম্বোজ, কোচ, মেচ, রাজবংশী উল্লেখনীয়। নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে কিরাত ও কম্বোজ উপজাতি মাঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত।[৪৬] কোচ, মেচ, রাজবংশীও মূলত মঙ্গোলয়েড কিন্তু বঙ্গের অন্য উপজাতিদের সংগে

এমনভাবে মিলে মিশে গিয়েছে যে তাদের মধ্যে অস্ট্রালয়েড, মঙ্গোলয়েড ও দ্রাবিড়ভাষী মেডিটেরেনিয়ানগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হয়েছিল। এরা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কাছে অস্পৃশ্য হলেও প্রতিলোম ও অনুলোম বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য বর্ণ কাঠামোর নিম্নস্তরে স্থান পেয়েছিল। আবার উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে যারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বঙ্গে এসেছিল তাদের মধ্যে যবন, ম্লেচ্ছ, খস, শক, মুরুণ্ড, হুণ, চীন, আভীর, তুরস্ক ইত্যাদির নাম তালিকাভুক্ত হতে পারে। ঐ সকল উপজাতিগোষ্ঠীর নাম লিখিত ও প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদানে পাওয়া যায়।[৪৭] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে পাল-সেন রাজাদের বহুবিধ লেখতে যবন, ম্লেচ্ছ, খস ইত্যাদি উপজাতিগোষ্ঠীর নাম পাওয়া যায়। যথা ধর্মপালের খালিমপুর, কেন্দুপত্ন প্লেট, বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া, পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন, কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসন ও তবকৎ-ই-নাসিরিতে যবনদের উল্লেখ আছে।[৪৮] বঙ্ক দেশের অধিবাসী যবনদের শারীরিক গঠন লম্বা চোখালো নাক, লম্বা করোটীযুক্ত মস্তক, বেশ দৃঢ় পোক্ত চেহারা। নৃতাত্ত্বিক বিচারে তাদের মেডিটেরেনিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত বলে চিহ্নিত করা হয়।[৪৯] ম্লেচ্ছ বাঙলায় মুসলমান ও অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যদিও তারা ব্রাহ্মণ্য পরিকাঠামোর নিম্নস্তরে স্থান করে নিয়েছিল। ম্লেচ্ছ ও যবনদের মতো খসগোষ্ঠীও বঙ্গে প্রবেশ করে বসবাস করেছিল। তার নজির মেলে পাল-সেন যুগের লেখতে যথা ধর্মপালের নালন্দা, দেবপালের মুঙ্গের, নারায়ণ পালের ভাগলপুর, ১ম মহীপালের বানগড় ও মদনপালের মনহলি তাম্রশাসনে।[৫০] ধর্মপালের নালন্দা তাম্রশাসনে খসগোষ্ঠী, হুণ, কুলিক প্রভৃতি সৈনিকদের সংগে উল্লিখিত। সাহস, চাতুর্য ও নৈপুণ্যের জন্য পালরাজারা সেনাবাহিনীতে খসদের নিয়োগ করেছিল। এদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য মঙ্গোলয়েড বলে অনুমিত হয়। আবার এদের মধ্যে মেডিটেরেনিয়ান গোষ্ঠীর রক্তের সংমিশ্রণও লক্ষণীয়।[৫১] শক পহ্লবরা হ্যাডনের মতে ইন্দো-আফগান গোষ্ঠীভুক্ত। ইন্দো-আফগানেরা লম্বা করোটি যুক্ত, উন্নত নাসিকা সমন্বিত, লম্বা থেকে মাঝারি ধরণের উচ্চতাযুক্ত মানুষ। শকরা কিন্তু প্রশস্ত মুখমণ্ডল সমন্বিত, চোয়ালের হাড় উন্নত, স্পষ্ট, ছোট-মধ্যম করোটীযুক্ত নরগোষ্ঠী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এরা মূলত মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত।[৫২] বঙ্গে হুণদের সনাক্ত করার মতো কোন বংশধর বা গোষ্ঠী পাওয়া যায় না। হুণরা সৈনিকরূপেই বঙ্গে প্রবেশ করেছিল। দেবপালের মুঙ্গের, নারায়ণ পালের ভাগলপুর; মহীপালের বানগড় তাম্রশাসন ও বাদাল স্তম্ভ লেখ ইত্যাদিতে হুণ সৈনিকদের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫৩] নৃতাত্ত্বিক বিচারে তারা মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত বলে চিহ্নিত হয়।[৫৪] তক্ষশীলার ধর্মরাজিকা স্তূপ থেকে আবিষ্কৃত কঙ্কাল এই অনুমানকে দৃঢ়ীকরণ করেছে।[৫৫] চীন আর একটি উপজাতিগোষ্ঠী বঙ্গ, সুহ্ম, কলিঙ্গ, শক, যবন, মগধ, কম্বোজ প্রভৃতি উপজাতিদের সঙ্গে চীন উপজাতি সংশ্লিষ্ট ও উল্লিখিত।[৫৬] এদের মধ্যে মঙ্গোলয়েড উপাদান বেশি থাকলেও একথা নিশ্চিত যে তারা কোন একটি নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বহুবিধ নরগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আভীর ও

তুরস্কগোষ্ঠী হ্যাডনের নৃতাত্ত্বিক বিচারে মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত। এরা বঙ্গে দ্বাদশ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এসেছিল। পরে ধীরে ধীরে এই সকল উপজাতিগোষ্ঠী বঙ্গের জনগণের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়েছিল। এইভাবে ভারত বহির্ভূত অঞ্চল থেকে দলে দলে বিভিন্ন উপজাতিগোষ্ঠী ভারতবর্ষে ও ক্রমে বঙ্গে প্রবেশ করেছিল।

ওদ্রূপ ভারতবর্ষের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও বহুবিধ উপজাতিগোষ্ঠী বঙ্গে প্রবেশ করেছিল। তন্মধ্যে কর্ণাটক, কুলিক, মালব/মল্ল, অম্বষ্ঠ, বৈদ্য, চোল, লাট, আন্ধ্র, কলিঙ্গ, উৎকল, ওড্র, মাগধ, কীকট, প্রাগজ্যোতিষ, কামরূপ ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। নৃতাত্ত্বিক বিচারে এরা অধিকাংশই মেডিটেরেনিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকরা ধর্মপাল, দেবপালের আমলে অর্থাৎ অষ্টম-নবম শতাব্দীতে সৈনিক হয়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে বঙ্গে প্রবেশ করেছিল।[৫৭] রাষ্ট্রকূট তুঙ্গের বোধগয়া লেখতে, রাজেন্দ্রচোলের তিরুমটল লেখতে বঙ্গে কর্ণাটদের বসতি স্থাপনের বিবৃতি জানা যায়। মহীপাল, মদনপাল রাজকীয় সেনাবাহিনীতে কর্ণাটদের নিযুক্ত করেছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে সেন আমলে কর্ণাটকরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচড়িত (111, 24) থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। লম্বা ও মধ্যম করোটীযুক্ত কর্ণাটগোষ্ঠী সম্ভবত মেডিটেরেনিয়ান নরগোষ্ঠীভুক্ত ছিল। বাঙালীদের মধ্যে লম্বা, মধ্যম করোটী ও চ্যাপ্টা নাসিকা কর্ণাটকদেরই অবদান।[৫৮] হুণ, মালব, খস ইত্যাদি উপজাতিদের সংগে কুলিকগোষ্ঠীব উল্লেখ দেবপালের মুঙ্গের, নারায়ণ পালের ভাগলপুর, মহীপালের বানগড়, মদনপালের মনহলি তাম্রশাসনে পাওয়া যায়।[৫৯] আবার ধর্মপালের নালন্দা, দেবপালের মুঙ্গের, নারায়ণ পালের ভাগলপুর, মহীপালের বানগড় ইত্যাদি তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ লেখ থেকে মালব, খস, গৌড়, কর্ণাট প্রভৃতি উপজাতিদের কথা অবগত হওয়া যায়।[৬০] মালব/মল্ল, দ্রাবিড় শব্দ থেকে উদ্ভূত।[৬১] মালবদের সঙ্গে অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে ধর্মপালের নালন্দা, দেবপালের মুঙ্গের, নারায়ণ পালের ভাগলপুর, মদনপালের মনহলি, মহীপালের বানগড় তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ তথ্য থেকে।[৬২] মালবদের শারীরিক গঠন অনুযায়ী তাদেরকে অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত ও অস্ট্রিকভাষী বলে অভিহিত করা হয়।[৬৩] আবার ওপার্টের মতে তারা মঙ্গোলয়েড।[৬৪] অতএব দেখা যাচ্ছে মালব, মল্লরা অস্ট্রালয়েড কিন্তু শারীরিক বৈশিষ্ট্যে মেডিটেরেনিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত বাঙলায় মল্লরা বা মালোরা জেলে বা মৎস্যজীবী বর্ণে (caste) পরিণত হয়েছে। বঙ্গে পাল ও সেন যুগে দক্ষিণ ভারত থেকে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যরা এসেছিল। অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যরা একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। বঙ্গে র বৈদ্যগোষ্ঠী অত্যন্ত বুদ্ধিমান, উচ্চ শিক্ষিত, চিকিৎসাশাস্ত্রকে জীবিকা রূপে গ্রহণ করেছিল। ব্রাহ্মণ্য পরিকাঠামোতে বৈদ্যগোষ্ঠীর সম্মানজনক স্থান ছিল। যাই হোক নৃতাত্ত্বিক বিচারে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যদের মধ্যে বহুবিধ নরগোষ্ঠীর রক্তের মিশ্রণ দেখা যায়।[৬৫] এরা প্রধানত দ্রাবিড়ভাষী ও অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত। চোলরাও সৈনিকরূপে বঙ্গে প্রবেশ করেছিল। সাক্ষ্য মেলে রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলৈ লেখ থেকে।[৬৬] তারা দ্রাবিড়ভাষী, মেডিটেরেনিয়ান

নরগোষ্ঠীভুক্ত।[৬৭] এই দ্রাবিড়ভাষী চোল উপজাতিগোষ্ঠীই সুদূর দক্ষিণ ভারতে উন্নত শাসন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্থাপন করেছিল। সামুদ্রিক সাম্রাজ্য স্থাপনে, নৌবাণিজ্যে, শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্যকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিওতে তাদের সংস্কৃতি ও শিল্প চেতনাকে প্রতিভাত করতে অগ্রণী হয়েছিল। দক্ষিণ ভারত ও বঙ্গের সম্পর্ক ও যোগসূত্র বহুদিনের। বঙ্গে ব্রাহ্মণ্য পরিকাঠামোতে চোলরা মিলে মিশে গিয়েছিল যদিও স্থান পেয়েছিল নিম্নস্তরে। পশ্চিমদিক থেকে আগত লাটগোষ্ঠী ধর্মপালের, নারায়ণ পালের ভাগলপুর, রাজ্যপালের ভাতুরিয়া, মদন পালের মনহলি, এস মহীপালের বানগড় লেখতে উৎকীর্ণ আছে।[৬৮]। লাটদের মধ্যে অ্যালপাইন, মঙ্গোলয়েড, দ্রাবিড়ভাষী-মেডিটেরেনিয়ান গোষ্ঠীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।[৬৯]। দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে আন্ধ্র উপজাতি বঙ্গে প্রবেশ করেছিল। তাদের উল্লেখ দেবপালের মুঙ্গের, নারায়ণ পালের ভাগলপুর, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম প্লেট, ১ম শূর পালের তাম্রশাসন ইত্যাদিতে দেখা যায়।[৭০] আন্ধ্রেরা মেদ, চণ্ডালের সঙ্গে একসাথে উল্লিখিত হয়েছে। হ্যাডন, থার্সটন, সরকার, আইকস্টেড, বি.এস.গুহ, হাটন প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের বহুবিধ নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ফলশ্রুতিতে অনুমিত হয় আন্ধ্রেরা অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত, দ্রাবিড়ভাষী মেডিটেরেনিয়ান এবং বঙ্গে প্রবেশের পূর্বে অ্যালপাইন উপাদান সমন্বিতগোষ্ঠী।[৭১]

এতদ্ব্যতীত বঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে কলিঙ্গ, উৎকল ও ওড্র উপজাতি বঙ্গে প্রবেশ করে। কলিঙ্গরা অঙ্গ, বঙ্গ, মাগধদের সঙ্গে একসঙ্গে উৎকীর্ণ হয়েছে দেখা যায়।[৭২] অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুক্ষ্ম, পুণ্ড্র উপজাতিদের পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে যে উপাখ্যান আছে তার থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে মূলত তাদের উৎস একই।[৭৩] নৃতাত্ত্বিক বিচারে কলিঙ্গরা সম্ভবত দ্রাবিড়ভাষী অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত।[৭৪] কলিঙ্গদের মতো উৎকল ও ওড্র উপজাতি যারা দ্রাবিড় ও অস্ট্রো-এশিয়াটিক অর্থাৎ অস্ট্রিকভাষীর সংমিশ্রণে উদ্ভূত ও স্বভাবতই অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত জন।[৭৫] বর্তমান বিহার থেকে মগধ, কীকট প্রমুখ প্রাচীন উপজাতি যারা বঙ্গে প্রবেশ করেছিল তারা সম্ভবত অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত। কারণ নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে তাদের গায়ের রং ঘন চকোলেট, ঢেউ খেলানো থেকে কোঁকড়ানো চুল, লম্বা করোটীযুক্ত, মধ্যম নাসিকা সমন্বিত সাধারণ চেহারার মানুষ। অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঐরকমই ছিল।[৭৬] অঙ্গগোষ্ঠীও অস্ট্রিকভাষী অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত ছিল।[৭৭] আরো লক্ষণীয় বিষয় এই যে অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুক্ষ্ম, মাগধ, কলিঙ্গ উপজাতিগোষ্ঠী লিখিত উপাদানে ও লেখতে একসঙ্গে উল্লিখিত। বঙ্গের উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আগত প্রাগজ্যোতিষ, কামরূপ প্রভৃতি উপজাতিগোষ্ঠীর মধ্যে অস্ট্রিকভাষী অস্ট্রালয়েড ও মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীর উপাদান লক্ষণীয়।[৭৮] বর্তমানে প্রাগজ্যোতিষদের বংশধর বোদো, খাসি, কুকি, নাগা, কাফি, খামতি, কামজং প্রভৃতি জনগোষ্ঠী।[৭৯] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে আর এক উপজাতি যারা মেদিনীপুর ও পশ্চিম বাংলার অন্য জেলাতেও বসবাস করতে দেখা যায়। সেই উপজাতির নাম মহার।[৮০]

বিজ্‌লী এদের দ্রাবিড়ভাষী পালকিবাহী কুলি ও কৃষক রূপে চিহ্নিত করেছেন। মহেলী নামক আর এক উপজাতি সাঁওতালদের একটি শাখা।[৮১] তাদের আবাসস্থল বঙ্গে পশ্চিম মল্লভূমি বা মল্লভূম নামে সুপরিচিত। এই প্রসঙ্গে বঙ্গদেশের আর একটি উপজাতির নাম করা দরকার। এই গোষ্ঠীর নাম 'ভৌম'। এরা বর্তমানের 'ভূম' উপজাতি যারা মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস করে। নৃতাত্ত্বিক বিচারে দেখা যায় ঐ সকল উপজাতিগোষ্ঠীর বেশির ভাগই অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীভুক্ত ও অস্ট্রিক বা মুণ্ডাভাষী। কিছু কিছু উপজাতি দ্রাবিড়ভাষী মেডিটেরেনিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত। আবার বেশ কিছু উপজাতির মধ্যে অস্ট্রালয়েড ও মেডিটেরেনিয়ানগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ দেখা যায়। কখনোও বা মঙ্গোলয়েড ও মেডিটেরেনিয়ান গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। এছাড়া অস্ট্রালয়েড ও মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীর মিশ্রণও লক্ষ্য করা যায়। যেমন প্রাগ্‌জ্যোতিষীদের কথা বলা যেতে পারে। বাঙলার সমাজের নিম্নস্তরে কর্মে লিপ্ত চণ্ডাল, ডোম, নমশূদ্র, মেদ গোষ্ঠী অন্ত্যজ অস্পৃশ্য বলে ব্রাহ্মণদের কাছে পরিচিত। এই সকল নরগোষ্ঠী বঙ্গে একসঙ্গে পাশাপাশি বসবাসের ফলে দৈহিক মিলনে আবদ্ধ হয়। ফলে তাদের শারীরিক গঠনে পরিবর্তন দেখা দেয়। ক্রমে অনেকেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সত্তা হারিয়ে ফেলে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে বঙ্গদেশ আর্যেতর বহু নরগোষ্ঠীর আবাসস্থল ছিল। তাছাড়া অগণিত উপজাতিগোষ্ঠী বঙ্গদেশ বলে চিহ্নিত ভূখণ্ডের চতুর্দিক থেকে এই স্থানে প্রবেশ করেছিল। এই সকল বহু-উপজাতি ভারতের অন্তর্ভুক্ত ও বহির্ভূত অঞ্চল থেকে এসেছিল। বৈদিক যুগ থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষীরা পূর্বভারতে অঙ্গ, মগধ অতিক্রম করে বঙ্গে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছিল। তাঁদের কাছে পূর্বভারত অর্থাৎ অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ অপবিত্র, অশিষ্ট, সংস্কৃতিবিহীন দেশ বলে পরিগণিত হত। ঐ দেশে আর্যভাষীজনগোষ্ঠী প্রবেশ করলে তাঁদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। বঙ্গে অনেক তীর্থস্থান ছিল। যথা গঙ্গাসাগর, করোতোয়া সংগম ইত্যাদি। পুণ্যার্জনে আর্যভাষীজনগোষ্ঠী বঙ্গে তীর্থদর্শনে আসার অনুমতি পেত। এইভাবে বঙ্গদেশ আর অশুদ্ধ দেশ থাকলো না। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রচারে সাধুসন্তরা বঙ্গদেশের পশ্চিমে রাঢ় দেশে জঙ্গলমহলে প্রবেশ করেছিল। অনেক বাধা, অনেক তাচ্ছিল্যের পর তাঁরা সাফল্যমণ্ডিত হন। তাঁদের অনুসরণ করে সংস্কৃতভাষী নরগোষ্ঠী ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রচারে অগ্রসর হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে রাজানুকূল্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রচার জয়যুক্ত হয়েছিল। সেন আমলের অসংখ্য লেখতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। একই দেশে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে সংস্কৃতভাষী ও আর্যেতর উপজাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দৈহিক মিলনে রক্তের মিশ্রণ ঘটে। ক্রমশ প্রতিলোম ও অনুলোম বিবাহের ফলে সমাজে বহুবিধ বর্ণ বা জাতির উদ্ভব হয়।

নৃতাত্ত্বিক পটভূমিকায় বাঙালীকে দেখে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে বাঙালীর শারীরিক বৈশিষ্ট্যে ও রক্তের উপাদানে অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর অবদান সব চেয়ে বেশি। পরে

মেডিটেরেনিয়ান, মঙ্গোলয়েড ও ইন্দো-আর্যভাষী অ্যালপিনয়েড, নর্ডিক নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে বাঙালী জাতির উদ্ভব ঘটলো। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারততীর্থ কবিতার মর্মবাণী প্রতিভাত হলো—

বণধারা বাহি জয়গান গাহি
উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা
এসেছিল সবে
কেহ নহে নহে দূর
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তার বিচিত্র সুর।

প্রকৃতই বাঙালীর শোণিতে বহুবিধ নরগোষ্ঠী ও উপজাতিগোষ্ঠীর রক্তকণিকা প্রবাহিত। বাঙালী সকলকে গ্রহণ করেছে, বর্জন করে নি। সমন্বিত বঙ্গজনের উদ্ভবের সঙ্গে বঙ্গ নামক ভূখন্ডের বিভিন্ন জনপদ একত্রিত হয়ে পালযুগে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের অধিবাসীদের ভাষাতেও ঐক্য ও সমন্বয় সাধিত হল। ইন্দো-আর্যভাষী ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় সংস্কৃত ভাষা বহন করে আনলো। পালি, অর্দ্ধ-মাগধী, প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষার ক্রম পরিবর্তন ও মিশ্রণে বাংলা ভাষার প্রাথমিক পর্যায়ের রূপ পরিস্ফুট হলো পাল যুগে। তার প্রমাণ মেলে চর্যাপদের ভাষায়। ভাষা প্রসঙ্গে লেভি, প্রিজুলস্কি, ব্লক, সুনীতি চ্যাটার্জী, প্রবোধ চন্দ্র বাগচী প্রমুখ ভাষাবিদ্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বাংলা ভাষায় বহু অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, তিব্বতীয় চৈনিক ও সংস্কৃত শব্দ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এইভাবে বহুবিধ ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর বহুল সংস্কৃতির সংমিশ্রণে সমন্বিত বঙ্গসংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে। পৃথক সংস্কৃতির সত্তা রইলো না।

এই নিবন্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় বঙ্গসংস্কৃতির দিগ্‌দর্শনে স্রষ্টার প্রতিফলন। বঙ্গভাষায় ও সংস্কৃতিতে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর অবদান প্রসঙ্গে প্রবোধচন্দ্র বাগচী, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, লেভি, কল্ডওয়েল, কিট্‌ল, বারো, কৃষ্ণপদ গোস্বামী, নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ পন্ডিতগণ মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। নিবন্ধকারের দি পিপ্‌ল এ্যান্ড কালচার অব বেঙ্গল এ স্টাডি ইন ওরিজিনস্, ভল্যুম টু, পার্ট টু তে বিশ্লেষণী ব্যাখ্যা রয়েছে। নিবন্ধটি দীর্ঘ না করার কারণে পরিশেষে শুধু এটুকুই বলছি বঙ্গসংস্কৃতির দিগ্‌দর্শনে স্রষ্টার প্রতিফলনে সর্বাগ্রে অস্ট্রিক/কোল/মুণ্ডাভাষীদের অবদান লক্ষণীয়। পরবর্তী পর্যায়ে দ্রাবিড় ভাষাভাষী, ও ইন্দো চীন, ইন্দো তিব্বতীয় ভাষাভাষীদের সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে। এর পর বাঙালীর সংস্কৃতিতে এলো আর্যভাষী জনগণের সংস্কৃতির প্রলেপ। বাঙলায় আর্যভাষীদের আগমণে আর্যেতর অধিবাসীরা শুধু যে বাধা সৃষ্টি করেছিল তাই নয় তাদের কোন কিছুই গ্রহণ করতে রাজি ছিল না। শেষ পর্যন্ত আর্যেতর বহুবিধ সংস্কৃতির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মিলন মিশ্রণে সমন্বয় সাধিত হলো। সামাজিক, ধর্মীয় ও ভাষায় সর্বক্ষেত্রে আর্যেতর —

বঙ্গসংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রলেপ দেওয়া হল। পূজা পদ্ধতিতে, সামাজিক অনুষ্ঠানে, বিবাহ উৎসবে হোম ছাড়া আর সব কিছুই আর্যেতর সংস্কৃতি। বহুবিধ সংমিশ্রণে অপূর্ব সমন্বিত বঙ্গসংস্কৃতি রূপায়িত হল। ঐক্য, বাক্য, মাণিক্যে পরিণত হল বঙ্গসংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির মিলিত স্রোত মধ্যযুগেও প্রবহমান। মধ্যযুগে ইসলাম সংস্কৃতির ধারা মিলিত হল শিক্ষা ব্যবস্থায়, ধর্মে ভাষায় ও চিন্তাধারায় সর্বত্রই সমন্বয় সাধিত হল সত্যপীর/সত্যনারায়ণ হিন্দু মুসলমান সকলের দেবতারূপে বাঙালী হৃদয়ে স্থান করে নিল। সর্বশেষে এলো পাশ্চাত্যের ঢেউ লাগলো বঙ্গসংস্কৃতিতে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও মিলনের সুর ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত। বিবাদ ও সংঘর্ষে সংস্কৃতি বিকৃত হয় নাই। নীহাররঞ্জন রায়ের উপলব্ধিই উদ্ধৃত করলাম 'ইতিহাসের আবর্তচক্রে বারবার নূতন নূতন জন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বিচিত্ররূপে তাহাদের বিরোধ-মিলন ঘটিয়াছে, আজও ঘটিতেছে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। চলমান প্রবাহ, বিরুদ্ধ প্রবাহ, সমন্বিত প্রবাহ ইহাই জীবনের গতিধর্ম।''[৮২] এই ধর্মই জীবনীশক্তি, প্রাণশক্তি। এই সমন্বিত সংস্কৃতির রূপই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারততীর্থ কবিতার ছত্রে ছত্রে —

'এসো হে আর্য এসো অনার্য
হিন্দু মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ
এসো এসো খ্রিস্টান'

এইভাবে দেখা যাচ্ছে ইতিহাসের সুপ্রাচীনকাল থেকে বঙ্গজন সমন্বিত সংস্কৃতির স্রষ্টা। গ্রহণ করেছে, নিজের করে নিয়েছে। পশ্চিম আজি যে উপহার এনেছে বাঙালী তাও গ্রহণ করেছে, কেউ শূন্য হাতে ফিরে যায় নি। বঙ্গসংস্কৃতির বহুবিধ স্রোতধারার মূল স্রোতে, প্রধান স্নায়ুতন্ত্রে যে সুর ঝঙ্কৃত হচ্ছে তাও বিশ্বকবিরই মর্মবাণী —

'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে।'

সূত্রনির্দেশ

১। মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ, বঙ্গ, বাঙ্গালা ও ভারত, পৃঃ ৩ (কলকাতা, ২০০০); চট্টোপাধ্যায় অন্নপূর্ণা, দি পিপল এ্যান্ড কালচার অব বেঙ্গল ঃ এ ষ্টাডি ইন ওরিজিন্‌স্, ভল্যুম ওয়ান, পার্ট টু, পৃঃ ৩৭৬-৩৭৮ (কলকাতা, ২০০২)

২। হ্যাডন, এ.সি., দি রেসেস্ অব্ ম্যান, পৃঃ ২০, ২১, ৩১, ১০৭, ১০৮, ১১২-১১৯ (কেম্ব্রিজ, ১৯২৯); সরকার, শশাঙ্ক শেখর, দি অ্যাবরিজিন্যাল রেসেস অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৯১, ৯৬ (কলিকাতা, ১৯৫৪); রায়, নীহার রঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪০-৪৮ (কলিকাতা, ১৯৮০)।

৩। চক্রবর্তী, দিলীপ কুমার ঃ আরকিওলজি অব ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া, পৃঃ ১১৮-১৮৪ (মুন্সিরাম মনোহরলাল, ১৯৯৩, দিল্লী); এ্যানসিয়ান্ট বাংলাদেশ — এ ষ্টাডি অব আরকিওলজিক্যাল

সোরসেস্, পৃঃ ৩১-৪২, ১৭৭-১৭৮ (অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, ১৯৯২) বিশদ আলোচনা ও তথ্যের জন্য।

৪। তদেব, পৃঃ ১৬১-১৬৪; ১৬৭-১৭৩ ইত্যাদি।

৫। ঘোষ; অশোক কুমার ও চক্রবর্তী, দিলীপ কুমার ঃ প্রি হিস্টোরিক মেটাল ষ্টেজ ইন ওয়েস্টবেঙ্গল, পৃঃ ১১৩, ১২০-১২২ (বুলেটিন অব দি কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ভল্যুম ৭, নং ১ ও ২, ১৯৬৮) বিশদ আলোচনার জন্য।

৬। ইন্ডিয়ান আরকিওলজি — এ রিভিউ, ১৯৬১-৬২; ১৯৬২-৬৩-৬৪, ১৯৬৪-৬৫, ১৯৬৬; এ্যানসিয়ান্টইন্ডিয়া, নং ৭, ১৯৫১; লাল, বি.বি.ঃ বীরভানপুর - এ মাইক্রোলিথিক সাইট ইন দি দামোদর ভ্যালি, এ্যানসিয়ান্ট ইন্ডিয়া, নং ১৪, ১৯৫৮।

৭। চক্রবর্তী, দিলীপ কুমার ঃ আরকিওলজি অব ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া, পৃঃ ১৬৭-৬৮-৬৯; ইন্ডিয়ান আরকিওলজি — এ রিভিউ, ১৯৬২-৬৩; ঘোষ, অশোক কুমার ও চক্রবর্তী, দিলীপ কুমার, প্রি-হিস্টোরিক মেটাল ষ্টেজ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল পৃঃ ১১২ (বুলেটিন অব দি কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট); এ্যানডারসন, সি.ডব্লু, ১৮৮৩ ক্যাটালগ এ্যান্ড হ্যান্ডবুক অব দি আরকিওলজিক্যাল কালেকসন্স্ ইন দি ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম; স্মিথ, ডিয়সেন্ট, ১৯০৫, দি কপার য়েজ এ্যান্ড প্রি হিস্টোরিক ব্রোঞ্জ ইমপ্লিমেন্টস্ অব ইন্ডিয়া; ইন্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়ারি, ভল্যুম ৩৪, পৃঃ ২২৯-২৩৪।

৮। চক্রবর্তী, দিলীপ কুমার, আরকিওলজি অব ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া, পৃঃ ১৭২; এ্যানডারসন, ১৮৮৩, স্মিথ, ১৯০৫ (পূর্বোক্ত) ক্যাটালগ এ্যান্ড হ্যান্ডবুক অব দি আরকিওলজিক্যাল কালেকশন ইন দি ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, পার্ট টু।

৯। ঘোষ, অশোক কুমার ও চক্রবর্তী, দিলীপ কুমার ঃ প্রি হিস্টোরিক মেটাল ষ্টেজ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, পৃঃ ১১২ (বুলেটিন অব দি কালচারাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট)।

৯ক। সুর, অতুল, বাঙালী জীবনের নৃতাত্ত্বিক রূপ, পৃঃ ১৫ (কলিকাতা, ১৯৯২)।

১০। চক্রবর্তী, দিলীপ কুমার, আরকিওলজি অব ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া, পৃঃ ১৭২; রায় প্রণব ঃ মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ, পৃঃ ১৮ (কলিকাতা, ১৯৮৬)।

১১। চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭২; চট্টোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা, মেদিনীপুর জেলার সংস্কৃতি ও ইতিহাসের রূপরেখা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী স্মারকপত্র, পৃঃ ৪৪-৪৫ (মেদিনীপুর, ১৯৮২)।

১২। দাশগুপ্ত, পরেশচন্দ্র ঃ প্রাগৈতিহাসিক বাঙ্‌লা, পৃঃ ৬৩-৬৭ (কলিকাতা, ১৯৮১) জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার মুখপত্র নিউজ, ৯ম খন্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ৭, (মার্চ, ১৯৭৮)।

১৩। দাশগুপ্ত, পরেশচন্দ্র ঃ এক্সকাভেশন এ্যাট পান্ডুরাজার ঢিবি ১৯৬২, পৃঃ ১৪, ১৬-২০, ২৮-২৯; (কলিকাতা, ১৯৬২) বুলেটিন অব দি এ্যানথ্রোপলজিক্যাল সারভে অব ইন্ডিয়া, ভল্যুম XIX, নাম্বার্স ৩ ও ৪; হিউম্যান স্কেলিট্যাল মেটিরিয়াল্‌স্ এক্সকাভেটেড এ্যাট পাণ্ডুরাজার ঢিবি; মুখার্জী, এস.সি ঃ চ্যালকোলিথিক ইমেজ অব ওয়েস্ট বেঙ্গল উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু পাণ্ডুরাজার ঢিবি, পৃঃ ৩৬-৪৯ (ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, বুলেটিন, জুলাই ১৯৬৭)।

১৪। দাশ, সুধীররঞ্জন ঃ আরকিওলজিক্যাল ডিস্‌কভারি ফ্রম মুর্শিদাবাদ ওয়েস্ট বেঙ্গল, পৃঃ ২৮-২৯ (কলিকাতা, ১৯৭২)।

১৫। ইন্ডিয়ান আরকিওলজি ঃ এ রিভিউ ১৯৬৪-৬৫; চট্টোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা পূর্বোক্ত, ভল্যুম টু, পার্ট টু, চ্যাপ্টার ১১।

১৬। সেন্সাস রিপোর্ট অব ইন্ডিয়া, ১৯৩১ (বেঙ্গল এ্যান্ড সিকিম); চট্টোপাধ্যায় অন্নপূর্ণা, পূর্বোক্ত, ভল্যুম ওয়ান পার্ট টু, পৃঃ ২২৯, ২৩৬, ২৩৮, ২৪০-৪১।

১৭। মিত্র, অশোক কুমার, দি ট্রাইব্‌স্ এ্যান্ড কাস্টস্ অব ওয়েস্ট বেঙ্গল (সেন্সাস, ১৯৫১), পৃঃ ৯৪ (ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১৯৫৩); রিজলী হাবার্ট, দি ট্রাইব্‌স্ এ্যান্ড কাস্টম্ অব বেঙ্গল, (টিসিবি) ভল্যুম টু, পৃঃ ১১০, (রিপ্রিন্ট ১৯৮১) পূর্বোক্ত, ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ২৩৮-৩৯; রিজলী হাবার্টঃ দি পিপল্ অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৪২, লন্ডন, ১৯১৫, (কলিকাতা, ১৯০৮) হ্যাডন, এ.সি; দি রেসেস অব ম্যান পৃঃ ১১৫-১১৬ (কেম্ব্রিজ, ১৯২৯)।

১৮। মিত্র, এ ঃ পূর্বোক্ত, (সেন্সাস, ১৯৫১) পৃঃ ৭৭, রিজলী হাবার্ট ঃ দি পপল্ অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৪৪১, ৪৪৯।

১৯। রিজলী, হাবার্ট, দি ট্রাইব্‌স্ এ্যান্ড কাস্টস্ অব বেঙ্গল, ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ৩২২-৩২৩; সরকার, শশাঙ্ক শেখর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯১, ৯৬।

২০। চট্টোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা, পূর্বোক্ত, ভল্যুম ওয়ান, পার্ট ওয়ান, পৃঃ ২৭৫-৭৭; সেন্সাস রিপোর্ট অব ইন্ডিয়া, ১৯০১।

২১। মিত্র, এ ঃ পূর্বোক্ত, সেন্সাস ১৯৫১, পৃঃ ৯৮-৯৯, ২১৯, বিজলী হাবার্ট ঃ দি টাইব্‌স্ এ্যান্ড কাস্টস অব বেঙ্গল (টিসিবি) ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ১১৮, ১২৭ (রিপ্রিন্ট, কলিকাতা, ১৯৮১); চট্টোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা, ইতিহাস অনুসন্ধান সংখ্যা ৯, (বঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে প্রাচীন সুক্ষ্ম বা রাঢ়বাসী ও ভূমিজ সম্প্রদায়) পৃঃ ১১৩-১১৪, (কলিকাতা ১৯৯৪)।

২২। রিজলী, হাবার্ট, পূর্বোক্ত, (টিসিবি), ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ১১৬, ১১৭, ১১৯-১২৬; সরকার এস, এস, দি অ্যাবরিজিন্যাল রেসেস অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৯১, ৯৬ (কলিকাতা, ১৯৫৪); হ্যাডন, এ.সি ঃ দি রেসেস অব ম্যান, পৃঃ ১০৮, মিত্র, এ ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০০; সিংহ, সুরজিৎ চন্দ্র, ম্যান ইন ইন্ডিয়া, ১৯৫৩; জারন্যাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ৩৩, বুলেটিন অব দি ডিপার্টমেন্ট অব এ্যানথ্রোপলজি, ১৯৫৯, চট্টোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা, পূর্বোক্ত, ভল্যুম ওয়ান, পার্ট ওয়ান, পৃঃ ২৬৮।

২৩। রিজলী, হাবার্ট, টিসিবি, ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ১১৮; মিত্র, এ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৯; চ্যাটার্জী সুনীতি কুমার, দি ওরিজিন এ্যান্ড ডেভলাপমেন্ট অব দি বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ (ওডিবিএল) ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ৪২৯, ৪১৮, ৩৩০. ৩৯৬, ৪৪৮, ৫৪০ (কলিকাতা, ১৯৮৫)।

২৪। মিত্র, এ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০১; বুকানন, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ভল্যুম টু, পৃঃ ১২৬।

২৫। চট্টোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা, পূর্বোক্ত ভল্যুম ওয়ান, পার্ট ওয়ান, পৃঃ ২৮৫; মিত্র, এ, পূর্বোক্ত।

২৬। চট্টোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা, ইতিহাস অনুসন্ধান, সংখ্যা ৮, পৃঃ ২২৫-২৩৬ বঙ্গজন ও বঙ্গসংস্কৃতিতে শবর জনগোষ্ঠীর অবদান (শবরগোষ্ঠীর জন্য) সংখ্যা ১০, পৃঃ ১৩০-১৪০ বঙ্গজন ও সংস্কৃতির উৎসে নিষাদ জনগোষ্ঠী, (নিষাদ গোষ্ঠীর জন্য) দি পিপ্‌ল এ্যান্ড কালচার অব বেঙ্গল। এ স্টাডি ইন ওরিজিন্‌স্, ভল্যুম ওয়ান, পার্ট ওয়ান চ্যাপ্টার ফাইভ(V), পৃঃ ৩৪৮-৩৬৩ (পুলিন্দ গোষ্ঠীর জন্য) লিখিত ও প্রত্নতত্ত্বীয় লেখমালার বিশদ বিবরণীর জন্য)।

২৭। মজুমদার, এন, জি, ইন্সক্রিপসন্‌স্ অব বেঙ্গল, প্রঃ ৭৩, ভার্স ১২ (রাজসাহি, ১৯২৯) সেন, বি. সিঃ সাম হিস্টোরিক্যাল অ্যাসপেক্টস্ অব্ দি ইন্সক্রিপন্সস্ অব্ বেঙ্গল, পৃঃ ৪৭৩, (কলিকাতা, ১৯৪২) দিক্ষীত, কে.এনঃ এক্সকাভেশন এ্যাট পাহাড়পুর, মেময়ার্স অব আরকিওলজিক্যাল সারভে অব ইন্ডিয়া, নং ৫৫, দিল্লী, ১৯৩৮; দাশগুপ্ত শশীভূষণ ঃ বৌদ্ধ ধর্ম ও চর্যা গীতি, পৃঃ ১১৫-১১৬, চর্যা ২৮ (কলিকাতা, ১৩৭৬)।

২৮। দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, বৌদ্ধ ধর্ম ও চর্যাগীতি, পৃঃ ১১৬, চর্যা ১৮।

২৯। রিজলী, এইচ, এইচ, দি পিপ্‌ল্ অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৪০০ (লন্ডন, ১৯১৫), গেট ই.এ. বেঙ্গল রিপোর্ট, সেন্সাস রিপোর্ট অব ইন্ডিয়া, ১৯০১, পৃঃ ৪২২; হাটন, জে. এইচঃ কাস্ট্‌স্ ইন ইন্ডিয়া, পৃঃ ২৮৫ (কেম্ব্রিজ, ১৯৪৬); ভৌমিক, পি.কে, দি লোধাজ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ঃ এ সোসিওইকনমিক স্টাডিজ, পৃঃ ১০-১৩ (কলিকাতা, ১৯৬৩); চট্টোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা, ইতিহাস অনুসন্ধান, সংখ্যা ৯, পৃঃ ১১৩ (কলিকাতা, ১৯৯৪); মিত্র, অশোক কুমার (সম্পাদক); পূর্বোক্ত, সেন্সাস ১৯৫১, পৃঃ ৭৪।

৩০। মাইতি, এস.কে এ্যান্ড মুখার্জী, রমারঞ্জন ঃ করপাস অফ বেঙ্গল ইন্সক্রিপসনস্ বিয়ারিং অন (সি.বি.আই) হিস্ট্রি এ্যান্ড সিভিলাইজেশন অফ বেঙ্গল, পৃঃ ২৬০, ২৬৬ (কলিকাতা, ১৯৬৭) ; মজুমদার, এন.জি ঃ ইন্সক্রিপসনস্ অফ বেঙ্গল, ভার্স ১২, পৃঃ ৭৩, ৭৭ (রাজসাহী, ১৯২৯) ।

৩১। তদেব, স্যালেটোর, দি ওয়াইল্ড ট্রাইব্‌স্ ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, পৃঃ ১০০ (লাহোর, ১৯৩৫); নরসিংহাচার্য ঃ কবিচরিত, দ্বিতীয়, পৃঃ ২৪৭-৪৮।

৩২। মিত্র, এ ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮; ম্যুর, জেঃ দি ওরিজিন্যাল সান্সক্রিট টেক্সট, ভল্যুম টু, পৃঃ ৪১১ (লন্ডন, ১৮৬৩) সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস ঃ কাদম্বরী, পৃঃ ১০১ (কলিকাতা, ১৯৩৮); কাওয়েল, ই.বি, এ্যান্ড টমাস, এফ. ডব্লু, (অনুবাদক) হর্ষচরিত অব বানভট্ট, ৮, পৃঃ ৭০ (রিপ্রিন্ট, দিল্লী, ১৯৬১); অলজেন ঃ এথনোলজি, পৃঃ ৪৬২; চট্টোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা ঃ ইতিহাস অনুসন্ধান, সংখ্যা ৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৯-২৩০ (কলিকাতা, ১৯৯৩)

৩৩। ঐতরেয় আরণ্যক, বৌধায়ন ধর্মসূত্র, জৈন উপাঙ্গ, জৈন ভগবতীসূত্র, মিলিন্দ পঞহো, ললিতবিস্তর, রামায়ণ, পুরাণ, কামসূত্র, বৃহৎসংহিতা, দশকুমারচরিত, গৌড়বাহো ইত্যাদি। লেখমালার মধ্যে দুচারটি উল্লেখ করা হল। যথা মহাস্থান লেখ, অপসিদল, মেহেরৌলি স্তম্ভলেখ, মহাকূট স্তম্ভলেখ, তিরুমলৈ লেখ, ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর লেখ, বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্র লেখ, বিশ্বরূপসেনের ইদিলপুর, সাহিত্য পরিষৎ তাম্র লেখ ইত্যাদি।

৩৪। তর্করত্ন, পঞ্চানন, মহাভারত, ভল্যুম ওয়ান, আদিপর্ব, চ্যাপ্টার ১০৪, ৩৪-৩৬, পৃঃ ১১৪ (বঙ্গবাসী সংস্করণ), বায়ুপুরাণ, চ্যাপ্টার ৯৯, ২৬-৩৪, ৪৭-৯৫; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ; iii; চ্যাপ্টার ৭৪, ২৫-৩৪, ৪৭-১০০; মৎস্যপুরাণ, চ্যাপ্টার ৪৮, ২৩-২৯, ৪৮-৪৯; ভাগবত পুরাণ, ৯ (IX), চ্যাপ্টার ২৩. ৫।

৩৫। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (অনুবাদক), আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প, পৃঃ ২৩২-২৩৩।

৩৬। সেন্সাস রিপোর্ট অব ইন্ডিয়া (বেঙ্গল), ১৯০১, পৃঃ ৪২৫।

৩৭। তদেব, পৃঃ ৪২৫-৪২৬।

৩৮। জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৯০৮, পৃঃ ২৮৪; চৌধুরী, শশীভূষণ, এথনিক সেটেল্‌মেন্ট ইন এ্যানসিয়ান্ট ইন্ডিয়া, পৃঃ ১৫৯ (কলিকাতা, ১৯৫৫); সম্পাদক মজুমদার, আর, সি, হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ১০ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৩) ; সেন, বি.সি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩।

৩৯। জ্যাকোবি, এইচ (অনুবাদক), সেকরেড বুক অব দি ইস্ট, ভল্যুম ২২, আচারঙ্গ সূত্র, বুক ওয়ান, চ্যাপ্টার এইট, সেকসেন থ্রি; (১৮৮৪) ইন্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়ারি, ভল্যুম বিংশ (২০) পৃঃ ৩৭৫।

৪০। জ্যাকোবি; এইচ, তদেব; সেকরেড বুক অব দি ইস্ট, ভল্যুম ২২, পৃঃ ৮৪; সেন, বি.সি; সাম হিস্টোরিক্যাল অ্যাসপেক্টস্ অব দি ইন্সক্রিপসন্‌স্ অব বেঙ্গল, পৃঃ ৫৩ (কলিকাতা, ১৯৪২); চট্টোপাধ্যায় অন্নপূর্ণা, ইতিহাস অনুসন্ধান, সংখ্যা ৯, (পূর্বোক্ত) পৃঃ ১১২-১১৩ (কলিকাতা, ১৯৯৪)।

৪১। জ্যাকোবি, এইচ, তদেব; সেন, বি.সি; পূর্বোক্ত; বাগচী, প্রবোধচন্দ্র (অনুবাদক) প্রি অ্যারিয়ান এ্যান্ড প্রি দ্রাবিড়িয়ান ইন ইন্ডিয়া (সিলভ্যান লেভি, প্রিজুলুস্কি ও অন্যান্যরা), পৃঃ ১৫-১৬, (কলিকাতা, ১৯১৯); চট্টোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা, ইতিহাস অনুসন্ধান, সংখ্যা ৯ পূর্বোক্ত, পৃঃ (১১২-১১৩)।

৪২। চট্টোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা, ইতিহাস অনুসন্ধান, সংখ্যা ৯, পৃঃ ১১২-১১৩; দি পিপ্‌ল এ্যান্ড কালচার অব বেঙ্গল ঃ এ স্টাডি ইন ওরিজিন্‌স্, ভল্যুম ওয়ান, পার্ট টু, পৃঃ ৪৩০।

৪৩। রিজলী, এইচ, এইচ, দি পিপ্‌ল্ অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৪০১; চট্টোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা, পূর্বোক্ত, ভল্যুম ওয়ান, পার্ট টু, পৃঃ ৩৯৩, ৩৯৫, ৪১৫, ৪১৭, ৪৪৭-৪৪৮; ইতিহাস অনুসন্ধান, সংখ্যা ৯, পৃঃ ১১৩-১১৫; রিজলী, টিসিবি, ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ১১৭।

৪৪। এপিগ্রাফিকা ইন্ডিকা, ভল্যুম ২৩ (XXIII) পৃঃ ২৯১ এফ, এফ (ধর্মপালের নালন্দা তাম্রশাসন) ; সরকার, ডি.সি. স্টাডিজ ইন দি সোসাইটি এ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব এ্যানসিয়ান্ট এ্যান্ড মিডাইভ্যাল ইন্ডিয়া, ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ১৩৬-১৩৭ (কলিকাতা, ১৯৬৭)।

৪৫। দালাল, সি.ডি (অনুবাদক), কাব্যমীমাংসা, পৃঃ ৮ (থার্ড এডিসন, ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট, বরোদা, ১৯৩৪); শাস্ত্রী, আর, এ (সম্পাদক) ও ঘোষ, এম (অনুবাদক) ঃ ভারতের নাট্যশাস্ত্র, ২৩/৬৪, ভল্যুম ওয়ান এ্যান্ড টু (কলিকাতা, ১৯৫০, ১৯৬১); চট্টোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা ঃ ইতিহাস অনুসন্ধান, সংখ্যা ১৭, পৃঃ ১১৪-১১৫, প্রাচীন বঙ্গের নগরনামের বৈশিষ্ট্য ও নৃতাত্ত্বিক তাৎপর্য (কলিকাতা, ২০০২)।

৪৬। চ্যাটার্জী, সুনীতিকুমার, কিরাত জন কৃতি, পৃঃ ১৭; জার্নাল অব দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, লেটার্স XVI কলিকাতা ১৯৫০, চট্টোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা; পূর্বোক্ত ভল্যুম ওয়ান, পার্ট টু, পৃঃ ৫৬৮।

৪৭। কিরাত ঃ- শুক্ল যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, রামায়ণ, মহাভারত, বৃহৎসংহিতা, পুরাণ, দশকুমার চরিত, ইত্যাদি। লেখ — নাগার্জুনকোন্ড, সাঁচি, খারবেল, ভাতুরিয়া, দামোদরপুর তাম্রশাসন ইত্যাদি।

কম্বোজ ঃ- রামায়ণ, মহাভারত, রাজতরঙ্গিনী, অশোকের লেখ, দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসন, মহীপালের বানগড় লেখ, মদনপালের মনহলি, বিগ্রহপালের আমগাছি লেখ ইত্যাদি।

মেচ ঃ- মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্ত, পদ্মপুরাণ ডুবি, নিধনপুর, বড়গাঁও তাম্রশাসন ইত্যাদি।

ম্লেচ্ছ ঃ- রামায়ণ, মহাভারত, অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা, শ্রীচন্দ্রদেবের লেখ; ময়নামতী তাম্রশাসন ইত্যাদি।

খস ঃ- মহাভারত, পুরাণ, রাজতরঙ্গিণী, ধর্মপালের নালন্দা, দেবপালের মুঙ্গের, মহীপালের বানগড়, মদনপালের মনহলি তাম্রশাসন ইত্যাদি।

শক ঃ- রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, পুরাণ, এলাহাবাদ স্তম্ভলেখ ইত্যাদি।

হুণ ঃ- হর্ষচরিত, সঞ্জোলি, মন্দাশোর লেখ ইত্যাদি।

চীন ঃ- রামায়ণ, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, বৃহৎসংহিতা ইত্যাদি। খারবেলের হাতিগুম্ফা নাগার্জুন লেখ ইত্যাদি।

আভীর ঃ- মহাভারত, পতঞ্জলি, মহাভাস্য, পুরাণ, পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সি, টলেমির ভূগোল, রাজতরঙ্গিনী ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি উপজাতির কতিপয় লিখিত ও প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদানের কথা উল্লিখিত হল।

৪৮। মাইতি এ্যান্ড মুখার্জী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮-১০৪; মজুমদার, এন, জি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৯, ১২৯ (ইদিলপুর তাম্রশাসন); পৃঃ ১৩৫ (মদনপাড়া তাম্রশাসন); জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ভল্যুম LXV, পৃঃ ২৩৯ (কেন্দুপত্র প্লেট) রায় হেমচন্দ্র, ডায়ানাস্টিক হিস্ট্রি অব নর্দার্ন ইন্ডিয়া, ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ৩৮২, ৪৮০ (কলিকাতা, ১৯৩১)।

৪৯। চট্টোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা, পূর্বোক্ত, ভল্যুম ওয়ান, পার্ট টু, পৃঃ ৬০৫-৬০৬।

৫০। এপিগ্রাফিকা ইন্ডিকা, ভল্যুম (XXIII) ২৩, পৃঃ ২৯০-২৯১ (ধর্মপালের নালন্দা প্লেট); মাইতি এ্যান্ড মুখার্জী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৮, ১২৪, ১৩৮, ২০২, ২১৫ ইত্যাদি।

৫১। জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, ১৯৪০ নং ১, পৃঃ ১-৪৪; মজুমদার, ডি, এন, রেসেস এ্যান্ড কালচার অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ১৫৫ (কলিকাতা, ১৯৬১, ১৯৬৫)।

৫২। হ্যাডন, এ.সি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬; রিজলী, হাবার্ট, দি পিপল্ অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৬০-৬১।

৫৩। মাইতি এ্যান্ড মুখার্জী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৪, ১৩০, ১৭৫, ১৮২, ২০২ ইত্যাদি।

৫৪। হ্যাডন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১, ১১২-১১৯।

৫৫। এ্যানসিয়ান্ট ইন্ডিয়া, ১৯৬৪-৬৫, পৃঃ ১৮৩।

৫৬। মহাভারত, (VI) ৬, ৯; এপিগ্রাফিকা ইন্ডিকা, ভল্যুম ২০, পৃঃ ২২; ল.বি.সি. ট্রাইক্স্ হন এ্যানসিয়ান্ট ইন্ডিয়া, পৃঃ ৩৯ (পুণা, ১৯৪৩)।

৫৭। মাইতি এ্যান্ড মুখার্জী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০২, ২১৫।

৫৮। হ্যাডন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০, ২১, ১০৭।

৫৯। এপিগ্রাফিকা ইন্ডিকা, সংখ্যা ১৫, পৃঃ ১২৯ এফ.এফ, ১৩৮ এফ এফ; ১৪১ এফ এফ; সংখ্যা ১৭, পৃঃ ১৯৩; মাইতি এ্যান্ড মুখার্জী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৮, ১৭৫ (নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসন) পৃঃ ২০২ (১ম মহীপালের বানগড় তাম্রশাসন), ২১৫ (মদনপালের মনহলি তাম্রশাসন)।

৬০। তদেব, এপিগ্রাফিকা ইন্ডিকা, ভল্যুম ২৩, পৃঃ ২৯০-২৯১ (ধর্মপালের নালন্দা প্লেট)।

৬১। ওপার্ট, জি, দি ওরিজিন্যাল ইনহ্যাবিন্টাস্ অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ১৩ (রিপ্রিন্ট, দিল্লী, ১৯৭১)।

৬২। এপিগ্রাফিকা ইন্ডিকা; ভল্যুম ২৩, পৃঃ ২৯১; মাইতি এ্যান্ড মুখার্জী ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৯, ১৬৩, ১৬৮, ১৭৫, ১৯৭, ২০২, ২০৯, ২১৫ ইত্যাদি; মজুমদার, আর, সিঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১৬।

৬৩। রিজলী, টিসিবি, ভল্যুম টু, পৃঃ ৬২; ম্যাক্রিন্ডেল, জে, ডব্লু (অনুবাদক), এ্যানসিয়ান্ট ইন্ডিয়া এ্যাজ ডেসক্রাইবড্ বাই মেগাসস্থিনিস এ্যান্ড এ্যারিয়ান, পৃঃ ৮৫ (লন্ডন, ১৮৭৭); জার্নাল অব দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৮৭৫, পৃঃ ৯০।

৬৪। ওপার্ট জি, দি ওরিজিন্যাল ইনহ্যাবিন্টাস্ অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৭, ১৪, ৩৬ (দিল্লী, ১৯৭১) মজুমদার, আর, সি (সম্পাদক), হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ৫৯১; সরকার, দীনেশ চন্দ্র, ষ্টাডিজ ইন দি সোসাইটি এ্যান্ড এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অব এ্যানসিয়ান্ট এ্যান্ড মিডাইভ্যাল

ইন্ডিয়া, পৃঃ ১১৮, বিশেষ দ্রষ্টব্য, রেফারেন্স ২ (কলিকাতা, ১৯৬৭); চট্টোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা, পূর্বোক্ত, ভল্যুম টু, পার্ট ওয়ান চ্যাপ্টার এইট।

৬৫। মিত্র, অশোক (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮৮।

৬৬। এপিগ্রাফিকা ইন্ডিকা ঃ ভল্যুম ৯, পৃঃ ২২৮ এফ. এফ।

৬৭। রিজলী, দি পিপ্‌ল্ অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৪৫।

৬৮। মাইতি এ্যান্ড মুখার্জী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০০, ১৬৮, ১৭৫, ২০২ (বানগড় তাম্রশাসন ১ম মহীপালের) ২১৫ (মদনপালের মনহলি তাম্রশাসন); এপিগ্রাফিকা ইন্ডিকা, ভল্যুম ৩৩, পৃঃ ১৫০, সরকার, দীনেশ চন্দ্র, পাল ও সেন যুগের বংশানুচরিত, পৃঃ ৭৬ (কলিকাতা, ১৯৮২), শিলালেখ তাম্রশাসনাদি প্রসঙ্গ, পৃঃ ২১৬ (কলিকাতা, ১৯৮২)।

৬৯। হ্যাডন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৩; রিজলী, দি পিপ্‌ল অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৩৮, চন্দ, আর, পি, দি ইন্দো এ্যরিয়ান রেসেস, পৃঃ ২৬, রিপ্রিন্ট, (কলিকাতা, ১৯৫৯); রাজসাহী, ১৯১৬, হার্টন, সেন্সাস রিপোর্ট অব ইন্ডিয়া, ১৯৩১, ভল্যুম ওয়ান, পার্ট ওয়ান।

৭০। মাইতি এ্যান্ড মুখার্জী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৯, ২৩১, ১৬৮, ১৭৫, ১৮২; জার্নাল অব দি বিহার রিসার্চ সোসাইটি, ভল্যুম XLI, ১৯৭৫, পৃঃ ১৩১-১৪৮।

৭১। হ্যাডন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০; সরকার, শশাঙ্ক শেখর ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯; চট্টোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা, পূর্বোক্ত, ভল্যুম টু, পার্টওয়ান, চ্যাপ্টার ৮।

৭২। সরকার, দীনেশ চন্দ্র ঃ সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রসঙ্গ, পার্ট ১, পৃঃ ৪৮ (কলিকাতা, ১৯৮২)।

৭৩। তর্করত্ন, পঞ্চানন ঃ মহাভারত, ভল্যুম ওয়ান, আদিপর্ব, চ্যাপ্টার ১০৪, ৫৩, পৃঃ ১১৪; বায়ু পুরাণ, ৯, ২৩, ৫; পারগিটার, এফ, ই; এ্যানসিয়ান্ট ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল ট্রাডিশন, পৃঃ ১৫৮ (লন্ডন ১৯২২) ল.বি.সি, পর্বোক্ত, পৃঃ ১৫।

৭৪। রিজলী, দি পিপ্‌ল্ অব-ইন্ডিয়া, পৃঃ ৫৬, ৩৯৮; মজুমদার, ডি.এন ঃ রেসেস এ্যান্ড কালচার্‌স্ অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৬৬, ৮৪ (কলিকাতা, ১৯৬১, ১৯৬৫)।

৭৫। বিচিত্রা, পার্ট তৃতীয় ১৩৪০ শতাব্দ, পৃঃ ৪১৭, মজুমদার, ডি.এন ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬, ৮৪, ওয়াটার্স, টি (অনুবাদ), অন য়ুয়ান চোয়াঙস্ ট্রাভেলস্ ইন ইন্ডিয়া, ভল্যুম টু, পৃঃ ১৯৩ (রিপ্রিন্ট, দিল্লী, ১৯৬১)।

৭৬। চন্দ, আর, পি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৬-৮৭, ৯৫; হ্যাডন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৫ ১১৬।

৭৭। তদেব, মৎসপুরাণ, ৪৮, ৬০; বায়ুপুরাণ, ৬২, ১০৭-১২৩; মহাভারত, ৮, চ্যাপ্টার, ২২, ১৮-১৯।

৭৮। হ্যাডন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৫-১১৬; চ্যাটার্জী, সুনীতি কুমার ঃ কিরাত জনকৃতি (জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৬, ১৯৫০), পৃঃ ১৭৪।

৭৯। হ্যাডন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৫-১১৬।

৮০। মিত্র. এ (সম্পাদক), পর্বোক্ত, পৃঃ ৮৯-৯২।

৮১। তদেব, পৃঃ ১০৭; রিজলী, টিসিবি, ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ৪০-৪৩।

৮২। রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস, ১ম খন্ড, পৃঃ ৮০।

মধ্যকালীন ভারতে বস্ত্রপ্রযুক্তি

ইশরত আলম

মাননীয় সভাপতি ও উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের ১৯তম বার্ষিক সম্মেলনে মধ্যযুগ বিভাগে আমাকে সভাপতিরূপে আমন্ত্রণ জানিয়ে কার্যকরী সমিতি যে মহানুভবতা দেখিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। একে আমি এক বিরাট সম্মান বলে মনে করি এবং এই সুযোগে মধ্যকালীন ভারতে বস্ত্রপ্রযুক্তি নিয়ে আমার গবেষণা প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই। এর আগে বহু স্বনামধন্য ইতিহাসবিদ এ নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাই আমি নিজের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন। এই সম্মানকে আমি এ বিষয়ে যে সামান্য কাজ করতে পেরেছি, তার স্বীকৃতি বলে মনে করি। আমার ওপর যে আস্থা রাখা হয়েছে তার যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়ার চেষ্টা করাই হবে আমাব প্রধান লক্ষ্য।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগের ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনে বস্ত্র-উৎপাদন ছিল দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র (প্রথম ছিল কৃষি) এবং ভারতীয় সাগর পারের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভূত সহায়তা করেছিল। আমরা বস্ত্র-উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি বিষয়ে কিছু বলব। বস্ত্র প্রধানত তুলো, শন, রেশম ও পশম থেকে প্রস্তুত করা হত।

মধ্যকালীন ভারতে বস্ত্র-উৎপাদনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত উপাদান ছিল তুলো। তুলোর সময়কাল ও উদ্ভবকে কেন্দ্র করে তার প্রাচীনত্ব নিয়ে নানা জটিলতা রয়েছে। মেহেরগড়-২ প্রত্নক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ পোড়া তুলোর বীজ পাওয়া গেছে, যেগুলি তুলোর প্রাচীনতম (৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পূর্বে) জ্ঞাত নিদর্শন।[১] বালুচিস্তানের অন্তর্গত বিখ্যাত বোলান গিরিপথের ঠিক নিচে কচ্চি সমতলে মেহেরগড় অবস্থিত। অঞ্চলটি কম বৃষ্টিপাতযুক্ত। যব, গম প্রভৃতি ফসল চাষ শুরুর জন্য প্রচুর জল দরকার। শুষ্ক এলাকা হওয়ার জন্য সমগ্র এলাকার জলসম্পদ বাঁধ দিয়ে ধরে রেখে চাষাবাদ চলত। বলা হয় যে, জলের ওপর এই নিয়ন্ত্রণের জন্য অধিবাসীরা বন্য তুলোকে চাষ করতে সক্ষম হয়েছিল।[২] মোহেনজোদড়োতে তন্তু ও কাপড়ের সন্ধান মিলেছে। এগুলি ছিল শিমুল বৃক্ষের তুলো (*Gossypium arboreum*)। এ ছিল গাছের বা ঝোপের তুলো, বার্ষিক ফলন (ওষধি) নয়।[৩] খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতকের মধ্যে এটি ভূমধ্যসাগরীয় জগতে পৌঁছয়, তখন এটিকে নীলনদের অববাহিকায় দেখা গিয়েছিল।[৪] মহান আলেক্সান্ডারের (মৃত্যু ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) অভিযানের সময় গ্রীকরা ভারতীয় তুলোর সংস্পর্শে আসে।[৫] বার্ষিক ফলন হিসাবে তুলোর নির্বাচন ও সংকরায়ন হতে অবশ্য বহু

সময় লেগেছিল। থিওফ্রাস্তুস (আনুমানিক ৩৫১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ — ২৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) বলেছেন যে ভারতীয়রা সারিবদ্ধভাবে তুলো গাছ লাগায়,[৬] যার থেকে মনে হয় যে ভারতীয়রা একদা-বন্য উদ্ভিদটিকে একটি কর্ষণযোগ্য উদ্ভিদে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মোহেনজোদড়োর তুলো আদিম প্রকৃতির হলেও আধুনিক ভারতীয় তুলোর সব পরিমাপযোগ্য গুণই এতে বর্তমান ছিল।

সুতরাং, ভারতে বস্ত্রপ্রযুক্তির সূত্রপাত হয়েছিল সিন্ধুসভ্যতার সময়ে। মোহেনজোদড়ো থেকে প্রাপ্ত রং করা ও বোনা সুতিবস্ত্র থেকে প্রমাণ মেলে যে প্রায় চার হাজার বছর আগে সিন্ধুসভ্যতায় সাধারণভাবে এর ব্যবহার ছিল,[৭] এবং প্রাচীনকালেই সূক্ষ্মতার জন্য ভারতের তুলোর বিশ্বব্যাপী সুনাম ছিল।[৮] প্রাচীন ও মধ্যকালীন ভারতে বস্ত্রপ্রযুক্তি জটিল ছিল না, তাহলেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ যান্ত্রিক নীতির ব্যবহার ছিল। যেহেতু ভারতে নকশা ও বয়নের প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে, তাই এর বস্ত্রপ্রযুক্তি ও শৈলী অন্যান্য সমসাময়িক সভ্যতা থেকে উপাদান গ্রহণ করে পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হয়েছিল।[৯] বস্ত্রপ্রযুক্তির কিছু গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি ও প্রকৌশল নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করব। প্রথমে আমরা তুলো ও তার প্রযুক্তি নিয়ে বলব, যা অন্যান্য তন্তুর ক্ষেত্রেও সাধারণ প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করবে।

গোড়া থেকেই তুলো নিজেই নিজের প্রযুক্তি তৈরি করে নিয়েছিল। তুলো থেকে কাপড় বোনার তিনটি পদ্ধতি আছে — (১) বীজ নিষ্কাশন, (২) আঁশ ছাড়ান, (৩) সুতো কাটা।

তুলো সংগ্রহের পর কিছুদিন তা মাঠে ফেলে রাখা হয় যাতে বীজের গায়ে লেগে থাকা আঁশ আলগা হয়ে যায়।

এবার আসে বীজ নিষ্কাশনের পালা। ভারতে সচরাচর দুভাবে তা করা হয়, রোলার ও বোর্ড ব্যবহার করে এবং চরকা (হিন্দীতে *চরখি*) দিয়ে। দুটি পদ্ধতিই বেশ প্রাচীন। রোলার ও বোর্ড সব প্রাচীন সভ্যতাতেই নানা উদ্দেশ্যে প্রচলিত ছিল। রোলারটি ছিল বেলনাকৃতির এবং একটি বোর্ডের ওপর হাত রেখে তার ব্যবহার হত। প্রাচীন ভারতের নানা রচনায় ও অজন্তার গুহাচিত্রে এর নিদর্শন দেখিয়েছেন ডঃ শ্লিংলফ।[১০] এর আপাত-কাঠিন্য দেখে মনে হয় যে এটি তৈরি হত পাথর দিয়ে।[১১] বীজ থেকে ভালভাবে তুলো ঝেড়ে ফেলার জন্য আছড়ান হত, যাতে পরবর্তীকালে চরকাতে তুলো থেকে সুতো কাটা যায়।[১২] মধ্যকালীন ভারতেও যে এটির ব্যবহার ছিল তার প্রমাণ মেলে বীজ থেকে তুলো ছাড়ানর জন্য ব্যবহৃত *চোবকিন*[১৩] নামক একটি কাষ্ঠযন্ত্রের বর্ণনা ও সংশ্লিষ্ট চিত্র থেকে।[১৪] মধ্যকালীন চীনেও এর ব্যবহার ছিল।[১৫] এটি ছিল কাঠের তৈরি, তবে তা হাত না পা — কি দিয়ে চালান হত সে বিষয়টি পরিষ্কার নয়। উনবিংশ শতকের দক্ষিণ ভারতে পদচালিত রোলারের ব্যাপক ব্যবহার ছিল।[১৬] হয়ত দুটি পদ্ধতিই একই সাথে চলত। বস্তুত, আজকের যুগেও এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জিনিষটির উপযোগিতার প্রমাণ।

চরকা এর তুলনায় প্রযুক্তিগতভাবে উন্নততর যন্ত্র। এটিতে একটি হাতল বা হাতের সাহায্যে একটি উপবৃত্তাকার গীয়র-যুক্ত দুটি বেলনাকার রোলার ঘোরান হয়। হাতল যুক্ত হওয়ার পর নিচের রোলারটি একপ্রান্তে ঘোরান হয়,[১৭] যা দুটি রোলারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।[১৮] যন্ত্রে তুলো ঢোকালে তা থেকে তন্তু নির্গত হয়। বীজগুলি আকারে বড় হওয়ার জন্য রোলারের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না, সেগুলি একপাশে পড়ে যায়।

ভারত,[১৯] কম্বোডিয়া ও জিংজিয়াং (সিংকিয়াং)[২০]-য়ে এই যন্ত্রের ব্যাপক উপস্থিতিই প্রাচীন ভারতে এর ব্যাপকতার জোরাল প্রমাণ। খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দে কম্বোডিয়ার সংস্কৃতির উপর ভারতের শক্তিশালী প্রভাবের প্রমাণ হল পঞ্চম থেকে দশম শতকের মধ্যে শুরু হওয়া ভারত - কম্বোডিয়া সাংস্কৃতিক সম্পর্ক।[২১] সম্ভবত সে সময়েই যন্ত্রটি ছড়িয়ে পড়েছিল। দুটি পথে ভারত থেকে চীনে ষষ্ঠ থেকে ত্রয়োদশ শতকে চরকা ছড়িয়ে পড়েছিল ঃ 'ব্রহ্মদেশ (ষষ্ঠশতক) সিংকিয়াংরের পথে ইন্দোচীন হয়ে (ত্রয়োদশ শতক)'।[২২] তবে প্রাচীন ভারতে এর উপস্থিতির আরও জোরাল প্রমাণ হল অজন্তার ফ্রেস্কোগুলিতে বিদ্যমান নিদর্শন, যেখানে গ্লিংলফ তুলোর আঁশ ছাড়ানর জন্য একধরণের ধনুকাকৃতি যন্ত্র লক্ষ্য করেছেন, যেটিকে চরকা বলেই মনে হয়। একটি আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে এটিকে দেখান হয়েছে, যার সাথে ধনুকাকৃতি যন্ত্রের কোন মিল নেই।[২৩] উপরের দুটি রোলারই সরু (মনে হয় লোহা দিয়ে তৈরি)। যুক্তিসঙ্গতভাবেই এতে কোন হাতল দেখান হয়নি (কারণ তা পরে সংযোজিত হয়েছে)। চিত্রে জনৈক মহিলা বামহাতে রোলারটি ঘোরাচ্ছেন এবং ডান হাতে তুলো ঢোকাচ্ছেন। এর থেকে প্রায় নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হয় যে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে ভারতীয়রা এর ব্যবহার জানতেন।[২৪] সহজেই ধরে নেওয়া যায় যে এই সময়েই ভারত থেকে চরকা চীন (ষষ্ঠ থেকে ত্রয়োদশ শতকে) ও কম্বোডিয়ার পৌঁছেছিল। ইসলামী বিশ্বে এর ইতিহাসের সপক্ষে ইরফান হাবিব কোন প্রমাণ পাননি। সেখানে যা ছিল তা হল ভারতীয় চরকার রকমফের, দুটি রোলার-যুক্ত, কিন্তু গীয়রটি নেই।[২৫] চীনের ক্ষেত্রেও একই দশা দেখা গেছে।[২৬]

এই যন্ত্রটির ভারতীয় উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন দলিলপত্রের স্বাক্ষ্য প্রমাণ নেই, কিন্তু একই ধরণের যান্ত্রিক নীতির প্রয়োগ দেখা গেছে ভারতীয় আখ-পেষাই যন্ত্রে, যা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। অন্য কোন সভ্যতাতে এ ধরণের যন্ত্রের হদিশ না মিললেও, তুলো ও আখ উভয়ই একান্তভাবে ভারতের নিজস্ব। এই দুই ধরণের রোলারের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল এই যে, চরকা যেখানে উলম্বভাবে ঘোরে, আখ-পেষাইয়ের কল সেখানে পশুশক্তি ব্যবহারের জন্য আনুভূমিকভাবে ঘোরে।

ভারতীয় চরকায় গীয়র ব্যবহার প্রসঙ্গে কিছু বিতর্ক আছে। বস্তুত, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে, হাতলের সাহায্যে চরকার রোলার দুটি ঘোরান হত, কেননা এর কৌশল ভারতীয় প্রযুক্তিতে বহিরাগত ছিল।[২৭] তবে এ ধরণের একটি মতকে

প্রমাণভাবে সিদ্ধ মনে হয় না। চরকায় গীয়র ব্যবহার প্রসঙ্গে অজন্তার ফ্রেস্কোগুলির গুরুত্ব হল এই যে, গীয়র-বিহীন চরকাকে তখনই ভারতীয় প্রযুক্তিতে বহিরাগত বলা যাবে যদি প্রমাণিত হয় যে এর উৎপত্তি হয়েছিল ভারতের বাইরে কোথাও। আর যদি তা বাইরে থেকে এসেও থাকে, তবে তা এসেছে এই সময়ে বা তার পরে। চীনদেশে একই সঙ্গে তুলো ও চরকা এসেছিল।[২৮] কিন্তু তা ছিল গীয়র-বিহীন, কেননা হান যুগ থেকেই দ্বি-শক্তিসম্পন্ন রোলার ব্যবহারের কৌশল তাদের জানা ছিল। সুতরাং, ভারতীয় চরকাকে তারা নিজেদের ব্যবস্থায় আত্তীকরণ করে নিয়েছিলেন। প্রাচীনতম চীনা চরকায় গীয়রের বদলে প্রত্যেক রোলারে হাতল (crank handle) লক্ষ্য করা যায়।[২৯] মধ্য-অষ্টাদশ শতকের কাংড়া মিনিয়েচারে যে *চরখি* দেখা যায়, তাতে রোলারের শেষপ্রান্তে একটি সর্পিল বাঁক লক্ষ্যণীয়।[৩০] ধ্রুপদী যুগ থেকেই ইউরোপে "Worm-gearing" জ্ঞাত ছিল, কিন্তু এই বিশেষ ধরণের গীয়রটি এসেছে মাত্র উনিশ শতকের প্রথমভাগে।[৩১] এই যন্ত্রটির সাথে ইসলামী জগতের পরিচিতিরও বিশেষ স্বাক্ষ্য নেই।[৩২] আবার, ভারতীয় তুলোর কাঠিন্যের জন্য, প্রযুক্তিগত দিক থেকে দেখলে, এ ধরণের হাতল বা গীয়র ছাড়া সুতো কাটা মুশকিল ছিল।[৩৩] সুতো কাটার জন্য রোলার দুটি আঁটসাটভাবে পরস্পর চেপে থাকত। এটি তখনই সম্ভব হত যদি একটি হাতল বা একটি Worm-gearing বা উভয়ই থাকে। সুতরাং, ভারতীয় চরকায় রোলারের হাতলের অনুপস্থিতির জন্য Worm gear থাকার সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পায়। অতএব, একথা বলা যায় যে শুরু থেকেই ভারতীয় চরকায় গীয়র ছিল এবং সেভাবেই এটি উনিশ শতকের শেষভাগ অবধি বিদ্যমান ছিল।[৩৪]

চরকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হাতলের উৎপত্তির সময়কাল সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না।[৩৫] বহর-ই আযম (১৭৪০)-এর মত দলিল এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করে না।[৩৬] কিন্তু, মধ্য-অষ্টাদশ শতকের কাংড়া মিনিয়েচারে হাতল লক্ষ্য করা যায়।[৩৭] সম্ভবত, ১৩শ - ১৪শ শতকে চরকাতে চাকার সঙ্গে হাতলও যুক্ত হয়েছিল।[৩৮] অষ্টাদশ শতকের মধ্যে কাংড়া মিনিয়েচারে আরেকটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল।[৩৯] দুটি রোলারেই সমান্তরাল খাঁজের উপস্থিতি রোলার দুটির ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিল। গীয়র ও হাতলযুক্ত চরকা দ্রুততর ও সূক্ষ্মতর হয়ে উঠল। এরপর আর কোনও যান্ত্রিক উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না,[৪০] একইসঙ্গে সিন্ধু ও ঝিলম নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে হাজারা জেলার পখলিতে চরকা চালানর জন্য জলশক্তির ব্যবহার দেখা যায়।[৪১] চরকার ব্যবহার অর্থনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। হিসাব করে দেখা গিয়েছিল যে জনপ্রতি গড়ে ছয় থেকে আট পাউন্ড তুলো দৈনিক পরিষ্কার করা যেত।[৪২] অর্থাৎ, রোলার -বোর্ড যন্ত্রের থেকে চরকার সুবিধা ছিল অনেক বেশি, এবং তা তন্তু উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছিল।

তুলো থেকে সুতোকাটার পর এর আঁশ আলাদা করতে হত। ভালভাবে ধুনলে শুধু তন্তু আলাদা হত না, ধুলোবালি, নোংরাও দূর হত। এরজন্য একদম শুরুতে

একটি লাঠির সাহায্যে তুলো পেটান হত। ষোড়শ শতকের শেষদিকের একটি ছবিতে, 'কাপড়বোনা সম্পর্কে ইদ্রিস মানুষকে জ্ঞান দিচ্ছেন', তাতে দেখা যাবে যে তুলোপেটানর কাজে লাঠি ব্যবহার করা হচ্ছে।[৪৩]

এমনকি সপ্তদশ শতকেও ধুনুরির ধনুকীর পাশাপাশি লাঠির ব্যবহার চলেছিল।[৪৪] কিন্তু, লাঠি দিয়ে তুলো ধুনার নিজস্ব কিছু সমস্যা ছিল। তন্তুর জট ছাড়ানর পরিবর্তে তা ছিঁড়েও যেতে পারত। এইজন্য, ধনুকী ছিল অনেক ভাল। লাঠি দিয়ে পেটানর বদলে ধনুকীর ছিলার কম্পনে তুলোর জট খুলে যায়, উদ্ভিজ তন্তু আলাদা হয়ে যায়।

ধনুকীর উৎপত্তি নিয়ে কিছু সমস্যা আছে।[৪৫] শ্লিংলফ *জাতকে* এর প্রথম সাহিত্যিক উল্লেখ পেয়েছেন, যেখানে *ইলখিনাম কাপ্পাস-পোখন ধনুকম* (তুলো ধুনার জন্য কোন মহিলার ব্যবহৃত ধনুক)-এর উল্লেখ রয়েছে।[৪৬] বিজয়া রামস্বামী দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে ধনুকীর ব্যবহারের উল্লেখ পেয়েছেন।[৪৭] খ্রিস্টীয় নবম শতকের একটি গ্রন্থে, *ত্রিকান্ডশেষ*-এ এর উল্লেখ মিলবে।[৪৮]

ডঃ শ্লিংলফ ষষ্ঠ শতকের অজন্তার ফ্রেস্কোতে একটি আয়তাকার ফ্রেমকে ধনুকী বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু, আয়তাকার ফ্রেম ধনুকী হতে পারে না, কারণ তাতে প্রয়োজনীয় কম্পন সৃষ্টি হয় না। এ তখনই সম্ভব যদি ফ্রেমটি ধনুকাকৃতি হয়, এবং তার ফলে তুলো না পিটিয়ে আলাগা ও আলাদা করার জন্য এতে কম্পনশীল তারের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য থাকে।[৪৯] বস্তুত, ইতিমধ্যেই দেখান হয়েছে যে অজন্তার ফ্রেস্কোতে প্রদর্শিত যন্ত্রটি প্রকৃতপক্ষে চরকা ছিল, যাতে আয়তাকার ফ্রেম কাজে লাগে।

সুতরাং, খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যেই ভারতে ধনুকীর ব্যবহার ছিল। মোতি চন্দ্র দুটি অভিধানের কথা বলেছেন, *বিজয়ন্তী* (একাদশ শতক) এবং *অভিধানচিন্তামনি* (দ্বাদশ শতক), যেখানে এই যন্ত্রের উল্লেখ মেলে।[৫০] *মিফতাহ্ উল ফুজালা* (পঞ্চদশ শতক) এই যন্ত্রের সর্বপ্রথম বিবরণ ও বর্ণনা দিয়েছে।[৫১] সুতরাং, একথা বলা যায় যে ধনুকী ভারত থেকে অন্য সংস্কৃতিতে ছড়িয়েছে। ইরফান হাবিব ইসলামী বিশ্বে এর পরিচিতির প্রাচীনতম নিদর্শন মাত্র একাদশ শতকে খুঁজে পেয়েছেন।[৫২] চীনদেশে ত্রয়োদশ শতকে তুলোর সাথে এটি গেছে।[৫৩] ইউরোপ সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে এই প্রযুক্তি লাভ করেছে।[৫৪]

আজও ভারতে কার্যত মধ্যযুগের মতই ধনুক-ছিলার ব্যবহার চলে।[৫৫] সংস্কৃত / পালি থেকে হিন্দীতে এটিকে বলে *ধনুকী*, অন্য আরেকটি সংস্কৃত ধাতু *ধু* থেকে *ধনুকম* বা ধুন্না, যার অর্থ বেদমজোরে পেটান, যেমনটি করা হত ধনুক-ছিলা যন্ত্রে।[৫৬]

ধনুকীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল কাঠের হাতুড়ি। *মিফতাহ্-উল ফুজালা-য়* (পঞ্চদশ শতক) *ধনুকীর* সঙ্গে এই হাতুড়িও চিত্রিত ও বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং, খুব সম্ভবত প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রাক্-আধুনিক যন্ত্রশিল্পের দুটি মূল যন্ত্রের কথা জানা থাকায় ভারতে সূক্ষ্মতম সুতিবস্ত্র উৎপাদিত হত। এদুটি হল, (১) আরো

পরিষ্কারভাবে সুতো কাটার জন্য চরকার ব্যবহার, এবং (২) তন্তুর খুব ক্ষতি না করেই তুলো ধুনার জন্য *ধনুকীর* ব্যবহার। এগুলিই পরবর্তীকালে মসৃণভাবে সুতো কাটার জন্য উত্তম মানের অনেক বেশিমাত্রায় তুলোর যোগান দিয়েছিল।

সুতোকাটার প্রধান হাতিয়ার ছিল তকলি। সিন্ধুসভ্যতার বিভিন্ন এলাকায় অগণিত পাওয়া যাওয়ায় এর প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়।[৫৮] এগুলি পাওয়া গেছে কখনও একটি ছিদ্রসহ, কখনও দু'-তিনটি ছিদ্রসহ ভাঙা তকলির জন্য, এবং কয়েকটির ধার খাঁজকাটা যা সম্ভবত সুতোর ঘর্ষণের সময় কাজে লাগত।[৫৯]

এটি এক প্রকারের দেশীয়, বহুব্যবহৃত সাধারণ যন্ত্র ছিল। যাঁতা ব্যবহার করে তকলিতে শান দেওয়া হত।[৬০] মধ্যযুগে সর্বদাই তকলির ব্যবহার প্রচলিত ছিল,[৬১] এবং সূক্ষ্মভাবে সুতোকাটার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ঢাকা জেলায় প্রস্তুত 'গ্যাঞ্জেটিক' নামে সুবিদিত সূক্ষ্ম মসলিনের খ্যাতি থেকে প্রমাণিত হয়।[৬২] প্রাচীন ভারতের কিংবদন্তীসম মসলিনে ব্যবহৃত হত অতিসূক্ষ্ম সুতো।[৬৩] এধরণের অতিসূক্ষ্ম সুতো কেবল সবচেয়ে, হাল্কা তকলি ব্যবহার করেই তৈরি করা সম্ভব,[৬৪] পরবর্তীকালের চরকায় এধরণের সুতো কাটা সম্ভব হত না।[৬৫]

প্রাচীন ভারতে চরকার অস্তিত্বের সপক্ষে কোন প্রমাণ আমরা পাইনি। জে.মার্শাল একটি লৌহ-অক্ষের বিদ্যমানতাকে চরকার অস্তিত্বের স্বাক্ষর ধরে নিয়েছিলেন।[৬৬] কিন্তু, তার জিজ্ঞাসা এমনকি সহমতবাদীর মনেও সন্দেহ সৃষ্টি করে। মহিলারা সুতো কাটলেও তারা ঠিক কিভাবে সুতো কাটতেন তার উল্লেখ নেই।[৬৭] লিন হোয়াইট সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে প্রাচীন ভারতে চরকা ছিল না।[৬৮] এটি বেশ বড়সড় এক ধরণের অভাব ছিল। তাই, আমরা যেহেতু জানি যে ভারতীয়রা সবচেয়ে তাড়াতাড়ি এবং দক্ষ ভাবে বীজ থেকে তুলো ছাড়াতে জানতেন, সেখানে এধরণের দ্রুত সুতো কাটা যন্ত্রের (অর্থাৎ চরকার) অনুপস্থিতি বস্ত্র উৎপাদনের দ্রুততার পক্ষে বাধা ছিল। চীনদেশে পশ্চিম হান বংশের (২০৬ খ্রি.পূ. — ২৪ খ্রি.) শাসনকালে চরকা ও তার বেল্ট-লাগান পদ্ধতিতে শক্তি-উৎপাদন, ফ্লাইহুইল ও অন্যান্য ঘূর্ণন গতির জন্ম হয়েছিল।[৬৯] নীডহ্যাম আবিষ্কার করেছেন যে, ১০৩৫ খ্রিস্টাব্দের চীনেই এর ছবি আঁকা হয়েছে।[৭০] ইসলামী বিশ্ব এটি পেয়েছে দ্বাদশ শতকে।[৭১] আহমদ জে. আল. হাসান ও ডোনাল্ড ই. হিল বলেছেন যে আরবরা খ্রিস্টীয় দশম শতকে ইউরোপে চরকার প্রচলন করে,[৭২] এবং একই সঙ্গে এর পরিচিতি সম্পর্কে তারা নিঃসংশয় হতে পারেননি, কেননা তারা এও বলেছেন যে এটি রেশমী সুতো বিশিষ্ট, বহু-তকলি যন্ত্র যা প্রক্ষেপণ ও মোচড়ানোর কাজ করে।[৭৩] তবে, চরকার (*চরখা*, আক্ষরিক অর্থে চাকা) পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে আনওয়ারি (১১৩৮-৯), নিজামী (মৃত্যু ১১৯৯-১২০০) এবং সাদী (১২৫৭) প্রমুখ ফার্সি কবিদের রচনায়।[৭৪] সুতরাং, ইরফান হাবিবের মতে দ্বাদশ শতকে চরকা ইসলামী বিশ্বে পৌঁছেছিল,[৭৫] অর্থাৎ ইসলামী জগতই বহির্বিশ্বে সর্বপ্রথম তার এই অপূর্ব আবিষ্কারটি গ্রহণ করেছিল।[৭৬] পরবর্তীকালে, এটি ত্রয়োদশ শতকে ইউরোপে গেছে, লিন হোয়াইট জুনিয়র ১২৮০

সালে স্পায়ারে (Spyer) প্রথম এর সন্ধান পেয়েছেন এবং তার ভিত্তিতে তিনি ধরে নিয়েছেন যে এটি ইউরোপের আবিষ্কার।[৭৭] বর্তমানে উপরি-উক্ত আলোচনার আলোকে মনে হয় যে ইউরোপ এটি ইসলামী জগতের মাধ্যমে লাভ করেছে,[৭৮] এবং যদি ভারতের কথা ধরা হয়, তবে সে এটি সম্ভবত ইসলামী উৎস থেকেই পেয়েছে।[৭৯] ইরফান হাবিব এর প্রাচীনতম উল্লেখ পেয়েছে ইশামী'র *ফুতুহ্-উস সালাতিন* (১৩৫০)-এ।[৮০] *মিফ্তাহ্-উল ফুজালা*-য় (১৪৬৮-৬৯) চাকার সাহায্যে সুতো কাটার কথা বলা হচ্ছে।[৮১] *মিফতাহ্-উল ফুজালা*-য় চরকার একটি ছবি আছে, যেটি সম্ভবত ভারতে এটির পয়লা তসবির, যদিও চিত্রটি খুব পরিষ্কার নয়।[৮২] পরবর্তীকালে বিভিন্ন চিত্রণ ও বিবরণে চরকার ব্যবহার বর্ণিত হয়েছে।[৮৩]

সুতরাং, খুব সম্ভবত, কার্পাস তন্তুর দ্রুত উৎপাদন ও *ধনুকী*-র সাহায্যে তুলোধুনা এবং তকলি-র সাহায্যে মন্থরতর সুতো কাটার মধ্যে যে ফাঁক তৈরি হয়েছিল, প্রাক্-আধুনিক ভারতীয় প্রযুক্তিতে সেই স্থান পূরণ করল চরকার আগমন।

কাপড় বোনার আগের মধ্যবর্তী পর্যায় সম্পর্কেও কিছু তথ্য প্রমাণ রয়েছে। সুতো কাটা হয়ে গেলে তা নাটাই বা কাটিমের গায়ে জড়ান হত। *মিফতাহ্-উল ফুজালা*-য় এর ছবি দেওয়া হয়েছে এবং এটিকে একটি কাঠের যন্ত্র বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাতে কার্পাস বা রেশমের সুতো জড়ান থাকে।[৮৪] এব হিন্দী প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে *পরেত্তি*।[৮৫] এরপর নাটাই বা কাটিম থেকে জড়ান সুতোকে আলগাভাবে খুলে নেওয়া হত। একে হিন্দীতে *আটে* বলা হয়ে থাকে।[৮৬] ষোড়শ শতকের শেষভাগের একটি ছবিতে দেখান হচ্ছে যে কাপড় বোনার আগে রঙে চুপিয়ে নেওয়ার জন্য গোল মালার আকারে সুতো জড়ো করা হচ্ছে।[৮৭] *মিফতাহ্-উল ফুজালা*-য় বিবরণ দেওয়া হয়েছে যে মাকুতে ব্যবহার করার জন্য পড়েনের নাটাই বা কাটিমে সুতো জড়ো করা হচ্ছে। এর প্রাচীন অব্যবহৃত নামটি হল *জগুন*, এবং মধ্যযুগের ভারতে *মশোরা* নামটি চালু ছিল।[৮৮] আবার, *মিফতাহ্-উল ফুজালা-য়* পড়েনের নাটাইকে 'সুতো' বলে বলা হয়েছে, যা মহিলারা ডিমের আকারে তকলিতে জমা করেন।[৮৯] মধ্যযুগের শেষভাগেও এরকম চলত।[৯০] সুতো গোটান হয়ে গেলে তা মাকুতে পাঠান হত।[৯১]

এরপর আসত টানা সুতোকে গোটানর পালা। জিয়াউদ্দিন নকশ্‌বি'র *তুতিনামা*-য় (১৫৮০-৮৫) এটি দেখান হয়েছে।[৯২] কাপড় বোনার সময় ঘর্ষণ কমানর জন্য এবং সুতোর ক্ষতি কম করার জন্য টানাসুতোকে ছেঁটে নেওয়া হত। *মিফতাহ্-উল ফুজলা*-য় টানাসুতোকে ছেঁটে নেওয়ার কথা বলা আছে।[৯৩] বর্ণনার সঙ্গে দেওয়া আছে।

তাঁতীর বুরুশকে ফার্সিতে বলা হত সিমা, মালা এবং এর হিন্দী প্রতিশব্দ হল কুঞ্চি।[৯৫] ষোড়শ শতকের একটি ছবিতে এটি দেখান হয়েছে।[৯৬] এভাবে আমরা মধ্যবর্তী পর্যায়টির হিন্দী প্রতিশব্দগুলি পেলাম। মুসলমানদের আগমনের আগেই এই বিষয়ে ভারতীয়দের জ্ঞান থাকার জন্যই এটি সম্ভব হল। টানা-র জন্য শঙ্কু - আকৃতির

সুতোর গুলির উল্লেখ এখানে আমরা পাই না। ১৪২১ সালের একটি ইতালীয় পান্ডুলিপিতে বলা হয়েছে ইতালীয় তাঁতীরা বারটি পর্যন্ত এইরকম সুতোর গুলি নিয়ে টানা-র কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলেন।[৯৭]

একথা বলা শক্ত যে কবে তাঁতীরা তাদের বোনা কাপড়ে নকশা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার সুতিবস্ত্র এতটাই ঘন বুনটের যে তা তাঁত ভিন্ন অন্য কিছুতে উৎপাদন করা সম্ভব ছিল না।[৯৮] পাণিনির (খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতক) রচনায় তাঁতের উল্লেখ রয়েছে, যিনি তাঁত বোঝাতে *তন্ত্র* এবং মাকু বোঝাতে *প্রবণী* শব্দদুটি ব্যবহার করেছেন। তিনি তার *ভাষ্য*-তে বলেছেন যে টানা সুতো টেনে রেখে তার মধ্য দিয়ে মাকুর সাহায্যে পোড়েন চালনা করা হত, *'অস্তিরনম তন্ত্রম, প্রোতম তন্ত্রম'*।[৯৯] তবে, এর থেকে তাঁতের প্রকৃতি ঠিক বোঝা যায় না। প্রাচীনতম তাঁত সম্ভবত আনুভূমিক হত। উইলহেলম রাউ অথর্ব বেদে এর বিবরণ খুঁজতে চেয়েছেন।[১০০] প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে সরল আনুভূমিক তাঁতের প্রচলন ছিল।[১০১] দ্বাদশ শতকের শেষভাগের মধ্যে দক্ষিণ ভারতে সরল উলম্ব তাঁতের প্রচলন শুরু হয়েছিল। ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দের একটি লেখতে ঘরের ছাদের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা তাঁতের উল্লেখ আছে।[১০২] এভাবে প্রাচীন ভারতে তাঁতীরা সরল আনুভূমিক ও উলম্ব তাঁতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ — পাদানি, যার সাহায্যে টানা সুতো উঁচু নীচু করা হত, তা পরবর্তীকালে সংযুক্ত হয়েছে। প্রাচীনতর ভারতীয় সাহিত্যে আমরা এর উল্লেখ পাই না।[১০৩] প্রাচীন ভারতে এই যন্ত্রের প্রচলন ছিল না। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে চীনে এই ধরণের পাদানির প্রচলন ছিল।[১০৪] প্রাচীন মিশরে এবং ধ্রুপদী জগতে এটি অপরিচিত ছিল।[১০৫] ইউরোপ সম্ভবত দ্বাদশ শতকে আনুভূমিক তাঁতের সঙ্গে পাদানি লাভ করেছিল,[১০৬] কেননা, যখন থেকে ইউরোপ পাদানি'র কথা জানে তখন থেকে আনুভূমিক তাঁতের কথাও জানত।[১০৭] ইসলামী জগতের সাথে এর পরিচিতির সময়কাল নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।[১০৮] ভারতে সম্ভবত এর সবচেয়ে পুরনো প্রমাণ মিলেছে মওলানা দাউদের দ্বারা জনৈক তাঁতীর দক্ষতা বর্ণনা প্রসঙ্গে। তিনি লিখছেন, 'তাঁতীর পেশার (পারঙ্গমতা) দিকে চেয়ে দেখ, [যখন] তার হাতদুটো উঠেযায়, [তার] পাদুটো মাটি ছোঁয় না'।[১০৯] সম্ভবত পাদানির ওপরে পাদুটো থাকার জন্যই এমনটা হত। এভাবে খুব সম্ভবত ত্রয়োদশ - চতুর্দশ শতকে ভারতে এর ব্যবহার চালু হয়। পরবর্তীকালে, শদিয়াবাদী (১৪৬৮-৬৯) একে লৌহ-পায় (আকরিকঅর্থে পাদানি) অর্থাৎ 'কাপড় বোনার সময় যে কাঠের তক্তার ওপর তাঁতী পাদুটো রাখে' বলে বর্ণনা করছেন।[১১০] এই ফোলিওতে একটি ছবিতে এই পাদানিকে দেখান হয়েছে।[১১১] এভাবে, এই পরিবর্তনটি সাধারণ আনুভূমিক তাঁতের উন্নতি ঘটিয়েছিল। ষোড়শ শতকের শেষভাগের একটি মিনিয়েচারে, "ইদ্রিস মানবজাতিকে কাপড়বোনা শেখাচ্ছেন", এটিকে দেখান হয়েছে।[১১২] সপ্তদশ শতকের একটি মুঘল মিনিয়েচারে সন্ত কবীর জোলাকে চিত্রণ করার মধ্য দিয়ে আরও ভালভাবে তা প্রমাণিত হয়।[১১৩] ঐ সময়ের মধ্যে

ভারতীয় তাঁতীরা এই কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। পঞ্চদশ শতকে রচিত প্রাচীনতম বিবরণের পূর্বেই মনে হয় তাঁতের পাদানি সর্বসাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্ভবত, চীন থেকে ইসলামী জগতের মারফৎ ভারতে পাদানি এসে পৌঁছেছিল।[১১৪] এও সম্ভব যে এটির আগমনের সময়কালের সঙ্গে চরকার আগমনকাল মিলে যায়, যার আগমনও হয়েছিল ত্রয়োদশ - চতুর্দশ শতকে; কিন্তু কোন সুস্পষ্ট প্রমাণের অভাবে এটি জল্পনার স্তরেই থেকে যায়। যেসময়েই এই উন্নতি ঘটে থাকুক, এর দ্বারা তাঁত চালনা, মাকুর প্রয়োগ ও তুলো ধুনা এই তিনটি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি ঘটেছিল, যা উল্লেখনীয় ভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে এবং একই সঙ্গে উৎপাদিত বস্ত্রের গুণমান বৃদ্ধি করেছিল।

তবে এধরণের উন্নতির পাশাপাশি সম্ভবত ভারতীয় আনুভূমিক তাঁত সরল প্রকৃতিরই থেকে গিয়েছিল, কারণ এতে কিছু কার্যকরী প্রকৌশলের অভাব ছিল। প্রথমত, ভারতীয় আনুভূমিক তাঁতে সম্ভবত এমন কোন লিভার সংযুক্ত বা বিকশিত হয়নি, যার দ্বারা টানা সুতো পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে এবং বোনা কাপড় বস্ত্রদন্ডের গায়ে জড়িয়ে যায়।[১১৫] তবে এ বিষয়টি কোন প্রকৌশলকে প্রত্যাখ্যান করা নাও হতে পারে। এই অভাব পূরণ করা হত তুলনামূলকভাবে কম দক্ষ দেশীয় পদ্ধতির দ্বারা, যেখানে তাঁতীর এক দিকের (বামদিকের) দন্ডটির গায়ে আটকানো একটি কীলকের সাথে দড়ি বেঁধে তাঁতী টানা সুতোকে নিজের কাছে নিয়ে আসতেন। পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ শতকের প্রাপ্ত সব ভারতীয় আনুভূমিক তাঁতের ছবিতেই এটিকে দেখান হয়েছে।[১১৬] দ্বিতীয়ত, আমরা দুটির বেশি পাদানি বা সমহারে বেশি সংখ্যক উল্লম্বদড়ি ব্যবহারের কথা জানতে পারি না। ইউরোপে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দেই এধরণের আনুভূমিক তাঁতের ব্যবহার ছিল।[১১৭] এটি খুবই সম্ভব যে বেশি সংখ্যক উল্লম্বদড়ি এবং পাদানির অনুপস্থিতি নকশা-বুনটের বৈচিত্র যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছিল। ভারতীয় আনুভূমিক তাঁতে আরেকটি অনুপস্থিত বিষয় ছিল দুটি কীলকের অনুপস্থিতি, যার উপরে টানা সুতোর দন্ডটি রাখা থাকত। তার বদলে, একটি কীলকের উপর দন্ডটি থাকত। এর পাশাপাশি, কোন বর্ণনাতেই আমরা টানার জন্য কোন ধরণের pulley বা কপিকল দেখতে পাই না। ইউরোপে বোপার্ড (রাইনল্যান্ড) এলাকায় ত্রয়োদশ শতকের ভিতরে কপিকলের বদলে পাদানির সঙ্গে সংযুক্ত এবং মাথার উপর দিয়ে টানা একটি তারের ব্যবহার শুরু হয়।[১১৮] এভাবে, যখন স্বয়ংক্রিয় ভাবে চালিত যন্ত্রের ব্যবহার চালু হতে পারত, সে সময় সেই সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করা যায়নি। সুতরাং, ভারতীয় আনুভূমিক তাঁতের অনতি-অগ্রসর প্রকৌশল সম্ভবত কিছু সীমিত প্রভাব রেখেছিল এবং সম্ভবত বস্ত্র উৎপাদনের দ্রুততার সম্ভাবনাকে রোধ করেছিল। ভারতীয় আনুভূমিক তাঁতের এসব সীমাবদ্ধতার কথা জানলেও ভারতীয় তাঁতীরা নিগূঢ়তম কৌশল প্রয়োগ করে তুলো বাঁচিয়ে এই তাঁতেই বেশি প্রস্থের কাপড় বুনে দিতেন। টানা সুতোকে চালনা করার জন্য যে কাঠিগুলি ব্যবহার করা হত, তার নির্মাণে কারচুপি করে এটি করা সম্ভব হয়েছিল। জর্জ রোকে (১৬৭৮-৮৬) আমাদের জানাচ্ছেন যে তাঁতীরা চার ধরণের শলাকা বা কাঠি ব্যবহার

করতেন। প্রথমটিতে সমান ফাঁক দিয়ে সুতো থাকত, দ্বিতীয়টিতে মধ্যখানে ফাঁক রাখা হত, তৃতীয়টিতে দ্বিতীয়টির তুলনায় দ্বিগুণ ফাঁক রাখা হত, এবং চতুর্থটিতে পুরো এক বিস্‌সা (একশো ষাট সুতো) বাদ রাখা হত।[১১৯]

এমন একটি মতবাদ আছে যে একাদশ শতকেই ভারতীয়রা টানা-তাঁত বা নকশা বোনা-তাঁতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।[১২০] কিন্তু এই তথ্যপ্রমাণের দ্বারা টানা তাঁতের উৎস খুঁজে বার করা কঠিন। *অচ্চুতরি* — এই যৌগিক শব্দটি দেখে বিজয়া রামস্বামী টানা-তাঁতের প্রতি নির্দেশ করেছেন। এও হতে পারে যে এর দ্বারা এমন একটি তাঁতযন্ত্র বোঝায় যেখানে আরও নিবিড়ভাবে টানা সুতোকে নিয়ন্ত্রণ করতে বেশি সংখ্যায় চটকদার বুননের জন্য তাঁতে বেশি সংখ্যায় একাদশ শতকে, মুসলিমদের আগমনের পূর্বেই ভারতীয়রা টানা- তাঁতের সঙ্গে পরিচিত থাকলে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে তন্তুবায় সমিতি এ সিদ্ধান্ত নিতেন না যে 'এই পদ্ধতিতে তাঁতবোনা কেবল মুসলমানদেরই করা উচিত'।[১২৩] তার পরিবর্তে তারা 'তাঁত বোনার জন্য প্রদত্ত জমি থেকে আর্থিক আদায় করার ....' অধিকারী ছিলেন।[১২৪] এই নিয়মটি শুধু এর প্রচলনকেই নিষিদ্ধ করেনি, সমগ্র দক্ষিণ ভারতে দেশীয় তাঁতীরা নিয়মের অন্যথা করলে নির্দিষ্ট হারে জরিমানা ও শাস্তির বন্দোবস্ত করেছিল।[১২৫] এ সব থেকে মনে হয় যে টানা - তাঁত ও তার বিশেষ প্রকৌশল তখন সবেমাত্র এসে উপস্থিত হয়েছিল, যেটি এসেছিল মুসলমানদের সঙ্গে। সুতরাং, এই বস্তুটি নতুন তন্তুবায় শ্রেণীকে আকৃষ্ট করেছিল এবং ক্রমবর্ধিত চাহিদা মেটাতে উৎপাদন বৃদ্ধি করেছিল। আবুল ফজল বলছেন যে আকবরের জমানায় আকবর বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে অভিজ্ঞ কারিগরদের দ্বারা রাজকীয় কারখানায় অসাধারণ বৈচিত্রের ও মনোহর জমিনের গালিচা নির্মাণ করাতেন।[১২৬] এর প্রধান কেন্দ্রগুলি আগ্রা,[১২৭] ফতেপুর,[১২৮] জৌনপুর,[১২৯] জাফরাবাদ,[১৩০] আলোয়ার[১৩১] এবং লাহোরে[১৩২] অবস্থিত ছিল। তুলনামূলকভাবে নতুন এই প্রকৌশলের আমদানি এবং নানাস্থানে এর দ্রুত বিস্তার থেকে মনে হয় যে এই পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই যুক্তিপূর্ণ ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় যখন ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে স্ট্রেইনশ্যাম মাস্টার অন্ধ্রপ্রদেশের এল্লুর অঞ্চলে উলম্ব তাঁতে গালিচা বুনন (রোঁয়াযুক্ত গালিচা বুনন) প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেখানে কাগজের উপর আঁকা নকশা অনুযায়ী রঙীন পশমী সুতো দিয়ে বুনে দেওয়া হচ্ছিল।[১৩৩] তার অভিমত ছিল এই যে এই শিল্প একশো বছর আগে ইরানী অভিবাসীরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ থেকে এই ধারণা সমর্থিত হয় যে পূর্বে উল্লেখিত প্রকৌশলটি (১৫৫৮) তখন সবেমাত্র আমদানি করা হয়েছিল এবং সম্ভবত এর দ্বারা উলম্ব তাঁতে রোঁয়াযুক্ত গালিচা বুননকে বোঝাত। '............... And every thread being wrought, they it with a pair of sizers, and then proceed to the next'[১৩৪] — তার এই বর্ণনানুযায়ী মিলটি আরও নিশ্চিতভাবে বোঝা যায়। রোঁয়াযুক্ত গালিচা বোনার সময় প্রতিটি সুতোর প্রান্তে শক্ত করে গিঁট বাঁধার পর ছেঁটে দেওয়ার এই প্রকৌশল[১৩৫] একটি ইরানী বুনন-প্রকৌশল, সুতরাং, এই প্রকৌশলগুলি ষোড়শ শতকে আমদানি করা হয়েছিল।

অন্য যে অঞ্চলটিতে পঞ্চদশ - ষোড়শ শতকে ইরানী প্রকৌশল এসে থাকতে পারে, তা হল কাশ্মীর। জয়নুল আবেদিনের শাসনকালে (১৪৫৯-৭০) মৌলিক কারুকার্যের কাজে পারঙ্গম বহুসংখ্যক কারিগর, কাশ্মীরে এসে পৌঁছন।[১৩৬] কাশ্মীরিরা মাকু (*তুরি*) এবং তাঁতের (*বেমা*) সূক্ষ্ম বিষয়গুলি রপ্ত করে নেন এবং সুন্দর ও মহার্ঘ রেশম বুনতে থাকেন।[১৩৭] 'কাশ্মীরিরা বিদেশী ধরণের বিশেষ পশমী বস্ত্র বুনতেন'।[১৩৮] 'চিত্রকররা সূক্ষ্ম বুনন প্রক্রিয়াজাত (*বিচিত্র্যায়ন*) নকশা (*চিত্র*) ও লতাপাতার কারুকার্য (*লতাকৃতিঃ*) দেখে চিত্রার্পিতের মত স্তব্ধ হয়ে যেতেন'।[১৩৯] কিন্তু, তাঁতের বিবরণ দেওয়া হয়নি। হতে পারে এ হল ১৮২২ সালের মুরক্রফট ও ট্রেবেকের ধ্রুপদী রচনায়, বর্ণিত তাঁতের উল্লেখ।[১৪০]

বোনা কাপড়ে কোন প্রকার রং করার আগে তাকে ধোয়া ও সফেদ করে তোলা হত।[১৪১] তাভারনিয়ে (১৬৬৭) সুতিবস্ত্রের শুভ্রতা বৃদ্ধি করতে লেবুর ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছেন।[১৪২] রোকে তার বিবরণে 'অর্ধ-ব্লিচিং'-এর উল্লেখ করেছেন।[১৪৩] অন্যত্র তিনি পরামর্শ দিয়েছেন ফাঁকফোকর ভরাট করে থাকা ছাঁটগুলি দূর করার জন্য কাপড়কে ধুয়ে ফেলতে। তিনি বলছেন যে, মোটা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে কাপড়টিকে পেটানর ফলে এর (*কঞ্জি*) দানাগুলো ভেঙে গিয়ে ছাঁটের সঙ্গে দানা বেঁধে যায়, এবং এভাবে 'কাপড়ের অবয়ব গড়ে ওঠে'।[১৪৪]

কাপড় ধোয়া ও সফেদ করার পর নানা উপায়ে কাপড়ে রং দেওয়া হত। এর মধ্যে কাপড় ছাপাই সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতে মৃত্তিকা নির্মিত শীলমোহরের আবিষ্কার থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ কাপড় - ছাপাইয়ের ইতিহাস অনেক পুরনো বলে ধার্য করেছেন। এ. কে. কুমারস্বামী খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের পূর্বের একটি মাটির ব্লকের সন্ধান পেয়েছেন।[১৪৫] জন মার্শাল একটি মাটির শীলমোহর পেয়েছেন, যেটি সম্ভবত সিরকাপ অঞ্চলের দ্বিতীয় তৃতীয় স্তরে (৯০ খ্রি.পূ. — ২৫ খ্রিস্টাব্দ) কাপড়ের ওপর ছাপ মারতে ব্যবহৃত হত।[১৪৬] আর. সি. গৌর অত্রন্‌জিখেরার একটি পোড়ামাটির ছাঁচকে ছাপাই - ব্লক বলে মনে করেছেন; এটি মিলেছে উত্তরের মসৃণ কৃষ্ণ মৃৎপাত্রের (NBP) স্তরে, যা খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতকের।[১৪৭]

তবে, কিছু মাটির ছাঁচকে ছাপাই - ব্লক হিসাবে চিহ্নিত করাতে সন্দেহ রয়ে গেছে। প্রথমত এবিষয়টি ভেবে দেখা হয়নি যে কোন শক্ত তলের ওপর চাপ দিয়ে ছাপতে গেলে 'পোড়া মাটির' উপরিতলে তার ছাপ রয়ে যাবে। কোন মাটির শীলমোহরই কাপড়-ছাপাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় বলে শোনা যায় না। রোকে সপ্তদশ শতকের ভারতে কাপড়-ছাপাইয়ের বিবরণে কেবল কাঠের ব্লকের উল্লেখ করেছেন।[১৪৮] আলাদা আলাদা ভাবে নিদর্শনগুলি শনাক্তকরণও অসম্ভব করে তোলে। সুতরাং, অত্রন্‌জিখেরার 'ছাপাই-ব্লক' শীলমোহর নয়, ছাঁচ মাত্র; অর্থাৎ, এর ভিতরে এক ধরণের নকশা রয়েছে যা থেকে নরম পদার্থের ওপর ছাপ তোলা যেতে পারে। বস্তুত গৌর ঐ নিদর্শনগুলি দ্বারা 'বাড়ির মাটির দেওয়ালের .... ওপর নকশা' করার সম্ভাবনার কথা

স্বীকার করে নিয়েছেন।[১৪৯] যদিও বিস্ময়করভাবে তিনি ছাঁচের অভ্যন্তরের ছাঁচ-সদৃশ গর্তগুলির বিষয়ে পাঠকদের সামনে কোন বক্তব্য তুলে ধরেননি। একইভাবে, তক্ষশীলার 'ব্লকগুলির' ক্ষেত্রেও ছাপাইয়ের কাজে সেগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল কিনা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে সেগুলিকে ভালভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত।

ফোর্বস মনে করেছেন যে ব্লক-ছাপাইয়ের জন্ম প্রাচীন ভারতে।[১৫০] কিন্তু তার ধারণার সমর্থনে কোন তথ্য প্রমাণ নেই। তবে বাণভট্টের *হর্ষচরিতে* (খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক) একটি বিতর্কিত বাক্য রয়েছে, সেটি হল *কুটিল ক্রম রূপক্রিয়মান পল্লবপ্রভাগৈ...*।[১৫১] পি. ভি. কানে এটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ রঞ্জিত, শুষ্ক বস্ত্রের উপর নানাধরণের উদ্ভিদের ছবি আঁকা হল। ছবিগুলি অতি সুন্দর (*প্রভাগ*)। ছবিগুলি বস্ত্রের অভ্যন্তরভাগে আঁকা হয়েছে, সেই অর্থে প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীতে (*কুটিল ক্রম*) সেগুলি সজ্জিত, যাতে করে বাইরে থেকে (দর্শকের চোখে যেমন দেখাবে) অতিসুন্দর 'পল্লব' গুলিকে তাদের স্বাভাবিক রূপে দেখায়।[১৫২] এভাবে ব্যাখ্যা করলে এই গ্রন্থ থেকে ব্লক-ছাপাইয়ের ধারণা সমর্থিত হয় না, কেননা যেকোন কারুকার্য বা চিত্রণই বস্ত্রের ভিতর দিকে। তবে, কানে'র নিজেরও এই অংশটির স্বয়ংকৃত অনুবাদ নিয়ে সংশয় রয়েছে।[১৫৩] ভি. এস. অগ্রবাল ভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন এবং বলেছেন যে প্রথম দুটি শব্দ (*কুটিল ক্রম*) বঙ্কিম নকশার দ্যোতক। এটি হয়ত কৌণিক বিন্যাসকেও বুঝিয়ে থাকতে পারে, একটি কোণ থেকে বিপরীত কোণের দিকে বিন্যস্ত আলংকারিক বিন্যাস, যেমন আমরা অজন্তার একটি ম্যুরালে অঙ্কিত বস্ত্রের উপর দেখতে পাই।[১৫৪] পরের শব্দটি, *রূপ*, পাণিনির সময় থেকেই 'প্রতীক', 'কারুকার্য', 'অবয়ব', এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, এবং অগ্রবালের মতে এক্ষেত্রেও এই অর্থে শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। তিনি পাণিনির *রূপদ অধাতপ্র সংসায়োর—জপ* শব্দগুলির উল্লেখ করেছেন, যেখানে *রূপ* শব্দটি পরিষ্কারভাবে ধাতব খণ্ডের উপর প্রতীক অঙ্কন করা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।[১৫৫] এভাবে প্রতীক অঙ্কনের প্রসঙ্গ থাকাতে অগ্রবাল মনে করেছেন যে হর্ষের সময় ব্লক-ছাপাই ছিল।[১৫৬] বাণের রচনার ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, মনে হয় যে সম্ভবত দশম-একাদশ শতকে ভারতে ব্লক-ছাপাই শুরু হয়েছিল।[১৫৭] ষোলটি অ্যাশমোলীয় (Ashmolean) নিদর্শনের মধ্যে দুটির রেডিওকার্বন পরীক্ষার ফল থেকে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে ভারতে ব্লক-ছাপাই করে কাপড় তৈরি হত এবং দশম-একাদশ শতকে তা মিশরে রপ্তানি করা হত।[১৫৮] অন্যত্র *মানসোল্লাস* গ্রন্থে (দ্বাদশ শতক) উল্লেখিত একটি 'যন্ত্রের' কথা আলোচিত হয়েছে।[১৫৯] কিন্তু শব্দটি একজন কারিগরকে বুঝিয়েছে মাত্র। দেশীয় শব্দের একটি দ্বাদশ শতকীয় অভিধান, ধনমাল রচিত *পৈয়ালাচ্চি*, তাতে মোতি চন্দ্র এক বিশেষ ধরণের সুতিবস্ত্রের (calico) কারিগরের (*চিম্পককারুবিশেষঃ*) পেশা বলতে উম্পো শব্দটি পেয়েছেন।[১৬০] একই গ্রন্থে মোতি চন্দ্র সুতিবস্ত্র নির্মাতা বলতে *চিম্পাও* বা *চিম্প* শব্দটি পেয়েছেন, যার

থেকে আধুনিক *চিপ* বা *চিপি* শব্দের জন্ম হয়েছে।[১৬১] হেমচন্দ্রে *দেশীনামমালা* গ্রন্থে *চপ্পাত্তি* শব্দের দ্বারা এমন এক প্রক্রিয়াকে বোঝান হয়েছে যার দ্বারা পদ্মের নকশা (*নিয়মবিশেষঃ যত্র পদ্মন লিখ্যতে*) করা হয়।[১৬২] চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে কিছু শব্দের ব্যবহার ছিল, মহিলা সুতিবস্ত্রের কারিগর বোঝাতে *চিম্পক* এবং পুরুষ সুতিবস্ত্রের কারিগর বোঝাতে *চিপ* শব্দদুটি ব্যবহৃত হত।[১৬৩] বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে এই শব্দগুলির ব্যবহার দেখে মনে হয় যে দশম-একাদশ শতকেই ভারতে ঐ বিশেষ ধরণের সুতিবস্ত্র তৈরি হত। ইরফান হাবিব বলেছেন যে চতুর্দশ শতকের মধ্যেই ভারত কাপড় ছাপাইয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে পড়েছিল।[১৬৪] এখানে মনে রাখতে হবে যে অ্যাশমোলীয় সংগ্রহশালার নিউবেরি সংগ্রহের ষোলটির মধ্যে চোদ্দটি নমুনা ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যেকার। মধ্যযুগে বারংবার এর উল্লেখ করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকে *বহর-ই আযম চপা* শব্দের উল্লেখ করেছে।[১৬৬]

ভারতীয় বস্ত্র-ছাপাইয়ের ক্ষেত্রে জটিল সংমিশ্রণ ঘটেছিল, যা একে চীনা কালি-লাগান শীলমোহর (চতুর্দশ শতক) এবং পঞ্চদশ শতকের ইউরোপের ব্লকের সাহায্যে রং লাগানর পদ্ধতি থেকে পৃথক করেছিল।[১৬৭] ইরান সম্ভবত ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে এটি আয়ত্ত করে, যখন থেভেনো (১৬৫২) ইস্পাহানে কাপড় ছাপাইয়ের উল্লেখ করছেন।[১৬৮] বর্তমানেও মূল রূপে এই পদ্ধতি চালু আছে।[১৬৯]

কাপড়ে রং করার সহজতম উপায় হল তাকে রঙে চোবান। *মিফতাহ্-উল ফুজালা*-য় রংরেজের উল্লেখ রয়েছে। সঙ্গের একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে জনৈক রংরেজ কাজ করছেন, তার সামনে দুটি চৌবাচ্চা এবং পিছনদিকে রংকরা কাপড় মেলে শুকনো হচ্ছে।[১৭১]

সহজভাবে রঙে চোবান ছাড়াও অন্য নানাভাবে রং করা হত, যেমন বাঁধনি প্রক্রিয়ায়, '*বন্ধন*' বা গুলবন্দ কাপড়ে গিঁট দিয়ে রংকে শুধু নির্দিষ্ট নকশা অনুযায়ী ছড়াতে দেওয়া; ছাপাই ব্লকের ব্যবহার (পূর্বেই আলোচিত হয়েছে); এবং পেন্সিলের (কলমকার) সাহায্যে ছবি এঁকে।

এইসব প্রকৌশলের মধ্যে 'বাঁধনি' বা গিঁটবেঁধে রং করার পদ্ধতি (*বন্ধন*, ইংরেজি কায়দায় 'bandanna')[১৭২] প্রাচীনকাল থেকে ভারতে চলে আসছে। *হর্ষচরিতে* (সপ্তম শতক)[১৭৩] দুবার এর উল্লেখ রয়েছে। মোতি চন্দ্র দ্বাদশ শতকের একটি রচনা *মানসোল্লাস*-এ এর উল্লেখ খুঁজে পেয়েছেন।[১৭৪] আকবরের কারখানাগুলিতে যেসব বস্ত্রের নির্মাণ অগ্রগতি লাভ করেছিল তার মধ্যে আবুল ফজল বন্ধনুন-এর উল্লেখ করেছেন।[১৭৫] *বহর-ই আযম* (১৭৪০)-এ এটিকে *গুলবন্দ* বা *গুলবন্দি* বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 'গুলবন্দ এমন এক ধরণের বস্ত্র, যা সুতো দিয়ে বাঁধার পর রং করে তৈরি করা হয়, এবং ভারতীয় ভাষায় একে বলে *বন্ধনুন*'।[১৭৬] মির্জা তাহির ওয়াহিদের একটি কবিতা উল্লেখ করা হয় যেখানে তিনি *বন্দন* বা *গুলবন্দের* ছোপের (*দাগ*) সঙ্গে ছিটকাপড়ে (*চিট*)

শিল্পীর আঁকা নকশার তুলনা করেছেন।[১৭৭] ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দের একটি উদ্ধৃতিতে ইউল ও বার্নেল 'bandannoes' শব্দের উল্লেখ দেখিয়েছেন, যা অবধারিতভাবে *বন্ধনুন* ও আধুনিক ইংরেজি 'bandanna'-র মধ্যবর্তী রূপ।[১৭৮] এর প্রয়োগ আধুনিক কালেও চলে আসছে।[১৭৯]

নকশার মধ্যেই রংকে সীমাবদ্ধ রাখতে ভারতীয় বস্ত্র কারিগররা রজনের ব্যবহার[১৮০] এবং রং ধরার জন্য mordants ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।[১৮১]

নকশা বোনার জন্য আগে থেকেই সুতো রং করে রাখার প্রক্রিয়ার ইতিহাসও বহু প্রাচীন। মোতি চন্দ্র খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের একটি রচনা, *ললিতবিস্তার*[১৮২] গ্রন্থের *বিচিত্র-পাটোলক* শব্দটির সঙ্গে আমাদের পরিচিত করিয়েছেন।[১৮৩] যে ইকৎ প্রকৌশলের দ্বারা *পাটোল* শাড়ি বোনা হত, তার ইতিহাস সুপ্রাচীন। ফিলিশ একেরমান অজন্তা গুহাচিত্রের কিছু পোশাকে এর ব্যবহার খুঁজে পেয়েছেন যেগুলি 'নির্ভুলভাবে ইকৎ ডুরে নকশা'।[১৮৪] চতুর্দশ শতকের দেওগির থেকে যেসব মূল্যবান বস্ত্রের নমুনা মিলেছে তার মধ্যে *পাটোল* নামটির উল্লেখ আছে।[১৮৫]

রেশম ঃ

ভারতের রেশমকে দুটি প্রধানভাগে ভাগ করা যায় ঃ (ক) ঘরোয়া বা তুঁতপোকাজাত রেশম, এবং (খ) বন্য বা তুঁতপোকা ভিন্ন উৎসজাত রেশম, যদিও এই পরের বিভাগটির কয়েকটি প্রজাতিকে ভারতে এবং চীনেও সম্পূর্ণভাবে ঘরোয়া করে তোলা গেছে।[১৮৬] প্রথম ভাগটিকে বোম্বিসিডি (Bombycidae) এবং দ্বিতীয়টিকে সাটুরনিডি (Saturnidae) বলা হয়। প্রধান ভারতীয় বোম্বিসিডি রেশমকে পুনরায় চারটি উপ-বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা, (১) বোম্বিক্স (Bombyx), (২) ওসিনারা (Ocinara), (৩) থিওফিলা (Theophila), এবং (৪) সাটুরনিডি।[১৮৭] প্রকৃত তুঁতপোকাজাত রেশম (Sericulture) বোম্বিক্স ভাগের অন্তর্ভুক্ত। ভারতে বন্য বা আধা-ঘরোয়া রেশমের ব্যবহার সুপ্রাচীন হলেও তুঁতপোকাজাত রেশম চাষের প্রাচীনত্ব নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। মধ্যযুগে কাশ্মীর ও বাংলা ছিল দুটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল যেখানে রেশম চাষ হত।[১৮৮] কাশ্মীরে যে বর্ষজীবী কীটটির সন্ধান পাওয়া যায় তাকে *Bombyx mori* বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।[১৮৯] টমাস ওয়াটার্স য়ুআন চঙ্-কথিত *কৌষেয়* বস্ত্রকে *বোম্বিক্স মোরি* থেকে সৃষ্ট বলে দেখিয়ে মনে হয় ভুল করেছেন। গ্রন্থের অন্তর্গত উল্লেখগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে কাশ্মীরে রেশম চাষের কোন উল্লেখ আমরা পাচ্ছি না। উদিয়ানা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত এলাকার মানুষজনের পরিধান বস্ত্র হিসাবে য়ুআন চঙ্ *পাই-তিচ্* (সুতিবস্ত্র) বা পশমী বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন।[১৯১] য়ুআন চঙ্ কাশ্মীর, তার অধিবাসীবৃন্দ ও উৎপন্ন দ্রব্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন।[১৯২] স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন দ্রব্যের উল্লেখ করে তিনি লিখছেন, "এই অঞ্চল কৃষিতে উন্নত ছিল এবং প্রচুর পরিমাণে ফুল ও ফল উৎপাদন করত এই অঞ্চল ছিল ড্রাগন-প্রজাতির ঘোড়া, জাফরান, আতসকাচ ও ঔষধি গাছগাছড়ার জন্মস্থান..... লোকেরা পশমী ও সুতির (*পাই-তিচ্*) কাপড় পরিধান

করত......।" তিনি রেশম উৎপাদন বা পরিধান করার কোন উল্লেখ করেননি। অন্যদিকে, তিনি উল্লেখ করেছেন যে খোটানে "শৈল্পিক বয়নের রেশম" উৎপাদিত হত।[১৯৩] সম্ভবত ১৫শ শতক পর্যন্ত কাশ্মীরে রেশম উৎপাদন শুরু হয়নি। আলবেরুনি'র কাশ্মীর বিবরণে এর স্থান মেলেনি।[১৯৪] কলহনের *রাজতরঙ্গিনী*-তে কাশ্মীরের বহু গুরুত্বপূর্ণ উৎপন্ন দ্রব্যের উল্লেখ থাকলেও রেশম উৎপাদনের উল্লেখ নেই।[১৯৫] য়ুআন চঙ্ ও শ্রীবরে'র (১৪৫৯-১৪৮৬) দেওয়া তথ্য মিলিয়ে দেখলে মনে হয় যে ১৫শ শতক পর্যন্ত খোটান এমনকি চীন থেকেও রেশম আমদানি করা হত। জয়নুল আবেদিনের রাজত্বকালে খোটান থেকে নানাধরণের কারিগরের কাশ্মীরে আগমনের কথা শ্রীবর উল্লেখ করেছেন।[১৯৬] তিনি লিখছেন যে এইসব কারিগরের সহায়তায় "কাশ্মীরিরা দক্ষভাবে মাকু ও তাঁত চালাতে পারত এবং এভাবে মহার্ঘ ও আকর্ষণীয় রেশমী বস্ত্র বুনত"।[১৯৭] কিন্তু, রেশম-বোনা অবশ্যই রেশম উৎপাদনের থেকে আলাদা এবং শ্রীবর কাশ্মীরে রেশমচাষ শুরু হওয়ার কোন উল্লেখ করেননি। একইভাবে, ১৫শ শতকের প্রথমদিকের একটি রচনা, ইয়াজদি'র *জাফরনামা*-য় কাশ্মীরের অত্যন্ত আগ্রহজনক বিবরণে রেশম উৎপাদনের উল্লেখমাত্র নেই।[১৯৮] কাশ্মীরে রেশম চাষের প্রথম জোরাল প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে মির্জা হায়দর দুগলতের *তারিখ-ই রশিদি* (১৫৪৭) তে।[১৯৯] মনে হয় ষোড়শ শতকেব কোন সময়ে কাশ্মীরে রেশমচাষ শুরু করা হয়। যুক্তিসংগতভাবেই ধরা যায় যে সিনকিয়াঙ (জিনজিয়াঙ) থেকে গিলগিট হয়ে বালতিস্তান (ক্ষুদ্র তিব্বত) পর্যন্ত রেশমচাষ প্রসারিত হয়েছিল।[২০০] এই বক্তব্য আরও জোরাল হয় এই কারণে যে ১৬শ শতকেও ঐ একই পথে অর্থাৎ, গিলগিট থেকে ক্ষুদ্র তিব্বত পর্যন্ত রেশমকীটের ডিম আমদানির প্রবণতা বজায় ছিল।[২০১] এর অব্যবহিত আগের শতকগুলিতে মোঙ্গল শাসনাধীন পারস্যে রেশমচাষের উন্নয়নে দ্বিতীয়বার জোয়ার দেখা গিয়েছিল (ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক)।[২০২] ত্রয়োদশ শতকে রেশম যে ইরান ও পশ্চিম আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের একটি উপাদান ছিল সেকথা সমর্থন করেছেন মিনহাজ সিরাজ জুঝানি।[২০৩] এটি হয়ত কাশ্মীরি রেশম-তাঁতীদের তাদের নিজস্ব তুঁতপোকাজাত রেশম উৎপাদনে উৎসাহিত করেছিল। সপ্তদশ শতকে সিন্ধুপ্রদেশেও রেশমচাষ ছড়িয়ে পড়ে।[২০৪] আবুল ফজল লিখছেন যে হিমালয় অঞ্চলের কুমায়ুনে রেশমচাষের প্রচলন ছিল।[২০৫]

এভাবে শুরু হওয়ার পরেই তুঁতপোকাজাত রেশম ভারতের সর্বত্র ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৭শ শতকের শেষভাগে এটি পশ্চিম উপকূলে পৌঁছয়।[২০৬] দক্ষিণ উপকূলের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে নেগাপত্তনমে এটির প্রচলনের কিছু প্রয়াস মনে হয় নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, নায়কদের বেপরোয়া নীতির জন্য কৃষকরা কোন জমি অকর্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখতে পারতেন না।[২০৭] তুঁতগাছ চাষ করে তাতে রেশমপোকা বড় করে তোলার চাইতে ধান চাষ করার জন্য তাদের বাধ্য করা হত।[২০৮]

তৎকালীন যুগে বাংলা ছিল রেশম উৎপাদনের প্রধানতম অঞ্চল। ১৫শ শতকে

মা হুয়ানের দ্বারা রেশমের নির্দিষ্ট উল্লেখের পূর্বে বাংলায় রেশম চাষের কোন প্রমাণ নেই।[২০৯] এরপর তুঁতগাছ চাষের ব্যাপক প্রসারতা ঘটল। যেভাবে বাংলায় তুঁতগাছ লাগান হয় তা ওলন্দাজদের কাছে বাংলা ঝোপ পদ্ধতি নামে পরিচিত ছিল।[২১০]

একটি ওলন্দাজ প্রতিবেদন আমাদের জানায় যে কৃষকরা পুরোন তুঁতগাছ বা চারা তুঁতগাছ নিয়ে হাতের তালুর আকৃতির মত ছোট করে নিতেন, জমিতে হালচালান হত এবং ছোট গাছগুলিকে কোণাকুনিভাবে অক্টোবর মাসে গর্তে পুঁতে ফেলা হত। এরপর সামান্য মাটি ও খড় দিয়ে সেগুলিকে মুড়িয়ে দেওয়া হত। কয়েকদিন কেটে গেলে অঙ্কুরগুলি অত্যন্ত সবুজ হয়ে উঠত এবং রেশমকীটের খাবার হিসাবে সেগুলি দৈনিক সংগ্রহ করা হত।[২১১] এভাবে বাংলার তুঁত (multivoltine) রেশমকীটের বৃদ্ধি ঘটাত।

মনে হয় যে ভারতীয় রেশম পাকদাররা (reelers) একই প্রকৌশল ব্যবহার করে Bombyx ও Saturnidae উভয় প্রকৃতির রেশম সংগ্রহ করতেন।[২১২] চীনা সংগ্রহ পদ্ধতি সম্বন্ধে তারা পরিচিত ছিলেন না।[২১৩] রেশম সংগ্রহ (reeling) মানে একাধিক তন্তুর শেষপ্রান্ত একত্রিত করে তাকে সুতোয় পরিণত করা প্রত্যেক তন্তুর দুটি করে প্রান্তভাগ থাকে, (brins) নামে পরিচিত। সেরিসিন (Sericin) দিয়ে এগুলি পরস্পর যুক্ত থাকে। দুটি একত্রিত হয়ে তৈরি করে রেশমগুটি (Cocoon)। শুঁয়াপোকা অবস্থায় রেশমকীট আট-সংখ্যার আকারে এটি তৈরি করতে থাকে, যতক্ষণ না রেশমকীট পিউপায় পরিণত হয়। রেশমগুটি ভেঙ্গে রেশমপোকা বেরিয়ে আসার ঠিক পূর্বে রেশমতন্তু সংগ্রহ শুরু হয়। দীর্ঘ রেশমসূত্র লাভ করতে গেলে এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রেশমগুটির তন্তুর প্রান্তদৈর্ঘ বিভিন্ন হয। কিন্তু রেশম গুটোনর জন্য একটি গোটানর যন্ত্র এবং রেশম গুটিগুলিকে জলে ভাসানর জন্য একটি জলাধার প্রয়োজনীয়। ভারতে রেশমের উপস্থিতির প্রাচীন নিদর্শন মিললেও ভারতীয় রেশম গোটানর প্রকৌশলের সূচনাকাল অজ্ঞাত। অবিচ্ছিন্নভাবে তন্তু পেতে গেলে যেহেতু সুতো গোটান ব্যতীত কোন উপায় নেই, অতএব একথা পরিষ্কার যে একধবণের গোটানর যন্ত্র অবশ্যই ছিল। চীনদেশে রেশমতন্তু গোটানর প্রাচীনতম নিদর্শন মিলবে খ্রি.পূ. ৮ম শতকের শাঙ্ এবং চৌ যুগ থেকে।[২১৪] পরবর্তীকালে চীনা রেশম গোটানর পদ্ধতিতে অবিরাম উন্নতি ঘটে নিত্যনূতন উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগের দ্বারা। একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ১৪শ শতকের মধ্যে ভারতে চরকার আগমন ঘটলে চরকার সাহায্যে সুতো গোটানর পদ্ধতি বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু, দেশীয় পদ্ধতিতে সুতোর সপক্ষে প্রাচীনতম নিদর্শন মিলবে ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দের একটি ওলন্দাজ প্রতিবেদন থেকে।[২১৬] এতে বলা হয়েছে রেশমগুটিগুলিকে প্রথমে গরম জলে ভেজান হল। এতে এর আঠা দূর হল। এখন সেটি গোটানর উপযোগী হল এবং কাঁচা রেশমতন্তুর চাহিদা অনুযায়ী (অর্থাৎ, প্রয়োজনীয় সুতোর ঘনত্ব অনুযায়ী) গোটানর আগের পর্যায়ের রেশমগুটি জল থেকে তোলা হল। গুটির সংখ্যা সুতোর কাঙ্ক্ষিত গুণমান এবং গোটানর আগের পর্যায়ের রেশমগুটির উৎকর্ষতা অনুযায়ী ১০, ১২, ১৫, ২০ থেকে ২৫ পর্যন্ত হতে পারত।

এদের একপ্রান্ত একটি গোটানর যন্ত্রের সঙ্গে বাঁধা হত। প্রতিবেদনটিতে বলা হচ্ছে যে গোটানর যন্ত্র ও গরম জলের রেশমগুটির মধ্যবর্তী স্থানে কিছু একটা থাকা প্রয়োজন যাতে সেগুলি পরস্পর জড়িয়ে না যায়। নির্দিষ্ট দূরত্ব ও চারপাশের বাতাসের জন্য জল এমনভাবে উত্তপ্ত করা হয় যাতে রেশম এমনভাবে দানা বাঁধবে যে তা একটি নির্দিষ্ট সুতোর আকারে সংগৃহীত হতে থাকবে। এতে বলা হয়েছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে সাতন্ত্রতা বজায় রাখা উচিত যাতে করে যখন রেশম তন্তু গোটান হচ্ছে তখন যেন তা পরস্পরের উপরে না পড়ে বা ভেঙে না যায়।

এক্ষেত্রে একমাত্র গোটানর সময় সুতো নরম হতে থাকে, যা তসরের ক্ষেত্রে ঘটে না।[২১৭] এই দিক থেকে ভারতীয় পদ্ধতি চীনা বা ইরানী পদ্ধতির থেকে উন্নততর বলে মনে করা হয়।[২১৮]

এই পদ্ধতিতে পৃথকভাবে প্রতিটি তন্তুকে একটি গোটান সুতোর বা 'এককের' মধ্যে আনা হয়। এভাবে একটি একক সুতোতে নির্দিষ্ট সংখ্যক তন্তুকে গোটান হয় (অর্থাৎ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেশমগুটি থেকে তন্তুকে গুটিয়ে তাকে সামান্য মোচড় দিয়ে একটি সুতো তৈরি করা হয় যাকে বলা হয় "একক" সুতো)।[২১৯] দেখা গিয়েছে যে কিছু রেশমতন্তু দৃঢ়ভাবে পরস্পর জুড়ে থাকে। প্রতিবেদনটিতে দেখান হয়েছে যে এর কারণ হল জলকে অত্যধিক গরম করা ও যথেষ্টভাবে বায়ু চলাচলের অভাব। এই প্রতিবেদন অনুসারে বায়ুর সাধারণ অবস্থার সমতার উপর রেশমের গুণমান নির্ভর করে। যে বায়ুর সংস্পর্শে রেশম আসে তার যদি কোন পরিবর্তন না হয় তবে একই ধরণের সুতো তৈরির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়ে যায়। এভাবে সুতোর প্রকৃতির সমদর্শিতা আবহাওয়ার সাধারণ অবস্থার উপর অত্যধিক মাত্রায় নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত, এতে বলা হয়েছে যে রেশমগুটিগুলি প্রথমে জলে সিদ্ধ করা হয় এবং তারপর একত্রিত করে পরিষ্কার জলে ছাড়া হয়। পরিষ্কার জল থেকে যে রেশম পাওয়া যায় তার ঔজ্জ্বল্য ও স্বাভাবিক চাকচিক্য বজায় থাকে। সেগুলিকে হাত দিয়ে নাড়তে থাকলে চাকচিক্য আরও বেড়ে যায়। এই অনুজ্জ্বলতার কারণ হল ১২, ১৫, ২০ থেকে ২৫টি রেশমগুটি থেকে প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ সুতো যা জলের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। এর ফলে জল ঘন হয়ে যায় ও রেশম চকচকে ভাব হারিয়ে ফেলে। আরও সিদ্ধ করা হলে রেশমের উজ্জ্বলতা হারানর চেয়েও ওজন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। অতএব রেশমগুটিকে দীর্ঘকাল ধরে জলে সিদ্ধ করা হয় না। এইভাবে প্রাপ্ত রেশমকে এরপর গুণমান ও দৈর্ঘ অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করা হয়। ভালজাতের রেশমগুটি থেকে প্রাপ্ত তন্তুকে বলা হত *পত্তনি* এবং তুলনামূলকভাবে খারাপ জাতের তন্তুকে বলা হত পুট বা *পোত্তি*।[২২০] *পত্তনি* তন্তু থেকে যে প্রাপ্ত কাঁচা রেশম দুটি সুনির্দিষ্ট ধরণের হয়ে থাকত ঃ *ট্যানাবানা* এবং *ট্যানি*।[২২১] এই দুটি প্রধান ভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল তিনটি উপ-বিভাগ ঃ *কাবেসা* (cabessa, পর্তুগীজ ভাষায় 'মাথা') অর্থাৎ, সর্বোৎকৃষ্ট প্রকৃতির রেশম, তারপর আসত *বারিগা* (*bariga*) এবং শেষত *পিউ* (*peeu*, পর্তুগীজ ভাষায়

'পা')। এভাবে এই শ্রেণীবিভাগ সমসাময়িক ইংরেজি দলিলপত্রের মস্তক, উদর ও চরণের সমতুল। শেষ উপ-বিভাগটি *গেরি-কারকেরি* (geri-kerckerie) বা *পোত্ত/পোত্তি* (রেশমগুটি থেকে প্রাপ্ত কাঁচা রেশম) নামে পরিচিত ছিল। এটির দুটি উপ-বিভাগ ছিল ঃ সর্বোত্তমটি *পত্তনি* এবং নিকৃষ্টতরটি *পুট* বা *পোত্তি*। এই শেষেরটি আসত নিকৃষ্টতম রেশমগুটি থেকে এবং কাঁচা রেশমের উভয়প্রান্ত হয় পশ্চাদ্‌ভাগে অথবা অগ্রভাগে জোড়া লাগান হত। *ট্যানি*-র সাতটি উপবিভাগ ছিল যথা (১) *ফাইন* (*fayn*. এক বিশেষ ধরণের বাংলার রেশমের নাম); (২) *কারা* (*kara*, উত্তম প্রজাতির রেশম); (৩) *দোম* (ভাল জাতের রেশম, বোনা *পত্তনি* রেশম); (৪) *জিম* (একধরণের বাংলার রেশম, 'So evenzo Ziarum'); (৫) *প্যানজিয়াম* (*Pangium* বা *Pangia*. সর্বশ্রেষ্ঠ জাতের রেশম, বাংলায় উৎপন্ন হত); (৬) *জেসাম* (*Szesum*) এবং (৭) *কেৎসিয়র* (*Ketsier*, নিকৃষ্টতম একটি প্রজাতি) ইত্যাদি।[২২] উৎপাদনের খরচ অনুযায়ী রেশমের গুণমান নির্ধারণ করতেও প্রতিবেদনটি খুবই সহায়ক। ১সের *পত্তনি* ছিল ১ সের *ট্যানি*-র সমান, অর্থাৎ ৩. ৪১/২ টাকা, *ট্যানাবানার ট্যানি*-র মূল্য ছিল ২. ৬১/২ টাকা এবং ১সের পুট বা পোত্তির দাম ছিল ২.৪ টাকা।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে প্রকৃত মজুরি ট্যানি রেশমের ক্ষেত্রে মূল্যের ৩২.৩৬ শতাংশ, ট্যানাবানা রেশমের ক্ষেত্রে ২৫.২৭ শতাংশ এবং পুট রেশমের ক্ষেত্রে ৩৯% ছিল।

<u>সারণী-১</u>

ট্যানাবানা, ট্যানি কাঁচা রেশম এবং পুট রেশমের সের প্রতি উৎপাদন খরচ ঃ

ক্রমাঙ্ক	খরচ (টাকায়)	ট্যানাবানা ট্যানি (টাকায়)	পুট (টাকায়)
টাকা পিছু ৬৩/৪ সের রেশমগুটি	১.৮৮	২.৩৭	১.৬২
পত্তনি তৈরির মজুরি			
তন্তু, পত্তনিকে দেওয়া খাদ্য	০.৩০	০.৫০	০.৬০
সুতো টানার লোক	০.০৮	০.১৩	০.১০
জ্বালানী কাঠ	০.১৩	০.২০	০.১০
রেশম তন্তু গোটানর মজুরি	০.৩০	০.৬০	০.৪০
মোট খরচ	২.৬৯	৩.৮০	২.৮২

সূত্র ঃ পিটার ফান ডাম, Beschrijvinge, II (২), পৃঃ ৬৯-৭০।

উপরের সারণী থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে কেন কোন এক বিশেষ ধরণের রেশমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। নিকৃষ্টতার জন্য পুট রেশম সংগ্রহকে উৎসাহদান করা হত না।[২২৪] পুট রেশমগুটি থেকে সংগ্রহ করা নিকৃষ্ট ধরণের তন্তুর পাশাপাশি এর উৎপাদন খরচও বেশি ছিল।[২২৫] সুতরাং, এটি খুব আশ্চর্যজনক কিছু নয় যে ওলন্দাজ কোম্পানির নজর ছিল *পত্তনি* তন্তুর দিকে।[২২৬]

এই তিনটি বিভাগ ও তাদের উপবিভাগ ছাড়াও আরও এক ধরণের রেশম ছিল যাকে বলা হত মোক্তা (mochta) রেশম,[২২৭] যেটি হল কোম্পানির কাগজপত্রে বর্ণিত

সপ্তদশ শতকের মধ্যে রেশম বাংলার প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের একটি হয়ে উঠল। তাভারনিয়ে বলেছেন যে কাশিমবাজার একাই বছরে ১০০ লিভ্রের ২২,০০০ গাঁট যোগান দিত, অর্থাৎ বার্ষিক উৎপাদন ছিল ৩১ লক্ষ বা ২৪ লক্ষ লিভ্র।[২২৯] তাভারনিয়ে আরও বলেছেন যে ওলন্দাজরা বার্ষিক প্রায় ৬০০০-৭০০০ গাঁট সংগ্রহ করত অর্থাৎ, ৬০-৭০ লক্ষ লিভ্র।[২৩০] এই হিসাব[২৩১] যা ছিল সম্ভবত প্রধান প্রধান বাজারের পণ্যের হিসাব, তা ১৯১৭ সালের ৩০ লক্ষ পাউন্ডের মোট ভারতীয় রেশম উৎপাদনের সঙ্গে ভালভাবেই মিলে যায়।[২৩২]

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি ও প্রকৌশলের সূত্রপাত নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তার কালানুক্রম প্রসঙ্গে বলা যায় যে উল্লেখিত সময়কাল প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শনের সময়সীমা মাত্র। কালানুক্রমটি সর্বদাই পরিবর্তনসাপেক্ষ এবং বিস্তৃততর গবেষণায় কোন একটি যন্ত্র বা পদ্ধতির অধিকতর প্রাচীন সময়কাল নির্ধারণ করা যেতে পারে।

সূত্রনির্দেশ

১। ইরফান হাবিব, *প্রিহিস্ট্রি*, দিল্লী, ২০০১, পৃঃ ৫৪।

২। তদেব, পৃঃ ৫০-৫৪।

৩। ইরফান হাবিব, *দি ইন্ডাস সিভিলাইজেশন*, দিল্লী, ২০০২, পৃঃ ২৬।

৪। চার্লস সিঙ্গার, ই.আই.হোমইয়ার্ড, এ.আর.হল, সম্পা, *এ হিস্ট্রি অফ টেকনোলজি*, ২য় খন্ড, অক্সফোর্ড, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪, পুনর্মুদ্রণ ১৯৬৭, পৃঃ ৩৭৩।

৫। জর্জ ওয়াট, *এ ডিকশনারি অফ ইকোনমিক প্রোডাক্টস অফ ইন্ডিয়া*, ৪র্থ খন্ড, লন্ডন। কলকাতা, ১৮৯০, পৃঃ ৪৪ এরপর থেকে BEPI; আরও দেখুন, চার্লস সিঙ্গার, ই.আই.হোমইয়ার্ড, এ.আর.হল এবং ট্রেভর আই. উইলিয়ামস, সম্পাঃ, *এ হিস্ট্রি অফ টেকনোলজি*, ১ম খন্ড, অক্সফোর্ড, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬, পুনর্মুদ্রণ ১৯৬৭, পৃঃ ১৯৯।

৬। তদেব।

৭। ই. ম্যাকে, *আর্লি ইন্ডাস সিভিলাইজেশন*, নয়াদিল্লী, ১৯৭৬, পৃঃ ৮২।

৮। উইলফ্রেড এইচ. শফ, *দি পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সী, ট্যাভেল অ্যান্ড ট্রেড ইন ইন্ডিয়ান ওসেন বাই এ মার্চেন্ট অফ দি ফার্স্ট সেনচুরি*, ২য় সং, নয়াদিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ৪৭।

৯। ডি. ডি. কোশাম্বী ইসলামের সঙ্গে ভারতের সংযোগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত দিকটির উল্লেখ করেছেন। দেখুন তার অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন রচনা, ডি.ডি.কোশাম্বী, *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু দি স্টাডি অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি*, ২য় সং, বোম্বাই, ১৯৭৫, পৃঃ ৩৭০।

১০। ডি. শ্লিংলফ, 'কটন ম্যানুফ্যাকচার ইন এনশেন্ট ইন্ডিয়া', *দি জর্নাল অফ দি ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল হিস্ট্রি অফ দি ওরিয়েন্ট* (এরপর থেকে JESHO), ১৭শ খন্ড, ১ম সংখ্যা, লাইডেন, ১৯৭৪, পৃঃ ৮৬-৮।

১১। উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত এর ব্যবহার চলেছিল, কেবল রোলারগুলি লোহার তৈরি হত। এভাবে কাটা সুতোকে বলা হত 'স্টোন-কটন'। দেখুন ওয়াট, *D.E.P.I.*, ৪র্থ খন্ড, লন্ডন, ১৯৮০। পৃঃ ১০৫-০৬।

১২। তদেব, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১০৫-০৬। উনিশ শতকেও সুতো-কাটার জন্য এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। পাথর দ্বারা পরিষ্কারের এই পরিশ্রমসাধ্য ও অ-ফলপ্রসূ পদ্ধতিটিকে 'অন্ততপক্ষে *চর্ক (চরখি)* দ্বারা' প্রতিস্থাপিত করার পরামর্শ দেওয়া হয় (তদেব, পৃঃ ১০৬)।

১৩। এফ. স্টেইনগাস, *কম্প্রিহেন্সিভ পার্শিয়ান-ইংলিশ ডিকশনারি*, ২য় সং, নয়াদিল্লী, ১৯৮১, পৃঃ ৪০২ (উল্লেখ চোবকিন)-এর ব্যাখ্যা অনুসারে *চোবকিন* একটি কাঠের বা লোহার যন্ত্র যার দ্বারা তুলোকে তার বীজ থেকে আলাদা করা যায়।

১৪। মহম্মদ ইবন দাউদ ইবন মাহ্মুদ শাদিয়াবাদী, *মিফ্তাহ্-উল ফুজালা*, ৮৭৩ আল হিজরী / ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দে সংকলিত, ব্রিটিশ লাইব্রেরি ওরিয়েন্টাল ৩২৯৯, ফোলিও ১০০এ। নোরা এম. টিটলি যিনি 'অ্যান ইলাস্ট্রেটেড পার্শিয়ান গ্লসারি অফ দি সিক্সটিনথ সেনচুরি', *ব্রিটিশ মিউজিয়াম কোয়ার্টার্লি*, ২৯শ খন্ড, লন্ডন, ১৯৬৫, পৃঃ ১৮-য় এই পান্ডুলিপিটির পরিচয় দিয়েছেন, তিনি *pamba dona* বলতে তুলোর গুটি (cotton-pod) বুঝিয়েছেন, কিন্তু ঠিক অর্থ হবে তুলোর বীজ।

১৫। পি. পেলিয়ো, *নোটস অন মার্কো পোলো*, ১ম খন্ড, পারী, ১৯৪৯, পৃঃ ৫০১-০২, উল্লেখ করেছেন ডি.শ্লিংলফ, *পৃঃ ৮৫*।

১৬। ওয়াট এবং মালে, *D.E.P.I.* ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৫২-৩, একই ধরণের পদ্ধতির বিবরণ দিয়েছেন। ব্যতিক্রম হল এতে কারিগরের পা-দ্বারা রোলারটি চলে। এর ফলে, এটিকে পদ-চালিত রোলার বলা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে দন্ডটি ক্ষুদ্রতর ও আংশিকভাবে কৌণিক আকৃতির হত, যেজন্য ঘূর্ণন গতির সৃষ্টি হত। হস্তচালিত রোলারের থেকে এর বাড়তি সুবিধা ছিল, কেননা এতে পায়ের চাপের সঙ্গে ঘূর্ণন গতিযুক্ত হওয়ায় তুলো নিষ্কাশনের বেগ দ্রুততর হত। এভাবে একজন কারিগর দিনে চার থেকে ছয় পাউন্ড তুলো পরিষ্কার করতে পারতেন। হাতের মত পা অত বেশী ক্লান্তও হয় না। এজন্য দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করা সম্ভবপর ছিল।

১৭। জর্জ এ. গ্রিয়ারসন, *বিহার পেজান্ট লাইফ : বিয়িং এ ডিসকার্সিভ ক্যাটালগ অফ দি*

সারাউন্ডিং অফ দি পিপল অফ দি প্রভিন্স, দিল্লী, ১৯৭৫, পৃঃ ৬২-৬৩ (ছবি, পৃঃ ৪৭); ওয়াট, *D.E.P.I.*, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১০৫-০৬, ১১৫-১২৩, ১৪৭-৪৮, ১৫২-৫৩)

১৮। ১৯শ শতকের মধ্যভাগের মধ্যে চরখি'র একদিকে বা দুদিকেই চাকা লাগান শুরু হয়, ওয়াট ও মারে, *D.E.P.I.*, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৫২-৫৩।

১৯। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এর ব্যাপক ব্যবহারের জন্য দেখুন ওয়াট, *D.E.P.I*. ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১০৫-০৬, ১১৫, ১২৩, ১৪৭-৪৮, ১৫২-৫৩।

২০। জে. নীডহ্যাম, *সায়েন্স অ্যান্ড সিভিলাইজেশন ইন চায়না*, কেমব্রিজ, ১৯৬৫, ৪র্থ খন্ড, ভাগ (২), পৃঃ ১২২-২৪।

২১। ইন্দো-কম্বোডিয় সংযোগের জন্য দেখুন আর.সি.মজুমদার, *ইন্সক্রিপশনস অফ কম্বুজ*, কলকাতা, ১৯৫৩; আরও দেখুন হিমাংশু পি. রায়., *দি উইন্ডস অফ চেঞ্জ, বুদ্ধিজম অ্যান্ড দি ম্যারিটাইম লিংক্‌স অফ আর্লি সাউথ এশিয়া*, দিল্লী, ১৯৯৪, পৃঃ ৮৭-১২০।

২২। নীডহ্যাম, ৪র্থ খন্ড (২), পৃঃ ১২২-২৪, ২০৪।

২৩। শ্লিংলফ এর একটি প্রতিচ্ছবি দিয়েছেন, *J.E.S.H.O.* পৃঃ ৮৮-র বিপরীতে। এই ফ্রেস্কোটি জি.ইয়াজদানি, *অজন্তা, দি কালার অ্যান্ড মোনোক্রোম রিপ্রোডাকশন অফ দি অজন্তা ফ্রেস্কোজ বেসড্ অন ফোটোগ্রাফি*, ১ম ভাগ, ১২শ চিত্র, রচনাংশ, পৃঃ ১৭-য় তুলে দিয়েছেন। শ্লিংলফের প্রতিচ্ছবিতে রোলারদুটি স্পষ্ট না হলেও ইয়াজদানি'র চিত্রে তা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আরও দেখুন ইশরাত আলম, *'টেক্সটাইল টুলস অ্যাজ ডেপিক্টেড ইন অজন্তা অ্যান্ড মুঘল পেইন্টিংস'*, প্রবন্ধটি রয়েছে অনিরুদ্ধ রায় ও এস. কে. বাগচী সম্পা, *টেকনোলজি ইন এনশেন্ট অ্যান্ড মেডিয়েভ্যাল ইন্ডিয়া*, দিল্লী, ১৯৮৬, পৃঃ ১২৯-৩০।

২৪। এই ফ্রেস্কোটি রয়েছে ১নং গুহায়, যেটি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত, দেখুন এম. কে. ধবলিকর, *অজন্তা — এ কালচারাল স্টাডি*, পুনা, ১৯৭৩, পৃঃ ২।

২৫। ইরফান হাবিব, 'মেডিয়েভ্যাল টেকনোলজি এক্সচেঞ্জেস বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড দি ইসলামিক ওয়র্ল্ড', *আলিগড় জর্নাল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ, প্রফেসর রাম সুরেশ ত্রিপাঠী কমেমোরেশন ভল্যুম*, ২য় খন্ড, ১-২ সংখ্যা, আলিগড়, ১৯৮৫, পৃঃ ২১৩-১৫ (এর পর থেকে 'মেডিয়েভ্যাল টেকনোলজি')।

২৬। তদেব, পৃঃ ২১৩-১৫।

২৭। *মধ্যকালীন ভারত* (সম্পা) ইরফান হাবিব, ১নং খন্ড, দিল্লী, ১৯৮১-র পুস্তক - আলোচনায় হরবনস মুখিয়া, *দি ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রিভিয়্যু*, ৭ম খন্ড, জুলাই - জানুয়ারি, ১৯৮১, ১-২ নভেম্বর, দিল্লী, ১৯৮১, পৃঃ ২৭২।

২৮। নীডহ্যাম, ৪র্থ খন্ড (২) পৃঃ ১২৭।

২৯। নীডহ্যাম, ৪র্থ খন্ড (২) পৃঃ ১২২-২৪।

৩০। এম এস রনধাওয়া, *কাংড়া পেইন্টিংস অফ দি ভাগবত পুরাণ*, নয়াদিল্লী, ১৯৬০, পৃঃ ৫৬, প্লেট V।

৩১। নীডহ্যাম, ৪র্থ খন্ড (২), পৃঃ ১২২-২৪।

৩২। ইরফান হাবিব, 'মেডিয়েভ্যাল টেকনোলজি', পৃঃ ২১৩-১৫।

৩৩। ওয়াট, *D.E.P.I.* ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৫২-৫৩।

৩৪। তদেব, ৪র্থ খন্ড, ১০৫-০৬, ১১৫, ১২৩, ১৪৭-৪৮, ১৫২-৫৩। কোন ধরণের পরিবর্তন ছাড়াই উনিশ শতক পর্যন্ত প্রাচীনত্ব সহ এর উপস্থিতি থেকে মনে হয় যে এটি এখানেই দেশীয়ভাবে উৎপত্তি লাভ করেছিল।

৩৫। ইরফান হাবিব, 'নীডহ্যাম অ্যান্ড দি হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান টেকনোলজি', 'নীডহ্যাম কনফারেন্স ঃ সায়েন্স। দি রিফ্রেশিং রিভার', - এ গঠিত প্রবন্ধ। N.I.S.T.A.D.S.. নয়াদিল্লী, ১৯৯৬, পৃঃ ৪-৬ (মিমিওগ্রাফ - কৃত)।

৩৬। মুনশি টেক চন্দ, 'বহর', *বহর-ই আযম* ১৭৩৯-৪০ খ্রিস্টাব্দ, লিথিওগ্রাফ-কৃত, লখনউ, ১৯১৬, পৃঃ ৩০৮, দেখুন সুতো কাটুনির চাকা, অর্থাৎ সুতোকাটার চরখা (*চর্‌খ-ই নদ্দাফি*)।

৩৭। এম এস রণধাওয়া, পৃঃ ৫৬, প্লেট V-এ স্পষ্টভাবে সুতোকাটার চরখাটিকে দেখানো হয়েছে। এই প্লেটটির বিষয় '*গোকুল থেকে বৃন্দাবন যাত্রা*'।

৩৮। ইরফান হাবিব, '*দি টেকনোলজি অ্যান্ড ইকোনমি অফ মুঘল এম্পায়ার*', *দি ইন্ডিয়ান ইকোনমিক অ্যান্ড সোসাল হিস্ট্রি রিভিয়্যু*, ১৬শ খন্ড, সংখ্যা ১, দিল্লী, ১৯৮০, পৃঃ ৭; এই প্রবন্ধে সপ্তদশ শতকে সুতোকাটার চাকার হাতলের সংযোজন দেখান হয়েছে।

৩৯। রণধাওয়া, পৃঃ ৫৬, প্লেট V।

৪০। ভারতে না হলেও অন্যত্র *চরখি* বিবিধ উন্নতি লাভ করেছে। চীনদেশে হাতল ছাড়াও উপরের রোলারটিতে পাদানি-চালিত গতি যুক্ত হয়। একটি বৈপ্লবিক বব-ফ্লাইহুইলের সাহায্যে এই গতি লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। জাপানে সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে এই ফ্লাইহুইল একটি মুগুর - আকৃতিবিশিষ্ট হয়ে শ্যাফ্‌টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল (তুলনীয় নীডহ্যাম, ৪র্থ খন্ড (২), পৃঃ ১২৩)। পারসীক চরকাতে তিনটি রোলার থাকত, যেগুলি একটি আরেকটির সাথে সংস্পৃষ্ট হত। রোলারগুলির বিয়ারিং-য়ের মধ্যবর্তী কীলকের সাহায্যে এটি চলত। পিছনের রোলারটির সাহায্যে তন্তুকে প্রধান রোলার থেকে পৃথক রাখা হত। কিন্তু এর প্রথম ব্যবহার কবে হয়েছিল তা জানা যায় না (দেখুন হান্স ই উল্‌ফ, *ট্রাডিশনাল ক্র্যাফ্টস অফ পার্সিয়া*, কেমব্রিজ, ১৯৬৬, পৃঃ ১৭৯-৮০।

৪১। ওয়াট, *D.E.P.I.* ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১২৩।

৪২। *তদেব*, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৫৩।

৪৩। টোবি ফক ও মিল্ড্রেড আর্চার, *ইন্ডিয়ান মিনিয়েচারস ইন দি ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি*, লন্ডন, ১৯৮১, প্লেট ৩, ক্যাটালগ ৪, পৃঃ ৪৭। এস পি বর্মা তার গবেষণাপত্রে এই ফোলিওটির পরিচয় দিয়েছেন, 'সিক্সটিন্‌থ সেনচুরি মুঘল মিনিয়েচারস অ্যাট দি রয়াল লাইব্রেরি (উইন্ডসর) অ্যান্ড ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি (লন্ডন) — এ সার্ভে অফ হিদারটু আন্‌নোটিসড্‌ পেইন্টিংস', *প্রসেডিংস অফ দি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস*, ৪২তম অধিবেশন, *বোধগয়া*, ১৯৮১, পৃঃ ২৫৮-৬৭।

৪৪। ডব্ল্যু. ফস্টার (সম্পা), *ইংলিশ ফ্যাক্টরিজ ইন ইন্ডিয়া* ১৬৬৫-৬৭, অক্সফোর্ড, পৃঃ ১৭৪, তুলোকে 'ধুনা হত বা পেটানো হত'।

৪৫। আর.জে.ফোর্বস, *স্টাডিজ এনশিয়েন্ট টেকনোলজি*, ৪র্থ খন্ড, লাইডেন, ১৯৬৪, পৃঃ ১১-১২, ইউরোপে এর প্রাগৈতিহাসিক উৎপত্তির কথা মেনে নিয়েছেন কিন্তু ইউরোপ আবার এর কথা জানতে পারে পঞ্চদশ শতকে (তদেব, ৪র্থ, পৃঃ ২১; সি সিঙ্গার সম্পা *হিস্ট্রি অফ টেকনোলজি*, ২য় খন্ডে আর. প্যাটারসনের প্রবন্ধ, অক্সফোর্ড, ১৯৬৭, পৃঃ ১১৫।

৪৬। শ্লিংলফ, *JESHO* পৃঃ ৮৬-৮৯। একাদশ-দ্বাদশ শতকের অভিধানগুলি থেকে *পিঞ্জনিকয়, পিঞ্জিতম* ইত্যাদি শব্দগুলি খুঁজে বার করে তিনি তুলো ধুনার ধনুকাকৃতি যন্ত্রকে বোঝাতে চেয়েছেন, যা খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। হয়তো লাঠির দ্বারা তুলো ধুনা বোঝানো হতে পারে (পূর্বে আলোচিত)।

৪৭। বিজয়া রামস্বামী, 'এ নোট অন দি টেক্সটাইল টেকনোলজি ইন মেডিয়েভ্যাল সাউথ ইন্ডিয়া', *PIHC* ৪০তম অধিবেশন, ওয়ালটেয়ার, ১৯৭৯, পৃঃ ৪৫১। 'নোটস অন দি টেক্সটাইল টেকনোলজি ইন মেডিয়েভ্যাল ইন্ডিয়া উইল স্পেশাল রেফারেন্স টু দি সাউথ,' *I.E.S.H R.*. ১৬শ খন্ড, ২য় সংখ্যা, দিল্লী, ১৯৮০, পৃঃ ২২৭।

৪৮। পুরুষোত্তম দেব, *ত্রিকান্ডশেষ*, বোম্বাই, ১৯৩৭, পৃঃ ৭৮। শ্লোকটিতে বলা হয়েছে, কপিলাক্ষ তরকুস্তরকুশানাস্ত ঝমক বরাতনি তরকুপিঠি শিয়ালপি পিনিয়ানম স্থুলাকরমুখম, এই তথ্যের জন্য আমি আলিগড়ের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক এস.আর.শর্মার কাছে কৃতজ্ঞ। কে.এন.মহাপাত্র, 'পুরুষোত্তম দেব, দি লেক্সিকোগ্রাফার', *দি ওড়িশা হিস্টরিক্যাল রিসার্চ জর্নাল*, ২য় খন্ড, ভুবনেশ্বর, ১৯৫৩, পৃঃ ৭১, ত্রিকান্ডশেষ-কে খ্রিস্টীয় নবম শতকের রচনা বলে উল্লেখ করেছেন।

৪৯। নীডহ্যাম, ৪র্থ খন্ড (২), পৃঃ ১২৭।

৫০। মোতিচন্দ্র, *কস্ট্যুমস্, টেক্সটাইলস্, কসমেটিকস্ অ্যান্ড কয়ফার ইন এনশিয়েন্ট অ্যান্ড মেডিয়েভ্যাল ইন্ডিয়া*, দিল্লী, ১৯৭৩, পৃঃ ১২৬।

৫১। *মিফতাহ্-উল ফুজালাহ্*, ফোলিও ১২৬ বি ও ২৫৯এ, আরও দেখুন, ইশরাত আলম, *পূর্বোল্লিখিত*, পৃঃ ১৩২-৩৩।

৫২। তুলনীয় ইরফান হাবিব, 'দি টেকনোলজি অ্যান্ড ইকোনমি অফ মুঘল ইন্ডিয়া', *I.E.S.H.R.*. ১৭শ খন্ড, সংখ্যা ১, দিল্লী, ১৯৮০, পৃঃ ৬; ইরফান হাবিব, চেঞ্জেস ইন টেকনোলজি ইন মেডিয়েভ্যাল ইন্ডিয়া', *স্টাডিজ ইন হিস্ট্রি*, ২য় খন্ড, সংখ্যা ১, দিল্লী, ১৯৮০, পৃঃ ১৭; ইরফান হাবিব, 'মেডিয়েভ্যাল টেকনোলজি ঃ এক্সচেঞ্জেস বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড দি ইসলামিক ওয়র্ল্ড', পৃঃ ২১৬-১৭।

৫৩। নীডহ্যাম, ৪র্থ খন্ড (২), পৃঃ ১২৭।

৫৪। ফোর্বস, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২১, আরও দেখুন সি. রিঙ্গার সম্পা., হিস্ট্রি অফ টেকনোলজি, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৯৫।

৫৫। তুলনীয় মৌলভি জাফরুর রহমান দেহলভি, *ফরঙ্গ ইস্তিলহৎ-ই পেশাওরান*, ২য় খন্ড, দিল্লী, ১৯৪০, পৃঃ ৫-৬। এটিকে *ধুনকি* বলা হত, যা সংস্কৃত *ধনুকম*-এর পরিবর্তিত রূপ।

৫৬। তুলনীয় জি.টি. প্লাটস, *এ ডিকশনারি অফ উর্দু, ক্লাসিকাল হিন্দী অ্যান্ড ইংলিশ*, অক্সফোর্ড. ১৯৬০, নয়াদিল্লী, ১৯৭৭, পৃঃ ৫৪৮-৪৯, উল্লেখ *ধুনিয়া, ধুম্না*।

৫৭। *মিফতাহ্-উল ফুজালাহ্*, ফোলিও ১২৬বি ও ফোলিও ২৫৯এ, উল্লেখ শফশহং।

৫৮। ই. ম্যাকে, *পূর্বোল্লিখিত*, পৃঃ ৮২।

৫৯। *তদেব*, পৃঃ ১০৫।

৬০। ত্রিকান্ডশেষ, পৃঃ ৭৮। পেষণকার্যে ব্যবহৃত *প্রস্তরখন্ড* তর্কুশান নামে পরিচিত ছিল।

৬১। *মিফতাহ্-উল ফুজালাহ্*, উল্লেখ *শোকক ওয়া সংগোক*, ফোলিও ১৮৮-এ-বি; *বহর-ই আযম*, উল্লেখ দুক।

৬২। ডব্ল্যু. এইচ. শফ, পৃঃ ৪৭।

৬৩। তুলনীয় মোতি চন্দ্র, পৃঃ ১৩০। আরব বণিক সুলেমান (৮৫১) বাংলার সুক্ষ্ম মসলিনের কথা বলেছেন। এর প্রশংসায় তিনি লিখেছেন, 'এদেশে এই বস্ত্র তৈরি হয়, যা আর কোথাও তৈরি হয় না। এর একটা আংটির মধ্য দিয়ে যেতে পারে, কেননা (কাপড়টা) অত্যন্ত সুক্ষ্ম। এটি সুতীবস্ত্র ....'।

৬৪। *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা*, ১৯১১, সম্পা, ২৫শ খন্ড, পৃঃ ৬৮৫-৬, উল্লেখ সুতোকাটা।

৬৫। এন.কে.সিংহ, *ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল*, কলকাতা, ১৯৫৬, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৭২-৭৩।

৬৬। জে. মার্শাল, ট্যাক্সিলা, *অ্যান ইলাস্ট্রেটেড অ্যাকাউন্ট অফ আর্কিওলজিকাল এক্সক্যাভেসনস, কেমব্রিজ*, ১৯৫১, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫৪৪।

৬৭। 'কাপ্পাস কান্টিতুম' (সুতো কাটা), *অঙ্গুত্তর নিকায়* (আনুমানিক ৩০০ খ্রি.পূ.), ২য় খন্ড, পৃঃ ২৯৩; কার্তিনাদিন (সুতোকাটা) *মেধাতিথি অন মনু*, ৫ম খন্ড, পৃঃ ১৫৭, উল্লেখ করেছেন এ.এস. আলতেকর, *পজিসন অফ উইমেন ইন হিন্দু সিভিলাইজেশন*, বেনারস, ১৯৫৬, পৃঃ ২৩ টীকা, কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* অনু / সম্পা আর. পি. কাংলে, ২য় সং, ২য় খন্ড, বেনারস, ১৯৭২, পৃঃ ১৪৬-৪৮।

৬৮। লিন হোয়াইট 'টিবেট-ইন্ডিয়া অ্যান্ড মালয় অ্যাজ সোর্সেস অফ ওয়েস্টার্ন মেডিয়েভ্যাল টেকনোলজি', *অ্যামেরিকান হিস্ট্রি রিভিয়্যু*, ৬৫তম খন্ড, সংখ্যা ৩, ১৯৬০, পৃঃ ৫১৭।

৬৯। গা ও হানয়ু ও শি বোকুই -এর রচনা, *এনশিয়েন্ট চায়না'স টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স*, বেজিং, ১৯৮৩, পৃঃ ৫০৪-০৮, এই রচনাতে এর উৎপত্তি নীডহ্যামের মতানুযায়ী খ্রিস্টীয় ২য় শতকের চীন দেশে উৎপত্তির তুলনায় আগে দেখান হয়েছে। (দেখুন নীডহ্যাম, ৪র্থ খন্ড (২), পৃঃ ১০৫)।

৭০। নীডহ্যাম, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১০৫, আরও দেখুন জে. নীডহ্যাম, *ক্লার্কস অ্যান্ড ক্র্যাফটসমেন ইন চায়না অ্যান্ড দি ওয়েস্ট*, কেমব্রিজ, ১৯৭০, ২০ নং প্লেট।

৭১। ইরফান হাবিব, 'মেডিয়েভ্যাল টেকনোলজি ঃ এক্সচেঞ্জেস বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড দি ইসলামিক ওয়ার্ল্ড', পৃঃ ২০৩-০৪।

৭২। আহমদ টি. আল-হাসান অ্যান্ড ডোনাল্ড আর. হিল, *ইসলামিক টেকনোলজি, অ্যান ইলাস্ট্রেটেড হিস্ট্রি*, কেমব্রিজ, ১৯৮৬, পৃঃ ১৮৫-৮৬।

৭৩। তদেব।

৭৪। ইরফান হাবিব, 'মেডিয়েভ্যাল টেকনোলজি' পৃঃ ২০৩-০৪।

৭৫। তদেব।

৭৬। তদেব।

৭৭। লিন হোয়াইট জুনিয়র, *মেডিয়েভ্যাল টেকনোলজি অ্যান্ড সোশাল চেঞ্জ*, অক্সফোর্ড, ১৯৬২, পৃঃ ১১৯-১৭৩।

৭৮। ইরফান হাবিব, 'মেডিয়েভ্যাল টেকনোলজি', পৃঃ ২০৪।

৭৯। তদেব।

৮০। ইরফান হাবিব, 'টেকনোলজিকাল চেঞ্জেস অ্যান্ড সোসাইটি থার্টিন্‌থ অ্যান্ড ফোর্টিন্‌থ সেনচুরিজ', *P.I H.C*, ৩১তম অধিবেশন, বারাণসী, ১৯৬৯, পৃঃ ১৪২।

৮১। *মিফতাহ্-উল ফুজালা*, ফোলিও ৯৪বি, উল্লেখ *চর্‌খ*।

৮২। তদেব, ফোলিও ১৫১এ।

৮৩। তুলনীয় এস. সি. ওয়েল্‌খ, *দি আর্ট অফ মুঘল ইন্ডিয়া, পেইন্টিং অ্যান্ড প্রেশাস অবজেক্টস (এক্সিবিশন ক্যাটালগ)*, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৩, প্লেট নং ১৩, পৃঃ ১৬৪; ই. কুহ্‌নেল ও এইচ. গোয়েৎস, *ইন্ডিয়ান বুক পেইন্টিং ফ্রম জাহাঙ্গীর'স অ্যালবাম ইন স্টেট লাইব্রেরি ইন বার্লিন*, লন্ডন, ১৯২৬, প্লেট নং ১, পাঠ্যাংশ পৃঃ ৫৩-৫৪; ইভান শ্চুকিন, *লা পেন্তুর আ'লেপোক দেস গ্রাঁদস মোগলস*, প্যারিস, ১৯২৮, পৃঃ ৪৪ (আনুমানিক ১৬২০-২৫) ; জর্জ রোকে, উল্লেখ করেছেন ইন্দ্রাণী রায়, 'অফ ট্রেড অ্যান্ড ট্রেডার্স ইন সেভেনটিন্‌থ সেনচুরি ইন্ডিয়া ঃ অ্যান আনপাবলিশড ফ্রেঞ্চ মেমোয়ার বাই জর্জ রোকে', ১৬৭৬ সালে এর ব্যবহার বর্ণনা করেছেন, *দি ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রিভিয়্যু*, ৯ খন্ড, সংখ্যা ১-২, পৃঃ ১০-১১, 'এধরণের বণিক এবং সুতাকাটুনীরা সংখ্যায় অগণ্য ছিলেন কারণ মুসলমানদের সব নারী শ্রমিকরা (দাসী) চরকা কেটে মালিকদের সাহায্য করতেন, এফ. আর. মার্টিন, '*দি মিনিয়েচার পেইন্টিং অ্যান্ড পেইন্টারস অফ পার্সিয়া, ইন্ডিয়া অ্যান্ড টার্কি ফ্রম দি এইটথ্ টু দি এইটিন্‌থ সেনচুরি*, লন্ডন, ১৯১২, পৃঃ ২০৭এ; ফক অ্যান্ড আর্চার, পৃঃ ২৩৮, পৃঃ ৪৩৫-এর প্লেট, 'কাশ্মীরের গ্রামীণ জীবন' তুলে ধরে তার বর্ণনা করেছেন (অবধ লখনউ ঘরানার মিনিয়েচার), ১৭৬০।

৮৪। *মিফতাহ্-উল ফুজালা*. ফোলিও ২৪০এ।

৮৫। তদেব, উল্লেখ *কলব*। হিন্দী প্রতিশব্দটি এর প্রাচীনত্বের প্রমাণ এবং এখনও এর ব্যবহার চলে। একে বলা হয় *পরেন্‌তি* বা *ফিরেন্‌তি* (তুলনীয় ইস্‌তিলহৎ-ই পেশাওরান, ২য় খন্ড, পৃঃ ১০, উল্লেখ পরেন্‌তি, ফিরেন্‌তি)।

৮৬। তদেব, ফোলিও ২৩৯ বি, উল্লেখ *কলওয়া*। এর হিন্দী প্রতিশব্দ *আটে*-র ব্যবহার রয়েছে *ইস্‌তিলহৎ-ই পেশাওরান*-এ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৯, উল্লেখ *আট্টি* বা *আন্টি*।

৮৭। ফক ও আর্চার, পৃঃ ৩, ক্যাটালগ ৪, পৃঃ ৪৭।

৮৮। *মিফতাহ্-উল ফুজালা*, ফোলিও ১৫১, এ।

৮৯। *মিফতাহ্-উল ফুজালা*, উল্লেখ *জঘুনা*।

৯০। *বহর-ই আযম*, উল্লেখ *মশোরা*।

৯১। তদেব।

৯২। ডাবলিনের চেস্টার বেটি লাইব্রেরিতে রক্ষিত পান্ডুলিপি, পান্ডুলিপি ২১, ফোলিও ৭৯ আর, প্রতিলিপির জন্য দেখুন, *দি ইন্ডিয়ান হেরিটেজ ঃ কোর্ট লাইফ অ্যান্ড আর্টস আন্ডার মুঘল রুল*, লন্ডন, ১৯৮২, প্লেট ২৩, পৃঃ ৩২।

৯৩। *মিফতাহ্‌-উল ফুজালা*, ফোলিও ১২বি, উল্লেখ অহর।

৯৪। তদেব, ফোলিও ২৬৮।

৯৫। তদেব, উল্লেখ *মালা*, ফোলিও ২৭১ বি, ২৭২ বি, ২৭২ এ। এর হিন্দী প্রতিশব্দের জন্য দেখুন *ইস্‌তিলহৎ-ই পেশাওরান*, ২য় খন্ড, পৃঃ ৮৩, উল্লেখ *কুণ্ড*। একে *ফুলি* বা *ঝরনিও* বলা হয়ে থাকে, তদেব, পৃঃ ৮৮।

৯৬। ফক ও আর্চার, পৃঃ ৩, ক্যাটালগ ৪, পৃঃ ৪৭।

৯৭। আর. প্যাটারসন-এর প্রবন্ধ, সি. রিঙ্গার সম্পাদিত গ্রন্থে সংকলিত, পৃঃ ২০৯।

৯৮। জে. মার্শাল, *মহেঞ্জোদড়ো অ্যান্ড দি ইন্ডাস সিভিলাইজেশন*, দিল্লী, ১৯৭৩, পৃঃ ৫৮৫-৮৬।

৯৯। ভি. এস. আগরওয়ালা, *ইন্ডিয়া অ্যাজ নোন টু পাণিনী*, এখানে বলেছেন "অস্তিরনম তন্ত্রস, প্রোতম তন্ত্রম" এলাহাবাদ, ১৯৫৩, পৃঃ ২৩১-৩২।

১০০। উইলহেলম রাউ, *ভেবেন উন্ড ফ্লেক্টেন ইন ভেডিশেন ইন্ডিয়েন*, ভাইজবাডেন, পৃঃ ১৭-২৪। বিজয়া রামস্বামী, *টেক্সটাইলস অ্যান্ড উইভারস ইন মেডিয়েভ্যাল সাউথ ইন্ডিয়া*, দিল্লী, ১৯৮৫, ভুলক্রমে এই বিখ্যাত শ্লোকটির ডব্ল্যু. ডি. হুইটনি-কৃত অনুবাদটি মেনে নিয়েছেন, যার উল্লেখ করেছেন রাউ ১৯ পৃষ্ঠায়। রাউয়ের ব্যাখ্যা অনুযায়ী অনুভূমিক তাঁতের বদলে উলম্ব তাঁতের শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে (তদেব, পৃঃ ২৪), আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক এস. আর. শর্মার কাছে আমি এজন্য কৃতজ্ঞ যে তিনি তার ব্যক্তিগত সংগ্রহের বইটি থেকে আমার জন্য প্রয়োজনীয় অংশগুলি অনুবাদ করে দিয়েছেন।

১০১। তুলনীয় ফোর্বস, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৯৮-৯।

১০২। উল্লেখ করেছেন বিজয়া রামস্বামী, 'নোটস অন টেক্সটাইল টেকনোলজি ইন মেডিয়েভ্যাল ইন্ডিয়া উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু দি সাউথ', *I.E.S.H.R.* ১৭শ খন্ড, সংখ্যা ২, দিল্লী, ১৯৮০, পৃঃ ২৩০।

১০৩। *দিব্য অবদান* (প্রথম খ্রিস্টাব্দ), পৃঃ ৮৩, ২১-২৫-এ একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে ঃ 'তাঁতী (*কুবিন্দা*) কাপড় বোনার সময় কাপড় ও সূতো (*অভিচীর বিচ্‌কম*) জড় করে এবং মাথা উঁচু করে (*অভিনির্ময় দুধশিরস্কঃ*) হাতে পায়ে তালি দিতে দিতে (*স্ফটিতম পাণি পদ*) কাপড় বোনা শুরু করে', মোতি চন্দ্র, পৃঃ ২৯। 'হাত পায়ে তালি দেওয়ার' প্রসঙ্গে পাদানি-যুক্ত তাঁতের কথা সহজেই মনে আসে। তবে, এই বিশেষ অংশটির অনুবাদ যথার্থ নয়। *স্ফটিতম্‌* শব্দটির প্রয়োগ দ্বারা কোন প্রকার ভুলবোঝার অবকাশ থাকা উচিত নয়, কেননা এর দ্বারা ছেঁড়া, ছিন্নভিন্ন, ফেঁসে যাওয়া বোঝায়। দেখুন, ফ্রাঙ্কলিন এজরটন, *বুদ্ধিস্ট হাইব্রিড স্যানস্ক্রিট গ্রামার অ্যান্ড ডিকশনারি*, ২য় খন্ড, নিউ হেভেন, ১৯৫৩, পৃঃ ৬১ এল, উল্লেখ *স্ফটিত*। *দিব্য অবদান* থেকে অন্যান্য উল্লেখও তিনি করেছেন, পৃঃ ৮৩-২২, ৪৬৩.৪; ৩০৪.৭।

১০৪। লিন হোয়াইট, পৃঃ ১১৭, ১৭৩।

১০৫। ফোর্বস ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২১৮-১৯।

১০৬। ইলিনোরা কারুস-উইলসন, হাবেরগেট ঃ এ মেডিয়েভ্যাল টেক্সটাইল কোনানড্রাম', *মেডিয়েভ্যাল আর্কিওলজি*, ১৩, ১৯৬৯ [১৯৭১], পৃঃ ১৬৫, অনুভূমিক তাঁতের প্রাচীন

ইউরোপীয় প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন রাবি রাশি'র (মৃত্যু ১১০৫) তালমুদীয় (Talmudic) বিবরণীতে, যেটি উত্তর ফ্রান্সে লেখা হয়েছিল, উল্লেখ করেছেন লিন হোয়াইট, 'টেকনোলজি অ্যাসেসমেন্ট ফ্রম দি স্টান্স অফ এ মেডিয়েভ্যাল হিস্টরিয়ান', *মেডিয়েভ্যাল রিলিজিয়ন অ্যান্ড টেকনোলজি, কালেক্টেড এসেজ,* লস এঞ্জেলস, ১৯৭৮, পৃঃ ২৭৪-৭৫, এই আবিষ্কার ইতিপূর্বে ইউরোপে ত্রয়োদশ শতকের প্রাপ্ত নিদর্শনের তুলনায় প্রাচীনতর, সি. রিঙ্গার, ২য় খন্ড, পৃঃ ১১২। আরও দেখুন, আহমদ জে. আল-হাসান ও ডোনাল্ড আর হিল, পৃঃ ১৮৭।

১০৭। লিন হোয়াইট জুনিয়র, পৃঃ ১১৭।

১০৮। আহমদ জে. আল-হাসান ও ডোনাল্ড আর. হিল, পৃঃ ১৮৭।

১০৯। মওলানা দাউদ, *চন্দায়ন,* (সম্পা), মাতাপ্রসাদ গুপ্তা, আগ্রা, ১৯৬৭, পৃঃ ১৬৯। এই গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় ভাষার সূত্রটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের অধ্যাপক এস. শৈলেশ জাইদি'র প্রতি কৃতজ্ঞ।

১১০। *মিফতাহ্-উল ফুজালা,* তুলনীয় *লৌহ-পায়।*

১১১। তদেব, ফোলিও ২৬২এ।

১১২। ফক ও আর্চার, প্লেট নং ৩, ক্যাটালগ নং ৪, পৃঃ ৪৭।

১১৩। দেখুন এ. এ. আন্তনোভা, টি. বি. গ্রেক, ও পি. আকিমুশকিনা, *অ্যালবাম অফ ইন্ডিয়ান অ্যান্ড পার্শিয়ান মিনিয়েচারস.* ১৬শ—১৮শ শতক, আকাদেমি অফ সায়েন্সেস, ইউ. এস. এস. আর, মস্কো, ১৯৬২, প্লেট ৬৬।

১১৪। ইরফান হাবিব, 'মেডিয়েভ্যাল টেকনোলজি', পৃঃ ২২০।

১১৫। আর. প্যাটারসনের প্রবন্ধ, রয়েছে সিঙ্গার, ২য় খন্ড, পৃঃ ২১২, ত্রয়োদশ শতকের একটি পান্ডুলিপি থেকে একটি তাঁতযন্ত্রে লিভারের ব্যবহার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১১৬। দেখুন, *মিফতাহ্-উল ফুজালা,* ফোলিও ২৬২এ (ষোড়শ শতকের শেষভাগের জন্য); ইন্ডিয়ান হেরিটেজ, প্লেট নং ২৩ (ষোড়শ শতকের জন্য), ফক ও আর্চার, প্লেট-৩, ক্যাটালগ ৪, পৃঃ ৪৭ (ষোড়শ শতকের শেষভাগের জন্য); অ্যালবাম অফ ইন্ডিয়ান ও পার্শিয়ান মিনিয়েচারস, প্লেট - ৬৬ (সপ্তদশ শতকের জন্য); জে. স্কিনার, *তশিরুল আকওয়াম* (১৮২৫ খ্রি) (রোটোগ্রাফ), ব্রিটিশ মিউজিয়াম, অ্যাডি. ২৭, ২৫৫, ফোলিও ৫১, এবং তাঁতী ও তার বিপরীতে তাঁতের চিত্র, পৃঃ ২৪৪ (উনিশ শতকের প্রথম ভাগের জন্য)। টানার সুতো লাগান যাতে টানার দন্ডে এবং টানার দন্ড দুজোড়া তারের (বা দড়ির) সঙ্গে বাঁধা থাকে, যার দ্বারা টানার সুঁতো তাঁতীর কাছে চলে আসে। ছবিতে তাঁতে তারজোড়ার কথা না বলা হলেও কোনধরণের লিভার প্রযুক্তি এখানে সম্ভব নয়।

১১৭। লিন হোয়াইটি, পৃঃ ১১৮।

১১৮। *তদেব।*

১১৯। উল্লেখ করেছেন ইন্দ্রাণী রায়, '*অফ ট্রেড অ্যান্ড টেডার্স ইন দি সেভেন্‌টিনথ সেনচুরি ইন্ডিয়া,* অ্যান আনপাবলিশড ফ্রেঞ্চ মেমোয়ার বাই জর্জ রোকে', *দি ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রিভিয়ু,* ৯ম খন্ড (১-২), দিল্লী, ১৯৮২-৮৩, পৃঃ ৯৪, পান্ডুলিপি, পৃঃ ৩০-৩২।

১২০। বিজয়া রামস্বামী, *I.E.S.H.R.*, ১৭শ খন্ড, সংখ্যা ২, পৃঃ ২৩২।

১২১। *তদেব*, পৃঃ ২৩২। রামস্বামী মনে করেছেন যে, *অচ্ছুতরি* বলতে এমন এক প্রক্রিয়ার কথা বোঝায় যাতে তাঁতের ওপরের কাঠের ফ্রেমে কিছু দড়ি বাঁধা থাকে, (একজন সহকারী দ্বারা) ঠিক ঠিক ভাবে তা টানা হয়, সে সময় বুনটের মধ্য দিয়ে তাঁতী তার মাকুটি চালাতে থাকেন। এই ব্যাখ্যার সমর্থনে কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নি (তদেব, পৃঃ ২৩২)।

১২২। ফোর্বস, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২১৮।

১২৩। রামস্বামী উল্লেখ করেছেন, *I.E.S.H R* ১৭শ খন্ড, সংখ্যা ২, পৃঃ ২৩৩, একাদশ শতকে টানা-তাঁতের সমর্থনে তিনি মত পেশ করেছেন।

১২৪। *তদেব*।

১২৫। *তদেব*।

১২৬। আবুল ফজল, *আইন-ই আকবরি*, সম্পা, ব্লখম্যান, বিব. ইন্ড., ১ম খন্ড, কলকাতা, ১৮৬৬-৬৭, পৃঃ ৫০-৫১।

১২৭। *আইন-ই আকবরি*, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫০-১; ফস্টার, সম্পা, *ইংলিশ ফ্যাক্টরিজ ইন ইন্ডিয়া* (১৬১৮-২১), ১ম খন্ড, অক্সফোর্ড, ১৯০৬, পৃঃ ১৬৮, ১৮৮; পেলসার্ট, *জাহাঙ্গীর'স ইন্ডিয়া*, অনু / সম্পা, ডব্ল্যু. এইচ. মোরল্যান্ড ও পি. গেইল, কেমব্রিজ, ১৯২৫, পৃঃ ৯।

১২৮। *আইন-ই আকবরি*, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫০-৫১, পেলসার্ট, পৃঃ ৯, তাভারনিয়ে, *ট্র্যাভেলস ইন ইন্ডিয়া*, ২য় খন্ড, অনু., ভি. বল, রেভ. ডব্ল্যু. ক্রুক, ভারতীয় সংস্করণ, নয়াদিল্লী, ১৯৭৭, পৃঃ ২।

১২৯। ডব্ল্যু. ফিঞ্চ, *আর্লি ট্র্যাভেলস ইন ইন্ডিয়া* (১৫৮৩-১৬১৯), ফস্টার সম্পা. লন্ডন, ১৯২১, পুনর্মুদ্রণ, নয়াদিল্লী, ১৯৮৫, পৃঃ ১৭৭; (পেলসার্ট, পৃঃ ৭)

১৩০। *আইন-ই আকবরি*, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪২৩।

১৩১। তদেব, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৪২।

১৩২। *আইন-ই আকবরি*, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৭, *E.F.I.*, ১৬১৮-২১, পৃঃ ৫১; পেলসার্ট, পৃঃ ৩১; নিকোলাও মানুচি, *স্তোরিও দো মোগোর*, ২য় খন্ড, অনু, ডব্ল্যু. আরভিন, লন্ডন, ১৯০৭-৮, পুনর্মুদ্রণ, নয়াদিল্লী, ১৯৯০, পৃঃ ৪২৪।

১৩৩। স্ট্রেইনশ্যাম মাস্টার, *ডায়ারিজ অফ স্টেইনশ্যাম মাস্টার ১৬৭৫-৮০*, ২য় খন্ড, সম্পা, আর. সি. টেম্পল, লন্ডন, ১৯১১, পৃঃ ১৭১।

১৩৪। *তদেব*।

১৩৫। দেখুন হান্স ই. উলফ্, পৃ ২১৪-১৬, এতে সনাতনী শিল্পকর্মটি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১৩৬। *রাজতরঙ্গিনী*, ৬ষ্ঠ খন্ড, বোম্বাই, ১৮৯২, পৃঃ ১৩৭, উল্লেখ করেছেন মোতি চন্দ্র, পৃঃ ১৭০, ২৩৭।

১৩৭। মোতি চন্দ্র, পৃঃ ১৭০, ২৩৭।

১৩৮। *রাজতরঙ্গিনী*, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ২৯, উল্লেখ করেছেন মোতি চন্দ্র, পৃঃ ১৭০, ২৩৭।

১৩৯। *তদেব*, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩০।

১৪০। তুলনীয়, ডব্ল্যু মুরক্রফট ও জি. ট্রেবেক. *ট্র্যাভেলস ইন দি হিমালয়ান প্রভিন্সেস অফ হিন্দুস্তান*

দি পাঞ্জাব ইন লাদাখ অ্যান্ড কাশ্মীর, ইন পেশোয়ার, কাবুল, কুন্দুজ অ্যান্ড বোখারা ফ্রম ১৮১০-১৮২৫, ২য় খন্ড, সম্পা. এইচ. উইলসন, লন্ডন, ১৮৩৭, পুনর্মুদ্রণ, দিল্লী, ১৯৭১, পৃঃ ১৭৯-৮১।

১৪১। *E.F.I.*, ১৬১৮-১৬২১, পৃঃ ১৬৮, ১৯২, ৩৪৭; *E.F.I.*. ১৬২২ - ১৬২২, পৃঃ ৫০, ৭২, ১০৩, ১০৪, ১১৮, ১৪০, ১৮৯; *E.F.I.*, ১৬৩০ - ১৬৩৩, পৃঃ ৬৩, ৭১, ২৪৬; *E.F.I.*, ১৬৪৮ - ১৬৫০, পৃঃ ২, ৩৩, ৫৬, ৭৮, ১১২, ২৫৩, ২৭৬, ২৮০।

১৪২। তাভারনিয়ে, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫।

১৪৩। উদ্ধৃত হয়েছে পল ই শোয়াৎর্জ, *প্রিন্টিং অন কটন অ্যাট আহ্‌মেদাবাদ ইন ইন্ডিয়া ইন* ১৬৭৮, (সংগ্রহশালার মোনোগ্রাফ নং ১) আমেদাবাদ, ১৯৬৯, পৃঃ ৭।

১৪৪। তদেব।

১৪৫। এ. কে. কুমারস্বামী, *দি আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফ্টস অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড সিলোন*, (প্রথম প্রকাশ, ১৯১৩), নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৫, পৃঃ ২০১।

১৪৬। জন মার্শাল, *ট্যাক্সিলা*, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৩৭।

১৪৭। আর. সি. গৌর, 'অ্যান আর্লি টেরাকোটা প্রিন্টিং ব্লক', প্রকাশিত হয়েছে *বায়াস ইন ইন্ডিয়া হিস্টারিওগ্রাফি*, সম্পা, দেবাহুতি, দিল্লী, ১৯৮০. পৃঃ ২৭৬-৭৭; আরও দেখুন আর. সি. গৌর, *এক্সাভেশন অ্যাট অত্রন্‌জিখেরা আর্লি সিভিলাইজেশন অফ দি আপার গঙ্গা বেসিন*, দিল্লী, ১৯৮৩, পৃঃ ২৪৪, ৩৮০, প্লেট নং ১০১।

১৪৮। রোকে, প্রকাশিত হয়েছে পি. আর. শোয়াৎর্জ, *প্রিন্টিং অন কটন অ্যাট আমেদাবাদ ইন ইন্ডিয়া ইন* ১৬৭৮, পৃঃ ৮।

১৪৯। গৌর, *পূর্বোল্লিখিত*, পৃঃ ২৭৭।

১৫০। ফোর্বস, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৩৮-৩৯, হান্স ই. উলফ্, পৃঃ ২২৪, ফোর্বসকে অনুসরণ করে একই ধরণের ভুল করেছেন।

১৫১। বাণভট্ট, *হর্ষচরিত*, সম্পা, পি. ভি. কানে, ২য় সং, দিল্লী, ১৯৬৫, *উচ্ছ্বাস* ৪র্থ সর্গ, পৃঃ ১৪।

১৫২। তদেব, উচ্ছ্বাস ৪র্থ সর্গ সংক্রান্ত টীকা, পৃঃ ৫৪-৫।

১৫৩। *হর্ষচরিত*, টীকা পৃঃ ৫৪-৫।

১৫৪। ভি. এস. অগ্রবাল, 'রেফারেন্সেস টু টেক্সটাইলস ইন বাণ'স হর্ষচরিত', *জর্নাল অফ ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল হিস্ট্রি*, ৪র্থ খন্ড, আমেদাবাদ, ১৯৫৯, পৃঃ ৬৭।

১৫৫। ভি. এস. অগ্রবাল, *ইন্ডিয়া অ্যাজনোন টুপাণিনি*, পৃঃ ২৭২।

১৫৬। ভি. এস. অগ্রবাল, *হর্ষচরিত এক সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন*, পাটনা, ১৯৫৩, পৃঃ ৬৭।

১৫৭। দেখুন ইশরাত আলম, "টেকনোলজিক্যাল এক্সচেঞ্জেস বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইরান ইন এনশিয়েন্ট অ্যান্ড মেডিয়েভ্যাল টাইমস", প্রকাশিত হয়েছে ইরফান হাবিব সম্পা, *এ শেয়ারড্ হেরিটেজ, দি গ্রোথ অফ সিভিলাইজেশন ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইরান*, দিল্লী, ২০০২, পৃঃ ৯০।

১৫৮। তদেব।

১৫৯। দেখুন ইশরাত আলম, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৩৬।

১৬০। মোতি চন্দ্র, পৃঃ ১২৫।

১৬১। তদেব, পৃঃ ১২৫।

১৬২। তদেব, পৃঃ ১২৫।

১৬৩। তদেব, পৃঃ ১৪৭, ১৬৮।

১৬৪। ইরফান হাবিব, 'মেডিয়েভ্যাল টেকনোলজি'।

১৬৫। দেখুন ইশরাত আলম, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৩৬-১৩৭।

১৬৬। *বহর-ই আযম*, উল্লেখ *চপা, কলিব*।

১৬৭। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন ইরফান হাবিব, *স্টাডিজ ইন হিস্ট্রি*, নয়াদিল্লী, ২য় খন্ড (১), ১৯৮০, পৃঃ ৩১; আরও দেখুন, ইরফান হাবিব, 'মেডিয়েভ্যাল টেকনোলজি', পৃঃ ২১৯।

১৬৮। তদেব।

১৬৯। ভারতের জন্য, *ইসতিলহৎ-ই পেশাওরান*, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৬৮, উল্লেখ ছাপা; ইরানের জন্য দেখুন উলফ, পৃঃ ২২৪-২৭।

১৭০। *মিফতাহ্-উল ফুজালা*, উল্লেখ *রংরেজ*, ফোলিও ১৩৩বি।

১৭১। তদেব।

১৭২। *অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি*, উল্লেখ *bandana*; এতে অনুমান করা হয়েছে যে শব্দটি প্রথম পর্তুগীজে গৃহীত হয়েছিল।

১৭৩। *হর্ষচরিত, উচ্ছ্বাস* ১ম সর্গ, পৃঃ ১৪, 'কুসুমভরগপটলং, পুলকবন্ধচোত্রং চন্ডতকমন্তঃ স্ফুটং স্ফটিকভূমিরিব রত্ননিধনং দধন', অনু, টীকা পৃঃ ৬৯, সূর্যমুখীর রঙে রঞ্জিত, নানা বর্ণে চিত্রিত একটি নিম্নাবরণ পরিধন করে বস্ত্রাবরণের মধ্যে সে ঝলমল করতে লাগল, যেন মণিমাণিক্যপূর্ণ একটি স্ফটিক টুকরো; *উচ্ছ্বাস*, ৪র্থ সর্গ, পৃঃ ১৪, বহুবিধভকিতি নির্মাণ নিপুণ পুরাণ পৌর পুরস্ত্রীবধ্যমনের বদ্ধেশ্চ, অনু. ভি. এস. অগ্রবাল, *J.I.T.H.*, ৪র্থ খন্ড পৃঃ ৬৬, পুরাতন ধাত্রীগণ নানা প্রকারের নকশা রচনায় (বহুবিধভক্তি) পারদর্শী ছিলেন, যেগুলির মধ্যে কয়েকটিকে বর্তমান বন্ধনযুক্ত হচ্ছে (বধ্যমান), কিছু ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়ে রয়েছে (বধ্য)। এটি আশ্চর্যজনক যে ভি. এস. অগ্রবাল পরের বাক্যটির উল্লেখ করছেন না, যাতে পরিষ্কার বলা হচ্ছে যে সেগুলি বোনা হয়ে গেছে সেগুলিকে রংরেজ (*রজক*) রং করেছেন। প্রাচীনা মহিলা রংরেজকে পুরস্কৃত করেছেন, যাতে রংরেজ আত্মপ্রসাদে ডগমগ হয়ে পড়েছেন'। এটি নিঃসন্দেহে রং করার উল্লেখ। অতএব, এই কাব্যের পূর্বাপর বিন্যাস কোন ধরণের ছাপাইয়ের সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেয়। তদুপরি, কাপড় আগে ছাপিয়ে তারপরে রং করা যায় না। কখনই তা করা হয় নি।

১৭৪। মোতি চন্দ্র, পৃঃ ১২৪।

১৭৫। *আইন-ই আকবরি*, ১ম খন্ড, পৃঃ ৯১।

১৭৬। *বহর-ই আযম*, উল্লেখ *গুলবন্দ ওয়া গুলবন্দি*।

১৭৭। তদেব।

১৭৮। লং-কে উদ্ধৃত করেছেন এইচ. ইউল ও এ. সি. বার্ণেল (সম্পা) *হবসন-জবসন*, প্রথম প্রকাশ, ১৮৮৬, নতুন সং, ডব্লু. ক্রুক, লন্ডন, ১৯০৩, উল্লেখ *bandana*, পৃঃ ৫৭।

১৭৯। তু. *ইসতিলহৎ-ই পেশাওরান*, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫৩ (উল্লেখ *বন্দনো*), পৃঃ ৪০, (উল্লেখ *চুনদারি*)।

১৮০। E. F. I. ১৬৩৪ - ১৬৩৬, পৃঃ ৮২-৩, 'Notwithstanding. were intreated Fremlen to inform himself of the order thereof and whether it might not be done upon coloured cloth as well as white cloth, whereunto he replies that it cannot be done but upon white cloth coely. and this is peeces not above 4 or 5 yards at the most, which is stayned after the forme of the fine paintains of Masulipatan, and into so many dye fatts as there are several colours, that part of it which must not take the dye being covered with a kind of earth, the rest which is uncovered takes the colour of the dye where unto it is put'.

১৮১। মেথোল্ড-এর উদ্ধৃতি, *রিলেশনস অফ গোলকোন্ডা ইন দি আর্লি সেভেনটিনথ্ সেনচুরি*, সম্পা/অনু ডব্লু. এইচ. মোরল্যান্ড, লন্ডন. ১৯৩১, পৃঃ ৩৫। জন ফ্রায়ার, *নিউ অ্যাকাউন্ট অফ ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যান্ড পার্সিয়া বিয়িং নাইন ইয়ার্স ট্রাভেলস* ১৬৭২-৮১, ডব্লু ক্রুক (সম্পা) লন্ডন, ১৯০৯, ১ম খন্ড, পৃঃ ৯০।

১৮২। মোতি চন্দ্র, পৃঃ ৩০।

১৮৩। কৃষ্ণ চৈতন্য. *এ নিউ হিস্ট্রি অফ স্যানসক্রিট লিটারেচার, দিল্লী*. ১৯৭৭, পৃঃ ২২৮।

১৮৪। এ. ইউ. পোপ এবং পি. একেরম্যান (সম্পা), *দি সার্ভে অফ পার্সিয়ান আর্ট*, ৫ম খন্ড, তেহরান।

১৮৫। জিয়া বরনি, *তারিখ-ই ফিরোজশাহী*, (সম্পা) সৈয়দ আহমদ, বিব. ইন্ড., কলকাতা, ১৮৬২, পৃঃ ২২৩।

১৮৬। জি. ওয়াট, *D.E.P.I.*, ৪র্থ খন্ড (৩), ২য় পুনর্মুদ্রণ, দিল্লী, পৃঃ ১।

১৮৭। এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগত আলোচনার জন্য দেখুন ওয়াট, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২-৬, ৬৭-৯৬।

১৮৮। দেখুন ইশরাত আলম, "হিস্ট্রি অফ সেরিকালচার ইন ইন্ডিয়া টু দি সেভেনটিনথ সেনচুরি", *প্রসেডিংস অফ দি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস*, হীরক জয়ন্তী অধিবেশন, কালিকট, ১৯৯৯, পৃঃ ৩৪০-৩৪৩।

১৮৯। ওয়াট, *D.E.P.I.*, ১১শ খন্ড (৩), পৃঃ ১৮, ৪৯-৬২।

১৯০। টমাস ওয়াটার্স, *অন য়ুআন চঙ্'স ট্র্যাভেলস ইন ইন্ডিয়া*, ১ম প্রকাশ, ১৯০৫, পুনর্মুদ্রণ, নয়াদিল্লী, ১৯৭৩, পৃঃ ১৪৮, ২৮৬-২৮৭।

১৯১। তদেব, পৃঃ ২২৫, ২৩৯-৪০, ২৮৩-২৮৫।

১৯২। তদেব, পৃঃ ২৬১।

১৯৩। তদেব, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৯৫, তার কাশ্মীর সম্বন্ধীয় বিবরণের বিপরীতে তিনি কু-সা-তান-বা (খোটান) সম্পর্কে লিখছেন, "এই দেশে কম্বল, সূক্ষ্ম পশমী বস্ত্র এবং *শৈল্পিক বয়নের রেশম* .... উৎপাদিত হয়" (নজরটান বর্তমান প্রাবন্ধিকের)।

১৯৪। এডওয়ার্ড সি. সাচাউ, আলবিরুনী'স ইন্ডিয়া, পুনর্মুদ্রণ, দিল্লী, ১৯৮৯, পৃঃ ২০৬-২০৮।

১৯৫। এম. এ. স্টাইন, অনু/সম্পা *কলহন'স রাজতরঙ্গিনী* ১ম সং, লন্ডন, ১৯০০, পুনর্মুদ্রণ, নয়াদিল্লী, ১৯৬১ ও ১৯৭৯। কলহন কাশ্মীরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দ্রব্যগুলির উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখছেন, "বিদ্যাচর্চা, সুউচ্চ হর্ম্যরাজি, কেশর, হিমশীতল বারি এবং

দ্রাক্ষা। স্বর্গেও দুর্লভ বস্তুনিচয় এখানে সহজেই পাওয়া যায়" (১ম খন্ড, পৃঃ ৪২)। একই ধরণের উদাহরণ মিলবে ১ম খন্ডে, পৃঃ ৪২, ২৯৪, ২৯৯; ২য় খন্ডে, পৃঃ ৬০; ৫ম খন্ডে, পৃঃ ১১৬-১৭, ২৭১; ৮ম খন্ডে, পৃঃ ১৪৮।

১৯৬। কাশী নাথ ধর, অনু/সম্পা *শ্রীবর'স জৈন রাজতরঙ্গিনী*, নয়াদিল্লী, ১৯৯৪, পৃঃ ২৩৬।

১৯৭। তদেব, পৃঃ ২৩৭।

১৯৮। শরফুদ্দিন আলি ইয়াজদি, *জাফরনামা*, সম্পা, মৌলভি মহম্মদ ইলাহবাদী, ২ খন্ড, ১৮৮৭-১৮৮৮।

১৯৯। মির্জা মহম্মদ হায়দর, *তারিখ-ই রশিদী*, অনু. ই. ডেনিসন রস, পাটনা, ১৯৭৩, পৃঃ ৪৫, লক্ষ্য করেছেন, "কাশ্মীরের বিস্ময়কর বস্তুগুলির মধ্যে রয়েছে তুঁতগাছ (যেগুলিকে চাষ করা হয়) তাদের পাতার জন্য, যার থেকে পাওয়া যায় (রেশম)"। আরও দেখুন ওয়াল্টার আর. লরেন্স. *দি ভ্যালি অফ কাশ্মীর*, লন্ডন, ১৮৯৫, পৃঃ ৩৬৬-৩৬৭। সি. ই. বেটস, *এ গেজেটিয়ার অফ কাশ্মীর*, দিল্লী, ১৯৮০, পৃঃ ৬১-তে উল্লেখ রয়েছে আরেক ধরণের ঐতিহ্যের যেখানে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে বাদশাহ আকবরের শাসনকালের কিছু পূর্বে কাশ্মীরে রেশমপোকার প্রচলন করেন কাশগড়ের মির্জা হায়দার যিনি বোখারা থেকে ডিম আমদানি করেছিলেন। মির্জা হায়দর দোগলতের রচনায় রেশমের প্রথম যে সাহিত্যিক উল্লেখ পেলাম তার থেকেই সম্ভবত এই ঐতিহ্যের উৎপত্তি।

২০০। ইরফান হাবিব, "নোট অন ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি ইন দি সেভেনটিনথ সেনচুরি", প্রবন্ধটি রয়েছে *এসেজ ইন অনার অফ প্রফেসর এস. সি. সরকার*, নয়াদিল্লী, ১৯৭৬, পৃঃ ১৮৬-১৮৭, গ্রন্থে [এরপর থেকে "ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি"] একই ধরণের মন্তব্য রয়েছে তার "এগ্রারিয়ান ইকোনমি" অধ্যায়ে, যেটি রয়েছে তপন রায়চৌধুরী ও ইরফান হাবিব সম্পাদিত *দি কেমব্রিজ ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া*, ১ম খন্ড, কেমব্রিজ / দিল্লী, ১৯৮২, পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৪, এই গ্রন্থে। খ্রিস্টীয় ১৯শ শতক পর্যন্ত এর প্রচলন ছিল, মুরক্রফ্‌ট ও ট্রেবক, পূর্বোল্লিখিত, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৫৫। তারা লক্ষ্য করেছিলেন যে খোটানে বিস্তীর্ণ এলাকায় রেশম চাষ হয়, এবং তা ইয়ারকন্দ ও বালতিস্তান হয়ে কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত।

২০১। *আইন-ই আকবরি*, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৬২-৫৬৩, আরও দেখুন ইশরাত আলম, "সিল্ক অ্যান্ড সিল্ক টেকনোলজি ইন মেডিয়েভ্যাল ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি", প্রবন্ধটি রয়েছে "আলিগড় পেপারস অন মেডিয়েভ্যাল ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি" সংকলনে, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৪৫তম অধিবেশন, আন্নামালাইনগর, ১৯৮৪; পৃঃ ৬৪।

২০২। *আইন ই আকবরি*, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫১৪, বিস্তৃততর টীকার জন্য দেখুন ইরফান হাবিব, *অ্যাটলাস অফ দি মুঘল এম্পায়ার*, 4B পাতার টীকা, উত্তরপ্রদেশ, অর্থনৈতিক, পৃঃ ৩২।

২০৩। ইরফান হাবিব, *CEHI*, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৩।

২০৪। মানরিক, *ট্র্যাভেলস*, অনু. সি.ই.লুয়ার্ড, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৩৯; এ হ্যামিলটন, *ট্র্যাভেলস* ...., ১ম খন্ড, পৃঃ ৭৭; আরও দেখুন ইরফান হাবিব, "ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি" পৃঃ ১৮৬।

২০৫। তদেব।

২০৬। ইরফান হাবিব, *এগ্রারিয়ান সিস্টেম অফ মুঘল ইন্ডিয়া*, পৃঃ ৫২ [এরপর এগ্রারিয়ান সিস্টেম]।

২০৭। ডব্ল্যু. পি. কুলহাস, সম্পা, *জেনেরাল মিসিফেল, ডীল, ৩য়ঃ ১৬৫৫-১৬৭৪*, এস-গ্রাভেনহেগ, ১৯৬৮, পৃঃ ৬৫৯।

২০৮। তদেব।

২০৯। "তুঁতগাছ, বুনো তুঁতগাছ, রেশম-কীট এবং রেশমগুটি এ সবই তাদের রয়েছে, (কিন্তু) কেবল সূক্ষ্ম রেশম, নকশাদার রেশমী রুমাল ও অসূক্ষ্ম রেশম তৈরি করতে পারে; কেমন করে রেশমের ফেঁসো বানাতে হয় তা তারা জানেনা" মা হুয়ান, *ইয়েঙ্-ইআই শেঙ্-লান, দি ওভারঅল সার্ভে অফ দি ওসেন শোরস*, অনু, জি.ভি.জি. মিলস, কেমব্রিজ, ১৯৭০, পৃঃ ১৬৩।

২১০। ওয়াট, *DEPI*. ৪র্থ খন্ড (৩), পৃঃ ৬। রেশমকীটের ক্ষেত্রে তুঁতের গুণমান নির্ভর করত যে এলাকায় তা পাওয়া যায় সেখানকার জলবায়ুগত ও অন্যান্য অবস্থার উপর।

২১১। পিটার ফান ডাম, *বেশ্রিভিংগে ফান ডে উস্ট ইন্ডিশ কোম্পানি*, সম্পাদনা, এফ. ডব্ল্যু. স্টাপেল, এস-গ্রাভেনহেগ, ২য় খন্ড (২), পৃঃ ৬৮।

২১২। ওয়াট, *পূর্বোল্লিখিত*. পৃঃ ১৪৬, রামকিউসে'র (১৬১৯) মন্তব্য উল্লেখ করেছেন যে ভারতীয়রা ১৫শ শতকের শেষদিকে কোন এক সময়ে তসর-রেশম গোটাতে শিখেছিলেন। এটিকে একটি আলগা মন্তব্য বলে মনে হয় কেননা প্রাচীনকাল থেকেই বন্য রেশমের সঙ্গে ভারতবর্ষ পরিচিত ছিল।

২১৩। হরপ্রসাদ রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৯২; ডিয়েটার কুন, *সায়েন্স অ্যান্ড সিভিলাইজেশন ইন চায়না*, সম্পা জোসেফ নীডহ্যাম, ৫ম খন্ড (৯), কেমব্রিজ, ১৯৮৮, পৃঃ ৩৪৭।

২১৪। ডিয়েটার কুন, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৩৫৪-৪০৪।

২১৫। তদেব।

২১৬। পিটার ফান ডাম, ২য় খন্ড (২), পৃঃ ৬৮।

২১৭। তদেব।

২১৮। তদেব।

২১৯। তদেব।

২২০। তদেব।

২২১। ওম প্রকাশ, *দি ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অ্যান্ড দি ইকোনমি অফ বেঙ্গল ১৬৩০-১৭২০*, দিল্লী, ১৯৮৮, পৃঃ ৫৫, দেখেছেন যে, ট্যানি যথেষ্ট পরিমাণে উন্নততর একটি প্রজাতি ছিল যেটি উৎপাদনের সময় এককপিছু বিপুল সংখ্যক রেশমগুটি ব্যবহৃত হত। তিনি দাবী করেছেন যে আগ্রার বণিকরা, যারা ছিলেন বাংলার কাঁচা রেশমের প্রধান ক্রেতা, তাদের উদ্যোগে ১৬৬৯ সালে এই প্রজাতিটির প্রচলন করা হয়। তবে ওলন্দাজ প্রতিবেদনটি দ্বারা এই দাবীটি সমর্থিত হয় না।

২২২। পিটার ফান ডাম ২য় খন্ড (২), পৃঃ ৬৮।

২২৩। তদেব।

২২৪। তদেব, পৃঃ ৬৯-৭০।

২২৫। পিটার ফান ডাম যে তথ্য দিয়েছেন সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ওম প্রকাশের ধারণার থেকে অনেকটা আলাদা, দেখুন ওম প্রকাশ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৫৫-৫৬।

২২৬। ওম প্রকাশ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৫৬।

২২৭। এই রেশমটির উৎপত্তি অনুযায়ী এটিকে *মট্‌কা* রেশম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেসব রেশমগুটি ভেদ করে রেশমপোকা নির্গত হয়, তার থেকে এটি প্রস্তুত হয়। সুতরাং মচ্‌তা কথাটি এসেছে *মুচকত* অর্থাৎ 'তারা নিজেদের মুক্ত করে' — এর থেকে (দেখুন জে.সি. রায়, ''টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি ইন এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া'', *জর্নাল অফ দি বিহার অ্যান্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি*, ৩য় খন্ড, ১৯১৭, পৃঃ ২১৯।

২২৮। ওম প্রকাশ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৫৬।

২২৯। তাভারনিয়ে, ১ম খন্ড, পৃঃ ২।

২৩০। ইবফান হাবিব, *এগ্রারিয়ান সিস্টেম*, পৃঃ ৫২।

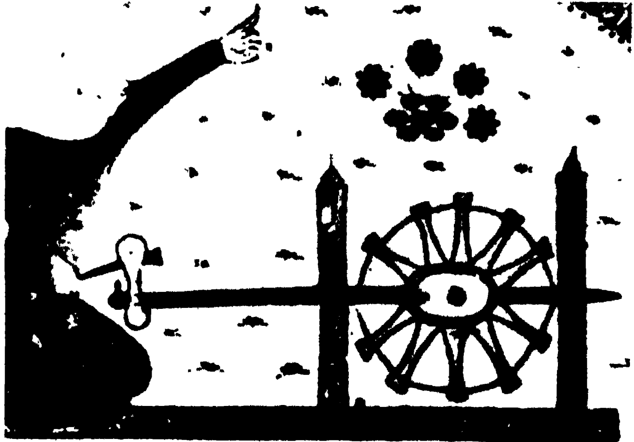
২৩১। ওম প্রকাশ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৫৭, তাভারনিয়ে'র এই মন্তব্যে সন্দেহপ্রকাশ করেছেন।

২৩২। ইরফান হাবিব, *এগ্রারিয়ান সিস্টেম*, পৃঃ ৫২।

অনুবাদক ঃ সৌভিক বন্দোপাধ্যায়



চিত্র নং ১ঃ তুলোর আঁশ ছাড়ানোর যন্ত্র, সূত্রনির্দেশ নং ২৩ দেখুন



চিত্র নং ২ঃ *মিফতাহ উল-ফুজালাতে* ছবি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন, অর ৩২৯৯ ফোলিও ১৫১ক, সূত্রনির্দেশ নং ৮২ দেখুন



চিত্র নং ৩ঃ *মিফতাহ-উল ফুজালাতে* ছবি, "লৌহপায়া", সূত্রনির্দেশ নং ১১০ দেখুন

ঔপনিবেশিক বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অবহেলিত তথ্যসূত্র

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়

গত কয়েক বছরে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের যে ধারাটি ক্রমশ আমাকে আকৃষ্ট করেছে তাকে ঘিরেই আজকের এই উপস্থাপনা। বিষয়টাকে বলতে পারেন ঔপনিবেশিক আমলে ভাগীরথীর দু-পারের নগরায়ণ। পর্তুগীজ অনুপ্রবেশের পর সাগরদ্বীপ থেকে সপ্তগ্রাম হয়ে ধাপে ধাপে চন্দননগর পর্যন্ত ভাগীরথীর দু-কূলে বসতি-বিন্যাসে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল সে বিষয়ে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এই ধারাটা যে আদপেই বেগবতী নয় সে কথা এই কাজে যাঁরা লিপ্ত আছেন তারা সকলেই উপলব্ধি করেছেন। কলকাতা শহরের পত্তন এবং তার ফলে নাগরিক সমাজের বিন্যাস নিয়ে অবশ্যই কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়েছে। পেশাগত পরিচয়ে যাঁরা ঐতিহাসিক, তাঁরা তো করেইছেন। পাশাপাশি রাধারমন মিত্র, থাংকপ্পন নায়ার অথবা শ্রীপান্থের মত ভিন্ন পেশার কলকাতা প্রেমীদের অবদানও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে হয়। তবে এর ফলে একটা অসুবিধাও হয়েছে। এঁদের মত গবেষকরা কলকাতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি এতটাই আকৃষ্ট করে রেখেছেন যে আশপাশের জনপদগুলোর ভাঙা গড়ার বর্ণময় ইতিহাসকে আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। চন্দননগর, চুঁচুড়া অথবা শ্রীরামপুরের কথা তবু কিছুটা উল্লেখিত হয়। টয়েনবী হুগলির ইতিহাসেব একটা প্রাথমিক খসড়া তৈরি করেই দিয়েছিলেন। তারপর অনেকেই এই ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। ফলে ভাগীরথীর কূল ধরে ইউরোপীয় অধ্যুষিত হুগলির শহরগুলোর অবয়ব খানিকটা চেনা যায়। কিন্তু পূর্ব উপকূল অনেকটাই অন্ধকারে। এপারে বিদেশী বণিকদের পদচিহ্ন ধরে গড়ে ওঠা অনেক জনপদই সামুহিক বিস্মৃতির কৃষ্ণগহ্বরে তলিয়ে গিয়েছে। কৈখালি, খেজুরি অথবা ফলতার একদা প্রাণচঞ্চল ইতিহাস ক'জনেরই বা স্মরণে আছে: নিদারুণ অবহেলা এবং অমার্জনীয় ইতিহাস বিমুখতার কারণে বিশেষত ভাগীরথীর পূর্বউপকূলে ইউরোপীয়দের স্মৃতি-বিজড়িত ইতিহাসের কতো উপাদান আজ অনিবার্য বিলুপ্তির পথে। এই উদ্বেগ আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়াটাও আমার আজকের উপস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

পরিস্থিতিটা যে কতটা উদ্বেগজনক, এই অঞ্চলে, বিশেষত সাগর থেকে ফলতা পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলে ক্ষেত্র - অনুসন্ধান করতে গিয়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। দু-একটা উদাহরণ দিই। আজ থেকে বছর দশেক আগে ওলন্দাজদের একটা দুর্গ সম্পর্কে তথ্যের

সন্ধানে ফলতায় গিয়েছিলাম। তখন আমরা ফোর্ট উইলিয়াম নিয়ে গবেষণা করছিলাম। আপনারা জানেন, ১৭৫৬ সালে কলকাতা থেকে বিতাড়িত হয়ে গভর্নর ড্রেক এবং তাঁর সঙ্গীরা ফলতায় পালিয়ে গিয়েছিলেন। আশ্রয় পেয়েছিলেন ওলন্দাজদের পরিত্যক্ত একটা দুর্গে। ওলন্দাজরা ততদিনে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে চুঁচুড়ায় গুছিয়ে বসেছে। ফলে ফলতা নিয়ে তাদের আর তেমন কোনও আগ্রহ নেই। তবু কিছুটা গড়িমসি করে তারা ইংরেজদের ফলতায় দুর্গে থাকার অনুমতি দেয়। গড়িমসির কারণটাও ছিল প্রধানত রাজনৈতিক, তবে সে প্রসঙ্গ আপাত থাক। ফলতা তখন ছোট গ্রাম। সামান্য দোকানপাট কিছু ছিল, আর সামনে ছিল নদী, সে নদী তখন ইংরেজ কোম্পানির জীবনসূত্র। ফলতার এই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ খুঁজতে গিয়ে নব্বুই এর দশকের গোড়ায় দেখলাম দুর্গের প্রাকার ও তার চারপাশের পরিখা দীর্ঘদিনের অবহেলা সত্ত্বেও কোনওক্রমে টিকে রয়েছে। এর পাঁচ বছর পরে আবার ফলতায় গেলাম। এবারের অভিজ্ঞতা মর্মান্তিক। প্রাকারের একটা ইঁটও আর অবশিষ্ট নেই। গোটা এলাকাটাই জবরদখল হয়ে গিয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে বাংলায় পালাবদলের একটা বড় অধ্যায় ধুলোয় মিশে গিয়েছে। অবশিষ্ট বলতে পড়ে আছে ওলন্দাজদের প্রমাণ সাইজের একটা কামান। অনবদ্য তার গঠন। ফলতা থানার পূর্বতন কোনও এক থানাদার কামানটাকে দুর্গের কাছে পড়ে থাকতে দেখে তুলে এনে থানার প্রবেশমুখে স্থাপন করেছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন, কামানটাও রক্ষা পাবে, সেইসঙ্গে লোকের চোখে থানার সম্ভ্রম বাড়বে। আজও সেটা খোলা আকাশের নীচে রোদ-জল সহ্য করে একইভাবে, একই অবস্থায় পড়ে আছে। সেখান থেকে আরও কিছুটা দক্ষিণে এগোলে ডায়মন্ডহারবার। অনেকেই দেখেছেন সেখানকার দুর্গের বর্তমান অবস্থাটা। চিংড়িহাটা দুর্গের প্রায় সবটাই নদী গ্রাস করে নিয়েছে, সামান্য দু একটা থাম বিপজ্জনকভাবে নদীর কূলে ঝুলে রয়েছে, অনিবার্য পরিণতির অপেক্ষায়। এই শহরেই পুরানো ডাকঘরের পাশে একটা গির্জা ছিল। অ্যাংলিকান গির্জাটা এখনও আছে, যদিও তার রক্ষণাবেক্ষণ নেই। থাকার কথাও নয়, ক্রিশ্চান পরিবারের লোকজনও আর বিশেষ অবশিষ্ট নেই। এই গির্জার পাশেই কবরখানার প্রাঙ্গনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি কবরের অনেক স্মৃতি ফলক, যাকে Epitaph বলে। ধুলো-ময়লার পুরু আস্তরণ ভেদ করে পাঠোদ্ধার করার ধৈর্য থাকলে দেখবেন, এগুলো সামাজিক ইতিহাসের টুকরো টুকরো উপকরণ। এই প্রসঙ্গে একটু পরেই আবার ফিরে আসছি, কারণ আমার আজকের আখ্যানে এরা অবান্তর পার্শ্বচরিত্র নয়। এদের একটা বড় ভূমিকা আছে।

আরও কিছুটা এগোলে পাবেন মন্দির বাজার। আগেই শুনেছিলাম কাছাকাছি একটা থানার নতুন বাড়ি তৈরির সময়ে নাকি কষ্টিপাথরের একটা বড় মাপের বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। থানায় খোঁজ করে এর হদিস পেলাম না। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল থানার সংলগ্ন একটা মন্দিরের ওপর। মন্দিরের সদর দরজার তালা খুলতেই রহস্যের সমাধান হল। অনবদ্য বিষ্ণুমূর্তিটা অক্ষতই আছে, তবে সেটিকে সিমেন্ট-বালি দিয়ে মন্দিরের ভেতরের

দেওয়ালে পাকাপোক্ত করে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। একদিক থেকে ভালোই, অন্তত পাচারের হাত থেকে এটা রক্ষা পেয়েছে। তবে পূরাকীর্তি হিসেবে সংরক্ষণের উপযুক্ত এই মূর্তিটির এহেন গতি যে বাঞ্ছনীয় নয়, তা বলাই বাহুল্য। অথবা ধরুন এই অঞ্চলের সেমাফোর টাওয়ারগুলোর কথা। সম্প্রতি কলকাতা জি.পি. ও কে কেন্দ্র করে পূর্ব ভারতে ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস লিখতে গিয়ে দেখেছি, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে উনবিংশ শতকের তিরিশের দশকে সেমাফোরের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খবর পাঠানো হত। খেজুরির দক্ষিণে কৈখালির লাইট-হাউস পয়েন্ট থেকে কলকাতার মধ্যে এইজন্য তিরিশটার মত সেমাফোর টাওয়ার তৈরি করা হয়েছিল। চুন সুরকির গাঁথুনি হলেও এর কয়েকটা এখনও টিকে আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এগুলোকে ঘিরে তৈরি হয়েছে নানাধরণের মিথ। মিথ বলে এগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। মিথ-নির্মাণেরও একটা ইতিহাস আছে, মিথকে প্রস্থানবিন্দু ধরে প্রবেশ করা যায় লোকায়ত চেতনার জগতে। সময়ের অভাবে কয়েকটা মাত্র উদাহরণ দিলাম। আরও অজস্র এই ধরণের উপকরণ ছড়িয়ে আছে গ্রামে গঞ্জে, পথে প্রান্তরে, নদীর কূলে গড়ে ওঠা জনপদে। এগুলোকে বাদ দিলে সামাজিক ইতিহাসের একটা বড় অংশই অধরা থেকে যাবে। বিশেষ করে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার প্রাথমিক উপাদান হিসেবে এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। এই অধিবেশনের শ্রোতাদের একথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না যে আঞ্চলিক ইতিহাস তার নিজস্ব প্রাথমিকতায় এবং মেজাজে রাষ্ট্রীয় বা প্রাদেশিক স্তরের ইতিহাসের থেকে অনেকটাই আলাদা। মাঝে মধ্যে একে অপরকে স্পর্শ করে গেলেও এরা আবর্তিত হয় নিজের নিজের বলয়ে। রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের মূল আখ্যানে যে ঘটনা পাদটিকাতেও স্থান পাবে না, সেটাই হয়তো আঞ্চলিক ইতিহাসের সীমিত পরিসরে নির্ণায়ক ঘটনা। কেন নির্ণায়ক, তার উত্তর লেখ্যাগারে নেই। এর উত্তর ছড়িয়ে আছে জনপদের উৎসব-অনুষ্ঠানে, লোকাচারে - বিশ্বাসে, সর্বোপরি অঞ্চলের অধিবাসীদের যৌথ স্মৃতিতে। যে স্মৃতি এক প্রজন্ম থেকে সঞ্চারিত হয় অন্য প্রজন্মে। অঞ্চলের ইতিহাস তাই এক অর্থে স্মৃতিরও ইতিহাস। সেইজন্য যে সব প্রতীককে ঘিরে স্মৃতি গড়ে ওঠে, সেগুলো অবহেলায় লুপ্ত হয়ে গেলে হারিয়ে যাবে টুকরো টুকরো ইতিহাস।

এইসব উপকরণের অনিবার্য প্রাসঙ্গিকতা আরও অনেকের মত উপলব্ধি করেছিলেন রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়। ইঁট, কাঠ, পাথরও কথা বলে, যদি তা শোনার জন্য কান তৈরি থাকে। এই কথা তাঁর নিজের মত করে তিনি বলেছিলেন অধুনা-বিস্মৃত, কিন্তু অসামান্য রচনা পাষাণের কথা-য়। ভিন্নতর প্রেক্ষিতে কবরখানার স্মৃতিফলককে ইতিহাসের একটা প্রধান উপকরণ হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত ইংরেজ ঐতিহাসিক ক্রিস্টোফার হিল। মনে পড়ছে, আমরা যখন স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র, সেই ষাটের দশকের মাঝামাঝি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন তিনি। হাতে যতটুকু বাড়তি সময় ছিল তা নিংড়ে ব্যবহার করে ঘুরেছিলেন কলকাতা ও তার আশপাশের কবরখানায়।

লক্ষ্য ছিল স্মৃতিফলক। এগুলো থেকে সামাজিক ইতিহাসের রসদ সংগ্রহ করছিলেন তিনি। রসদ কি সত্যিই কম আছে? ঐ যে আগেই বলছিলাম, কলকাতা শহর আমাদের নজরটাকে বড় বেশি করে দখল করে রেখেছে। কলকাতার গির্জা এবং কবরখানাগুলোর বিস্তৃত খতিয়ান একসময়ে অশেষ অধ্যাবসায়ে তৈরি করেছিলেন রেভারেন্ড ফার্মিংগার এবং তার সহযোগীরা। ফার্মিংগার ছিলেন প্রকৃত অর্থেই আর্কিভিষ্ট, তাঁর তথ্যসংগ্রহে তাই কোনও ঘাটতি ছিল না। চন্দননগর, ঘিরিটি, চুঁচুড়া এবং শ্রীরামপুরে কবরস্থ সাহেব-মেমসাহেবদের তালিকাও Bengal Past and Present এর প্রথম দিককার সংখ্যাগুলোতে অথবা Bengal Obituary তে পাওয়া যায়। স্মৃতিফলকের অনেক উদ্ধৃতিও এগুলোতে সহজলভ্য। এমনকি পশ্চিম উপকূলে আর্মেনীয়দের কবরখানার স্মৃতিফলকের উল্লেখ দুর্লভ নয়। এই সব স্মৃতিফলকের অনেকগুলোই উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেকদিন আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবু তো কলকাতা বা হুগলি জেলার কবরগুলোর স্মৃতিফলকের কিছুটা হদিশ আছে। W. K. Firminger বা D. G. Crawford এর মতো লোকেরা এই শ্রমসাধ্য কাজ অনেকটাই সহজ করে দিয়ে গিয়েছেন। চুঁচুড়ার ওলন্দাজদের কবরখানা, পরে ১৮২৫ সালে শহরটা ইংরেজদের হাতে এলে ইংরেজদের গোরস্থান, ঐ একই শহরে আর্মেনীয় গির্জার কবরস্থান, ব্যান্ডেল গির্জার, অথবা ঘিরিটি, শ্রীরামপুর বা চন্দননগরের গোরস্থানেরও নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া দুরুহ নয়। কিন্তু ভাগীরথীর পূর্বতীরের বসতি, জনবিন্যাস এবং কবরখানাগুলো সম্পর্কে তথ্য প্রায় অজ্ঞাত। অথচ হদিশ থাকলে এগুলো হতে পারত দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার অববাহিকা অঞ্চলের সামাজিক ইতিহাসের বিকল্প উপাদান।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কবরখানার স্মৃতিফলকের মত আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বহীন এবং বিক্ষিপ্ত এই উপাদানকে গুরুত্ব দেবার কারণ আছে কি? সহজ উত্তর হল, নির্বাক অথচ বাঙ্ময় এই সব ফলকগুলো এমন অনেক কথা বলে যা লেখ্যাগারের সরকারী নথিতে কোনওদিন স্থান পাবে না। স্থানাভাবের কারণে বেশি না হলেও দুটো-একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। খেজুরির একটা ফলকে উৎকীর্ণ ছিল —

To the Memory of
Emelia
Wife of Edward Maxwell Esq
Judge and Magistrate of Dinagepore
Who departed this life
Aged 28 years & 2 months
After a painfull illness of many months
On the 26 July 1822
On board the Earl Balcarros Indiaman
At the New Anchorage.

বিশদ ব্যাখ্যায় পরে আসা যাবে। মনে রাখা দরকার ১৮২২ সালে New Anchorage বলতে খেজুরিকে বোঝানো হচ্ছে। এমিলিয়া রোগভোগের পর মাত্র ২৮ বছর বয়সে আর্ল বালক্যরস নামক জাহাজে মারা যান। জাহাজটা তখন খেজুরিতে নোঙর করা ছিল। মৃতদেহ খেজুরিতে কবর দেওয়া হয়। খেজুরির মত ডায়মন্ডহারবারেও ইউরোপীয়দের একটা বেশ বড় কবরখানা ছিল। এক ইংরেজ পর্যটক লিখছেন, ডায়মন্ডহারবারের পাশ দিয়ে জাহাজে চেপে যাঁরা যাচ্ছেন তাঁদের কানে হয়তো ক্যাসুরিনা গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের মর্মরধ্বনি এসে পৌঁছোচ্ছে। এই সঙ্গীত তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেবে যে দেশে ফিরে যাবার বাসনা পরিত্যাগ করে অনেক ইংরেজই এই ডায়মন্ডহারবারে দীর্ঘতর এক যাত্রার ডাক শুনতে পেয়েছিলেন ("The clump of lofty casurina trees, through whose foliage the summer wind whispers the music of the ocean, will indicate to those who pass by in ships the place where lie so many of our race, whose expectations of reaching their native land were at Diamond Harbour thwarted by the call for a larger journey")

দেশে ফেরার আগেই ডায়মন্ডহারবারে যে সব শ্বেতাঙ্গরা কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন, তাঁদের পরিচয় গ্রথিত হয়ে আছে স্মৃতিফলকে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরানোটা বোধহয় ১৭৯০ সালের। উদ্বিগ্ন পিতামাতা তাঁদের অসুস্থ শিশুকন্যাকে স্বাস্থোদ্ধারের জন্য নিয়ে এসেছিলেন ডায়মন্ডহারবারে। তাঁদের বাসনা অপূর্ন রেখে কন্যাটি মারা যায়। শোকাহত পিতার আর্তি লিপিবদ্ধ হয়েছিল সংশ্লিষ্ট ফলকে। অনুরূপ অসংখ্য ফলক ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল দীর্ঘকাল, এখনও সামান্য কিছু অবশিষ্ট আছে। শেযের দিকের একটাতে লেখা দেখেছি ঃ Harold James Huntley, who was drowned on 14th August 1899 off Diamond Harbour creek by the sinking of the Port Commissioners despatch vessel Resolute after having seen in collision with the BISN Co's ship Shindia ।তালিকা দীর্ঘতর করব না। শব্দবন্ধ পৃথক হলেও অভিব্যক্তি সব ফলকেই মোটামুটি একই রকম।

এই সব ফলকের লিপিগুলো সামাজিক ইতিহাসের তথ্যসূত্র হিসাবে কতটা প্রাসঙ্গিক? এর কোনও সহজ উত্তর আমার জানা নেই, শেষ উত্তর দেবার স্পর্দ্ধা নেই। তবে সম্ভাব্য উত্তরের সন্ধানে একটু এগোনো যেতে পারে। প্রথমত ব্যাধি এবং মৃত্যুর ইতিহাসের এগুলো বিকল্প তথ্য। ব্যাধির ইতিহাস নিয়ে এদেশে গবেষণা সবে মাত্র শুরু হয়েছে, তাও কয়েকটি নির্ণায়ক ব্যাধি নিয়ে, যেমন ওলাউঠা অথবা ম্যালেরিয়া। মৃত্যুর তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য ইতিহাস এখনও নজরে পড়েনি। ড. সেট্টার প্রাচীন যুগে এ বিষয়ে জৈনদের দৃষ্টিভঙ্গী যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা মনে রেখেই বলছি, আধুনিক যুগে মৃত্যু নিয়ে গবেষণার অবকাশ রয়েছে। বারাণসীতে মৃত্যু — এই শিরোনামে একটা বই পড়েছিলাম। ভিন্ন পরিসরে এ বিষয়ে গবেষণা আমাদের ইতিহাসবোধকে সমৃদ্ধ করতে পারে। বিশেষ করে অস্টাদশ শতকের শেষের দিকে বাংলায় ইউরোপীয়দের অকালমৃত্যুতো গবেষণার

একেবারে অনাঘ্রাত এলাকা। ডাক ব্যবস্থায় ইতিহাস নিয়ে গত এক বছর ধরে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি অষ্টাদশ শতকে এদেশে ইউরোপীয়দের মৃত্যুর হার ছিল অস্বাভাবিক রকমের চড়া। ১৭০৭ থেকে ১৭৭৫ সালের মধ্যে "death at post accounted 358 out of 645 Company servants from Britain, and there way have been wore, shipped home mortally ill to an early death". ১৭৪৭ থেকে ১৭৫৬ সালের মধ্যে অকালমৃত্যুর শতকরা হার ছিল সবচেয়ে চড়া — এই সময় যাঁরা কোম্পানির কাজে যোগ দিয়েছিলেন তাদের ৭৪% এদেশে মারা গিয়েছেন। ১৭৬৭ থেকে ১৭৭৫ সালের মধ্যে এই হার কিছুটা কমতে দেখা যায়। শতকরা হিসেবে ৪৪% — কারণ সম্ভবত এই সময়ে পূর্ব প্রজন্মের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলায় টিকে থাকার কলাকৌশল তাঁরা শিখতে শুরু করেছিলেন, যার প্রতিফলন সমাজের নানা স্তরে দেখা যাবে। একাকিত্ব কাটাবার জন্য অনেকেই তখন দেশীয় রমনীর দিকে ঝুঁকেছিলেন। এনিয়ে কিছু কাজ হয়েছে। পূর্বভারতের শহরতলী অঞ্চলে ইউরোপীয়দের "Country House", এর গঠনশৈলীতে এর প্রতিফলন ঘটেছে। কলকাতার Government House, যেটা Wellesley তাঁর নিয়োগ কর্তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে তৈবি করেছিলেন, তার ইতিহাস লিখতে গিয়ে দেখেছিলাম, কার্জনদের পূর্বসূরী Lord Scarsdale এর কেনসিংটন প্যালেসের আদলে এটা তৈরি করা হলেও, একে দক্ষিণমুখী করার উদ্দেশ্য একান্তই স্থানীয়। উত্তর দক্ষিণ উন্মুক্ত রাখা এদেশের বাড়ি তৈরির প্রাথমিক শর্ত। যখন বিজলি বাতি ছিল না, পাংখাবরদারদের ওপর নির্ভর করাই ছিল যখন গ্রীষ্মকে মোকাবিলা করার সহজলভ্য পথ, তখন এইভাবেই প্রাকৃতিক বাতাসকে বাড়ির ভেতরে ঢোকানো সম্ভব ছিল। আর সাহেবদের বাগানবাড়ি? সে যুগে বেলভেডিয়ার, হেস্টিংস-হাউস, দমদমের ক্লাইভ হাউস এবং সেই সঙ্গে ব্যারাকপুর বা অন্যান্য এলাকার বাংলো বাড়ির গঠনশৈলী নিয়ে যে সব কাজ হয়েছে — যেমন ধরুন নেইল স্টেনসনের European Architecture in India - তার থেকে এটা স্পষ্ট যে গ্রীষ্মকে মোকাবিলা করার কৃৎকৌশল অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইংরেজদের করায়ও হয়েছে। অবশ্য ভাগীরথীর পশ্চিমপাড়ে ফরাসী ওলন্দাজ বা ডেনদেরও হয়েছে, তবে তারা তো তখন পার্শ্বচরিত্র। নায়ক ইংরেজরাই। এর ফলে এইসময় থেকে কর্মরত ইউরোপীয়দের মধ্যে মৃত্যুহার কিছুটা কমেছে। বিশেষ করে এই শতকের প্রথমার্ধের তুলনায়। হ্যামিলটন ১৭২৭ সালে লিখছেন, 'One year I was there, and there were reckoned in August about 1200 English, and before the beginning of January there were 460 burials registered in the clerks' book of mortality'। এরসঙ্গে শতকের শেষ দুই দশকের তুলনা করলে বোঝা যায় অকালমৃত্যু কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনতে তারা সক্ষম হয়েছে। তবে অবশ্যই পুরোপুরি নয়। মৃত্যুর আশঙ্কা ডেমোক্ল্সের তরোয়ালের মত তখনও তাদের মাথার ওপর ঝুলছিল। আর সেই কারণেই অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত কলকাতার ইউরোপীয় অধিবাসীরা প্রতি

বছর ১৫ই নভেম্বর তারিখে একত্রে মিলিত হতেন। উদ্দেশ্য ছিল আরও এক বছর বেঁচে থাকার জন্য পরস্পরকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো।

মৃত্যুহার কমলে কি হবে, রোগের প্রকোপে তারা তখনও পর্যুদস্ত। রোগের নানা কারণ। গ্রীষ্মের দাবদাহের কথা আগেই বলেছি। তার সঙ্গে ছিল বর্ষার স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ এবং মাঝে মধ্যে বন্যা। তবে সমসাময়িক চিঠিপত্র খুঁটিয়ে পড়লে দেখবেন, মশা ছিল তাদের অন্যতম প্রধান শত্রু। Roberdieu লিখছেন 'the mosquitoe is about the size and shape of a Gnat. During the day they remain concealed and sally out just at evening'। তিনি আরও লিখছেন যারা নতুন এদেশে আসে, মশারা তাদেরই বেশি কামড়ায়। যারা বেশিদিন আছে তাদের মশার কামড় ধাতে সয়ে যায়। মশার কামড়ের ফলে অসুস্থতার কথা শুধু চিঠিপত্রেই নয়, হিক্কির Bengal Gazette এও নিয়মিতভাবেই আলোচিত হত। আর সেই সঙ্গে ছিল রকমারি পেটের ব্যাধি। এসবের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়লে নিরাময়ের জন্য বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থা তখন সুপ্রচলিত ছিল না। ডাক্তার যতটুকু যা ছিল তাদেরও ব্যবহার করা হত প্রধানত সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্যরক্ষার কাজে। এর ফলে একটু দূরবর্তী এলাকায় যে সব ইংরেজরা ছিলেন তাঁরা আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ বিশেষ পেতেন না। অসুস্থ বা রুগ্ন হয়ে পড়লে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য পাহাড়ি এলাকার স্যানেটোরিয়াম সে যুগে গড়ে ওঠেনি। এগুলো ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে। কথাগুলো বলছি এই কারণে, যে অসুস্থ ইংরেজদের হাওয়া বদলের জন্য অষ্টাদশ শতকের শেষ, উনবিংশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হত ফলতা, খেজুরি অথবা ডায়মন্ডহারবারে। এই জনপদগুলো একটা তাগিদ যদি হয় anchorage বা নোঙর করার সুবিধা, অন্য তাগিদ ছিল স্বাস্থ্যোদ্ধার। ফলতার সুখের দিন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।' কলকাতা পুনরুদ্ধারের পর ড্রেক এবং তাঁর সঙ্গীরা কলকাতায় ফিরে যান। ফলতা ফিরে যায় তার নিস্তরঙ্গ অতীতে। থেকে যায় অল্প কিছু ইংরেজ Tavern, যার একটার পরিচালনায় ছিল M/s Higginson and Baldwin। এর নাম ছিল Fultah Farm and Tavern। এর সম্পর্কে বিজ্ঞাপনে বলা হত "Most eligibly situated at Fultah, contiguous to the river, and which has for many years enjoyed the greatest celebrity as a farm and the highest reputation as a Tavern, comprehending the well arranged suite of building" এটার উদ্দেশ্য ছিল জাহাজে চড়তে যারা আসছেন তাদের সাময়িক আশ্রয় দেওয়া, সেইসঙ্গে অসুস্থদের স্বাস্থ্যোদ্ধারের পরিসর দেওয়া। কিন্তু anchorage হিসেবে ফলতা অবান্তর হয়ে পড়ার ফলে Tavern গুলোও ক্রমশ উঠে যায়। খেজুরি বা ডায়মন্ডহারবার আরও অনেকদিন টিকে ছিল। তার একটা প্রমাণ কবরখানার স্মৃতিফলক।

এই ফলকগুলো থেকে আরও একধরণের তথ্য পাওয়া যায়। সাধারণভাবে স্মৃতিফলকগুলোতে মৃত্যুর কারণ লেখা থাকত না। তবে মুষ্টিমেয় কিছু Epitaph এ কারণ

স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হত। যেমন বঙ্গোপসাগর থেকে ভাগীরথী দিয়ে যে সব জাহাজ ঢুকত তাদের পথ দেখাতে কোম্পানি pilotage service চালু করেছিল। এই সব service এ midshipman হিসেবে তরুণ ইংরেজরা নিযুক্ত হত। এরা মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনায় ডুবে মারা যেত। কারণ নানাবিধ। নদীর নাব্যতা সর্বত্র সমান নয়। ঝড় উঠলে বিপদ বাড়ত। সর্বোপরি কয়েকটা জায়গা ছিল বিশেষভাবে বিপজ্জনক। যেমন হুগলি-দামোদর সংগমস্থল আর নীচে হুগলি রূপনারায়ণ সংগমস্থলের মাঝে নদীর একটা অংশকে অষ্টাদশ শতকে বলা হত James & Mary। পরে এই নাম বিশেষ কেউ মনে রাখেন নি। কিন্তু এই সময় James & Mary তে চড়া সৃষ্টি হবার ফলে অসতর্ক জাহাজ এখানে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হত। জাহাজ ডুবি - এবং মৃত্যুও হত। এর উল্লেখও Epitaph গুলোতে পাওয়া যায়। James and Mary আঞ্চলিক ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায়। পলি সরিয়ে কোম্পানি ভাগীরথীর নাব্যতা কিছুটা বাড়াবার ফলেই এই পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কমবেশি একশো বছরের সময়সীমায় সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভাগীরথীর পূর্বতীরের কয়েকটি জনপদের খণ্ডিত এবং অসম্পূর্ণ আলেখ্য এখানে উপস্থিত করার চেষ্টা করলাম। সময়ের স্বল্পতার কথা মনে রেখে উদাহরণকে যথাসম্ভব সীমিত রেখেছি। এই জনপদগুলোর উত্থান - পতনের সঙ্গে কোম্পানির শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং বিস্তার অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সাগর থেকে ভাগীরথী হয়ে কলকাতা পর্যন্ত জাহাজ চলাচল নিয়মিত হবার পর থেকেই anchorage হিসেবে এগুলোর প্রয়োজনীয়তা কমে আসে। পাহাড়ি এলাকায় অথবা Frasergunj অঞ্চলে স্বাস্থ্যোদ্ধারের বিকল্প পরিসর গড়ে ওঠার ফলে Sanatorium হিসেবেও এই সব অঞ্চল তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়। ইউরোপীয়দের যাতায়াত অনিয়মিত হবার ফলে জনপদগুলো ফিরে যেতে থাকে তাদের সাবেক অবস্থানে। উনবিংশ শতক জুড়ে এই সংকোচনের প্রক্রিয়াটা অব্যাহত থেকেছে। মধ্যশতকে ফলতা অথবা খেজুরির এই পরিত্যক্ত কাঠামোটা সমসাময়িক ইংরেজদের লেখা চিঠিপত্র অথবা স্মৃতিকথায় মাঝে মধ্যেই ফিরে এসেছে। সেমাফোর বা তারপরে- টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রচলিত হবার সময় ডায়মন্ডহারবার বা খেজুরিতে সাময়িক প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিলেও তার কোনও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব দেখা যায় না। মধ্য শতক থেকে এই অঞ্চলের ক্রিশ্চান কবরখানাগুলোতেও বিশেষ নতুন এবং উল্লেখযোগ্য সংযোজন দেখা যায় না। ব্যাধি অথবা মৃত্যুর এই ধরণের উপাদানও কমে আসতে থাকে। ১৮৬৩ সালে ক্যানিংকে রেলপথে সদরের সঙ্গে যুক্ত করে সেখানে একটা বিকল্প বন্দর গড়ে তোলারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। সাগরদ্বীপের উত্তর দিকে চার্লস ট্রাওয়ারের নামাঙ্কিত ট্রাওয়ারল্যান্ডও এখন শুধুই স্মৃতি।

স্মৃতিরও অবশ্য রকমফের আছে। এইসব অঞ্চলের অধিবাসীদের সামুহিক স্মৃতিতে কিছু কিছু ঘটনার অভিঘাত ছিল মর্মন্তুদ, এবং সেই কারণে দীর্ঘস্থায়ী। এইরকমের একটি ঘটনা হ'ল ১৮৬৪ সালের ঘুর্ণিঝড়, যা ভাগীরথীর উপকুলকে তোলপাড় করে দিয়েছিল।

এই ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছিল ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসে। উক্ত সাইক্লোনের সময় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ অঞ্চলে স্বল্পকালের জন্য কর্মরত ছিলেন। বাকল্যান্ড তাঁর Bengal Under the Lieutenant Governors এ লিখেছেন এই সাইক্লোনে দশটা জাহাজ পুরোপুরি জলমগ্ন হয়, ১৪৫ টা জাহাজ তীরে আছড়ে পড়ে। ফার্মিংগার পরে যে তালিকা তৈরি করেছিলেন তাতে দেখা যাচ্ছে, জেলার প্রায় সত্তর হাজার লোক এই সাইক্লোন প্রাণ হারান। ১৯০৮ সালে ডায়মন্ডহারবারের কবরখানায় গিয়ে তিনি যে সব স্মৃতিফলক দেখেছিলেন, তার একটাতে উৎকীর্ণ ছিল —

Sacred
To the Memory of
Mr. John Aitken
Late Inspector of Police
Who with his wife and child were
killed in the cyclone of October 1864
And are buried beneath these mounds.

শেষ করার আগে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। এই প্রতিবেদনের একটা উদ্দেশ্য হল আঞ্চলিক ইতিহাস রচনা করার কিছু বিক্ষিপ্ত উপাদানকে দৃষ্টিগোচর করা। অন্য উদ্দেশ্যটা হল এই সব অবহেলায় ছড়িয়ে থাকা উপাদানের সংরক্ষণের প্রয়োজনের দিকে গুরুত্ব দেওয়া। কেবল সাম্রাজ্যবাদের স্মৃতি — এই লেবেল সেঁটে এগুলোকে অবান্তর ঘোষণা করলে তা হবে ইতিহাসের প্রতি অবিচার। আর আঞ্চলিক ইতিহাস তো এক অর্থে স্মৃতিরও ইতিহাস। যে স্মৃতি কখনও সুখের, কখনও বা দুঃখের।

সমকালীন ইয়োরোপ ঃ সংহতির প্রয়াস ও ইয়োরোপীয় ইউনিয়নের উদ্ভব

পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য

প্রেক্ষাপট ঃ আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ইয়োরোপের সাম্প্রতিক পুনরুত্থান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনীতির সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ইয়োরোপই ছিল বিশ্ব রাজনীতির মূল কেন্দ্র এবং এই রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হত কয়েকটি ইয়োরোপীয় বৃহৎ শক্তির দ্বারা যথা গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া এবং স্বল্প পরিমাণে ইতালি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি ইয়োরোপীয় শক্তিগুলির বিপর্যয় ডেকে আনে। উত্থান ঘটে দুটি অ-ইয়োরোপীয় মহাশক্তির, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন। এদের নিয়ন্ত্রণে ছিল প্রচুর পরিমাণ ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক এবং মানব সম্পদ যার দ্বারা ওয়াশিংটন এবং মস্কো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে।

কয়েকটি প্রভাবশালী রাষ্ট্রের 'বৃহৎ শক্তির মর্যাদা' হ্রাসই কেবল ইয়োরোপের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক ছিল না, ছয় বছরের বিশ্বযুদ্ধ সমগ্র মহাদেশটিকেই বিপর্যস্ত করে দেয়। বৃহৎ বা ক্ষুদ্র প্রায় সকল রাষ্ট্রই প্রভূত পরিমাণ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং বিশেষ ভাবে মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। অসংখ্য নরনারী শিশু হতাহত হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা হয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। এদের অধিকাংশেরই আশ্রয় নেওয়ার মতো কোনও স্থান ছিল না এবং ফলত তারা এক দিশাহীন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে এসে দাঁড়ায়। ইয়োরোপে দেখা দেয় আত্মবিশ্বাসের সংকট।

সর্বোপরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইয়োরোপের প্রধান সমস্যাটিকে উন্মুক্ত করে দেয় — এটি হল নিয়ন্ত্রণহীন আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের সমস্যা। ফরাসী বিপ্লবের পরেই ইয়োরোপে প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে ফ্রান্স এবং জার্মানীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। ১৮৭১ সালে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর উত্থানের সাথে সাথে এই সংঘাত তীব্রতর হয়। তাই যথার্থই বলা যায় যে এই শতকে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ছিল ইয়োরোপীয় বৃহৎ শক্তিগুলির নিয়ন্ত্রণহীন জাতীয়তাবাদী দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পরিণতি।

সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইয়োরোপের সর্বত্র ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়ের চিত্র। ইয়োরোপের দেশগুলি এক অনিবার্য ধ্বংসের

মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। এই সময় ইয়োরোপের সামনে কেবল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠন বা কয়েকটি দেশের লুপ্ত বৃহৎ শক্তির মর্যাদা পুনরুদ্ধারের প্রশ্নটিই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল ইয়োরোপের জনসাধারণ দুটি বিশ্বযুদ্ধ থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের জাতীয়তাবাদী দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক কি না। কারণ এই জাতীয়তাবাদী উন্মাদনাই ছিল ইয়োরোপের দুর্ভাগ্যের মূল কারণ। এই প্রেক্ষাপটেই ইয়োরোপে সংহতি সাধনের সাম্প্রতিক প্রয়াসটিকে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

ঐক্যের প্রয়াস ঃ ইয়োরোপে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নতুন নয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চিন্তাবিদ এবং রাষ্ট্রনায়কগণ একটিমাত্র কর্তৃপক্ষের অধীনে সমগ্র মহাদেশটিকে ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখেছেন। রোমান সাম্রাজ্যের সময় থেকেই ইয়োরোপীয় ঐক্যের ধারণা প্রথম অঙ্কুরিত হয়। রোমান সাম্রাজ্য সামরিক শক্তি ও আধিপত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও সমকালীন ইয়োরোপীয় আদর্শের অনেক ধারণাই এই সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ঠ্যের অন্তর্গত ছিল। যথা একটি সাধারণ মুদ্রা ব্যবস্থা, একটি সাধারণ আইন ব্যবস্থা, অবাধ বাণিজ্য, একক প্রতিরক্ষা ও বিদেশনীতি ইত্যাদি। সমগ্র ইয়োরোপীয় ভূখণ্ডে খ্রিস্টধর্ম ও গ্রীক রাজনৈতিক ধ্যান ধারণার প্রসারে রোমান সাম্রাজ্য বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। পোপের আধিপত্যের যুগে খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্যের ধারণা ইয়োরোপে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার লাভ করে। পরবর্তীকালে নবম শতকে শার্লেমান, উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে নেপোলিয়ন এবং সবশেষে বিংশ শতকে হিটলার সামরিক শক্তি দিয়ে ইয়োরোপে ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা চালান যদিও এর মারাত্মক পরিণতি সর্বজনবিদিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইয়োরোপীয় চিন্তাবিদদের মনে দৃঢ় ধারণা হয় যে দীর্ঘ দিনের পুরানো এই আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব দূর করার একমাত্র উপায় হল সহমতের মাধ্যমে ঐক্য প্রতিষ্ঠা। যুদ্ধ পরবর্তী যুগের বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই চিন্তাবিদদের মনে এই ধারণা গড়ে ওঠে। ইয়োরোপে ঐক্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ অভিমত দেন ব্রিটেনের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালীন প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল। ১৯৪৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সুইজারল্যান্ডের জুরিখে এক ভাষণে চার্চিল ফ্রান্স-জার্মানীর মধ্যে মত বিরোধ দূর করে "সম্মিলিত ইয়োরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র" ধাঁচের একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে মত দেন। তিনি একটি "ইয়োরোপীয় পরিষদ (Council of Europe) প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব করেন।

ইয়োরোপীয় ঐক্য আন্দোলনের বিবর্তনের দুটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীর অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আঞ্চলিক স্তরে সহযোগিতা সম্পর্কিত অপেক্ষাকৃত পুরানো দৃষ্টিভঙ্গীকে আন্তঃসরকারি দৃষ্টিভঙ্গী (Inter-Governmental approach) বলে অভিহিত করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ঐক্য প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীগণ নিজেরাই এই কর্ম প্রক্রিয়ার সূচনা করেন এবং এর ব্যাপ্তি কত দূর হবে সে বিষয়ে তাঁদের পূর্ব প্রস্তুতি থাকে। অন্য দৃষ্টিভঙ্গীকে বলা হয় অধি-জাতীয়তাবাদ (Supranationalism) যেখানে কোনও অধি-জাতীয় সংস্থার

সদস্যরাষ্ট্রগুলি এর প্রধান অঙ্গগুলিকে স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ও ক্ষমতা প্রদান করে।

ইয়োরোপে একীকরণ প্রক্রিয়ার প্রথম যুগে আন্তঃসরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর দুটি উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। একটি ছিল ব্রিটেনের নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে গড়ে ওঠা ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিষদ (Organisation for European Economic Co-operation-OEEC) যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইয়োরোপের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রদত্ত মার্কিন সাহায্যের সঠিক বন্টনের জন্য একটি সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই OEEC ই ছিল প্রথম সংস্থা যার মাধ্যমে একটি ব্যাপক ইয়োরোপীয় আর্থিক সহযোগিতার ভিত্তি গড়ে ওঠে। অপর উল্লেখযোগ্য উদাহরণটি ছিল ১৯৪৯ সালের মে মাসে ইয়োরোপীয় পরিষদ Council of Europe এর প্রতিষ্ঠা যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এর সদস্যদের মধ্যে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ঐক্য স্থাপন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রগতিবিধান এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের নীতির পরিপোষণ।

১৯৪৫ থেকে ১৯৫০ এই সময়ে ইয়োরোপে আঞ্চলিক সহযোগিতার যে আন্তঃসরকারি দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে তার মুখ্য প্রবক্তা ছিল ব্রিটেন। অধি-জাতীয় পদ্ধতিতে যেহেতু জাতীয় সার্বভৌমিকতার সীমা অতিক্রমের সম্ভাবনা ছিল তাই ব্রিটেন ছিল এর বিরোধী। কিন্তু ইয়োরোপের মূল ভূখন্ডের বহু দেশ যথা ইতালি, পশ্চিম জার্মানী, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশ সমূহের অনেক মানুষের অভিমত ছিল যে ইয়োরোপের সমস্যা সমূহের প্রকৃত সমাধান খুঁজতে গেলে প্রয়োজন নতুন ধরণের সহযোগিতা। শিল্প, বাণিজ্য, শক্তি, পরিবহন প্রভৃতির মত কয়েকটি বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য কয়েকটি সংস্থা গড়ে তোলাই যথেষ্ট নয় - প্রয়োজন হল এমন একটি প্রতিষ্ঠানের যা তার এলাকাভুক্ত দেশগুলির মতৈক্যের বিষয়গুলি সম্পর্কে সাধারণ নীতি নির্ধারণ করতে পারবে এবং এর সদস্য রাষ্ট্রগুলি তাদের নিজের নিজের এলাকায় এগুলির রূপায়ণ করতে বাধ্য থাকবে।

ইয়োরোপীয় সংহতি প্রক্রিয়ার অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সহযোগিতার ভিত্তি হিসাবে রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে অগ্রাধিকার প্রদান। এর প্রধান কারণ ছিল অধি-জাতীয় পদ্ধতিতে সহযোগিতার ব্যাপারে সহমত হলেও অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলির, বিশেষ করে ফ্রান্সের, এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ত্ব ক্ষুন্ন হয় এমন কোন প্রক্রিয়া মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এই কারণেই ইয়োরোপীয় একীকরণ প্রক্রিয়ার অধি-জাতীয় পদ্ধতিতে প্রথম যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তা ছিল কয়লা ও লৌহ শিল্প সংক্রান্ত সহযোগিতা যার মাধ্যমে European coal and Steel community (ECSC) প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫২ সালে। ECSC প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ছিল ১৯৫০ সালের মে মাসে ঘোষিত শুম্যান পরিকল্পনা (এই উদ্যোগের প্রধান রূপকার ফরাসী বিদেশমন্ত্রীর নামাঙ্কিত) অনুযায়ী ফ্রান্স ও জার্মানীকে তাদের কয়লা ও ইস্পাতের উৎপাদন একটি উচ্চ কর্তৃপক্ষের

নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেওয়ার একটি পরিকল্পনা। অন্য দেশগুলি যদি এই প্রকল্পে যোগ দিতে আগ্রহী হয় তবে তাদেরও স্বাগত জানানো হয়। এর ফল হিসাবে বেলজিয়াম, হল্যান্ড, লুকেস্‌মবার্গ এবং ইতালি এই প্রকল্পে যোগ দেয়। ব্রিটেন এতে অংশ নিতে অস্বীকার করে কারণ তার মতে এই পরিকল্পনা ছিল অতিমাত্রায় অধি-জাতীয় এবং ব্রিটিশ জাতীয় স্বার্থ বিরোধী।

ইয়োরোপীয় কয়লা ও ইস্পাত উদ্যোগের (ECSC) প্রতিষ্ঠা ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। এর মাধ্যমে জার্মান সমস্যার সমাধান খোঁজাই ছিল এই প্রকল্পের লক্ষ্য। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ফরাসী জার্মান দ্বন্দ্বই ছিল আধুনিক ইয়োরোপের অধিকাংশ সমস্যার প্রধান কারণ। এই দুটি দেশের মধ্যে শত্রুতা দূর করেই কেবল একটি শান্তিপূর্ণ, ঐক্যবদ্ধ এবং সমৃদ্ধিশালী ইয়োরোপ গড়ে তোলা সম্ভব ছিল। একটি অধি-জাতীয় কাঠামোর মধ্যে পুনরুদ্দীয়মান এবং সম্ভাব্য শক্তিশালী জার্মানীকে বেঁধে রাখার পাশাপাশি ECSC ফরাসী-জার্মান বিরোধ দূরীকরণের সুযোগও সৃষ্টি করেছিল।

১৯৫২ সালে প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে ECSC-র প্রতিষ্ঠা ইয়োরোপে যে একীকরণ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত করে তা গত পাঁচ দশকে আরো মজবুত ও শক্তিশালী হয়েছে। ECSC-র সাফল্য ঐক্য প্রক্রিয়ার নেতৃবৃন্দকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরো প্রশস্ত করতে উৎসাহিত করে যার ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৫৭ সালের ২৫শে মার্চ রোমচুক্তি দ্বারা ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী বা EEC-র প্রতিষ্ঠা হয়। একটি ইয়োরোপীয় সাধারণ বাজার (Common Market)-এর ধারণা বহুদিন ধরেই ইয়োরোপীয় বিভিন্ন মহলে ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু। বিশদ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যে ছয়টি দেশ ECSC প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করেছিল - অর্থাৎ ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালি, বেলজিয়াম, হল্যান্ড ও লাকেস্‌মবার্গ তারাই EEC-র প্রতিষ্ঠা করে এবং এই সংস্থার কাজ ১ জানুয়ারী ১৯৫৮ থেকে শুরু হয়।

EEC-এর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত রোম চুক্তির ১ নং ধারায় বলা হয়েছে যে কতগুলি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এই গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটি অভিন্ন সম্প্রদায়ের ধারণার ভিত্তিতে EEC সকল অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রচেষ্ঠা সমূহকে তার আওতাভুক্ত করবে। এর উদ্দেশ্য কেবল এর সদস্য রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা নয়. একটি সাধারণ স্বার্থের কাছে এদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাখাও এর কাজ। ২৩৭ নং ধারা অনুযায়ী EEC-এর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে নিজেদের সামঞ্জস্যবিধান করতে পারলে অন্য দেশও এই গোষ্ঠীতে যোগদান করতে পারে।

রোম চুক্তির ২নং ধারায় EEC-এর বৃহত্তর লক্ষ্যগুলিকে বর্ণনা করা হয়। "গোষ্ঠীব প্রধান কাজ হবে একটি সাধারণ বাজার প্রতিষ্ঠা এবং সদস্য দেশগুলির অর্থনৈতিক নীতিসমূহের প্রগতিমূলক সমন্বয়ের মাধ্যমে সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ঐক্যবদ্ধ বিকাশ ঘটানো, ক্রমাগত এবং ভারসাম্যযুক্ত সম্প্রসারণ,

স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নয়ন এবং সদস্যভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা।"

গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রাষ্ট্রগুলি একটি শুল্ক ইউনিয়ন (customs union) প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি দেয় (শুল্ক ইউনিয়ন হল এমন একটি ব্যবস্থা যার দ্বারা অংশগ্রহণকারী দেশগুলি নিজেদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক এবং অন্যান্য নিষেধ বিধি দূর করতে এবং তৃতীয় কোনও দেশের সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি প্রণয়ন করতে এবং সাধারণ বাহ্যিক শুল্ক আরোপ করতে সম্মত হয়)। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তৃতীয় কোনও দেশের সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি প্রণয়ন এবং কৃষি, পরিবহন এবং বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মবিধি গড়ে তোলা। ব্যক্তি, সেবাকার্য এবং পুঁজির স্বাভাবিক চলাচল নিশ্চিত করতে এবং নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি এবং আইনসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতেও তারা সম্মত হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বিশেষ সংযোগ আছে এমন সব আর্থিক গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানগুলিতে অংশ গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে EEC চুক্তি ছিল মূলত একটি কাঠামো। এর দ্বারা প্রণীত নীতির ভিত্তিতে সদস্য রাষ্ট্রগুলির দায়িত্ব ছিল যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে নীতি নির্ধারণ করা। EEC প্রণীত বৃহত্তর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে থেকে সদস্য রাষ্ট্রগুলি সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলিকে বিস্তৃত করতে সম্মত হয়।

সুতরাং ইয়োরোপীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্পর্কিত রোম চুক্তি ছিল এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ECSC ব্যতীত অন্য কোনও ইয়োরোপীয় সংগঠন এমন কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারেনি। EEC গঠন সংক্রান্ত চুক্তিতে এই সংস্থার আওতায় কতগুলি সাধারণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় যারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ইয়োরোপীয় গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা ছিল প্রথাগত আন্তঃসরকারি সহযোগিতা পদ্ধতির বদলে এক নয়া পদক্ষেপ। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে কতগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে যারা প্রচুর পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে এবং EEC-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং সাধারণ কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। EEC-এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে ইয়োরোপীয় গোষ্ঠীর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

EEC-এর মধ্যে আছে চারটি মুখ্য প্রতিষ্ঠান — মন্ত্রী পরিষদ, কমিশন, ইয়োরোপীয় পার্লামেন্ট এবং আদালত। এছাড়াও আছে একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটি এবং হিসাব পরীক্ষকদের একটি সভা। কমিশন এবং মন্ত্রী পরিষদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ও ব্যাপক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে EEC-এর সাধারণ নীতিগুলি প্রণীত হয়; পার্লামেন্ট এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটি এই প্রক্রিয়ায় মূলত পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করে

সমগ্র কর্ম প্রক্রিয়াই আদালতের আওতাভুক্ত। হিসাব পরীক্ষকদের সভার কাজ হল EEC-এর বাজেট পরীক্ষা নিরীক্ষা করা। সুতরাং বলা যায় এখানে নীতি নির্ধারণ হল একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া — একদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অন্য দিকে সদস্য রাষ্ট্রগুলির সাথে এই প্রতিষ্ঠানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক।

১৯৯৩ সালের ১ নভেম্বর থেকে ইয়োরোপীয় গোষ্ঠীর নতুন নাম রাখা হয়েছে ইয়োরোপীয় ইউনিয়ন (European Union)। এই গোষ্ঠীর সরকারি নাম যাইহোক এর ক্ষমতা এবং ভূমিকা সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। অনেক আইনবিদের মতে এই সংগঠনের হাতে পুরোপুরি অধি জাতীয় ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। যদিও এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতার মাত্রা কিছুটা বেশি তা সত্ত্বেও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে এর তেমন কোনও পার্থক্য চোখে পড়ে না। আবার অনেকের মতে EEC-এর ভূমিকা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। এর সবচেয়ে বড় অবদান হল সার্বভৌমিকতাকে জাতীয় স্তর থেকে সরিয়ে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের স্তরে নিয়ে যাওয়া। এই দুটি ধারণার মধ্যবর্তী অবস্থান নিয়ে ইয়োরোপীয় আদালতের এক প্রাক্তন সভাপতি মন্তব্য করেন যে EEC হল "এমন একটি সংস্থা যার সৃষ্টি করা হয়েছে একটি রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করার জন্য। এই উদ্দেশ্যে এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু দায়িত্ব এবং ব্যাপক পরিমাণ সার্বভৌম ক্ষমতা। একে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসমন্বিত এককে পরিণত করা না হলেও এর স্বাতন্ত্র্য এবং সার্বভৌমিকতার পরিমাণ যথেষ্ট"। ইয়োরোপীয় আদালত রোম চুক্তিকে একটি 'নয়া আইনগত ব্যবস্থা'-র আখ্যা দিয়েছে। সদস্য রাষ্ট্রগুলির পাশাপাশি এর আছে স্বাধীন অস্তিত্ব এবং এদের উপর এর কার্যকলাপের প্রত্যক্ষ আইনগত প্রভাব আছে। সাধারণ ভাবে জাতীয় আইনগুলির তুলনায় 'গোষ্ঠী'র আইন অধিক প্রাধান্যলাভ করে। এই ভাবে এই 'গোষ্ঠী' র সদস্যভুক্ত দেশগুলির জাতীয় সার্বভৌমিকতা নিঃসন্দেহে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে যার পরিমাণ জাতীয় রাষ্টগুলি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তির তুলনায় অনেক বেশি।

আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় সদস্য রাষ্ট্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করলেও EEC-র প্রেক্ষাপটে তারা তাদের সম্মিলিত ভূমিকা পালনের চেষ্টা করে এবং এই গোষ্ঠীকে সমবেত প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে মনে করে। এর প্রধান উদাহরণ হল Customs Union-এর প্রতিষ্ঠা। ১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালি, হল্যান্ড, লুকসেমবার্গ এবং বেলজিয়াম নিজেদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমস্ত ধরণের কর ও শুল্ক বিলোপ করে। ১৯৭৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর কলেবর বৃদ্ধি করার পর (১৯৭৩) নয়টি দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে সব বাধা দূর হয়ে যায়। বর্তমানে একটি ইয়োরোপীয় Customs Union রয়েছে এবং এর পরিধির ভিতর সর্বপ্রকার পণ্য অবাধে চলাচল করতে পারে। ইয়োরোপীয় গোষ্ঠীব বাইবেব কোনও দেশ থেকে আমদানি করা দ্রব্যের উপর গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সর্বত্র একই হারে শুল্ক আরোপ করা হয়। আবার গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে কৃষিপণ্যের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করা

হয়েছে। কৃষিজাত পণ্যের আমদানির উপর লেভি আরোপ করে EEC-এর অভ্যন্তরীণ বাজারটিকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

EEC-এর ভূমিকার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মানুষের অবাধ যাতায়াত নিশ্চিত করা। যে কোনও সদস্য রাষ্ট্রের নাগরিক গোষ্ঠীভুক্ত অপর রাষ্ট্রে যাতায়াত করতে পারে বা চাকরি করতে পারে। কোনও দেশই কর্মসংস্থান নীতিতে জাতিগত বৈষম্য ব্যবস্থা আরোপ করতে পারে না। তবে জনশৃংখলা এবং জনস্বাস্থ্যের কারণে নিয়ন্ত্রণ বিধি আরোপ করা যায়। আবার কোনও দেশ নিজের দেশের নাগরিকদের জন্য সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তিদের বিশেষত পেশাদার বৃত্তিজীবীদের অবাধ গমনাগমনের ক্ষেত্রে সীমিত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এক্ষেত্রে কর্মপ্রার্থীকে, যে দেশে নিযুক্ত হতে ইচ্ছুক সেই দেশের নির্ধারিত যোগ্যতামান অর্জন করতে হয়। চিকিৎসা, কোম্পানী আইন, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, যানবাহনের জন্য বীমা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সীমিত সাফল্য পাওয়া গেছে। সাফল্য অর্জিত হয়েছে আইন ব্যবসার ক্ষেত্রেও। তবে বলা যায় যে এ বিষয়গুলিতে সার্বিক সাফল্য অর্জন করতে ইয়োরোপীয় গোষ্ঠীকে আরও অনেক দূর যেতে হবে।

পুঁজির স্বাধীন চলাচলের জন্য তালিকাভুক্ত শেয়ার ক্রয় বা প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যিক ঋণের নীতিকে উদার করতে ইয়োরোপীয় গোষ্ঠী নির্দেশিকা প্রদান করে। এই সংস্থা স্থাপনের প্রথম দিকেই এই নির্দেশিকা প্রদান করা হয়েছিল। তবে ৬০-এর দশকের শেষ দিকে এবং ৭০-এর দশকের প্রথম দিকে বিরূপ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সদস্য দেশগুলি বৈদেশিক বাণিজ্যর ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হয় এবং রোমচুক্তির সুবিধা নিয়ে তারা পুঁজির অবাধ চলাচল নিয়ন্ত্রিত করে। তবে চুক্তি ধারা লঙ্ঘন করলেই কমিশন ব্যবস্থা নিয়েছে।

Customs Union এবং সাধারণ বাজার প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে সাফল্যের দ্যোতক। তবে একীকরণ প্রক্রিয়ার মূল বিষয় হল কতগুলি সাধারণ নীতি প্রণয়ন। EEC চুক্তিতেই একটি সাধারণ কৃষিনীতি এবং সাধারণ বহির্বাণিজ্য নীতির কথা বলা হয়। পরবর্তীকালে এর ভিত্তিতে সদস্য দেশগুলি সামাজিক নীতি, যানবাহন নীতি, অনুন্নত অঞ্চলগুলিকে সাহায্যদান, শক্তি, পরিবেশ, বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ কর্মপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন করে। এই সাধারণ নীতিগুলির প্রধান লক্ষ্যসমূহ আঞ্চলিক স্তরে সহযোগিতা সংক্রান্ত মূল নীতিটির সাথে সম্পর্কিত ছিল। অর্থাৎ পশ্চিম ইয়োরোপের সমস্যাগুলি ছিল চরিত্রগত দিক দিয়ে বহুজাতিক এবং সমষ্টিগত প্রচেষ্টা ব্যতীত এগুলির সমাধান ছিল অসম্ভব।

সাধারণ নীতি প্রণয়ন এবং এগুলির রূপায়ণই ছিল জাতীয় স্তর থেকে অধিজাতীয় সংস্থার স্তরে সার্বভৌমিকতা স্থানান্তরের পরীক্ষামূলক ক্ষেত্র। প্রথম যুগে ফ্রান্স এবং

পরবর্তীকালে ব্রিটেন বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের সার্বভৌমিকতা বজায় রাখতে জোরদার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় স্বার্থগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের সমস্যা EEC-এর কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বহুবারই সংকটের সৃষ্টি করেছে। তা সত্ত্বেও এই সংস্থা কেবল তার অস্তিত্বই রক্ষা করেনি, নিজের কার্যকলাপের ক্ষেত্রটিকেও বিস্তৃত করেছে।

EEC-এর সম্প্রসারণ ঃ আগেই বলা হয়েছে যে রোম চুক্তির প্রস্তাবনায় ইয়োরোপের জনসাধারণের মধ্যে ঘনিষ্ট ঐক্য প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। এই গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতাগণ মনে করেছিলেন যে মাত্র ছয়টি দেশ নিয়ে এই সংগঠন তার যাত্রা শুরু করলেও তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হবে পশ্চিম, উত্তর, মধ্য এবং চূড়ান্তভাবে পূর্ব-ইয়োরোপের অন্যান্য দেশগুলিকে এর আওতাভুক্ত করা।

এই লক্ষ্যে এই সংস্থাটিকে আজ পর্যন্ত চারবার সম্প্রসারিত করা হয়। ১৯৭৩ সালে প্রথম সম্প্রসারণে ব্রিটেন, ডেনমার্ক এবং আয়ারল্যান্ড, ১৯৮১ সালে দ্বিতীয় সম্প্রসারণে গ্রীস, ১৯৮৬ সালে স্পেন ও পর্তুগাল এবং ১৯৯৫ সালের প্রথম দিকে চতুর্থ এবং শেষ সম্প্রসারণে সুইডেন, অস্ট্রিয়া এবং ফিনল্যান্ড এই সংস্থায় যোগ দেয়। বর্তমানে এই সংস্থার সদস্য সংখ্যা ১৫।

ইয়োরোপীয় গোষ্ঠীর এই সম্প্রসারণ বিগত চার দশকের ইয়োরোপীয় সংহতি আন্দোলনের কতগুলি বাস্তব দিকের প্রতিফলন ঘটায়। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রিটেন এবং স্ক্যানডিনেভীয় দেশগুলি অধিজাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের কারণে এই সংস্থা থেকে দূরে ছিল, পরবর্তী সময়ে তারা এই সংস্থায় যোগ দেয়। এর মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করা। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ে এই সংস্থাকে তারা যতখানি অধিজাতীয়তাবাদী মনে করেছিল পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয় যে এই সংস্থা ততখানি অধিজাতীয়তাবাদী বৈশিষ্ট্য সমন্বিত নয়।

৭০-এর দশক এবং ৮০-এর দশকের প্রথম দিকে গ্রীস, স্পেন এবং পর্তুগাল একনায়কতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হয় এবং ইয়োরোপীয় গোষ্ঠীতে তাদের সদস্য হওয়ার পথও এর ফলে সুগম হয়। সুইডেন, ফিনল্যান্ড এবং অস্ট্রিয়ার এই সংস্থায় যোগ না দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য কারণের পাশাপাশি নিরপেক্ষতার প্রশ্নটিই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ঠান্ডা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি এবং একটি সফল ইয়োরোপীয় সংস্থা হিসাবে ইয়োরোপীয় গোষ্ঠীর অবস্থান এই দেশগুলির মনোভাবের পরিবর্তন সূচিত করে। সমগ্র পশ্চিম ইয়োরোপকে এর আওতায় নিয়ে এসে (অবশ্য নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ড এখনও এর সদস্য হয়নি) এই গোষ্ঠী এক নতুন যুগের প্রবেশদ্বারে উপনীত হয়েছে। ১৯৮৯ সালে সমাজতন্ত্রের অবলুপ্তির পর মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। ১৯৯০ সাল থেকে ইয়োরোপীয় ইউনিয়ন পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া (বর্তমানে চেক ও শ্লোভাক নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত), রুমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশকে গণতন্ত্র এবং মুক্ত বাজার

অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার কাজে প্রভূত পরিমাণ আর্থিক ও প্রযুক্তি গত সাহায্য প্রদান করেছে।

যাইহোক ইয়োরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান দেশগুলি বিশেষত জার্মানী উপলব্ধি করতে পেরেছে যে ইয়োরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি বজায় রাখতে গেলে এই দেশগুলিকেও সদস্যপদ দিতে হবে। ইয়োরোপীয় গোষ্ঠী পরীক্ষামূলক ভাবে চালু করার সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, যে দেশ গণতন্ত্র ও বাজার অর্থনীতির শর্ত পূরণ করতে পারবে তাকেই এই গোষ্ঠীর সদস্যপদ দেওয়া হবে। সমাজতন্ত্র-উত্তর মধ্য এবং পূর্ব ইয়োরোপের দেশগুলিও বর্তমানে এই শর্ত পূরণ করেছে। সুতরাং ইয়োরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য পদ থেকে এদের আর বঞ্চিত রাখা সম্ভব নয়।

তবে এই লক্ষ্য অর্জনের পক্ষে দুটি বড় বাধা আছে। প্রথমত, ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত দেশগুলির সাথে অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপের দেশগুলির বিরাট ব্যবধান আছে। ইউনিয়নের সদস্যপদ পাওয়ার আগে এই দেশগুলিকে উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে ন্যূনতম মান অর্জন করতে হবে, তাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটাতে হবে। দ্বিতীয়ত, নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়টিকে সুষ্ঠু করতে ইউনিয়নও বর্তমানে নিজের পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ইয়োরোপীয় ঐক্য আন্দোলনের সামনে চ্যালেঞ্জ সমূহ

ইয়োরোপীয় ঐক্য আন্দোলন পাঁচ দশকের পুরানো। এই সময়কালে ইয়োরোপের চরিত্রের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। আজকের ইয়োরোপ আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় উপনীত। ইয়োরোপীয় ইউনিয়নও আজ একটি পরিবর্তিত সত্তা। এর সদস্য সংখ্যা কেবল ৬ থেকে ১৫ হয়নি, এর কার্যকলাপের ক্ষেত্রও বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিগত দশকে এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া অনেক দ্রুত হয়েছে। অভ্যান্তরীণ বাজারটিকে আরও শক্তিশালী করতে ১৯৮৬ সালে রোম চুক্তির সংশোধন ঘটিয়ে Single European Act প্রণীত হয়েছে। এ ছাড়া সামাজিক, পরিবেশগত এবং ফিসক্যাল নীতির ক্ষেত্রেও EEC গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বাক্ষর রেখেছে।

ইয়োরোপীয় ঐক্য আন্দোলনের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে উত্থাপিত এবং ১৯৯৩ সালের ১ নভেম্বর থেকে চালু হওয়া মাসট্রিকট্ (Maastricht) চুক্তি। এই চুক্তির দ্বারা ইয়োরোপীয় একীকরণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিষয়গুলিকেই কেবল গুরুত্ব দেওয়া হত। এই চুক্তির দ্বারা সদস্য রাষ্ট্রগুলি তিনটি মূল ভিত্তির উপর ইয়োরোপীয় ইউনিয়নকে স্থাপন করতে রাজি হয়েছে। এগুলি হল তিনটি ইয়োরোপীয় গোষ্ঠী, একটি সাধারণ বিদেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি (Common Foreign

and Security Policy) এবং ন্যায় বিচার ও স্বরাষ্ট্র ক্ষেত্রে (Home Affairs) সদস্য রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতা। শেষোক্ত ভিত্তি দুটি বর্তমানে সাধারণ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত নয়। এর প্রতিফলন ঘটে মূলত মন্ত্রী পরিষদে এবং এগুলির চরিত্র হল আন্তঃসরকারি; তবে রাজনৈতিক সহযোগিতার একটি রূপ হিসাবে তারা এখনকার ইয়োরোপীয় রাজনৈতিক সহযোগিতাকে অতিক্রম করে যেতে পারে এবং ভবিষ্যতে 'গোষ্ঠী' প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

মাসট্রিকট্ কাঠামোর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল অর্থনৈতিক এবং অর্থসংক্রান্ত ইউনিয়ন (Economic and Monetary Union – EMU)। ১৯৭২ সাল থেকেই ইয়োরোপে একক মুদ্রাব্যবস্থা এবং একটি ইয়োরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। সকল প্রকার শুল্ক ও অ-শুল্কজাত বাধা অপসারণ করে একটি পূর্ণাঙ্গ ও ঐক্যবদ্ধ সাধারণ বাজার সৃষ্টির প্রক্রিয়া ১৯৯২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত হবার ফলশ্রুতি হিসাবে সমগ্র ইয়োরোপীয় গোষ্ঠী জুড়ে একটি মাত্র মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করা প্রায় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফরাসী রাষ্ট্রপতি মিতেরাঁ ও জার্মান চ্যান্সেলর কোল এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী হন যাতে মাসট্রিকট্ চুক্তির শর্ত অনুয়ায়ী ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারী এই মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করা যায়। তবে এই পরিকল্পনা রূপায়িত হবার পথে কিছু রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত বাধা দেখা দেয়। গোষ্ঠীর সদস্য রাষ্ট্রগুলির অর্থনীতির বিশেষ সমন্বয় সাধন ছিল একক মুদ্রা ব্যবস্থার সাফল্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ। এছাড়া একক মুদ্রাব্যবস্থা সমগ্র ইয়োরোপ জুড়ে চালু হলে পরিচিতির প্রতীক নিজস্ব মুদ্রাব্যবস্থা বিলুপ্ত করতে হবে। ফলে অনেক দেশ এ ব্যাপারে প্রথমে উৎসাহী ছিল না। ব্রিটেন প্রথম থেকেই নিজেকে এই পরিকল্পনার বাইরে রেখেছে।

এত সব বাধা সত্ত্বেও ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারী ইয়োরোপীয় একক মুদ্রাব্যবস্থা ইউরো (Euro) চালু হয়েছে। এই ব্যবস্থা প্রথমে ব্যাঙ্ক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রচলিত হয়। ২০০২ সালের ১ জানুয়ারী থেকে অংশ গ্রহণকারী সদস্য রাষ্ট্রগুলিতে ইউরো দৈনন্দিন ক্ষেত্রে পুরোপুরি চালু হয়েছে এবং তাদের প্রচলিত মুদ্রাব্যবস্থার অর্থাৎ ব্যাঙ্ক নোট ইত্যাদি অবসান ঘটেছে। এই দেশগুলিতে এখন 'ইউরো' একমাত্র প্রচলিত মুদ্রাব্যবস্থা। বর্তমানে আন্তর্জাতিক মুদ্রার বাজারে 'ইউরো' খুব সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রাজনৈতিক ভাবে সংবেদনশীল ক্ষেত্রগুলিকে অধি-জাতীয় সহযোগিতার বাইরে রাখা হয়েছিল। এর ফলে বিদেশ ও প্রতিরক্ষা নীতির ক্ষেত্রে সহযোগিতার সূত্রপাত হয় কিছু বিলম্বে এবং আন্তঃসরকারি পদ্ধতিতে। মাসট্রিকট্ চুক্তি একটি সাধারণ বিদেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি (Common Foreign and Security Policy – CFSP) প্রণয়ন ও রূপায়ণের ভিত্তি স্থাপন করে। তবে বিষয়টির সংবেদনশীলতার জন্য এই নীতি প্রধানত আন্তঃসরকারি পদ্ধতিতে রূপায়িত হচ্ছে। এর প্রধান লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি একক ইয়োরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতি প্রণয়ন ও

উপস্থাপন। বলাই বাহুল্য যে যদিও এক্ষেত্রে কিছু সাফল্য পরিলক্ষিত হয়েছে সাম্প্রতিককালে, এর মাত্রা কিন্তু সীমিত। গত একদশকে ইরাক ও যুগোশ্লাভিয়ার সংকটে সদস্য রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্যই এই সীমিত সাফল্যের নিদর্শন।

গত পাঁচ বছরে ইয়োরোপীয় সংহতি প্রক্রিয়া আরো দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তিদ্বারা গতিশীল ও সংঘবদ্ধ হয়েছে। ইয়োরোপীয় নাগরিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ, সাধারণ বিদেশ ও নিরাপত্তা সক্রান্ত নীতির আরো উন্নততর সমন্বয় সাধন ও কার্যকরী হবার সুযোগ প্রদান, ইউনিয়নের আসন্ন সম্প্রসারণকে সাফল্যমন্ডিত করার প্রয়াসে সাধারণ নীতি প্রনয়ণ পরিকাঠামো বিশেষত প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার ইত্যাদি ইয়োরোপীয় আঞ্চলিক সহযোগিতাকে এক নতুন স্তরে উন্নীত করেছে। পূর্ব ও মধ্য ইয়োরোপের ছটি দেশ - পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, স্লোভেনিয়া, এস্টোনিয়া, সাইপ্রাস ও চেক প্রজাতন্ত্র - এর যোগদানের মাধ্যমে ইয়োরোপীয় ইউনিয়ন ১ জানুয়ারী ২০০৪ সালে ১৫ থেকে ২১ সদস্য বিশিষ্ট সংস্থায় রূপান্তরিত হতে চলেছে। অদূর ভবিষ্যতে আরো সাতটি দেশের ইউনিয়নের সদস্য প্রাপ্তির ব্যাপারে আলাপ আলোচনা চলেছে। এই সাতটি দেশ হল - বুলগেরিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, মল্টা, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া ও তুরস্ক।

উপসংহার ঃ গত পাঁচ দশকে ইয়োরোপীয় সংহতি প্রক্রিয়া পশ্চিম ইয়োরোপের অর্থনৈতিক পরিবর্তন, রাজনৈতিক সহযোগিতা ও সামরিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যাবলী মোকাবিলার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে সুনির্দিষ্ট নীতিজনিত সমস্যার সমাধানে পশ্চিম ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো উদ্ভাবন করে। যথা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য একক মুদ্রা সমেত একক বাজার, রাজনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতার জন্য সাধারণ বিদেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি, ন্যায় ও স্বরাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে বিশেষ সহযোগিতা। এই প্রক্রিয়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন স্তরে রাজনৈতিক নীতি প্রনেতা ও উচ্চ আমলাবর্গের মধ্যে নিরন্তর আলোচনা ও গভীর সমন্বয় সাধন।

এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হল ইয়োরোপীয় বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে বহুদিন ধরে চলে আসা দ্বন্দ্বের নিরসন এবং নিজেদের মধ্যে একটা আস্থা ও সৌহার্দের বাতাবরণ সৃষ্টি। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ফ্রান্স ও জার্মানীর চিরশত্রুতার অবসান ও দুটি দেশের মধ্যে এক নিবিড় সমন্বয় সাধন যা আজকের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে বিরল। গত পাঁচ দশকে ফরাসী-জার্মান সহযোগিতা ইয়োরোপীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার প্রধান সৃজনীশক্তি হিসাবে কাজ করে এসেছে এবং এই জুটি এখনও ইয়োরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান প্রাণশক্তি।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি লক্ষনীয় বিষয় হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক সম্পর্কে জাতীয় সার্বভৌমত্বের সীমারেখা সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি। মাঝারি ও ক্ষুদ্র ইয়োরোপীয়

রাষ্ট্রগুলি তাদের সীমিত সামর্থে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে না, এই উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে ইয়োরোপীয় চিন্তাবিদগণ অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে একটি ইয়োরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সময়ের সাথে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ইয়োরোপীয় জাতি রাষ্ট্রগুলি তাদের জাতীয় স্বকীয়তা পুরোপুরি ত্যাগ করতে উৎসাহী নয়। সংহতি প্রক্রিয়াকে আরো গভীরে নিয়ে যাওয়ার মাসট্রিকট্ চুক্তির প্রয়াস কিছু সদস্যরাষ্ট্রের জনমানসে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি করেছিল। জাতীয় সত্তাকে যতদূর সম্ভব বজায় রেখেই ঐক্য প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এই বোধ এখন সকল ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রেই আজ বাস্তব সত্য। অবশ্য সদস্য রাষ্ট্রগুলিতে ঐক্যের গভীরতা নিয়ে কিছু মত পার্থক্য আছে যেহেতু সকলের দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়।

গত পাঁচ দশকে পশ্চিম ইয়োরোপে কোন সংঘাত ঘটেনি। যে মহাদেশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী তিনশ বছরে নিরন্তর সংঘর্ষের পীঠভূমি ছিল তার পক্ষে এ এক বড় কৃতিত্ব। শুধু তাই নয়, স্থায়ী শান্তি এবং অর্থনৈতিক সমন্বয় সাধন ইয়োরোপ বিশেষত পশ্চিম ইয়োরোপকে সমৃদ্ধির এক নতুন স্তরে নিয়ে যায়। যার ফলশ্রুতি ইয়োরোপের অন্য রাষ্ট্রগুলির কাছে এই সংস্থার এক দুর্নিবার আকর্ষণ এবং এর কলেবর বৃদ্ধি।

সর্বোপরি লক্ষণীয় এক বৃহৎ শক্তি হিসাবে আন্তর্জাতিক স্তরে ইয়োরোপীয় ইউনিয়নের স্বীকৃতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন ও জাপানের মত ইয়োরোপীয় ইউনিয়ন আজ একটি প্রভাবশালী শক্তি যাকে উপেক্ষা করে অন্তত পৃথিবীর অর্থনৈতিক এবং বহুলাংশে রাজনৈতিক সমস্যাবলীর মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

ইয়োরোপে সংহতি প্রক্রিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছে। বহু বাধা সত্ত্বেও এই প্রক্রিয়ার সাফল্য নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এক সুদৃঢ় সমজাতীয় গোষ্ঠী ৬টি দেশ নিয়ে তার যাত্রা শুরু করে আজ ১৫-তে পৌঁছেছে। এর কলেবর আরও বৃদ্ধি পেতে চলেছে। তবে এর ফলে এর সমজাতীয় চরিত্র রক্ষিত নাও হতে পারে এবং এর কার্যকলাপের উপরও তার প্রভাব পড়তে পারে। এই গোষ্ঠী বর্তমানে কার্যকলাপের গভীরতা এবং সংখ্যার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চালাচ্ছে। আকৃতি ক্ষুদ্র হলে সমন্বয় সাধনের কাজ এবং সংগঠনের গভীরতা বৃদ্ধির কাজ সহজ হয়। সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সদস্য দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য ও ব্যবধান স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সংগঠন পরিচালনা সমস্যা সংকুল হয়ে পড়তে পারে। ফলে সংগঠনের মধ্যেই ছোট ছোট গোষ্ঠী গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থেকে যায়। EMU-এর রূপায়ণের ব্যাপারে এই প্রবণতা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে।

অনেক দিক দিয়েই আজকের ইয়োরোপ মানবতার একটি নির্দিষ্ট রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। মানব সভ্যতার কতগুলি পুরানো সমস্যা (যা সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে আরও দুরূহ রয়েছে) দূর করার ব্যাপারে ইয়োরোপের প্রচেষ্টা সমগ্র মানবজাতির উপরেই প্রভাব ফেলেছে। অদূর ভবিষ্যতে একীকরণের পথে ইয়োরোপের বৃহত্তর সাফল্য অন্যান্য অঞ্চলেও সমজাতীয় অগ্রগতির পথ আরও প্রশস্ত করবে।

সূত্রনির্দেশ

অলটার, কে. (২০০০) *দ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নস্ লিগাল সিস্টেম এন্ড ডোমেস্টিক পলিসি*, স্প্রিলওভার অর 'ব্যাকলাস', *ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন*, ৫৪/৩, ৪৮৯-৫১৮।

বেষ্ট, ই. গ্রে, এম. এবং স্টাব এ. (সম্পা), *রিথিংকিং দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, আইজিসি ২০০০ এবং বিয়ন্ড*, মাসট্রিক; ইউরোপিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন।

ক্যাপোরাসো, জে. এবং কেলার জে. (১৯৯৫) 'দ্য ই ইউ এন্ড রিজিওনাল ইন্টিগ্রেশন থিয়োরি', সি.রোডস ও এস ম্যাজে (সম্পা), *দ্য স্টেট অফ্ দি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, তৃতীয় খন্ড, বিল্ডিং এ ইউরোপিয়ান পলিটি*, বোল্ডার লিন রিনার, পৃঃ ২৯-৬২।

কিকোস্কি আর ঃ 'ইন্টিগ্রেটিং দ্য এনভায়ারোনমেন্ট, দ্য ইউরোপিয়ান কোর্ট এন্ড দ্য কনট্রাকশান অফ সুপারন্যাশনাল পলিসি,'' *জার্নাল অফ ইউরোপিয়ান পাবলিক পলিসি*, ৫/৩, ৩৮৭-৪০৫।

কোন, ডি (১৯৯৯), ''বিজনেস ইন্টারেস্ট এন্ড ইউরোপিয়ান ইনটিগ্রেশন'', অপ্রকাশিত রচনা যেটি ''অরগানাইজড ইনটারেস্ট ইন দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, লবিইং মবিলাইজেশন এন্ড দ্য ইউরোপিয়ান পাবলিক এরিয়া'' বিষয়ক সম্মেলনে, নাফিল্ড কলেজ, অক্সফোর্ড, অক্টোবর ১-২ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

কমিশন অফ্ দি ইউরোপিয়ান কমিউনিটিস্ (১৯৯২*, এন ওপেন এন্ড স্ট্রাকচারড ডায়ালগ বিটিউইন দ্য কমিশন এন্ড ইনটারেস্ট গ্রুপস্* (SEC (92), 2272 ফাইনাল), ব্রাসেলস্, কমিশন অফ দ্য ইউরোপিয়ান কমিউনিটিস্।

কাউলেস্ এম. (১৯৯৫), 'সেটিং, দ্য এজেন্ডা ফর এ নিউ ইউরোপ, দ্য ই আর টি এন্ড ইসি ১৯৯২, *জার্নাল অফ্ কমন মার্কেট স্টাডিস*, ৩৩/৪, ৫০১-২৬।

ক্রাম এল, (১৯৯৩), 'কলিং দ্য টিউন উইদাউট পেয়িং দ্য পাইপার? সোসাল পলিসি রেগুলেশন, দ্য রোল অফ দ্য কমিশন এ্যাস এ মাল্টি- অরগানাইজেশন ঃ সোসাল পলিসি এন্ড আই টি রেগুলেশন ইন দ্য ই ইউ. *জার্নাল অফ্ ইউরোপিয়ান পাবলিক পলিসি*, ১/২, ১৯৫-২১৭।

ডিহাউস আর এবং মোজোন জি. (১৯৯৪), দ্য ইনস্টিটিউশনাল ডায়ানামিক্স অফ্ ইউরোপিয়ান ইনটিগ্রেশন, 'এস.মার্টিন (সম্পা), *দা কনস্ট্রাকশান অফ্ ইউরোপ, এসেজ ইন অনার অফ্ এমিলে নোয়েল, ড্রোরড্রেচ্ট্ ক্লুয়ার একাডেমিক পাবলিসার্স*, পৃঃ ৯১-১১২।

ডুকেন এফ্ (১৯৯৪), *জাঁ মনেট, দ্য ফার্স্ট স্টেটস্ম্যান অফ ইনডিপেনডেস*, নিউ ইয়র্ক, নর্টন।

ডাফ.এ. (সম্পা), দ্য ট্রিটি অফ্ আমস্টারডাম, *টেক্স্ট্* এন্ড কমেনটারি, লন্ডন, ফেডেরাল ট্রাস্ট।

স্ট্রিক পি.এম.আর এবং জিগাল ডি. (সম্পা) (১৯৯৯), *দ্য অরিজিন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফ্ ইউরোপিয়ান ইনটিগ্রেশন, এ রিডার এন্ড এ কমেনটারি*, লন্ডন, পিনটার।

স্টোন সুইট, এ. এবং ব্রানেল টি (১৯৯৮), 'দ্য ইউরোপিয়ান কোর্ট এন্ড দ্য ন্যাশনাল কোর্টস্ ঃ এ স্ট্যাটিসটিকাল এনালিসিস অফ্ প্রিলিমিনারি রেফারেন্সেস, ১৯৬৬-৯৫, *জার্নাল অফ ইউরোপিয়ান পাবলিক পলিসি*, ৫/১, ৬৬-৯৭।

ভ্যান শেনডেলেন, এম.পি.সি.এম. (১৯৯৮), *ই ইউ কমিটিস্ এস ইনফ্লুয়েনসিয়াল পলিসি মেকারস্*, এলডারসোট, আসগেট।

ভ্যান শেনডেলেন, R. (ed) (১৯৯২), *ন্যাশানাল পাবলিক এন্ড প্রাইভেট লবিইং*, এলডারসোট,

ডার্টমাউথ প্রেস।

ভোগান আর (১৯৭৯), *টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি ইউরোপ*, লন্ডন, ক্রোম, হেলম্।

ওয়ালেস এইচ, (২০০০), 'ফ্লেক্সিবিলিটি; এ টুল অফ্ ইনটিগ্রেশন অর এ রেসট্রেন্ট অন ডিসইনটিগ্রেশন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃঃ ১৭৫-৯১।

উইলার জে (১৯৯৭), দ্য রিফরমেশন অফ্ ইউরোপিয়ান কনস্টিটিউশনালিজম, জার্নাল অফ্ কমোন মার্কেট স্টাডিজ, ৩৫/১, ৯৭-১৩১।

উইলার জে (২০০০), আইজি সি ২০০০, দ্য কনস্টিটিউশনাল এজেন্ডা, ই.বেস্ট, এম গ্রে এবং এ. স্টাব (সম্পা), *রিথিংকিং দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, আই জি সি ২০০০ এন্ড বিয়ন্ড মাসট্রিষ্ট*, ইউরোপিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ২১৯-৩৬।

পোলক এম, (২০০০), 'এ ব্রেরাইট ট্রিটি নিয়ো লিবেরালিজম এন্ড রেগুলেটেড ক্যাপিটালিজম ইন দ্য ট্রিটি অফ্ আমস্টারডাম ইন 'কে. ননরেদার এবং উইনার এ সম্পাদিত *'ইউরোপিয়ান ইনটিগ্রেশন আফটার আমস্টারডাম, ইনস্টিউশনাল ডায়নামিক এন্ড প্রসপেকট্স ফর ডেমোক্রেসি'*,অক্সফোর্ড, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

রিচার্ডসন জে.জে.এন্ড জর্ডন জি (১৯৭৯), *গভার্নিং আন্ডার প্রেশার*, অক্সফোর্ড, ব্লাকওয়েল।

সাবাতিয়ার পি. (১৯৮৮), 'এন এডভোকাসি কোয়ালিশন ফ্রেমওয়ার্ক অফ্ পলিসি চেঞ্জ এন্ড দ্য রোল অফ্ পলিসি ওরিয়েন্টেটেড লার্নিং দেয়ারইন', *ইনটারন্যাশানাল অর্গানাইজেশন*, ৪৬, ১-৩৫।

সাবাতিয়ার পি. (১৯৯৮), 'দ্য এ্যাডোকেসি কোয়ালিশন ফ্রেমওয়ার্ক, রিভিশনস্ এন্ড রেলেভেনস্ ফর ইউরোপ', *'জার্নাল' অফ্ ইউরোপিয়ান পাবলিক পলিসি*, ৫/১, ৯৮-১৩০।

স্টিভেনস্ এ. (২০০০), 'এভার ক্লোজার ইউনিয়ন ঃ ইউরোপিয়ান কোঅপারেশন এন্ড দ্য ইউরোপিয়ান ডায়মেনশন', ইন আর সাকোয়া ও এ স্টিভেনস্ সম্পাদিত, *'কনটেমপোরারি ইউরোপ'*, লন্ডন, ম্যাকমিলান, পৃঃ ১৩৭-৬০।

আরউইন ডিঃ (১৯৮৯), *ওয়েস্টার্ন ইউরোপ সিনস্ ১৯৪৫ঃ এ পলিটিকাল হিসট্রি*, চতুর্থ সংস্করণ, লন্ডন, লংম্যান।

মোরাভ সিক, এ (১৯৯৮), *'দ্য চয়েজ্ ফর ইউরোপ ঃ সোসাল পারপোস এন্ড স্টেট পাওয়ার ফ্রম মেসিনা টু মাসস্ট্রিক্ট*, ইটাচা, কর্নেল ইউনিভার্সিটি প্রেস।

মোরাভ সিক, এ ও নিকোলেডিস কে (১৯৯৮), 'ফেডেরাল আইডিয়াল এন্ড কনস্টিটিউশনাল রিয়ালিটিস', *এনুয়াল রিভিউ*, জার্নাল অফ্ কমন মার্কেট স্টাডিজ, ৩৬।

নেনরিটার কে. ও উইনার এ (সম্পাদিত) (২০০০), 'ইউরোপিয়ান ইনটিগ্রেশন আফটার আমস্টারডাম ঃ ইনস্টিটিউশনাল ডায়নামিকস এন্ড প্রসপেক্টস অফ ডেমোক্রেসি', অক্সফোর্ড, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

পিটারস্ জি. (১৯৯৪), 'এজেন্ডা সেটিং ইন দ্য ইউরোপিয়ান সোসাইটি', *জার্নাল অফ ইউরোপিয়ান পাবলিক পলিসি*, ১/১ ঃ ৯-২৬।

পিটারসন জে. (১৯৯৫), 'ডিসিশন মেকিং ইন দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন', টুয়ার্ডস এ ফ্রেমওয়ার্ক ফর এনালিসিস, 'জার্নাল অফ ইউরোপিয়ান পাবলিক পলিসি, ২/১, ৬৯-৯৪।

পিলিপার্ট ই এবং Sie Dhian Ho. M. (2000) 'ফ্রম ইউনিফরমিটি টু ফ্লেক্সিবিলিটি : দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ্ ডাইভার্সিটি এন্ড ইটস্ ইউনিফর্মিটি টু ফ্লেক্সিবিলিটি, অক্সফোর্ড হার্ট, পৃঃ ২৯৯-৩৩৬।

পিয়ারসন পি : 'দ্য পাথ টু ইউরোপিয়ান ইনটিগ্রেশন', এ হিস্টোরিকাল ইনস্টিটিউশনাল এ্যানালিসিস, 'কমপারেটিভ্ পলিটিকস্, ২৯।২, ১২৩-৬৩।

পিনডার জে. (১৯৯৫), ইউরোপিয়ান কমিউনিটি, দ্য বিল্ডিং অফ্ এ ইউনিয়ন, 'অক্সফোর্ড' ইউনিভার্সিটি প্রেস।

'ওয়েস্টলেক', এম. (সম্পা), (১৯৯৪), দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বিয়ন্ড আমস্টারডাম, নিউ কনসেপ্টস অফ্ ইউরোপিয়ান ইনটিগ্রেশন, লন্ডন।

ডাফ, এ (১৯৯৮) ব্রিটেন অ্যান্ড ইউরোপ : দি ডিফারেন্ট রিলেশানশিপ, ইন এম.ওয়েস্টলেক (এডি) দি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বিয়ন্ড আমস্টার্ডাম নিউ কনসেপ্ট স্ অফ ইউরোপিয়ান ইনটিগ্রেশন, লন্ডন, রুটলেজ, পৃঃ ৩৪-৪৬।

ডাফ, এ পিনডার, জে. অ্যান্ড প্রাইস, R (সম্পা) (১৯৯৪) মাসট্রিক্ট অ্যান্ড বিয়ন্ড : বিল্ডিং দি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, লন্ডন রুটলেজ।

ডাইসন, কে অ্যান্ড ফিদারস্টোন, কে (১৯৯৯) দি রোড টু মাসট্রিক্ট : নিগোশিয়েটিং ইকনোমিক অ্যান্ড মনেটারি ইউনিয়ন, অক্সফোর্ড, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

এডয়ার্ডস্, জি অ্যান্ড পিজপারস্ এ (সম্পা) (১৯৯৭) দি পলিটিক্স অফ ইউরোপিয়ান ট্রিটি রিফরম, লন্ডন : প্রিন্টার, ইউরোপিয়ান কমিশন (১৯৯৯) ইউরোব্যারোমিটার ৫১:২৫।

ফিদারস্টোন, কে. (১৯৯৪) জিন মোনেট অ্যান্ড দি "ডেমোক্রেটিক ডেফিসিট" "ইন দি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ান', জার্নাল অফ্ কমন মার্কেট স্টাডিজ ৩২/২ : ১৪৯-৭০।

জর্জ, এস (১৯৯০) অ্যান অকওয়ার্ড পার্টনার, ব্রিটেন ইন দি ইউরোপিয়ান কমিউনিটি, অক্সফোর্ড, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

গ্রিনউড, জে (১৯৯৭) রিপ্রেজেন্টিং ইনটারেস্টস্ ইন দি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, লন্ডন : ম্যাকমিলান।

গুসটাফসন, আর (১৯৯৬) 'দি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ১৯৯৬ অ্যান্ড বিয়ন্ড : এ পারসোনাল ভিউ ফর্ম দি সাইডলাইন, ইন এস. এস. অ্যান্ডারসন অ্যান্ড কে.এ এলিয়াসেন (সম্পা) দি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন : হাউ ডেমোক্রেটিক ইস্ ইট লন্ডন, সেজ।

হাস্ ই (১৯৫৮) দি ইউনাইটিং অফ্ ইউরোপ, স্ট্যানফোর্ড, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

জাঙগ্ কে (১৯৯৬) *ফ্লেক্সিবিলিটি, এনহ্যানস্ড কোঅপারেশন অ্যান্ড দি ট্রিটি অফ্ আমস্টারডাম,* ইউরোপিয়ান ডোসিয়ার সিরিজ, লন্ডন, কোগান পেজ।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চার সাম্প্রতিক প্রাসঙ্গিকতা ঃ

নূপুর দাশগুপ্ত

অধুনা যুক্তিসম্মত ঐতিহাসিক গবেষণার গুরুত্ব কতখানি? গোড়াতেই সাম্প্রতিক কালের পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধের উল্লেখ করি। একটি প্রবন্ধের শীর্ষনাম ঃ "সতী ঃ একের অনলে বহুর আহুতি", সেটি ৪ঠা জানুয়ারি, ২০০৩ সংখ্যার দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত। লেখিকা ভাস্বতী চক্রবর্তী।[১] অন্য প্রবন্ধটি অর্মত্য সেন এর "ভারতে শ্রেণীবিভাগের তাৎপর্য"[২] প্রথমটির বিষয়বস্তু নতুন করে উত্থাপিত কেন হলো? এর পটভূমিটি অত্যন্ত জটিল এক আবর্তের সৃষ্টি করেছে। ইদানীংকালে এই প্রসঙ্গ নতুন করে উত্থাপন কেন? সে এক গুরুতর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন। উদাহরণের সাম্প্রতিক সংখ্যা স্বল্প হলেও এটি একটি মারাত্মক রূপ নিতে পারে। সুতরাং এর ঐতিহাসিক মূল্য নিঃসন্দেহে অনুধাবন যোগ্য। দ্বিতীয় প্রবন্ধটির বিষয়বস্তুর ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরতে হলে শ্রী সেনের বক্তব্য উদ্ধৃত করতে হবে। তিনি লিখছেন ঃ "দুটো কারণে এই বিষয়টার আলোচনা খানিকটা কঠিন, প্রথমত, শ্রেণীই অসাম্যের একমাত্র উৎস নয়। তাই অসাম্যের উৎস হিসাবে শ্রেণীকে দেখার সময় একটা বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে তা দেখতে হবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে রয়েছে অন্যান্য বিভেদ সৃষ্টিকারী সম্পর্কগুলো - যেমন লিঙ্গবিভাগ, জাতি - বর্ণ বিভেদ, আঞ্চলিক পরিচিতি, গোষ্ঠীগত পরিচিতি ইত্যাদি।" তিনি আরও লিখছেন - নীচু জাতিতে জন্মানোটা নিঃসন্দেহে বঞ্চনার একটি কারণ। দলিত বা নিম্নবর্ণের লোকেরা অথবা তফসিলভুক্ত আদিবাসীরা যে বঞ্চনা ও বৈষম্যে ভোগেন, তা অনেক বেশি রকম হয়ে দাঁড়ায় যখন তা দারিদ্র্যের সঙ্গে যুক্ত হয়।"[৩] নীচু জাতিতে জন্মানোর ব্যাপারটি শুধু একটি বাক্যে সরলীকৃত করে, এবং তাকে অবশম্ভাবী পরিনাম বলে প্রায় প্রাকৃতিক রূপ দেওয়া হচ্ছে। এমন দৃঢ়ভাবে বর্ণবৈষম্যের রীতিটি আমাদের জীবনে শিকড় গেড়েছে, যে তা আমাদের আধুনিক অস্তিত্বকেও পাকে পাকে জড়িয়ে রেখেছে। আমাদের ইদানীং কালের জীবনে বর্ণবৈষম্য ও সতীপ্রথার প্রাসঙ্গিকতা কিভাবে আসে, তা ভাবতে গিয়েই শিক্ষিত মানুষের মনে ইতিহাসের চর্চা, বিন্যাস ও তার বিকৃতি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন ওঠে। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিষয়টি যাচাই করা যাক। বর্ণ ও লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য সময়ের সোপান ধরে প্রাচীন যুগ থেকে আজ অবধি সামাজিক রীতি ও নির্দিষ্ট ব্যবহারিকতার মধ্য দিয়ে নানাভাবে অনুষ্ঠিত, অনুসৃত হয়ে এসেছে, এবং কালে তা প্রাত্যহিক জীবনের

ধারায় সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। আরোপিত ঐতিহাসিকতার সৌজন্যে, প্রায় প্রশ্নবিহীন এক স্বীকৃতি দাবী করে এই ধারাগুলি। অথচ এর ঐতিহাসিক ভিত্তি কি? এই বিষয়গুলি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের এক গবেষকের কাছে প্রাসঙ্গিক নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। সমসময় দাবী করে, নতুনভাবে প্রাচীন ভারতের সত্য ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ন। প্রাচীন কাল থেকে অনুসৃত বলে যে রীতিগুলি চিহ্নিত করা হচ্ছে, তার সঠিক তথ্য নির্ভর খোঁজ ও তার প্রেক্ষিতের সম্পূর্ণ ছবি তুলে ধরতে হবে, এবং সেই সময় থেকে এ যাবৎ প্রত্যেক যুগ তার কায়েমী স্বার্থে অথবা জীবনের ব্যবহারিক খাতিরে এই রীতিগুলিকে ধর্মীয় শাস্ত্রীয় সংজ্ঞায় ও আখ্যায় ভূষিত করেছে। এই প্রক্রিয়ার একটি নির্মোহ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ইদানীংকালের ইতিহাস দর্শনে মিশেল ফুকোর[৪] অবদানের কথা বলতেই হয়। তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমবিকাশের একটি নিজস্ব জীবন ধারা থাকে। সেই ধারাটি সবসময় সরল-রেখা-পথ ধরে চলে না। তার পথে নানা ঘটনা, নানা মনস্কতা ও উপকরণ কাজ করে। এই সর্পিল গতিতে অগ্রসর ইতিহাস একটি প্রায় স্বতন্ত্র জীবের উদ্ভবেরই মতো।

প্রাচীন ভারতে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতিগুলির পরিচয় প্রধানত আমরা সাহিত্যিক সূত্র সমূহে পাই। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিবরণীগুলি আমাদের ইতিহাসচর্চা প্রভাবিত করে। এই বিষয়ে কিছু কাজ, বিশেষ করে ঐতিহাসিক বিবরণীর চরিত্র ও তার ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে রোমিলা থাপার কয়েকটি প্রবন্ধে লিখেছেন। থাপারের[৫] নির্ভুল বক্তব্য—বিবরণী নিজে কথা বলে না, বিবরণীকে কথা বলানো হয় — এই দৃষ্টিভঙ্গী ইতিহাস, বিশেষ করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চার প্রেক্ষাপটে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রণালীর সূচনা করেছে। এর মূল সুরটি ফুকোর দর্শনে নিহিত রয়েছে। কালের গতিপথ ধরে বিবরণীর যে একটি জৈবিক বিকাশ ঘটে সে কথাই থাপার তুলে ধরেছেন। তবে শুধু আখ্যান, কিংবদন্তী বা উপন্যাস নয়, — আকরগ্রন্থ, আইনগ্রন্থ বা ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতেও আদতে কোন না কোন নির্দিষ্ট ও বিশেষ ব্যক্তিমানস বা সমষ্টিমানসের প্রতিফলন হয়েছে। সমস্ত সাহিত্যিক উপাদানই রচয়িতাদের দৃষ্টিভঙ্গীর আত্মপ্রয়োজক, এবং এ সব ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট স্থান, কাল, পাত্রগত প্রেক্ষিতের প্রগাঢ় প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। অথচ ইতিহাস চর্চায় এই সাহিত্যিক উপাদানের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এই সূত্রগুলির বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর সর্বাঙ্গীন মূল্যায়নের ভিত্তিতে ইতিহাস চর্চা ও রচনার কথা এই নিবন্ধে তুলে ধরা হল।

যে দুটি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে, তার ঐতিহাসিক সূত্র সম্বলিত গবেষণা কেমন করে এগোবে? এবার সেটা আলোচনা করা যাক। সতীদাহ প্রথা সংক্রান্ত তথ্যাদি সাহিত্যিক সূত্রে প্রাপ্ত। একটি ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করতে হলে শুরু করতে হবে ঋগ্বেদের সূত্র থেকে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের[৬] একটি সূক্তে (সম্ভবত

পরবর্তী বৈদিক যুগের সন্ধিক্ষণে রচিত) বর্ণিত হয়েছে স্বামীর চিতায় এক নারীর আত্মাহুতির উদ্যত প্রয়াস। কিন্তু এক্ষেত্রে শ্লোকটিতে স্পষ্ট বলা হচ্ছে - হে নারী তুমি মৃতদেহ লগ্ন হয়ে আছো, তুমি উত্থান কর, জীবিতের জগতে ফিরে এসো এবং যে ব্যক্তি তোমার হাত ধরে চিতা থেকে উদ্ধার করছে, তার স্ত্রী রূপে, তার সন্তানের জননী রূপে ফিরে এসো। পরবর্তীকালে অথর্ব বেদে দুবার এই প্রথার বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ "দেখলাম জীবিত নারীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মৃতের বধূ হতে"[৭] এবং "এই নারী পতিলোকে যাচ্ছে, এ প্রাচীন রীতি অনুসরণ করছে।"[৮] এই দুটি উল্লেখ থেকে বোঝাই যায়, অথর্ব বেদের রচনা কালেও এই দৃষ্টান্ত (অর্থাৎ সতীদাহের ঘটনা) স্বল্প প্রচলিত এবং কোন এক প্রাচীন সংস্কৃতির একটি নির্দিষ্ট, স্বতন্ত্র ধারা, যা সামগ্রিকভাবে সমাজের পালনীয় ছিল না।

অপরদিকে বৈধব্য জীবন যে যন্ত্রণাদায়ক ছিল সে কথাও জানা যায়। যেমন তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে[৯] স্পষ্ট বলা হচ্ছে কোন নারীর প্রার্থনা যেন সে ইন্দ্রানীর মত অবিধবা হয়। তবে ঋগ্বেদের[১০] দশম মন্ডলে এও বলা হয়েছে যে বিধবা নারী তার দেবরের শয্যা অভিমুখিনী হয়। অথর্ব বেদ বা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেরও পরের রচনা আশ্বলায়ন সূত্রে[১১] বলা হয়েছে বিধবা নারী তার দেবর, মৃত স্বামীর শিষ্য, ছাত্র বা কোন পুরাতন অনুচরের সঙ্গিনী হতে পারে। অথর্ব বেদে তো এক নারীর বহুবিবাহের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।[১২] সুতরাং বৈধব্য সম্পর্কে কোন একমুখী ধারা এই প্রাচীন সাহিত্য থেকে নির্দিষ্ট করা যায় না। তবে জমির উপর অধিকার, স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত ধারণা ও ব্যবহারিক জীবনের খাতিরে সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনের উদ্ভব, ধীরে ধীরে সামাজিক কাঠামোকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দিতে থাকে। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও উত্তরাধিকারের নিয়মাবলী গঠিত হওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল সামগ্রিকভাবে সমাজে নারীর অবস্থানের উপর প্রতিফলিত। সুকুমারী ভট্টাচার্য অবশ্য এর সাথে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত উত্তরভারতে নানা বৈদেশিক জাতির অনুপ্রবেশের ঘটনাও যুক্ত করেছেন।[১৩] এই পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি মনুস্মৃতিতে পাওয়া যায়। মনু বিধবাদের জন্য এক কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনের জীবন নির্দেশ করেছেন।[১৪] তবে মনুতে সতীদাহের নির্দেশ নেই। মনু পরবর্তী স্মৃতিকার যাজ্ঞবল্ক্যও সতীদাহকে বাধ্যবাধকতা রূপে নির্দিষ্ট করেননি। তবে পরবর্তী কালে এই স্মৃতিগুলির টীকাকার বা এই সূত্র ব্যবহারকারী অন্যান্য আইনসংক্রান্ত গ্রন্থের প্রণেতাগণ ভিন্ন রূপে তুলে ধরেছেন। বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরা গ্রন্থে যাজ্ঞবল্ক্যকে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ থেকে চন্ডাল পর্যন্ত সমস্ত বর্ণের বিধবা নারীর ক্ষেত্রে মৃত স্বামীর সাথে সহমরণে গমন একান্ত পালনীয়।[১৫] এই ব্যবস্থাটি পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকে মিতাক্ষরা'র রচনাকাল - একাদশ শতকের মধ্যে একটি সুচিন্তিত প্রথা রূপে গড়ে উঠল, বিশেষ করে সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন কানুন রচয়িতাদের হাতে। তবু নানা সূত্রে অষ্টম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে

নানা ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। অষ্টম-নবম শতাব্দীর পরাশর সংহিতায় স্পষ্ট ভাবেই বিধবার ব্রহ্মচর্য জীবন বা সহমরণ দুইয়ের কথাই বলা আছে।[১৬] পঞ্চানন তর্করত্ন সঙ্কলিত ও অনূদিত সঙ্কলনে অবশ্য টীকাকার বলছেন যে অন্য যে ব্যাখ্যায় বিধবার পুনর্বিবাহের কথা বলা হয়েছে তা পরবর্তীকালে নিষিদ্ধ বলে জারী করা হয়েছে।[১৭] সুতরাং, প্রথমত, নিয়মাবলীর বিভিন্নতা স্পষ্টতই কোন একমাত্রিক নির্দিষ্ট প্রথার কথা বলে না। দ্বিতীয়ত, এই রকম আইন সৃষ্টি করার পিছনে অন্যরকম প্রথা যে বাস্তবে চালু ছিল এবং এর প্রতিকার করার জন্যই আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়েছিল — এই দুই সত্যই সূচীত হয়। এইভাবে, একটি প্রথার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ কিভাবে সাহিত্যিক উপাদানের সঠিক প্রেক্ষিত নির্ভর বিশ্লেষণ থেকে অনুধাবন করা যায়, তা দেখলাম। জাতি বর্ণ প্রথার বিকাশ আরও ব্যাপক সূত্র থেকে একই ভাবে একটি ক্রমবিবর্তনের ধারায় দেখা যেতে পারে। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে উল্লেখিত[১৮] চার বর্ণ, ব্রহ্মের মুখ, বাহু, উরু ও পা থেকে উৎপন্ন বলে বর্ণিত। এই বিভাজনটির পিছনে সমষ্টিগত ভাবে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিয়োজিত মানুষের একটি রূপকধর্মী বিশিষ্টতা নির্দেশিত করাই উদ্দেশ্য ছিল। অন্তত পূর্ববর্তী বৈদিক যুগে কোন বৃত্তি জন্মগত ভাবে কোন ব্যক্তির উপর বর্তাতো না বলেই দেখা যায়। পরবর্তীকালে শ্রমবিভাজনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায় এবং কৃষি ও হস্তশিল্প উৎপাদনের বৃদ্ধি ব্যক্তিজীবনে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিফলন ঘটায়। ফলে বৃত্তি বা পেশা, বিশেষ করে বৈশিষ্ট্যমূলক পেশা, পারিবারিক ও জন্মগত ভাবে অনুসৃত হতে থাকে। এর ফলে বর্ণ বিভেদ প্রথা ব্যবহারিক ভাবে সমাজে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ - পঞ্চম শতক থেকেই, উত্তর ভারতে নগরায়ন ও কৃষি এবং শিল্প উৎপাদনের অর্থনীতি অগ্রগামী হতে থাকে। এই পটভূমিতে শ্রমবিভাজন ও বর্ণ ভিত্তিক পেশা বা বৃত্তি উত্তরোত্তর সংগঠিত হতে থাকে। বিভিন্ন সাহিত্যিক সূত্রে এই চিত্র ফুটে ওঠে। বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে[১৯] কামার পুত্র, কুমারকুল, এমন কি কামার গ্রাম, হলকার গ্রাম বা লোনকার গ্রাম (লবনপ্রস্তুত কারক) ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়।

ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থে বর্ণিত ধারার বাইরে বাস্তব জীবনে বর্ণ - প্রথা কতটা পরিবর্তনশীল ছিল তা অন্যান্য সাহিত্যিক সূত্র ও লেখগুলি থেকে জানা যায়। বিনয় পিটকের একটি অংশের মূল অর্থ সম্বন্ধে আর.সি. মজুমদারের[২০] বক্তব্য যে সে সময়ে, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৩০০ শতকের মধ্যে, নিষাদ বা পুক্কুস ইত্যাদি আদি জন জাতিগুলি এবং রথকার, মালাকার, বেণ ইত্যাদি পেশাভিত্তিক গোষ্ঠীগুলি বর্ণে পরিণত হচ্ছিল। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের লেখাগুলিতেও বংশগত পেশার বিকাশ ও বর্ণে পরিণতির ইঙ্গিত রয়েছে।[২১] সুতরাং দেখাই যাচ্ছে যে ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত বর্ণ - বিভাজন ব্যবহারিক জীবনে পরিপূর্ণভাবে অনুসৃত হয়নি। রোমিলা থাপারও মন্তব্য করেছেন[২২] যে যদি কিনা শাস্ত্র নির্দেশিত বর্ণ - প্রথা সত্যসত্যই যথাযথভাবে সমাজের কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করত তা হলে প্রধান বর্ণ - গুলির মধ্যে বিভেদকারী পার্থক্যগুলি আরও স্পষ্টরূপে বজায় থাকত।

কিন্তু আদতে তা হয়নি। বর্ণ সমাজের বহুমাত্রিকতা ও পরিবর্তনশীলতার কথা আন্দ্রে বেতেও[২৩] আলোচনা করেছেন। পি. ভি. কানের বক্তব্য উল্লেখ করে তিনি শূদ্র বর্ণের ভিতরেও যে একটা ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগ তৈরি হয়েছিল সে কথা তুলে ধরেছেন। মনুর বর্ণনাতেও এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

মনু সংহিতায়২৪ যে মিশ্রবর্ণগুলি বর্ণিত হয়েছে তা শুধুমাত্র পেশাভিত্তিক সমষ্টিকে নির্দেশ করে না। এর মধ্যে রয়েছে সেই সব বহু জনজাতি গোষ্ঠী যা আর্য সমাজের সাথে সহজে সম্পৃক্ত হতে পারেনি। এই আর্যেতর আদি জনজাতিগুলিকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক থেকেই আর্যবর্ণজাতি কাঠামোর অন্তর্গত করার একটি পূর্ণ প্রচেষ্টা স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে বিদ্যমান। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য রমনীর সঙ্গমে জাত অম্বষ্ঠ বর্ণের কথা বলা হয়েছে মনুতে অথচ পরবর্তীকালে পুরাণে অম্বষ্ঠ উপজাতির কথাও বলা হয়েছে যাদের উৎপত্তি ধরা হয়েছে আনব ক্ষত্রিয়দের সূত্রে। মনুতে[২৫] এদের উল্লেখ রয়েছে। তেমনি ব্রাহ্মণ ও শূদ্র রমনীর বিবাহ সঙ্গমে জাত সন্তান নিষাদ বর্ণভুক্ত, অথচ নিষাদ একটি প্রাচীন উপজাতি। সুতরাং বর্ণপ্রথার চতুর্ভাগের যে সোজা সাপ্টা বিবরণ সাধারণত আমরা শাস্ত্রসূত্রে পাই, তার ব্যবহারিক জীবনে প্রচলন ততটা সোজা বা সরল ছিল না। মনুতে প্রাপ্ত অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ এই কথাই নির্দেশ করে। একটি নির্দিষ্ট বর্ণের মানুষের মধ্যেও যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা স্তর বিভাজন ছিল - তা নিয়ে কিছু গবেষণাও হয়েছে।[২৬]

পরবর্তীকালে, অন্তত আদি মধ্যযুগের বঙ্গে বর্ণপ্রথার যে বিচিত্র বিন্যাস দেখা যায় তা থেকে বর্ণপ্রথার বাস্তবিক পরিবর্তনশীল ও বহুমাত্রিক রূপটিই ধরা পড়ে। আদি মধ্যযুগীয় বঙ্গে একদিকে ব্রাহ্মণ বর্ণ, যারা কনৌজ থেকে আগত বলে ধরা হয় এবং অন্যদিকে কেবলমাত্র শূদ্র বর্ণের উপস্থিতি লক্ষিত হয়। শূদ্রবর্ণের মধ্যে আবার তিনটি স্তর, ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগের ধারায় - উত্তম সঙ্কর, মধ্যম ও অধমসঙ্কর।

বঙ্গের বর্ণপ্রথার বিন্যাস কৌতুহল উদ্দীপক। এই সঙ্কর বর্ণের মধ্যে পেশাভিত্তিক নির্দিষ্টকরণ লক্ষ্য করা যায়। বৃহদধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে[২৭] যে বর্ণ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে তাতে পূর্ববর্তী ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশাবলীর অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে চর্যাগীতিগুলি[২৮] থেকে যে নিম্ন বর্গের সমাজের পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে আদিমধ্যযুগীয় বঙ্গে অন্তত এক বৈচিত্রময় সমাজ জীবন যাপিত হত, যার সঠিক ঐতিহাসিক চরিত্র ধর্মশাস্ত্র বা অন্যান্য কোন এক ধরণের সাহিত্যিক সূত্রের সরল অনুধাবনে বা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ব্যবহার বর্জন করে তুলে ধরা যাবে না। অন্তত বঙ্গের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী নাগাদ এই অঞ্চলের আর্যীকরণ পরিপূর্ণ হলেও আর্য সংস্কৃতি এখানে তার নিজস্ব ধ্রুপদী রূপ বজায় রাখতে পারেনি। এখানে বর্ণপ্রথার একমাত্রিক, ধ্রুপদী রূপ

সম্বন্ধে নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। "চতুবর্ণপ্রথা অলীক উপন্যাস, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কারণ, ভারতবর্ষে এই চতুবর্ণের বাহিরে অসংখ্য বর্ণ, জন ও কোম বিদ্যমান ছিল"।[২৯]

শুধু আদিম মধ্যযুগের নয় অন্যান্য অঞ্চলেও বৈচিত্রে পরিপূর্ণ বহুস্তর ও মাত্রা বিশিষ্ট সামাজিক বিন্যাসের চিত্র সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মাধ্যমে দেখা যায়। ভারতবর্ষের ভৌগলিক, জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিকতা এদেশের ইতিহাসকে স্বভাবতই এক বিজড়িত নকশার জটিল পথে সময়ের ধারায়, নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে, এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে এগিয়ে নিয়েছে। এদেশের ইতিহাসের গোটা পটভূমিই নতুন আলোয় আলোকিত হওয়া প্রয়োজন। সাম্প্রতিক কালের বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও বিতর্কিত বিষয়ের উত্থাপনের কথা মাথায় রেখে, বিশেষ করে ভারতের ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায়টির নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে চর্চা করা আশু প্রয়োজন।

তথ্যসমূহের সঠিক চরিত্র, সেগুলির উৎস, প্রেক্ষিত, পুনঃ পুনঃ উদ্ধৃতিকালীন আদি তথ্যের চারিত্রিক পরিবর্তন, এবং বিভিন্ন যুগের আলোয় এই তথ্য মূল্যায়নের পিছনে যে মানসিক জগতের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি ছিল, তার উপর আলোকপাত, এ সবই এক নতুন প্রণালীর ইতিহাস চর্চা দাবী করে।

সূত্রনির্দেশ

১। দেশ পত্রিকা, ৪ঠা জানুয়ারী, ২০০৩, পৃঃ ৩২-৪০।

২। ঐ, ১৮ই জানুয়ারী, ২০০৩, পৃঃ ৩৬ ৪৫।

৩। ঐ, পৃঃ ৩৬ ও ৩৯।

৪। এই ধারা ইতিহাস দর্শন মিশেল ফুকোর সব গ্রন্থেই আলোচিত যথা ঃ Discipline and Punish: The Birth of Prison, New York, 1977; The Archaeology of knowledge, New York, 1972.

৫। Romila Thapar, Narratives and the making of History, New Delhi, 2000, pp. 1-5.

৬। ঋগ্বেদ, ১০ ঃ ১৮ ঃ ৮।

৭। অথর্ব বেদ, ১৮ ঃ ৩ ঃ ৩।

৮। ঐ, ১৮ ঃ ৩ ঃ ৩।

৯। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩ ঃ ৭ ঃ ৫ ঃ ৫১।

১০। ঋগ্বেদ, ১০ ঃ ৪০ ঃ ২।

১১। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র, ৪ ঃ ২ ঃ ১৮-২০।

১২। অথর্ব বেদ, ১০ ঃ ৫ ঃ ২৭; ৫ ঃ ১৭ ঃ ১৯।

১৩। Sukumari Bhattacharjee, Women and Society in Ancient India, Calcutta, 1994, p. 189.

১৪। মনুস্মৃতি, ৫ ঃ ১৫৭।

১৫। Sukumari Bhattacharjee, op. cit., Calcutta, 1994, p. 175.

১৬। পরাশর সংহিতা, ৪ ঃ ২৭-২৯।

১৭। পঞ্চানন তর্করত্ন সঙ্কলিত ও অনূদিত, ঊনবিংশতি সংহিতা, কলিকাতা, ১৪০৭ বঃ, পৃঃ ৩৪৯।

১৮। ঋগ্বেদ, ১০ ঃ ৯৭।

১৯। দীর্ঘ নিকায়, ২, পৃঃ, ১৩৫-৩৬; মকিবাম নিকায়, ১, পৃঃ ২৫; বিনয় পিটক, ১, পৃঃ ৩৫০ ও ৪, পৃঃ ৬৬।

২০। R.C. Majumder, Corporate Life in Ancient India, Calcutta, 1922, pp 378 - 80.

২১। Epigraphica India, vol. 10, index; Vijay Thakur, Urbanisation in Ancient India, New Delhi, 1981, p. 165.

২২। Romila Thapar, Ancient Indian Social History Some Interpretations, New Delhi, 1979, p. 130.

২৩। André Béteille, The Backward Classes in Contemporary India, Delhi, 1992, pp. 5-6; P.V. Kane, History of Dharmashastra, Poona, vol. II, Part-I, 1974, p. 163; মনুস্মৃতি, ১০ ঃ ৫১-৫২।

২৪। মনু, ১০ ঃ ৬-৫৬।

২৫। ঐ, ১০ ঃ ৮।

২৬। ঐ, ১০ ঃ ১৮।

২৭। বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ত্রয়োদশ অধ্যায়; ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

২৮। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংকলিত, হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা, কলিকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

২৯। নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, কলিকাতা, ২০০১, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২০৯।

পশ্চিমবঙ্গে নবাবিষ্কৃত তাম্রাশ্মীয় প্রত্নক্ষেত্র

অরবিন্দ মাইতি

পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তাম্রপ্রস্তর বা তাম্রাশ্মীয় প্রত্নক্ষেত্রের আবিষ্কার নতুন নয়। পশ্চিমবঙ্গের পুরাবৃত্ত গ্রন্থে শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায় এইরকম ৭৬ (ছিয়াত্তরটি) প্রত্নক্ষেত্রের উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় এই সংস্কৃতি কেবলমাত্র তাম্র ধাতুরই সংস্কৃতি ছিল না, এরই স্তরে স্তরে আমরা লক্ষ্য করেছি ক্ষুদ্রাশ্মীয় প্রস্তর যন্ত্রপাতি ও নবাশ্মীয় যন্ত্রের ব্যবহার।[১] সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপারটি হোল কোন কোন ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ লোহারও ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রত্নক্ষেত্রগুলির অবস্থান বিন্যাস থেকে আমরা এই ধারণা করতে পারি যে, প্রাচীন রাঢ়দেশের কেন্দ্রভূমি বর্তমান বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় প্রাণপ্রবাহ ময়ূরাক্ষী, বক্রেশ্বর, কোপাই, অজয়, দামোদর, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, বিধৌত মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় এই সভ্যতাগুলি বিকশিত হয়েছে। এই নদীগুলির উৎসস্থল বিন্ধ্যা শক্তিমান কুলাচল দুটির পর্বতময় বিস্তৃতি, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার নিম্নাশ্রয়ী পাহাড়গুলি বা (ফ্রিনজী এলাকা) শীত ও গ্রীষ্মে এই নদ নদীগুলির শীর্ণকায়া ক্ষীণধারা কিন্তু বর্ষায় স্ফীতকায় ক্ষরস্রোত দুর্বার ভীষণা ও দুকুল প্লাবিনী। হাজার হাজার বছর ধরে প্রতিবর্ষায় দুর্বার ক্ষরস্রোত ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার পাহাড়গুলি থেকে ছোট বড় কাঁকর মেশানো লাল গেরুয়া মাটি বয়ে এনে ঢেলে দিয়েছে নদীগুলির তীরে তীরে। প্লাবনের স্রোত সেই মাটিকে ঠেলে নিয়ে গেছে দূর দূরান্তরে। কোথাও বেশি, কোথাও কম। যতদূরে তত কম, যত কাছে তত বেশি, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব মেদিনীপুরের কিয়দংশে এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এরই অপর নাম পুরাভূমি।[২] মেদিনীপুর জেলা বিভাজনের পর পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা মহকুমার পশ্চিমাংশ জুড়ে রয়েছে সেই পুরাভূমির স্বল্প আস্তরণ, যা দাঁতন ও মোহনপুর এলাকার উচ্চভূমির অংশ বিশেষ। কুদি নদীর উৎসমূল থেকে এর বিস্তার। পানিপারুল অতিক্রম করে কাঁথির বালুয়াড়ি ভেদ করে এর দক্ষিণমুখী বিস্তার দীঘা বালুয়াড়িকে স্পর্শ করেছে। শ্রীপুর, চাটলা রামনগর থানার সাহাড়া অঞ্চল। কাঁথি মহকুমার জয়কালীচক ও বাহিরী (পূর্ব মেদিনীপুর) পর্যন্ত এর বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়।[৩] পূর্ব মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্ত প্রত্নক্ষেত্র প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে সুবিদিত কিন্তু পূর্ব মেদিনীপুরের সমুদ্রাশ্রয়ী প্রাক মৌর্য ও মৌর্য কুষাণ যুগের সভ্যতার লীলাক্ষেত্রের পশ্চাৎপদে কোনো তাম্রাশ্রয়ী প্রত্নক্ষেত্রের তেমন

উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে না। বেশ কিছুদিন আগে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষক বিভাগ তাম্রলিপ্তের অদূরে তাম্রপ্রস্তর সভ্যতার কিছু নিদর্শন আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে এ সম্পর্কে তাঁরা কোন মন্তব্য প্রকাশ করেননি। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের পুরাতত্ত্ব বিভাগ ও অবিভক্ত মেদিনীপুরের ভৌগোলিক বৃত্তে নয়টি তাম্রাশ্রয়ী সভ্যতার প্রত্নক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এগুলির অবস্থান উচ্চ মেদিনীপুর বা পশ্চিম মেদিনীপুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এমনকি অধুনা অবস্থিত তমলুক শহরের সন্নিকটবর্তী নাটশাল প্রত্নক্ষেত্র যা প্রায় তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার প্রত্নক্ষেত্ররূপে স্বীকৃত যে স্থানেরও উল্লেখ নাই। স্থানীয় রজনীকান্ত জ্ঞান মন্দিরের অনুসন্ধান কার্যের ফলে উপরোক্ত প্রত্নক্ষেত্র থেকে অশ্মিভূত কাঠ, পাথরের ছোট বড় কারুযন্ত্র (ক্ষুদ্রাশ্মীয় ও নবাশ্মীয়) হস্ত নির্মিত মৃৎপাত্র পরবর্তী কালের কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ তাম্রকারুযন্ত্র ডিগার তামার স্বস্কন্ধ কুঠার (যা পাওয়া গেছিল শ্রীপুর চাটলা থেকে যা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেহালার প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে)।[৪] ক্ষুদ্রাশ্মীয় কারুযন্ত্রের ব্যবহার মানব ইতিহাসের নবাশ্মীয় পর্বের সঙ্গে সঙ্গেই জড়িত সন্দেহ নেই। কিছু কিছু টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন তথ্যাদি ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে এখনও এমন কিছু আবিষ্কৃত হয়নি। অবশ্য এ পর্বে যা যা বিশিষ্ট লক্ষণ যেমন শস্য উৎপাদনে প্রবর্তনা ও বন্য পশুকে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করা ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। অবশ্য এক্ষেত্রে উল্লেখ থাকে যে বিস্তারিত প্রত্নমন্ডলে বৈজ্ঞানিক উৎক্ষননের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কেবলমাত্র এক্সপ্লোরেশন পদ্ধতির মাধ্যমে উপরোক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যাদির সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে। যা কিছু প্রমাণ হাতে এসেছে তার উপর নির্ভর করে মানুষের সামাজিক ইতিহাসের এ হচ্ছে সেই পর্ব যখন সে যন্ত্রপাতি নির্মাণে শুধুমাত্র পাথর ব্যবহার করছে না। সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান পরিমাণে ধাতুর ব্যবহার করছে এবং সেই ধাতু হচ্ছে তাম্র। এই ধাতুর যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের একটি নতুন রূপরেখা নির্মিত হয়েছে। নবাশ্মীয়, ক্ষুদ্রাশ্মীয় কিছু কারুযন্ত্র ছাড়া চিত্রিত ও ছিদ্রকৃত লাল ও কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্রগুলি এখান থেকে পাওয়া গেছে। এছাড়াও জলনালী যুক্ত মৃৎপাত্রগুলি এখানে পাওয়া গেছে। মানব সভ্যতা তাম্রাশ্মীয় পর্বে উত্তীর্ণ হয়েছিল কিন্তু সেইসঙ্গে বেশ কয়েকটি বড় আকারের তীক্ষ্মাগ্র নবাশ্মীয় শেল্ট (বারশেল্ট) এখানে পাওয়া গেছে তবে বিস্ময়ের কথা যে এই প্রত্নক্ষেত্র থেকে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও কিঞ্চিৎ লৌহনির্মিত যন্ত্রাংশ পাওয়া গেছে।[৪] আমার অনুমান খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের কাছাকাছি সময়ে এইরকম মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব সম্ভব। অবশ্য উপরোক্ত প্রত্নসামগ্রীগুলির সঙ্গে সব সময় আনুষঙ্গিক জিনিস লক্ষ্য করা যায়নি। মৃৎপাত্রের বিস্তারও সর্বত্র সমানভাবে চোখে পড়েনি। সে যাই হোক তাম্রাশ্মীয় এই সংস্কৃতি গ্রাম্য সমাজ সংগঠন ও কৃষিকর্মে বিস্তার ঘটাতে বিশেষ পারদর্শী হয়েছিল। কোন

কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন এই সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল গাঙ্গীয় ভারত, মধ্যভারত, ও রাজস্থানের তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে এই যোগটা ঘটেছিল গাঙ্গীয় ভারতের মাধ্যম নয়, উড়িষ্যার মাধ্যমে দক্ষিণ ভারত থেকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকে যে কিছু কিছু তাম্রাশ্মীয় যন্ত্রপাতি এবং কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ এখানে পাওয়া গেছে যার অস্তিত্ব বীরভূম ও বর্ধমানের প্রত্নক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি। যা পাওয়া গেছে সুবর্ণরেখা বিধৌত নিম্ন অববাহিকায় মেদিনীপুরে, অর্থাৎ যার ইঙ্গিত উড়িষ্যামুখী। বি.কে. আয়ারের নেতৃত্বে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ কু-চাই ও কুলিয়ানা যে সকল প্রত্নসামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমস্যাটা এখানে রয়েছে যে, এখানে উৎক্ষনন হয়নি সেকারণে পূর্বাপর ইতিহাস ও প্রত্নবস্তু প্রাপ্তির স্তরবিন্যাস সম্ভব হয়নি। বিক্ষিপ্ত লৌহ ব্যবহারের পর মনে হচ্ছে, সভ্যতা যেন অনেকটা সরে গেছে নদী নালার মোহানায় অথবা নিম্নভূমিতে। খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক তিনশ অব্দের নিকট এসে লৌহ ব্যবহার চিহ্নিত সমৃদ্ধ জনবসতি নিরবিচ্ছন্নতায় ঐতিহাসিক কালে এসে মিশে গেছে। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ (তিনশ) থেকে খ্রিস্টীয় ২০০ (দুশো) বৎসরের মধ্যে সমুদ্রশায়ী মেদিনীপুর (যেমন তাম্রলিপ্ত, পূর্ব মেদিনীপুরের বাহিরী প্রভৃতি স্থানে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে)। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তাম্রলিপ্ত, বাহিরী প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণ উত্তর ভারতীয় কৃষ্ণচিক্কন মৃৎপাত্র, মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ, চিহ্নমুদ্রিত মুদ্রা, ঢালাইকরা মুদ্রা, পোড়ামাটির ঝাঁঝরা, ধূসর মৃৎপাত্রের টুকরো নানারকমের পোড়ামাটির নরনারী ও পশুমূর্তির খেলনা কুন্ডলীকৃত নক্‌শাযুক্ত মৃৎপাত্র প্রত্নসামগ্রী পাওয়া গেছে।[৪] যা নিঃসন্দেহে প্রাচীন উন্নত সভ্যতার সোচ্চার প্রমাণ। এ অনুমানে বোধ হয় বাধা নেই এই সমৃদ্ধ সমাজ জীবন ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল প্রধানত মৌর্যযুগের বঙ্গদেশে। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রভাব পরিধিতে এই দেশ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সময় থেকে। এবং এর মূলে ছিল ক্রমবর্ধমান লৌহ যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও ধানচাষের বিস্তার। এর প্রস্তুতিপর্ব শুরু অবশ্য তাম্রাশ্মীয় পর্ব থেকেই হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক সপ্তম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে।

সূত্রনির্দেশ

১। পুরাবৃত্ত ১ (১৪০৭)
(পশ্চিমবঙ্গ)
পশ্চিমবাংলার প্রত্নতত্ত্ব চর্চা (একটি রূপরেখা)
ডঃ শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায় পৃষ্ঠা (১৪-৬২)।

২। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) দ্বিতীয় সংস্করণ
পৃষ্ঠা ঃ ৬০-৬৬।

৩। লেখকের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রসমীক্ষা (১৯৭৫-২০০৩)।

৪। **A guide to :-**

Rajani Kanta Jnan Mandir

(Sangrahasala & Gabesana Kendra)

Vill. Dharas. p.o. Sisusadan, Dist. East Midnapore.

Printed by Prasanta Dey 4 E Rash Behari Avenue.

Calcutta - 700026.

According to the Stock Book Register :-

1) Neolithic tool category

No.- 5 (Hand-axe small)

No.- 6 (Barcelt-big)

2) Metal tool Category

No.-1 (digger)

3) Terracotta Category

No.- 5 (Sugha terracotta - Age 1 century B.C.)

বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাংশে অ্যাশুলিয় সংস্কৃতির বিস্তার ঃ সাম্প্রতিক আবিষ্কারের ভিত্তিতে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

বনানী ভট্টাচার্য্য

অ্যাশুলিয় সংস্কৃতির আবির্ভাব প্রাচীন প্রত্ন প্রস্তর যুগে। ফ্রান্সের সেন্ট অ্যাশুল নামক স্থান থেকে এই সংস্কৃতির প্রথম নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীকালে এর ব্যাপ্তি ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া এই তিন মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এই সংস্কৃতির প্রধান হাতিয়ার বা আয়ুধ ছিল হাত কুঠার বা Hand axe। পূর্ববর্তী অ্যাব্বিভেলিয় সংস্কৃতির তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট, হালকা এবং মার্জিত। দ্বিতীয় যে প্রধান আয়ুধটি পাওয়া যায় তা হল কর্তরী বা cleaver। কোথাও কোথাও এই দুই হাতিয়ারে একই কারিগরীর প্রয়োগ দেখা গেছে তবে ব্যবহারিক দিক থেকে এদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই সংস্কৃতিতে যে আয়ুধ কারিগরীর উপর জোর দেওয়া হত তার নাম সিলিন্ডার হ্যামার টেকনিক (Cylinder Hammer Technique) সাধারণত রিস্ হিমবাহ যুগকে এই সংস্কৃতির কালসীমা ধরা হয়ে থাকে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কিন্তু এর বিস্তার নিয়ে বিক্ষিপ্ত কিছু লেখা ছাড়া তেমন কোন সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত হয়নি। বিহারীনাথ পাহাড়ের সংলগ্ন অঞ্চল থেকে ১৭.৫ কি.মি. দক্ষিণ পশ্চিমে গোবিন্দপুর থেকে ১৮৬৫ সালে ভ্যালেন্টাইন বল প্রথম অ্যাশুলিয় হাতকুঠারের নিদর্শন আবিষ্কার করেন। দুবছর পরে নিকটবর্তী গোপীনাথপুর থেকে এই সংস্কৃতির নিদর্শন পান। এর পর বহুদিন বাদে ১৯৬০ এর দশকে আবার এই অঞ্চলে কাজ শুরু হয় ডি.ডি. কৃষ্ণস্বামী (১৯৬০), পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৯৬০), ধরণীসেন (১৯৬৩) প্রভৃতির প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানমূলত কাজকর্ম এই অঞ্চলের গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষত পুরা প্রস্তর ও মধ্যপ্রস্তর যুগের ইতিহাস চর্চার এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেন। সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাংশ থেকে এই সংস্কৃতিসমৃদ্ধ প্রত্নস্থলের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই আবিষ্কার শুধুমাত্র বাঁকুড়া জেলারই নয় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের নিরীখেই এর অবস্থান নিয়ে নতুনভাবে ভাবনাচিন্তার সুযোগ এনে দিয়েছে। এই প্রত্নাঞ্চলগুলি মূলত এসেছে কংসাবতী নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকা, শিলাবতী নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকা ও গুনিয়াদা

পার্বত্য অঞ্চল থেকে। হাতিয়ার তৈরিতে যে পাথরগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তা হল মূলত কোয়ার্টজ ও কোয়ার্টজাইট।

অম্বিকা নগরের কাছে কুমারী কংসাবতী নদী উপত্যকা অঞ্চল আদি, মধ্য ও শেষ পুরা প্রস্তর ও মধ্যপ্রস্তর প্রত্নাঞ্চল রূপে পরিচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে ঐ সমস্ত অঞ্চল কংসাবতী বাঁধের নীচে নিমজ্জিত। ১৯৬০ এর পর অম্বিকা নগর সংলগ্ন এলাকা থেকে নতুন কোন পুরাপ্রস্তর যুগের প্রত্নাঞ্চল আবিষ্কারের কথা জানা যায়নি বা প্রকাশিত হয়নি।

অম্বিকানগর থেকে চার কি.মি. দক্ষিণে বনসোলজোরের সন্নিহিত অঞ্চল থেকে অ্যাশুলিয় সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। বনসোল জোর নালাটি কংসাবতী নদীতে গিয়ে মিশেছে। হাতিয়ারগুলি মূলত পাওয়া গেছে টিপির ধাপে, জনক শিলার (Bed rock) উপরে পলিমাটির অবক্ষেপিত স্তরে। স্তরগুলির বিন্যাস নীচে দেখান হল —

০ - ১.৯৯ মি	ধূসর পলিমাটির স্তর
২ - ৩.৯৯ মি	বাদামী পলিমাটির স্তর
৪ - ৪.৫৯ মি	চূণ মিশ্রিত পলিমাটির স্তর
৪.৬০ -	জনক শিলা (আংশিক)

১০ মি × ৬ মি অঞ্চল থেকে যে হাতিয়ারগুলি পাওয়া গেছে তা হল হাতকুঠার বা Hand axe (২টি), কর্তরী বা Cleaver (৭টি), ছুরি বা Knife (২টি), চপার (৩টি), Beak (২টি), চাঁছুনি বা Scaper (৬টি), ব্লেড (৭টি) এবং একটি বড় ফ্লেক বা ছিলকা।

খাতরার নিকটবর্তী শিলাবতী বা শিলাই নদীর ব্রিজের কাছে নদীর উত্তর তীরবর্তী অঞ্চল থেকে অ্যাশুলিয় সংস্কৃতির যে হাতিয়ারগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি হল মূলত Cleaver বা কর্তরী (২টি), হাতকুঠার বা Hand axe (২টি), ব্লেড (১টি), চাঁছুনী বা Scraper (১টি), খোদক বা Burin (১টি), তীক্ষ্মাগ্র বা Point (১টি), এই আয়ুধগুলি মূলত পাওয়া গেছে পলিমাটির স্তরের নীচে নুড়িপাথরের অবক্ষেপিত স্তর থেকে। একটা বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট যে প্রকৃত প্রত্নাঞ্চলটি এই এলাকার খুব কাছাকাছি জায়গাতেই অবস্থিত কেননা হাতিয়ারগুলি অত্যন্ত পরিষ্কার এবং এগুলির গায়ে বহুদূর বাহিত হয়ে আসার চিহ্ন নেই।

শিলাবতী ব্রিজের থেকে দক্ষিণে নামোকেচন্দা নামে একটি গ্রাম থেকে এই সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত হাতিয়ার ১৭টি, এর মধ্যে রয়েছে কর্তরী বা Cleaver (৩টি), চাঁছুনি বা Scraper (৯টি), স্ক্রেপার অন ব্লেড (Scraper on Blade) (১টি), খোদক বা Burin (১টি), বোরার (Borer) (২টি), ফ্লেক (১টি)।

দক্ষিণ পশ্চিম বাঁকুড়ার গুনিয়াদা পার্বত্য অঞ্চলটির অবস্থান একটু বিচ্ছিন্ন। এখান

থেকে যে হাতিয়ারগুলি পাওয়া গেছে তা হল মূলত কর্তরী বা Cleaver (৩টি), হাতকুঠার বা Hand axe (৫টি), তীক্ষ্মাগ্র বা Point (৪টি), ফ্লেক (২টি), স্ক্রেপার অন ব্লেড (১টি)।

বস্তুত বাঁকুড়ার জেলা থেকে এই আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে আরও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যার থেকে এই সংস্কৃতি সম্পর্কে আরও বিভিন্ন তথ্য জানা সম্ভবপর হবে।

সূত্রনির্দেশ

অ্যান্ডারসন সি.ডব্লু. ১৯১৭ ঃ নোট অন প্রিহিস্টোরিক স্টোন ইমপ্লিমেন্টস ফাউন্ড ইন সিংভূম ডিস্ট্রিক্ট বিহার এন্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটির জার্নাল ৩ঃ৩৪৯-৩৬২।

বল ভ্যালেন্টাইন ১৮৬৫ ঃ স্টোন ইমপ্লিমেন্টস ফাউন্ড ইন বেঙ্গল, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল এর প্রসিডিংগস্ কলকাতা পৃঃ ১২৭-১২৮।

বল ভ্যালেন্টাইন ১৮৭০ স্টোন ইমপ্লিমেন্টস ডিসকভার্ড ইন সিংভূম, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল এর প্রসিডিংগস্ কলকাতা পৃঃ ২৬৮।

বল ভ্যালেন্টাইন ১৮৮০ ঃ জাঙ্গল লাইফ ইন ইন্ডিয়া, লন্ডন ঃ দোজ. দে. লা. রু. এন্ড কো. (Thos De La Rue & Co)।

ব্যানার্জী কে ডি ১৯৮৭ ঃ স্টোন এজ মাইগ্রেশন ইন ইন্ডিয়া, আর্কিওলজি এন্ড হিস্ট্রী সম্পা. ডি. পি. চট্টোপাধ্যায়, নিউ দিল্লী।

ভট্টাচার্য মণিব্রত ১৯৮৭ ঃ স্টেজেস অফ প্রিহিস্টোরিক কালচার ইন রাঢ় বেঙ্গল — আ রিসেন্ট এক্সপ্লোরেশন, আর্কিওলজি এন্ড হিস্ট্রী, নিউ দিল্লী।

ভট্টাচার্য মণিব্রত ১৯৯০ ঃ বাসুদিহ - এন অ্যাশুলিয়ান সাইট ইন ওয়েস্টবেঙ্গল, এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল ৩২ (১-২) ঃ ১০৯-১১২।

চক্রবর্তী দিলীপ ১৯৯৩ঃ আর্কিওলজি ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, মুন্সিরাম মনোহরলাল পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লী।

কৃষ্ণস্বামী ডি.ডি., কে. এম. শ্রীবাস্তব ও এস. পি. জৈন., ১৯৬০ ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি ১৯৫৯-৬০ এ রিভিউ, পৃঃ ৪৮-৫০।

সেন. ডি. ও এ. কে. ঘোষ ১৯৬০ ঃ অন দ্য অকারেন্স অফ প্যালেওলিথিক ইন সিংভূম, ম্যান ইন ইন্ডিয়া ৪০(১) ঃ ১৭৮-১৯১।

সেন. ডি, এ. কে. ঘোষ ও মঞ্জু চ্যাটার্জি ১৯৬৩ ঃ প্যালেওলিথিক ইন্ডাস্ট্রি ইন বাঁকুড়া, ওয়েস্টবেঙ্গল ৪০(২) ঃ ১০০-১১৩।

বৌদ্ধ ভারত

জয়িতা গঙ্গোপাধ্যায়

বৌদ্ধযুগ ভারত ইতিহাসের একটি প্রধান যুগ। বৌদ্ধধর্ম বিপুল শক্তিসম্পন্ন একটি বিশ্ববিজয়ী ধর্মরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল - সে তথ্য সকলের জানা। এই ধর্ম যে ভারতীয় সভ্যতার প্রাণস্বরূপ তাতে সন্দেহ নেই। বৌদ্ধধর্মের প্রেরণা পেয়েই ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলা পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছিল, কাব্য ও নাট্য সাহিত্যে নূতন রস সঞ্চার হয়েছিল অধ্যাত্মদৃষ্টিও প্রসার লাভ করেছিল। ভারতবর্ষ থেকে সাইবিরিয়া ও পারস্য থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত সমস্ত দেশের অধ্যাত্মদৃষ্টির ভিতর যে আজ অবধি একটা ঐক্য লক্ষ্য করা যায় তা বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রেরণাতেই ঘটেছিল। ভারতের বাইরে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার যদি প্রধানত বৌদ্ধধর্মের প্রভাবেই হয়ে থাকে, তবে তার ইতিহাস সাহিত্য ও দর্শন উপেক্ষাকরে ভারতীয় আদর্শই যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, একথা জোর দিয়েই বলা যায়। বৌদ্ধধর্ম যে নূতন ভাবধারা বইয়ে দিয়ে ভারতের প্রাণকে রসময় করে তুলেছিল সে ধারা কোথায় কি ভাবে নূতন নূতন উৎসের সৃষ্টি করেছিল তা আমাদের জানা অত্যন্ত প্রয়োজন, নাহলে ভারতের ইতিহাসকে পুরোপুরি জানা যায় না।[১]

বৌদ্ধ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করলে স্পষ্ট হয় যে, বুদ্ধের নিজের ধর্মমত পরবর্তী কালে নানা সম্প্রদায়ের হাতে বিভিন্ন রূপ নিয়েছিল। যে কোন শক্তিশালী ধর্মমতের ক্রমবিকাশে কেউ বাধা দিতে পারে না। বুদ্ধের ধর্মমত সংকীর্ণ ছিল না, সেইজন্যই বহু শতাব্দীধরে সে ধর্মমত প্রসারলাভ করেছিল। প্রতিভাবান বৌদ্ধ আচার্যদের যুক্তি তর্কপূর্ণ ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে সে ধর্মমত নিত্য নতুন ঐশ্বর্যে মন্ডিত হয়েছিল। পরবর্তীকালের এই পল্লবিত বৌদ্ধধর্ম বিচার করবার পূর্বে বুদ্ধের ধর্মমত সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বুদ্ধ বৈদিক কর্মকান্ড মানতেন না সত্য, কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম নষ্ট করাই যে তাঁর ধর্মের একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তাঁর ধর্মমত সম্বন্ধে নানাবিধ মতামত প্রচলিত আছে। কারুর মতে বুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক ছিলেন, আবার কেউ বলেন বুদ্ধ বর্ণবিভাগ ভেঙে দিয়ে ব্রাহ্মণের প্রভাব খর্ব করেছিলেন। আবার অন্য কারুর মতে বুদ্ধ ছিলেন পতিতপাবন, কারণ তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই নীচজাতীয়। কিন্তু এই মতবাদগুলি আসলে সঠিক নয়, কারণ আসলে বুদ্ধ সোশ্যালিস্ট বা পতিতপাবন কোনটাই ছিলেন না। কোনো বিশেষ জাতি বা বর্ণের সামাজিক

অবস্থার উন্নতিবিধান তাঁর ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল না। মানুষের ব্যক্তিগত মুক্তির পথ খুঁজে বের করবার জন্যই তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। দীর্ঘ সাধনায় সে পথের সন্ধান পেয়ে দশজনকে সেই পথে চালিত করবার চেষ্টাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হয়েছিল। এই মুক্তিমার্গ হচ্ছে গৃহত্যাগী ভিক্ষুর মার্গ, কোনো বিশিষ্ট বর্ণের নিজস্ব নয়। বস্তুত এই মার্গ ব্রাহ্মণ্যধর্মের বানপ্রস্থ ও যতিরই রূপান্তর। এই বানপ্রস্থকেই বুদ্ধ সর্বজনীন করতে চেষ্টা করেছিলেন। বানপ্রস্থ ধর্মে যেমন জাতি বা বর্ণ বিচার নেই, তেমন বুদ্ধের ধর্মেও তা নেই।

বুদ্ধ যে ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাতে কতকগুলি নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হত। পরিধেয় বস্ত্র, পানভোজন, ভিক্ষাগ্রহণ প্রভৃতি বাইরের ব্যাপারে ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদের নিজস্ব স্বাধীনতা ছিল না। বুদ্ধ প্রদর্শিত বিনয় ব্যবহারের দ্বারাই এগুলি নিয়ন্ত্রিত হত। এই বিনয় ব্যবহারকে বিধিবদ্ধ করতে গিয়ে পরবর্তীকালে বৌদ্ধসাহিত্যে বিপুল বিনয়পিটকের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই বিনয়ের মূলসূত্রগুলি বৌদ্ধধর্ম বা বুদ্ধের নিজস্ব মনে করা অসঙ্গত হবে। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য ও বানপ্রস্থ আশ্রমের বিধিগুলির উপরই বৌদ্ধ বিনয়-ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মচর্য পালন করা, সত্য কথা বলা, অহিংসা অস্তেয় ও অপরিগ্রহ প্রভৃতি ব্রত গ্রহণ করা উভয় ধর্মেরই মূলসূত্র। নির্দিষ্ট সময়ে লব্ধ ভিক্ষায় জীবনধারণ করা, সকল প্রাণীর উপর সমদৃষ্টি। অধ্যয়ন ও ধ্যান ধারণায় সময় অতিবাহিত করে মুক্তিকামনা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক উভয়েরই লক্ষ্য। সুতরাং বাইরের ধর্মের দিক দিয়ে যে বুদ্ধের ধর্মের একটা বিশিষ্টতা ছিল একথা মনে করবার কারণ নেই। ভিক্ষু হলেন মুক্তিকামী মুক্ত মানুষ। নিজের গুরু ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির আদেশ তাঁকে মানতে হয় না। বুদ্ধের জীবদ্দশায় এই গুরু ছিলেন বুদ্ধ, বুদ্ধের অবর্তমানে হলেন সঙ্ঘনায়কেরা। বুদ্ধ নিজে কারও নির্বাচনের অপেক্ষা করেননি। সঙ্ঘনায়কেরা নির্বাচিত হতেন ভোটে নয়। অধ্যাত্মসাধনায় যে উৎকর্ষ লাভ করতেন তারই বলে।

বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্রগুলির বা বুদ্ধের বাণীর তত্ত্বনির্দেশ করতে গিয়েই কালক্রমে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এইসব সম্প্রদায়কে সাধারণত দুটি গন্ডিভুক্ত করা হয়। একটি হীনযান, অন্যটি মহাযান। এই আখ্যার উদ্ভব মহাযানের আচার্যদের হাতে। তাঁদের আদর্শ হল শুধু অর্হত্ত্ব অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের বিনয় ব্যবহার মেনে ও জপতপ করে পূজনীয় হওয়া নয়, একেবারে বুদ্ধত্ব লাভ করা। অনেকে এ দুরাশা পোষণ করতে সাহসী হননি, কিন্তু মহাযানপন্থী আচার্যেরা এ আশাকে মোটেই দুরাশা মনে করেননি। বুদ্ধত্বলাভই তাঁদের শুধু একমাত্র কাম্য নয়। সে বুদ্ধত্বলাভে দশের সহায় হওয়াই হচ্ছে সবচেয়ে বড় আদর্শ, আর সে আদর্শ বাস্তবায়িত করতে গিয়ে যদি নিজেদের বুদ্ধত্ব-লাভে বিঘ্ন ঘটে তাতেও ক্ষতি নেই। এইজন্য এই আচার্যদের কাছে মৈত্রীই হল সবচেয়ে বড় চর্যা, আর তাই মৈত্রেয় বুদ্ধ এসে গৌতম বুদ্ধের স্থান অধিকার করলেন।

তাঁদের আদর্শের গন্ডি অনেক বেশি প্রশস্ত বলেই নিজেদের মতবাদের তাঁরা আখ্যা দিলেন মহাযান। আর যাঁদের আদর্শ অর্হত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছে থেমে গেল তাঁদের মতবাদের আখ্যা দিলেন হীনযান।

হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ের ভিতর কোনটি বেশি প্রাচীন একথা বলা কঠিন। যেসব সম্প্রদায়কে হীনযান বলা হয় তাদের শাস্ত্র মানলে বলতে হয় যে হীনযানই প্রাচীন, আর মহাযান শাস্ত্র মানলে স্বীকার করতে হয় যে বুদ্ধের বাণীর প্রথম থেকেই দুটি ধারা ছিল — ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। যারা শ্রাবক, অর্থাৎ সাধনার চরম সোপানে উঠে পারমার্থিক সত্য উপলব্ধি করতে হলে যাদের বহু ব্রত আচরণ আবশ্যক তাদের আদর্শ হল ব্যবহারিক জগতের, আর তা অর্হত্ত্বের চেয়ে বড় নয়। আর যারা সাধনায় অগ্রগামী এবং পারমার্থিক সত্যের উপলব্ধি যাদের দুরাশা নয়। তাদের পথ হল পরমার্থের পথ। আর সে পথের শেষ নিশানা হচ্ছে বুদ্ধত্ব। একথা বিশ্বাস করলে স্বীকার করতেই হবে যে, প্রথম থেকেই দুটো গন্ডির সৃষ্টি হয়েছিল, একটি শ্রাবকদের, অন্যটি ছিল যারা বেশি অগ্রসর তাদের। আর সব ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই যে প্রথম থেকে এরকম গন্ডির সৃষ্টি হয়ে থাকে তাতে সন্দেহ নেই। হীনযান মহাযান দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে হীনযান মতবাদ পরিপুষ্টি লাভ করেছিল খ্রিস্ট্রীয় প্রথম দ্বিতীয় শতকের দিকে এবং মহাযানের যে দুটি প্রধান মতবাদ, মাধ্যমিক ও যোগাচার, তাও প্রায় ওই সময়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বিভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের ভিতর চারটি সম্প্রদায় নিজেদের বিশিষ্ট অধ্যাত্মদৃষ্টি বা দর্শনের জন্য বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল ও বহুদিন ধরে তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই চারটি সম্প্রদায়ের নাম হচ্ছে — বৈভাষিক সৌত্রান্তিক মাধ্যমিক ও যোগাচার। ব্যবহারিক সংজ্ঞা দিতে গেলে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিককে হীনযান ও মাধ্যমিক ও যোগাচারকে মহাযান বলতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হীনযান - মহাযান এত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ যে একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির পৃথক বিচার সম্ভবপর নয়। উভয়ের সম্বদ্ধ অতি নিকট ও প্রভেদ অতি সূক্ষ্ম। বিশেষ কোনো যুগে বৌদ্ধসঙ্ঘের ভিতর যে পরস্পরবিরোধী দুটি দলের সৃষ্টি হয়েছিল তা মনে করা অসঙ্গত হবে। হীনযান সম্প্রদায়ের ভিক্ষুও যে মহাযানপন্থী হতে পারতেন তার বহু প্রমাণ আছে। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য বসুবন্ধু প্রথমে বৈভাষিক এবং জীবনের প্রথম ভাগে তিনি অভিধর্ম কোষ নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন তা বৈভাষিকদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হয়। পরে এই বসুবন্ধুই যোগাচারবাদ অবলম্বন করে বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা নামক বিশিষ্ট দার্শনিক মত স্থাপনা করেন। সেই সময়ে তিনি যেসব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন সেগুলিই হচ্ছে বিজ্ঞানবাদের প্রামাণিক গ্রন্থ।

বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব সর্বাস্তিবাদে এবং উভয়ের প্রাচীন নাম

সর্বাস্তিবাদ ছিল একথাও বলা চলে। বস্তুত সর্বাস্তিবাদের সাতখানি অভিধর্ম বা দার্শনিক গ্রন্থই বৈভাষিকদের শাস্ত্র। এই সাতখানি গ্রন্থ হচ্ছে জ্ঞানপ্রস্থান, ধর্মস্কন্ধ, সঙ্গীতিপর্যায়, বিজ্ঞপ্তিবাদ, প্রকরণপাদ, প্রজ্ঞপ্তিসার ও ধাতুকায়পাদশাস্ত্র। সর্বাস্তিবাদের অভিধর্মগ্রন্থগুলি অবলম্বন করে যেসব প্রাচীন টীকা প্রণয়ন করা হয়েছিল তাকে বিভাষা বলা হয়। সেই থেকেই বৈভাষিক নামের উৎপত্তি। সুতরাং বৈভাষিক মতের সৃষ্টি যে খ্রিস্ট্রীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকেই হয়েছিল এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।[২]

সৌত্রান্তিক মতের উৎপত্তি হয় আরও কিছু পরে। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় - তৃতীয় শতকে সর্বাস্তিবাদের আচার্য কুমাররাত বা কুমারলাত ও তাঁর শিষ্য হরিবর্মণ এই নূতন মতবাদ স্থাপন করেন। অভিধর্ম ও বিভাষা গ্রন্থগুলিকে প্রামাণিক বলে স্বীকার না করে তাঁরা বললেন যে বুদ্ধের বাণী সম্যক উপলব্ধি করতে হলে সূত্রগ্রন্থগুলির শরণ নিতে হবে। কারণ তাতেই শুধু বুদ্ধের নিজের মুখনিঃসৃত বাণী রয়েছে।

সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক এই উভয় দার্শনিক মতেরই মূল হচ্ছে সর্বাস্তিবাদ। বৈভাষিকেরা সর্বাস্তিবাদের অভিধর্ম এবং সৌত্রান্তিকেরা সূত্রগ্রন্থ অবলম্বন করে নিজেদের মত গড়ে তোলেন ও প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বনিরূপণ করতে গিয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন।[৩]

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকেও উত্তর ভারতে মাধ্যমিক ও যোগাচার মত প্রবল ছিল। ওই শতকের মধ্যভাগে হিউয়েন সাং যখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য শীলভদ্রের নিকট যোগাচার - দর্শন অধ্যয়ন করছিলেন তখনও সেখানে তান্ত্রিক মতের প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু অষ্টম শতক হতেই নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী প্রভৃতি বিদ্যায়তনের আচার্যদের হাতে যে বৌদ্ধদর্শন পরিপুষ্টি লাভ করে অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত প্রাচ্য ভারত ও তিব্বতকে আচ্ছন্ন করে তুলল, সে বৌদ্ধমত অভিনব।

এই অভিনব বৌদ্ধমতের সাধারণ আখ্যা দেওয়া চলে তন্ত্রযানই, তন্ত্র কথার পরিভাষা দিতে গেলে বলা যায় যে তার মধ্যে এমনসব সাধনপদ্ধতি নির্দেশ করা হয়েছে যা সাধারণের বোধগম্য নয়। সেই পদ্ধতিতে সিদ্ধ পুরুষদের উপদেশ অনুসরণ করে যারা সেই পথ অবলম্বন করে ধর্মযাজন করেন তাঁরাই তার অর্থ জানেন। তন্ত্রযান বৌদ্ধধর্মও তাই। তার মধ্যে সাধনবিষয়ের যেসব ইঙ্গিত আছে তা সুবোধ্য নয় এবং যে পরিভাষার সঙ্গে সে ইঙ্গিত জড়িয়ে রয়েছে তার ব্যবহারিক অর্থ গ্রহণ করলে কদর্থে উপনীত হতে হয়।

তন্ত্রযানের মধ্যে অন্তত তিনটি মতের সন্ধান পাওয়া যায়। এ তিনটি হচ্ছে কালচক্রযান, বজ্রযান ও সহজযান। প্রত্যেক মতেরই গ্রন্থ ছিল, এবং সে গ্রন্থবলী সম্পূর্ণভাবে তিব্বতী অনুবাদে সংরক্ষিত হয়েছে। কতকগুলি গ্রন্থের সংস্কৃত মূল নেপালে পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের চেষ্টায় যে সব গ্রন্থ প্রকাশিত

হয়েছে তার মধ্যে চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, দোহাকোষ, অদ্বয় - বজ্রসংগ্রহ, গুহ্যসমাজতন্ত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মৌলিক গ্রন্থগুলির মধ্যে বেশির ভাগ এখনও উদ্ধার করা বা প্রকাশ করা হয়নি। শুধু পুঁথিপত্রের সাহায্যে এসব মতের কিছু পরিচয় দেওয়া সম্ভব।

কালচক্রযানের একখানি পুঁথি নেপাল হতে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ পুঁথির নাম হচ্ছে "লঘুকালচক্রতন্ত্ররাজটীকা"। এর অন্য নাম হচ্ছে 'বিমলপ্রভা'। এ টীকার রচয়িতা ছিলেন সুচন্দ্র। কালচক্রযানের আর একজন প্রচারক ছিলেন অভয়াকরগুপ্ত।

যখন বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান হয়, তখন প্রাচীন ভারতে কোনও একক সার্বভৌমত্ব ছিল না। সমগ্র দেশ অনেকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এগুলির মধ্যে মগধ, বৎস, কোশল এবং অবন্তী এ চারটি রাজতান্ত্রিক দেশ বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি ও চরম উৎকর্ষ বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যা হোক শুরুতেই কিছু রাজতান্ত্রিক দেশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু অতি শীঘ্রই রাজকীয় এবং বিখ্যাত ও অনন্যসাধারণ ব্যক্তিবর্গ সোজাসুজিভাবে অথবা অন্য প্রভাবে বুদ্ধের সংস্পর্শে আসেন। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়। এই সমস্ত রাজতান্ত্রিক রাজ্যে কেবল ধর্ম পরিবর্তন হয়নি; অধিকন্তু বিহার ধর্মশালা ইত্যাদি নির্মিত হয় এবং অধিবাসীরা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিহার বাসস্থান ইত্যাদি প্রদান পূর্বক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তদুপরি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে বুদ্ধ স্বয়ং রাজপুত্র হিসাবে তাঁর ধর্মের ব্যাপারে রাজকীয়, বিখ্যাত এবং আদর্শবাদী ব্যক্তিবর্গের সমর্থন লাভের জন্য সচেষ্ট ছিলেন।[৪]

বৌদ্ধধর্ম প্রথম দিকে পূর্ব ভারতেই আবদ্ধ ছিল কিন্তু কালক্রমে এই ধর্ম ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর নানা দেশেও বৌদ্ধধর্মের বিস্তার হয়। যে ধর্ম প্রথম দিকে শুধু আঞ্চলিক ধর্ম মাত্র ছিল তা ক্রমে বিশ্বধর্মে রূপান্তরিত হয়। বৌদ্ধধর্মের এই ব্যাপক প্রসারের কয়েকটি কারণ আছে।[৫]

বুদ্ধদেব মানবিক গুণের বিকাশের উপরই জোর দিয়েছেন, দার্শনিক তত্ত্বের বাতাবরণ সৃষ্টি করে তিনি তাঁর ধর্মমতকে জটিল করে তোলেননি। তাঁর উপদেশ ছিল সহজ ও মর্মস্পর্শী। ফলে বৌদ্ধধর্ম সহজেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের তুলনায় বৌদ্ধধর্ম ছিল অনেক বেশি উদার ও গণতান্ত্রিক। বুদ্ধদেব জাত-পাতের বিচার করেননি। জন্মের উপরও গুরুত্ব দেননি। ফলে সমাজের নীচু তলার লোকদের তিনি সহজেই আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থাদিতে বৈশ্য ও শূদ্রের উপর নানা প্রকার বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এসব গ্রন্থে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়েছে, তেজারতি নিন্দিত হয়েছে। বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের উপর এ ধরণের বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়নি। ফলে বৈশ্য ও শূদ্র সম্প্রদায়ের নীচু তলার লোকেরা যেমন, তেমনি সম্পন্ন ব্যক্তিরাও বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হন। অনাথ

পিন্ডদের মতো সেযুগের কয়েকজন ধনী বণিকের সঙ্গে বুদ্ধদেবের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

যে নারীসমাজকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম গৃহকোণে বন্দী করে রেখেছিল, সেই নারী সমাজের সামনে বৌদ্ধধর্ম এক বৃহত্তর জীবনের আদর্শ তুলে ধরে। বৌদ্ধধর্ম নারীজাতিকে সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে, তাঁদের উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করে। নারীসমাজে সঙ্গত কারণেই বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল.

ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্র সবই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এ ভাষা সর্বসাধারণের ভাষা নয়, শিক্ষিতজনের ভাষা। তাছাড়া সকলের বেদপাঠের অধিকার ছিল না। ফলে প্রকৃত অর্থে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সর্বসাধারণের ধর্ম হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু বুদ্ধদেব প্রথম থেকেই তাঁর ধর্মকে মাটির কাছাকাছি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি সংখ্যালঘুর ভাষা সংস্কৃতের পরিবর্তে মগধের আঞ্চলিক ভাষা মাগধী প্রাকৃতে ধর্মপ্রচার করেছেন। ফলে বৌদ্ধধর্মের আবেদন হয় সর্বজনীন।

বৌদ্ধধর্মের প্রসারের একটা প্রধান কারণ হল রাজা-মহারাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা। মগধের রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রু, কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ ও কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন ধর্ম প্রচারের জন্য বুদ্ধদেবকে সক্রিয় সাহায্য করেন। তাছাড়া শাক্য, লিচ্ছবি, মল্ল, ভর্গ, কোলিয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোকেরাও বৌদ্ধধর্মের প্রসারে এগিয়ে আসেন। বৌদ্ধধর্মের প্রচারে মৌর্য্য সম্রাট অশোকের অবদান বোধহয় সবচেয়ে বেশি। তাঁর চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম শুধু ভারতের মধ্যেই প্রসারলাভ করেনি, পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁরই ঐকান্তিকতায় বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মে রূপান্তরিত হল। কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁর আগ্রহে বৌদ্ধধর্ম মধ্য এশিয়া ও চীনদেশে বিস্তার লাভ করে। বৌদ্ধধর্মের প্রসারে থানেশ্বরের রাজা হষবর্ধন, পালরাজ ধর্মপাল ও তাঁর পুত্র দেবপাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

যে বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবল প্রতিপক্ষরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সারা ভারতে প্রসার লাভ করেছিল তা খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক নাগাদ এদেশ থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়। অথচ শ্রীলঙ্কা, বার্মা, লাওস, থাইল্যান্ড, তিব্বত, জাপান প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম আজও জনপ্রিয়। নিজের জন্মভূমি থেকে বৌদ্ধধর্মের নির্বাসিত হবার অনেক কারণ আছে।

প্রথমত পরবর্তীকালে তাহার স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতা বর্জিত হয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই এক শাখারূপে পরিচিত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত যে নৈতিকতা বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র ছিল কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম তার থেকে দূরে সরে এসেছিল। নৈতিকতার পরিবর্তে মন্ত্র, তন্ত্র ও গুহ্যসাধনার প্রাধান্য দেখা দেওয়ার ফলে বৌদ্ধধর্ম তার প্রভাব হারিয়েছিল। বৌদ্ধ শ্রমণদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পূর্বেকার যোগাযোগও পরবর্তীকালে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। বুদ্ধদেব সাধারণের ভাষা প্রাকৃতে ধর্মপ্রচার করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বৌদ্ধশাস্ত্রাদি প্রাকৃতে নয়, শিক্ষিতজনের ভাষা

সংস্কৃতেই রচিত হতে থাকে। ফলে সমাজের সাধারণ মানুষের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের বিচ্ছেদ ঘটেছিল।

বৌদ্ধধর্মের ঐকান্তিক দুঃখবাদও এর তিরোধানের এক প্রধান কারণরূপে চিহ্নিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের দুঃখতত্ত্ব মানুষকে উজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়নি। পরবর্তীকালে সঙ্ঘ-নায়কদের দলাদলিও বৌদ্ধধর্মকে দুর্বল করে তুলেছিল। নানান্তরের সংঘাতের ফলে সঙ্ঘ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পরবর্তী রাজা মহারাজাদের নিকট পূর্বের মতো পৃষ্ঠপোষকতা না পাওয়া, তুর্কী আক্রমণ প্রভৃতি নানা কারণে বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে বিলুপ্ত হয়েছিল।

সূত্রনির্দেশ

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুদ্ধদেব, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা ১৯৯৩, পৃ নং ৬১-৬২।

২। প্রবোধচন্দ্র বাগচী বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা ১৯৮৭, পৃ নং- ২২-২৩।

৩। স্বামী বিবেকানন্দ ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর বাণী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ১৯৯৯, পৃঃ ১৭-১৮।

৪। অধ্যাপক শ্রী রনজিৎ কুমার বড়ুয়া — প্রকাশনা শ্রীযুক্ত বাবু বীরমোহন বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ ১৯৮৪, পৃঃ নং- বৌদ্ধধর্মে রাজা-মহারাজাদের অবদান, পৃঃ নং- ১।

৫। অধ্যাপক দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায় — ভারত ইতিহাসের সন্ধানে আদি পর্ব। প্রথম খন্ড সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা ৬, ২০০০, পৃঃ নং - ১৫০-১৫৩।

ইতিহাসের আলোকে স্থানীয় শাসক পাহিল

কৃষ্ণেন্দু রায়

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আদিমধ্যকাল বহু আলোচিত পর্ব (খ্রিঃ ৬০০—১৩০০)। আর্থ-সামাজিক ধর্মীয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ লক্ষ্যণীয়। তবে এই পর্বে সবচেয়ে বেশি করে নজর কাড়ে ভক্তি-আশ্রিত আদর্শের প্রচার ও প্রসার। ভক্তিবাদের মূল কথা হল ইষ্টদেবতার পূর্ণ শরণ নিলে ঈশ্বর তার ভক্তকে মুক্ত করেন; ভক্ত দেবতার প্রসাদ লাভ করে।[১] ধর্মাদর্শগত এই ভাবটি আদিমধ্যকালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। একথা সুবিদিত যে, এই সময়ে স্থানীয়/আঞ্চলিক রাজশক্তিগুলি তাদের ক্ষমতার প্রসারণ ঘটাতো। প্রাসঙ্গিক শিলালেখগুলি থেকে জানা যায় যে, স্থানীয় শাসক লোকনাথ (খ্রিঃ ৬৫০—৭০), খড়গরাজগণ (আঃ খ্রিঃ ৬২৫—৭০৫), আঞ্চলিক শাসক পালরাজগণ (আঃ খ্রিঃ ৭৫০—১১৭৫), স্থানীয় চন্দ্ররাজগণ (আঃ খ্রিঃ ৪৬৫—১০৫৫) নিজ নিজ প্রভাব বিস্তারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।[২] বিজিত অঞ্চলে ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত তথা বৈধ করার উদ্দেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধর্মসম্প্রদায়গুলিকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হত। অর্থাৎ তাদের দৈবী প্রসাদ লাভের মাধ্যমে রাজশক্তিকে দৃঢ়তর করা হত। অনুরূপভাবে ধর্মসম্প্রদায়গুলিও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থে রাজনৈতিক প্রসাদ তথা বাস্তবিক সাহায্য রাজশক্তির নিকট থেকে গ্রহণ করত। অর্থাৎ রাজশক্তি ও ধর্মসম্প্রদায়গুলি বাস্তবিক স্বার্থে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল ছিল। রাজনৈতিক সাহায্যপুষ্ট হয়ে ধর্মসম্প্রদায়গুলি তাদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একই সঙ্গে সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক প্রভাবকে সংশ্লিষ্ট এলাকার সমাজমানসে গ্রথিত করত। এই মর্মে উপরোক্ত স্থানীয় শাসকদের কার্যকরী ভূমিকা সুপরিচিত। একই ভূমিকায় আলোচ্য স্থানীয় শাসক পাহিলকে আমরা বোঝার চেষ্টা করবো।

বাংলাদেশ জাতীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত ৬৬ সে.মি. লম্বা ও ৩৫ সে.মি. চওড়া লেখ-উৎকীর্ণ পাথরটি প্রতিপাদ্য বিষয়ের মূল তথ্যসূত্র। *জার্নাল অব বেঙ্গল আর্ট*-এর দ্বিতীয় খন্ডে গৌরীশ্বর ভট্টাচার্য ১৯৯৭ সালে লেখটি প্রথম সম্পাদনা করেন।[৩]

লেখমালা থেকে জানা যায় যে, কর্করাজ নামে কোন এক বীরপুরুষ (*কর্করাজঃ প্রথিতো মহাবলঃ* ....) ছিলেন ভট্টল দেশের সর্বময় কর্তা (............... *ভট্টলদেশ - নায়কঃ* ....)।[৪] ভট্টলদেশ বলতে বর্তমান বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ জেলাকে বোঝানো হয়েছে।[৫] কর্করাজ ছিলেন কনৌজ অধিপতি যশোবর্মনের (আঃ খ্রিঃ ৭২৫—

৫৩) মিত্র (*আসীদ যশোবর্ম্ম - নৃপ - ঐক - বল্লভো মিত্র ....*);[৬] কর্করাজ নিশ্চয়ই কনৌজপতির অধীনস্ত মিত্র ছিলেন। ব্রাহ্মণসহ ভট্টলদেশের সকলের নিকটই কর্করাজ ছিলেন সমানভাবে আশ্রয় স্বরূপ (*দ্বিজ - জ্ঞাতি সুহৃৎ - সমাশ্রয়ঃ*)।[৭] অর্থাৎ বলা যেতে পারে কর্করাজের রাজকীয় প্রভাব - প্রতিপত্তি ভট্টলদেশের মানুষের নিকট যথেষ্ট সুস্বীকৃত ছিল। এই রকম একজন অধিকর্তার পুত্র ছিলেন শিবরুদ্র এবং শিবরুদ্রের পুত্র ছিলেন আমাদের আলোচ্য শাসক পাহিল।[৮] পাহিল ছিলেন ভট্টলদেশের তৃতীয় শাসক। সময়কাল যথাস্থানে বলা হবে। এবং পাহিলের রাজবংশ ভট্টলদেশে যথেষ্ট গ্রাহ্য ও মান্য ছিল। পাহিলও তাঁর রাজবংশের সামাজিক মান্যতা বজায় রাখার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এবার সেদিকে নজর দেওয়া যাক।

ভট্টলদেশে ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি করতেন। প্রাসঙ্গিক যজ্ঞক্রিয়াও সম্পন্ন করতেন (*দ্বিজাতি - বেদ - ধ্বনি - যজ্ঞ - কর্ম্মভিঃ*)।[৯] এসবের ফলে ভট্টলমণ্ডল বেশ সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে, অবশ্যই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির চর্চায় (..................... *শ্রীয়ান্বিতে ভট্টল - নাম্নি - মণ্ডলে ....*)।[১০] বৈদিক সংস্কৃতির চর্চার পাশাপাশি বৈষ্ণব সংস্কৃতি চর্চাও ছিল।

আলোচ্য লেখমালা শুরু হয়েছে ভগবান বাসুদেবের বন্দনা দিয়ে (*ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ....*)।[১১] এবং বর্তমান লেখমালার প্রথম তিনটি ছন্দ-ই ভগবান বিষ্ণুর বন্দনায় মুখর। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি পাহিলের ঝোঁক থাকলেও থাকতে পারে। বেদ অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পাদন করার পর যারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতেন অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করে পরিব্রাজক-ধর্মের আচরণ করতেন, তারাই ছিলেন প্রকৃতার্থে ধর্মীয় ভিক্ষু।[১২] বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এইসব সন্ন্যাসী স্থান থেকে স্থানান্তরে ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রচার করতেন। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করতে হবে যে, পাহিল ভট্টলদেশে চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসীদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বসতি দিয়েছিলেন। সম্ভবত পাহিল উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানুষের সম্পদ ও যৌবন ক্ষণস্থায়ী, একমাত্র আসক্তিহীন ধর্মাচরণই অবিনশ্বর। এই উপলব্ধি থেকেই সম্ভবত পাহিল তার নিজরাজ্যে অর্থাৎ ভট্টলদেশে উক্ত সন্ন্যাসীদের স্থান দিয়েছিলেন (*সম্পদ - জীবীত - যৌবনানি চপলান্য - আলোক্য ধর্ম্ম্যং স্থিরং দত্তঃ প্রব্রজিতেভ্য - এষ ....মঠ*)।[১৩] কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ভট্টলদেশে ধর্ম-সংস্কৃতির চর্চার বেশ পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়েছিল এবং এই কাজে সাধারণ মানুষেরও সমর্থন ছিল। এই মর্মে প্রাসঙ্গিক তথ্যও বর্তমান লেখতে উপস্থিত (*ভক্তদেব - গুরু - দ্বিজাতিষু - সদা স্নিগ্ধঃ সুহৃন্ মিত্রয়োর ভোগী সর্ব্বজন - উপভোগ্য ......*)।[১৪] অর্থাৎ পাহিল ব্রাহ্মণ, মিত্র তথা সাধারণ মানুষ সকলেরই নিকট প্রিয় ছিলেন। স্থানীয় শাসক হিসেবে পাহিলের প্রভাব ভট্টলদেশে সর্বত্র ব্যাপ্ত ছিল। রাজ দরবারের সামাজিক ভিত্তি ছিল মজবুত। বুঝতে অসুবিধা হয় না এই কারণেই পাহিলের সাংস্কৃতিক

উদ্যোগসমূহকে প্রশংসা করে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রশস্তি রচনা করা হয়েছে। প্রাচীন বাংলায় স্থানীয় শাসকের নামে প্রশস্থি রচনার খবর এই প্রথম পাওয়া গেল।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা দরকার। ভট্টলদেশে পাহিলের ও তার রাজ দরবারের সামাজিক মান্যতা ও গ্রাহ্যতার কারণেই সম্ভবত দেবপাল তাঁর রাজ্যপাটের দায়িত্ব পাহিলের হাতে তুলে দেন (................. *যস্মিন্ রাজ্যং নিধায় আখিল - বিষয় - মুখ্যং সেবতে ত্যক্ত - চিন্তো দেবঃ শ্রী দেবপালঃ* ....) এবং নিশ্চিন্তে সুখ ভোগ করতে থাকেন।[১৫] স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠেঃ এই দেবপাল কে? মনে করা হয়েছে ইনি প্রাচীন বাংলার তৃতীয় পালরাজ দেবপাল যিনি রাজত্ব করেছিলেন খ্রিস্টীয় নবম শতকের প্রথমার্ধে (আঃ খ্রিঃ ৮০৮—৪৩)। তাহলে পাহিলের রাজত্বকাল অবশ্যই খ্রিস্টীয় নবম শতকের প্রথমার্দ্ধ; কিন্তু তিনি কত বছর রাজত্ব করেছিলেন সঠিকভাবে বলা কঠিন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাহিল একজন স্থানীয় শাসক ছিলেন, কোন সামন্তরাজা নন। যদি দেবপাল উক্ত তৃতীয় পালরাজ হয়ে থাকেন, তবে তিনি কি আংশিক, না-কি পূর্ণ রাজ্যপাট পাহিলের হাতে তুলে দেন? যদি পূর্ণ রাজ্যপাট তুলে দিয়ে থাকেন, তবে কি দেবপালের পরে পাল রাজত্বে পাহিলের স্থান হবে? প্রসঙ্গত একটি কথা উল্লেখ্য: নালন্দা তাম্রশাসনে (৩৫শ বর্ষ) উক্ত পালরাজকে বলা হয়েছে—*পরমসৌগতঃ পরমেশ্বরঃ পরমভট্টারকো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমান্দেববপালদেবঃ*।[১৬] বলাই বাহুল্য যে, দেবপাল একজন বড়মাপের শাসক ছিলেন। এরকম একজন উচ্চ উপাধিধারী মহারাজকে একই সময়ের প্রেক্ষিতে — নবম শতকের প্রথমার্ধে — শুধুমাত্র *শ্রী দেবপালঃ* বলেই সরকারি দলিলে উল্লেখ করা হল। কাজেই পাহিল *প্রশস্তির* দেবপালকে মহারাজাধিরাজ দেবপালের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা যাবে? যাহোক্ একজন স্বাধীন স্থানীয় শাসক হিসেবে রাজশক্তির সামাজিকিকরণে পাহিল যথেষ্ট সফল হয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশে তাঁর সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ-ই রচিত হয়েছিল প্রশস্তি। এই কারণেই তিনি ইতিহাসের স্থানীয় শাসক পাহিল।

সূত্রনির্দেশ

১। সেন এ. সি. প্রমুখ (অনুঃ ও সম্পাঃ), *উপনিষদ*, অখন্ড সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ১০১, ১-২৩।

২। সরকার ডি.সি. *পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত*, কলকাতা, ১৯৮৫;
ঐ পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত, কলকাতা, ১৯৮২।

৩। ভট্টাচার্য গৌরীশ্বর, 'বাংলাদেশ ন্যাশন্যাল মিউজিয়াম প্রশস্তি অব পাহিল (নাইন্‌থ্ সেঞ্চুরি এ.ডি.), *জার্নাল অব বেঙ্গল আর্ট* (এরপর থেকে জাবেআ), খন্ড ২, ১৯৯৭, পৃঃ ১১১-২০।

৪। ঐ, *জাবেআ*, পৃঃ ১১৬, লাইন নং ৭।

৫। *ঐ, তদেব,* পৃঃ ১১২।

৬। *ঐ, তদেব,* পৃঃ ১১৬, লাইন নং ৭খ।

৭। *ঐ, তদেব,* পৃঃ ১১৬, লাইন নং ৭খ—৮ক।

৮। *ঐ, তদেব,* পৃঃ ১১৬, লাইন নং ৮—১০।

৯। *ঐ, তদেব,* পৃঃ ১১৬, লাইন নং ৫খ।

১০। *ঐ, তদেব,* পৃঃ ১১৬, লাইন নং ৫ক—খ।

১১। *ঐ, তদেব,* পৃঃ ১১৫, লাইন নং ১।

১২। তর্করত্ন পঞ্চানন (সম্পাঃ), *মনু-সংহিতা,* পরিমার্জিত সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৯৭, পৃঃ ১৫৭—৬৪, ৬.৩৩—৮৬।

১৩। *জাবেআ,* পৃঃ ১১৬, লাইন নং ১৩খ—১৪ক।

১৪। *ঐ, তদেব,* পৃঃ ১১৬, লাইন নং ১১ক—খ।

১৫। *ঐ, তদেব,* পৃঃ ১১৬, লাইন নং ১০খ—১১ক।

১৬। শাস্ত্রী হীরানন্দ, 'দি নালন্দাকপার-প্লেট অব দেবপালদেব', *এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা,* খণ্ড ১৭, নং ১৭, পৃঃ ৩২১ লাইন ২৫।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে উত্তর দিনাজপুর

অরূপ দাস

এ জেলার অতীত ইতিহাস গৌরবে সমুজ্জ্বল। জেলার দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, অথবা উঁচুনিচু অনুর্বর প্রান্তরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত স্থান আর প্রবহমান নদী নালার জলধারায় সঞ্জীবিত ভূ-ভাগের স্থানে স্থানে আজও চোখে পড়ে নানান ধর্মীয় ইমারতে স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নিদর্শন। কালের প্রভাবে অযত্ন ও অবহেলায় সে সব স্থাপত্য সৌধের অধিকাংশই জীর্ণ হয়ে পড়লেও, আজ পর্যন্ত যা টিকে আছে সেগুলির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এ জেলার শিল্পবোধের নিদর্শন।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে উত্তর দিনাজপুর জেলায় এখনও কয়েকটি মন্দির, কয়েকটি মসজিদ এবং পাল, সেন ও মুসলিম যুগের কিছু প্রত্নৌক, ছড়ানোছিটানো ঘরের কার্ণিশ, ভগ্ন দেওয়ালের মাথা-উঁচু করে ইতিহাসের অনন্য নজির গড়ে তুলেছে। এই সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের নির্মাণ কৌশল, তৈরির পদ্ধতি, গাঁথনির উপকরণ, শিখররীতি ও টেরাকোটা - মার্গ - লৌকিক শিল্পের সমন্বয়, পঙ্খ (স্টাকে) ছাড়াও ভাস্কর্য শিল্পের রত্নমালিকা, কল্পতরু ছত্রাবলী, কীর্তিমুখ, শিকলে লম্বমান ঘন্টা, প্রস্ফুটিত পদ্মদল, পাক-দেওয়া দড়ি, ত্রিপত্র এর সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার শিল্পধারা থেকে আহূত আঙুরগুচ্ছ, গোলাপ, কুন্ডলীবদ্ধ ও লতাযুক্ত অ্যারাবেক এর শিল্প নিদর্শন আজও বিস্ময় সৃষ্টি করে। এখানে সুলতানী আমলে মুসলিম স্থাপত্য শৈলীর এক আলোক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এই জেলার রায়গঞ্জ শহরের অনতিদূরে হেমতাবাদ থানার অধীনে কসবা মাহাসো মৌজায় পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত গরিবুল্লা হাসানধোকর পোষ-এর দশ গম্বুজ মসজিদ। কথিত যে, রাজা গণেশের দ্বিতীয় পুত্র যদু (যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন) জালালউদ্দিন মসজিদটি নির্মাণ করিয়েছিলেন।[১] এই কসবা মাহাসো গ্রামটি ছিল বাংলার নবাবী আমলের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান, রাজা গণেশের বাড়ি এই গ্রামে ছিল বলে অনেকের ধারণা। বিহার শরিফ থেকে আগত পীর মখদুমি গরিবুল্লা হাসান এখানে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন।[২] তবে স্থানীয় ভাবে জানা যায়, বাদশাহ শাহজাহানের আমলে এই মসজিদটি নির্মিত হয়। মসজিদের ভিতরে মিহরাবে টেরাকোটা-ভাস্কর্য-ফলকে উৎকীর্ণ নিকাশি কাজ ছাড়াও শিকলে ঝুলন্ত ঘন্টা প্রতিকৃতির ফলকও লক্ষ্য করা যায়। মসজিদটিতে নিবদ্ধ গোলাকার এক প্রস্তর ফলকে আরবি - তুগরা হস্তলিখন পদ্ধতিতে উৎকীর্ণ একটি প্রতিষ্ঠা ফলক বেশ বৈশিষ্ট্য পূর্ণ।[৩]

রায়গঞ্জ ব্লকের বিন্দোল গ্রামে নির্মিত প্রাচীন মন্দির মার্তন্ড ভৈরব মন্দির। এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত। বহুদিন পূর্বে পার্শ্ববর্তী কাঙ্গন নদী থেকে এটি তুলে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। মন্দিরে বিগ্রহটির লক্ষণীয় দিক হল ভৈরব আর তার নিচে শয়নসূর্য। মূর্তিটির দুই পার্শ্বে জুতা পরিহিত দন্ডি পিঙ্গল ছায়া ও গঙ্গা বর্তমান। সামনে মহাশ্বেতা, নিচে সূর্যের রথের সারথি অরুণ। পাদপীঠে রথের প্রতীক একটি চক্র এবং সপ্তাশ্ব খোদিত। এর গঠনশৈলী অতীব সুন্দর।[৪] কালো পাথরের ওপর খোদাই করা পেছনের চালচিত্র সমেত মূর্তিটি ৪ ফুট লম্বা। প্রত্নতত্ত্বের অন্যতম নিদর্শন এই মন্দিরের ভাস্কর্যে জ্যামিতিক ও ফুলকারি নকশাই প্রাধান্য পেয়েছে।[৫]

কালিয়াগঞ্জ থানার রাতন গ্রামের রাজভিটা নামক স্থানে দশম - একাদশ শতকের একটি প্রাচীন ধর্মীয় গৃহের অলংকরণ মন্ডিত দেওয়ালের কার্ণিশ রয়েছে। কার্ণিশটির দৈর্ঘ্য ৮/৮ ফুট প্রস্থ ৬ ফুট/৬ ফুট। বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এটি সমতল ভূমিতে পরিহৃত হচ্ছে। এর অলংকরণ ফুল, লতাপাতা সমন্বিত টেরাকোটার ভাস্কর্য খুবই আকর্ষণীয়। স্থানীয় লোকের কথায় এই কাজের ক্ষেত্রে শিল্পীগণ উত্তরপ্রদেশ এবং সংলগ্ন অঞ্চলের।[৬]

রায়গঞ্জের টেনোহরি গ্রামে একাদশ ও দ্বাদশ শতকে ৭০-৭৫ হাত বিস্তৃত প্রাচীন ইটের নির্মিত লম্বা দেওয়ালে ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই টেনোহরি মন্দিরের মূর্তিগুলি লম্বায় ৩ ফুট - ৩.৫ ফুট এবং চওড়ায় ২ ফুট - ২.৫ ফুট। এগুলি সবই বিষ্ণুমূর্তি। এই মূর্তিগুলি দেখে মনে হয় এগুলি পাল ও সেন যুগের। দেওয়ালের ভাস্কর্যে রয়েছে পথ, লতা ও ধর্মীয় দেবতা তথা সূর্যের অলংকরণ।[৭]

কালিয়াগঞ্জ ব্লকের রাধিকাপুর অঞ্চলের উড্র গ্রামে (বর্তমান নাম উদগ্রাম) সম্ভবত গুপ্ত থেকে পালযুগের একত্র সংলগ্ন ১৭টি ধর্মীয় গৃহের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে এবং সংলগ্ন রয়েছে সাবেক মন্দির ও বিষ্ণুমূর্তির ধ্বংসস্তূপ, সংলগ্ন গৃহগুলির আকৃতি, গাঁথনির উপকরণ দেখে মনেহয় এটি স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক বৈশিষ্ট্য পূর্ণ নিদর্শন, জ্যামিতিক গঠন রীতিতে ছোট ও পাতলা পোড়া ইটের মধ্যে সূর্যের ছবি লক্ষ্যণীয়।[৮]

ইসলামপুর মহকুমার অন্তর্গত করণদীঘি থানার পূর্বপ্রান্তে 'করণদীঘি'-র কাছে একটি বহু প্রাচীন শিবের মন্দির রয়েছে। এই দীঘিটি মহাভারতের সূতপুত্র কর্ণের নামের সঙ্গে যোগসূত্র। স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান সমস্ত মানুষই বিশ্বাস করে এই দীঘির জলে স্নান করে কোন প্রার্থনা করলে মনোবাসনা পূর্ণ হয়। কোন ইচ্ছা পূর্ণ হলে পূজা দেবার প্রচলন আছে। সাধারণত বৈশাখ মাসের প্রথম দিন পূজা হয়। এই শিবের মন্দিরটি দিনাজপুরের রাজা রামনাথ রায়ের আমলে নির্মিত বলে কথিত। মন্দিরটি প্রাচীন হলেও এর মূর্তি ও ভাস্কর্য জীবন্ত। বর্তমানে এই মন্দিরটি সংস্কারের ফলে প্রাচীনতাকে লুকিয়ে (প্রাচীন ইট) আধুনিকতার রূপ পরিগ্রহ হচ্ছে।[৯]

এ জেলার কয়েক শতাব্দী প্রাচীন একটি একরত্ন মন্দির রয়েছে রায়গঞ্জ থানার অধীনে দুর্গাপুরের স্বামীনাথের মন্দির। মন্দিরটি দুর্গাপুরের জমিদার ভূপাল চন্দ্র রায়ের আমলে নির্মিত। কারুকার্য খচিত ভাস্কর্যে মন্দিরের বিগ্রহটির মধ্যে ১০০টি বিষ্ণুমূর্তি রয়েছে।[১০]

এ জেলার গোয়ালপুকুরের অসুবাগড়ে পাওয়া গেছে কুষাণ যুগের মৃৎপাত্র এবং মাটির খোলার উপর ভাস্কর্যের নিদর্শন, ধ্বংসাবশেষের কিছু অংশ বনাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত এবং কিছু অংশ চাষযোগ্য জমি। কুষাণ যুগের এই নিদর্শনগুলি বর্তমানে Registering officer, Archaeological office, Siliguri-তে রাখা আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এই অঞ্চলে পাবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়। এজেলার চিরামতী (শ্রীমতী) নদীর তীরে সুরোহরে, জৈন ধর্মের পীঠস্থান ছিল। জৈন তীর্থঙ্করদের মধ্যে প্রথম ছিলেন ঋষভদেব। তাঁর মূর্তি এখান থেকেই সংগ্রহ করে রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মূর্তিটির ভাস্কর্য অতীত সুন্দর। এছাড়াও বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও নৃত্যরত শিবের মূর্তি পাওয়া গেছে। হিন্দু ও জৈন ধর্ম এখানে যে সমান গৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল তা স্পষ্টতই বোঝা যায়।[১১]

তাছাড়া কালিয়াগঞ্জ থানার সদরে রয়েছে প্রায় ৩০০ বছর আগে নির্মিত একটি মনসা মন্দির। মন্দিরটি চারচালা মাটির দেওয়াল। এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বর্ধমান থেকে আগত কাচালু সাহা এবং নদীয়া থেকে আগত প্রাণনাথ সাহা (মোদক)। মন্দিরটির দরজা ও জানলায় কাঠের ভাস্কর্য লক্ষ্যণীয়। এবং মোঘল আমলের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যরীতিতে তৈরি ২৫০-২০০ বছর আগের একটি মসজিদ। জলবায়ু এবং উপাদানের তারতম্যে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ এই রীতির উল্লেখযোগ্য ঢঙ। গম্বুজ, অশ্বক্ষুরাকৃতি, খিলান এবং মিনার ও এই রীতির বিশিষ্ট অবদান। পাশ্চাত্য স্থাপত্যের তুলনায় এই স্থাপত্য সাধারণত অপেক্ষাকৃত লঘু ও দৃঢ়তাহীন। অলংকরণের অধিক প্রবনতা বিশেষ করে ভারতীয় স্থাপত্যে লক্ষ্যণীয়। বহু বিচিত্র রঙের ব্যবহার ও এ রীতির বিশিষ্টতা। এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দিনাজপুরের অন্যতম জমিদার বিলকু মিঞা চৌধুরী, বর্তমানে এর তদারকি করেন মহঃ তৌসিরুদ্দিন আহম্মদ।[১২]

এ জেলায় রয়েছে ইটাহার থানা। স্থানীয় জনগণের মতে 'ইটাহার' অর্থ ইটের সমাহার। এই অঞ্চলে সর্বত্র প্রচুর পুরাতন ইট এবং ইটের কাজ লক্ষ্য করা যায়। এখানে পোর্ষা নামক স্থানে প্রচুর মন্দির ছিল এবং এই মন্দিরের অসংখ্য বিষ্ণুমূর্তি রয়েছে বালুরঘাট মিউজিয়ামে। ইটাহারের পঃদিকে চামুর ও কুলিক নদীর মাঝামাঝি একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ সূর্যমন্দির রয়েছে ধুলোহারে। পার্শ্ববর্তী মালদহ জেলাতে প্রচলিত গল্প হচ্ছে ধুলোহার ছিল 'ধুলপত' রাজার রাজধানী। অনেকে মনে করেন এদের সঙ্গে পাল রাজাদের সম্পর্ক স্থাপন বা বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। খামারোয়া কালীবাড়িতে

কালো পাথরের একটি সূর্যমন্দির আছে। কাছেই এক বটগাছ তলায় নবগ্রহের একটি প্রস্তর ফলক অযত্নে পড়ে আছে। ধুলোহারের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে আছে নানা উঁচু-নিচু ঢিপি আর ইট ও পাথরের টুকরো। হয়ত এইসব জায়গাতেই ছিল প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, সুন্দর মন্দির এবং বৃহৎ দীঘি। অতীতের গৌরব আজ লুপ্ত আর ধ্বংসপ্রাপ্ত ইতিহাস ফেলছে দীর্ঘশ্বাস।[১৩]

উপরোক্ত পোর্ষায় ভাস্কর্যগুলির অধিকাংশ পালযুগের তৈরি। এখানে পাল যুগের একটি দ্বিতল মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এর পাথরের স্তম্ভগুলি সুন্দর ভাস্কর্যের নিদর্শন বহন করছে। এর অধিকাংশ নিদর্শনই অষ্টম-নবম শতাব্দীর। ইটাহারের ১.৫ কিলোমিটার পূর্বে ভদ্রশীলায় রয়েছে ভদ্র বা ভদ্রীর মন্দির। এই মন্দিরের বিগ্রহগুলি সূর্য মূর্ত্তি গঙ্গামূর্ত্তি ও ভগ্নশ্রী অঘোর রুদ্রের মূর্তি। স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছে রুদ্রের মূর্তিটি দুর্গা-মহিষমর্দিনী নামেই পূজিত হয়। অন্যান্য মূর্তিগুলি অঙ্গহীন অবস্থায় আছে, এর মকরের মুখটি ভাঙা। এর ভাস্কর্য সুন্দর এবং আকর্ষণীয়। এর প্রাচীন নিদর্শন দেখে মনে হয় এই গ্রাম এককালে হয়তো সমৃদ্ধ জনপদ ছিল।[১৪]

ইতিহাস প্রসিদ্ধ কালিয়াগঞ্জের পশ্চিমে সোনাপুরে রয়েছে একটি প্রাচীন নবদুর্গার মন্দিরে বিষ্ণু মূর্তি - এগুলি হল বিষ্ণু, গৌরী, গণেশ, উমা, মহেশ্বর প্রভৃতি। এবং এখানে একটি সূর্যমূর্তিও পাওয়া যায়, যা ধর্মপালের সময়ে নির্মিত বলে অনুমিত হয়। এই অঞ্চলের ভগ্নাবশেষ এর প্রাচীনত্ব ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়।[১৫]

ইটাহার থানার আমাতি গ্রামকে দেখিয়ে অনেকে বলেন, "ওই যে দেখছেন পাল রাজাদের রাজধানী রামাবতী নগরী"। এই গ্রামের গম্ভীরা তলা থেকে পাওয়া গেছে প্রচুর পাথরের মন্দির, মূর্তি ও উৎকীর্ণ স্তম্ভ. সদাশিব বিষ্ণু অবলোকিতেশ্বর, গণেশ, মহাসরস্বতী মূর্তিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এগুলি বালুরঘাট কলেজের সংগ্রহশালায় রয়েছে। পালযুগে এখানে ভাস্কর্য শিলাকলার শিক্ষাকেন্দ্র ছিল বলে অনেকে মনে করেন। এখান থেকে একটি কালো পাথরের বেদি পাওয়া যায়। বেদিটিতে রয়েছে সপ্তরথ, গরুড়, সাপ, পদ্ম, চক্র এবং বীণাবাদনরত সরস্বতী। দ্বাদশ শতাব্দীর এই প্রত্ন নিদর্শনটি বর্তমানে কলকাতার জাতীয় সংগ্রহশালায় রয়েছে। এর কাছেই পাল যুগের একটি মন্দির। এই মন্দিরের ভাস্কর্য যেন জীবন্ত ছবি।[১৬]

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের এই চিরন্তন নিদর্শনগুলি আধুনিক সময়ের মহিমায় ক্রমশই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এখনই এগুলিকে যথাপোযুক্ত সংরক্ষণ না করলে কালের স্থূল হস্তাবলেপে অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমরাও হারিয়ে ফেলব আমাদের অতীত ঐতিহ্যকে।

সূত্রনির্দেশ

১। তারাপদ সাঁতরা ঃ পশ্চিম বাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য — মন্দির ও মস্‌জিদ; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী।

২। দৈনিক বসুমতী; ১৯৯৭, ২২শে জুন।

৩। তারাপদ সাঁতরা; প্রাগুক্ত।

৪। বিশ্বনাথ দাস (সম্পাদিত); উত্তরবঙ্গের পুরাকীর্তি; কলিকাতা।

৫। তারাপদ সাঁতরা; প্রাগুক্ত।

৬। পাক্ষিক কালিয়াগঞ্জ বার্তা — ১৯৭৮; ১৫ই জুলাই।

৭। ধনঞ্জয় রায় — জানা অজানায় দিনাজপুর।

৮। পৌণ্ড্রবর্ধন ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র — সার্ভে রিপোর্ট ও নিজের দেখা অভিজ্ঞতা, ২০০০, ৩০শে জানু।

৯। বিশ্বনাথ দাস, প্রাগুক্ত।

১০। দৈনিক বসুমতী; উত্তরবঙ্গের মেলা, ২০০১, ১১ই জুন।

১১। বিশ্বনাথ দাস, প্রাগুক্ত।

১২। প্রদ্যোত ঘোষ, গৌড় বঙ্গের স্থাপত্য (১ম পর্ব); পৃষ্ঠা-৫৯।

১৩। বিশ্বনাথ দাস; প্রাগুক্ত।

১৪। ঐ।

১৫। ঐ।

১৬। ঐ।

"বল্লাল চরিত" - গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা

সুপম মুখার্জ্জী

কবি ও সাহিত্যিক তথা সমাজ সংস্কারক হিসাবে সেনরাজ বল্লাল সেন ইতিহাসে যতখানি আলোচিত হয়ে থাকেন, সমর বিজেতা হিসাবে ততখানি নয়। বাংলাদেশে প্রাপ্ত অসংখ্য কুলজী গ্রন্থে বল্লাল সেন কর্তৃক কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তন বা পুনঃপ্রবর্তনের কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। তবে এ বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে দুখানি "বল্লালচরিত"- নামক গ্রন্থের আবিষ্কার যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই দুখানি গ্রন্থের মধ্যে একটি পন্ডিত শশিভূষণ শর্মা অনুবাদ করেছিলেন, যে গ্রন্থখানি বল্লাল সেনের শিক্ষক গোপাল ভট্ট রচনা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে গোপাল ভট্টের উত্তরপুরুষ আনন্দ ভট্ট পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে ১৯০৪ সালে পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে অপর একখানি বল্লালচরিত নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন, যে গ্রন্থখানি আনন্দ ভট্ট স্বয়ং রচনা করেছেন বলে গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কাজেই দুখানি 'বল্লালচরিত' নামক গ্রন্থের মধ্যে কোনটি প্রামাণিক তা নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক রয়েছে, যদিও ব্যাখ্যাগত পার্থক্য থাকলেও এবং দু-একটি স্থানে অমিল পরিলক্ষিত হলেও দুখানি গ্রন্থেরই বিষয়বস্তু কৌলীন্য প্রথা। যাইহোক গ্রন্থ দুখানির মধ্যে কোনটি প্রামাণিক তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও গ্রন্থে উল্লিখিত সময় কালের নিরিখে খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে - এ দুখানি গ্রন্থের কোনটিই বল্লাল সেনের সমসাময়িক কালের রচনা নয়। যদিও আনন্দ ভট্ট তাঁর রচনায় নিজেতে অনেক পরবর্তী কালের বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু রাজশিক্ষক গোপাল ভট্টের রচনা বলে পরিচিত গ্রন্থের সময় কাল বল্লাল সেনের অনেক পরবর্তীকালের হওয়াতে উক্ত গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। গোপাল ভট্ট বিরচিত ও আনন্দ ভট্ট কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্ধিত গ্রন্থে সময়কাল নির্ণায়ক যে শ্লোকটি রয়েছে তা হল—

গোপালভট্টনাম্না তদ্রাজস্য শিক্ষকেণ চ।
অস্য রাজ্ঞঃ প্রসাদার্থং সুখম্নেনাপিতং ময়া।
অব্দরাজজমানৈর্ব্বসুভির্বাণেরধিক শাকেষু।
রুদ্রৈশ্চ দর্শিতে মাসে রাশিভিমার্সসম্মিতৈঃ।।[১]

এখানে অন্ধরাজা অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রকে ধরা হয়েছে যাঁর পুত্র সংখ্যা ১০০, বসু শব্দের দ্বারা ৮ (অষ্টবসু) এবং বাণ শব্দের দ্বারা ৫ (পঞ্চবাণ) ধরে প্রাচীন ভারতীয় সময় নির্ণায়ক প্রচলিত রীতি "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" অনুসারে (১০০×৫+৮) ১৩০০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৩০০+৭৮=১৩৭৮ খ্রিঃ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে বল্লাল সেনের রচনা বলে খ্যাত - 'অদ্ভুত সাগর' গ্রন্থের প্রারম্ভিক শ্লোকে "শাকেভ্রনবখেন্দ্বা ১০৯০ খ্রিঃ আরেভেইদ্ভুত সাগরম" — অর্থাৎ ১০৯০ শকে বা ১০৯০+৭৮=১১৬৮ খ্রিঃ গ্রন্থারম্ভ ধরা হয়। আর এরপরে তিনি বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। কেন না গ্রন্থখানি তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে সমাপ্ত করতে হয়েছিল। তাছাড়া যদি ধরে নেওয়াও হয় যে বল্লাল সেন এরপরে দীর্ঘ সময় বেঁচে ছিলেন তা হলেও ১৩৭৮-১১৬৮=প্রায় ২০০ বৎসরের ব্যবধানে রাজ শিক্ষক গোপাল ভট্টের উপস্থিতি মেনে নেওয়া যায় না। তবে শুধুমাত্র এই কারণেই গ্রন্থখানিকে জাল বলা যাবে না — কেন না — প্রাচীন ভারতের এমন অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায় যেখানে অনেক পূর্ববর্তী কোন ঘটনা বা বর্ণনা অনেক পরবর্তী সময়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বদা নিজের নাম গোপন করে — কাহিনীটি যা'র নামে প্রচলিত তাঁর নামই ব্যবহার করতেন। যেমন 'মনুসংহিতা'-র প্রতিটি অধ্যায়ের পুষ্পিকার শেষে বলা হয়েছে ভৃগু প্রোক্ত। তেমনি গোপাল ভট্ট বিরচিত বলে পরিচিত গ্রন্থটিও হয়তো অনেক পরবর্তীকালে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। তবে এভাবে গ্রন্থখানির প্রামাণিকতার পক্ষে যুক্তি দেওয়া হলেও একথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, পরবর্তীকালে লিপিবদ্ধ হওয়া গ্রন্থে পরবর্তীকালের নানা ঘটনার প্রভাব এতে থেকে যাবার সম্ভাবনা যেমন থেকে যায়, তেমনি আবার পূর্ববর্তী বর্ণনার নানা পরিবর্তন হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। আর সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে, কৌলীন্য বিষয়ক গ্রন্থ ঘটক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল থাকে।

তাছাড়া উপরিউক্ত কারণে এ গ্রন্থের যেমন সমালোচনা করা হয় — তেমনি আবার একথাও বলা হয়ে থাকে যে, 'বল্লালচরিত' নামক গ্রন্থদ্বয়ে যেখানে বল্লাল সেন-কে কৌলীন্য প্রথার সাথে যুক্ত করা হয়েছে — সেখানে বল্লাল সেনের রচনা বলে খ্যাত 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামক গ্রন্থদ্বয়ে তার কোন উল্লেখ করা হয় নি কেন? তবে এর উত্তরে বলা যায় যে, দানসম্বন্ধীয় ও জ্যোতিষ সংক্রান্ত গ্রন্থে হয়তো বা আলোচনার অবকাশ ছিল না বলেই এ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়নি। আর বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল বলেই হয়তো সেন আমলের লিপিগুলিও এক্ষেত্রে নীরব।

কাজেই বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বরং দেখা যেতে পারে যে, উভয় 'বল্লালচরিত' নামক গ্রন্থে এমন কোন তথ্য রয়েছে কি না — যা ইতিহাসের দৃষ্টিতে সমর্থন যোগ্য।

গোপাল ভট্ট বিরচিত ও আনন্দ ভট্ট কর্তৃক পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত গ্রন্থে বল্লাল সেনকে বৈদ্য বংশোদ্ভূত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২] যদিও বল্লাল পিতা বিজয় সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে সেন রাজবংশকে 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] তবে এই আপাত বিরোধের একটি মীমাংসা বৈদ্যকুলপঞ্জিকা-তে দেওয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে — ১। 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' কথাটির সর্বজন গ্রাহ্য অর্থ হল - মূলত জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হয়েও ক্ষত্রিয় বৃত্তি অবলম্বনকারী (আয়ুধজীবী); ২। বৈদ্যকুলপঞ্জিকার মতে — বৈদ্যরা জন্মসূত্রে বিপ্র ব্রাহ্মণ এবং সেনবংশের প্রথম রাজা অনুরূপভাবে জাতিতে বৈদ্য তথা ব্রাহ্মণ হয়েও আয়ুধজীবী। ক্ষত্রিয়ের জীবিকা অবলম্বনকারী বলে ব্রহ্মক্ষত্রিয়। আবার বৈদ্যরা মূলত ব্রাহ্মণ কিন্তু 'বৈদ্য' অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী এবং চিকিৎসাজীবী হওয়ায় বৈদ্য বলে পরিচিত — এমন দাবী করা হয়। আর ঐ দাবীর সমর্থনে বহু সংস্কৃত শ্লোক উল্লেখ করেছেন বৈদ্যকুলপঞ্জিকার বৈদ্যজাতীয় লেখকগণ। [অন্যদিকে ব্রাহ্মণের ন্যায় বেদপাঠ, বৈদিক যজ্ঞ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা প্রভৃতি সব কাজই নাকি বৈদ্যগণ করতেন। তার উড়িষ্যার ক্ষেত্রে বৈদ্য জাতীয়দের এধরণের জীবন যাপনের কথা জানা যায়। এক সময়ে বাংলাদেশের এই বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণের ন্যায় মর্যাদা দিয়ে নিয়ে আসার কথাও শোনা যায়।]

তবে বল্লাল সেন যে বৈদ্য বংশীয় ছিলেন তা সমসাময়িক ইতিহাস থেকেও সহজেই অনুমান করা যায়। কেননা বল্লাল পিতা বিজয় সেনের বারাকপুর তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে, তিনি শূরবংশীয়া রাজকুমারী বিলাসদেবীকে বিবাহ করেন।[৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই শূরবংশ ওপরমান্দারের (বর্তমান হুগলী জেলার গড়-মান্দারণ) শূর। কৈবর্ত্য বিদ্রোহ দমনে রামপালকে যে সামন্তচক্র সাহায্য করেছিল এরা তাঁদেরই অন্যতম। যাইহোক প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অনেকসময়ই কূটনৈতিক কারণেও রাজাকে অসবর্ণ বিবাহ করতে হতো। কাজেই এই শূরবংশে বিবাহ থেকে কিভাবে প্রমাণিত হবে যে সেন বংশ বৈদ্য জাতীয় ছিলেন? এর উত্তরে বলা যায় যে, বল্লাল সেনের নৈহাটী তাম্রশাসনে বিলাসদেবীকে প্রধানা মহিষী ও রাজমাতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫] কাজেই তৎকালে কূটনৈতিক কারণে অসবর্ণ বিবাহ হলেও সেই মহিলার প্রধানা মহিষী ও রাজমাতা হওয়া সহজসাধ্য ছিল না। তাছাড়া শুধুমাত্র বল্লাল সেনের মাতা শূরবংশীয়া ছিলেন না - সদ্‌বৈদ্যকুলপঞ্জিকার লেখক জয়সেন ঠাকুরের কন্যা ছিলেন — লক্ষ্মণ সেনের পৌত্র/প্রপৌত্র কার্তিক সেনের প্রধানা মহিষী। অন্যদিকে বৈদ্যকুলপঞ্জিকাতে দেখা যায় যে, সেনবংশীয় রাজকুমারীগণেরও বৈদ্য পরিবারে বিবাহ হয়েছিল।

আবার উভয় 'বল্লালচরিত' গ্রন্থেই স্থান কাল সম্পর্কে প্রায় একই রকমের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আনন্দভট্ট তাঁর রচনাতে বল্লাল সেনের সমালোচনা করলেও

গোপাল ভট্টের ন্যায় সেন সাম্রাজ্য সম্পর্কে একই বর্ণনা দিয়েছেন। আসলে আনন্দ ভট্ট গোপাল ভট্ট রচিত গ্রন্থের পরিশিষ্ট রচনা কালে লিখেছেন যে, গোপাল ভট্ট রাজশিক্ষক হওয়ার জন্য স্তুতিমূলক রচনা করেছেন — তাই তিনি নিরপেক্ষ রচনার প্রয়োজনে গ্রন্থটি পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেছেন। তবে তিনিও বল্লাল সেনের রাজ্যের গোপাল ভট্টের ন্যায় — রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ি, বঙ্গ ও মিথিলা এই ৫টি ভাগের কথা লিখেছেন। আর 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থে বল্লাল সেনকে "গৌড়েন্দ্রকুঞ্জরলানস্তম্ভবাহুর্মহীপতিঃ" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে পাল রাজবংশের প্রায় সমস্ত অংশই যে বল্লাল সেনের অধিকারভুক্ত ছিল তা মেনে নিতে হয়। অন্যদিকে আনন্দ ভট্ট বল্লাল সেনকে 'চোড়গঙ্গসখ' বলে উল্লেখ করেছেন।[৬] আর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে বল্লাল সেনের আমলেই উড়িষ্যাতে কেশরী বংশের পর গঙ্গবংশীয়গণ ক্ষমতায় আসেন। চোড়গঙ্গ অনন্তবর্মণ বল্লাল সেনের সমসাময়িক ছিলেন। আবার মিথিলার উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বিজয় সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে নান্যরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের কথা বলা হয়েছে।[৭] এই নান্যকেই মিথিলার রাজা ধরা হয়। দেওপাড়া প্রশস্তিতে মিথিলা আক্রমণের কথা থাকলেও বিজয়ের কথা নেই। তাই মনে করা হয় যে, বল্লালসেনই মিথিলা বিজয় সম্পূর্ণ করেছিলেন। তাছাড়া বিহারের ভাগলপুর জেলার নিকটে সনোখার গ্রামে প্রাপ্ত অষ্টধাতু নির্মিত একটি সূর্যমূর্তির পাদদেশে উৎকীর্ণ লেখ থেকে জানা যায় যে, বল্লাল সেন বিহারের উপর নিজের আধিপত্য কায়েম করেছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা হল লক্ষ্মৌ পর্যন্ত ভূ-খন্ডের উপর লক্ষ্মণ সেনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর লক্ষ্মণ সেন যেহেতু বৃদ্ধ বয়সে রাজা হন — তাই খুব সম্ভবত বল্লাল সেনের রাজত্বকালেই সেনাপতি হিসাবে তিনি এই সকল অঞ্চল দখল করেন।

তবে আদিশূর কর্তৃক বঙ্গে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের যে কাহিনীটি 'বল্লালচরিত' গ্রন্থে পাওয়া যায় — তা খুব সম্ভবত চোল আমলের (তৃতীয় কুলোতুঙ্গ, ১১৭৮-১২১৬ খ্রিঃ) একখানি শিলালেখ অনুসারে বর্ণিত হয়েছে। লেখটিতে বলা হয়েছে যে একজন প্রাচীন চোল রাজা কান্যকুব্জ থেকে কয়েকজন ব্রাহ্মণ ও তাদের ভৃত্যকে এনে গ্রামদান করে বসতি স্থাপন করেন। সময়কাল বিচার করলে চোলরাজের অভিলেখর অনেক পরে কুলজী গ্রন্থগুলির সৃষ্টি 'বল্লালচরিত'-এর ন্যায় কুলজী গ্রন্থগুলিতেও এই কাহিনী পাওয়া যায় — যদিও আদিশূর নামক কোন রাজার অস্তিত্ব আজও প্রমাণিত হয়নি। কাজেই কৌলীন্য বিষয়ক আলোচনা এবং তার সাথে বল্লাল সেনের নাম যুক্ত করার ক্ষেত্রে সন্দেহাবকাশ থেকেই যায়। কিন্তু, উভয় 'বল্লালচরিত' নামক গ্রন্থে বল্লালসেন কর্তৃক সুবর্ণবণিকদের বর্ণগত অবনমন ও কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ের বর্ণগত মানোন্নয়নের যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে — তাতে

গোপাল ভট্ট যেখানে সুবর্ণবণিকদের ত্রুটির কথা তুলে ধরেছেন সেখানে আনন্দ ভট্ট তাঁর গ্রন্থে এর জন্য বল্লাল সেনকেই দায়ী করেছেন। এক্ষেত্রে ঘটনার কারণ সম্পর্কে উভয় গ্রন্থে অমিল থাকলেও সুবর্ণবণিক ও কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ের জন্য বল্লাল সেনের গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়টি সমকালীন ইতিহাসের নিরিখে ব্যাখ্যা করা যায়। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই যে, উভয় গ্রন্থেই সুবর্ণ বণিকদের সামাজিক মর্যাদা হ্রাসের ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও সমাজে নিম্নবর্গের বা বর্ণগতভাবে ব্রাত্য সম্প্রদায়ের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও কেন কেবলমাত্র কৈবর্ত্য সম্প্রদায়কেই বর্ণগত মর্যাদা প্রদান করা হল — তার কোন সদুত্তর 'বল্লালচরিত' গ্রন্থদ্বয়ে পাওয়া যায় না। আসলে পাল আমলের কৈবর্ত্য বিদ্রোহকে জাতিগত চেতনার বাইরে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বা যে কোন ভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন — সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর 'রামচরিত'-গ্রন্থে একে 'অনিকম ধর্ম বিপ্লবম্' বলে উল্লেখ করেছেন। এই ধর্ম অত্যাচারিতের প্রতিবাদের ধর্মও হতে পারে। কিন্তু একজন কৈবর্ত্য নায়ক দিব্য — যেভাবে দ্বিতীয় মহীপালকে ধরাশায়ী করেছিলেন এবং রামপাল পর্যন্ত কৈবর্ত্য নেতা রুদোক, ভীম ও সেনাপতি হরি যেভাবে কৈবর্ত্যকুলকে সংগঠিত করে পালরাজ্যকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল বাংলাদেশের পরবর্তীকালের রাজারা দীর্ঘকাল মনে রেখেছিলেন সন্দেহ নেই। আর বল্লাল সেনের মতো একজন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শাসক যে, এই কারণেই কৈবর্ত্যদের সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাছাড়া বাংলাদেশে যুদ্ধের প্রয়োজনে ক্ষত্রিয় সৈন্যের অভাব দূর করতেও কৈবর্ত্যদের প্রয়োজন ছিল। এক্ষেত্রে কৈবর্ত্যদের সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ ও বীরত্বের কাহিনী বল্লাল সেনকে প্রভাবিত করেছিল। কাজেই নিম্নবর্ণ হিসাবে পরিগণিত কৈবর্ত্যদের বর্ণগত মানোন্নয়ণ ঘটিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগদানের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। এতে পুনরায় কৈবর্ত্য বিদ্রোহের সম্ভাবনা অনেকটাই দূরীভূত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, বক্তিয়ার খলজীর দ্বিপ্রাহরিক আকস্মিক আক্রমণে বিপর্যস্ত বৃদ্ধ সেনরাজ লক্ষ্মণ সেন যখন সপরিবারে প্রাসাদ নিকটস্থ গঙ্গাঘাট থেকে নৌকাযোগে পূর্ববঙ্গে পলায়নে বাধ্য হন তখন নৌকাবাহী কৈবর্ত্যরাই তাঁকে নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিয়েছিল।

এইভাবে কোলীন্য প্রথার বাইরে যে দু-একটি ঘটনার কথা গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে কিছু ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। আসলে ইতিহাস নির্ভর কোন রচনার মধ্যে কিছুটা ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে থাকা খুব একটা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু এই গ্রন্থদ্বয়ের সাহিত্যগত ও ঐতিহাসিক মানের বিচারের দ্বারা গুরুত্ব নির্ণয় আবশ্যক। সাহিত্যগত মানের প্রসঙ্গে খুব সংক্ষেপে বলা যায় যে, গোপাল

ভট্ট বিরচিত ও আনন্দ ভট্ট কর্তৃক সংশোধিত ও সমাপ্তিকৃত বলে উল্লিখিত গ্রন্থটি নিকৃষ্টমানের। আর আনন্দ ভট্ট রচিত ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত 'বল্লালচরিত' গ্রন্থখানি তুলনায় কিঞ্চিৎ ভালো। তবে সেন আমলের উন্নত সাহিত্যচর্চার যুগে এ-হেন নিকৃষ্টমানের সাহিত্য কল্পনাতীত সন্দেহ নেই। অন্যদিকে ইতিহাসের কিছু ঘটনার সাথে যোগসূত্র থাকলেও ইতিহাস নির্মাণে গ্রন্থ দুখানি কোনভাবেই সাহায্য করে না। কেননা ১। গোপাল ভট্ট একাধারে বল্লাল সেনের গুরু এবং ১৩০০ শকাব্দে তিনি এ গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন যা পরস্পরবিরোধী। ২। 'বল্লালচরিত' নাম হলেও বল্লালের জীবনের একটিমাত্র ঘটনাই — গোপাল ভট্ট রিরচিত ও আনন্দ ভট্ট কর্তৃক পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত বলে প্রচলিত গ্রন্থে পাওয়া যায় যা তার মৃত্যু সম্পর্কিত। যদিও এ দুটি গ্রন্থেই মৃত্যু সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা অদ্যাবধি প্রাপ্ত তথ্যাদির বিরুদ্ধ। অন্যদিকে আনন্দ ভট্টের লেখা বলে পরিচিত গ্রন্থে মৃত্যুর বিষয়টি ছাড়াও একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে — তা হল চর্মকার কুলজা যুবতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে বৃদ্ধ বল্লাল সেন প্রেম নিবেদন করেন ও তাকে বিবাহ করেন। বিবাহ বিষয়ক এই তথ্যটির সত্যাসত্য প্রমাণের মতো তেমন কোন তথ্যই আমাদের হাতে নেই। তবে তৎকালে কালচক্রযান ও সহজযানের প্রভাব ও কৌলাচারের আবির্ভাবের ফলে বিশেষত হাড়ি, ডোম, মুচি প্রভৃতি নিম্নবর্গের রমনীতে আসক্তি হতেও পারে। আবার বৈদ্যকুলপঞ্জিকা পাঠে বোঝা যায় যে, লক্ষ্মণ সেন তাঁর পিতার বহু কার্যকেই শ্রদ্ধার অযোগ্য বলে মনে করতেন।

অন্যদিকে আবার গোপাল ভট্ট বিরচিত ও আনন্দ ভট্ট কর্তৃক সংশোধিত ও সমাপ্তিকৃত গ্রন্থের পরিশিষ্টে আনন্দ ভট্ট লিখেছেন যে, —

অসম্পূর্ণঞ্চ বল্লালচরিতং যত্তুবর্ণিতম্।
গোপাল ভট্টেন রাজদন্ডাশঙ্কিত চেতসা।
সেন বংশধরো রাজা বল্লালো নাম বিশ্রুতঃ।
সঙ্ক্ষেপেণ তদিদানীং চরিতং রচিতং ময়া।।

১/২ যুগ্মকম্, পৃঃ-৫৮।

"যে বল্লালচরিত রাজদন্ড ভয়ে গোপাল ভট্ট অসম্পূর্ণভাবে রচনা করেছেন, এক্ষণে আমি সেই সেনবংশীয় রাজা বল্লালের চরিত্র সংক্ষেপে রচনা করছি।" কিন্তু পরিশিষ্টে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলতে যে তথ্যটি পাওয়া যায় তা হল — নাথ য়োগীরা মূলত জন্মসূত্রে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ ও বল্লাল পূর্বকালে ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত কৃত্যাকৃত্য তাঁরা পালন করতেন এবং সমাজে ব্রাহ্মণ সুলভ মর্যাদা ও সুবিধা ভোগ

করতেন। কিন্তু বল্লাল ক্রোধাপন্ন হয়ে তাঁদের ঐ সমস্ত মর্যাদা ও সুবিধা ভোগ ও ব্রাহ্মণোচিত কৃত্যাদি পালনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন — (পৃঃ ৬০-৬১), কিন্তু প্রাক্ বল্লাল যুগের যোগীদের অধিকার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সে দাবীর বিপক্ষে বিশেষত পক্ষেও বলার মতো কোন ঐতিহাসিক তথ্যই পাওয়া যায় না। তবে আপাতভাবে মনে হয় যে, পরিশিষ্ট রচনার পিছনে নাথদের অধিকার বিষয়ক অভিযোগটি প্রচার করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য — পরিশিষ্ট নামক অংশ যুক্ত 'বল্লালচরিত' গ্রন্থখানি প্রকাশন বিষয়ে অনুবাদক পন্ডিত শশিভূষণ শর্মা জানিয়েছেন যে, হস্তলিখিত পুঁথিটি প্রকাশনার্থ অনুবাদের জন্য তাঁকে এনে দিয়েছিলেন - নাথবংশীয় জনৈক "এই গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু পদ্ম চন্দ্র নাথ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র কুমার নাথ মহাশয়।"- এর থেকে খুব সহজেই এই গ্রন্থের গুরুত্ব অনুমান করা যায়।।

সূত্রনির্দেশ

১। গোপালভট্ট রচিত ও আনন্দভট্ট কর্তৃক পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত *বল্লালচরিত* (অনুবাদক শ্রী শশিভূষণ শর্মা, ১২৯৬, কার্ত্তিক); উত্তর খন্ডম, শ্লোক নং-ঃ ১৬৪/১৬৫, পৃঃ ৫৭।

২। তদাজ্ঞয়া কৃতমিদং বল্লালচরিতং শুভম।। বৈদ্যবংশাবতংসোইয়ং বল্লালো নৃপপুঙ্গবঃ। গোপালভট্ট রচিত ও আনন্দভট্ট কর্তৃক পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত *বল্লালচরিত* (অনুবাদক শ্রী শশিভূষণ শর্মা, ১২৯৬, কার্ত্তিক,) উত্তরখণ্ডম, শ্লোক নং- ১৬৩, পৃঃ ৫৭।

৩। বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি, আই.বি. অর্থাৎ Ins. Beng.(italics) N.G. Majumder — বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটী, রাজশাহী, ১৯২৯; খন্ড-৩, শ্লোক নং ৫, পৃঃ ৪৬ এবং ৫০-৫১।

৪। বিজয়সেনের বারাকপুর তাম্রলেখ, আই.বি অর্থাৎ Ins Beng. (italics) N.G. Majumder — বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটী, রাজশাহী, ১৯২৯; খন্ড ৩, শ্লোক ৭, পৃঃ ৬২ এবং ৬৫, ই.আই অর্থাৎ ***এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা*** (Et. Ind.) খন্ড-১৫; পৃঃ ২৮৩ এবং ২৮৫।

৫। বল্লালসেনের নৈহাটী তাম্রলেখ, আই.বি. অর্থ্যাৎ Ins. Beng. (italics) N.G. Majumder — বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটী, রাজশাহী, ১৯২৯; খন্ড ৩, শ্লোক নং - ১০, পৃঃ ৭২ এবং ৭৭।

৬। আনন্দভট্ট বিরচিত ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত (১৯০৪ খ্রিঃ) ***বল্লালচরিত*** (অনুবাদক শ্রী শশিভূষণ শর্মা. ১২৯৬, কার্তিক) দ্বাদশ অধ্যায়, শ্লোক ৫২, পৃঃ ৬১।

৭। বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি, আই.বি. অর্থাৎ Ins. Beng. (italics) N.G. Majumder — বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটী, রাজশাহী, ১৯২৯; খন্ড-৩; শ্লোক- ২০-২২, পৃঃ ৪৮ এবং ৫৩-৫৪; ই.আই. অর্থাৎ এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা (Et. Ind.) খন্ড-১, পৃঃ ৩০৯ এবং ৩১৪।

প্রায়শ্চিত্ত ঃ একটি তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ধারণা

দুর্ব্বা আইন দাস

'দুইটি কোলের ছেলে গেছে পর-পর
বয়স না হতে হতে পূরা দু বছর।
এবার ছেলেটি তার জন্মিল যখন
স্বামীরেও হারালো মল্লিকা। বন্ধুজন
বুঝাইল, পূর্বজন্মে ছিল বহু পাপ,
এ জনমে তাই হেন দারুণ সন্তাপ।
শোকানলদগ্ধ নারী একান্ত বিনয়ে
অজ্ঞাত জন্মের পাপ শিরে বহি লয়ে
প্রায়শ্চিত্তে দিল মন।'[১]

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' কবিতার এই নারী এরপর কি কি ভাবে প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা করেন ও তার ফল কি হয় তা অনেকেরই জানা। প্রায়শ্চিত্তের এই ধারণা যে বর্তমানেও একেবারে অনুপস্থিত তা নয়। প্রায়শ্চিত্ত শব্দের অর্থ 'পাপস্খালনের জন্য পালনীয় কর্ম'।[২] বৈদিক যুগ থেকেই এই ধারণার উল্লেখ পাওয়া গেলেও আদি-মধ্যযুগে তা প্রাবল্য পায়।

বেদে অগ্নি ও জলের পরিশুদ্ধিকরণের শক্তির কথা আভাষিত হয়েছে।[৩] একথাও বলা হয়েছে যে বরুণ অপরাধীকে জালে বন্দি করে শাস্তি দেন। আবার অপরাধীকে মুক্তি দিতে তিনিই পারেন। তবে তাঁর এই ক্ষমতা পুরোটাই ঐন্দ্রজালিক এবং অনিচ্ছাকৃত অপরাধও এই ক্ষমতার অন্তর্গত।[৪] তবে বেদে স্বীকারোক্তির তেমন কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না,[৫] ব্রাহ্মণ্যসাহিত্যে যজ্ঞস্থলে স্বীকারোক্তির প্রচলন ছিল এমন উদাহরণ আছে। এই প্রসঙ্গে 'বরুণপ্রঘাস' যজ্ঞের কথা উল্লেখ্য।[৬] এই যজ্ঞে নারীকে তার বিবাহ বহির্ভূত প্রেমের কথা স্বীকার করতে হত সর্বসমক্ষে। উপনিষদের 'কর্ম' ধারণাটির মধ্যে কিছু শিথিলতা আসে প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বের দ্বারা। কোন কর্মের বিচ্যুতি ঘটলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই অপরাধ হ্রাস পেত।

সূত্র সাহিত্য থেকেও এ ব্যাপারে বিস্তৃত ধারণা পাওয়া যায়। গৌতম ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে যে প্রায়শ্চিত্তের পাঁচটি উপায় আছে - মনে মনে বেদোচ্চারণ, কৃচ্ছ্রসাধন, অগ্নিতে আত্মাহুতি, উপবাস এবং দক্ষিণাপ্রদান (দান)।[৭] কিন্তু শূদ্র ও প্রতিলোমদের পক্ষে বেদোচ্চারণ সম্ভব ছিল না। তাই ক্রমশ বিশেষত পুরাণের লেখকেরা একথা মনে করেছেন যে সকল প্রায়শ্চিত্তের শ্রেষ্ঠ উপায় হল 'কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ। কোন ব্যক্তি যদি সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা ও রাত্রে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেন তাহলে তাঁর সর্বপাপক্ষয় হয়। এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই নরঘাতক দস্যু রত্নাকরের রামনাম জপের ফলে বাল্মিকীতে উত্তরণের কথা মনে পড়ে যায়। এছাড়া তীর্থযাত্রা ও প্রাণায়ামের দ্বারাও পাপের ক্ষয় হয়।[৮] জনসমক্ষে দেওয়া স্বীকারোক্তিতে - পাপের ক্ষয় হয় বলে বিশ্বাস ছিলো। তাই দেখা যায় ব্রাহ্মণ হত্যা করলে বা স্ত্রীকে ত্যাগ করলে তা জনসমক্ষে স্বীকার করতে হত। অনুতাপের দ্বারাও প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হত বলে বিশ্বাস ছিল। তাই বলা হয়েছে কেউ যদি অনুতপ্ত হয়ে অপরাধটি পুনর্বার না করার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলেই তার পাপের ক্ষয় হয়।[৯]

স্বাভাবিকভাবেই এর সাথে যুক্ত ছিল বিভন্ন ধরণের পাপের ধারণাটি। সূত্র সাহিত্যকারগণ প্রকৃতি ও গুরুত্ব অনুযায়ী পাপের প্রকারভেদ করেছেন ও সেই অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়েছেন। তবে তাঁরা যে সর্বদাই এ বিষয়ে একমত, তা নয়। তাঁদের মধ্যে মতদ্বৈধতা আছে।[১০]

আদি-মধ্যযুগ থেকে (৭০০-১২০০ খ্রিঃ) প্রায়শ্চিত্ত ধারণাটি অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে এবং একটি সামাজিক উপাদানে পরিণত হয়। পরবর্তীকালেও এর অস্তিত্ব বজায় থাকে। এমনকি আধুনিকযুগেও বিভিন্ন অপরাধ যা 'পাপ' বলে পরিগণিত হয় তা দূর করার জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান পাওয়া যায়। যেমন সমুদ্রযাত্রা বা কালাপানি পার হবার জন্য 'প্রায়শ্চিত্ত' করার অনেক উদাহরণ আছে। সিপাহী বিদ্রোহের পিছনেও এর একটি প্রভাব আছে। মণীষীদের জীবনীর দিকে তাকালেও এর উদাহরণ পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে বলি যে, 'বিলেতে তিনবছর ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। সেকালে সামাজিক গোঁড়ামি এমন ছিল যে কেউ বিলেত গেলে তাকে ম্লেচ্ছ দেশে যাবার অপরাধে ফিরে এসে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। দ্বিজেন্দ্রলাল সমাজপতিদের এই ব্যবস্থা মানতে রাজী না হওয়ায় তাঁকে যথেষ্ট সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। তাঁর এই সময়কার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পায় তাঁর একঘরে পুস্তকে।'[১১]

বর্তমানেও প্রায়শ্চিত্তের প্রতি বিশ্বাস অটুট আছে। তাই এখনও অনেক মৃত্যুপথযাত্রীকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তার যাত্রার পথ সুগম করা হয়।

প্রায়শ্চিত্তের ধারণা পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের সাথেই যুক্ত। তবে ব্রাহ্মণ্য ধারণার সঙ্গে তা চরিত্রগতভাবে পৃথক। অন্যত্র তা প্রধানত পবিত্রতা অপবিত্রতা ধারণার সাথে

সম্পৃক্ত। সেখানে প্রায়শ্চিত্ত একটি পথ-অপবিত্রতা দূরীকরণের। বিভিন্ন শারীরিক প্রক্রিয়া, জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুজনিত দূষণ এবং পবিত্র জীবনধারণ থেকে বিচ্যুতিজনিত অপবিত্রতা দূরীকরণের জন্য কিছু পালনীয় কর্মের নির্দেশ আছে যার অন্যতম, আগেই বলা হয়েছে, প্রায়শ্চিত্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইহুদীদের মধ্যে খাদ্যতালিকার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়; এস্কিমোদের বিশ্বাস অসুস্থতার কারণ হল কিছু 'ট্যাবু' না মানা, ভারতীয়দের মধ্যে প্রচলিত - বসন্ত রোগের উপশমের জন্য দেবী শীতলার সন্তুষ্টিবিধান ইত্যাদি।[১২] বলা বাহুল্য, 'প্রায়শ্চিত্ত' বলতে যে ধারণা পাওয়া যায় এগুলি তার থেকে স্বতন্ত্র। অন্যান্যধর্মে শারীরিক, প্রাকৃতিক, সামাজিক - সকল বিষয়ের মধ্যে পবিত্রতা-অপবিত্রতা সন্ধান করা হয়েছে, ভারতীয় প্রায়শ্চিত্তের ধারণায় ব্যক্তিগত অন্যায়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং সেই পাপক্ষয়ের জন্য প্রয়োজন প্রায়শ্চিত্ত - একথা বলা হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, ব্রাহ্মণ্যধর্মে এই ক্ষেত্রে ব্যক্তির উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও অন্যান্যধর্মে সম্ভবত সমষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে বলা যেতেই পারে যে কখনও কখনও পার্থক্যের সীমারেখা খুবই সূক্ষ্ম বলে প্রতিভাত হয়।

সুতরাং বলা যেতেই পারে, এটি এমন একটি ধারণা যার সাথে জড়িত আছে সামাজিক - ধর্মীয় - আধ্যাত্মিক ও মানসিক দিক। এই বিষয়টি ইতিহাসচর্চার একটি পদ্ধতিগত দিককে নির্দেশ করে। ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ নিয়ম - রীতির বিচ্যুতিকে কিছুটা হ্রাস করার প্রয়াস প্রায়শ্চিত্ত। তথাকথিত সনাতন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা যে ধরাবাঁধা নিয়মে চলত তার বিচ্যুতি সামাল দেওয়ার ব্যবস্থাও সেই সমাজেই করা ছিল। এর থেকে সমাজের গতিশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার একইসাথে ধারাবাহিকতার প্রমাণও দেয়।

সূত্রনির্দেশ

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঞ্চয়িতা*, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৫৩ (পুনঃমুদ্রণ ১৩৬২) বিশ্বভারতী, ৩৫৩।

২। রাজশেখর বসু, *চলন্তিকা*, ত্রয়োদশ সংস্করণ, ১৩৮৯ (নূতন মুদ্রণ) কলকাতা, ১৮০৫।

৩। রমেশচন্দ্র দত্ত, *ঋগ্বেদ সংহিতা*, প্রথম খন্ড (২/২৮/১১), কলকাতা, ১৯৭৬, ১৯৯৩ (পুনঃমুদ্রণ), ৩৭০-৩৭১।

৪। *তদেব*, ৭/৮৬/৮, ৭/৮৯/৭, ৭/৮১/১, পৃঃ ১৮৩-১৮৬ (দ্বিতীয় খন্ড)।

৫। বিজনবিহারী গোস্বামী, *অথর্ব বেদ*, ৪/৬/১, কলকাতা ১৯৭৮, ১৯৯২ (পুনঃমুদ্রণ), ১১৪।

৬। পি ভি কানে, *হিস্ট্রি অব ধর্মশাস্ত্র*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, দ্বিতীয় খন্ড, ১৯৭৪, ৫৭৫-৫৭৬।

৭। *তদেব*, চতুর্থ খন্ড, ৪৪-৫২।

৮। *তদেব*, চতুর্থ খন্ড, ৪২, ৫৫-৫৬, ৫৫২-৫৮০।

৯। মথুরানাথ তর্করত্ন, *মনুসংহিতা*, কলকাতা, ১৯৩১, ২/২২৭, ২/২৩০।

১০। উমেশচন্দ্র পান্ডেয়, *দি বৌধায়ণ ধর্মসূত্র উইথ দি কমেন্টারি বাই গোবিন্দস্বামী*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বারাণসী, ১৯৭৪।

১১। নচিকেতা ঘোষ, *নির্বাচিত জীবনী সমগ্র*, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, ৪৮।

১২। এম এলিয়েড, *দি এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন*, দ্বাদশ খন্ড, নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৭, ৯১-৯৯।

সারাংশ

চোল যুগের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা (৮৫০-১৩১০ খ্রিঃ) একটি আলোচনা।

তপন কুমার মন্ডল

ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। এই সাম্রাজ্যগুলির বেশির ভাগ ছিল স্বাধীন এবং সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন বৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। আর এই সকল বৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অধীনস্ত ক্ষুদ্র ও সর্বনিম্ন একক হচ্ছে 'গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন'। স্বায়ত্ত শাসন বলতে স্ব-শাসন বা নিজেদের শাসনকে বোঝায়। প্রত্যেক দেশেই জেলা, মহকুমা, গ্রাম প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল থাকে। স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা এই সমস্ত অঞ্চলের শাসন কার্য পরিচালনার ব্যবস্থাকে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বলে। অর্থাৎ স্থানীয় মানুষের দ্বারা আঞ্চলিক বা গ্রামীণ শাসন পরিচালনা। প্রাচীন ভারতে সভা, সমিতি, পঞ্চায়েত প্রভৃতি বিভিন্ন উন্নত স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠান ছিল। সুদূর দক্ষিণ ভারতে তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত চোল সাম্রাজ্যেও এক অসাধারণ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

চোল সাম্রাজের বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের ইতিহাসে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। চোল রাজারা যুগ পরিবেশের প্রভাবে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু শাসন ব্যবস্থায় কঠোর স্বৈরতন্ত্র কায়েম করেননি। চোল রাজাগণ নিজেদের শাসন ব্যবস্থাকে উদার নৈতিক রাজতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। আর এই উদার নৈতিক রাজতন্ত্রের অধীনে চোল সাম্রাজ্যের সর্বত্র এক অসাধারণ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল।

চোল সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তি ছিল গ্রাম। প্রায় ৪৫০ বছর ধরে সুদূর দক্ষিণ ভারতে গ্রাম কেন্দ্রিক সভ্যতা টিকে ছিল। দক্ষিণ ভারতে চোল বংশের সমসাময়িক বা তাদের রাজত্বের পূর্বে অন্য কোন রাজ বংশের রাজত্ব কালে গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, দক্ষিণ ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার প্রথম প্রবর্তক ছিলেন চোল রাজাগণ। বিশেষ করে শ্রেষ্ঠ চোল শাসকদের অন্যতম ছিলেন প্রথম পরান্তক। তিনিই ৯০৭ খ্রিস্টাব্দে চোল সিংহাসনে আরোহন করবার পর গ্রামাঞ্চল স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তন করেন।

তাঁরপর প্রথম রাজরাজ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নেন। তাঁর গৃহীত ব্যবস্থা দীর্ঘকাল যাবৎ অক্ষুন্ন ছিল। এমনকি চোল সাম্রাজ্যের সিংহাসনে রাজার পরিবর্তন ঘটলেও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন হত

না। সরকারী কর্মচারীরা গ্রামীণ শাসনের ব্যাপারে কখনো হস্তক্ষেপ করতেন না। নামে মাত্র পরামর্শ দাতার ভূমিকা পালন করতেন।

চোল সাম্রাজ্যকে শাসনের সুবিধার জন্য কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হত। যথাঃ- মন্ডলম - কোট্রাম - নাড়ু - কুররম - উর এবং সর্বনিম্নে ছিল কুড়ুম্বু বা পাড়া। কুররম বা মহা সভা এবং উর বা গ্রাম সভা ছিল সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠান।

উর বা গ্রাম সভা যখন কোন বিশেষ ব্যাপারে আলোচনা সভার আয়োজন করত তখন গ্রামের ভূমিহীন কৃষক ব্যতীত অন্য সকলকে ড্রাম বাজিয়ে জানিয়ে দিত সভায় উপস্থিত হবার জন্য। ব্রাহ্মণদের বসতির আধিক্য ছিল যে গ্রামে সেই গ্রাম সংগঠনের নাম ছিল 'সভা'। আর 'নগরম' ছিল আধা গ্রাম ও আধা শহরের বণিক সভা। যা হোক, প্রত্যেকটি গ্রাম সভার নিজস্ব পৃথক সংবিধান নিজেরাই রচনা করতেন।

গ্রাম সভার গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল গ্রামসভার কর্মকর্তা নির্বাচন করা। এই উদ্দেশ্যে কোন একটা মন্দির প্রাঙ্গনে বা কোন হল ঘরে বা গাছের ছায়ায় সমবেত হতেন। মৌখিক আলোচনার ভিত্তিতে প্রত্যেক কুড়ুম্ব থেকে ১ জন করে সদস্য নির্বাচিত হতেন। উর, সভা ও নগরম তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব সরকারের বিনা হস্তক্ষেপে পালন করত।

উর বা গ্রাম সভার উর্ধে ছিল কুররম বা মহা সভা। এর সদস্য মনোনয়নের কাজ হত প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। এরপর একাধিক মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে থেকে একজন সদস্য নির্বাচন করা হত লটারির মাধ্যমে। তৎকালীন যুগে লটারি ছিল এক বিশেষ নির্বাচনী প্রক্রিয়া। চোল রাজাদের রাজত্বকালে এই ব্যবস্থাকে যথেষ্ট নিরপেক্ষ ও সর্বসম্মত বলে ভাবা হত। যা হোক এ ব্যাপারে বর্তমান কালের ন্যায় প্রার্থীর পক্ষে কোন রকম রাজনৈতিক প্রচার করার প্রয়োজন হত না।

নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে মহাসভা গঠিত হত। এছাড়া কয়েকটি সমিতি ও উপসমিতি গঠন করা হত। মহাসভা উপসমিতিগুলির মাধ্যমে তার কাজগুলি পরিচালনা করত।

দুই বা ততোধিক কুররম বা মহাসভার মধ্যে যদি কখনো কোন ব্যাপারে বিরোধ দেখা দিত তবে বিরোধ মীমাংসার জন্য কেন্দ্র সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা হত।

যা হোক, চোল সাম্রাজ্যে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন ছিল একটি বাস্তবচিত জনকল্যাণকর পদক্ষেপ। বলা যায় যে, চোল শাসন কার্যের পরিধির এক ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। বস্তুত চোল রাজতন্ত্র ব্যাপক গণতান্ত্রিক সংগঠনের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিল। তথাপি চোল রাজাগণ স্বায়ত্ত শাসনের নীতিকে উৎসাহিত করেছিলেন। কারণ এর ফলে কেন্দ্রীয় শাসনের ভার বা দায় অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল।

হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন

জিনবোধি ভিক্ষু

হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনের দীর্ঘ পরিক্রমায় এতই তত্ত্ব ও তথ্য সংযোজিত হয়েছে যে, এই উভয় দর্শন বিস্তৃত ও বিপুলাকার। হিন্দু ধর্মের প্রেক্ষাপটে মানবের আদিম ও মুখ্য প্রবৃত্তি হল জন্মমৃত্যুচক্র ভেদ করে মোক্ষলাভার্থ উপায়গুলি জীবনচর্যার সাথে সম্পৃক্ত করা। মোক্ষ অর্থ ভগবৎ প্রাপ্তি। যা হতে জীবের উদ্ভব, সেই পরাব্রহ্ম বা পরমাত্মার সাথে বিলীন হওয়াই ভগবৎ প্রাপ্তি বা মোক্ষ। তাই হিন্দু ধর্মকে ভগবৎ ধর্ম বা ঈশ্বরবাদী ধর্ম বলা হয়। যে জীবগণ আপন কৃতকর্মের দ্বারা পরাব্রহ্ম বা ব্রহ্ম নির্বাণে বিলীন হতে অক্ষম, তাদের এই জন্মমৃত্যুচক্রে আরম্ভ হতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করতে হয়। ব্রহ্ম নির্বাণে বিলীন হওয়ার জন্য যে সকল উপায় বা পন্থা অবলম্বন করে জীব ও জগত সম্বন্ধে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, সেইগুলি হিন্দু দর্শন ও হিন্দু শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। বৈদিক যুগে মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় যাগযজ্ঞাদি কর্ম প্রধান ধর্মে নিহিত ছিল। কর্মকে বন্ধন হিসাবে চিহ্নিত করে অনেকে ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরতত্ত্বে মনোনিবেশ করে আরণ্যক ও উপনিষদ রচনা করে জ্ঞানযোগে মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় বলে প্রচার করতে লাগলেন। তাই আরণ্যক ও উপনিষদকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়। এদিকে পৌরাণিক যুগে ভগবানের প্রতি অবিচল ভক্তি প্রদর্শন করে ভগবৎ প্রাপ্তির বা মোক্ষ লাভের সহজ উপায় হিসাবে ভক্তিবাদের সৃষ্টি হলো। হিন্দু ধর্মের মুল আদর্শ ঈশ্বরবাদ হলেও ভারতীয় দর্শনে নিরীশ্বরবাদীরা ষড়দর্শনসহ মক্ষলী গোসাল, অজিত কেশকম্বলী, নিগণ্ঠনাথপুত্র, সঞ্জয় বেলটিপুত্র, প্রকুধ কাত্যায়ন প্রভৃতি ছয়জন বিভিন্ন প্রকার দার্শনিক মতবাদ প্রবর্তন করে হিন্দু দর্শনের কলেবর সমৃদ্ধি করেছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম দর্শনের পরম ও চরম লক্ষ্য হলো ভবচক্রের জন্মজরা-ব্যাধি-মৃত্যু সমুদয় দুখের কারণ কাম-ভব-বিভব এই ত্রিবিধ তৃষ্ণার ক্ষয় সাধন করে সর্ব তৃষ্ণা বিমুক্ত নির্বাণ লাভ করা। বুদ্ধ তার অতীত জন্মে সুমেধ নামে জনৈক ব্যক্তি সাধারণ অবস্থায় চিন্তা করেছিলেন - "*দুক্খো পুনবভবো নাম সরীরসস চ ভেদনং*" অর্থাৎ পুনরুৎপত্তি ও শরীর ভেদ বা মরণ দুঃখজনক। যে মার্গের দ্বারা নির্বাণ লাভ হবে, তা আছে ও থাকবে। কোন কারণে তা না থাকতে পারে না। তখন থেকে নির্বাণ প্রাপ্তির যে বুদ্ধ জন্মান্তরব্যাপী পথ অবলম্বন করে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই পথের জীবন চর্যাই বৌদ্ধ দর্শন। এই পথে বুদ্ধ দু'টো সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। যথা (১) ব্যবহারিক সত্য বা সম্মতি সত্য এবং (২) তিনি পরমার্থ সত্য। জাগতিক সকল বস্তুর আপেক্ষিক অস্তিত্ব হলো ব্যবহারিক সত্য। যথা - সত্ত্ব, জীব, বৃক্ষফলাদি। বৌদ্ধমতে এই জাগতিক সত্যের বিষয়বস্তুগুলি কার্যকারণ সম্ভূত অর্থাৎ প্রতীত্যসমুৎপন্ন। কারণের পরিণতিতে

কর্ম সৃষ্টি হয়। কারণের অভাবে বস্তুর অনুপস্থিতি। এই কার্যকারণে কোন অদৃশ্য ব্যক্তি বা শক্তির প্রভাব নেই। এই সৃষ্টি প্রলয়ে ঈশ্বর বা কোন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন হয় না। কার্যকারণের পরিণতিতে ঘটনা প্রবাহ অবিরাম চলছে এবং চলবে। কারণ সম্ভূত কার্য মাত্রেই পরিবর্তনশীল। বহুবিধ হেতু ও প্রত্যয় সহযোগে জীব জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যুবরণ করে। এই পরিবর্তনশীল অবস্থা মাত্রই অনিত্য। অনিত্যতাই দুঃখ। দুঃখের ভোক্তা হলো জীব। জীব বলতে বৌদ্ধধর্মে নামরূপ অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান প্রভৃতি পঞ্চোপাদান স্কন্ধের সমাহার বুঝায়। এই পঞ্চস্কন্ধ বিভাজন করে বিশ্লেষণ করা হলে কোন বস্তুর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই দুঃখ ভোক্তার অস্তিত্ব নেই অর্থাৎ অনাত্মা। তাই অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মার ভিত্তিতে বৌদ্ধ দর্শনের ঘটনা প্রবাহ প্রকৃত মৌলিক এবং প্রাথমিক গুণাবলীর মধ্যে নিহিত। এই সত্য হলো পরমার্থ। পরমার্থ সত্যের বিষয় হলো চিত্ত, চৈতসিক, রূপ, নির্বাণ, স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি। এইগুলি বৌদ্ধ দর্শনের মূল বিষয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনের সম্যক্ আলোচনাই বর্তমান "অভিসন্দর্ভের" বিষয়।

মাহিসন্তোষ ঃ একটি মূল্যায়ন

আরেফিনা বেগম

সমৃদ্ধশালী জনপদ ও প্রশাসনিক গুরুত্বের জন্য বরেন্দ্র অঞ্চলে অবস্থিত 'মাহিসন্তোষ' প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগ থেকে আরম্ভ করে মোগল শাসন পর্যন্ত ঐতিহাসিক গুরুত্ব হিসেবে স্বীকৃত। বহু প্রাচীন কাল থেকেই এখানে গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা।

ত্রয়োদশ শতকের[১] শুরুতেই ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী প্রাচীন বরেন্দ্র ভূমিতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। বরেন্দ্র ভূমির যে অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তার কেন্দ্রস্থলে[২] অবস্থিত বর্তমান নওগাঁ জেলার ধামইরহাট থানার অন্তর্গত চৌঘাট মৌজাস্থ মাহিসন্তোষ। এর অবস্থান সদর থানার ১৩ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে আত্রাই নদীর পূর্ববর্তী অঞ্চলে। ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে বর্তমান নওগাঁ জেলার উত্তরাংশ (ধামইরহাট) পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অধীনস্থ ছিল। পরবর্তীতে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ধামইরহাট থানাকে বৃহত্তর রাজশাহীর সাথে সংযুক্ত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী নওগাঁ ১৯৮৪ সালে একটি জেলা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

'মাহিসন্তোষ' স্থানটির নামকরণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মাহিসন্তোষ বা মাহিনগর[৩] নামটি পাল বংশের শাসক মহীপাল দেবের সাথে সম্পর্কিত। ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রের লেখনীতে জানা যায়, কম্বো-জান্ধারাজ গৌড়পতির কবল হতে বরেন্দ্র উদ্ধারের পর মহীপালের বৈরাগ্য দেখা দেয় এবং অশোকের ন্যায় তিনিও যুদ্ধ বিগ্রহ পরিত্যাগ করে পরহিতকর কাজে জীবন উৎসর্গ করেন।[৪] গৌড়পতির নিকট হতে উদ্ধারকৃত বরেন্দ্রতে 'মাহিসন্তোষ' নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন।[৫] ষোড়শ শতকে শাহ্ ইসমাইল গাজীর কাহিনী অবলম্বন রচিত '*রিসালাত-ইস-সুহাদা*' নামক গ্রন্থে 'সন্তোষ' নামটি পাওয়া যায়।[৬] আবার মুসলিম আমলে সংস্কৃত শব্দ 'মহী' এবং ফারসী 'গঞ্জ' শব্দের সমন্বয়ে এই নামকরণ করা হয় বলে অনেকে মনে করেন। কারণ মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর তুর্কী ও ফারসী ভাষার ব্যবহার প্রচলিত হয়। গঞ্জ শব্দটি নদী তীরে ব্যবসা ও বাণিজ্যের কেন্দ্র বোঝায় এবং এসময় আত্রাই নদীর মাধ্যমে গৌড়ের সাথে এবং পাল ও সেন আমলে এই গঞ্জের সাথে দক্ষিণ বঙ্গের যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায়।[৭]

আবার অনেকের মতে 'মায়ি' (মাই বা মা) শব্দের অপভ্রংশ মাহী (একজন মহিলা পীরের সাথে সম্পর্কিত) শব্দের সাথে গঞ্জ শব্দ সংযুক্ত করা হয়েছে। এর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই বলে মনে হয়। মিনহায-ই-সিরাজের *তবকাত-ই-নাসিরী* গ্রন্থে প্রাপ্ত

তথ্য থেকে জানা যায়, ইখতিয়ার-উদ্-দীন মোহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার খলজীর মৃত্যুর পর তার মাসেদা সন্তোষের[৮] শাসক শিরণ খলজী দেবকোটের সিংহাসন অধিকার করলে (১২০৭-১২০৮) দিল্লীর শাসক কুতব-উদ্দিন আইবক এর সেনাপতি কায়েমাজ রুমীর সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মাসেদা সন্তোষে[৯] আশ্রয় নেন এবং খলজী আমীরদের সাথে অন্তদ্বন্দ্বে নিহত হন।[১০] তার কবর এখানে আছে।[১১] এই সময় থেকেই মাহিসন্তোষ প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব লাভ করে[১২] এখান থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য এই স্থানে সামরিক শক্তি জোরদার করা হয়। কিন্তু গ্রন্থ রচনার সময়কালে এই স্থানের নাম সন্তোষ ছিল, মাহিসন্তোষ নয়। মুসলিম অধিকারের পূর্বেই এই নাম ছিল।[১৩] সেন যুগেও এই স্থানটি 'সন্তোষ' নামে পরিচিত ছিল।[১৪] ইখতিয়ার-উদ্-দীন মোহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বিভক্ত ইকতা[১৫] এবং *তবকাত-ই-নাসিরীতে* বর্ণিত 'মরুসিদাহ্' ও সন্তোষ উক্ত মাহিসন্তোষের সাথে অভিন্ন মনে করা হয়।[১৬] *তবকাত-ই-নাসিরী*[১৭] এর 'মাসেদা সন্তোষ' (Masidah Santush), *তবকাত-ই-আকবরীর*[১৮] সন্তোষ এবং সূফী মাকতুবাত[১৯] সাহিত্যের 'মাহিসন' অভিন্ন স্থান। আধুনিক পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও মাসিদা সন্তোষকে রাজশাহী জেলার মাহিসন্তোষ হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে।[২০]

কিংবদন্তী অনুযায়ী জনৈক সাধু মাছের পিঠে করে এই স্থানে আসেন। তাই এলাকাটি 'মাহি (মাছ) সন্তোষ নামে পরিচিত।[২১] তবে স্থানীয় জনগণ স্থানটির নাম 'মাইগঞ্জও' ব্যবহার করে থাকে।

বাংলার দুশো বছরের (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিঃ) স্বাধীন আমলের পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের আল-ফাজিল-ওয়া আল-কামিল সুলতান রুকনউদ্দিন বরবক শাহ্র শাসনকালে (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রিঃ) মাহিসন্তোষ ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ নগর হয়ে *ওঠে* এবং সুলতানের নামকরণ হয় 'বারবকাবাদ'। ১৪৭১ খ্রিঃ মাহিসন্তোষে প্রাপ্ত শিলালিপিতে 'বারবকাবাদ' নামের সমর্থন পাওয়া যায়।[২২] আশরাফ খান[২৩] বারবকাবাদ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। লিপিতে 'মাকান' শব্দ উল্লেখ থাকায় বারবকাবাদকে আবাসস্থল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[২৪]

বারবকাবাদ ২৪° থেকে ২৫°-১৫'' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮'' থেকে ৮৯°-১০'' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত এবং এর আয়তন প্রায় ৪১০০ বর্গমাইল। এর উত্তরে পাঞ্জায়া, পূর্বে ঘোড়াঘাট, দক্ষিণে মাহমুদাবাদ এবং পশ্চিমে লাক্ষ্ণৌতি।[২৫] দক্ষিণে পদ্মা নদী এবং প্রায় মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত আত্রাই নদী এই শহরকে সমৃদ্ধ করেছে।

আইন-ই-আকবরী, (২য় খণ্ড), ***রিয়াজ-উস-সালাতিন***, হেনরী ব্লকম্যান, জন বীমস এবং ইরফান হাবিবের বিবরণে এবং টোডরমলের প্রশাসনিক বিভক্তিতে মাহিসন্তোষের অবস্থান ও সীমানা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।[২৬] জন বীমস ও ইরফান হাবিব ***আইন-ই-আকবরী*** অনুসারে সুবাবাংলার ১৯ সরকার ও কিছু মহলের নকশার নমুনার প্রেক্ষিতে

মাহিসন্তোষকে একটি সুরক্ষিত শহর হিসেবে অনুমান করেন। অক্ষয় কুমার মৈত্র ১৯১৩ সালে এই স্থান পরিদর্শনকালে 'মাহিসন্তোষকে' সুলতানী আমলের একটি উন্নত শহর হিসেবে অনুমান করেন। এখানে হিন্দু যুগের প্রাপ্ত প্রত্ন সম্পদ সূত্রে স্থানটিকে সে যুগের কোন সঙ্ঘারাম বা জয়স্কন্ধাবার নগর (প্রশাসনিক কেন্দ্র) বলে অনুমান করা হয়।[২৭] সুলতানী আমলের প্রাপ্ত মুদ্রায় উৎকীর্ণ বারবকাবাদ টাঁকশালের নাম থেকে এই অঞ্চলকে 'টাঁকশাল শহর' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[২৮] সুলতান রুকনউদ্দিন বারবাক শাহ্ এই টাঁকশালের প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তী সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ এবং মুজাফফর শাহ্ (১৪৯১-১৪৯৩ খ্রিঃ) এবং হোসেন শাহী বংশের সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরত শাহ্ (১৫১৯-১৫৩২ খ্রিঃ) এর মুদ্রিত মুদ্রা[২৯] এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বাক্ষর বহন করে।

ওয়েস্টমেকট (V. Westmecot) এর উদ্ধৃতি দিয়ে মেহরাব আলী বলেন খলজী বংশীয় সুলতানদের আমলেই এই অঞ্চল তৎকালীন বাংলার অন্যতম টাঁকশাল শহর হিসেবে পরিচিত ছিল।[৩০] কিন্তু অন্য কোন সূত্রে এই মতের সমর্থনে পাওয়া যায় না।

বারবকাবাদ টাঁকশালকে মাহিসন্তোষের সাথে অভিন্ন বলে মনে করা যায়।[৩১] ১৫৮০ খ্রিঃ সম্রাট আকবর টোডরমলকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন।[৩২] ১৫৮২ খ্রিঃ টোডরমল রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুবা বাংলাকে (বিজিত অঞ্চল) ১৯ সরকার এবং ৬৮৮ মহলে রাজস্ব মহলে বিভক্ত করে।[৩৩] এসময় 'মাহিসন্তোষ' সরকারের কেন্দ্রীয় শহর ছিল।[৩৪] 'মাহিসন্তোষের মহল সংখ্যা ছিল ৩৮ এবং এর রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,৭৪,৫১,৫৩২ দাম।[৩৫] এর সামরিক শক্তি ছিল ৫০ অশ্বারোহী এবং ৭০০০ পদাতিক বাহিনী।[৩৬]

পরবর্তী সুবাদার মুর্শিদ কুলি খান পূর্ববর্তী বিন্যাসের পুনর্গঠন করে ১৭২২ সালে সুবা বাংলাকে ১৩ চাকলা এবং ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত করেন।[৩৭] মুর্শিদ কুলি খান এরপর সুজা খান (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রিঃ) বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা একটি যুক্ত শাসনে পরিণত হয়। এই প্রশাসনিক বিন্যাসের ফলে মাহিসন্তোষের কয়েকটি মহল ঘোড়াঘাট চাকলাভুক্ত হয় এবং অবশিষ্ট দক্ষিণ মহলগুলি মুর্শিদাবাদ চাকলাভুক্ত হয়।[৩৮] মূলত এই সময় হতেই মাহিসন্তোষ বা বারবকাবাদ অঞ্চল প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। শাহ্ শুয়াইব রচিত *মানাকিব-আল-আসাকিয়া* থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাহিসন্তোষ উচ্চ শিক্ষার একটি কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল। বাংলার বাইরে থেকেও শিক্ষার্থীরা এখানে এসে ইসলামের বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন করে।[৩৯]

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইকতা মাহিসন্তোষে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মওলানা তাকী উদ্দিন আল আরাবী এর অধ্যক্ষ ছিলেন।[৪০] তিনি মারাফত তত্ত্বে হাক্কানী আলীম। এই মাদ্রাসা ঐ অঞ্চলের ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।[৪১]

মসজিদ ও অন্যান্য স্থাপত্য ইমারতের শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ লিপির সাক্ষ্যে অনুমিত হয়। মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতে লিপিকলা (Calligraphy) ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৪২] এসময় মাদ্রাসা, মসজিদ হিসেবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২৭৫০ বিঘা লাখেরাজ ভূমি অনুদান হিসেবে মুসলিম শাসনামল থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।[৪৩] পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে বাগদাদের খলীফা হারুন-আর রশীদ এর (৭৮৮ খ্রিঃ) মুদ্রা প্রাপ্তি থেকে অনুমিত হয় ১২০৪ খ্রিঃ পূর্বেই এই অঞ্চলে মুসলিম বসতি গড়ে ওঠে।[৪৪] এনামুল হকের মতে অষ্টম শতাব্দীতেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রচারকদের আগমণ ঘটে এবং তাদের মাধ্যমেই এই মুদ্রার স্থানান্তর ঘটে।[৪৫]

আধুনিক পন্ডিতদের মতে, কিছু সংখ্যক মুসলিম সাধু দরবেশ যাদের বেশির ভাগই ছিল আরব ও ইরানী তারা বাংলায় বসতি স্থাপন ও হিন্দু রাজাদের আমলেই ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। এদের মধ্যে বগুড়ায় মহাস্থানে শাহ্ সুলতান বলখী মাহিসাওয়ার, শেরপুরে শাহ্ তুরকান এবং পাবনার শাহজাদপুরে মখদুম শাহ্ দৌলা[৪৬] অন্যতম। উল্লেখ যে, বিহারের মানের শরীফের বিখ্যাত সুফী মখদুম শাইখ, শহ্ফ-উদ-দীন, ইয়াহিয়া মানেরীর পিতা শাইখ ইয়াহিয়া মানেরী মাহিসুন মাদ্রাসায় মৌলানা তাকিউদ্দিন আল-আরাবী এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। একটি সূত্রে পাওয়া যায়, ইয়াহিয়া মানেরী ১২৯১ খ্রিঃ মৃত্যুবরণ করেন।[৪৭]

মাহিসন্তোষের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির মধ্যে রয়েছে মসজিদ, দুই পীর এবং একজন উজীরের সমাধিদুর্গ প্রাকার। প্রায় তিন থেকে চার মাইল ব্যাপী উচুঁ টিলা, মহীপাল দীঘিসহ অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়, পাকা ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ স্থানে স্থানে পতিত ভিটা, পুরোনো রাজপথের নিদর্শন। ইটের বেষ্টনীকৃত বাড়ির চত্বর, বিভিন্ন স্থানে স্তুপীকৃত প্রস্তর খণ্ড, অলংকৃত ইট, প্রাচীর বেষ্টিত জলাবৃত একটি গড় ইত্যাদি। প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষটি প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ অথবা মুসলিম কোন্ আমলের তা জানা যায় না। এই বিরাট দুর্গে মাটির তৈরি উঁচু প্রাচীরের বাইরের পরিখা দেখে দুর্গটি হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের বলেই অনুমিত হয়। সম্ভবত পরবর্তী মুসলিম আমলে এর সংস্কার করা হয়। তবে মাহিসন্তোষের উত্তর দক্ষিণে লম্বা জলাশয়গুলি হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের বলে মনে করা হয়।[৪৮] দুর্গের বাইরে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে প্রাচীর ঘেরা একটি ইমারতের মাথায় দুটি পাকা সমাধি আছে, যার একটি 'মায়ি সন্তোষের সমাধি' এবং অপরটি তার কন্যার বলে জনশ্রুতি আছে। দুর্গের দক্ষিণ পূর্ব কোণে 'মিঠাপুকুর' নামে একটি বিরাট প্রাচীন জলাশয় আছে। এর পাড়গুলি খুব উঁচু। এর দক্ষিণেই বারদুয়ারী নামে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এখন থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য এখানে সামরিক শক্তি গড়ে তোলা হয়। অধ্যাপক মীর জাহান মাহিসন্তোষের

দুর্গ প্রাচীর, জলাশয় প্রস্তর খণ্ড, রাস্তার নিদর্শন দেখে অনুমান করেন, এটি একটি সুরক্ষিত গড়। মাহি সন্তোষ থেকে একটি কামান রাজশাহী বরেন্দ্র গবেষণা যাদুঘরে স্থানান্তরিত হওয়ায় তার ধারণা যুক্তিযুক্ত মনে হয়।[৪৯] ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয়, এসব স্থানে অনেক ইমারত ছিল এবং ধ্বংসাবশেষেরই কোনটিতে উল্লেখিত মসজিদের অস্তিত্ব ছিল। পরবর্তীতে মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে শিলালিপিটি মাজারে স্থানান্তরিত হয়। H. Blochmann এর ধারণা অনুযায়ী মাজারটি মসজিদের আগেই নির্মিত হয়েছিল এবং তিনি মাজারের কাছেই একটি মধ্যযুগীয় মসজিদের ধ্বংসাবশেষের উল্লেখ করেন।[৫০]

সে সময় ওয়েস্টমেকট এই স্থান হতেই আরো একটি শিলালিপি উদ্ধার করেন। জনশ্রুতি অনুযায়ী এটিও প্রথম শিলালিপিটির পাশেই মাজারের দেয়ালে লাগানো ছিল। এই শিলালিপিটির আংশিক উদ্ধারকৃত তথ্য থেকে জানা যায়, সুলতান বারবক শাহ্-এর রাজত্বকালে খান উল আযম ওয়াল মোয়াজ্জেম উলুঘ[৫১] ইকরার খান বারবকাবাদ শহরে ১৪৭১-১৪৭২ সনে এই মসজিদ নির্মাণ করেন।[৫২]

বরেন্দ্র গবেষণা যাদুঘরের নথি থেকে জানা যায় এর প্রতিষ্ঠাতা শরত কুমার রায় মসজিদের ধ্বংসাবশেষ থেকে একটি শিলালিপি উদ্ধার করেন এবং এই শিলালিপিটি যাদুঘরেই সংরক্ষণ করা হয়।[৫৩] এর লিপি থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জানা যায় ১৫০৭ খ্রিঃ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্র রাজত্বকালে সোহাইলের পুত্র এই মসজিদ নির্মাণ করেন। তবে মসজিদ নির্মাতার নাম উদ্ধার করা যায়নি।[৫৪] এই শিলালিপির লিখন পদ্ধতির সাথে ছোট সোনা মসজিদের দ্বারের উপরের লিপিটির যথেষ্ট মিল আছে।[৫৫] মাহিসন্তোষের ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ থেকে প্রাপ্ত মিহরাবটি বরেন্দ্র যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এর প্রস্তর খণ্ডে বিষ্ণু, উমা, মহেশ্বর, সূর্য, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি দেব দেবীর চিত্রসহ শেকল ও ঘন্টা এবং প্রস্ফুটিত পদ্ম ও পদ্ম ফুলের ডাল চিত্রিত আছে।[৫৬] এস্থানের স্থাপত্য ইমারত ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ হতে ষোড়শ শতাব্দীর সামরিক ও প্রশাসনিক প্রসিদ্ধির স্বাক্ষর বহন করে।

সাম্প্রতিক কালে উদ্ধারকৃত বারবক শাহ্র আমলে (১৪৫৯-১৪৭৪) নির্মিত মসজিদের আরো একটি শিলালিপির প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, জনৈক উলুঘ হাসান কর্তৃক ১৪৬৩ খ্রিঃ এই মসজিদ নির্মিত বলে জানা যায়।[৫৭] এই শিলালিপিটি পাহাড়পুর যাদুঘরে রক্ষিত আছে। গভীর জঙ্গলে ঢাকা মসজিদের ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে পরিষ্কার করে টিনের ছাউনি দিয়ে নামাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন মসজিদটির শুধুমাত্র পশ্চিমের দেয়ালটাই আছে। বাকি উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের দেয়াল মাটির সাথে মিশে গেছে। মাটি থেকে প্রায় ৩ ফুট উঁচু পশ্চিমের দেয়ালটির অধিকাংশ ইট সরানো হয়েছে। প্রাঙ্গনে স্তুপীকৃত প্রস্তরের অধিকাংশই কালো। উত্তর দক্ষিণের বহির্বাহু ২৪ মি. এবং পূর্ব পশ্চিমে ১৬.২০ মি.। মসজিদটি আয়তাকার। মসজিদের চারকোণে

চারটি অষ্টকোণাকৃতি বুরুজ রয়েছে। নামাজের ঘরটি দুই সারি পিলার এবং তিন আইলে বিভক্ত। মসজিদে ৫টি মিহরাব আছে। উত্তর দক্ষিণের দেয়ালে দুটি জানালা রয়েছে। মূল প্রবেশ পথটি অন্যান্য প্রবেশ পথের চেয়ে প্রশস্ত।

প্রাচীনতম এই ঐতিহাসিক স্থানটি (মাহিসন্তোষ) মোগল শাসনের শেষ পর্যায়ে এসে প্রশাসনিক বিন্যাসের কারণে তার গুরুত্ব হারাতে থাকে এবং ইংরেজ শাসনামলে এর যোগাযোগ বিনষ্ট হতে থাকে ফলে গুরুত্বপূর্ণ এই জনপদটি ক্রমশ জনশূন্য হয়ে পড়ে। স্থানীয় জনগণের মতে কোন এক সময় এখানে মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল।

তবে উদ্ধারকৃত শিলালিপি এবং মসজিদের ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমিত হয় যে, ঐতিহ্য বিলুপ্তপ্রায় মাহিসন্তোষ এক সময় টাঁকশাল নগরী, উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র এবং সামরিক শক্তিতে বাংলা এবং বাংলার বাইরেও গুরুত্বপূর্ণ একটি জনপদ হিসেবে পরিচিত ছিল। এর পুরাকীর্তি সমূহের ধ্বংসাবশেষ বরেন্দ্র তথা বাংলার প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন, জামে মসজিদের ধ্বংসাবশেষ, দুর্গপ্রাকার ও পুরাতন সমাধিগুলো মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে এই স্থানটির গুরুত্ব বহন করে। এছাড়া বাংলায় মুসলমানদের প্রথম আবাসিক স্থল হিসেবেও এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে।

সূত্রনির্দেশ

১। মিনহায-ই-সিরাজ বর্ণিত ইখতিয়ার উদ্ দীন মোহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয়ের তারিখটি বিতর্কিত। মিনহায-ই-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরী*, আবুল কালাম যাকারিয়া (অনুদিত ও সম্পাদিত) (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃঃ ২২; ড. এ. এইচ দানীর মতে এই সময় ১২০৪ এর আগে হতে পারে না। A. h. "Dani. Date of Bakhtiyar's Raid on Nadiya" *Indian Historical Quarterly*, Vol. XXX, (Calcutta, 1954), p. 145. এই মত এখন স্বীকৃত। ১২০৫ খ্রিঃ প্রচারিত মুহম্মদ ঘোরীর একটি স্বর্ণমুদ্রায় গৌড় বিজয়ের উল্লেখ আছে। P. K. Gupta, "Date of Bakhtiyar Khalji Occupation of Gaur", *Journal of the Varendra Research Museum*, Vol. 4. (Rajshahi. 1975-1976). pp. 33-34. এই মুদ্রায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে অনুমিত হয় বখতিয়ার খলজী ১২০৫ খ্রিঃ গৌড় অধিকার করেন এবং মুহম্মদ ঘোরীর নামে মুদ্রা প্রচার করেন।

২। ইখতিয়ার উদ্ দীন মোহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার খলজীর রাজ্যসীমা সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। *The History of Bengal*, Vol. 2. সূত্রে জানা যায়, লাক্ষ্মৌতি রাজ্যটি মোটামুটিভাবে উত্তর পূর্বে দেবকোট (বানগড় ভারতের পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানা) থেকে রংপুর শহর, পূর্বে দক্ষিণে তিস্তা ও করতোয়া এবং দক্ষিণে গঙ্গার (পদ্মা) প্রধান স্রোতধারা এবং পশ্চিমে কোশীয় নিম্নধারা হয়ে রাজমহল পর্বত

পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দ্রষ্টব্যঃ J. N. Sarkar (ed.) *The History of Bengal*, Vol. 2, (University of Dacca, 3rd edition, 1976), pp. 12-13.

৩। *Journal of The Asiatic Society of Bengal*, (Henceforth *JASB*) Vol. XIIV, p. 190, *Journal of the Royal Asiatic Society*, (Henceforth *JRAS*). 1876, p. 116.

৪। A. K. Maitra, *The Ancient Monuments of Varendra* (Rajshahi, 1949), p. 24.

৫। *Ibid.*

৬। *Risalah-as-Shuhada, Persian text in Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. XLIII, 1874, p. 230.

৭। J. N. Sarkar, *op cit*, p. 48.

৮। বর্তমান মাহিসন্তোষ সম্ভবত মিনহায-ই-সিরাজ বর্ণিত সন্তোষ।

৯। J. N. Sarkar, op.cit., p. 11.

১০। Minhaj-i-Siraj, *Tabaqat-i-Nasiri*, Eng. tr. by Reverty. p. 70.

১১। মিনহায-ই-সিরাজ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮।

১২। Dr. A.K.M. Yaqub Ali, *Aspects of Society and Culture of the Varendra, 1200-1576* (Rajshahi : Sajidur Rahim 1998) (Henceforth *ASCV*), p. 126.

১৩। মিনহায-ই-সিরাজ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৭, পাদটিকা-৪।

১৪। *Memories of the Archeological Survey of Bengal*, Vol. III. p. 14.

১৫। ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার খলজী তার বিজিত অঞ্চলকে কয়টি ইকতায় বিভক্ত করেন সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায় না। দ্রষ্টব্য ঃ *ASCV*, p. 125; A.K. Khan, "Successors of the Iktiar Uddin Muhammad Ibn Bakhtiar Khaljis", *Indian Culture*, 1944, p. 45. fn, 2; নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, (কলিকাতা ঃ দে'জ পাবলিশিং দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০২), পৃঃ ৮৮।

১৬। J N. Sarker, op cit. p. 37, মিনহায-ই-সিরাজ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৮, পাদটিকা, ১; *ASCV*, p. 126.

১৭। Minhaj-i-Siraj, *op.cit.*, p. 433.

১৮। Khwaja Nizam-al-Din Ahmed Bakhshi, *Tabaqat-i-Akbari* Vol. I, Tr. B.De, (Royal Asiatic Society of Bengal, 1927), p. 56, fn. 3.

১৯। J.N. Sarkar, 'A Description of North Bengal in 1609', *Bengal Past and Present*, 1928. No. 130, p. 135.

২০। *The District of Rajshahi*, pp. 65-66.

২১। Montogomary Martin, *The History, Antiquities Topography and Statistics of Eastern India*, Vol. II (Delhi : Reprint, 1976), p. 67; Mir Jahan, "Mint towns of Medieval Bengal", *Journal of the Pakistan Historical Society*, Vol. I, Part. 1, Karachi. p. 409.

২২। S. Ahmed. *Inscription of Bengal*, Vol. IV; Sultan Ahmed : "A New light on

the Jami Mosque of Mahisantosh", *Journal of the Pakistan Historical Society,* Karachi, Vol. 46. No. 2, April-June, 1998, pp. 61-67.

২৩। S. Ahmed, *op cit.,* Vol. IV, p. 74.

২৪। S. Ahmed. *op cit.,* p 90.

২৫। John Beams, Atlus. *Journal of the Pakistan Historical Society,* 1896, p. 88.

২৬। Abul Fadal Allami, *Ain-i-Akbari,* Eng. Tr. by H. Blochmann (Asiatic Society of Bengal, 1904), Vol. II, p. 128; গোলাম হোসেন সেলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন,* পৃঃ ৪৩, পাদটিকা, IASB; H. Blochmann, 1873, pp. 215-218; *JRAS,* 1896, Article No. IV, pp. 115-117; Irfan Habib, *An Atlus of the Mughal Empir* (Oxford University Press, Reprint, 1986), p. 11-A.

২৭। সম্প্রতি মাহিসন্তোষে স্থানীয় কৃষকদের মাটি খনন কালে তিনটি মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্রষ্টব্য ঃ *সোনালী সংবাদ,* রাজশাহী, ৮-৩-১৯৯৮ তারিখ।

২৮। ড. এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, *মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প* (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃঃ ২৫৫; A. Karim, *Corpus of the Muslim Coins of Bengal* (Down to 1538 AD) (Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1960), p. 162.

২৯। Dr A.K.M. Yaqub Ali, op. cit., p. 177, Mir Jahan, *Proceedings of the. Pakistan Historical Society* (Dacca. 1953). pp. 236-237; হোসেন শাহী যুগে (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রিঃ) বাংলায় নিম্নলিখিত টাঁকশাল শহরের নাম পাওয়া যায় ঃ হোসেনাবাদ (লাক্ষ্মৌতি), ফতেহাবাদ, নসরতাবাদ, মুফাজ্জমাবাদ, খলীফতাবাদ, বারবকাবাদ, মুহাম্মদবাদ, মাহমুদাবাদ এবং মুজাফ্ফরাবাদ M.R. Tarafdar. *Hushain Sahi Bengal* (Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1965), p. 114.

৩০। মেহরাব আলী, দিনাজপুরে ইসলাম (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯১), পৃঃ ১৪১।

৩১। A.H. Dani, *Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal,* p. 28: *The District of Rajshahi its Past and Present,* p. 67.

৩২। *The Commercial Policy of the Mughals* (Bombai : 1930), p. 59.

৩৩। Ain-i-Akbari, *op cit ,* Vol. II, Jarret কর্তৃক অনূদিত ও স্যার যদুনাথ সরকার কর্তৃক সংশোধিত ও টিকা টিপ্পনি সংযোজিত ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, *Royal Asiatic Society of Bengal,* 1949, p. 141-150: গোলাম হোসেন সেলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন* (আব্দুস ছালাম অনূদিত), *History of Bengal,* Reprint (Delhi : 1975), p. 48; নিখিল নাথ রায়, *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস,* কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৩০৯, পৃঃ ৪২৫-৪২৯।

৩৪। H. Blochmann, "Contributions to the Geography and History of Bengal", *JASB,* Vol. 42, Calcutta, 1873, p. 215-218; গোলাম হোসেন সেলীম, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪৩; John Beams. "Notes on Akbar's Suba's with Reference to the Ain-i-Akbari", *JRAS,* Article on IV, London : 1896, pp. 115-116.

৩৫। মুঘল মুদ্রা সাধারণত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র ধাতবে তৈরি। স্বর্ণ মুদ্রা 'মোহর', রৌপ্য মুদ্রা

'রূপায়া' এবং তাম্র মুদ্রাকে ফলস্ বা 'দাম' বলা হয়। দ্রষ্টব্য ঃ ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, মুসলিম মুদ্রা ও হস্ত লিখন শিল্প, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৭২; A. Karim, *Murshidkuli Khan and His Times* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1963), p. 74, fn. 3.7.

৩৬। Ain-i-Akbari *op.cit.*, Vol. II, p. 150.

৩৭। A. Karim, *Mushrid Quli* op-cit., p. 79.

৩৮। J.N. Sarkar. op-cit., p. 420-426.

৩৯। Abul Fadl Allami, *Ain-i-Akbari*, Eng. tr. by H. Blochmann (Calcutta : Asiatic Society of Bengal, 1904), p. 110; *Bengal Past and Present*, (Calcutta, 1948), p. 35.

৪০। Shah Shu'ayb, *Manaqib al-Asfiya*, Extract Printed at the end of *Maktubat-i-Sadi*, p. 339; *The District of Rajshahi, its past and Present*, p. 67.

৪১। ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম* (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৯২), পৃঃ ৫৯।

৪২। Dr. A.K.M. Yaqub Ali, *Select Arabic and Persian Epigraphs* (Dhaka : Islamic Foundation, Bangladesh. 1988).

৪৩। *Islamic Studies*, Vol. XXIV, pp. 434-435, 443, f.n 71.

৪৪। K N. Dikshit, *Memories of the Archeological Survey of India*, No 55 (Delhi, 1938), p 87.

৪৫। এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম* (ঢাকা ঃ আদিল ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ১৯৪৮), পৃঃ ১২; *ASCV*, pp. 151-152.

৪৬। *ASCV*. pp. 151-152.

৪৭। *Ibid.*

৪৮। আ.ক.মো. যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ* (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃঃ ২৬৫।

৪৯। M.Mir Jahan. op.cit., (Dacca. 1953). pp. 236-237; H. Blochmann. *JASB*, *op cit.*, p. 74.

৫০। H. Blochmann, *JASB*, p. 74.

৫১। উলুঘ তুর্কী শব্দ এবং তা একজন সামরিক ও প্রশাসনিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বোঝায়; ড. এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম* (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃঃ ৯৮।

৫২। S. Ahmed, *op.cit.*, p. 90; H. Blochmann, *JASB*, Vol. XLIV, 1875, p. 291; A.H. Dani, *Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal*, p. 23; A. Karim, *Corpus* op.cit., p. 170.

৫৩। অপ্রকাশিত হস্তলিপি, *Proceeding of Varendra Research Society*, 1918, p. 21.

৫৪। S. Ahmed. *op.cit.*, p. 179; N. Sanyal, *List of Inscriptions in the Museum of*

Varendra Research Society (Rajshahi : 1928). p. 18; A.K. Maitra, *The Ancient Monument of Varendra* (Rajshahi. 1949). p. 25; A. Karim, *op.cit.*, p. 161.

৫৫। এ.বি.এম. হোসেন, *ইতিহাস পরিষদ,* ৩য় সংখ্যা, ১৩৭৬, পৃঃ ২৭৮।

৫৬। *তদেব,* পৃঃ ২৭৯; ১৯১৬ সালে ডিসেম্বর মাস থেকে মাহিসন্তোষে খনন কাজ শুরু হয়েছে। খনন কার্যের নথিপত্রে মাহিসন্তোষকে মূলত একটি হিন্দু প্রধান এলাকা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৭। Sultan Ahmed. "A New Light on the Jami Mosjid of Mahisantosh", *Pakistan Historical Society,* 1997.

মঙ্গলকাব্যের বাণিজ্য পথ ও বাণিজ্য পণ্য

শংকররঞ্জন মজুমদার

মধ্যযুগের বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হল বাংলার মঙ্গলকাব্য সাহিত্য। এই কাব্য সাহিত্যের অন্যতম উপজীব্য হল সমুদ্র বাণিজ্য — যার চিত্র প্রধানত পাই মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতে।

মঙ্গলকাব্যে বাণিজ্য পথের অন্যতম নদী হল আদিগঙ্গা। ঐযুগে ভাগীরথীর প্রধান প্রবাহ পথই ছিল আদি গঙ্গা। ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দের ইয়াও দ্য ব্যারোস এবং ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে ভ্যান ডেন ব্রুকের তৈরি গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ অঞ্চলের মানচিত্রগুলি এর সাক্ষ্য দেয়। এছাড়াও দ্য থ' ও আভিল (১৭৫২) এফ্,ডি,হিট (১৭২৬), ইজাকটিরিয়ন (১৭৩০), থর্নটন প্রভৃতি সকলের নকশাতেই এই পথের পরিচয় পাওয়া যায়।[১] নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাংলার নদনদী গ্রন্থে গঙ্গার প্রবাহ পথ পরিবর্তনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার তৃতীয় পর্যায় ছিল আদি গঙ্গার প্রবাহ পথ। তাঁর মতে তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতন, দামোদর রূপনারায়ণ — পত্রঘাটার এবং সরস্বতীর জলে পুষ্ট প্রবাহ পথ পরিত্যক্ত হওয়া এর কারণ।[২]

মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, রায়মঙ্গল ইত্যাদি মঙ্গল কাব্যগুলিতে আদি গঙ্গার দুই পার্শ্বস্থ যেসব লোকালয়ের বর্ণনা আমরা পাই সেগুলি হল — বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত মনসাবিজয় (আনুমানিক ১৪৯৫) ছত্রভোগ, হাথিয়াগড়, শতমুখী (নদীর শতমুখ), সঙ্গম, দরিয়া, মগরা।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* (১৫৯৪-১৬০৬ খ্রিঃ) গরিফা, বাজান, আমালঙ্গ/ আমালঙ্কা (বড়াশির অম্বুলিঙ্গ), ছত্রভোগ, হাত্যাগড় (হাতিয়াগড়), শিলাকুট, মগরা।

কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল (১৬৮৬ খ্রিঃ) কল্যাণপুর, ডিহি মেদনমল, হোগলা, পাথরঘাটা, বারাসাত, খনিয়া, কল্যাণপুর মালঞ্চ, বারুইপুর, সূর্যপুর, সাধুঘাটা, মলুটি (মূলটি), হাঁসুড়ি, বড়ুক্ষেত্র (বহড়ু) জয়নগর, বিষ্ণুপুর, অম্বুলিঙ্গ (বড়াশি), ছত্রভোগ, গঙ্গাদ্বারা (গঙ্গাদুয়ারা), টিয়াখোল, গজমুড়ি, কাকদ্বীপ, বেতাই, ধামাই এবং মগরা।

এছাড়া বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবতে* পাই (১৫৩৫-৩৬ খ্রিঃ) আটিসারা (দঃ বারুইপুর), ছত্রভোগ, অম্বুলিঙ্গ, শতমুখী।

এর বাইরে কলিকাতা, বেতড়, ধনন্ত (দঃ পঃ কলকাতা), কালিঘাট, চূড়াঘাট (সম্ভবত দক্ষিণ কলকাতায়), ধনস্থান এবং বারুইপুরের উল্লেখ পাই।

চাঁদ সদাগরের যাত্রা শুরু হয়েছিল গাঙ্গুর নদীর কূল থেকে। — "গুঙ্গড়ির কুলে গেল চাঁদো অধিকারী / প্রভাতে বরিব ভিক্ষা সনকা সুন্দরী।" (অষ্টম পালা/২০)। ওখান থেকে তাঁর নৌবহর (সাত ডিঙ্গা — গন্ধেশ্বরী, সর্বজয়া, জগদ্দল, সুমঙ্গল, নবরত্ন, চিত্ররেখা, শশিমুখী)। মনসাবিজয় - অষ্টম পালা (২) আসে ত্রিবেণীতে। উক্ত পালায় তৃতীয় কবিতায় আমরা সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে চাঁদের কৌতূহল লক্ষ্য করি — কেননা সংশ্লিষ্ট সময়ে ঐ স্থান ছিল শহর ও বন্দর হিসেবে বিখ্যাত। ঐতিহাসিক অনিরুদ্ধ রায় ত্রিবেণীকে সপ্তগ্রামের অংশ হিসেবে ধরেছেন। বিপ্রদাস তীর্থস্থান হিসেবে ত্রিবেণীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মনে হয় সপ্তগ্রামের সঙ্গে ত্রিবেণীর সরাসরি যোগাযোগ তখনো স্থাপিত হয়নি। ১৫০৫ এর এক শিলালেখ থেকে উল্লেখ করে অনিরুদ্ধ রায় দেখিয়েছেন সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণীর মধ্যে যাতায়াতের সুবিধার জন্য এক সাঁকো তৈরি করেন।[৩] ১৫৯৪-১৬০৬ খ্রিঃ মধ্যে রচিত মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গলে* দেখি —

"রাঢ়া মাঝে সপ্তগ্রাম অতি অনুপাম
দিনাদুই সাধু তাহে করিল বিশ্রাম।
কিন্যা বেচ্যা নানা ধন নায়ে ছিল ভরা
বাহ বাহ বল্য ঘন নায়ে হৈল ত্বরা।"

(*চণ্ডীমঙ্গল*, ৩৪৮ সংখ্যক কবিতা)

সপ্তগ্রামে টাঁকশাল নির্মাণ এর বাণিজ্যিক গুরুত্ব বোঝানোর পক্ষে যথেষ্ট। ১৩২৯ সালে এখানে নির্মিত প্রথম টাকার নিদর্শন পাওয়া যায়। সুতরাং যোগাযোগের অভাবই বোধ হয় চাঁদের সপ্তগ্রাম না যাওয়ার কারণ।

আদি গঙ্গার পথে ঢোকার আগে আর যে সব স্থান দিয়ে বাণিজ্য তরী অগ্রসর হয়েছিল তা হল — রিসিড়া (রিষড়া), কোননগর, নিমাইতীর্থ, চাপদানি, ভাটপাড়া, কাঁকীনাড়া, ইছাপুর, খড়দহ, কোতরং, ঘুসুড়ি, আড়িয়াদহ, কামারহাটি, চিতপুর ইত্যাদি স্থান।[৪] একটা জিনিস পরিষ্কার যে কবিরা স্থানের বর্ণনায় পূর্বাপর পারম্পর্য রক্ষা করতে পারেননি।

সাগরের বর্ণনায় কবিরা স্বচ্ছন্দ নন। কারণ সমসাময়িক কালে বাঙালি হিন্দুদের নৌ বাণিজ্যে অনুপস্থিতি।

"সপ্তগ্রামের বণিক কোথাহ না জায়
ঘরে বস্যা সুখমোক্ষ নানা ধন পায়।"

(৪১৭ সংখ্যক কবিতা)

চণ্ডীমঙ্গলের এই উদ্ধৃতি সমসাময়িক হিন্দু বণিকদের অবস্থান পরিষ্কার করে দেয়।

বাংলার হিন্দু বণিকরা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ব্যাপৃত ছিল। মনে হয় বাংলায় মুসলমান রাজত্বের শুরুতে হিন্দু বণিকদের ওপর আঘাত আসে। যেমনটা ঘটেছিল চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমে দিল্লীর সুলতান কর্তৃক গুজরাট জয়ের পর। মুঘল আমলে বাংলায় যে বৈদেশিক বাণিজ্যের উত্থান হয় তারাও সুলতানী আমলে বাংলায় এসেছিল — এমনটা অনুমান করা হয়। বলা বাহুল্য এরা সবাই মুসলমান শ্রেণীভুক্ত।

সপ্তগ্রামের যে বণিকদের কথা মুকুন্দরাম বলেছেন তারা সাধারণত জাহাজে প্রেরিত মালের জোগান দিত। বড় বড় বণিকরা এদের ওপর নির্ভরশীল ছিল।[৫] এই বড় বণিকদের মধ্যে আরব, পারস্য বা ইউরোপের বণিকরাও ছিল। তবে যে প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবে উঠতে পারে তা হল বাংলার বাঙালি সওদাগররা যদি সেই সময় সমুদ্র বাণিজ্যে না যেত তা হলে বাঙালি বণিকদের সমুদ্র বাণিজ্যের কথা সমকালীন বাংলা সাহিত্যে কি ভাবে এল? এর উত্তর হল মঙ্গলকাব্য বিশেষত *মনসামঙ্গল* এবং *চন্ডীমঙ্গলে* যে কাহিনী বিবৃত হয়েছে তার উৎপত্তি প্রাচীন কালে। আর কাব্যরূপায়ণ ঘটেছে মধ্যযুগে। এ বিষয়ে আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত হল তুর্কী আক্রমণের পরে ভারতীয় বা জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের জন্য পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদির সঙ্গে বাংলার স্থানীয় পুরাণ কথা 'মঙ্গল-কাব্য' আকারে প্রচারিত হতে লাগল। 'প্রাচীন-কথা ও লোক-গাথা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সাহিত্যিক রূপ পাইল।'[৬] বাংলার পুরাণ কথা হলেও এর জট রয়ে গেছে ভারতীয় সাহিত্য ও ইতিহাসে।

উদাহরণ হিসেবে আমরা চম্পা নগরীর উল্লেখ করতে পারি যা ছিল চাঁদ সদাগরের বাসস্থান। এটি ছিল নগর, বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে খ্যাত। এই চম্পার সঙ্গে সমকালীন পূর্বভারতের বাণিজ্য কেন্দ্র রাজগৃহ, বৈশালী, শ্রাবস্তী, বারাণসীর স্থলপথে যোগাযোগ ছিল। বুদ্ধ এই সব স্থানে পরিব্রাজকরূপে এসেছিলেন। কলিঙ্গের সঙ্গেও এর যোগযোগ ছিল. এমনকি গান্ধার, কম্বোজ, সিন্ধু প্রভৃতি দূরদেশের সঙ্গেও স্থলপথে এর যোগ ছিল।[৭] অতীন্দ্রনাথ বসু বৌদ্ধ গ্রন্থ আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষে চারটি প্রধান পথের একটি ছিল অঙ্গের রাজধানী ভাগলপুরের চম্পা থেকে পশ্চিম বা উত্তর পশ্চিমে গন্ধার দেশের পুষ্কলাবতী পর্যন্ত প্রসারিত।[৮] এর কিছু বর্ণনা রামের বনবাস যাত্রার পথ বর্ণনায় পাওয়া যায়। বণিকেরা এখান থেকে মালপত্র নিয়ে দূর প্রাচ্যে সমুদ্র বাণিজ্যে যেতেন। বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চম্পার সঙ্গে বেশি বাণিজ্য হত সুবর্ণভূমির সঙ্গে। এই চম্পা থেকে আসাম হয়ে বার্মা পর্যন্ত বাণিজ্য পথ ছিল। পথের শুরু ছিল পাটলিপুত্র-চম্পা কজঙ্গল (রাজমহল), পুন্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ) হয়ে কামরূপ। কামরূপ থেকে তিনটি পথ ছিল বার্মাতে যাওয়ার।[৯]

রণবীর চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ভারতে দ্বিতীয় দফায় যে নগরায়ণের সূত্রপাত ঘটেছিল তা প্রধানত ছিল মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকাতেই সীমাবদ্ধ। এর কালসীমা

খ্রিঃ পূর্ব চতুর্থ থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত। সম্ভবত চম্পা নগরীর উদ্ভব এই সময়।

সিংহল তথা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় প্রধানত রোম-ভারত বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। বাকাটকদের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে মুদ্রারহিত অর্থনীতিকে তাদের অবক্ষয়ের চিহ্ন বলে ধরেছেন। খুব সম্ভবত এর প্রভাব অর্থাৎ রোম ভারত বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার প্রভাব পূর্ব ভারতেও পড়েছিল। তাই দেখি সিংহল রাজের সঙ্গে বাণিজ্যে বিনিময় প্রথার অবস্থান।[১০]

"কৌতুকে দেখায় রাজা ঝুনা নারিকেল
দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ দেহ ইহার বদল।
হরিদ্রা দেখায় চাঁদো করিয়া মন্ত্রণা
ইহার বদল সোনা কহিনু তোমারে
তন্ডুল বদলে দেহ মুকুতা প্রবাল।"

(*মনসাবিজয়*, নবম পালা, নয় সংখ্যক কবিতা)

বিপ্রদাসের *মনসাবিজয়* কাব্যে আমরা দেখি চাঁদো রাজা চার পোন কড়ির বদলে কাঠ বিক্রী করছে এবং বিক্রী লব্ধ চার পোন কড়ি দিয়ে তাঁতিদের কাছে যাচ্ছে কাপড় কিনতে। অথচ মধ্যযুগের সমকালীন অর্থনীতিতে টাকা বা মুদ্রার প্রচলন আমরা পাই।[১১]

চাঁদ সদাগরের যাত্রাপথে সিংহল সমীপে কড়িদহ, শঙ্খদহের উল্লেখ পাওয়া যায়, উপরের সাক্ষ্য থেকে মনে হয় শঙ্খ সিংহল থেকে আসত। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর Coastal and Overseas Trade in Pre-Gupta Vanga and Kalinga থেকে জানতে পারি যে মুক্তা বাংলা থেকে রপ্তানি হোত আবার আমদানিও করা হোত রপ্তানির উদ্দেশ্যে।[১২] তবে সোনা শুধু আমদানিই করা হোত। বঙ্গের বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম ছিল দানা, শস্য ও ঘোড়া। বিপ্রদাস যে অঞ্চলের লোক (বাদুড়িয়া) তার নিকটবর্তী হচ্ছে বিখ্যাত চন্দ্রকেতুগড় প্রত্নস্থল। শ্রী মুখার্জী উক্ত স্থান থেকে প্রাপ্ত সীলের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন উক্ত অঞ্চল ছিল ধান উৎপাদনের বৃহত্তর কেন্দ্র। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে চন্দ্রকেতুগড়কে কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, বি-এন. মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ঐতিহাসিকবৃন্দ প্লিনি ও টলেমি বর্ণিত গাঙ্গে বন্দরকে বর্তমান চন্দ্রকেতুগড় বলেই মনে করেন। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মনে করেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে। বিপ্রদাস ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম উভয়ের কাব্যেই আমরা ন্যরকেলের বদলে শঙ্খ আহরণের কথা পাই। এই নারিকেল মনে হয় উড়িষ্যা থেকে সংগ্রহ করা হত। কড়ি যেমন মালদ্বীপ থেকে আসত তেমনি শঙ্খ মনে হয় সিংহল থেকে আমদানি করা হত। ধনপতি সদাগর যখন সিংহল

রাজের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছে তখন ভেট হিসেবে সঙ্গে নিচ্ছে 'জিন সনে তাজি ঘোড়া' (সুকুমার সেন সম্পাদিত চণ্ডীমঙ্গল — ৩৬১ সংখ্যক কবিতা।) অভিধানকার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'তাজি' শব্দের অর্থ করেছেন আরবদেশীয় অশ্ব, তাজি বা তুরুকি ঘোড়া। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক বি.এন. মুখোপাধ্যায় প্রাচীন বাংলায় ঘোড়ার বাণিজ্য সম্বন্ধে বলেছেন যে ঘোড়া আসত মধ্য এশিয়া এবং উত্তর পশ্চিম থেকে এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও অন্যান্য দেশে রপ্তানি হোত। অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায় সুলতানী যুগের অর্থনীতির আলোচনায় দেখিয়েছেন যে সুলতানী যুগেও দক্ষিণ পশ্চিম চীনদেশ থেকে জলপথে বড় ঘোড়া আসত। তিনি অধ্যাপক সাইমন ডিগবীর মতকে উল্লেখ করে বলেছেন যে ঐগুলি টাট্টু ঘোড়া নয় দক্ষিণ পশ্চিম চীনের বড় ঘোড়া।

পুনরায় যে কথা আমাদের স্মরণে রাখা দরকার তা হল মঙ্গল কাব্যের কবিরা মধ্যযুগে বসে প্রাচীন যুগের ঘটনাকে বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে সমকালীন ঘটনাও কোথাও কোথাও অল্পবিস্তর রেখাপাত করেছে।

আরোও জরুরী একটি তথ্য আমাদের আলোচনায় আনা উচিত তা হল চন্দ্রকেতুগড়-এর উল্লেখ আমরা প্রাচীন কোন সাহিত্যে সরাসরি পাই না। সর্বপ্রথম পাই বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসাবিজয় কাব্যে এবং ঐ পথের বাণিজ্যিক তাৎপর্যও মঙ্গলকাব্যে প্রথম পাই। (মনসাবিজয় - সুকুমার সেন সম্পাদিত - দশম পালা ১৮, ১৯, ২০ সংখ্যক কবিতা)। উত্তর চব্বিশ পরগণার এই অংশের প্রাচীন বাণিজ্যিক গুরুত্বও কিছুটা উপলব্ধি করা যায়।

সূত্রনির্দেশ

১। সুনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, "আদি গঙ্গার প্রাচীন প্রবাহ পথ" *কৌশিকী পত্রিকা*, কলকাতা ১৯৯৮, পৃঃ ১১৫। নীহাররঞ্জন রায়, *বাংলার নদনদী*, বিশ্বভারতী, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২৩।

২। *বাংলার নদনদী*, পৃঃ ২৩।

৩। অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর*, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ১৫৫।

৪। সুকুমার সেন (সম্পাদিত), *মনসাবিজয়*, এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃঃ ১৪৩-৪৪।

৫। অনিরুদ্ধ রায়, *মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃঃ ৮৯।

৬। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, *বাঙ্গালীর সংস্কৃতি*, কলকাতা, ১৯৯৮, চতুর্থ মুদ্রণ, পৃঃ ১১ ১৩৪১ বঙ্গাব্দে 'জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য' শীর্ষক বক্তৃতা রাঁচি হিন্দু ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব কর্তৃক আহূত সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত।

৭। *Early Indian Trade and Industry*, University of Calcutta - 1972. p. 37. 39. 41-44.

৮। রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, বঙ্গাব্দ ১৪০৯, পৃঃ ১৩৭।

৯। *Early Indian Trade and Industry*, p. 44.

১০। রণবীর চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৪।

১১। অনিরুদ্ধ রায়, *সুলতানী আমলের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃঃ ১৪, ১৯, ৩১।

১২। B N. Mukherjee, "Coastal and Overseas Trade in Pre-Gupta Vanga and Kalinga" ed. by Ranabir Chakrabarty, Trade in Early India, p. 202.

একলাখী সমাধি, হজরত পান্ডুয়া

রাশেদা ওয়ায়েজ

অবস্থান ঃ

একটি অপূর্ব অট্টালিকা ভাবগম্ভীর পরিবেশে অলঙ্কৃত সহকারে ঠিক দু'মাইল উত্তর পশ্চিম দিকে গৌড়-দিনাজপুর রোডের পাশে হজরত পান্ডুয়ার একলাখী সমাধি। বাংলার এই গৌরবময় স্থাপত্যটি নির্মাণ করতে গিয়ে ১,০০,০০০/- একলাক্ষ (এক লাখ) টাকা খরচ হয় বলে মনে করা হয় সেই হেতু এই কীর্তিস্তম্ভটি একলাখী সমাধি বলা হয়।

পরিচিতি ঃ

এই স্মৃতিস্তম্ভের পরিচিতি নিয়ে পন্ডিতবর্গ বিভিন্ন মত পোষণ করেন।[১] বুকানন হ্যামিলটন মনে করেন সৌধটির অভ্যন্তরে সুলতান গিয়াসউদ্দিন ও তার দু'পুত্রের কবর আছে। মনে হয় রাজকীয় পরিবারের তিন ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্মাণ করা হয়, যাদের কবর মেঝের মধ্যখানে অবস্থিত। এ কবরে কোন উৎকীর্ণ লিপি নেই যা স্থাপত্যের পরিচয়ে নির্ণয় করতে সাহায্য করে। কিন্তু বলা হয়ে থাকে যে কবরগুলি হচ্ছে গিয়াসউদ্দিন জয়নাল আবেদিন এবং ওয়াহজউদ্দিনের। পরের দুটি কবর হচ্ছে পুত্রদের। প্রথম কবরে যিনি শায়িত আছেন যিনি বাংলার তৃতীয় মুসলিম শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ। দুঃখের বিষয় হাবিবা খাতুন[২] বুকানন হ্যামিলটনের বক্তব্য সমর্থন করেন। তিনি দলিল পত্র ও ঐতিহাসিক ভিত্তি ছাড়াই ও উৎকীর্ণ লিপির উপরে ভিত্তি না করে এবং কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ ছাড়াই তার মত প্রকাশ করেন।[৩] তিনি বলছেন "একলাখী সমাধিটি গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ জীবনকালীন সময়ে নির্মাণ করেন। এ নির্মাণ কৌশল খানী জাহান কর্তৃক দক্ষিণ বাংলায় নেওয়া হয়"। তিনি ভুল প্রতিপাদন করেন *রিয়াজ-উস-সালাতিনের* বক্তব্য এবং মনে করেন কতগুলো ভাঙা কবর যা জালালী দীঘির পাড়ে, গৌড় দুর্গের মধ্যে অবস্থিত। ইহাই হচেছ জালালউদ্দিনের সমাধি। অতএব এটাও সম্ভাবনা গিয়াসউদ্দিন একলাখী কবরে শুয়ে আছেন, যেটি তিনি নিজ জীবনকালে তৈরি করেন। এ বক্তব্য কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয় যেহেতু অধিকাংশ পন্ডিতবর্গ যেমন গোলাম হোসেন সেলিম[৪] এ কানিংহাম,[৫] আবেদ আলী,[৬] এ এইচ দানি[৭] এস. এম. হাসান.[৮] ক্যাথরিন বি আশার[৯] তারা সকলেই একবাক্যে বলেন যে, জালালউদ্দিন, তার স্ত্রী এবং পুত্রকে কবর দেয়া হয়েছে একলাখী সমাধিতে। র‍্যাভেনশো[১০] মনে করেন এটি হচ্ছে গিয়াসউদ্দিনের, তার স্ত্রীর এবং তার

পুত্র বধূর কবর (?)। গোলাম হোসেন সেলিম[১১] *রিয়াজ উস সালাতিনে* বর্ণনা দিয়ে বলছেন এ কবরগুলি হচ্ছে জালালউদ্দিন, তার স্ত্রীর এবং তার পুত্র বধূর। কানিংহাম[১২] অকাতরে বিশ্বাস করেন যে *একলাখী সমাধি* জালালউদ্দিন দ্বারা নির্মাণ করা হয়। তিনি রাজা কনস্ (গনেশ) এর পুত্র ছিলেন। তিনি রাজত্ব করেন ৮১৬-৮৩১ হিঃ পর্যন্ত। মধ্যের কবরটিকে তিনি মনে করেন রাজার স্ত্রীর, পশ্চিম দিকের কবরটি জালালউদ্দিনের পুত্র, আহমদ শাহের, তিনি শামসুদ্দিন উপাধি নেন। একজন গোঁড়া মুসলমান হিসাবে জালালউদ্দিন চাইবেন তার কবরটি খুব নিকটে হবে বিখ্যাত পীর আলাউল হকের মাযারের নিকট যিনি মারা যান ৮০০ হিজরীতে এবং নূর কুতুব আলমের বাসস্থানের কাছে যিনি আলাউল হকের পুত্র ছিলেন এবং যিনি সমভাবে খ্যাত ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন। সৌধর উপর কোন উৎকীর্ণ লিপি নেই। জালালউদ্দিন মোহাম্মদ শাহর চাওয়াটা খুব স্বাভাবিক। তাঁর কবরটি রাজধানী শহরের নিকট হজরত পান্ডুয়াতে। আর রাজধানী গৌড়ে পরিবর্তিত হয় ইলিয়াস শাহী রাজপরিবারের পুনর্আগমনের পর সুলতান মাহমুদ শাহ যা স্থাপন করেন ১৪৩৬ খ্রি। এস. এম. হাসানের[১৩] মতে ঐতিহাসিক রেকর্ড সুনিশ্চিত প্রমাণ করে যে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ (৭৯৫-৮১৩ হিঃ বা ১৩৯২-১৪১০ খ্রিঃ) রাজত্ব করেন এবং যিনি পিতা সুলতান সিকান্দর শাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন যার কোন পুত্র ছিলনা। জয়নুল আবেদিন ওয়াহজউদ্দিন অথবা হাজ উদ্দিন নামে যা বুকানন[১৪] হ্যামিলটন উল্লেখ করেন। বিশ্বাস করা হয় যে গিয়াসউদ্দিন আযম শাহকে কবর দেয়া হয়েছে সোনারগাঁয়ে। যদিও বর্তমানে আমাদের যে ক্ষুদ্র জ্ঞান তার থেকে দৃঢ় ভাবে বলতে পারি না। তিনটি কবরের মধ্যে মধ্যখানেরটি কানিংহামের[১৫] মতে একটি মহিলার সিনোটাফটির উপরের অংশ যেহেতু এটি সাদামাটা। পশ্চিম দিকের কবরটি হচ্ছে তার পুত্রের আহম্মদ শাহর। তিনটি কবরের মধ্যে সবচেয়ে বড় কবরটি যার মাথায় সবচেয়ে বৃহৎ পোস্ট আছে এবং যার কবরের উপরের অংশে কলমদানী খোদিত আছে - যেটি পূর্বদিকে - সেটি নিশ্চয় রাজার সমাধি। আবিদ আলীর মতে[১৬] "যেখানে দুটি পাথরের পোস্ট দেখা যায় কবরের মাথায় একটি জালালউদ্দিন ও আরেকটি আহম্মদ শাহর। পরের কবরটির শীর্ষ দেশের পাথরটি একটু উপরে উত্তলন করা হয়ে থাকে যা প্রমাণ করে কবরটি একজন শহীদের। জালালউদ্দিন শাহর কবরের পাথরের পোস্টটি কবরের একই স্তরে অবস্থিত, যা বলে যে তিনি সাধারণ মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব আমরা র‍্যাভেনশোর[১৭] মতামত গ্রহণ করতে পারিনা।" মাযারটির ভিতরে তার স্ত্রী এবং পুত্রবধূ শায়িত আছেন। এটা আরও প্রমাণ করা যাবে যে, তৃতীয় কবরের পাথরটি যেটি আবেদ আলী[১৮] সত্যায়িত করেন, এটি নিশ্চয় সুলতান আহম্মদ শাহ, যিনি জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহের পুত্র ছিলেন, যাকে হত্যা করে শাদী খান এবং নাসির খান নামে দুই ক্রীতদাস। অতএব যতদূর মনে হচ্ছে একলাখী সমাধিতে যাদেরকে

কবর দেয়া হয় তারা হচ্ছে জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ, তার স্ত্রী এবং পুত্র আহম্মদ শাহ।

স্থাপত্যিক অলঙ্করণ ঃ

একলাখী সমাধির বাইরের নকশা প্রায় চারকোণা। এর পরিধি ৭৮''৬ X ৭৪' ফুট ৬'' ইঞ্চি। কিন্তু ভিতরটা পরিবর্তনের কারণে এটি অষ্টকোণাকৃতি ধারণ করে ৪৮ ফুট ব্যাস হয়। এ. এইচ. দানী.[১৯] বলছেন, "এ পরিবর্তন চারকোণা থেকে ভিতরে অষ্টকোণাকৃতি পরিবর্তন আনা হয়। কোণার অভ্যন্তরে ইট দিয়ে পূর্ণ করার দরুন দেওয়ালের পুরু দাঁড়ায় ১৩ ফুট ঘন। বৃহদায়তন শক্তিশালী পর্দা দেওয়াল থাকায় স্থাপত্যটি নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ কাটিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। চতুর্কায় থেকে কোণে পেনডেনটিভের ব্যবহারে গম্বুজের ভিতরে অষ্টকোণাকৃতি আনা হয়েছে। যদিও দানী[২০] এবং ক্যাথারিন বি. আশার[২১] বলছেন কুইঞ্চের ব্যবহার করা হয়েছে। একলাখী সমাধিতে যে অষ্টকোণাকৃতি নকশা দেখতে পাই এধরণের গম্বুজের আকৃতি দিল্লীতে নাসিরউদ্দিন মাহমুদের কবরে আছে যা সুলতান ঘোরী নামে পরিচিত এবং এর পুনরাবির্ভাব হয় অজানা সমাধি মোহাম্মদপুর ঢাকায়। এস. এম. হাসান[২২] বলছেন "বাঙালী স্থপতিরা নিশ্চয়ই খুব অসুবিধায় পড়তেন যখনই তারা চারকোণা ভবনকে পরিবর্তন করে অষ্টকোণাকৃতিতে রূপান্তরিত করে ভিতরের প্রকোষ্টকে নূতন রূপ দিতেন, যেটি একলাখীতে দেখানো হয়েছে। এখনও বিভ্রান্তকর স্থাপত্যের ছাত্র/ছাত্রীর কাছে যে বাঙালী স্থপতিরা কেমন করে অনেক পূর্বের স্থুল পদ্ধতি ব্যবহার করে যেখানে ঠিক পঞ্চাশ বছর পূর্বে বাঙালী স্থপতিরা বহু গম্বুজ বিশিষ্ট আদিনা মসজিদ এই একই শহরে নির্মাণ করেন"। ওয়েষ্টমাকটের[২৩] মতে ৪৮' ব্যাসযুক্ত একটি চমৎকার পূর্ণাঙ্গ গম্বুজ স্থাপত্যের জয়যাত্রা একলাখীতে প্রকাশ হয়। গম্বুজ ৫' (পাঁচ) ফুট পুরু। ফিনিয়াল কলস মোটিফের যা একটি বড় থেকে ছোট কলস হয়ে পদ্মফুল পাপড়ীর নকশার উপর বসান হয়। একটি গোলার্ধ গম্বুজ দ্বারা আবৃত যা সরাসরিভাবে দেওয়ালের উপরে বসানো হয়েছে। ড্রাম না থাকায় উপযুক্ত উচ্চতায় পৌঁছানো সম্ভবপর হয়নি। অর্দ্ধ গোলাকার গম্বুজ মোগল পূর্ব যুগের চমৎকার বৈশিষ্ট্যময় স্থাপত্যের নমুনা, যা আমরা হজরত পান্ডুয়া, গৌড় এবং আরও অন্যান্য স্থানের স্থাপত্যে দেখতে পাই। একলাখী সমাধিতে চারটি খেলনাযুক্ত প্রবেশদ্বার অভ্যন্তরে আছে যা দিয়ে প্রবেশ করা যায় যা নকশায় আছে। এস. এম. হাসান.[২৪] বলেন 'ইটের খেলানগুলো উত্তোলিত হয় পাথরের লিন্টেল হতে যা হিন্দু কারিগরের নৈপুণ্য। দরজায় লিন্টেল ও বাজু এগুলোতে হিন্দু মূর্তি খোদিত"। পার্সি ব্রাউন[২৫] লক্ষ্য করেন "প্রতিটি পাশে মধ্যখানে একটি খোলা দরজা আছে এবং দরজাগুলো পাথরের তৈরি যা প্রয়োজনে হিন্দু মন্দির থেকে বিদীর্ণ করা হয় - কিন্তু সূচারু খিলান দ্বারা লিন্টেলে বসানো হয় যাতে সার্বিকভাবে নীল থাকে খিলান ও বীমের সঙ্গে আর যার মিল আছে দিল্লীর ফিরোজীয়ান

স্থাপত্যগুলির"। কোন জানালা কিংবা লুনেট নেই যাতে ঘরের ভিতরে আলো প্রবেশ করতে পারে। বাংলার আর্দ্র আবহাওয়া এবং অনবরতঃ বৃষ্টিপাত - তাই সম্ভবত স্থপতিকে এধরণের বন্ধ ও ঢাকা স্থাপত্য নির্মাণ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করে। দেওয়ালগুলিতে বক্র কার্নিশ দেখা যায় এবং একাধিক ফোকর বিশিষ্ট বক্র প্রাচীর (ব্যাটেলমেনটেড) যা বাংলার স্থাপত্যগত ঐতিহ্য বলে পরিচিত। পূর্বেই বলা হয়েছে যে একলাখী সমাধিতে প্রবেশ করা হয় চারটি ছোট খিলানযুক্ত প্রবেশ দ্বার দিয়ে, যার পরিমাপ ৬' ৭'' ইঞ্চি, ৬' ৭'', ১৬' ৬'' ইঞ্চি। পূর্বদিকের দরজাটির কথা বলতে গিয়ে আবিদ আলী বলছেন "এর সমস্ত ঢালুর চাপ নীচের দিকে আসল কক্ষটির দিকে ন্যস্ত হয়েছে, যেখানে রাজকীয় ব্যক্তিবর্গ শায়িত। তাই বাইরে থেকে কেহ সমাধিতে প্রবেশ করতে চাইলে প্রথমেই তাকে রাজকীয় ব্যক্তিবর্গকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। যারা কবরে শুয়ে আছেন। এই সৌধর দরজার সংগে মিশে গিয়ে যে আয়তকার সেলগুলি যা একটি করে চারকোণে চারটি যেগুলো মোটা দেওয়ালের সঙ্গে মিশে আছে। এস. এম. হাসান.[২৬] মনে করেন "ইহা সম্ভবত এই আয়তকার কক্ষগুলিতে পূর্বে যারা কোরআন শরীফ পাঠ করতেন তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল।" প্রবেশ পথগুলির মাপ হচ্ছে ১৩' x ৬'' ইঞ্চি ৬' ৭'' ইঞ্চি। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে কেমন করে অন্ধকার কক্ষগুলিতে কোরআন পড়া হতো। খুব সম্ভব মোমবাতির সাহায্যে পড়া হতো। দরজাগুলোর সরু লম্বা খাঁজকাটা পাথরের এবং লিন্টেলগুলোব সাহায্যে খোলা স্থানগুলো লোহার রড দ্বারা বন্ধ করা হতো। আবিদ আলী[২৭] যথার্থই বলছেন, "পাথরের উপস্থিতি প্রবেশ দ্বারের কাছে, তাতে মনে হয় কাঠের দরজা ব্যবহৃত হতো, যা আমরা রুকন-ই আলমের সমাধি, মুলতান, পশ্চিম পাকিস্তানে দেখতে পাই"। সমাধির বাইরের কোণে যে চারটি অষ্টকোণাকৃতি মীনার, যা পার্শ্ব দেওয়ালগুলোতে এমনভাবে সংলগ্ন আছে যাতে পাঁচটি পলকাটা আটটির মধ্যে এগুলো মিশে গেছে পাশের দেওয়ালগুলোতে। দানী[২৮] বলছেন এক সময় কিউপলা দ্বারা আবৃত ছিল। কোনের বুরুজের ধারণা খুব সম্ভব তুগলোগ স্থাপত্য হতে গৃহীত হয়, কিন্তু মৌলিক তফাৎ এ দুটোতে যথেষ্ট আছে। তুগলোকী মীনারগুলি কালান এবং খিরকী মসজিদ দিল্লী তে দেখা যায়। এইগুলো গোল এবং ক্রমে ক্রমে সরু হয়েছে এবং এতে কোন অলস্করণ নেই - কেবল প্লাষ্টার দেওয়া হয় উপরে। কিন্তু এখানে মীনারগুলি অষ্টকোণাকৃতি এবং সরু হয়নি। এস. এম. হাসান.[২৯] বলছেন একলাখী মীনারগুলি হচ্ছে অর্ধগোলাকৃতি। অপর দিকে আদিনার মসজিদে বড় বড় খাঁচ কাটা মীনার দেখা যায়। দানী[৩০] ইঙ্গিত করছেন "এ মীনারগুলি বেঁটে ও মোটা এবং প্যারাপেটের উপরের অংশের কোনভাবে পৌঁছায়না"।

সবচেয়ে দেশীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একলাখী সমাধির বক্র কার্নিশ যা বাংলার একটি বৈশিষ্ট্যময় স্টাইল। কানিংহাম[৩১] জরিপ চালিয়ে জেনেছেন যে বেটেলমেনটেড কার্নিশ

যার অবস্থান দেওয়ালের মাঝে এবং যার ঘনত্ব ৩' ফুট। সৌধটির মোট উচ্চতা ২৭ ফুট। পার্সি ব্রাউন[৩২], এ. এইচ. দানী.[৩৩], সতিশ গ্রোভার[৩৪], ক্যাথারিন বি. আশার[৩৫], আবিদ আলী[৩৬], এস. এম. হাসান.[৩৭] — সকলেই বলছেন এই স্থাপত্যে বক্র করে কার্নিশ কাবভিলিনিয়ারে ব্যবহারের কথা।

পার্সি ব্রাউনের[৩৮] মতে "এই স্থাপত্যে প্রাচীন বক্র কার্নিশের উদাহরণ পাই যেটি বাংলা বাঁশের ঘরের ডিজাইন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। কেবল ফিচারটি এই উৎপত্তি থেকে গৃহীত হয়নি স্থাপত্যের সম্মুখের অংশ অর্থাৎ ফাসাদ অংশের যে খোপগুলির সৃষ্টি হয় তা সম্পূর্ণ বাংলার কুঁড়ে ঘরের বাঁশের ফ্রেমে বসানো নকশা হতে উৎপত্তি। আবিদ আলী খাঁন[৩৯] বলছেন "দেওয়ালের কোনে বক্র কার্নিশের যথেষ্ট মিল আছে সাধারণ বাংলো টাইপের বিল্ডিংয়ের সাথে"। এস. এম. হাসান.[৪০] উক্তি করেছেন "বিল্ডিংয়ের কোণায় বক্র কার্নিশের যে প্রয়োজন যে আছে — আমরা গৌড়ের এবং হযরত পান্ডুয়ায় এর ব্যবহার অনেক স্থাপত্যে তাই দেখা যায়। বর্ষাকালে সার্বক্ষণিক বৃষ্টিপাত হয় ফলে ছাদের এ বক্র কার্নিশে যে ঢালু তাতে ছাদ থেকে অনায়াসে পানি নিষ্কাসন হয়ে পড়ে ফলে বিল্ডিংয়ের কোন ক্ষতি হয় না"। সর্বশেষে ক্যাথারিন বি. আশার.[৪১] ইনভেনটরিতে মন্তব্য করছেন "ছাদের ধীর ঢালু কার্নিশ ইহা একটি স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যময় নমুনা যেটি সবকালে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলায় স্থাপত্যে ট্রেড মার্ক হিসেবে যেটি বাংলার কুঁড়ে ঘরের নমুনা হতে নেয়া হয়েছে। দানী[৪২] সবশেষে বলছেন "বাংলার স্থপতিদের একটি বড় পরীক্ষা বড় গম্বুজ নির্মাণ ক্ষেত্রে পিলার না দিয়ে কিভাবে ভার বহন করা যায়"।

অলংকরণ

একলাখী সমাধি একটি ইট নির্মিত স্থাপত্য যা সুন্দর ভাবে নানা প্রকার সজ্জায় অলংকৃত করা হয়েছে। সমাধিটি সজ্জিত করা হয় - (১) পেনটেড প্লাস্টার, (২) গ্লেজডটাইল এবং (৩) টেরাকোটা অলংকরণ।

(১) পেনটেড প্লাস্টার

সুলতানী যুগে চিত্র সামান্য ব্যবহার হয়েছে। যদিও চিত্রের সুন্দর সুন্দর নমুনা দেখতে পাওয়া যায় যা কোন অংশে ক্ষুদ্র না। যেমন আমরা একলাখী সমাধি হজরত পান্ডুয়াতে এবং ছোট সোনা মসজিদ রাজশাহীতে বাংলাদেশ এবং বড় সোনা মসজিদ গৌড়ে পেনটেড প্লাস্টারের প্রথম ব্যবহার দেখা যায়। রং দিয়ে চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে সজ্জাকরণকে বিশেষভাবে "পেনটেড প্লাস্টার" বলা হয়। এর প্রথম উদাহরণ পাই একলাখী সমাধি, ছোট সোনা মসজিদের স্বর্ণ মন্ডিত করা গম্বুজের এবং বড়সোনা মসজিদের গম্বুজে। এ.বি.এম. হোসেন[৪৩] বলছেন, "সুলতানী" যুগে চিত্রকলা খুব বেশী ব্যবহৃত হয়নি স্থাপত্যের সজ্জার ব্যাপারে।

(২) গ্লেজডটাইল ঃ

একলাখী সমাধির ভিতর ও বাইরে এক সময় ঢাকা ছিল নীল, সাদা, হলুদ এবং সবুজ টাইল দ্বারা। বেশীরভাগ কাজ ধ্বংস হয়ে গেছে। ইহা সর্ব প্রথম উদাহরণ হওয়ার পরও এই কাজ দেখতে খুবই চমৎকার ছিল। অবশিষ্ট অংশ দেখলে বোঝা যায়। প্রক্ষিপ্ত অংশগুলো যা চতুর্দিকে বেষ্টিত আছে সজ্জিত বর্ডার দ্বারা কোণ পর্যন্ত। কিন্তু প্রক্ষিপ্ত অংশগুলির মাত্র দুইটি বড় প্যানেল আছে যাহা সূক্ষ্মাগ্র খিলানযুক্ত কুলঙ্গিতে, চতুর্দিকে বেষ্টন করা আছে অতি সুন্দর সজ্জিত ব্যান্ড বন্ধনী দ্বারা ঠিক কার্নিশ পর্যন্ত সজ্জিত এবং বেটলমেনটেড দ্বারা যা গুলি চালাবার জন্য অট্টালিকার উপর নির্মিত ফোকর বিশিষ্ট প্রাচীর। এইরূপ কুলঙ্গির নমুনা আজও বিদ্যমান আছে। প্রক্ষিপ্ত ফাসাদের মাপ ৭'২'' দুটি কুলঙ্গির মাপ হচ্ছে ২'৮''।

একলাখী সমাধির অলংকরণ খুব জাঁকজমকপূর্ণ এবং বিবিধ - একটি নকশা কদাচিৎ পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং তা হলে কেবল বর্ডারগুলিতে করা হয়। এখানে সেখানে খুবই উচ্চ মানের সজ্জা যেমন নীল, সাদা, পদ্মফুল বৃহৎ পদকের মোটিফ আকারে যা অঙ্কিত। সবগুলি সজ্জা সরু একের পর অন্য খিলানের পিপার মধ্যবর্তী স্থানে অঙ্কিত। নকশাগুলিতে এত উজ্জল রং ব্যবহৃত হয় যা চোখকে ধাঁধিয়ে দেয়। কিন্তু যে চাকচিক্য মুলতান কিংবা টাইলগুলির নমূনাতে দেখতে পাই তা সম্পূর্ণ এখানে অনুপস্থিত ও অপেক্ষাকৃত নিম্ন মানের। এই স্থাপত্যের *গ্লেজডটাইল* একইভাবে নকল করে খানী জাহানের কবরবাগের হাটে ব্যবহৃত হয়েছে। দানী এবং আনজুমান আরা হাবিব[৪৪] জোর দিয়ে বলছেন একলাখী সমাধিতে প্রথম থেকে *গ্লেজডটাইল* ব্যবহারের নিদর্শন দেখা যায়। আবার লায়লা আনজুমনারা হাবিব[৪৫] বর্ণনা দিচ্ছে ''একলাখী সমাধি একটি অদ্বিতীয়-সমাধি এবং ইহা চতুর্কায় ভবন যাহা ইট নির্মিত সৌধ বক্র কার্নিশ যুক্ত। অষ্টকোণাকৃতি টারেট প্রতিটি কোণে এবং সমস্ত ছাদটি একটি গোলার্ধ গম্বুজ দ্বারা আবৃত। গম্বুজের ভিতর স্কুইঞ্চ ব্যবহৃত হয়েছে। গম্বুজের ভার বহনের জন্য পাথরের পিলার ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত ইহা একটি ইটের তৈরি ভবন যাকে সজ্জিত করা হয়েছে টেরাকোটা ফুলের নকশা কখনও আবার খোদাই করা কাল পাথরের ভাস্কর্য।

(৩) টেরাকোটা অলংকরণ ঃ

একলাখী সমাধিতে টেরাকোটা ফলক ব্যবহৃত হয়েছে যার নতুনত্ব আছে। টেরাকোটা ফলকগুলি বাইরের দেওয়ালের চতুর্দিক অলংকৃত করে। প্রত্যেকটি দরজা একটি ফ্রেমের মধ্যে বসানো অত্যধিক বিস্তারিত টেরাকোটা কাজ দেখানো হয়েছে। খাড়া ফ্রেমের বাহু ভাগ করে তিনটি ছোট চতুর্কায় প্যানেলের সৃষ্টি হয়, মধ্যখানেরটি সবচেয়ে ছোট। প্রতিটি প্যানেল যাদেরকে আবদ্ধ করা হয় একটি সজ্জিত বর্ডারের মধ্যে ফ্রিজ এরাবেস্ক

অলংকরণের দুটি পাতলা লাইনের মধ্যখানে যা অঙ্কিত চমৎকার স্ক্রোল ডিজাইন দ্বারা। মুহাম্মদ হাফিজউল্লাহ্ খান[৪৬] বলছেন "লিনটেলে প্রতিটি প্যানেলে খোদিত করা হয়েছে তিনটি টেরাকোটা কৃত্রিম গোলাপ একটি মধ্যখানে এবং দুইটি শেষে। ফাসাদে প্যানেলের উপরের অংশে পাতলা সমান্তরাল সারি, যা দেখা যায় নানা রকম টেরাকোটা, লতাপাতা ডিজাইন খালি জায়গাটি নীচে থেকে উপরের অংশের এবং প্যানেলের উপরের অংশ টেরাকোটা এরাবেস্ক নকশা পরিপূর্ণ। মধ্যখানের প্যানেলটিতে দেখা যাচ্ছে বহু খাঁজযুক্ত খিলান যার ভিতরে কুলঙ্গি বসানো আছে।

বাংলার সবচেয়ে চমৎকার অলংকরণের নকশা হচ্ছে সুলতানী যুগে ঝুলন্ত চেইন ও বেল মোটিফ। সবচেয়ে প্রথম ঝুলন্ত চেইন ও বেল মোটিফের ব্যবহার দেখা যায় আদিনা মসজিদ, হজরত পাণ্ডুয়াতে। নির্মাণ তারিখ ১৩৭৪-৮৪ খ্রীঃ এবং পরে ইহা একটি মডেল হিসাবে কাজ করে সুলতানী যুগের স্থাপত্যগুলিতে। এ.বি.এম. হোসেন[৪৭] ঝুলন্ত চেইন ও বেল মোটিফের কথা মাহী সন্তোষ মসজিদের কথা উল্লেখ করেন যেটি সুলতানী আমলে তৈরি হয় বর্তমানে যা ধ্বংসপ্রাপ্ত। যাহোক টেরাকোটা ইটের প্যানেলসমূহ যুক্তভাবে ঝুলন্ত মোটিফসহ সেগুলো দেওয়ালের গায়ে একলাখী সমাধিতে যা অবিরাম দেখা যাচ্ছে তা যেন পরবর্তী স্থাপত্যে প্রচলনের প্রবণতা হয়ে দেখা দেয় পাথর অথবা ইটে যেমন ছোট সোনা মসজিদ, বাহরাম সাক্কার কবর বর্ধমান, পশ্চিম বাংলা। সেখানে চেইন ও বেল স্থলে দু'টি কিম্বা ততোধিক বেল মোটিফ খোদাই করা আছে। টেরাকোটা অলংকরণ গম্বুজের নীচের অংশে দেখা যাচ্ছে কালী কাজের নকশা গম্বুজের নিচের অংশে চারিদিক ঘুরে ঘুরে গেছে।

তারিখ ঃ

একলাখী বলে পরিচিত সমাধিটি ১৪১৫-৩২ খ্রিঃ যা তিনি নিজে তৈরি করেন নিজ জীবনকালে। যিনি হিন্দু রাজা গণেশের পুত্র ও ধর্মান্তরিত হন যদিও কোন উৎকীর্ণ লিপি নেই। স্থাপত্যটি নিশ্চয়ই শাসকের রাজত্ব কালেই তৈরি হয় যা পূর্বেই বলা হয়েছে - সমাধিস্তম্ভটি ভিতরের সুলতানের, তার স্ত্রী এবং তার পুত্র আহম্মদ শাহের কবর আছে।

তুলনামূলক আলোচনা ঃ

(১) একলাখী স্টাইল ঃ

সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদের সমাধি হজরত পাণ্ডুয়াতে, যেটি বাস্তবিকই ইটের তৈরি ইমারত এবং দানী[৪৮] বর্ণনা দিচ্ছেন এটিকে একলাখী স্টাইল বলে যা তিনি স্বয়ং আবিষ্কার করেন। এই স্টাইল একলাখী সমাধি হতে নেয়া হয়। জন মার্শেল এই বলে সন্তোষ প্রকাশ করেন একলাখী সমাধি সত্যিকারের ইটের নির্মিত বড় বড় দেওয়ালসহ, অষ্টকোণাকৃতি মীনার, বক্র কার্নিশ, পোড়া ইঁটের অলংকরণ, দেওয়া নানা

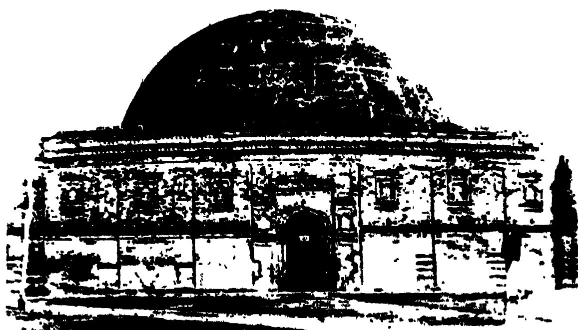
রকম অফসেট এবং দেওয়ালের উপরের অংশ এছাড়া অসংখ্য মোলডিং এর লাইন সমূহ। এস. এম. হাসান.[৪৯] বলছেন "একলাখী সমাধি একটি চতুর্কায় অট্টালিকা যেটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট যার একই স্থাপত্যগত মিল *চামকাটী* মসজিদ এবং *চিকা বিল্ডিং* সমূহতে পাওয়া যায়"। দানী[৫০] একটি তুলনামূলক আলোচনা করেন তার নিজ কথায় "আর একটি সৌধ তথাকথিত চিকা মসজিদ দুটো সৌধ বাইরে ও ভিতরের পরিকল্পনা সজ্জা খিলানযুক্ত দরজাগুলি, লিনটেল এবং একটি বড় গম্বুজ ছাদের উপর, এগুলোর মিল আছে একলাখী সমাধির সঙ্গে। এমনকি দুটো সৌধের আয়তন একই। যতগুলো হযরত পান্ডুয়াতে সৌধ আছে অক্ষত অবস্থায় সেগুলোর মধ্যে একলাখী হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে ভাল অবস্থায় টিকে থাকা একটি স্থাপত্য।

একটি মডেল স্থাপত্য আগামী দিনের জন্য ঃ

ক্যাথারিন বি আশার[৫১] বলছেন এটি একটি সর্ব প্রথম চতুর্কায় ভবনের নমুনা যেটি ইট দিয়ে তৈরি হয় বাংলাতে প্রথম এবং পরবর্তীকালে এ ধরণের ইমারত তৈরিতে নমুনা হিসাবে কাজ করে যার উৎপত্তি হয় চতুর্কায় ইটের একটি কবর থেকে যেটি পূর্ব-ভারতে প্রতিষ্ঠিত ইব্রাহিমের মীনার বলে পরিচিত, বিহার শরীফ (নালন্দা, বিহার) তারিখ ১৩৫৩ খ্রিঃ।

দানী বলছেন একলাখীতে স্থপতীরা একটি বড় গম্বুজ নির্মাণ করেন যেটির পরিধি হচ্ছে ৪৮ ডায়ামিটার পিলারের সাপোর্ট ছাড়া জন মার্শেল[৫২] নিশ্চয়ই ভুল বলেন যে পিলারগুলো স্বাধীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যা আগেই বলা হয়েছে। খুব সম্ভব এগুলোর সঙ্গে লাগানো পিলার ছিল।

অতএব একলাখী হচ্ছে সবচেয়ে কীর্তিময় উদাহরণ ইটের নির্মিত সমাধি হিসাবে যা মুগল যুগে তৈরি করা হয়। এ. এইচ. দানীও এই একই মতামত ব্যক্ত করেন "এই বিল্ডিংটি প্রকৃতপক্ষে সর্বকালের জন্য বাংলার স্থাপত্য গঠনের নমুনা হিসাবে কাজ করে। ইহা টেরাকোটা সজ্জায় একটি সৌধ এবং প্রথম মুসলিম নমুনা।



একলাখী টুম্ব

সূত্রনির্দেশ

১। Francis Buchanan Hamilton: *The History, antiquities, Topography and Statistics of Eastern India*, vol. II (edited by Martin) London 1833. p. 643.

২। Habiba Khatun: *Sonargaon its History and Memoirs* (1988-1608) unpublished Thesis, Dacca University, 1989, p. 61 (Sonargaon).

৩। *Ghulam Husain Salim Riyazas - Salatin* (Eng. Tr. by Abdus Salam), 1898. p. 118.

৪। Ghulam Husain Salim. *Ibid*. p. 118.

৫। A Cunningham, *Archaeological Survey of India*. Report, vol. XV. 1879-80. p. 38 (এখানে সংক্ষেপে *A.S R.*).

৬। Abid Ali. *Memoirs of Gaur and Pandua*. Calcutta 1934 (সংক্ষেপে *Memoirs*). p. 118.

৭। A. H. Dani. *Muslim Architecture in Bengal*, (সংক্ষেপে MAB), Dacca, 1061. p. 76.

৮। Sayed Mahmudul Hasan, *Gaur and Hazrat Pandua*, Dhaka, 1987, p. 267.

৯। Catherine B. Asher. *Inventory of Monuments*, Islamic Heritage of Bengal. UNESCO, Paris. p. 113.

১০। J. H. Ravenshaw. *Gaur, its Ruins and Inscriptions* (Edited by Mrs. Ravenshaw), London, 1876, p. 16.

১১। *Memoirs*, p 125.

১২। *ASR*, p. 38. (*ASR*).

১৩। Syed Mahmudul Hasan, op.cit, p. 246.

১৪। Francis Buchanan Hamilton, op.cit., 1833, p. 643.

১৫। *ASR*.

১৬। *Memoirs*, p 126, bn. I.

১৭। *Ravenshaw's Gaur* in Calcutta, Review 1879. quoted by S.M. Hasan. *GHP* p. 21, 276.

১৮। *Memoirs*, p. 120.

১৯। A. H. Dani. *op.cit*. p. 76.

২০। *Ibid*, p. 76.

২১। Catherine B. Asher, *op.cit*. 1, p. 113.

২২। S. M. Hasan. *op.cit*, p. 270.

২৩। Eu Westmacott. Ravenshaw's Gaur. in *Calcutta Review* 1879 quoted by S. M. Hasan. *GHP*, p. 27.

২৪। S. M. Hasan. *op. cit*, p. 273.

২৫। P. Brown, *Indian Architecture*. Bombay, p. 39-41.

২৬। *Memoirs*, 120, pp. 120-127.

২৭। S. M. Hasan. *op.cit*, p. 275.

২৮। *Memoirs*, pp. 120-127.

২৯। A. H. Dani, *op.cit.*, p. 81.

৩০। S. M. Hasan *op cit.*, p. 275.

৩১। Dani, *op.cit*, p. 81.

৩২। *ASR*, XV. p. 28.

৩৩। P. Brown *op.cit.*, pp. 39-41

৩৪। A. H. Dani, *op.cit*, p. 81.

৩৫। Saish Grover, *Indian Architecture*, Delhi, 1981, pp. 77-76.

৩৬। Catherine B. Asher. op.cit., p. 113.

৩৭। *Memoirs*, pp. 120-127.

৩৮। S. M. Hasan. op.cit., p. 275.

৩৯। P. Brown. op.cit., p 40.

৪০। Memori, p. 126.

৪১। S. M. Hasan op.cit., p. 275.

৪২। Catherine B. Asher. *op.cit*, p. 113

৪৩। *MAB*. p. 75.

৪৪। A.B.M. Hasan *The Ornamentation of the Sultani Architecture in Bengal*, Shilpakala, vol. I. 1978, p. 6.

৪৫। Dani. *op.cit.*, p. 83.

৪৬। Laila Anjuman Ara - Habid *The Art of Glazed Tile Decoration in Mediavel Bengal*, Shilpakala, vol. I. 1978, Shilpakala Academy, p. 860.

৪৭। Laila Anjuman Ara-Habib, *op.cit.*, p. 86.

৪৮। Muhammad Hafzullah Khan. *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture*, Dhaka, 1987, p. 107.

৪৯। A.B.M. Hussain. *op cit.*, vol. I. 1978, p. 6.

৫০। Dani *op.cit.*, p. 83.

৫১। J. Marshall, *op.cit.*, pp. 603-604.

ষোড়শ শতাব্দীতে কামতা কোচ রাজ্যে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব এবং শঙ্করদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের ভূমিকা

পার্থ সেন

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কোচ বংশ সম্ভূত বিশ্বসিংহ কামতা কোচবিহারে এক শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। মহারাজা নরনারায়ণের সময় কামতা কোচ রাজ্যের সীমানা ছিল পূর্বে ব্রহ্ম সীমান্ত, উত্তরে তিব্বত, পশ্চিমে মিথিলা এবং দক্ষিণে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত।[১] অমলেন্দু গুহকে উল্লেখ করে বলা যায় "The process of State formation within a tribe could have had started only where it had to a considerable extent moved from shifting to permanent cultivation with without the use of plough. For a quautam of surplus was necessary to maintain State apparatus."[২] ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এবং পূর্ব আসামে কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়। উন্নত কৃষি কার্য প্রচলনের মধ্যেই কামতা-কোচবিহারের কোচ রাজ্যের উৎপত্তির বীজ চিহ্নিত ছিল। কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে সাথে আসাম ও কামতা কোচবিহার ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন শুরু হয়। গৌহাটি, হাজো এবং কোচবিহার গুরুত্ব পূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৩]

রাজ্য স্থাপনের পর মহারাজা বিশ্বসিংহ (১৪৯৬-১৫৩৩) কামতা কোচবিহারে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করান। কালীচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকট তিনি শাস্ত্র সম্মত ভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করেন।[৪] ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণের পরে মহারাজা বিশ্বসিংহ কনৌজ, কাশী বহু ব্রাহ্মণ পন্ডিত কামতা-কোচবিহার রাজ্যে নিয়ে আসেন।[৫] বিশ্বসিংহের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত্যায়নের মাধ্যমে রাজকীয় ক্ষমতাকে শক্তিশালী করা। মহারাজা নরনারায়ণের (১৫৩৪-১৫৮৭) আমলেও সংস্কৃত্যায়নের ধারা অব্যাহত থাকে। মহারাজা নরনারায়ণের সময় সিদ্ধান্ত বাগীশ এবং বিদ্যাবাগীশ নামে দুইজন ব্রাহ্মণ কামরূপে আসেন। নরনারায়ণ তাঁদের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করে প্রত্যেককে নয়টি করে গ্রাম দান করান। সিদ্ধান্তবাগীশ কামরূপে চতুবর্ণ প্রথা প্রবর্তন করেন। প্রত্যেক বর্ণের পালনের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্ম পালনের বিধান দেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত বাগীশ প্রবর্তিত নিয়মাবলী পালনে অস্বীকার করলে শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে কামরূপের উপজাতি জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে পূজা পার্বণ করার অধিকার হারায়। রাজা থেকে শূদ্র পর্যন্ত সকলের কামাখ্যা দেবীর দর্শন নিষিদ্ধ করা হয়। নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন "In this way the Brahmana authority was

established in the whole of Kamrupa".[৬] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কোচ রাজ বংশের পূর্বে কামরূপের খেন রাজগণও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তবে সম্ভবত কামরূপের আর্য-সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে খেন রাজাগণ ব্রাহ্মণদের কোচ রাজগণের মত ধর্মীয় এবং সামাজিক দিক একাধিপত্য স্থাপন করতে দেননি। তাই দেখা যায় খেন রাজা নীলাম্বরের সময় গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে কামরূপ আক্রমণ করলে কামরূপের ব্রাহ্মণগণ তাদের সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ হবে না — এই প্রতিশ্রুতিতে খেন রাজাদের বিরুদ্ধে কামরূপের ব্রাহ্মণগণ সুলতানী সেনা বাহিনীকে সাহায্য করেছিলেন।[৭]

কোচ রাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও কামরূপে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। ফলে তাঁদের রাজানুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হত। কিন্তু কোচ রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধিপত্য কামরূপ তথা আসামের তিব্বতীয় বর্মন এবং মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কোচ, মেচ, গারো, রাভা প্রভৃতি জনগোষ্ঠী সহজে মেনে নেয়নি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সান জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অহোমরা আসামের উত্তরপূর্বাঞ্চল বিজয় করে। বামাচারী তান্ত্রিক ধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল কামরূপ। আসামে ব্যাপক শিবের উপাসনা প্রচলিত ছিল। যোগিনীতন্ত্র থেকে জানা যায় যে কামরূপে লক্ষাধিক শিবলিঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।[৮] উল্লেখ্য আসামে শিবের মূর্তি অপেক্ষা শিবলিঙ্গের পূজার প্রচলন বেশি ছিল। এমনকি মহারাজা নরনারায়ণ আসাম অভিযানের পূর্বে সেনাবাহিনীকে তুষ্ট করার জন্য হাঁস, মহিষ, ছাগল, পায়রা মদ দিয়ে শিবলিঙ্গের পূজা করেছিলেন।[৯] শিবলিঙ্গের পূজার পাশাপাশি কামরূপ শক্তি উপাসনার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। যোগিনীতন্ত্র থেকে জানা যায় যে বামাচারী তান্ত্রিক সাধনার মাধ্যমে কামাখ্যায় শক্তির আরাধনা করা হত। ফলে ব্যাপক হারে পশু ও নরবলির সাথে কামাখ্যা দেবীর পূজা হত। শুধু তাই নয় পঞ্চ 'ম' সহকারে কামাখ্যা দেবীর পূজা হত।[১০] কামরূপে শক্তি ও শিবলিঙ্গের উপাসনা ছাড়াও ব্রজায়ন বৌদ্ধধর্মের উপাসনা প্রচলিত ছিল। ব্রজায়ন বৌদ্ধ ধর্মে নির্বান লাভের উপায় হিসাবে ব্যাপক পঞ্চ 'ম' সহকারে সাধনা করা হত।[১১] স্বাভাবিক ভাবে যাদু বিদ্যা, ব্যাপক পশু বলি এবং তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব কামতা-কোচ রাজ্যের কৃষি অর্থনীতি বিকাশের সহায়ক ছিল না। অথচ মঙ্গোলীয় এবং তিব্বতীবর্মী জনগোষ্ঠীকে ব্রাহ্মণ ধর্মেব অন্তর্ভুক্ত করা কোচ রাজগণের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই দেখা যায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হয়েও মহারাজা নরনারায়ণ এক আদেশ জারী করে ঘোষণা করেছিলেন যে গোহাই কামান রাস্তার উত্তর ধারে অবস্থিত মন্দিরগুলিতে কোচ মেচ এবং কাছাড়ি জনজাতি তাদের রীতি অনুযায়ী পূজাআর্চা করবে। অপর দিকে গোহাই কামান রাস্তার দক্ষিণে অবস্থিত মন্দিরগুলিতে তিনি ব্রাহ্মণদের পূজা করার অধিকার দেন।[১২] এইভাবে মহারাজা নরনারায়ণ তাঁর রাজ্যে ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধের মীমাংসা করেন।

১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের আক্রমণে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরকূলের ভূঁইয়ারা বিধ্বস্ত হলে বিশ্বসিংহ ভূঁইয়াদের পরাস্ত করে কামতা - কোচ রাজ্য স্থাপন করেন। বিশ্বসিংহ কর্তৃক পরাজিত হলেও কায়স্থ ভূঁইয়ারা যুদ্ধ বিদ্যায় যেমন পারদর্শী ছিলেন তেমনি বিদ্বান ছিলেন। তাই বিশ্বসিংহ ভূঁইয়াদের নব প্রতিষ্ঠিত কামতা কোচ রাজ্যে উঁচু পদে নিয়োগ করেন। মহারাজা নরনারায়ণের সময় মন্ত্রী হিসেবে কায়স্থ মন্ত্রী কবীন্দ্র পাত্রের নাম পাওয়া যায়। অমলেন্দু গুহ লিখেছেন। "The very surnames like Bhuyas, Giri, Rai suggest that the Kayasthas were not only a status group but also a class of arm land controllers" ভূঁইয়ারা ছাড়াও আসামের কলিতা সম্প্রদায় লিখতে পড়তে জানতেন এবং তাঁরা কোচ মেচ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় পুরোহিত হিসেবে কাজ করতেন। আসামের কলিতারা কৃষিজীবি হলেও তাঁরা ব্যবসা বাণিজ্যে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। আমরা ভবানন্দ কলিতা নামে একজন বড় সওদাগরের নাম পাই। তিনি আসাম, গারো এবং বাংলা দেশের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করে প্রচুর ধন সম্পত্তি অর্জন করেন।[১৪] এই ভবানন্দ কলিতাই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।[১৫] কায়স্থ ভূঁইয়া বরং কলিতা সম্প্রদায় কখনই কামতা - কোচ রাজ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধিপত্য মেনে নেয়নি। তাই পরবর্তীকালে এই দুই সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে শঙ্করদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক ভাবে ক্ষমতাচ্যুত হলেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও পৃষ্ঠপোষকতা করা কায়স্থরা পুনরায় আসামের সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন।

শঙ্করদেব আসামের নওগাঁ জেলার বাসিন্দা কুসুম ভূঁইয়ার পুত্র ছিলেন। ই. এ. গেটের মতে শঙ্করদেব ১৪৪৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১৬] আসামে যখন তান্ত্রিক ধর্মের প্রাবল্য এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যখন কোন সামাজিক সংহতি বোধ গড়ে ওঠেনি তখন প্রয়োজন ছিল এমন এক ধর্মের যা প্রচলিত ধর্মবোধকে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে গড়ে তুলতে সমর্থ হবে এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যবোধ গড়ে তুলতে শঙ্করদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম আসামে এই প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কামরূপে বিষ্ণুর উপাসনা বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। হাজোতে হয়গ্রীব মন্দিরে অস্তিত্ব তার প্রমাণ। বিষ্ণুর এক অবতারের নাম হয়গ্রীব। তবে কামরূপে বিষ্ণুর উপাসনাও তান্ত্রিক মতে হত।[১৭] শঙ্করদেব ভক্তিধর্মের অনুকরণে একশরণ নামধর্মের প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে একমাত্র নাম কীর্তনের মাধ্যমেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। কবীরের মতো শঙ্করদেব মূর্তি পূজার বিরোধী ছিলেন এবং সমস্ত রকম যাগযজ্ঞ ও পশুবলির তিনি বিরোধী ছিলেন। শঙ্করদেব মনে করতেন ভগবানকে পাওয়ার জন্যে সংসার ধর্ম ত্যাগ করার কোন প্রয়োজন নেই। শঙ্করদেব প্রচলিত ধর্মের মূল নীতি তিনি ভাগবত পুরাণ থেকে গৃহীত হয়েছে। শঙ্করদেব মনে

করতেন ভক্ত নিজেকে ভগবানের সেবক বলে মনে করবে। গুরু, দেব, ভক্ত এবং নাম — এই চার মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল শঙ্করদেবের ধর্ম।[১৮] তবে চৈতন্য দেবের মত শঙ্করদেব রাধাকৃষ্ণের যুগল আরাধনা সমর্থন করেননি। শঙ্করদেব শুধু কৃষ্ণকেই উপাসনা করার নির্দেশ দেন। কারণ শঙ্করদেব মনে করতেন বামাচারী তান্ত্রিক ধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র আসামে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা সাধারণ মানুষের কাছে ভুল সঙ্কেত পৌঁছাবে। এই প্রসঙ্গে অনিমা দত্ত লিখেছেন "In this context he argues that madhura type of devotion may be high as a personal ideal, but if it falls into less enlightened mind after the death of its real founder it is sure to degenerate".[১৯] শঙ্করদেব প্রবর্তিত উদার ভক্তিধর্মে জাতিভেদ প্রথার কোন স্থান ছিল না। ব্রাহ্মণ, মুসলিম, কৈবর্ত, ভূটিয়া, কাছাড়ী সহ সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ শঙ্কর দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা ছিল। সমগ্র আসামে শঙ্করদেব বৌদ্ধ ধর্মের অনুকরণে অসংখ্য সত্র এবং নামঘর গড়ে তোলেন।[২০] চর্তুদশ শতকের ভক্তি আন্দোলনের প্রবক্তাদের মত শঙ্করদেব আঞ্চলিক ভাষায় তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। অসমীয়া ভাষায় ভাগবত পুরাণের অনুবাদ করেন।

আসামে শঙ্করদেব প্রবর্তিত ভক্তি ধর্ম ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করলে ব্রাহ্মণগণ ক্ষুব্ধ হন এবং অহোম রাজা সুহমুঙ্গের (১৪৯৭-১৫৩৯) নিকট অভিযোগ করেন যে শঙ্করদেব প্রচলিত ধর্মকে বিকৃত করেছেন। অহোম রাজা শঙ্করদেবের বিরুদ্ধে সরাসরি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিলেও তাঁর শিষ্য মাধব দেবকে ছয় মাসের জন্য কারাদন্ড দেন। শঙ্করদেবের পরিবারের অহোম প্রশাসনে প্রভাব থাকার জন্যই সম্ভবত শঙ্কর দেব শাস্তি এড়াতে সমর্থ হন।[২১] অহোমরাজ ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের চাপে শঙ্কর দেবের শিষ্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, আসলে অহোমরাজ সুহমুঙ্গের বৈষ্ণব সত্রগুলির প্রতি ক্ষোভের কারণ অন্যত্র লুকিয়েছিল। আসামে প্রত্যেক সবল ব্যক্তিকেই সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক ভাবে কাজ করতে হত। এদেরকে পাইক বলা হত। সামরিক বাহিনীতে কাজের বিনিময়ে পাইকরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে চাষের জন্য নির্দিষ্ট ভুখন্ড পেত। যুদ্ধের সময় ছাড়া পাইকরা নিজ জমিতে কৃষিকাজ করত। কিন্তু ধীরে ধীরে পাইকদের উপর রাষ্ট্র এবং সামন্তদের নিপীড়ণ বাড়তে থাকে। পাইকদের অবসর সময়ে রাষ্ট্র এবং সামন্তদের জমিতে বেগার শ্রম দিতে বাধ্য করা হয়। ফলে দলে দলে পাইকরা বৈষ্ণব সত্রগুলিতে যোগ দিতে শুরু করে। বৈষ্ণব সত্রগুলিতে পাইকদের যোগদান ছিল পাইকদের রাষ্ট্রীয় নিপীড়ণের বিরুদ্ধে এক ধরণের নীরব প্রতিবাদ। তাই বৈষ্ণব ধর্ম অহোম রাজের আক্রমণের সম্মুখীন হয়। এমনকি সত্রগুলি থেকে বহু সন্ন্যাসীকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে রাষ্ট্র রাস্তা নির্মাণের কাজে নিয়োগ করত। অমলেন্দু গুহ লিখেছেন "It appears, therefore, there was a co-relation between the spread of vaisnavaism and the peasant protests against

the imposed feudal control and bureaucratization of the militia system from above."[২২]

আসামে রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম আক্রান্ত হলে শঙ্করদেব কোচবিহারে চলে আসেন। এখানেও ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় কামতা কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ শঙ্করদেবকে বন্দী করার জন্য লোক পাঠান। শঙ্কর দেবকে রাজার লোকজন না পেলেও শঙ্করদেবের দুইজন শিষ্যকে গ্রেপ্তার করে।[২৩] কিন্তু মহারাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা চিলা রায় শঙ্করদেবকে আশ্রয় দেন এবং বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্টপোষকতা করেন। চিলা রায়ের অনুরোধে নরনারায়ণ শঙ্করদেবকে কামতা - কোচবিহার রাজ্যের গোমস্তা নিয়োগ করেন।[২৪] কামতা - কোচবিহারে আসামের মত পাইক ভিত্তিতে সামরিক বাহিনী গঠিত হলেও রাজনৈতিক কারণে নরনারায়ণ এবং চিলা রায় শঙ্করদেবের পৃষ্টপোষকতা করেন। ঐ সময় মহারাজা নরনারায়ণ আসাম আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। শঙ্করদেবের সমর্থক আসামের বারো ভূঁইয়া গোষ্ঠী কোচ রাজাকে আসামের বিরুদ্ধে অভিযানে সহযোগিতা এবং সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেয়। উল্লেখ্য প্রতাপ রায় এবং গন্ভুযাঁন ভূঁইয়া অহোম রাজের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় কোচ সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন। উল্লেখ্য এই দুই ভূঁইয়া শঙ্করদেবকে অহোম রাজের থেকে পালিয়ে কোচবিহারে আসতে সহযোগিতা করেছিলেন।[২৫]

এরপর থেকে শঙ্করদেব কোচ রাজা নরনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। কোচবিহারে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক শঙ্করদেবকে মহারাজা নরনারায়ণ মধুপুরে সত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দান করেন বিভিন্ন জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত কামতা কোচবিহারে শঙ্করদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম সামাজিক সমন্বয় আনতে সক্ষম হয়। বামাচারী তান্ত্রিক ধর্মের অন্যতম পীঠস্থান কামরূপে পশুবলি ও নরবলি প্রথা রদ করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল বৈষ্ণব ধর্ম। বৈষ্ণব সত্রগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বৈষ্ণব সত্রগুলি জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষির বিস্তার ঘটাতে সহায়তা করেছিল। সর্বোপরি শঙ্করদেব এর একশরণ নাম ধর্ম পরোক্ষ ভাবে রাজার প্রতি জনগণের অনুগত্য সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছিল।

উত্তর ভারতের মত শঙ্করদেব প্রবর্তিত ভক্তি আন্দোলন আসামে জাতিভেদ প্রথা এবং তান্ত্রিক ধর্মের বিরোধিতা করলেও ব্যাপক কোন সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করার মত কর্মসূচী ছিল না শঙ্করদেবের ধর্মমতে। শঙ্করদেব জাতিভেদ প্রথা উচ্ছেদ করতে সাহস পাননি বরং তিনি সমস্ত জাতিকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। শঙ্করদেবের মৃত্যুর পর তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। শঙ্করদেব উত্তরাধিকারী নির্বাচন নিয়েও তাঁর দুই শিষ্য দামোদর দেব এবং মাধব দেবের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দেয়। দামোদর দেব নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন। দামোদর দেবের গোষ্ঠী শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দামোদর দেবের কিছু কিছু সত্র

তান্ত্রিত পদ্ধতিতে সাধনা করত এবং জাতিভেদ প্রথা মেনে চলত।[২৬] কোচবিহারে নরনারায়ণের মৃত্যুর পর মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ (১৫৮৭-১৬২৭) মাধব দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁর রাজ্যে পশুবলি নিষিদ্ধ করেন।[২৭] মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের পরে পরবর্তী রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাছাড়া নিম্নবঙ্গের কাছাকাছি হওয়ায় কোচবিহারে ধীরে ধীরে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম প্রাধান্য বিস্তার করে। বর্তমান কোচবিহারের রাজবাড়ি সংলগ্ন খাগড়া বাড়িতে স্থাপিত রাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং কালীমাই রোডে স্থাপিত রাধামাধব মন্দিরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবের পরিচায়ক।[২৮]

সূত্রনির্দেশ

১। (Eng tra) S.C Ghosal. History of Coochbehar . Coochbehar. 1942. P. 154-155.

২। Amalendu Guha 'The Medieval Economy of Assam' in Edi Tapan Roy Choudhury - Irfan Habib, *The Cambridge Economic History of India*. vol I. পৃঃ ৪৮০।

৩। ঐ পৃঃ - ৪৯৯।

৪। সূর্যদেব সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত, *গন্ধর্বনারায়ণের বংশাবলী*, ৫২ পত্র।

৫। খাঁ চৌধুরী *আমানতউল্লা, কোচবিহারের ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃঃ ৯৫।

৬। N. N. Vasu. *Social History of Kamrupa* vol II, New Delhi. 1983. পৃঃ ৫৯-৬০।

৭। সম্পাদনা নৃপেন্দ্রনাথ পাল *গোসানীমঙ্গল*, রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী, ভূমিকা-২৯।

৮। *যোগিনীতন্ত্র*, শ্লোক, ৩৬।

৯। N. Neogi *Sankardeva and his times*, Gauhaty. 1998. পৃঃ ৮০।

১০। ঐ পৃঃ ৮২-৮৩।

১১। K. L. Barman. "Kamrupa and Vajrayana". in *Reading in the History and culture of Assam*, Kamrupa Anusandhana Samity Gauhati. পৃঃ ১৫।

১২। M. Neogi, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৮০।

১৩। Amalendu Guha. *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৪৭৯।

১৪। M. Neogi, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৭৮।

১৫। Tapan Roy Choudhury & Irfan Habib (edi), *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৪৯০।

১৬। M. Neogi, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৯৮।

১৭। Jogendra Chandra Ghose "Hayagriva Worship in Assam", in *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮৩-৮৬।

১৮। D. Nath. History of the Koch Kingdom 1515-1615. New Delhi. 1989, পৃঃ ১৭১-৭২।

১৯। Anima Dutta, *Assam Vaishnavaism*, New Delhi. 1989. পৃঃ ৩২।

২০। D. Nath *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৭১-৭২।

২১। M. Neogi *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১১১-১২।

২২। অমলেন্দু গুহ *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৫০৩।

২৩। N. N. Vasu, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১০৩-১০৪।

২৪। *ঐ*, পৃঃ ১০৩।

২৫। *ঐ*, পৃঃ ১১২।

২৬। M. Neogi, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৩।

২৭। খান চৌধুরী আমানতুল্লা পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫১।

২৮। দ্রষ্টব্য পার্থ সেন *Study of Some aspects of the History of Kamata - Kochbihar since 1772 to the accession of Sivendranarayana*, unpublished thesis, *N.B U.* 1990. পৃঃ ১০০।

মধ্যযুগের বিস্মৃত বন্দর ভগবানগোলা

অনিরুদ্ধ দাস

বিস্মৃত অর্থাৎ স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া মুর্শিদাবাদের মধ্যযুগের বন্দর ভগবানগোলা বিষয়ে 'পেপার' (গবেষণাপত্র) এর অবতারণার কারণ ইতিহাস উল্লেখিত এই বন্দরের অবস্থান মধ্যবর্তী সময়ে খুঁজে না পাওয়া এবং সম্প্রতি তা পুনরাবিষ্কৃত হওয়া। পরবর্তী অংশে বিস্তৃত হয়েছে বন্দরের ইতিহাস এবং তা খুঁজে পাওয়ার বিষয়।

পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায় যে একটি বন্দর ছিল তা অনেক ইতিহাস গ্রন্থেই উল্লেখিত। খান মহম্মদ মহসীন তাঁর A Bengal District in Transition: Murshidabad 1765-1713 গ্রন্থে জানাচ্ছেন, মুর্শিদাবাদের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য এবং পশ্চাদভূমি যে বন্দরের সঙ্গে যুক্ত ছিল তা নিঃসন্দেহে ভগবানগোলা। রাজধানী থেকে আঠারো মাইল দূরে গঙ্গার ওপর অবস্থিত এটি। ভগবানগোলা বেশির ভাগ জলপথই নিয়ন্ত্রণ করত এবং জেলার বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে এর নদী পথে যোগাযোগ ছিল। আলিবর্দী খানের সময় শতাব্দীর মধ্যভাগে এটিই ছিল প্রধান বন্দর। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমদানি করা দ্রব্য জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সরবরাহ করা হত।[১] বর্তমানে এই বন্দরের অবস্থান ভগবানগোলা থানার পলাশবাটী মৌজার ৪ নম্বর দাগে। পলাশবাটী ঘাটের উত্তর দিকের ঘাটগুলির নাম টুলটুলিপাড়া, পটন বা পাটন, মৃগী, পাইকপাড়া, বাজিতপুর, বালি খরিয়া, কুমিরদহ, পাঁচবেড়িয়া, ভান্ডারদহ, কালান্তর ও সুতি। পটন বা পাটনের ঘাট থেকে উত্তরদিকে চলে গেছে একটি খাল ঐ খালটি আটমুখো সাঁকো হয়ে মিশেছে পদ্মায়। পাটনের ১ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে বালিয়া হোসেন নগর মৌজায় ৩৮৮ দাগে পাড়সহ বাঁধানো পুকুর চাঁদের পুকুর বলে কথিত। স্থানীয় বয়স্ক লোকেদের মতে এখানেই ছিল চাঁদ সদাগরের বাস। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যেও দেখা যায় ধনপতি সদাগর পুত্র শ্রীমন্তকে নিয়ে পাটন অতিক্রম করে ভান্ডারদহ দিয়ে গিয়েছিলেন বাণিজ্য করতে।

বন্দরের সঙ্গে বাজার সংযুক্ত থাকা বা লাগোয়া অবস্থানে থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার। খান মহম্মদ মহসীন জানাচ্ছেন অষ্টাদশ শতকে ভগবানগোলা ছিল ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শস্য বাজার।[২] সমসাময়িক বাঙালী কবি বিজয়রাম তীর্থমঙ্গলে এই বাজারের ব্যাপ্তি ৮ মাইল বলে বর্ণনা করেছেন। শস্য থেকে রাজস্ব আদায় হত তিন লক্ষ টাকা। বছরে শস্য কেনা বেচা হত সাড়ে ছ'লক্ষ টন বা এক লক্ষ আশি হাজার মণ। অষ্টাদশ

শতকের শেষদিকে এই বন্দরের গুরুত্ব বাড়ে কারণ উত্তর-পশ্চিমের রাজ্যগুলি থেকে বাংলায় তুলোর আমদানি। বাংলায় তুলোর বাজার এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে বেনারসের কালেকটর ১৭৮৮ সালে লিখছেন, মীর্জাপুরের বাজার ভগবানগোলার বিক্রয় মূল্য কর্তৃক প্রভাবিত হত - ঢাকা, কলকাতা এবং অন্যান্য স্থান থেকে যেখানে ব্যবসায়ীরা তুলো ক্রয় করতে আসত।[৩] বাংলার নবাব সরকারের কাছে এই ভগবানগোলার এত গুরুত্ব ছিল যে একটি খালের দ্বারা একে ঘিরে রাখা হয়েছিল। প্রয়োজনে একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারের অধীনে এক হাজার অশ্বারোহী এবং এক হাজার পদাতিক গঙ্গা এবং শহরের মধ্যে সরবরাহ বজায় রাখায় সাহায্য করত।[৪] মধ্যযুগের ঐ বন্দর ও বাজারের নদী গর্ভে বিলীন হওয়া সম্পর্কে বলা যায় মধ্যযুগে এই অঞ্চলে প্রধান বন্দর ছিল ভাগীরথীর ওপরেই এবং বর্তমানের গোবরা নালায় কালুখালি পাটন হয়ে মধ্যযুগে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল। এবং ভান্ডারদহ, সুতী হয়ে জলঙ্গী নদী।

ভগবানগোলা বন্দর এবং বাজারের গুরুত্ব এতটাই ছিল যে ১৭৪৩ সালে মারাঠারা এটি আক্রমণ করে এবং এটির পতন হয়। যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বেশ কিছু দিনের জন্য আবার ঐ বাজার ও বন্দরের পুনরুজ্জীবন ঘটলেও উনবিংশ শতাব্দীতে এসে ভাগীরথী ও পদ্মার সাথে সংযোগকারী খালগুলি মজে যেতে থাকলে ভগবানগোলায় পুনরায় পতন শুরু হয়। ভগবানগোলার থেকে আদায়ীকৃত রাজস্ব বাংলার নবাব সরকারে খান মহল শীর্ষকে লেখা ঐ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ করে। এর অর্থ ঐ অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ভার সরকার নিজের হাতেই রেখেছিল, কাউকে ইজারা দেওয়া হয়নি।

২০০১ সালের জুন মাস নাগাদ মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুরের 'ইতিহাস পরিক্রমা' নামক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ দেখতে পান পলাশবাটী মৌজার ৪ নম্বর দাগে প্রায় ২৫০ ফুট চওড়া উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত মজা নদীর পূর্বপাড়ে রয়েছে ৭৫ ফুট লম্বা, ৪০ ইঞ্চি চওড়া এবং মাটির ওপর ৪ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ছোট ছোট বাংলা ইঁটের বা লাখোরিয়া ব্রীকে তৈরি প্লীন্থ বা মধ্যযুগের জাহাজ ঘাটার জেটি বলেই প্রতীয়মান হয়। ঐ স্থান থেকে পূর্বদিকে সোজা খড়িবোনা, আখেরিগঞ্জ হয়ে প্রায় ৮০ ফুট চওড়া রাস্তা চলে গিয়েছে রাজসাহীর দিকে। ঐ রাস্তার সঙ্গেই যোগাযোগ আছে রাজমহল ও পাটনার। ঘাট থেকে উঠে দক্ষিণ পূর্বে আমডহরা, হাজিগঞ্জ, রমনাপাড়া, বলরামপুর প্রভৃতি স্থানে এখনও পাওয়া যাচ্ছে অজানা ভাঙা ইঁটের টুকরো, প্রাচীন প্রত্ন সামগ্রী ও ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িঘরের চিহ্ন। স্থানীয় বয়স্কদের মন্তব্য ঐ চওড়া রাস্তা বরাবর কিছুদিন আগেও ছিল প্রাচীর। এখন সেসবের লেশমাত্র নেই। পলাশবাটী ঘাটের, স্থানীয় লোকেদের মতে, আগে নাকি নাম ছিল বাজার ঘাট। মধ্যযুগের বাজার ও জনপদে খুঁজে পাওয়া প্রচুর প্রত্নসামগ্রীর মধ্যে সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফার্সী ভাষায় লেখা মুদ্রা যেমন পাওয়া গিয়েছে, তেমনই পাওয়া গিয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর ইস্ট

ইন্ডিয়া কোম্পানীর নামোল্লেখিত মুদ্রাও। স্থানীয় বহু মানুষ ঐ অঞ্চল থেকে পেয়েছেন সোনা, রূপো ও তামার মুদ্রা। ১৮৩৫ সালের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নাম খোদিত ঐ মুদ্রা থেকে মনে হয় মধ্যযুগের ঐ বন্দর ও বাজার হয়তো উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত কার্যকলাপে নিযুক্ত ছিল।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ইতিহাস পরিক্রমা' উদ্যোগ নিয়ে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে ভগবানগোলায় ঐ জেটি দুটির অবস্থানের কথা জানালে উক্ত বিভাগ থেকে পরিদর্শকরা এসে তদন্ত করে M-10/2-P.11-02 মেমো নম্বরেব ১৭-১০-২০০১ তারিখের চিঠিতে রাজ্য সরকারকে জানিয়েছেন এই ভগ্নাবশেষ মধ্যযুগের শেষ দিকের। ঐ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ভারতের সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীকেও রাজ্যের সীমান্তে ঐ ৮০ ফুট চওড়া রাস্তার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা বর্তমানে অব্যবহার্য্য। বলে রাখা ভাল, সম্প্রতি স্থানীয় বিধায়ক ঐ জেটি দুটি সংরক্ষণের এবং মজা নদীর ওপর সেতু তৈরির পরিকল্পনা রূপায়ণে সাহায্য করবেন বলে জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে সেতু নির্মাণের জন্য প্রস্তর ফলকও বসানো হয়েছে। ইতিমধ্যে সেতু নির্মাণের জন্য প্রস্তর ফলকও বসানো হয়েছে।

বিস্তৃত আলোচনায় অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায়ের অভিমত মধ্যযুগের ঐ বন্দরের পুনরাবিষ্কার হয়তো হয়ে থাকতে পারে কিন্তু ঐ জেটিগুলিকে দেখে বন্দর ঠিক বলা যায় না, যদি আমরা অধ্যাপক অতীন দাশগুপ্তের সুরাট বন্দরের ওপর গবেষণাকে খেয়াল করি। বড় বড় নৌকো হয়তো নদী পথে এসে ঐ স্থানে পণ্য ওঠানো নামানো করত বন্দরের পশ্চাদভূমি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের লেখায় অতিশয়োক্তি থাকতে পারে। এমনকি অতিশয়োক্তি থাকতে পারে কবি বিজয় রামের তীর্থমঙ্গলেও। তবে ভাগীরথীর পুরনো খাতে অবস্থিত ঐ স্থানকে নদী বন্দর বলে অস্বীকার করা যায় না। খান মহম্মহ মহসীনের বইতেও ডাচদের তৈরি পুরনো ম্যাপে MAXVDABAD চিহ্নিত রয়েছে এবং ছবির শীর্ষক Murshidabad Port in 1786।[৫]

সূত্রনির্দেশ

১। সাক্ষাৎকার শ্রী শ্যামল দাস ও শ্রী রওনাকুজ্জামান (বন্দর পুরনাবিষ্কারের সঙ্গে এঁদের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত) যথাক্রমে সাধারণ সম্পাদক ও সদস্য 'ইতিহাস পরিক্রমা,' বহরমপুর।

২। পলাশবাটী মৌজার আকবর আলি, আব্দুল হাই, সোহেল প্রমুখ সাধারণ মানুষের বাসিন্দার সাক্ষাৎকার।

৩। পলাশবাটী ঘাটের পশ্চাদভূমি থেকে প্রাপ্ত ফার্সী ও ইংরাজী ভাষায় লেখা তাম্রমুদ্রা ও পুরাতন দ্রব্যের ভগ্নাবশেষ।

৪। বিশেষ সাক্ষাৎকার ঃ অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিলুপ্ত গ্রাম গোবিন্দপুর

উত্তরা চক্রবর্তী

আজকের কলকাতা শহর হুগলি নদীর ধারের তিনটি গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছিল। কলিকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামেরই অস্তিত্বের সূচনা যোল শতকের মাঝামাঝি থেকে। গ্রামগুলির মধ্যে গোবিন্দপুরই তুলনামূলক ভাবে প্রাচীন। নদীর ধারের গ্রাম গোবিন্দপুরে গড়ে ওঠা এবং অবলুপ্তি দুটি নদীর গতি প্রবাহের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল।

ষোল শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সরস্বতী নদী ছিল বাংলার বাণিজ্যের প্রধান জলপথ। প্রধান বাণিজ্য শহর ছিল সপ্তগ্রাম। সরস্বতী দক্ষিণে বেতোরের (এগারো/বারো শতকের বেতড্র) কাছে, মূল গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়ে সমুদ্রে পৌঁছাত। বেতোরের আগেই গঙ্গার মূল খাত, আদি গঙ্গা, প্রবাহিত ছিল। কোন এক সময় আদি গঙ্গাই বাণিজ্যের জল পথ ছিল। পনেরো শতকে গঙ্গার মূল প্রবাহ একটি সামান্য খাল ছিল। ষোল শতকের কোন এক সময় সরস্বতীর খাত শুকিয়ে যাওযায় জলধারা ভাগিরথী বা হুগলির খাত দিয়ে বইতে শুরু করে। তার ফলে আদি গঙ্গা মজে যায়। সুতরাং বাণিজ্যের অন্য নদীপথ খোঁজার দরকার হয়। এই তাগিদেই সপ্তগ্রামের শেঠ-বসাক নামের কিছু তন্তু ব্যবসায়ী গঙ্গা নদীর নতুন জলপ্রবাহের এক পারে বসতি করে। তাঁদের বসতি থেকেই গোবিন্দপুর গ্রামের উদ্ভব। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, তাঁর *কলিকাতার ইতিবৃত্ত* বইতে, শেঠ বসাকদের সপ্তগ্রাম ছেড়ে আসার আরও একটি সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করেছেন। সপ্তগ্রামের পদস্থ কর্মচারী এবং শাসকগোষ্ঠীরা ধনী ব্যবসায়ীদের থেকে নানাভাবে অর্থ আদায় করত; সম্ভবত এই আর এক কারণেই শেঠ-বসাকরা সপ্তগ্রাম ছেড়ে বেশ কিছুটা দূরে মূল গঙ্গার জলপ্রবাহের পুবধারের জঙ্গল কেটে নতুন বসতি তৈরি করেছিলেন। ঐ অঞ্চলের কাছাকাছি বরানগরে বহু তাঁতীর বাস ছিল। সরাসরি এই সব তাঁতীদের সঙ্গে ব্যবসা করা এবং কোনওরকম রাজনৈতিক শক্তির আওতার বাইরে থাকার জন্যই শেঠ-বসাকরা সম্ভবত গোবিন্দপুরের পত্তন করেন।[১] গোবিন্দপুর স্থাপনের সন, তারিখ নিয়ে নানারকম বিতর্ক আছে। আদি গঙ্গা এবং 'নতুন গঙ্গা'র সঙ্গমেই গোবিন্দপুর ১৫২০ থেকে ১৫৩৭ সালের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মনে করেন ১৫১৫ সালেই গোবিন্দপুর বসতি গ্রামে পরিণত হয়েছিল। ১৪৯৫-৯৬ সালে বিপ্রদাস পিপ্‌লাই 'কলিকাতা'র উল্লেখ করেছেন, তাঁর মনসাবিজয় কাব্যে। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের মতে, মুকুন্দরামের সময় কলিকাতা ছাড়াও 'ধনস্ত' বলে একটি গ্রামের

উল্লেখ আছে। এই গ্রামটিই গোবিন্দপুর বলে তিনি মনে করছেন।[২] রাজা প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক কবিরামের *দিগ্বিজয় প্রকাশে*, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা, যশোর ও হুগলি জেলা নিয়ে 'কিলকিল্লা' প্রদেশ বলে একটি প্রদেশের কথা বলা হয়েছে। এই কিলকিল্লা প্রদেশের গঙ্গার পূর্ব পাড়ের প্রাণ হল গোবিন্দপুর।[৩] ১৭১০ সালের আলেকজান্ডার হ্যামিলটনের বিবরণে গভর্নারপুর (গোবিন্দপুর), টাউন কলকাতার দক্ষিণ সীমা বলে ধরা হয়েছে। এর আগে ১৬৫৬ সালে ভ্যালেন্টাইনের তৈরি মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে গোবিন্দপুরের উপস্থিতি, গভর্নারপুর হিসেবে। ১৬৭৬ সালে ইংরেজ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে স্ট্রেইনশাম মাস্টার এবং ১৬৭৯ সালে ক্যাপটেন স্ট্রাফোর্ড নদীর মোহনা থেকে উপর দিক পর্যন্ত বাণিজ্যের সম্ভাবনাযুক্ত অঞ্চলের সন্ধানে আসেন। দু'জনের ডায়েরিতেই গোবিন্দপুরের তন্তু ব্যবসায়ী শেঠ-বসাক, তাঁতীদের বসতি গ্রাম এবং তাঁদের ফলাও সুতো ও কাপড়ের ব্যবসার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪]

গোবিন্দপুর নাম নিয়েও একটি বিতর্ক উনিশ শতকীয় এবং বিশতকের প্রথম দিকের লেখকদের মতামত ও উক্তি থেকে উঠে আসছে, দেখতে পাই। গৌরদাস বসাক, অথবা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছিলেন শেঠ বসাকদের প্রতিষ্ঠিত দেবতা গোবিন্দজীর নামেই গ্রামের নামকরণ। বিশশতকের প্রথম দিকের লেখক প্রাণকৃষ্ণ দত্ত কিন্তু মনে করেছেন, জনৈক গোবিন্দশরণ দত্ত টোডরমল এবং মানসিংকে সহায়তা করার জন্য পুরস্কার হিসেবে এই অঞ্চল লাভ করেন। তাঁরই নামে গ্রামের নাম হয় গোবিন্দপুর। এই বিষয়ে তিনি কেদার দত্ত ভক্তি-তীর্থের 'দত্তবংশ' এবং কবিরামের *দিগ্বিজয় প্রকাশে* গোবিন্দপুর সংক্রান্ত একটি স্তোত্র উল্লেখ করেছেন

গঙ্গা পূর্বতটে রম্যে কালিকাপীঠ সন্নিধৌ।
গোবিন্দশরণশ্চক্রে গোবিন্দপুর পত্তনং।।[৫]

ষোল শতকের মাঝামাঝি, গোবিন্দপুর গ্রাম বর্ধিষ্ণু তন্তু ব্যবসায়ীদের গ্রাম; আবার বস্ত্র ব্যবসায়ের নতুন বাণিজ্য কেন্দ্রও বটে। এই সময়েই গোবিন্দপুর গ্রামের পাশাপাশি আরোও দুটি সংলগ্ন গ্রাম তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কলিকাতা, একটি বড় বাজার এবং সুতানুটি, হাট হিসেবে শুরু হলেও পরে বসতি গ্রামে তৈরি হল। শেঠ-বসাক, উদ্যোগী বণিকরা হুগলি, সপ্তগ্রাম এবং আশেপাশের অঞ্চল থেকে তাঁতীদের নিয়ে বসতি করিয়েছিলেন সুতানুটি হাটে। সুতানুটি প্রথম দিকে তাঁতীদেরই গ্রাম ছিল। ছবিটা ছিল এইরকম — শেঠ বসাকদের বসতি গ্রাম ছিল গোবিন্দপুর, সুতানুটি হল মূলত কারিগরদের এলাকা, আর কলকাতা কারবারের জায়গা। ষোল শতকে এই গ্রামগুলি যে ব্যস্ত জনবসতি তার প্রমাণ পাওয়া যায় মধ্যযুগীয় কাব্য সাহিত্য থেকে। ষোল শতকের শেষের দিকে, বাংলায় মোগল শাসন কায়েম হয়েছে। *আইন-ই-আকবরিতে* কলকাতার উল্লেখ হয়েছে। দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের রাজনৈতিক গুরুত্বও মোগল শাসনে

উপলব্ধ হয়েছে। গঙ্গা নদীর অপর পারে তৈরি হচ্ছে থানা দুর্গ; এপারে মেটিয়াবুরুজ দুর্গ। এই অঞ্চলের জায়গীরদার, জমিদার হিসেবে পরিচিত হচ্ছেন লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার। ১৬৯৮তে তাঁদের পরিবারের কাছ থেকেই ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি সুতানুটি, গোবিন্দপুর এবং কলিকাতা, এই তিন গ্রামের রাজস্ব আদায়ের অধিকার কিনে নিল।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে গোবিন্দপুর গ্রামের উদ্ভবের সঙ্গে বিদেশী বণিকদের বাণিজ্য ব্যবসায়ের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ষোল শতকের শেঠ-বসাকরা সপ্তগ্রাম ত্যাগ করে এই অঞ্চলে এসেছিল পর্তুগীজ বাণিজ্যকে আগে ভাগে ধরবার জন্য। পর্তুগীজ বাণিজ্যের পতনের পর, ১৬৭৬ থেকে তারা ইংরেজদের সঙ্গে কাজকারবার শুরু করে। ১৬৭৬-এ স্ট্রেনসাম মাস্টারের সঙ্গে শেঠ-বসাকদের প্রথম যোগাযোগ। পর্তুগীজদের দেখাদেখি, হুগলিতে প্রথমে বাণিজ্য কুঠি তৈরি করলেও, সমুদ্রের কাছাকাছি, গোবিন্দুপর গ্রামই তাদের পছন্দ ছিল বেশি। হুগলির মোগল পদস্থ কর্মচারীদের কড়াশাসনেও তারা উত্যক্ত বোধ করছিল। ফলে ১৬৯০ তে জব চার্নকের পাকাপাকি সুতানুটিতে আসা। শেঠ-বসাকরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। কুঠি-বাড়ির জায়গা জমি, দেওয়া, তাঁতীদের সঙ্গে লেনদেনের ব্যবস্থা কম এসবের মধ্য থেকে আমরা শেঠ-বসাকদের সঙ্গে ইংরেজদের একটা সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখি। কলিকাতা গ্রামে, লক্ষ্মীকান্তর প্রাক্তন কাছারি বাড়িতে ইংরেজদের কাজকারবার শুরু হলেও, তাঁরা কিন্তু গোবিন্দপুরে, শেঠ-বসাকদের কাছাকাছি থাকাই পছন্দ করত।[৬]

নদীর নতুন জলপ্রবাহের ধারে, শুধুমাত্র সুতো তৈরি এবং বোনা কাপড়ের ফলাও ব্যবসা নিয়ে গড়ে ওঠা তিনটি গ্রাম, বিদেশী বাণিজ্য ও সওদাগরদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তৎপর ও উদ্যোগী দেশীয় বণিক গোষ্ঠী — এই সব উপাদানগুলি যেন ভবিষ্যতের ঘটনা প্রবাহের দিকে অনিবার্যভাবে আমাদের ইঙ্গিত করছে। সতেরো শতকের দ্বিতীয় পর্বে ইংরজ বণিকদেরএই অঞ্চলে আগমন হয়। তারপর আঠেরো শতকের শেষ না হতেই কি ভাবে ইংরেজ বণিকরা বাংলার বাণিজ্য এবং রাজত্ব দুইই দখল করল, এবং গোবিন্দপুর, সুতানুটি, কলিকাতা — এই তিন গ্রামকে নিয়ে গড়ে উঠল কলকাতা শহর — এই অতিপরিচিত ইতিহাসের আগে একটি পূর্বকথা আছে। এই পূর্বকথায় গোবিন্দপুর গ্রাম এবং শেঠ-বসাকদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাছাড়া, ষোল এবং সতেরো শতকের ভারতীয় এবং বাংলা বাণিজ্যের ইতিহাসও এই পূর্ব কথার একটা বড় অংশ তৈরি করেছিল।

মনে রাখার দরকার পনেরো শতকের শেষাশেষি থেকে আঠেরো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত — এই সময়কালুটাতেই শহর কলকাতা গড়ে উঠেছিল। এই সময়কালের প্রথম ভাগ হল শেঠ বসাকদের উদ্যমের কালপর্ব, যে সময়ে, গোবিন্দপুর, সুতানুটি, কলিকাতা জুড়ে তাঁদের দাপটের উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি। এও লক্ষ্য করা যায়, এই সময়কালের ব্যাপ্তিতে গোবিন্দপুরকে কেন্দ্র করে একটি শহরের অস্ফুট রূপায়ণ

কেমন ভাবে তৈরি হচ্ছে। ষোল শতকেই, বর্ধিষ্ণু গ্রাম হিসেবে, গোবিন্দপুর নানাবর্ণের এবং নানা বৃত্তির মানুষদের আকর্ষণ করছিল। হালদার (পরবর্তী কালে কালিঘাটের পুরোহিত পরিবার) পিরালি ঠাকুর, ঘোষাল ইত্যাদি ব্রাহ্মণ, এবং মিত্র, ঘোষ, দত্ত, কায়স্থ পরিবার গোবিন্দপুরে এসে বসবাস শুরু করে। এর ফলে গোবিন্দপুরের বসতির চেহারাও পালটে যায়। দুটি সরগরম ব্যস্ত বাজার, জনবসতি, দুটি মন্দির (চিত্রেশ্বরী এবং কালীমন্দির — গোবিন্দপুর থেকে, এই কালীমন্দির পরে কালীঘাটে স্থানান্তরিত হয়), এবং কাছাকাছি একটি জাহাজঘাটা, ষোল শতকের পর থেকে মোগলদের দুটি দুর্গ - এইসব উপাদানগুলি মধ্যযুগীয় শহরের গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় লক্ষণ বলে মনে করা যেতে পারে। গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে দক্ষিণে যাওয়ার একটি স্থলপথও ছিল। এই স্থলপথটির উল্লেখ পাওয়া যায় মধ্যযুগীয় সাহিত্যে।

মনে রাখতে হবে পনেরো থেকে আঠেরো শতক — এই সময়কালে বাংলার অন্তর্দেশীয় এবং বহির্বাণিজ্য নানাভাবে প্রসারিত হয়ে বৃহত্তর এশিয় বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বাংলার প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল সুতী বস্ত্র। বঙ্গোপসাগরের বাণিজ্যে বাংলার বণিকদের বড় একটা জায়গা ছিল। বাণিজ্যের সূত্র ধরে ভারতীয় উপকূল অঞ্চলে বেশ কিছু শহর এই সময়ে গড়ে উঠতে থাকে। এই নতুন শহরগুলির উৎস ছিল এমন বিশেষ কিছু গ্রাম, যেখানে কৃষির থেকে কারিগরি শিল্পই প্রধান ছিল। কলকাতা, বোম্বাই বা মাদ্রাজ, পরবর্তী কালের তথাকথিত ঔপনিবেশিক শহরগুলি, একটি নির্দিষ্ট ছক ধরে গড়ে উঠেছিল। শিল্প এবং বাণিজ্য থেকে অর্থনৈতিক অগ্রগতি, বিদেশী ব্যবসায়ীদের সংযোগ, এভাবে ঐতিহাসিক এবং ভৌগলিক উপাদানগুলি অবলম্বন করে গ্রাম থেকে শহরের রূপান্তরের ধারাটি অনুসরণ করা যেতে পারে। এই ছক বা প্যাটার্নের মধ্যেই আমরা কলকাতা শহরের গড়ে ওঠার গতিপ্রকৃতি দেখতে পাই। এবং গোবিন্দপুর ও সংশ্লিষ্ট সুতানুটি ও কলিকাতা এই তিন কারিগরি গ্রাম থেকে শহরের উদ্ভবের প্রক্রিয়াটি সনাক্ত করতে পারি।[৭]

আঠেরো শতকের সূচনায় কোম্পানির রেকর্ডে গোবিন্দপুর, সুতানুটি এবং কলিকাতা আলাদা করে 'টাউন' বলা হচ্ছে। ১৬৯৮ সালে রায়চৌধুরীদের কাছ থেকে ইংরেজরা এই তিন গ্রাম বা 'টাউনের' রাজস্ব আদায় এবং জমা দেবার সত্ত্ব কিনে নেয়। এরপর থেকে গোবিন্দপুর গ্রামের, রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও তাদেরওপর বর্তায়। এই মর্মে, এবং এই উদ্দেশ্যে ১৬৯৯ সালে কোম্পানির এজেন্ট চালর্স আয়ার, কোর্ট অফ ডিরেক্টারসদের লিখেছিলেন, "We having now at our great cost and charge obtained the Princes (আজিম-উস.শান, বাংলার সুবাদার) grant of the two tower of Chuttanuttee and Gobindapore as well as Calcutta, We doubt not of your utmost care and Industry for 'the advancement of our Revenues in those places".[৮]

১৭০৭ সালের নথিপত্রগুলিতে গোবিন্দপুরের উন্নতির নানা পরিকল্পনার হদিশ পাওয়া যায়। শেঠ-বসাকদের সাহায্য নিয়ে কলিকাতা থেকে গোবিন্দপুর পর্যন্ত পুরোনো পথটি সারানো, বাঁধ দিয়ে গঙ্গার তীর বাঁধানো, তিনটি 'শহরের' মাপজোক, ফলনের হিসেব নেওয়া, গোবিন্দপুরের দিকে আরও একটি নতুন রাস্তা তৈরি করার প্রস্তাব — এই সব ব্যাবস্থাপত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে, ইংরেজরা অতি দ্রুত, এই তিনটি গ্রামকে একত্রিত করে আরও বড় একটি শহরের অবস্থানের কথা ভাবছে। গোবিন্দপুর তখনও ইংরেজদের পছন্দের বসবাসের জায়গা। গঙ্গার তীর ধরে স্থানীয় ধনী ব্যবসাদার শেঠ-বসাকদের বাড়ি ঘরের, এবং গোবিন্দপুরের গঞ্জের কাছাকাছি থাকতে চায় তারা। কেননা, গোবিন্দপুরই ব্যবসা বাণিজ্যের, লেনদেনের মূলকেন্দ্র — একথা বুঝে নিয়েছিল তারা।[৯]

আঠেরো শতকের প্রথম দশকেই একটি প্রাকৃতিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। নদীর ভাঙ্গন ইংরেজদের ভাবিয়ে তোলে। কোম্পানির নথিপত্র থেকে এই ভাবনা চিন্তার আভাস আমরা পাই। জনৈক ক্যাপটেন জোসেফ টলসনকে নিয়োগ করা হয়েছিল গোবিন্দপুরের কাছে নদীর ধার বাঁধিয়ে দেওয়ার জন্য। গোবিন্দপুর গঞ্জের ঘাটে পণ্যের নৌকা এসে নোঙ্গর করত। অথচ কোম্পানির দলিল থেকে জানা যাচ্ছে নদী যেন ক্রমশ পার ভেঙে তীরের জমি গ্রাস করে নিচ্ছে। কিভাবে গোবিন্দপুর গঞ্জ এবং তীরভূমি রক্ষা করা যায়, সেই অনুযায়ী নানা পরিকল্পনা, যেমন বাঁধ আরও ভেতরে নিয়ে যাওয়া, জোয়ারের জল যাতে সজোরে ভেতরে না ঢুকতে পারে, এই সমস্ত খবরই আমরা পাচ্ছি, ১৭০৭-১৭৩০ এই সময়ে কোম্পানির কলকাতা থেকে লেখা যাবতীয় চিঠিপত্র এবং ডায়েরি থেকে।

হুগলি নদী কি এই সময়ে, কোনও ভাবে দক্ষিণে বয়ে যাওয়ার পথে পুব দিকে হঠাৎ বাঁক নিয়েছিল, যার জন্যে এই সমস্যা? এ বিষয়ে সঠিক না জানা গেলেও শেষ পর্যন্ত নদীর বেগ এবং জোয়ারের উচ্ছাসে নাজেহাল ইংরেজরা গোবিন্দপুর গঞ্জকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়াই ঠিক করেছিল। ১৭৩৭ সালের বিধ্বংসী ঝড় এবং জলোচ্ছাস, শেষ পর্যন্ত তাদের সিদ্ধান্ত পাকা করে দিল। গোবিন্দপুর থেকে গঞ্জ এবং কাছারিবাড়ি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবেত বটেই এমন কি শেঠ-বসাক এবং অন্যান্য বাঙালী বাসিন্দাদেরও সরিয়ে দেওয়া হবে কলিকাতা বা সুতানুটিতে। গোবিন্দপুর গ্রামের বসতিহীন খালি অঞ্চলের পুরোটাই অন্যভাবে ব্যবহার করা হবে। নদীর পার থেকে জমি উঁচু করে বাঁধিয়ে, কিছুটা তফাতে সরিয়ে নতুন দুর্গ তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়।[১০] ১৭৫৭ সালের আগে এবং এই পরিকল্পনা কার্যকরী হয়নি। ১৭৫৭ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনে সহসা ইংরেজদের নতুন দুর্গ তৈরি করাও সহজ হয়ে যায়। শেঠ-বসাক বণিকরা জায়গা জমি ছেড়ে দিল। এর পেছনে ইংরেজদের ভূমিকা এবং ক্ষমতা রূপান্তর ছিলই, উপরন্তু এটাও বোঝা যাচ্ছিল যে ইংরেজরা আর তাঁদের ওপর ততটা নির্ভর করছে না। নবকৃষ্ণ দেবের মত মধ্যবর্তী মুৎসুদ্দিরা দেখা দিচ্ছে। তবু

গোবিন্দপুর ছেড়ে চলে যাওয়ার আরেকটি গুরুতর কারণ ছিল। গোবিন্দপুরের বিপজ্জনক পরিস্থিতিই অন্যত্র বাসস্থান খুঁজে নিতে তাঁদের বাধ্য করেছিল। কোম্পানির নথিপত্র বলছে, গোবিন্দপুরের সবচেয়ে ধনী রাসবিহারী শেঠের পরিত্যক্ত বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে। শুধু শেঠ বসাক নয়, ঠাকুর পরিবার চলে গেল কলিকাতার উত্তরে চিৎপুরে। হালদাররা গেলেন দক্ষিণে কালীঘাটে, যেখানে ষোল শতকের শেষাশেষি মন্দির স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। দত্ত, ঘোষ, ইত্যাদি কায়স্থ পরিবার ও সুতানুটিতে বাসাবাড়ি তৈরি করলেন। এমনকি নবকৃষ্ণ দেবও গোবিন্দপুরের আদত বাড়ি ছেড়ে সুতানুটিতে বাড়ি তৈরি করলেন।[১১] বোঝা যাচ্ছে নদীর ভাঙ্গনই গোবিন্দপুর গ্রাম, বাজার, গঞ্জ, বসতির পরিত্যক্ত হওয়ার কারণ।

এই সময় থেকেই ইংরেজদের মনে একটি শহরের রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। একথা বোঝা যাচ্ছে কলকাতা থেকে লন্ডন এবং লন্ডন থেকে কলকাতা, কোম্পানির কলকাতার দপ্তর, এবং কোর্ট অফ ডিরেকটারসদের নিয়মিত চিঠি চালাচালি থেকে। শহরের যে নকশা তারা তৈরি করলেন, তা যে কোন ইওরোপীয় মধ্যযুগীয় শহরের মত। শিল্প কারিগরি, ব্যবসা বাণিজ্য শহরের প্রধান লক্ষণ। বাজার এবং শহরের কেন্দ্রস্থল (Square) এই দুটি হবে শহরের অপরিহার্য অঙ্গ। ফার্নান্দ ব্রদেলের বর্ণনা অনুযায়ী বাজার ছাড়া কোন শহর হতে পারে না, এবং কোন জাতীয় বা আঞ্চলিক বাজার চলতে পারে না শহর ছাড়া।[১২] কলকাতা শহরের আদি চেহারার ক্ষেত্রেও ট্যাংক স্কোয়ার (লালদিঘী) এবং বাজারের স্পষ্ট ভূমিকা আমরা দেখি। সুতানুটি একাধারে ব্যবসাদারি, বাজার হাটের এলাকা, তেমনি বসতিও বটে। গোবিন্দপুর পুরোপুরি বসবাসের তলাকা। মধ্যযুগীয় শহরের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি নিয়ে, শহর কলকাতা এভাবে গড়ে উঠছিল। শহরের উপনিবেশিক রূপটি তৈরি হল পরবর্তী পর্যায়ে, আঠেরো শতকের মাঝামাঝি থেকে। ১৭৫৭র পর ঔপনিবেশিক শহরের মূল লক্ষণগুলি স্পষ্ট দেখা দিল 'নেটিভ' এলাকা, এবং ইংরেজদের এলাকা এই বিভাজনের মধ্যে।[১৩] গোবিন্দপুরের খালি করে দেওয়া জমিতে ইংরেজদের বাসস্থান হবে, এমনটাই হওয়ার কথা। কিন্তু নদীর ভাঙ্গনের জন্য তা হল না। ফলে খালি জমিতে দুর্গ তৈরি করার পরিকল্পনার সঙ্গে, "ট্যাঙ্ক স্কোয়ার" থেকে সরিয়ে, এবং গোবিন্দপুর থেকে অনেক তফাতে ইংরেজ এলাকা হল আরও দক্ষিণে এবং পুবে। নকশাটি এইরকম — নদী থেকে অনেকটা পিছিয়ে, উঁচু জমিতে দুর্গ, এরপর জমি ঢালু হয়ে সমতল খোলা অঞ্চলটি এসপ্লানেড এবং এরই অপর পাশে ইংরেজদের বাসস্থান এলাকা। গোবিন্দপুর গ্রামের দক্ষিণে জঙ্গল কেটে ভবিষ্যৎ ময়দানের কথা ভাবা হল।[১৪] এভাবে একটি মধ্যযুগীয় শহর গড়ে উঠতে উঠতে কি ভাবে উপনিবেশিক শহরে রূপান্তরিত হল, সেই রূপান্তরের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে পলাশী যুদ্ধের পরের দশকগুলিতে। রূপান্তরের নকশাও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কোম্পানির নথিপত্রে।

আঠেরো শতকের শেষ দশকে গ্রাম গোবিন্দপুরের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, একদা গোবিন্দপুর গ্রামের দক্ষিণে, বড় বড় বাড়ি ঘর, "এসপ্লানেড" ঘিরে, আঠেরো শতকীয় স্থাপত্যের ইমারত। সুতানুটির নাম উনিশ শতকীয় কাগজে পত্রে, দলিলে নথিপত্রে বহুদিন পর্যন্ত ব্যবহৃত হলেও, অবলুপ্ত গ্রাম গোবিন্দপুর স্মৃতিতেও ঝাপসা হয়ে যায়।

গোবিন্দপুর বিলুপ্ত হয়েছে ইংরেজদের প্রয়োজনীয়তায় — এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না, কিন্তু আরেকটি তথ্যের দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। নতুন দুর্গ যদি, গোবিন্দপুর গ্রামে নাও তৈরি হত, নদীর ভাঙ্গনের থেকে গ্রামকে কি বাঁচানো যেত? আঠেরো শতকে (১৭০০-১৭৩৭), হুগলি নদী হঠাৎ করে, কলিকাতা অর্থাৎ আজকের ডালহৌসি অঞ্চল ছাড়িয়ে খানিকটা দক্ষিণে প্রবলভাবে পাড় ভেঙ্গে জমি গ্রাস করতে শুরু করেছিল। এই ভাঙ্গন ইংরেজদের ভাবিত করেছিল, স্পষ্টভাবে তা ওদের ডায়েরি, চিঠিপত্র থেকে জানা যায়। দেশীয় মানুষরাও যে এককথায় কয়েক পুরুষের ভিটে ছেড়ে চলে গেল অন্যত্র সেকি শুধু ইংরেজদের তাড়নায় না, নদীর কারণে?

সরস্বতী নদীর শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে গঙ্গার ধারে গোবিন্দপুর গ্রামের গড়ে ওঠার আংশিক যোগাযোগ ছিল। দুশো বছর পরে, যে নদীর ধারে গ্রাম গোবিন্দপুর গড়ে উঠেছিল সেই নদীরই জোয়ারের বেগ এবং জলোচ্ছাস গোবিন্দপুরের অবলুপ্তির অন্যতম কারণ হল।

সূত্রনির্দেশ

১। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, *কলিকাতার ইতিবৃত্ত*, প্রথম প্রকাশ ১৯০৯ পুনর্মুদ্রণ পুস্তক বিপনি, ১৯৮১, কলকাতা, পৃঃ ৩১-৩৫।

২। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, *কলিকাতা সেকালের ও একালের* (১৯১৫) পুনর্মুদ্রণ ১৯১৯ পি.এম.বাকচি, কলকাতা, পৃঃ ১৮৪।

৩। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫।

৪। গৌরদাস বসাক 'কালীঘাট এ্যান্ড ক্যালকাটা', দি ক্যালকাটা রিভিউ ভল্যুম ৯২, নং ১৮৪, এপ্রিল ১৮৯১ পুনর্মুদ্রণ, ক্যালকাটা কিপ্‌সেক ঃ অলোক রায়, ঋদ্ধি, কলকাতা ১৯৭৮।

৫। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪০।

৬। সি.আর.উইলসন, *আর্লি এ্যানালস অফ দি ইংলিশ ইন-বেঙ্গল*, ভল্যুম-১, পৃঃ ৫৮-৫৯, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।

৭। ওমপ্রকাশ, *ইওরোপিয়ান কর্মাশিয়াল এন্টারপ্রাইজ ইন প্রি-কলোনিয়াল ইন্ডিয়া*, কেম্বিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃঃ ৮, ১২, ১৩, ১৮, ২১, ২২।

৮। সি.আর উইলসন, *ফোর্টউইলিয়ম রেকর্ডস*, ভল্যুম-১, লন্ডন, ১৯০৬, পৃঃ ৪৭।

৯। প্রদীপ সিন্‌হা, *ক্যালকাটা ইন আরবান হিস্ট্রি* কলকাতা ১৯৭৮, পৃঃ ৬২; উইলসন, ফোর্ট উইলিয়ম রেকর্ডস, প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৭, ১৩২, ১৬২, ১৬৩।

১০। উইলসন, *তদেব*।

১১। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, *প্রাগুক্ত* পৃঃ ৪৮-৯৫।

১২। ফার্নান্দ ব্রদেল, *সিভিলাইজেশন এ্যান্ড ক্যাপিটালিসম্ ফিফটিনথ - এইটিন্থ্য় সেঞ্চুরিঃ কলিন্স স্ট্রাকচারস অফ্ এভরিডে লাইফ*, ফনটানা প্রেস ভল্যুম-১, পৃঃ ৪৭৯।

১৩। প্রদীপ সিনহা, *ক্যালকাটা এ্যান্ড দি কারেন্টস অফ্ হিস্ট্রি ঃ ক্যালকাটা দি লিভিং সিটি* - ভল্যুম-১, সম্পাদক - সুকান্ত চৌধুরী, পৃঃ ৩৩।

১৪। প্রদীপ সিনহা, প্রাগুক্ত, ব্রদেল, প্রাগুক্ত, ভল্যুম-২, *পার্সপেকটিভস অফ দি ওয়ার্ল্ড*, পৃঃ ৫০৮, ৫০৯।

সারাংশ

নবাব আলিবর্দীর অধীন মেদিনীপুর

রাজর্ষি মহাপাত্র

আলিবর্দী ছিলেন আরব বংশ সম্ভূত। তাঁর মূল নাম ছিল মির্জা মহম্মদ আলি। প্রথমে ঔরংজেবের তৃতীয় পুত্রের তিনি পরিচারক ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও সাহসের মাধ্যমে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব সুজাউদ্দীনের অধীনে ফৌজদার পদে নিযুক্ত হন এবং নবাব তাঁকে 'আলিবর্দী' উপাধি দান করেন। ১৭৩৩ সালে বিহার বাংলা সুবার সঙ্গে সংযুক্ত হলে সুজাউদ্দিন আলিবর্দীকে বিহারের সহকারী সুবাদার নিযুক্ত করেন। এরপর আলিবর্দী সুজাউদ্দিনের পুত্র সরফরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন ও আনুষ্ঠানিকভাবে নবাব পদে অধিষ্ঠিত হন।

আলিবর্দীর শাসনকাল শান্তিতে কাটেনি। নবাবের আফগান সৈন্যদের বিদ্রোহ তাঁদের যখন উত্যক্ত করে তুলেছে সেই সময় মারাঠাদের বারবার আক্রমণ বাংলা সুবার শান্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প সবকিছুর বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল।

আলিবর্দী যখন ওড়িশা অভিযান করেন, তাঁর যাত্রাপথ ছিল মেদিনীপুরের ওপর দিয়েই। মেদিনীপুরের জমিদারগণ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন এবং মেদিনীপুর হয়ে জলেশ্বর অভিমুখে যাওয়ার পথ সুগম করে দেয়। ময়ূরভঞ্জের রাজা এই সময় তাঁর যাত্রাপথে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুললেও আলিবর্দী তাঁকে পরাজিত করে সুবর্ণরেখা অতিক্রম করেন।

তাঁর ওড়িশা অভিযান থেকে ফেরবার পথে মেদিনীপুরের কাছাকাছি এসে আলিবর্দী খবর পেলেন যে বেরারের মারাঠা দলপতি রঘুজী ভোঁসলে চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সমেত ভাস্কর পন্ডিত নামে এক ব্যক্তিকে বাঙলায় পাঠিয়েছেন চৌথ আদায় করার জন্য। নবাব আলিবর্দী মেদিনীপুরকে মারাঠাদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর জামাতা মীরজাফরকে মেদিনীপুর এবং হিজলীর ফৌজদার হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। এদিকে নবাব আলিবর্দী খানকে মারাঠারা অস্থির করে তোলে। চতুর্দিকেই এক সন্ত্রাস পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বাংলার লোক একে বর্গীর হাঙ্গামা আখ্যা দেয়।

যাহোক কাঁথি, পটাশপুর মারাঠাদের অধিকারে আসে। মারাঠাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময় যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে ১৭৫১ সালে নবাব আলিবর্দী মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন এবং ওড়িশা বর্গীদের হাতে তুলে দেন। মারাঠারা প্রতিশ্রুতি দেন যে তারা ওড়িশা থেকে সুবর্ণরেখা নদী অতিক্রম করে বাংলাদেশে আর ঢুকবেনা। জলেশ্বরের কাছে সুবর্ণরেখার পূর্বতীর পর্যন্ত আলিবর্দী খানের রাজ্যের সীমানা নির্ধারিত

হয়। নবাব আলিবর্দী প্রতি বছর বাংলাদেশের চৌথ হিসেবে ১২ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতিও দেন।

মারাঠা রণনীতি

শিল্পী গাঙ্গুলী

দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জাতিগত চরিত্রের উপর রণনীতি নির্ভরশীল।

দাক্ষিণাত্যের পার্বত্যময় বহুধাবিভক্ত শুষ্ক দুর্গম অঞ্চল, স্বয়ংশাসিত গ্রামীণ শাসনব্যবস্থা, অধিবাসীদের কঠোর জীবনসংগ্রাম মারাঠা রণনীতিকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল।

মারাঠারা অশ্বচালনায় অত্যন্ত দক্ষ হওয়ায় অপরিসীম গতিশীলতা মারাঠা বাহিনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। মুঘল বাহিনীর ন্যায় অতিরিক্ত দ্রব্যসামগ্রী, লোকলস্কর অথবা হারেমের দ্বারা মারাঠা বাহিনী ভারাক্রান্ত ছিল না। মারাঠা রণনীতির অপর বৈশিষ্ট্য ছিল যে, শত্রুকে চারিদিক থেকে পরিবেষ্টিত করে রসদ সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করা। গেরিলা রণনীতি গ্রহণ মারাঠাদের সাফল্য লাভের অন্যতম কারণ। অত্যন্ত দ্রুতগামী অশ্বরোহী বাহিনীর সাহায্যে শত্রুকে আক্রমণ করে চকিতে অদৃশ্য হয়ে যেত। গেরিলা রণনীতি মুঘলদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

সুদক্ষ রণতরীর সাহায্যে মারাঠারা বিদেশীদের যথেষ্ঠ অসুবিধায় ফেলেছিল।

পরবর্তীকালে মারাঠারা পাশ্চাত্য রণনীতি গ্রহণ করলেও সেনাবাহিনীকে পাশ্চাত্য প্রথায় সুশিক্ষিত করেনি। বিদেশীদের হাতে গোলন্দাজ বাহিনীর নেতৃত্ব থাকায় বিপদের সময় উপযুক্ত সাহায্য মারাঠারা পায়নি।

সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নেওয়ায় জাতীয়তা বোধ নষ্ট হয়।

চিরাচরিত অশ্বারোহী বাহিনী ও গেরিলা নীতি পরিত্যাগ, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলন্দাজ বাহিনীর অভাব মারাঠাদের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতা-র চর্চা ঃ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ

আইরিন মুস্তাফা মন্ডল

সাম্প্রদায়িক সমস্যা বর্তমান ভারতে এক জটিল রূপ নিচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে গুজরাটে গণনিধনে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক নিহত হয়েছেন, সমাজের মধ্যস্তরের মানুষেরা এ বিষয়ে এক বিস্ময়কর নীরবতা অনেকক্ষেত্রে অবলম্বন করছেন। এ অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার বিশ্লেষণ আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে বলেই মনে করি। বর্তমান প্রবন্ধে আধুনিক ইতিহাসবিদদের মধ্যে ঔপনিবেশিক ধারা, কেম্ব্রিজ ধারা ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী ধারার ইতিহাসবিদেরা কিভাবে ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার উপরে বক্তব্য রেখেছেন তা আলোচনা করব।

প্রথমে উপনিবেশবাদী ঐতিহাসিকদের সাম্প্রদায়িকতার উপরে লিখিত বক্তব্য আলোচনা করব। বস্তুত পক্ষে সাম্প্রদায়িকতা সংক্রান্ত যে কোন আলোচনাতেই আমরা প্রাথমিকভাবে তাঁদের কাছে ঋণী। 'সাম্প্রদায়িকতা' — এই শব্দটি ইতিহাসে যে ভাবে উপস্থাপিত হয় তা প্রথম রূপ পায় ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের প্রথম যুগের লেখায়। 'সাম্প্রদায়িকতা' যে 'জাতীয়তা'-র নামান্তর হিসাবে বর্তমান কালের বিভিন্ন লেখনীতে প্রচারিত হচ্ছে তার সূত্রপাত এই সময়কাল থেকেই। দ্বি-জাতিতত্ত্বকে সরাসরি প্রচার করে এঁরা বক্তব্য রেখেছেন অনেকক্ষেত্রে। জেমস মিলের লেখায় ভারতের ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক যুগবিভাজন এবং ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার-এর লেখায় মুসলমানদের সম্বন্ধে এক বিকৃত একপেশে অনুসিদ্ধান্তগুলি বর্তমানে বহু আলোচনার বিষয়বস্তু। এদের পাশাপাশি প্রথম যুগের ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে পাওয়া যায় জন স্ট্র্যাচি,[১] ভি. চিরোল,[২] ফেনার ব্রকওয়ে, হিউজ ম্যাকফারসন, পি মুন — প্রমুখ ঐতিহাসিকের নাম।

উপরোক্ত ঐতিহাসিকদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখি যে এঁরা প্রায় ক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণগুলিকে নিহিত দেখেছেন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মধ্যেই। অতি তুচ্ছ কতকগুলি সাম্প্রদায়িক অভ্যাস বা আচার গুলিকে তাঁরা সাম্প্রদায়িকতার মূল কারণ হিসাবে অভিহিত করেছেন'। জন স্ট্র্যাচি-র লেখায় পাই যে গো-হত্যা সাম্প্রদায়িকতার কারণ। আবার ভি. চিরোল ভারতের ব্রিটিশ শাসনকে পিতৃপ্রতিম বলে উল্লেখ করেন।[২] চিরোলের মতে, ভারতে এই শাসনের উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়, জাতি বা

শ্রেণীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে এই শাসনকে প্রত্যেকের হিতের জন্য চালিত করা, অথচ বর্তমান গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে ভারতে ব্রিটিশ বিভেদমূলক শাসননীতি সাম্প্রদায়িকতার অন্যতম প্রধান কারণ।

জন স্ট্র্যাচি-র মতই ম্যাকফারসনও হিন্দু মুসলিম ধর্মীয় আচার পালনের ফলেই দাঙ্গা বাধে বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] পি. মুন. তুলে ধরেন নিম্ন মর্যাদার জনতার ভূমিকা, তাঁর মতে, এই জনতা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটনের পশ্চাতে মূল কারণ। সাম্প্রদায়িক সঙ্কটের সময়ে এই ধরণের লোক শহরের আইন কানুন নিজের হাতে তুলে নেয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।[৪]

প্রথমদিকের এই উপনিবেশিক ভাবধারা পরে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের ক্রমাগত অপপ্রচারে আরও জটিল রূপ পায়। ১৯০১ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কার উপলক্ষ্যে সরকারে ভারতীয়দের বেশি করে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্তের ফলে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়। যখন মুসলিমরা প্রতিনিধি সভায় পৃথক ও যথাযথ সংখ্যায় যোগ দেওয়ার দাবি উত্থাপন করেন, লর্ড মর্লে ও মিন্টো বলেন যে, হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য কেবলমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় গোঁড়ামী সংক্রান্ত পার্থক্য নয় — ঐতিহ্যে, ইতিহাসে বা সামাজিক বিষয়ে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিরোধ প্রকটিত।[৫] এছাড়াও ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকেরা মনে করতেন যে ১৮৮৫ সালে স্থাপিত কংগ্রেস এবং ১৯০৬ সালে স্থাপিত মুসলিম লীগ যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলিম সংগঠন। এঁদের উদ্যোগ কেবলমাত্র নিজ সম্প্রদায়ের হিত সাধনের স্বার্থে পরিচালিত। চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা, এঁদের মতে, মুসলিম বিরোধী এক ধর্মবিশ্বাসী শ্রেণী।

ক্রমশ ঔপনিবেশিকদের লেখায় প্রত্যাশিত ভাবেই সাম্প্রদায়িকতা জাতীয়তার রূপ নেয়। ডব্লিউ. সি. স্মিথ. ও লুই ড্যুমন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুজন লেখক যাঁরা সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদকে এক করে দেখেছেন।[৬] স্মিথ ধর্মের সঙ্গে অর্থনীতিকে যুক্ত করে দুধরণের সাম্প্রদায়িকতার কথা উল্লেখ করেছেন —

(১) মধ্যবিত্তশ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতা

(২) নিম্নশ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতা

স্মিথের মতে, নিম্নশ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতা বিক্ষোভের এক প্রবল প্রকাশ, যা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আকারে রূপ পায়। মধ্যবিত্তশ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতা বিক্ষিপ্ত কোন প্রকাশের চেয়ে অনেকটা ব্যক্তিগত তিক্ততার রূপ নেয় এবং সন্দেহ, ভয় বা আবেগদীপ্ত ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটে অন্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতি। বর্তমান ভারতে দাঙ্গার যে অবয়ব আমরা দেখি তাতে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণার প্রাবল্য আচ্ছন্ন করেছে নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জনতাকে। স্মিথের মতে সাম্প্রদায়িকতার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জাতীয়তাবাদ হিসাবে এর বাহ্য

প্রকাশ। লুই ড্যুমন্টও সাম্প্রদায়িকতার বিকাশকে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে পিটার হার্ডির নাম উল্লেখযোগ্য। হার্ডি উলেমা ও শিক্ষিত মুসলিম গোষ্ঠীর পারস্পরিক আঁতাতের উপর জোর দেন। শিক্ষার অভাবই তাদেরকে ধর্মীয় আবেগের দিকে চালিত করে বলে তিনি বক্তব্য রাখেন। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে রাজনৈতিক ধর্মীয় বা সামাজিক পার্থক্যের নিরীখেও বিশ্লেষণ করেছেন হার্ডি। তিনি উল্লেখ করেছেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিমদের মিলন ত্বরান্বিত হয়।[৭]

প্রথম পর্যায়ের ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকেরা সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে জাতীয়তার যোগ আবিষ্কার করেছেন, যা ছিল এক কষ্ট কল্পনা। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখছি যে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদকে একই ধর্মীয় ভাবাবেগের নিরীখে দেখা হচ্ছে। ধর্মকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদের এক উগ্র চেহারার আকারের মধ্যে বর্তমান ভারতের এক সামাজিক ভারসাম্যহীনতাই প্রকাশ পায়। লেখনীতে যার সচেতন বা অসচেতন প্রকাশ আমরা প্রথম পর্যায়ের ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে পাই।

ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকেরা সাম্প্রদায়িকতার বিশ্লেষণ করেছেন একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। ফলে ভারতের সাম্প্রদায়িকতার উপরে ইতিহাসচর্চা একপেশে হয়ে থেকে গেছে দীর্ঘদিন। সাম্প্রদায়িকতাবাদী এমনকি জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরাও অনেকক্ষেত্রে এঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ভারতের উপনিবেশীয় সমাজকাঠামোকে ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকেরা সরাসরি সমর্থন করেছেন। অনেকক্ষেত্রে এঁদের লেখার মাধ্যমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি বিস্তারলাভ করেছে। এঁদের লেখায় একটিই তত্ত্ব ঘুরে-ফিরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে — তাহল, ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক সহজাতভাবে বিদ্বেষপূর্ণ ও তিক্ত। একমাত্র ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনই হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে বিক্ষিপ্ত রূপ ধারণ করতে দেয়নি। ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উপরে ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত যেহেতু এঁরাই করেছিলেন, আমরা পাঠক হিসাবে এঁদের কাছে ঋণী।

II

কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকদের বক্তব্যগুলি তুলে ধরে সাম্প্রদায়িকতার উপরে ইতিহাসচর্চার এক অন্য দিক দেখাবার চেষ্টা করব। ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গীর এক ভারতীয় রূপ এদের লেখায় ফুটে উঠেছে। সাম্প্রদায়িকতার প্রসারের কারণ হিসাবে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ বিভেদ, পারস্পরিক ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব ও বর্ণগত অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা এঁদের লেখায় গুরুত্ব পেয়েছে। এঁদের মতে, সাম্প্রদায়িকতা ভাষাগত, অঞ্চলগত, বর্ণগত বিভেদের (যা ভারতীয় সমাজে স্বতঃসৃষ্ট) পাশাপাশি এই সমাজেরই একটি উপজাত বিষয়। এছাড়া পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সংবিধান সংস্কারগুলি আঞ্চলিক ও উপদলীয়

রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বার্থপর প্রতিযোগিতা নিয়ে আসে এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কিভাবে সাংবিধানিক সংস্কারের ফলে প্রত্যক্ষ মদত পায় তা এঁরা বিশ্লেষণ করেছেন। এঁদের বক্তব্যগুলি নীচে আলোচিত হল।

অনিল শীল কেম্ব্রিজ ধারার এক মুখ্য ঐতিহাসিক। তাঁর মতে, হিন্দু-মুসলমান বিভেদের ক্ষেত্র ভারতীয় সমাজের বিভিন্নরকম বিভাজনের মধ্যে বর্তমান ছিল। শীলের মতে, ব্রিটিশ শাসন মুসলমান শাসন থেকে মুক্তি হিসাবে সমাদৃত হয়েছিল। ধর্মীয় উন্মাদনা, শীলের মতে, ভারতীয় সমাজে খুবই সাধারণ ঘটনা, যার দ্বারা প্রতিবেশীদের ধর্মীয় আবেগের প্রতি বিদ্বিষ্টদের দ্বারা প্রায়ই বিভিন্ন আক্রমণের ঘটনা ঘটত বলে শীল মনে করেন। হিন্দুদের থেকে মুসলমানদের, পৃথক এক জাতি বলে দেখিয়েছেন অনিল শীল। ধর্মীয় বোধের কারণে তারা পরস্পরের থেকে পৃথক বলে তিনি উল্লেখ করেন।[৮]

জয়া চ্যাটার্জীর সাম্প্রদায়িকতার উপরে বক্তব্য বিশ্লেষণ করব। চ্যাটার্জী সাম্প্রদায়িকতাকে বিশ্লেষণ করেন, বাংলায় বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝোঁক গড়ে ওঠা ও দেশবিভাগের প্রেক্ষাপটে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা কিভাবে বিস্তারলাভ করেছে তার প্রেক্ষিত থেকে। লেখিকার বক্তব্য হল এই যে, মুসলিমরাই প্রধানত বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝোঁক ও দেশবিভাগের জন্য দায়ী হন। কিন্তু ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথমদিকে বাংলায় হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যেও এক পৃথক স্ব-ভূমির দাবি দেখা যায় এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝোঁক এদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়।[৯] ভদ্রলোক জাতীয়তাবাদ বিশেষভাবে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী মতাদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল বলে লেখিকা মনে করেন। ভদ্রলোক শ্রেণীস্বার্থ এক সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে ঘিরে আবর্তিত হতে থাকে। মুসলিমদের তুলনায় সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবি তোলেন তাঁরা, যা আবশ্যিকভাবে নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। দেশ বিভাগের দাবি তুলে হিন্দু বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতি মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পাশে এক স্ব-নিয়ন্ত্রিত অবস্থান নেয় বলে লেখিকা উল্লেখ করেছেন।[১০]

কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে রজত রায়, সি.এ. বেইলী ও ফ্রান্সিস রবিনসন উল্লেখযোগ্য বক্তব্য রাখেন। রজত রায় সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যাখ্যা করেন আবশ্যিকভাবে ক্ষমতা দখলের জন্য সংগ্রাম হিসাবে যা সমাজের এক মুষ্টিমেয় শিক্ষিত শ্রেণী অর্জন করেছে। সাম্প্রদায়িকতার কারণ হিসাবে রজত রায় দায়ী করেন প্রাথমিকভাবে প্রশাসনিক স্তর থেকে কিছু ব্যবস্থাগ্রহণকে যা হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বমূলক কাঠামোর অঙ্গীভূত হওয়ার জন্য এক তীব্র প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে।[১১]

বেইলী সাম্প্রদায়িকতার উৎস সন্ধানে মধ্যযুগে সমাজব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করেছেন, যখন সাম্পদায়িকতার কোন অস্তিত্ব ভারতীয় সমাজে ছিল না বলেই আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। সাম্প্রদায়িকতা আবশ্যিকভাবেই একটি আধুনিক ঘটনা

বলে প্রমাণিত হয়েছে। রবিনসন সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যাখ্যা করেন ১৮৬০ থেকে ১৯২০-র মধ্যে যুক্তপ্রদেশে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের অন্তর্নিহিত প্রেক্ষিত থেকে। গো-হত্যা, নাগরী ও ফার্সী ভাষা সংক্রান্ত বিরোধ তাঁর লেখায় স্থান পায়।[১২]

কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিঞ্চিৎ পৃথকভাবে ডেভিড পেজ বক্তব্য রেখেছেন। পেজ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কারের প্রেক্ষিত থেকে সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর ব্যাখ্যায় ঘুরে ফিরে এসেছে ভারতব্যাপী দাঙ্গার ছবি। যুক্তপ্রদেশের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, স্বরাজ্য দল ও উদারপন্থীদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বপ্রসূত বলে পেজ মনে করেন। সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর দ্বন্দ্ব, শিক্ষা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক অনুদানগুলিকে কেন্দ্র করে সেই সময়ে এক জটিল আকার নেয় বলে পেজ মনে করেন।[১৩]

কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকদের ভারতীয় সমাজকে সাম্প্রদায়িক বিভাজন শুধুমাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে থেমে থাকেনি; পরবর্তীকালে হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা এক স্পষ্ট রাজনৈতিক আকার পায়, তা আমাদের সকলের জানা আছে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা প্রচার করেন মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, একইভাবে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা হিন্দু সম্প্রদায়ের কঠোর সমালোচনা করেন। সাম্প্রদায়িকতাবাদী ইতিহাসবিদদের ব্যাখ্যায় মুছে যায় হিন্দু ও মুসলিম সামাজিক ঐক্যের ধারণাটি। কেবলই পারস্পরিক বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণকারী হিসাবে পরিচিত হয় হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়। হিন্দু মহাসভার স্থপতি ও মুসলিম লীগের প্রণেতারা সাধারণত এই ধরণের উদ্দেশ্যমূলক প্রচার চালান। ১৯২০-র দশকের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আলোচ্য বিষয়গুলি, যেগুলি কংগ্রেস বরাবরই এড়িয়ে চলেছিল, গুরুত্ব পেয়েছে এদের আলোচনায়। গো-রক্ষিণী সভা ও শুদ্ধি আন্দোলন চালু করতে বারবার আবেদন জানিয়েছেন এঁরা। গো-হত্যা, মসজিদের সামনে গীত-বাদ্য ইত্যাদি মুসলিম সংস্কৃতি হিন্দুদের ক্ষতি করছে — এই বক্তব্য রাখার পাশাপাশি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে প্রতিনিধিসভায় আসন বন্টনের প্রশ্নটি। যুক্তপ্রদেশের মত রাজ্যে এই প্রশ্নগুলি খুবই গুরুত্ব পেয়েছিল, কেননা সেখানে শিক্ষিত মুসলিমদের সংখ্যা বেশ ভালো পরিমাণে ছিল। এই প্রেক্ষাপটে হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বক্তব্য আলোচনা করা যেতে পারে।

সাভারকর ও গোলওয়ালকরদের ব্যাখ্যায় মুসলিম সম্প্রদায় মূলত হিংসা পোষণকারী জনতা। ভারত হল হিন্দু রাষ্ট্র, সেখানে মুসলিম সম্প্রদায় কখনোই জাতীয় জীবনের অঙ্গ হতে পারে না। এই লেখকদের মুসলিম বিদ্বেষ সরাসরি হিংসার রাজনীতিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। এঁরা বলছেন ম্লেচ্ছ ও বিশ্বাসঘাতকদের ধ্বংস করে এই দেশে শান্তি আনতে হবে।[১৪] ইন্দ্রপ্রকাশ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও এস.পি. চ্যাটার্জী হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের কারণকে মধ্যযুগ থেকে উৎসারিত বলে মনে করেন। শুধুমাত্র মুসলিম সম্প্রদায় দ্বারাই হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় বলে তাঁরা মনে করেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের

বর্বর আচরণ দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ বাড়িয়ে দাঙ্গা সংঘটনে সাহায্য করে বলে তাঁরা বক্তব্য রাখেন।[১৫] পরবর্তীকালে এঁদের ব্যাখ্যায় এসেছিল ইতিহাস বিকৃতির এক সংগঠিত প্রচেষ্টা যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে শিক্ষিত সমাজকে।

এঁদের পাশাপাশি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তাঁরাও হিন্দু সম্প্রদায়কে হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের জন্য সর্বতোভাবে দায়ী বলে উল্লেখ করেন। কংগ্রেসকে মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দ এক হিন্দু সংগঠন হিসাবে দেখেছেন, যদিও কংগ্রেসের কর্মসূচীতে কোন সাম্প্রদায়িক বিষয়ের উল্লেখ ছিল না। খিলাফৎ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম নেতৃবৃন্দের ঐক্যের কর্মসূচী ব্যর্থ হওয়ার পরে ১৯১৯, ১৯২০ ও ১৯৩৫-এর শাসন সংস্কারগুলি হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির এক অন্যতম হাতিয়ার হয়ে ওঠে। ১৯৩০-এর পর থেকে মহম্মদ আলি জিন্না সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারাটিকে সযত্নে দেশবিভাগ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান। জিন্না ভারতীয় মুসলিমদের পৃথক একটি জাতি হিসাবে গড়ে ওঠা সাংবিধানিক ও অন্যান্য প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠনের হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের সমকক্ষভাবে প্রতিনিধিত্বের দাবি তোলেন। ক্রমশ তিনি দ্বি-জাতি তত্ত্ব প্রচার করেন।[১৬]

এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; যিনি হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে উন্নত করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। ব্রিটিশ বিভেদমূলক শাসননীতি সাম্প্রদায়িকতার জন্য দায়ী — এর উল্লেখ করে গান্ধীজী জোর দেন হিন্দু ও মুসলমানের সামাজিকভাবে পারস্পরিক ঘৃণা দূর করার উপরে। এছাড়া সাম্প্রদায়িকতা রাজনীতির এক প্রধান হাতিয়ার বলে গান্ধীজী সংসদীয় ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, যেখানে সংখ্যাগুরুরা প্রতিনিধিত্ব করে, সেনা বা পুলিশ তাদের আদেশ অনুসারে সংখ্যালঘুদের পীড়ন করে। সাম্প্রদায়িক ঐক্যের উপর বিরাটভাবে জোর দিয়ে গান্ধীজী বলেছেন যে স্বরাজ লাভের জন্য এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় পথ।[১৭]

রাজেন্দ্রপ্রসাদ বা আবুল কালাম আজাদ ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকার উপরে জোর দিয়ে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নিন্দা করেন। বিশেষভাবে সাম্প্রদায়িকতার প্রসারের বিরুদ্ধে জহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু বক্তব্য রাখেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটি জড়িয়ে দেন নেহরু। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা প্রধান বলে নেহরু উল্লেখ করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন ধর্মীয় প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, যদিও ধর্মীয় আবেগকে তা ব্যবহার করে।[১৮] সুভাষচন্দ্র বসু সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নের সঙ্গে অর্থনীতির প্রশ্নটিকে সংযুক্ত করেন এবং হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নিন্দা করেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়োজনে কংগ্রেসের ভূমিকাকে সঠিক পথে পরিচালনার কথা বলেন তিনি। পাশাপাশি, মুসলিমদের কংগ্রেসে যোগ দেবার আহ্বান জানান।[১৯]

জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে যখন বক্তব্য রেখেছেন তাকে ব্রিটিশ শাসনের আবশ্যিক ফলরূপেই শুধু দেখেননি, তারা হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে এক দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায় বলে বর্ণনা করেছেন। কংগ্রেসের রাজনীতির মধ্যেও সাম্প্রদায়িক উপাদান বর্তমান ছিল। ১৯৩০-এর দশকে গোড়া পর্যন্ত বহু নেতা একইসঙ্গে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ বা হিন্দু মহাসভার সদস্য হতে পারতেন। কংগ্রেসের মত একটি জাতীয়তাবাদী সংগঠনে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য ছিল। ফলত কংগ্রেসী ও অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে বক্তব্যগুলি সবসময় নিরপেক্ষ বা অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রাখা সম্ভব হয়নি। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের মূল অবদান এই যে সাম্প্রদায়িকতা যে একটি নিন্দিত রাজনৈতিক পদক্ষেপ তা এঁদের লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। পাশাপাশি ব্রিটিশ বিভেদমূলক শাসননীতি তাদের কাছে স্পষ্ট ছিল। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরোধিতায় এঁদের ভূমিকা তাই উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রদায়িকতার গঠন ও প্রতিরোধ সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনার পরেও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতের স্বাধীনতা (১৯৪৭) দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের মধ্যে দিয়ে এল। সাম্প্রদায়িকতার অর্জিত স্বাধীনতা আমাদের গণতান্ত্রিক দেশে আজও সফল হয়নি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিহীন কোন বছর তারপর থেকে অতিবাহিত হয়নি। এই পরিস্থিতিতে সমাজে শুভবুদ্ধির প্রসার ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া সাম্প্রদায়িকতাকে অতিক্রম করা অসম্ভব।

সূত্রনির্দেশ

১। জন স্ট্র্যাচি; *ইন্ডিয়া ইটস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড প্রগ্রেসন*, ম্যাকমিলান, লন্ডন, পুনর্মুদ্রণ ১৯০৩, পৃঃ ২৮৭।

২। ভি. চিরোল, *ইন্ডিয়ান আনরেস্ট*, লাইট অ্যান্ড লাইফ পাবলিশার্স, নতুন দিল্লী, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭০।

৩। হিউজ ম্যাকফারসন, *ইভোল্যশন অফ পলিটিক্যাল লাইফ ইন ইন্ডিয়া*, আনমোল পাবলিকেশন, নতুন দিল্লী পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৬, পৃঃ ১০৯।

৪। পি.মুন, *রিফ্লেকশনস অন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া - আফটার দ্য গ্রেট ওয়ার অফ ১৯১৪-১৮*, আনমোল পাবলিকেশন, দিল্লী, পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৫, পৃঃ ৮৮।

৫। টি. ডব্লিউ হোল্ডারনেস উদ্ধৃত।

৬। ডব্লিউ. সি. স্মিথ, *মডার্ন ইসলাম ইন ইন্ডিয়া ঃ এ সোস্যাল অ্যানালিসিস*, ঊষা পাবলিকেশন নতুন দিল্লী, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৯, পৃঃ ১৮৭।

৭। পিটার হার্ডি, *দ্য মুসলিমস অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া*, সি.ইউ.পি. কেমব্রিজ, ১৯৭২, পৃঃ ১৭৫।

৮। অনিল শীল, *দ্য ইমারজেন্স অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম, কম্পিটিশন এ্যান্ড কোলাবরেশন ইন দ্য লেটার নাইনটিস্থ* সেঞ্চুরী, সি.ইউ.পি., পুনর্মুদ্রণ ১৯৬৮ পৃঃ ২৭।

৯। জয়া চ্যাটার্জী, *বেঙ্গল ডিভাইডেড, হিন্দু কম্যুনালিজম অ্যান্ড পার্টিশন* ১৯৩২-১৯৪৭, *সি.ইউ.পি.*, ১৯৯৫, পৃঃ ১।

১০। প্রাগুক্ত, ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২২৭-২৩০।

১১। রজত কান্ত রায়, *আরবান রুটস অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম ঃ প্রেশার গ্রুপস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্টস ইন ক্যালকাটা সিটি পলিটিক্স,* ১৮৭৫-১৯৩৯, বিকাশ পাবলিকেশন, দিল্লী, ১৯৭৯।

১২। ফ্রান্সিস রবিনসন, *সেপারেটিজম অ্যামঙ্গ দ্য ইন্ডিয়ান মুসলিমস ঃ দ্য পলিটিক্স অফ দ্য ইউনাইটেড প্রভিন্সেস মুসলিমস* ১৮৬০-১৯২৩, সি. ইউ. পি., লন্ডন, ১৯৭৪।

১৩। ডেভিড পেজ, *দ্য গ্রোথ অফ কম্যুনালিজম অ্যান্ড দ্য পোলারাইজেশন অফ পলিটিক্স প্রেল্যুড টু পার্টিসন ঃ দ্য ইন্ডিয়ান মুসলিমস অ্যান্ড দ্য ইমপেরিয়াল সিস্টেম অফ কন্ট্রোল,* ১৯২০-১৯৩২, ও.ইউ.পি., দিল্লী, ১৯৮২, পৃঃ ৭৩-১৪০।

১৪। এম. এস. গোলওয়ালকর, *উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড*, পৃঃ ৬৪-৬৫।

১৫। এস. পি. মুখার্জী, *অ্যাওয়েক হিন্দুস্তান*, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৬৪, পৃঃ ১৩৭।

১৬। সৈয়দ শরীফুদ্দীন পীরজাদা (সম্পাঃ), *লিডার্স করেসপন্ডেন্স*, করাচী।

১৭। ডি. জি. তেন্ডুলকর, *মহাত্মা ঃ লাইফ অফ মোহনদাশ করমচাঁদ গান্ধী*, ভল্যুম-২, পাবলিকেশন ডিভিসন, দিল্লী, পুনর্মুদ্রণ ১৯৬১, পৃঃ ৩৬।

১৮। জওহরলাল নেহরু, *অ্যান অটোবায়োগ্রাফী*, ও.ইউ.পি., নতুন দিল্লী, পুনর্মুদ্রণ ১৯৮০, পৃঃ ৪৩৫।

১৯। শিশির কুমার বোস এবং সুগত বোস (সম্পাঃ), *লেটারস, আর্টিকেলস, স্পীচেস অ্যান্ড স্টেটমেন্টস* ১৯৩৩-৩৭, *সুভাষচন্দ্র বোস, দ্রষ্টব্য নেতাজী কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম-৮,* ও. ইউ. পি., দিল্লী ১৯৯৪, পৃঃ ২২৭।

ইংরেজ শাসনপর্বে ডুয়ার্সের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা ও আদিবাসী সমাজ

কার্তিক চন্দ্র সূত্রধর

১৮৬৫ সালে সিঞ্চুলা চুক্তির মাধ্যমে ডুয়ার্স এলাকা ব্রিটিশের হস্তগত হবার পর ভূমি-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তারা চট্‌জলদি কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। প্রথমদিকে তারা স্থানীয় লোকদের মাধ্যমেই রাজস্ব আদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এটা অবশ্য শুধু ডুয়ার্সের ক্ষেত্রেই নয়, বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও তারা একই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে পার্থ চ্যাটার্জী তার গ্রন্থে লিখেছেন, "In Bengal, after much debate and several experiments, it went into an arrangement to this end with a class of Indians who were designated 'Proprietors' and assigned the task of collecting the revenue'[১] ডুয়ার্সের সর্বত্র তারা একই ব্যবস্থা এবং একই আইন প্রয়োগ করেনি। তিস্তার পূর্ব পারে তারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রয়োগ করেনি। অর্থাৎ Non-regulated এলাকা হিসেবে রাখা হয়েছিল। ভূটানের কাছ থেখে প্রাপ্ত ও রংপুরের অংশ নিয়ে ইংরেজ আমলের যে ডুয়ার্স গঠিত হয়েছিল সেখানে আলাদা আলাদা আইন প্রয়োগ করা হয়েছিল। রংপুর অঞ্চলে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের দশ নম্বর আইন ও পরে তার সংশোধনী আইন প্রচলিত থাকে এবং এই আইনের ধারা অনুসারে রাজস্ব আদায় করা হত। পশ্চিম ডুয়ার্সে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ নম্বর আইন প্রয়োগ করা হয়। পরে অবশ্য এই আইনেরও রদবদল করা হয়।

ডুয়ার্সে প্রথম সেটেলমেন্টের কাজ শুরু হয় ১৮৭১ সালে ডেপুটি কমিশনার Mr. W.O.A. Becket-এর নেতৃত্বে। চেঙ্গমারী, নর্থ ময়নাগুড়ি, মোড়াঘাট, লক্ষ্মীপুর, ওয়েস্টমাদারী, ইষ্টমাদারী, চকোয়াখেতি, বক্সা, ভাটিবাড়ী এবং ভল্কা প্রভৃতি পরগনাতে এই সেটেলমেন্টের কাজ করা হয়। প্রথম সেটেলমেন্টের পর নিম্নলিখিত হারে রাজস্ব ধার্য করা হয়েছিল ঃ-[২]

Description of land	In North Mynaguri and Ambari Falakata			In chengmari and rest of the Duars		
1	2			3		
	Per acre			Per acre		
	Rs.	A	P	Rs	A	P
Bastu	1	8	0	1	0	0

Bamboo	1	8	0	1	0	0
Rupit	1	8	0	1	0	0
Doba	1	8	0	1	0	0
Faringati	0	12	0	0	8	0
Gungle or waste	0	1	6	0	1	6

যখন সেটেলমেন্টের কাজ শুরু হয়েছিল তখন ডুয়ার্সের মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩৯,৫২৬ টাকা। সেটেলমেন্টেব কাজ শেষ হবার পর রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৮৮,৬১৮ টাকায়।

দ্বিতীয় সেটেলমেন্টের কাজ শুরু হয় ১৮৮০ সালে রাজশাহী ডিভিশনের কমিশনার উলিক ব্রার্ডনের নেতৃত্বে। মোট ১,১১৯,৩২২ একর জমি সার্ভে করা হয়েছিল যারমধ্যে ২,৬৪,৬৮০ একর জমিতে কর ধার্য করা হয়েছিল। এই সেটেলমেন্টের পর নিম্নলিখিত হারে রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল ঃ-[৩]

Description of land	South Mynaguri rates			North Mynaguri rates			Rest of the rates		
1	2			3			4		
	Rs.	A	P	Rs.	A	P	Rs.	A	P
Bastu	2	0	0	1	8	0	1	0	0
Bamboo	2	0	0	1	8	0	1	0	0
Rupit	1	8	0	1	8	0	1	0	0
Doba	1	8	0	1	8	0	1	0	0
Faringati	1	2	0	0	12	0	0	8	0
Waste	0	3	0	0	1	6	0	1	6

এই সেটেলমেন্টের পর রাজস্বের পরিমাণ ৮৮,৬১৮ টাকা থেকে বেড়ে ১,৫১,৮৬২ টাকা হয়েছিল।

তৃতীয় সেটেলমেন্টের কাজ শুরু হয় ১৮৮৯ সালে এবং শেষ হয় ১৮৯৫ সালে D. H.E. Sunder এর নেতৃত্বে। এই সেটেলমেন্ট আলিপুরদুয়ার সহ ১১,১১২টি জোতকে সেটেলমেন্টের আওতায় আনা হয়, যার মধ্যে ৯,৯৭১ টি (৩,৮৪,৮৯৫.৯১ একর) জোত ছিল রাজস্ব প্রদায়ী। এই সেটেলমেন্টের পর মোট রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৩,৭৪,৯০১.০০ টাকায় এবং প্রতিটি জোতে জমি ছিল গড়ে ৩৮.৬ একর। সবচেয়ে বড় জোতের জমি ছিল ২৬০৯ একর এবং সবচেয়ে ছোট জোতের আওতায় জমি ছিল মাত্র ০.০৬ একর। এই সেটেলমেন্টে নিম্নলিখিত হারে রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল ঃ-[৪]

Rupit	Present rate		Proposed rate		
	Rs.	A	Rs.	A	
First class	1	8	1	12	
Second class			1	9	
Faringati					
	Rs.	A	Rs.	A	
First class	12		1	6	
Second class			1	3	
Homestead	2	0	2	0	
Bamboo	2	0	2	12	
Betelnut gardens	2	0	2	12	
Dobas	1	8	1	12	acording to class of land
			1	9	
Waste	0	3	0	3	

চতুর্থ সেটেলমেন্টের কাজ শুরু হয় ১৯০৭ সালে এবং শেষ হয় ১৯১৬ সালে। এই সেটেলমেন্টে জলঢাকা নদীর পূর্ব পার হতে তোর্ষা নদীর পশ্চিম পার পর্যন্ত বিরাট অংশের পতিত জমিকে জরিপের মাধ্যমে সরকারের খাসের আওতায় আনা হয়েছিল। এরূপ ২,৯৩,০০০ একর জমিকে জরিপ করা হয়েছিল।[৫]

ডুয়ার্সে মোট তিন ধরণের জোত ছিল। প্রথম জোতকে বলা হত মালজোত। মালজোতের জোতদাতরা বংশপরম্পরায় জোতের স্বত্ত্বাধিকার লাভ করতেন। জোত বিক্রি করতে পারতেন, উপহার দিতে পারতেন, হস্তান্তর করতে পারতেন এবং বন্ধক দিতেও পারতেন। দ্বিতীয় প্রকারের জোত ছিল মিয়াদি জোত। এই জোতে জোতদাররা স্বাধীন স্বত্ত্বাধিকার ভোগ করতে পারতেন না। নির্দিষ্ট মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে নতুন মেয়াদে আবার জমি বন্দোবস্ত নিতে হত। তৃতীয় প্রকারের জোত ছিল পোড়ো জমির জোত। এই জমি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চা বাগানের জন্য লিজ দেওয়া হত।[৬]

জলপাইগুড়ি জেলার প্রথম ডেপুটি কমিশনার টুইডি ১৮৬৬ সালে প্রজাদের শ্রেণী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আলোকপাত করেছেন। তিনি প্রজাদের তিনভাগে ভাগ করেছেন। যথা — (ক) জোতদার, (খ) চুকানিদার এবং (গ) কৃষি শ্রমিক। রাজশাহী বিভাগের কমিশনার নোলান প্রজাদের দুটিশ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যথা — (ক) জোতদার এবং (খ) আধিয়ার। চুকানিদার এবং দ্বারচুকানিদার সম্পর্কে তিনি বলেন 'প্রজা' 'রায়ত' প্রভৃতির সংমিশ্রণে পরবর্তী কোন সময়ে ঐ দুটি শ্রেণীর উৎপত্তি। গ্রুনীং তাঁর ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার-এ তিনধরণের প্রজার কথা স্বীকার করেছেন। যথা ঃ- জোতদার, চুকানিদার, মুলানদার, দ্বারচুকানিদার,

দ্বার-দ্বার চুকানিদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্ত্বভোগী এবং আধিয়ার বা প্রজা।[৭]

ভূমি-ব্যবস্থার এই পর্যায়ক্রমিক বিভাজনে সর্বনিম্নে থাকতেন আধিয়ার বা প্রজা। তারা জোতদার কিংবা মধ্যসত্ত্বভোগীদের অধীনে জমি চাষ করতেন। আধিয়াররা যাদের অধীনে জমি চাষ করতেন তাদের বলা হত 'গিরি'। এই গিরি এবং আধিয়ারদের মধ্যে সম্পর্ক প্রথমদিকে কিছুটা ভাল থাকলেও পরবর্তীকালে তা খারাপ হতে থাকে। গিরি এবং আধিয়ারদের মধ্যে সম্পর্ক হয় দাস এবং প্রভুর সম্পর্ক। তারা গিরির বাড়ির সম্মুখ দিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে যেতে পারতেন না, জুতো পায়ে যেতে পারতেন না - ইত্যাদি অনেক নিয়ম ছিল আধিয়ারদের কাছে অবশ্য পালনীয়।[৮]

ব্রিটিশরা আসার পূর্বে ডুয়ার্সের পাবত্যঅঞ্চলে যেসব জনজাতি বাস করতো তাঁদের মধ্যে ছিল ডোয়রা, টোটো, ডুকপা প্রভৃতি। আবার পাহাড়ের সমতলে বাস করতো মেচ্, রাভা, গারো, টোটো, তুভু, ডোয়রা, পোনিকোচ, লেপচা, জলদা প্রভৃতি জনজাতির মানুষ। এসব জনজাতির মানুষ তখনও ছিল আদিম জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত এবং শিকার, ঝুমচাষ; মাছ ধরা প্রভৃতি ছিল তাদের জীবিকা। তারা জঙ্গল পরিষ্কার করে জমিকে চাষের উপযোগী করে গড়ে তুলতো। এক জায়গায় কিছু দিন চাষবাস করার পর আবার অন্যত্র চলে যেত। সেখানে আবার চাষবাস শুরু করতো। এক একটা জনগোষ্ঠীর নামে এক একটা গ্রাম পত্তনী দেওয়া হত এবং এলাকাটি নথিভূক্ত করা হত ঐ বিশেষ জনগোষ্ঠীর গোষ্ঠীপ্রধান বা ধর্মীয় প্রধানের নামে। ঐ গোষ্ঠীপ্রধান প্রতিটি পরিবারের প্রধানের নামে খাজনা আদায় করে (Capitation tax) প্রতিবছর তা সরকারী আমলার হাতে তুলে দিতেন। ঐ গোষ্ঠীপ্রধান বা ধর্মীয় প্রধান সরকার ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করতেন। এই জনজাতির মানুষেরা জমি বিক্রয়যোগ্য বলে মনে করতো না। তারা জমিকে ঈশ্বরের সম্পদ বলে মনে করতো এবং গ্রাম পত্তনের পর জমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ তাদের যৌথ সম্পত্তি বলে মনে করা হত।

কিন্তু আদিবাসী মানুষের এরূপ স্বাধীন স্বত্ত্বা আর থাকল না। ডুর্য়াসে যে প্রচুর পরিমাণ পতিত জমি ছিল তা সেটেলমেন্টের মাধ্যমে চাবাগান গড়ার জন্য পত্তনী দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয় এসব জমি জোতদারদেরও পত্তনী দেওয়া হয়েছিল। ১৮৭৪ সালে ডঃ ব্রাউঘনের (Broughan) এর দ্বারা তিস্তা নদীর পূর্ব দিকে গাজনডোবায় প্রথম চা বাগান তৈরি করা হয়েছিল, যার ম্যানেজার ছিলেন রিচার্ড হটন (Haughton)। দু বছরের মধ্যে চাবাগানের সংখ্যা হয় ১৩টি এবং ১৯০১ সালের মধ্যে চাবাগানের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩৫-এ।[৯]

চা বাগান গড়ে উঠলে শ্রমিকের অভাব দেখা দিল। কারণ স্থানীয় মেচ, রাভা, গারো, নেপালী, রাজবংশী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ চা শ্রমিকের কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন না। তারা চাবাগান গড়ে ওঠাকে ভাল চোখে দেখলেন না। সুতরাং তাদের নজর পড়ল

ছোটনাগপুর, সাঁতাল পরগনার সাঁতাল, মুন্ডা ও ওঁরাওদের উপর। এই সহজ সরল মানুষদের নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে আড়কাঠিরা তাদের ধরে আনতে লাগলেন। এখানে এসে তারা বন্দী ক্রিতদাসে পরিণত হয়ে গেলেন। তাদের উপর চলতে লাগল অমানুষিক অত্যাচার। এই অত্যাচার থেকে পালাবার কোন উপায় ছিল না। সবসময় চৌকিদাররা পাহারা দিতেন। পালাবার চেষ্টা করলে তাকে ধরে এনে কঠিন শাস্তি দেওয়া হত। ডেমাটার অর্থাৎ পলায়নকারী বিশেষণ চাপিয়ে শ্রমিকদের গুলি করে মারার অধিকার ছিল সাহেবদের। মহিলাদের ইজ্জতের কোন মূল্য ছিল না। পরিতোষ দত্ত তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "বস্তুত চা শ্রমিকরা তাদের গোষ্ঠীর নাচগান, বাজনা সব নিয়ে আসে তার সুর তাঁদের নিয়ে যেত কল্পলোকে। নির্যাতনে, পীড়নে সেই সুর জন্ম দেয় নবতরঙ্গ — লোকশিল্পীরা ক্রমশ প্রতিদিনের সংগ্রামের সাথে যুক্ত হয়ে হতে থাকেন গণশিল্পী।"[১০] সান্ডার সাহেব লিখেছেন, "In the cold weather and rains plucking work was done from 7 a.m till about 6 p.m with two hours leave."[১১] রঞ্জিৎ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "In the early 1890s on the tea gardens the average wage rates were Rs. 6 a month for men, Rs. 4.8 to Rs. 5 for women and Rs. 2.8 to Rs. 3 for children."[১২] ১৮৯৩ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত জিনিসপত্রের দাম বেড়েছিল অনেক, অথচ শ্রমিকদের মজুরী বাড়েনি।

প্রথমদিকে যখন সেটেলমেন্টের মাধ্যমে জোতদারদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল তখন ডুয়ার্সের লোকসংখ্যা ছিল খুবই কম। নানা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যে কেউ আসতে চাইত না। ফলে কৃষকদের নানা সুযোগ সুবিধা দিয়ে জমিতে ধরে রাখার চেষ্টা করা হত। প্রথম দু-এক বছর কোন রাজস্ব দিতে হত না। কিন্তু আস্তে আস্তে রাজস্বের পরিমাণ বাড়াতে থাকে। জোতদারী ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে ডুয়ার্সে লোকসংখ্যা বাড়তে থাকে। পার্শ্ববর্তী কোচবিহার, রংপুর, দিনাজপুর, বিহার, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু মানুষ ডুয়ার্সে আসতে থাকে। ডুয়ার্সের লোকসংখ্যা ১৮৭২ সালে ছিল ১,০০,১১১ জন, ১৮৮১ সালে হয় ১,৮২,৬৬৭ জন এবং ১৮৯১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২,৯৬,৯৬৪ জনে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ প্রবেশ করার ফলে পুরোনো জমির মালিকরা অনেকেই জমি হারাতে থাকেন। জমি কেনা বেচা হতে থাকে। অনেকে জমি কিনে জোতদারে পরিণত হয়, যাদের জমির সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক ছিল না। নিম্নে জোত বিক্রির একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হল ঃ—[১৩]

তহশিল	হস্তান্তরিত জোতের সংখ্যা	জমির পরিমাণ একর	মোট জমির পরিমাণ	জমির শতাংশ
১। ময়নাগুড়ি	২৭৩০.৫	২৮,৫৭২.৪৫	১৬০,৪২৪.৯৫	১৭.৭৬
২। ফালাকাটা	১৭৪২.০	২৮,২৬৯.৯৪	১৮৭,৩০১.৯০	১৫.১০

৩। আলিপুর-দুয়ার	১২০৮.৯	৬৬,২২২.৭৫	১৪৩,৫৪৪.২৫	৪৬.১৪
৪। ভক্কা	২৫১.০	১,৩০১.৯০	৩৭,৭৫২.৬৭	৪.০০
৫। আমবাড়ী ফালাকাটা	৪.০	২৩৬.০০	৯,৭৩,৭৯.৬০	২.৫২
মোট	৫৯৩৬.৪	১২৪,৬০৩.০৩	৫৩৮৮০৩.৩৭	২৩.১২

জোতসোতাদের মধ্যে ৮৫ শতাংশ ছিলেন জোতদার, চুকানিদার এবং ১৫ শতাংশ ছিলেন মহাজন, উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি। এসব অনুপস্থিত বহিরাগত জোতদারেরা জমিতে প্রবেশ করার ফলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা জমিতে স্বাধীনভাবে বসবাস করতেন তাদের ভাগ্যে নেমে এল বিপর্যয়। ডুয়ার্সের অন্তর্গত টোটো পাড়ার টোটোরা আজ পৃথিবীর এক লুপ্তপ্রায় জনজাতি হিসেবে পরিচিত। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৯০১ সালে টোটোদের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১৭১ জন। টোটোপাড়া ছিল তাদের একক জনগোষ্ঠীর গ্রাম। বাইরের কোন জনগোষ্ঠী টোটোপাড়ায় ঢোকা নিষেধ ছিল। কিন্তু কালক্রমে তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে ইংরেজরা। ইংরেজদের শাসনের অধীনে টোটোদের নিয়ে আসা হয়। টোটোদের কমলালেবুর ব্যবসাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। ১৯৫১ সালে জেলা প্রশাসন কোন কারণ না দেখিয়ে তাদের জমি রক্ষা করার নামে মাত্র ৩১২ একর জমি বাদে টোটোপাড়ার সমস্ত জমি খাস জমি হিসেবে নথিভুক্ত করে নেয়।[১৪] একসময় টোটোরাই যেখানে ছিলেন একমাত্র জনগোষ্ঠীর মানুষ সেখানে তারা আজ সংখ্যালঘিষ্ঠ। একটি পরিসংখ্যান দিয়ে বিষয়টি দেখান হল[১৫]

জাতি/জনজাতি	পরিবারের সংখ্যা	মোট জন সংখ্যা	শতকরা হার
বিহারী	১৪	৮৩	৩.৭
বাঙালী	৯	২৪	১.০৬
বিহারী ও ইউ.পি মুসলমান	৫	২৩	১.০২
গারো	২	১৪	০.৬
লেপচা	১	০২	০.০৮
মেচ	১	০৪	০.১১৭
মাড়োয়ারী	১	০২	০.০৮

ওঁরাও	১	০১	০.০৪
নেপালী	২০৯	১১৬৬	৫১.৯
টোটো	১৮০	৯২৬	৪১.৩

টোটোদের সংখ্যা ১৯০১ সালে ছিল ১৭১ জন, ১৯৩১ সালে ৩২৮ জন এবং ১৯৫১ হয় ৩১৪। অর্থাৎ এই দীর্ঘ ৫০ বছরে টোটোদের সংখ্যা সেরকম বাড়েনি।

টোটোদের মত ডুয়ার্সের আর একটি আদিম জনজাতি হল মেচ। একসময় মেচরাই ডুয়ার্সে স্থায়ীভাবে বসবাস করতো। কারণ অন্যান্য জাতির মানুষ এই অস্বাস্থ্যকর দুর্গম পরিবেশে এসে থাকতে পারতো না। এরা ছিল খুবই সহজ সরল।

নিম্নে জলপাইগুড়ি জেলার মেচ জনজাতির পরিসংখ্যান দেওয়া হল।[১৬]

১৮৯১ সালে ২১,৬০৮ জন।

১৯০১ সালে ২২,৩৫০ জন।

১৯১১ সালে ১৯.৮৯৩ জন।

১৯২১ সালে ১০,৭৭৭ জন।

১৯৩১ সালে ৯,৫১০ জন।

১৯৪১ সালে ৬,৮৮৬ জন।

১৯৫১ সালে ১০,৫০৭ জন।

১৯৬১ সালে ১৩,১৭৮ জন।

১৯৭১ সালে ১০,৩৮৭ জন।

পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯০১ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত মেচদের সংখ্যা ক্রমশই কমেছে। অশোক গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "................ ওদের এই করুণ অবস্থা শুরু হয় ১৮৫০ সাল থেকে। .... তাছাড়া ১৮৬০ নাগাদ চা এর প্রয়োজনে জমিও দরকার হয়ে পড়েছিল। তাই ওয়েস্টল্যান্ড আইন করে প্রচুর জমি মেচ ও অন্য ভূমিপুত্রদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হল। ইংরেজ চালু করল জোতদারী প্রথা। জোতদারী প্রথায় জমি কেনাবেচা যায়। তাই বহিরাগত বিহারী, মারোয়ারী, বর্ণহিন্দু বাঙালীদের প্রবেশ ঘটতে লাগল। সেই সঙ্গে শুরু হল শোষণ ও বঞ্চনা।"[১৭]

মেচ, টোটো সম্প্রদায়ের মত রাভা, গারো, ধীমল, কোচ এরাও ইংরেজ শাসনপর্বে সমানভাবে অত্যাচারিত ও শোষিত হয়েছে। এদের পাশাপাশি সাঁওতাল, হো, ওঁরাও, মুন্ডা প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষও সমানভাবে অত্যাচারিত ও শোষিত হয়েছে। এসব আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার কোন চেষ্টা ইংরেজ

শাসনপর্বে হয়নি। দেশ স্বাধীন হবার পরও এসব মানুষকে শোষণমুক্ত করবার জন্য সেরকম কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সম্প্রতি সরকারের তরফ থেকে কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও রাজনৈতিক দলাদলি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, জাতিগত বিদ্বেস এবং সততা ও আন্তরিকতার অভাবে উন্নয়নের কাজ যতটা হবার কথা ছিল তা হয়নি। ফলে এদেরকে নিয়ে আবার নতুন করে ভাববার সময় এসেছে এবং এর জন্য সমাজের সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে সততা ও আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারকেও আরও তৎপর হতে হবে। ঘোচাতে হবে তাদের উপর সমস্ত রকম অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ ও বঞ্চনা। তাদের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তাদের মধ্য থেকে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর হয়। যত দ্রুততার সঙ্গে একাজ করা যাবে ততই তাদের মঙ্গল। মঙ্গল সকলের, দেশের ও সমাজের। নতুবা ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না।

সূত্র নির্দেশ ঃ-

১। Chatterjee Partha. *Bengal 1920-1947- The Land Question*, K.P. Bagchi & Company. Calcutta. First Published 1984, p-6.

২। Sunder. D H.E. *Survey and Settlement of the western Duars 1889-95*, Bengal Secretariet Press. Calcutta, 1895. p-41

৩। Do. p-42

৪। Do. p-117

৫। Milligan. J A.. *Final Report on the Survey and Settlement in Jalpaiguri District, 1906-16*. Bengal Secretariet Book Depot. Calcutta, 1919.

৬। ডঃ রায়চৌধুরী. তাপস কুমার, "ডুয়ার্সে ভূমি-বাজস্ব ব্যবস্থাব বিবর্তন", *মধুপর্ণী*, বিশেষ জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৩৯৪।

৭। Grunning. J.F. I.C.S. *Eastern Bengal and Assam District Gazetteers, Jalpaiguri*, Pioneer Press, Alahabad. 1911.

৮। Dasgupta. Ranjit. *Economy, Society and Politics in Bengal Jalpaiguri 1869-1947*, Oxford University Press. Delhi. 1992.

৯। Ranjit Dasgupta. পূর্বোক্ত।

১০। দত্ত, পরিতোষ, *উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার*, প্রিন্টকো, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৯৯, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারী ২০০০।

১১। Sunder. পূর্বোক্ত।

১২। Ranjit Dasgupta. পূর্বোক্ত।

১৩। Sunder's and Milligan's Report.

১৪। বিশ্বাস, রতন (সম্পাঃ), *উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি*, পুনশ্চ, কলকাতা, জানুয়ারী ২০০১, পৃঃ ৩০।

১৫। ঐ, পৃঃ ৩১।

১৬। ঐ পৃঃ ১৬২।

১৭। গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক, *উত্তরবঙ্গ পরিচয়*, গ্রন্থতীর্থ, কলেজস্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৩, পৃঃ ৭৮।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ — রুজভেল্ট নগর — একটি সমীক্ষা

অঞ্জলি দাস

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যায় যা ইতিহাসের পাতায় আক্ষরিক আকারে স্থান পায় না। সেই স্থানের লোকগাথায় সেই দেশ প্রচলিত কিছুদিন থাকে। কালের অমোঘ গতিতে তা একদিন নিঃশেষ হয়ে যায়। অথচ ঘটনাগুলোর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তা অসামান্য ঐতিহাসিক উপাদানে সমৃদ্ধ। ধীরে ধীরে ঘটনার প্রতক্ষ্যদর্শীরাও পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়ায় এমন অনেক ঐতিহাসিক তথ্যও হারিয়ে যায়। আবার কিছু ইতিহাস অনুসন্ধানী মানুষ ঘটনাগুলোকে ধরে রাখার চেষ্টা করেন তাদের লেখনীর মাধ্যমে। তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টা প্রেরণা যোগায় আধুনিক ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুদের। এমনই এক মুছে যাওয়া, বিস্মৃতির আলো আঁধারেতে হারিয়ে যাওয়া ঘটনাকে তুলে ধরার প্রয়াসে ব্রতী হয়েছি।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পশ্চিমবাংলার গড়ে ওঠা নতুন শহর 'কল্যাণী' স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মানসকন্যা। কল্যাণীর অধিকাংশ অঞ্চল একদিন ছিল 'রুজভেল্ট নগর'। নদীয়া জেলার দক্ষিণ দিকে এক সময় ছিল শ্যামল প্রান্তর, কৃষি সমৃদ্ধ সবুজ বনানী দ্বারা পরিবেষ্টিত কয়েকটি গ্রাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ সালে গ্রামের সরল কৃষিজীবী, সমৃদ্ধ চাষী, জমিদার সকলকেই উচ্ছেদ করে রাতারাতি হয়েছিল মার্কিন সামরিক ঘাঁটি 'রুজভেল্ট' নগর।

তৎকালীন নদীয়া জেলার মানচিত্রে 'রুজভেল্ট' নগরের জন্য উচ্ছেদ হওয়া গ্রাম গুলির অবস্থান ঃ উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সীমান্ত অঞ্চলের প্রায় গা ঘেঁসে থাকা দুটি ইউনিয়ন বোর্ড এবং তাতে অন্তর্ভুক্ত ৪৫ খানা গ্রাম। ইউনিয়ন বোর্ড দুটির নাম সগুনা ও কাঁচরাপাড়া। বোর্ড দুটি রাণাঘাট মহকুমার অধীনে চাকদহ থানার অন্তর্গত ছিল। শিয়ালদহ - রাণাঘাট রেল লাইনের পশ্চিমদিকে কাঁচরাপাড়া এবং পূর্বদিকে সগুনা ইউনিয়ন বোর্ড ছিল। অতীতে ইউনিয়ন বোর্ড দুটি হাবেলী শহর পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ঃ সগুনা ইউনিয়নবোর্ডভুক্ত গ্রাম ও মৌজাগুলির নাম ঃ

মৌজা নং	মৌজার নাম	গ্রামের নাম
৭২	সাঁতরাপাড়া	সাঁতরাপাড়া

৭৩	গোকুলপুর	গোকুলপুর
৭৪	কাঁটাগঞ্জ	কাঁটাগঞ্জ
৭৬	উত্তর বড়া	উত্তরবড়া
৭৬	উত্তরবড়া	কোলেপোঁতা
৭৯	জয়দেব বাটি	জয়দেব বাটি
৭৯	জয়দেব বাটি	বনবনিয়া
৮০	সগুনা	সগুনা
৮০	সগুনা	কাঠুরপাড়া
৮০	সগুনা	শিয়ালডাঙ্গা
৮১	কৃষ্ণপুর	কৃষ্ণপুর
৮২	রঘুনাথপুর	রঘুনাথপুর
৮৩	কুলিয়া	কুলিয়া
৮৪	যাদবপুর	যাদবপুর
৮৫	বালিয়াঘাটা	বালিয়াঘাটা
৮৬	কানপুর	কানপুর
৮৭	গয়েশপুর	গয়েশপুর
৮৮	দোগাছিয়া	দোগাছিয়া
৮৯	কাঁটাবেলে	কাঁটাবেলে
৯০	বসন্তপুর	বসন্তপুর
৫১	মুরাতীপুর	মুরাতীপুর
৫২	বীরপাড়া	বীরপাড়া
৫৩	চর যদুবাটী	চর যদুবাটী
৫৪	মাঝের চর	মাঝের চর
৫৫	চর নন্দনবাটী	চর নন্দনবাটী
৫৬	চর কাঁচরাপাড়া	চর কাঁচরাপাড়া
৫৭	কাঁচরাপাড়া	কাঁচরাপাড়া
৫৮	শিঙা	শিঙা

৫৯	ধোকরাদহ	ধোকরাদহ
৬০	কৃষ্ণদেববাটী	কৃষ্ণদেববাটী
৬১	গুস্থিয়া	গুস্থিয়া
৬২	পশ্চিম বিষ্ণুপুর	পশ্চিম বিষ্ণুপুর
৬৩	দক্ষিণ ঘোষপাড়া	দক্ষিণ ঘোষপাড়া
৬৩	দক্ষিণ ঘোষপাড়া	স্কুলডাঙ্গা
৬৪	ধর্মবাটী	ধর্মবাটী
৬৫	যাদববাটী	যাদববাটী
৬৬	চর মানিককাঁদা	চর মানিককাঁদা
৬৭	ঘুনঘুনিয়া	ঘুনঘুনিয়া
৬৮	মথুরাবাটি	মথুরাবাটি
৬৮	মথুরাবাটি	কেউটিয়া
৬৯	দক্ষিণ ভবানীপুর	দক্ষিণ ভবানীপুর
৭০	ইলেমডাঙ্গা	ইলেমডাঙ্গা
৭৫	গোপালপুর	গোপালপুর
৭৭	বড়েয়া	বড়েয়া
৭৮	চাঁদামারী	চাঁদামারী

প্রকৃতির অকৃপণ দানে পরিপূর্ণ গ্রামগুলি ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে সকলে মিলে মিশে বসবাস করত। একটি গ্রাম থেকে অপর গ্রামের দূরত্ব বেশী ছিলনা কিন্তু গ্রামগুলি ছিল ঘনবসতিপূর্ণ। গ্রামের নিকটবর্তী ছিল চাষের উর্বর ক্ষেত্র। সুতরাং সারা বছরই মানুষগুলোর অন্ন সংস্থানের অভাব ছিলনা।

এই সময়ে দুই ধরণের গ্রামবসতির পরিচয় পাওয়া যায়। এক ধরণের বাড়ি কাঁচা মাটির দেওয়াল এবং খড়, টিন অথবা টালির ছাউনি। প্রতিটি গ্রামেই রয়েছে পাকা বাড়ি, তবে সংখ্যায় কম। বিশেষত গ্রামে প্রতিটি জমিদার বাড়িই ছিল ইঁটের তৈরি বিশালাকার। রাস্তাগুলি ছিল কাঁচা — বর্ষায় রাস্তায় চলা ছিল অত্যন্ত কষ্টকর, পাকা রাস্তা বলতে একটিই ইঁটের তৈরি রাস্তা ছিল। জেলা বোর্ডের তৈরি এই রাস্তাটি ঘোষপাড়া গ্রাম থেকে শুরু করে ধর্মবাটি, যাদববাটি, কৃষ্ণচরবাটি গ্রামের মধ্য দিয়ে কাঁচরাপাড়া গ্রামে উপনীত হয়। বর্তমান কাঁচরাপাড়া স্টেশনের সম্মুখে সারি সারি ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত। ঘোড়ার গাড়িতে কাঁচরাপাড়া স্টেশন থেকে ঘোষপাড়া গ্রাম অবধি ভাড়া ছিল আট

আনা। মুসলমান চালকই ছিল বেশী। দেশবিভাগের সময়ে তারা অধিকাংশই পাকিস্তানে চলে যায়।

বর্তমান কাঁচরাপাড়ার আসল নাম ছিল বীজপুর। বীজপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল কাঞ্চনপল্লী থেকে অপভ্রংশ হয়ে কাঁচরাপাড়া নামে পরিচিত হয় যা গোটা বীজপুরেও প্রচলিত হয়ে পরে, এই কাঞ্চনপল্লী বা গ্রাম কাঁচরাপাড়া বর্তমানে নদীয়া জেলার সীমানাভুক্ত, কিন্তু বীজপুর বা বর্তমান কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত।

সেই সময়ে এখানকার গঙ্গার চর এলাকায় প্রচুর পরিমাণে ফসল ফলতো, বাণীপুর ও শিঙা গ্রামে প্রচুর পরিমাণে ফুলকপি ও বাঁধাকপির চাষ হতো। পরিবারের স্বচ্ছলতার প্রতীক ছিল গরু। গঙ্গাতীরবর্তী গ্রামগুলিতে অনেক ধনী কৃষক বাস করতেন তাদেরই একজন মাণিক মণ্ডল, যাঁর দুই ছেলে নারায়ণ মণ্ডল ও গোপাল মণ্ডল এখনও জীবিত। এছাড়াও সম্পন্ন চাষী হিসাবে বিষ্ণুপুর গ্রামের বাসুদেব মণ্ডল, মোড়েডাঙা গ্রামের বিষ্ণুপদ দাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

গ্রামগুলিতে জমিদারই ছিলেন শাসনকর্তা, যদিও তারা ছিলেন প্রজাবৎসল, ফলে গ্রামের মানুষদের সাথে তাঁদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। জমিজমা নিয়ে জমিদারদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ থাকলেও প্রজাদের মধ্যে এর রেশ কখনো ছড়িয়ে পড়েনি। এভাবেই চলছিল গ্রামের জীবনযাত্রা। কিন্তু এই জীবনযাত্রায় বাদ সাধল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৩৯ সালে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলেও সারা পৃথিবীতে এই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে ১৯৪৩ সালে। পৃথিবীর দেশসমূহ দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে যায়, মার্কিন-ব্রিটিশ-রাশিয়ার মিত্রশক্তি বনাম জার্মানি-জাপান-ইটালির অক্ষশক্তি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলগুলি জাপান দখল নিতে শুরু করলে এবং জাপানী সাহায্যে ভারতের মাটি থেকে ব্রিটিশ ফৌজকে উৎখাত করার উদ্দেশ্য নিয়ে যখন নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতের পূর্ব সীমানায় পৌঁছে গেলেন — সেই সময়ে তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ভারতের পূর্ব সীমানায় অক্ষশক্তি ও আজাদ-হিন্দ-ফৌজের যৌথ অভিযানকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পূর্ব সীমান্তে জরুরীভিত্তিতে কিছু সামরিক ঘাঁটি তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মিত্রশক্তির এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন খণ্ডে রাতারাতি গড়ে উঠতে থাকে বেশ কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি। তার মধ্যে অন্যতম চিহ্নিত হল নদীয়া জেলার চাকদহ থানার দুটি ইউনিয়ন বোর্ড। কোন সুদূরে নেওয়া সিদ্ধান্ত সর্বনাশের মুখে ফেলে গ্রাম বাংলার সাধারণ অধিবাসীদের। তখনকার দিনে খবরের কাগজ এবং শিক্ষার কোন সঠিক চল না থাকায় তাদের কাছে পৌঁছলোনা সেই সর্বনাশের খবর। ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে — মাঠে তখন সবুজের বন্যা, ক্ষেতের কাজে সবাই ব্যস্ত, জমিদার বাড়িতে চলছে দুর্গা পূজার আয়োজন, পূজার সময়ে হবে যাত্রাপালা বা নাটক, চলছে তার অভ্যেসচর্চা। দিনমজুররা তাদের

পরিবারের সবাইকে নূতন বস্ত্র তুলে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, কুমোর বাড়িতে তৈরি হচ্ছে প্রতিমা, সেই সময়ে ঢাকে কাঠি পড়ল ঠিকই, কিন্তু সে পূজার বাজনা নয়, সরকারী ঢোল পিটানো। আগেকার দিনে প্রচারের বাদ্য হিসাবে ঢোল পিটানো হত। সকলেই উৎসুক হয়ে সরকারী ঘোষণা শুনতে দৌড়ালো, ঘোষক জানালো — "এতদ্বারা এতদ অঞ্চলের গ্রামবাসীদের জানানো যাচ্ছে যে দেশের স্বার্থে অতি জরুরী প্রয়োজনে এই এলাকার সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে। অতএব আপনাদিগকে আগামীকাল (২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩) এই এলাকা ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইবে। যাঁদের ইউনিয়ন বোর্ডের করের রসিদ আছে, তাঁদেরকে প্রতি এক টাকা রসিদে একশত টাকা এবং যাহাদের রসিদ নাই তাহাদিগকে পরিবার পিছু সত্তর টাকা করে দেওয়া হবে।" মাত্র একটি দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়ায় মানুষ দিশেহারা হয়ে উঠলেন — কোথায় যাবেন, কোথায় আশ্রয় পাবেন, ইউনিয়ন বোর্ডে ক্ষতিপূরণ নিতে যাবেন না ঘর ছাড়ার জন্য গাড়ি ঘোড়া যোগাড় করবেন, কিছু ভেবে ওঠার অবকাশও পেলেন না, যে যেরকম পারলেন তেমনভাবে ঘর ছাড়তে শুরু করলেন। এই দিশেহারা মানুষগুলোর কথা ভাবলে এখনো অনুভবে আতঙ্কের পরশ এসে পড়ে।

প্রথমে ঘোষকের কথা অনেকে বিশ্বাস করেননি। তবু সারারাত পঁয়তাল্লিশখানা গ্রামের মানুষ দুচোখের পাতা এক করতে পারেননি। কিন্তু পরের দিন সকালে অর্থাৎ ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ গ্রামে মার্কিন মিলিটারী অফিসাররা মাপজোক শুরু করলে গ্রামবাসীরা দলে দলে ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে উপস্থিত হতে শুরু করল। যারা গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার বেদনায় নির্দেশ মানলেন না, ৩রা সেপ্টেম্বরের পুনর্বার হুঁশিয়ারীতে তারাও কালবিলম্ব করেননি। সে দৃশ্য অবর্ণনীয় — শুধু অনুভবের আয়নায় তাকে প্রত্যক্ষ করা যায় - দিশেহারা মানুষজন কি করবে, কোথায় যাবে, কে যোগাবে অন্ন — এর উপর যানবাহনের সমস্যা। সময় নেই — এখনই বেরোতে হবে — ফেলে যেতে হবে সাধের ভিটে মাটি, ক্ষেতখামার, গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুরের মাছ, শ্যামলা সুন্দর বনানী — আজ তারা পথের ভিখারী, অল্প সময়ের মধ্যে যে যতটুকু নেওয়ার নিতে পারল, বাকি সব পড়ে রইল, গাড়ীর গাড়োয়ানরাও সুযোগ বুঝে আকাশ ছোঁয়া দাম হাঁকিয়ে বসলেন। অনেক ঘোড়াও অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়েছিল। নিজভূমে পরবাসী জমিদার - প্রজা, ধনী - দরিদ্র সকলেই গ্রাম ছেড়ে অজানা ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। বুক ভরা বেদনা, চোখ অশ্রুসক্ত, প্রত্যেকে আতঙ্কগ্রস্ত, ৪৫ খানা গ্রামের মানুষের যাত্রার বর্ণানা সকলকেই অশ্রুসিক্ত করে তোলে। বহু বৃদ্ধ বৃদ্ধা সেদিন পথের মাঝেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। অনেক মা রাস্তাতেই সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন — এই করুণ কাহিনীর প্রত্যক্ষদর্শী কিছু মানুষ এবং তাঁদের পরের প্রজন্মের কয়েকজনের সঙ্গে যোগযোগ করে এই ঘটনাগুলি জানা যায়। তাঁদের অনেকের

বক্তব্য ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে যে অনুদান দিয়েছিলেন তা খুবই সামান্য এবং তা দেওয়া হয়েছিল তিনটি কিস্তিতে —

অনুদানের নমুনা —

স্থাবর সম্পত্তির নাম ও পরিমাণ	অনুদানের পরিমাণ
১ একক কৃষি জমি	১০৫ টাকা
১ একর অকৃষি জমি	৫০ টাকা
১ একর ভিটে জমি	৬০ টাকা
১টি বড় মাটির ঘর	১১০ টাকা
১টি বড় পাকা ঘর	২০০ টাকা
১টি বড় গোয়াল ঘর	৫০ টাকা
১টি বড় আম গাছ	৮ টাকা
১টি বড় নারকেল গাঠ	৩ টাকা

এখন কল্যাণী যে শিল্পনগরীতে দাঁড়িয়ে আছে, হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্প, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সেই স্থলে ছোটবড় মোট ৪৫ খানা গ্রামের বাস্তুভিটা আবাদী জমি মার্কিন সেনার ট্রাকটরের তালার ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার নরনারীর চোখের জলে সিক্ত নরম মাটিতে গড়ে উঠেছিল মার্কিন প্রতিরক্ষা বেষ্টনী ও মার্কিন জঙ্গী বিমান ঘাঁটি। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্টের নামানুসারে যার নামকরণ করা হয় — 'রুজভেল্ট নগরী'। আর আজ সেই মাটিতে গড়ে উঠেছে বিধানচন্দ্র রায়ের মানস কন্যা কল্যাণী।

মুরাতিপুর গ্রামের জমিদার অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘোষপাড়া গ্রামের গোপালকৃষ্ণ পাল, কেউটিয়া গ্রামের সতীশ চন্দ্র নন্দী, জয়দেববাটি গ্রামের মাখনলাল সুর, কাঁচরাপাড়া গ্রামের হরিদাস মুখোপাধ্যায়, সগুনা গ্রামের হরিদাস সরকার এবং কৃষ্ণপুর গ্রামের রজনীকান্ত সুর প্রমুখ জমিদারেরা এই নারকীয় ঘটনায় জমির দখল হারিয়ে ফেলেন। সেই সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী বর্তমানে একমাত্র জীবিত শ্রী ভবেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে ত্রিবেণীতে একটি কাগজ কলের শ্রমিক হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করছেন। তিনি শ্রী অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ছয় পুত্রের অন্যতম। অম্বিকাবাবুর তিন ভাই — বড় ভাই যাদবকৃষ্ণ মুঙ্গের জেলায় জেলাজজ ছিলেন, মেজভাই রাধাকৃষ্ণ কলকাতায় সরকারী কাজ করতেন, পূজার ছুটিতে সকলেই অম্বিকাবাবুর বাড়িতে মিলিত হতেন। অম্বিকাবাবুর ভাগ্নে সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় মামার বাড়িতেই থাকতেন, বর্তমানে তিনি নৈহাটীর ভাটপাড়ায় বসবাস করছেন। তাঁর জবানবন্দীতে জানা যায় বর্তমান বিধানচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরটিও ছিল তাঁর মামার জমিদারী। তাঁদের পুকুর ও আমবাগান আজও তাঁদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

অম্বিকা বাবুর আর এক পুত্র খগেন্দ্রনাথ শিমুরালীতে বসবাস করতেন, বর্তমানে তিনি মৃত। তাঁর পুত্র বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, আমরা আজ বহু কষ্টে দিন কাটাচ্ছি। বিশাল সম্পত্তির নামমাত্র আমরা ক্ষতিপূরণ পেয়েছি, এখন আমাদের দুবেলা অন্নসংস্থান করতেই কষ্ট হচ্ছে। আমরা যারা একদিনের নোটিশে ভিটেছাড়া হলাম সঠিক পুনর্বাসন পেলাম না, পরিবারের কেউ চাকরি পেল না, কিন্তু ভারত সরকার পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এই রুজভেল্ট নগরে করলেন।

জমিদার অম্বিকাবাবু বাড়ির পশ্চিমে ছিল অমর কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মভূমি, তাঁর মামার বাড়িতে এখানেই কাটে তাঁর শৈশব, তিনি সর্বদাই একটা কবিতা বলতেন, — আমি পেয়েছি ঠাকুর, হয়েছি কুকুর / সে পদে পরাণ সঁপিয়া। তিনি ঘোষপাড়া গ্রামে পাঠশালায় পড়তেন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে মামার বাড়িটিও ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তলায় পড়ে থাকে বিভূতিভূষণের শৈশবের স্মৃতি। নদীয়ার মাণচিত্র থেকে হারিয়ে যায় তাঁর জন্মভিটা। বিভূতিভূষণের ডায়েরীর পাতা থেকে পাওয়া যায় তাঁর মামার বাড়ির সুখস্মৃতিগুলি। গত ১৯৯৮ সনের ১২ই সেপ্টেম্বর (মুরাতিপুর গ্রামে) বর্তমান কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিভূতিভূষণ স্মারক সমিতির উদ্যোগে বিভূতিভূষণের জন্মদিনে একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত হয়। 'কল্যাণীর সেকাল-একাল গ্রন্থের লেখক শ্রী নিতাই ঘোষের আবেদনে সাড়া দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী এই মূর্তিটির উন্মোচন করেন। বিভূতিভূষণের মৃত্যুর ৪৮ বছর পরে তাঁর জন্মভূমি সম্মানিত ও চিহ্নিত হয়।

সেই সময়ের আর একজন গুণী ছিলেন — শ্রী নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মুরাতিপুর গ্রামে জন্ম, তিনি যৌবনকালে তত্ত্ববোধিনী, হিন্দু প্যাট্রিয়ট, এডুকেশন গেজেট পত্রিকায় কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার অন্যতম সদস্য, তাঁর লেখা বই 'প্রাকৃত', 'তত্ত্ববিষয়ক', 'জ্ঞানাঙ্কুর' প্রভৃতি। ১৯৪৩ সালের ভয়ঙ্কর দিনটিতে তিনিও গ্রামছাড়া হন এবং নদীয়া জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে আশ্রয় নেন। বর্তমানে তিনি মৃত তাঁর চার পুত্র অতীশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, তারাপদ, কৃষ্ণচন্দ্র আজও জীবিত আছেন। বর্তমান বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলগুলির পাশেই ছিল তাঁর বসতভিটে।

সম্পন্ন কৃষক পাঁচুগোপাল পাল চাঁদমারী গ্রামে বাস করতেন, তাঁর বয়স এখন প্রায় নব্বই। তাঁর ভাই কালীপদ পাল কাঁচরাপাড়ার বাগমোড়ে থাকতেন, বর্তমানে তাঁরা দুজনেই মৃত।

ঘোষপাড়া গ্রামের জমিদার কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আদি নেতা রামশরণ পালের বংশধর সত্যচরণ পালের পুত্র গোপালকৃষ্ণ পাল বর্তমান জন্মভিটায় থাকেন না, তাদের জমিতে প্রচুর আম এবং লিচুর ফলন হতো। এখনও সেই জমির লিচু চড়া দামে বিকোয়। বাগানটি অযত্নে প্রায় শেষ হতে বসেছে।

কেউটিয়া গ্রামের জমিদার সতীশ চন্দ্র নন্দী অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তখন বারোয়ারী পূজার চল না থাকায় জমিদার বাড়ির পূজাগুলিই গ্রামের মানুষের উৎসবের স্থলে পরিণত হত। প্রতেকে জমিদার বাড়ির পূজাতেই বসত যাত্রাপালার আসর। নাচমহলে নাচগানের আসর বসত। অনাবিল আনন্দে গ্রামবাসীরা কয়েকটা দিন কাটাতেন। অনেক গ্রামবাসী আন্তরিকভাবে নানা কাজে অংশ গ্রহণ করতেন।

নবনির্মিত রুজভেল্ট নগর ঃ রাতারাতি গড়ে ওঠা সাহেব সৈন্যদের জন্য তৈরি হল বিশাল সৈন্যাবাস। সামরিক বাহিনীর গাড়ি চলাচলের জন্য তৈরি হল অসংখ্য চওড়া কংক্রিটের রাস্তা, গাড়ি পার্ক করার জন্য সিমেন্টের চত্ত্বর। সামরিক বাড়ি ও যুদ্ধাস্ত্র রাখার জন্য বিশালাকার নানা ঘর। সৈন্যদের কুচকাওয়াজের জন্য গড়ে উঠলো কয়েকখানি 'চাঁদমারী'। তৈরি হয়েছিল বড় বড় জলের ট্যাঙ্ক, বহু স্নানাগার, বিমানক্ষেত্র। বিমানক্ষেত্রটি তৈরি হয়েছিল উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কাঁপা ও ধরমপুর মৌজার উপর। সৈনিকদের রসদ পৌঁছে দেওয়ার জন্য কল্যাণী স্টেশন থেকে (তখনকার চাঁদমারী স্টেশন)। গঙ্গার তার পর্যন্ত একটি লাইনপাতা হয়েছিল। তখন গঙ্গার স্রোত প্রবল থাকায় রসদ জাহাজে করে এনে ঐ লাইনের সাহায্যে রুজভেল্ট সিটিতে এসে পৌঁছত। বর্তমান কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডিস হোস্টেলের দক্ষিণে ও কল্যাণী ঘোষপাড়া স্টেশনের পূর্বে দুটি প্ল্যাটফর্ম ছিল তাতে সামরিক বাহিনীর মালপত্র উঠানো নামানো হত। ঐ লাইনটিকে সংস্কার করে বর্তমানে কল্যাণী শহরের অভ্যন্তরে ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামরিক হাসপাতালটি আজ পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা পুনর্নির্মিত হয়ে নেতাজী সুভাষ স্যানিটোরিয়ামে পরিণত হয়েছে। কাঁপা সামরিক বিমানক্ষেত্রটি বর্তমানে ভারতের সামরিক বিমানক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

রুজভেল্ট শহরের আশেপাশে যেসব গ্রাম অক্ষত ছিল সেই গ্রামের মানুষগুলি প্রতিদিনই আতঙ্কের সঙ্গে দিনযাপন করতেন। বারে বারে বিপদ সংকেত বাজলেই তাঁদের ট্রেঞ্চের মধে ঢুকে যেতে হতো। প্রত্যেক বাড়িতেই তখন আত্মরক্ষার জন্য গর্ত খুঁড়ে রাখতে হতো। রাত্রে সাইরেন বাজলে তাঁরা আলা নিভিয়ে অন্ধকার ঘরে রাত কাটাতেন। গোলাগুলির শব্দ তাঁদের গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। শত্রুপক্ষের বিমান দেখলেই বিমান বিধ্বংসী কামানগুলো একসঙ্গে গর্জে উঠতো। ঝাঁকে ঝাঁকে কামান ও মেশিনগানের গোলা আকাশে ছুটে যেত। কান ফাঁটানো আওয়াজে কানে তালা লেগে যেতো। এক অত্যাধুনিক শহরের মত গড়ে ওঠা রুজভেল্ট সিটির স্থায়িত্বকাল ছিল তিন বৎসর।

পরিত্যক্ত রুজভেল্ট নগর ঃ ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হতেই যে তৎপরতার সঙ্গে নগর বসানো হয়েছিল অনুরূপভাবেই তা ভাঙার কাজ শুরু হয়ে যায়। ১৯৪৬ সালের মধ্যেই সকল মার্কিন সৈন্য স্বদেশে ফিরে যায়। যাওয়ার সময় তারা অতি প্রয়োজনীয়

জিনিসছাড়া সবই ফেলে দিয়ে বা ধ্বংস করে দেয়। সেই ধ্বংসস্তুপের তলায় চাপা পিতল, তামার টুকরো সংগ্রহ করতে হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে। অনেকেই নাফাটা গোলার সেই মুহূর্তের বিস্ফোরণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, এছাড়া মার্কিন সৈন্যদের ফেলে যাওয়া মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী নানা ধরণের যন্ত্রপাতি, মোটর সাইকেল, করোগেটেড টিন, লোহার রেলিং, জীপগাড়ি প্রভৃতি লুটে নেওয়া হয়। পরিত্যক্ত মূল্যবান দ্রব্যাদি বিক্রয় করে অনেকে ধনী হয়ে যান, অনেকে সম্পদ বৃদ্ধির জন্য রেখে দেন। কিন্তু সামরিক ঘাঁটির তলায় কোথায় মারণাস্ত্র পোঁতা আছে তার হদিস ছিল না। মাটি খুঁড়লে হয়তো এখন পাওয়া যাবে বারুদের গন্ধ। ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা পাওয়ার পরে রুজভেল্ট নগরীর সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব ভারত সরকার গ্রহণ করেন এবং তা প্রতিরক্ষা দপ্তরের হাতে ন্যস্ত হয়।

ঘোষপাড়া রোডে পাশে লম্বা যে দুটি হলঘর বর্তমানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর কর্মচারীদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তাকে বোমার ঘর বলা হত। এরূপ বোমার ঘর গয়েশপুর কুলিয়াতেও আছে। বর্তমানে এটিকে বোমার মাঠ বলে। ১৯৭১-৭২ সালে ঐ স্থানে একটি বোমা পাওয়ার পর শহরের সর্বত্র চাঞ্চল্য দেখা দেয়। বোম স্কোয়ডের অফিসাররা পরীক্ষা করে ফাটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। বোমাটি ফাটার সময় সমস্ত কল্যাণী অঞ্চল কেঁপে ওঠে এবং বোমার উপর রাখা বালির বস্তাগুলির কোন হদিস পাওয়া যায়নি। আশে পাশে বাড়ির একটাও জানালা আস্ত থাকেনি এবং ঐ স্থানে এক বিশালাকায় গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। আজও সেই গর্ত বর্তমান যে চাঁদমারীতে মার্কিন সৈন্যরা গুলি ছোঁড়া অভ্যাস করছেন। কুকুরদের জন্য স্নানাগার, বাসগৃহ, মোটর গ্যারেজ ইত্যাদি চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আছে শুধু ইতস্তত চওড়া কংক্রিটের রাস্তা যার উপর নতুন করে পীচ দিয়ে কল্যাণীর অধিকাংশ রাস্তা নির্মিত হয়েছে। ট্রাক্টর গ্যারেজটিও আজও রয়েছে কল্যাণী নোটিফায়েডের সম্মুখে। এখানেই কিছু নিদর্শন বর্তমান থাকলেও বেশীর ভাগই ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

অবশেষে ১৯৪৯ সালে রুজভেল্ট নগরীর সমস্ত সম্পত্তি ভারত সরকারের থেকে গ্রহণ করে বিধানচন্দ্র রায় কল্যাণী নগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং ১৯৫০ সালে পরিকল্পনা গৃহীত হয়। গড়ে ওঠে শিল্পনগরী তথা বিধান রায়ের 'মানস কন্যা কল্যাণী'।

উচ্ছেদ হওয়া মানুষের স্বার্থে নদীয়া জেলার কৃষক আন্দোলন ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনের উপর এবং তখনকার দিনের কংগ্রেসের ভিতর বামপন্থীদের উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের প্রচণ্ড দমননীতি জারি করা হয়। বিনা বিচারে আটক ভারত রক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হত। গণ আন্দোলনের সভা-সমাবেশ এবং সংগঠন বে-আইনি ঘোষণা করা সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের স্বাভাবিক নীতি দাঁড়িয়ে

গেছিল। সারা ভারত কৃষকসভা, বঙ্গীয় কৃষকসভার আন্দোলন ও সংগঠনের কর্মীদের উপর নির্মম দমননীতি নেমে আসে। যাই হোক, কৃষক আন্দোলনের অন্যান্য কর্মসূচীর কথায় না গিয়ে নদীয়া জেলায় কল্যাণী অঞ্চলে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণে ব্রিটিশ শাসকদের জমি দখল শুরু হয়। কৃষ্ণনগর কোতোয়ালী থানার ধুবুলিয়া অঞ্চলে এবং চাকদহ ও রাণাঘাটের বিস্তীর্ণ এলাকায় গ্রামগুলিতে জমি দখল শুরু হয়ে যায়। কার্যত বেআইনি অবস্থার মধ্য দিয়ে নদীয়া জেলা কৃষক সমিতি কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় গ্রামগুলিতে জমি দখল শুরু হয়ে যায়। কার্যত বেআইনি অবস্থার মধ্য দিয়ে নদীয় জেলা কৃষক সমিতি কৃষকদের স্বার্থরক্ষা যেমন দ্রুত জমির ক্ষতিপূরণ, বিকল্প পুনর্বাসন গাছ গাছালির নায্য ক্ষতিপূরণের দাবি নিয়ে ভারতরক্ষা আইনের কঠিন নাগপাশ উপেক্ষা করে আন্দোলনকে জোরদার করে তোলেন। ন্যায্য ক্ষতিপূরণের দাবিতে সেদিনকার কল্যাণী এলাকার কিছু বিশিষ্ট নাগরিক ও কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সত্যশিব পাল (বর্তমানে তিনি জীবিত নেই) অনশন করেছিলেন।

নদীয়া জেলা কৃষক সমিতির সভাপতি কমরেড সুশীল চ্যাটার্জী কল্যাণী অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য কমঃ অমৃতেন্দু মুখার্জী ও কমঃ সমরেন্দ্র মুন্সীকে (বর্তমানে দুজনেই প্রয়াত) দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। কাঁচরাপাড়ার কৃষক সমিতির নেতা কুঞ্জ বসু, বড় জাগুলির কমঃ অশোক বসু (তাঁর নামে তখন তেভাগা আন্দোলনের জন্য গ্রেফতারীর পরোয়ানা ছিল) বে-আইনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও আইনজীবী কমঃ দেবীভূষণ ভট্টাচার্য (প্রয়াত) উচ্ছেদ হওয়া কয়েক হাজার কৃষকের পক্ষে মামলা করেন।

উচ্ছেদ হওয়া গ্রামবাসীরা বিভিন্ন এলাকায় চলে গেলেও (বিশেষ করে গঙ্গার ওপারে হুগলীতে চলে যায়) কমঃ দেবীবাবুর কাছে পুরানো নথিপত্র থাকায় তিনি কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিয়েছিলেন।

গ্রাম কাঁচরাপাড়া অঞ্চলের ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি কুঞ্জ বসু, সমরেন্দ্র মুন্সী ও অন্যান্য গ্রামবাসীদের কত একর জমি সামরিক প্রতিরক্ষার জন্য দখল হয়েছিল, তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তৈরি করেছিলেন। এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সেদিনই নদীয়া জেলার অন্য রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের এই দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের পাশে দেখা যায়নি। কিন্তু সেদিন সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করে নদীয়া জেলার কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ সরকারী দমননীতি অমান্য করে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তখন অনুমতি নিয়ে সভা করলেও হঠাৎই সভার উপর আক্রমণ হতো, জেলে নিয়ে যেত। ভারত রক্ষা আইনে কমরেড সুশীল চ্যাটার্জী, কমরেড ননী রায়, কমরেড কানাই কুণ্ডু, কমরেড সন্তোষ পাল জেলে যান। নদীয়া জেলায় থাকাকালীন কমঃ মুজফফর আহমেদকে নদীয়া থেকে বর্ধমানে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নেন মৎস্যজীবী আন্দোলনের নেতাদ্বয় কমঃ কানাই কুণ্ডু, কমঃ মুরারী মোহন গোস্বামী (দুজনেই প্রয়াত)। কমঃ মুজফফর আহমেদকে সকলে কোট পরা অবস্থায়

দেখেছে, তাই তাকে ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়ে পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে নৌকায় করে দাদপুর থেকে বর্ধমানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখনকার ঐ নির্ভীক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম এক উজ্জ্বল পথের দিশারী হয়ে থাকবে।

যুদ্ধশেষে সামরিক ঘাঁটির উপরে এদেশের স্বাধীন সরকার 'কল্যাণী' শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলেন। কিন্তু সব হারানো মানুষগুলির মর্মবেদনা আজও গুমরে ওঠে। যাঁরা অনেক দুঃখ কষ্ট বুকে নিয়ে পৃথিবী ছেড়েছেন — তাঁদের পুত্র-পৌত্রগণের মনোবেদনা আজও শোনা যায়। কল্যাণীর একাল ও সেকাল গ্রন্থের লেখক ও জীবিত ব্যক্তিদের একই বক্তব্য শুনতে পেলাম যে - "স্বাধীন ভারত সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেভাবে পূর্ববাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন এই 'রুজভেল্ট নগরে' সেভাবে আমাদের অর্থাৎ ১৯৪৩ সালে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া ৪৫টা গ্রামের উদ্বাস্তুদের কল্যাণী শহরের কোন স্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারতেন, কিন্তু তা হয়নি। আমরা কেউ নিঃস্ব, রিক্ত, কেউ দিনমজুর, কেউ শ্রমিক, আমাদের ক্ষোভের কথা দাবির কথা কেউ কি সরকারের কাছে পৌঁছে দেবেনা'! আমরা কেউ এখন আর্থিক সাহায্য চাইনা, ক্ষতিপূরণও চাইনা — শুধু চাই আমাদের জমির উপরে গড়ে ওঠা কল্যাণী শিল্পশহরে একজন করে সন্তানের চাকরির সুযোগ করে দেওয়া"।

সূত্রনির্দেশ

১। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ ঃ

২। নিতাই ঘোষ, *কল্যাণীর সেকাল ও একাল*, প্রকাশক ডঃ অসিত গুহ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া।

৩। শ্রী পূর্ণচন্দ্র বণিক, শিক্ষাকর্মী, কল্যাণী পৌরসভা।

৪। ডঃ শান্তনু ঝাঁ, পৌরপ্রধান, কল্যাণী পৌরসভা।

৫। শ্রী বাসুদেব মারিক, অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার।

৬। শ্রী শৈলেন তরফদার, মদনপুর, নদীয়া।

৭। তথ্যবিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

৮। *পশ্চিমবঙ্গ*, নদীয়া জেলা সংখ্যা - ১৪০৪।

৯। শ্রী মণি ভট্টাচার্য, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা।

১০। শ্রী অঞ্জন দাস, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা।

১১। শ্রী জগদীশ চন্দ্র মোদক।

১২। কয়েকটি প্রামাণ্য চিত্র।

দেশবিভাগত্তোর পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের পুনর্গঠন জনিত সমস্যা — একটি সমীক্ষা

রত্না পাল

বর্তমান নিবন্ধে দেশবিভাগত্তোর উত্তরবঙ্গের পুনর্গঠন জনিত সমস্যার বিষয়ে আলোকপাত করাই মুখ্যতম উদ্দেশ্য। এই বিষয়ে এখনো পর্যন্ত ইংরেজী ও বাংলাভাষায় গবেষণাস্তরে কোন অনুপঙ্খ লেখা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাই এই বিষয়টি সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছি এখানে।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা জানিয়ে রাখি যে সেদিনের পুনর্গঠনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে যোগাযোগ ব্যবস্থার ও অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটলেও নৃগোষ্ঠীগত ও ভাষাগত ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার বীজ রোপিত হয়েছিল অবচেতন ভাবে। আজকে এই অঞ্চলে যে রাজনৈতিক, সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে তার সিংহভাগই উত্তরবঙ্গের পুনর্গঠনের ফলে যে সংযোজিত অংশ এসেছিল সেখানেই বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এই আলোকে বিষয়টি সম্পর্কে গবেষক মহলে কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্যই এই লেখাতে হাত দিচ্ছি।

আমরা যে বিষয়ের প্রতি গবেষক ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি সে বিষয়টি হল বাউন্ডারী কমিশন-এর সভাপতি স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ-এর সুপারিশ। কারণ তার সুপারিশের ভিত্তিতেই বঙ্গ বিভাজনের রূপরেখা প্রস্তুত হয়েছিল। র‍্যাডক্লিফের সুপারিশের সঙ্গে কমিশনের অপর সদস্য চারুচন্দ্র বিশ্বাস, বিজন মুখোপাধ্যায়, আবু সালেহ রহমান ও মহম্মদ আক্রম কখনো ঐক্যমত্য পোষণ করতে পারেননি। স্বভাবতই র‍্যাডক্লিফ সাহেবকে এককভাবেই সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে এবং সরকার তাকে সেরূপ অধিকারও দিয়েছিল।

প্রথমে আমরা ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের দিনের পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মানসিক অস্থিরতার ছবি পর্যবেক্ষণ করতে পারি। কারণ র‍্যাডক্লিফ এর সুপারিশ ঘোষিত হয়েছিল দুদিন পর অর্থাৎ ১৭ই আগস্ট। অর্থাৎ দেশ স্বাধীনতা পাওয়ার আনন্দ উপভোগ করার সাথে সাথে ভবিষ্যৎ ভাগ্য কি হবে তা জানার জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে দুটো দিন। ১৫ই আগস্টের দিনে সারাদেশ যখন স্বাধীনতার আনন্দ উৎসবে মাতোয়ারা তখন দিনাজপুর, মালদহ, জলপাইগুড়িবাসীর জীবনে নেমে

এসেছে ঘোর অনিশ্চয়তা। দিনাজপুরের বালুরঘাটে মহকুমা শাসক পানাউল্লা পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন করেন। পাকিস্তানি সেনা এসে হাজির হয় বালুরঘাট হাইস্কুলে। জয়েন্ট কনস্টিটুয়েন্সীর প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য জিল্লুর রহমান ও মোজা চৌধুরী দুজনেই বালুরঘাটকে পাকিস্তানে রেখে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান।[১] সুতরাং ১৫ই আগস্ট বালুরঘাটের ভাগ্য ছিল দোদুল্যমান ও শহর জুড়ে ছিল চাপা উত্তেজনা। কালিয়াগঞ্জ থানা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে এই আনন্দে সেখানে ১৪ই আগস্টের দিনেই মুসলীম লীগের পক্ষ থেকে মিছিল বের করা হয়। কালিয়াগঞ্জ রেল স্টেশনে পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলিত হয়।[২] যদিও মালদহের আপামর জনসাধারণ মালদহ খণ্ডিত হওয়ার বিপক্ষে ছিল তবুও যেদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় সেদিন মুসলীম লীগ মালদহে পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন করে।[৩] জলপাইগুড়ির সর্বত্র ১৫ই আগস্টের দিন গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে সমগ্র জলপাইগুড়ি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই নিয়ে শুরু হয় জল্পনা কল্পনা। কারণ জলপাইগুড়ির নবাব মোশারফ হোসেন ছিলেন সুরাবর্দী মন্ত্রীসভার সদস্য ও অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি যে জলপাইগুড়িকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে মত দেবেন সে বিষয়ে জলপাইগুড়ির অধিবাসীদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না।[৪]

এরপর ১৭ই আসস্ট র‍্যাডক্লিফ এর সুপারিশ অনুযায়ী মূলত ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান উভয় দেশের সীমানা নির্ধারিত হল। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের কোন জেলা রইল অখণ্ডিত, কোন জেলাকে আবার দ্বিখণ্ডিত করা হল। দার্জিলিং জেলায় যেহেতু কোন একক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা ছিল না তাই সমগ্র দার্জিলিং জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হল।[৫] র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারায় জলপাইগুড়ির দক্ষিণের পাঁচটি মুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত থানা - তেঁতুলিয়া, পচাগড়, বোদা, দেবীগঞ্জ এবং পটিগ্রামকে অর্থাৎ মোট ৬৭২ বর্গমাইল এলাকাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়। জলপাইগুড়ির বাকি অংশকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৬] মালদা জেলার ক্ষেত্রে দক্ষিণের পাঁচটি মুসলিম প্রধান থানাকে পূর্ব পাকিস্তানের ও উত্তরের বাকি দশটি থানা - ইংরেজবাজার, কালিয়াচক, মালদা, হবিবপুর, রতুয়া, মানিকচক, খড়বা, হরিশচন্দ্রপুর, গাজোল ও বামনগোলাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৭] র‍্যাডক্লিফ কমিশন দিনাজপুর জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করে ২/৩ অংশকে দিনাজপুর নামে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করেন, বাকি ১/৩ অংশ নিয়ে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গঠিত হয়, যাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ১/৩ অংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ১০টি থানা - বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর, তপন, রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, বংশীহারী, কুশুমন্ডি, কালিয়াগঞ্জ ও ইটাহার।[৮]

জলপাইগুড়ির তেঁতুলিয়া ছিল জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার সঙ্গে দিনাজপুর জেলার প্রত্যক্ষ যোগাযোগকারী থানা। তেঁতুলিয়া পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ প্রকৃতপক্ষে তিনটি অংশে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। গঙ্গার ওপারে পশ্চিমবঙ্গ, এপারে

মালদা দিনাজপুর নিয়ে একটি অংশ। এই অংশের সঙ্গে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং-এর কোন যোগ ছিলনা এবং কোচবিহার ছিল দেশীয় রাজ্য। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ করতে হত বিহারের মধ্যে দিয়ে। অন্যদিকে তেঁতুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হলে জলপাইগুড়ি দার্জিলিং এর সঙ্গে মালদা, দিনাজপুর ও দক্ষিণবঙ্গের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকত। এইভাবে স্বাধীনতার পর ত্রিধাবিভক্ত উত্তরবঙ্গের উৎপত্তি হল। র‍্যাডক্লিফ কমিশন এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি কেন বিচার বিবেচনা করেননি সেটা ভাবতেই অবাক লাগে। আসলে সম্যক ভৌগলিক জ্ঞানের অভাব, সময়ের অপ্রতুলতা, কমিশনের সদস্যদের মধ্যে মতের অমিল প্রভৃতি কারণে র‍্যাডক্লিফের পক্ষে ত্রুটিমুক্ত ভৌগলিক সীমারেখা টানা সম্ভব হয়নি।

দেশীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ কি হবে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয় স্বাধীনতার পরে। কোচবিহার দেশীয় রাজ্যের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দেবেন বলে রাজি হয়েছিলেন যদিও তিনি Instrument of Accession এ স্বাক্ষর দিয়েছিলেন দুবছর পর অর্থাৎ ১৯৪৯এ।[৯]

পশ্চিমবঙ্গের সহিত কোচবিহারের সংযুক্তিকরণের বড় বিরোধী ছিল হিতসাধনী সভা নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন।[১০] এই সংগঠনের সদস্যরাই ছিলেন আবার স্টেট কাউন্সিল-এর সদস্য। হিতসাধনী দলের মুসলিম সদস্যরা কোচবিহারকে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। মুসলিম লীগপন্থী রাজস্বমন্ত্রী খান চৌধুরী আমানতউল্লা ও শিক্ষামন্ত্রী সতীশ সিং রায় মেখলিগঞ্জে এক জনসভায় বলেছিলেন যে, কোচবিহার রাজ্যকে ভারতীয় ইউনিয়নের বাইরে রাখতে হবে এবং কোচবিহার স্টেট কংগ্রেসকে ধ্বংস করতে হবে।[১১] এমনকি কোচবিহার সরকার ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালনের ক্ষেত্রেও বাধা দিয়েছিল। সবচেয়ে আর্শ্চযের বিষয় যে মহারাজা তাঁর মন্ত্রীদের এরূপ ভারতবিরোধী কার্যকলাপ দেখেও উদাসীন থাকেন।

কোচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরে এইরূপ ভারত বিরোধী কার্যকলাপের সর্বপ্রথম বিরোধিতা করে কোচবিহার প্রজামন্ডল। তারা ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে জানায় যে মহারাজা স্বয়ং বঙ্গদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কোচবিহারকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে মত দিয়েছেন।[১২] এরপর কোচবিহার পিপলস্ এসোসিয়েশন, স্টেট কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক - সকলেই দাবি করে যে কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই সমস্যার সমাধান করতে ব্যক্তিগতভাবে এগিয়ে আসেন শরৎচন্দ্র বসু, প্রফুল্ল ঘোষ, বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখেরা।

দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকার কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের সহিত সংযুক্তিকরণের কথা ঘোষণা করেন ও ১৯৫০ এর ১লা জানুয়ারী থেকে কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা হিসাবে পরিগণিত হয়।[১৩] অর্থাৎ

কোচবিহারবাসীর ভাগ্য নির্ধারিত হয় স্বাধীনতা লাভের প্রায় তিন বৎসর পর।

কোচবিহার দেশীয় রাজ্যের পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তিকরণের ফলে উত্তরবঙ্গের সীমানা সম্প্রসারিত হল। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় কোচবিহারের সংযুক্তির কথা শুনে সর্দার প্যাটেলকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন " .... আমি এই সঙ্গে তোমাকে এবং মন্ত্রীসভার সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই। তোমরা শেষ পর্যন্ত ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করতে রাজি হয়েছো বলে। যার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেটা শুধু এই প্রদেশের পরিবৃদ্ধিই নয়, এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক সংগঠনও বটে।"[১৪]

কোচবিহারের সংযুক্তিকরণ পশ্চিমবঙ্গের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরণের পদক্ষেপ বললে অত্যুক্তি হবে না। তবে পুনর্গঠনের ফলে এই অঞ্চলে কি সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তা আমি পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করব।

কোচবিহার দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তিকরণ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের এই অংশের পুনর্গঠনের কাজ সমাপ্ত হল না। পঞ্চাশের দশকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য আন্দোলন শুরু হল। এই আন্দোলনকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৩ সালে গঠন করলেন রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন। এই কমিশনের কাছে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে এই রাজ্য সংলগ্ন বিহারের বাংলাভাষী কিছু অঞ্চল দাবি করা হয়েছিল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেছিলেন "বিহারের কিছু বাংলা ভাষা ভাষী অঞ্চল বাংলার মধ্যে আসা দরকার। .... জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ মালদা এলাকার সংযোগ সাধনের জন্য বিহারের সন্নিহিত অঞ্চল থেকে কিছুটা পাওয়া দরকার।"[১৫] সবচেয়ে সমস্যা ছিল পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ক্ষেত্রে। কারণ এই জেলার সাথে উত্তরে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার যোগাযোগ ছিল বিহারের মাধ্যমে। অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের সহিত দক্ষিণ বঙ্গের যোগাযোগের জন্য পশ্চিম দিনাজপুর জেলার মধ্যে দিয়ে একটি করিডরের প্রয়োজন ছিল। এই জন্য বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রস্তাব ওঠে। এই জেলার অন্তর্গত কিষানগঞ্জ মহকুমা ছিল দার্জিলিং জেলার সঙ্গে যুক্ত। এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী পুনর্গঠন কমিশনের কাছে দাবি জানায়। খন্ডিত পশ্চিমবঙ্গকে সংযুক্তিকরণের প্রয়াসে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে ১৯৫৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর মাননীয় উপেন্দ্রনাথ বর্মন পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখেন যে, কিষানগঞ্জের যে অঞ্চল পশ্চিমবাংলার সংলগ্ন তা সেখানে সংযুক্ত হলে সেখানকার মুসলিমরা বাংলার মুসলিমদের সাথে একত্রিত হবে।[১৬] এরা যদি উর্দুও শিখতে চায় তাতে কোন বাধার সৃষ্টি হবে না। সরকার তাদের অনুরোধ রক্ষা করবে।[১৭] কিন্তু বিহারের এই অংশের উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী ছিল হস্তান্তরকরণের বিপক্ষে। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ তাদের

হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার কাছে কিষানগঞ্জের পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কিষানগঞ্জের অধিকাংশ অধিবাসীই বিহারে থাকতে চান, পশ্চিমবঙ্গে যেতে চান না। সংখ্যাগুরুর অভিমত মেনে ঐ অঞ্চলটি বিহারেই থাকা উচিৎ।[১৮] আজাদের যুক্তি মন্ত্রীসভা মেনে নিয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী কমিশন এই অঞ্চলে শুধুমাত্র পূর্ণিয়া জেলার কিষানগঞ্জ মহকুমার সামান্য অংশ বাংলার সাথে যুক্ত করার সুপারিশ করে।

অবশেষে ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে বিহার বেঙ্গল টান্সফার্ড টেরিটরী আইন অনুযায়ী চোপড়া, করণদিঘী, গোয়ালপুকুর ও ইসলামপুর এই চারটি থানাকে ১লা নভেম্বর প্রথমে দার্জিলিং জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয় ও ২রা নভেম্বর তা পরিবর্তন করে করে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১৯] উল্লেখ্য যে ইসলামপুরকে মহকুমা হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ উত্তরবঙ্গবাসীর মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার করল। কারণ উত্তরবঙ্গের সহিত দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগের জন্য সমগ্র কিষানগঞ্জ মহকুমার পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রয়োজন ছিল। ভারতবর্ষে একমাত্র সিকিম ছাড়া অপর কোন রাজ্যে এরূপ দেখা যায় না যে, রাজ্যের এক অংশের সহিত অন্য অংশের যোগাযোগ রক্ষা করতে হয় ভিন্ন রাজ্যের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গেও দেখা গেল যে উত্তরবঙ্গের সহিত দক্ষিণবঙ্গের সংযোগ রক্ষা করে চলেছে বিহার রাজ্য।

পশ্চিমবঙ্গ আশা করেছিল যে দেশবিভাগের ফলে তার ভৌগলিক ক্ষতির অন্তত আংশিক ক্ষতিপূরণ হবে রাজ্য পুনর্গঠনের সময়। সে আশা কমিশনের রিপোর্টেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আসলে কমিশন পশ্চিমবঙ্গকে যেটুকু দেওয়ার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার হস্তক্ষেপে তারও কাটছাঁট হয়ে যায়।

১৯৫৬ সালের পর পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ বা তথাকথিত উত্তরবঙ্গ বর্তমান রূপ নিল। কিছু নতুন অঞ্চল সংযোজিত হওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্প্রসারিত হল। কিন্তু দেখা গেল যে, যে সব এলাকার সংযুক্তিকরণ ঘটছে সেই সব এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে মনস্তাত্বিক সংকট দেখা দিচ্ছে। যেমন, পুনর্গঠনের পর কোচবিহার ও পশ্চিম দিনাজপুর হয়ে গেল প্রান্তিয় জেলা, যাদের সীমান্ত হিসাবে রইল যথাক্রমে আসাম ও বিহার। এই দুটি জায়গায় যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংহতিকরণের দরকার ছিল তা হল না। ভাষা, ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি সকল ক্ষেত্রে নানা রকম সংকট ঘনীভূত হতে লাগল। সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অভাবে এই অঞ্চলগুলিতে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা গড়ে উঠতে পারেনি। সামাজিক অস্থিরতা থেকে ক্রমে অঙ্কুরিত হয়েছে রাজনৈতিক আন্দোলনের বীজ।

কোচবিহার কয়েক শতাব্দীকাল দেশীয় রাজ্যের শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত থাকায় এখানকার প্রজা তথা নাগরিকদের মধ্যে এক বিশেষ ধরণের মনস্তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল। এখানকার অধিবাসীরা পশ্চিমবঙ্গের সহিত সংযুক্তিকরণ কোন ভাবেই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টির সাময়িক সমাধান হলেও আজকের যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে বিশেষ ভাবে প্রকটিত তার অনেকটাই এই দেশীয় রাজ্যের সংযুক্তিকরণের ফলে উদ্ভব হয়েছে। কারণ দেশীয় রাজ্যের অধিবাসী হওয়ায় প্রজা তথা নাগরিকরা শিক্ষা, চিকিৎসা, চাকুরী প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি সুবিধা ভোগ করে এসেছিলেন। তাই রাজতন্ত্রের নেতিবাচক দিকটিকে এরা গৌণভাবে দেখে রাজতন্ত্রের সুযোগ সুবিধাগুলো স্মরণ করে ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

অন্যদিকে বিহারের কিষানগঞ্জের যে অংশটি পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইসলামপুর মহকুমা নাম গ্রহণ করে সেখানে ভূমি সংস্কার, ভাষা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। বিহারের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার অনেক বৈসাদৃশ্য ছিল। ফলে পশ্চিমবঙ্গে ভূমি আন্দোলনের যে ঐতিহ্য রয়েছে তা এই বিহার থেকে আসা 'নতুন বাংলা'য় ছিল না। স্বাভাবিক ভাবেই এই অঞ্চলে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়। ভাষার ক্ষেত্রে ঐ অঞ্চলে হিন্দী, উর্দু, বাংলা, সূর্যাপুরী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার প্রচলন থাকায় সকল ভাষাকে সমমর্যাদা দেওয়ার দাবি উঠতে থাকে। এছাড়া প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী ও বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা উদ্বাস্তুদের ভীড়ে এই অঞ্চলের জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটতে থাকে ও গ্রামীন জনসাধারণ ক্রমশ সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। তাদের মনে একজাতের বিচ্ছিন্নতাবোধ ধীরে ধীরে জন্ম নিতে শুরু করে।

পরিশেষে বলতে পারি যে পুনর্গঠনের পর ত্রিধাবিভক্ত উত্তরবঙ্গের সংযুক্তিকরণ ঘটল। সংহত ভৌগলিক ঐক্য নিয়ে উত্তরবঙ্গের উৎপত্তি হল। কিন্তু বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সীমানা সংক্রান্ত ব্যাপারে ও জলপাইগুড়ি কোচবিহারের ছিটমহল সমস্যার কোন সমাধান হল না। র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারায় বেরুবাড়িকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও সীমানা নিধার্রণের সময় তা ভারতে থেকে যায়। ১৯৫৮ খ্রিঃ দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু ও ফিরোজ খাঁ নুন ঘোষণা করেন যে বেরুবাড়ির অর্ধাংশ পাকিস্তানকে দেওয়া হবে।[২০] কিন্তু এর বিরুদ্ধে বেরুবাড়ি অঞ্চলে প্রবল গণবিক্ষোভ শুরু হয়। সুপ্রীমকোর্ট বেরুবাড়িকে ভারতীয় অঞ্চল বলে রায় দেয়।. এরপর ১৯৭৪ সালে ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীদ্বয় ইন্দিরা গান্ধী ও মুজিবর রহমান-এর মধ্যে চুক্তি হয় যে বেরুবাড়ির পরিবর্তে তিনবিঘা অঞ্চলটিকে বাংলাদেশকে ভারত ৯৯৯ বছরের জন্য লীজ দেবে।[২১] ফলে এই অঞ্চলের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন ও এই অঞ্চলে একটা সংকটের সৃষ্টি হয়। সুতরাং ছিটমহলগুলি বিনিময়ের যে প্রস্তাব উঠেছিল সেই সমস্যা সমাধান আজ অবধি হল না। ছিটমহল সমস্যা উত্তরবঙ্গের পুনর্গঠনের পক্ষে

একটা বিশাল প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়টি বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও যেহেতু অঞ্চলটি উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি সংশ্লিষ্ট তাই এই প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের পুনর্গঠনের সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যেতে পারে যে এই ধরণের সমস্যা পশ্চিমবঙ্গ শুধু নয় ভারতবর্ষেরও অন্য কোথাও নেই। তাই আজও উত্তরবঙ্গের পুনর্গঠনের কাজ ও তৎজনিত সমস্যার সমাধান হল না।

সূত্রনির্দেশ

১। কর, কালী, "হারানো সেই দিনের কথা এবং বালুরঘাট", *উত্তরাধিকার বালুরঘাট*, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৫০।

২। ধনঞ্জয় রায় সম্পাদিত, *কালিয়াগঞ্জ বার্তা*, পাক্ষিক পত্রিকা, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, ১৫ নভেম্বর, ১৯৮৮।

৩। মুখার্জী, সুধীর কুমার, "মালদহের সংবাদপত্র ও স্বাধীনতা আন্দোলন রূপান্তরের পথে", *শারদীয়া সংখ্যা* ১৯৯৭।

৪। সাক্ষাৎকার, কামাখ্যা প্রসাদ চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি, বয়স ৮৬ বছর।

৫। Chakraborty, Manomohan, "A summary of the changes in the jurisdiction of Districts in Bengal" (1757-1916) Ed. by Kumud Ranjan Biswas, 1999, p-২৮১

৬। Kusari, Abani Mohan et. al., *District Gazetter of Jalpaiguri*, Govt. of West Bengal, 1981, p-66.

৭। Chakraborty, Monomohan, *op.cit.* p-৩৩৬.

৮। *Ibid.* p-২৯০.

৯। Mitra, Ashok, *Census-1951*, District Hand-Book, Coochbehar, 1951, p-1.

১০। ঘোষ, ডঃ আনন্দ গোপাল, "কোচবিহার রাজ্যের ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের পটভূমিকা", গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, *ইতিহাস অনুসন্ধান*-২, ১৯৮৬।

১১। ডঃ চারুচন্দ্র স্যান্যাল সম্পাদিত, 'জনমত' (সাপ্তাহিক পত্রিকা), জলপাইগুড়ি, ৩১শে ভাদ্র, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।

১২। আহমেদ, আব্বাসউদ্দিন, "আমার শিল্পী জীবনের কথা", পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃঃ ১১৯।

১৩। Chakraborty, Manomohan, *op.cit*, p-৩১৯.

১৪। ঘোষ, ডঃ আনন্দগোপাল, "কোচবিহারের রাজনৈতিক আন্দোলন", *মধুপর্ণী* (ত্রৈমাসিক পত্রিকা), কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।

১৫। চক্রবর্তী, সরোজ, *মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে* (সুরাওয়ার্দি থেকে বিধানচন্দ্র পর্যন্ত ঃ ১৯৪৭-১৯৬২), প্রথম খন্ড, জানুয়ারী ১৯৭৭, পৃঃ ১৪৯।

১৬। মনোমোহন রায় সম্পাদিত, *জল্পেশ* (পাক্ষিক পত্রিকা), ৪র্থ বর্ষ, জলপাইগুড়ি, ১৫ই চৈত্র, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ।

১৭। ঐ

১৮। ঘোষ, শংকর, ''জাতীয় রাজনীতির পাশাখেলা'', *'দেশ'*, ১২ই জুলাই, ১৯৯৭, ৬৪ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত, পৃঃ ৪৩।

১৯। Sengupta, Jatindra Chandra, *District Gazetteer of West Dinajpur*, Govt of West Bengal, 1965, p-4.

২০। বসু নির্মল, ''বেরুবাড়ি মামলার ইতিবৃত্ত'', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, কলিকাতা - ১৫০৩, ১৯৬০, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত।

২১। Roy Pradhan, Amar, *Rule of Jungle*, Cooch Behar, 1997

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ এই প্রবন্ধের কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে ও তথ্যাদির বিশ্লেষণে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক অধ্যাপক ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ।

সারাংশ

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতের শিল্পোন্নয়নের ইতিহাস

রাজীব ভট্টাচার্য

পাশ্চাত্যের অর্থ ও মুনাফালোভী বণিক সম্প্রদায়ের ভারতবর্ষে পদার্পণের পূর্বে ভারতীয় শিল্পের বিকাশ তৎকালীন ইওরোপের উন্নত দেশগুলির তুলনায় কোন অংশেই কম ছিল না। ভারতীয় শিল্পকলা ও হস্তশিল্পের উৎকর্ষতা বিদেশে দ্রুত প্রসার লাভ করে। সুতিবস্ত্র শিল্প, রেশমশিল্প, পশম বস্ত্র শিল্প, তাম্র ও অন্যান্য ধাতু শিল্প ছিল প্রধান শিল্পের পর্যায়ভুক্ত। অবিভক্ত বাংলা, পাটনা, বেনারস, আমেদাবাদ, পুনা, মাদুরাই প্রভৃতি স্থান এই শিল্পের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল মুঘল শাসনকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থান। ভারতীয় অর্থ ও সম্পদের *ড্রেন* (Drain)-ই সাহায্য করেছিল ব্রিটিশ শিল্প বিপ্লবে। বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ এবং ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে পরাজয় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পদক্ষেপকে আরো সুদৃঢ় করেছিল। তার পরবর্তীকালে ভারতীয় শিল্প ও অর্থনীতি ছিল ব্রিটিশ অত্যাচার ও নিপীড়নের ফলে শোষিত এক সমাজেরই প্রতিফলন মাত্র। ব্রিটিশ অধিকৃত কলোনী থেকে কাঁচামাল ও অন্যান্য উৎপাদনের উপকরণ স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে কেড়ে নিয়ে তা প্রেরিত হতে থাকে ব্রিটেনে, যা পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শিল্প বিপ্লবে সহায়তা করেছিল। তাই এই *ড্রেনই* ভারতবর্ষকে ঐতিহাসিক কারণে কিছুটা দুর্বল করে দিয়েছিল।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ধারাবাহিকভাবে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে থাকে, যা ভারতীয় অর্থনীতিতে তার গতিপ্রবাহের রূপ দেয় বদলে। স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ 'জীবনধারণের জন্য কৃষি (Subsistence Farming) রূপ দেয় বাণিজ্যিক কৃষিতে (Commercial Farming)। কোম্পানির চাপে পড়ে নীল, পাট, চা, কফি প্রভৃতি নগদ শস্যে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বাজার কেন্দ্রিক ব্যবসায়িক সাফল্যই হয়ে দাঁড়ায় মূল লক্ষ্য।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই ভারতীয় হস্তশিল্প ও গ্রামীণ কুটীর শিল্পের ক্রমাবনতি, এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানত নবাবী শাসনের অবসানের ফলে এই ধরণের উৎকৃষ্ট মানের দ্রব্যাদির সমাদর যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায় এবং যথার্থ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবেই এই শিল্পের দ্রুত ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। এছাড়া, ব্রিটিশ স্টীম ইঞ্জিনের আবিষ্কার এবং উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যায় সৃষ্ট দ্রব্য, ভারতীয় হস্তশিল্পগুলিকে

তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে ফেলে দেয়। তাছাড়াও, ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের উপর অতি উচ্চহারে শুল্ক (৭০ থেকে ৮০ শতাংশ হারে) চাপানো এবং ভারতীয় হস্তশিল্পীদের জোর করে কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে বাধ্য করা ইত্যাদি এই শিল্পে দ্রুত অবনতির জন্য কিছুটা দায়ী।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে পারসিক ব্যবসায়ী নানাভাই দাভার-এর উদ্যোগে বম্বে বস্ত্রশিল্পের সূচনার পর ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে ও দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, সুরাট প্রভৃতি স্থানে বস্ত্রশিল্প কেন্দ্রীভূত হয়। এক কেন্দ্রীভবন ঘটে। একইভাবে, ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রধানত জর্জ অকল্যান্ডের উদ্যোগে বাংলার রিষড়ায় প্রথম পাটশিল্প কেন্দ্র গড়ে ওঠে ও পরবর্তীকালে হুগলি নদীর দুই তীর বরাবর এই শিল্পের কেন্দ্রীভবন ঘটতে দেখা যায়। এছাড়া স্বদেশী কারিগরী কৌশলে গড়ে ওঠা টিটাগড় কাগজ শিল্প (১৮৮২ খ্রিঃ), গুজরাটের দেশলাই কারখানা (১৮৯৫ খ্রিঃ), বিহারের চিনি শিল্প (১৯০৩ খ্রিঃ), মাদ্রাজে সিমেন্ট কারখানা (১৯০৪ খ্রিঃ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯১১ খ্রিঃ জামশেদজী টাটার উদ্যোগে জামশেদপুরে প্রথম আধুনিক লৌহ-ইস্পাত শিল্পটি এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকালে দেশীয় অর্থ ও সম্পদের বহির্গমন ঘটলেও দেশীয় শিল্পে বৈদেশিক মূলধন লগ্নীর পরিমাণ ছিল যথেষ্টই নগণ্য। কিন্তু উনবিংশশতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগের পথ ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকে। ব্রিটেন ইতিমধ্যেই সারা বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালাতে পরিণত হয়েছে। ততদিনে ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবের উজ্জ্বল দিনগুলিরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ঝুঁকিবিহীন ও লাভজনক বিনিয়োগের পথ প্রায় রুদ্ধ হয়েছে। তাই ১৮৫৩-৫৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পুঁজির বিনিয়োগ ঘটতে শুরু করে। অধ্যাপক অমিয় কুমার বাগচির মতে (A.K. Bagchi, *Private Investment in India, 1900-1939*) এই পুঁজি মূলত ব্যবসা বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, বাগিচা (Plantation) প্রভৃতি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই দেখা যায়, যে সমস্ত বেসরকারী সংস্থা উন্নত ও আধুনিক কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ করছে তার সিংহভাগই অধিকার করে রয়েছে বেসরকারী বিদেশী মূলধন।

১৮৮০-৯৫ খ্রিস্টাব্দে যে তিনটি শিল্পের অগ্রগতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় সেগুলি হল সুতিবস্ত্র শিল্প, পাটশিল্প ও বাগিচাশিল্প।

কিন্তু ১৮৯৫-১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কৃষির দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা এবং দুর্ভিক্ষের কারণে ও ভয়ানক প্লেগের প্রকোপে শিল্পের অগ্রগতি স্তিমিত হয়ে যায়। ১৯০৫ খ্রিঃ নাগাদ অর্থনৈতিক মন্দা কিছুটা দূরীভূত হয়। কিন্তু ১৯০৭ খ্রিঃ এই মন্দা আবার ফিরে আসে এবং জাপানী ও ল্যাঙ্কাশায়ারের সুতিবস্ত্র শিল্প, ভারতীয় সুতিবস্ত্র শিল্পকে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে ফেলে দেয়। তাই এর বিদেশী বাজারে রপ্তানির ক্রমসংকোচন ঘটতে থাকে।

১৮৯৫-১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সর্বাধিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয় খনিজ উৎপাদনে। কয়লা শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে পেট্রোলিয়াম ও ম্যাঙ্গানীজ-এর উন্নতিও বিশেষ লক্ষণীয়। তাই ১৮৯৪ খ্রিঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতীয় শিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাচীন, সনাতনী হস্তশিল্পের ক্রমাবনতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা নির্ভর আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার দিকে ধীর গতিতে অগ্রসর।

প্রথম, বিশ্বযুদ্ধ ভারতীয় শিল্পে বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। এই সময় থেকেই ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে গড়ে ওঠা সুতিবস্ত্র শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্বপ্রান্তে গড়ে ওঠা পাটশিল্পে বিনিয়োগকে ছাপিয়ে যায়। যুদ্ধের ফলে বিদেশী প্রতিযোগিতার বাজার বিপর্যস্ত হওয়ায় দেশীয় শিল্পে মুনাফাও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের পূর্বে ইংরেজ সরকারের নীতি ছিল অনেকটা 'Laissez Faire' বা কিছুটা সরকারী ঔদাসীন্য। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয় যুদ্ধোপকরণ বোর্ড (Munition Board) যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সম্পদের ব্যবহার করে ব্রিটিশ প্রয়োজনে যুদ্ধের উপকরণ তৈরি করা। ফলে, ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে ব্যবসায় তীব্র মন্দারভাব দেখা দেয় এবং রেলবিভাগের মুনাফাতেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারতীয় শিল্প দ্রব্যের চাহিদা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পেলেও, তা শিল্পায়নের পথকে মোটেও প্রশস্ত করেনি।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত বিভেদমূলক সংরক্ষণনীতি (Policy of Discriminating Protection) শিল্পায়নের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই নীতি অনুযায়ী কেবলমাত্র সেই সমস্ত শিল্পকেই সংরক্ষণ করা হবে (ক) যাদের কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ যোগানের ক্ষেত্রে একটি প্রাকৃতিক বা সহজাত সুবিধা রয়েছে। (খ) যারা জাতীয় স্বার্থে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সংরক্ষণ ভিন্ন যাদের বিকাশ প্রায় অসম্ভব। (গ) যাদের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতির বিলোপ ঘটলে, প্রতিযোগিতার বাজারে পরবর্তীকালে লড়াই করে টিকে থাকার সক্ষমতা রয়েছে। এই নীতি প্রয়োগ করে প্রথমে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে সংরক্ষণ করা হয় (১৯২৪ খ্রিঃ) এরপর একে একে সুতিবস্ত্র শিল্প, (১৯২৭ খ্রিঃ), দেশলাই শিল্প (১৯২৮ খ্রিঃ), চিনি শিল্প (১৯৩২ খ্রিঃ), রেশম ও টুকরো কাপড় শিল্প (১৯৩৪ খ্রিঃ)। এদের সংরক্ষণ করা হয় মূলত বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত থেকে এদের রক্ষা করতে। কিন্তু বাস্তবে এই নীতির সুফল কতদূর, তা সম্বন্ধে প্রশ্নের অবকাশ রয়েই যায়। তবে এই নীতির ব্যর্থতার পেছনে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা অবশ্যই বিশেষভাবে দায়ী। এর ফলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পছন্দের নীতির (Policy of Imperial Preference) সূত্রপাত ঘটে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ও ব্রিটিশ দ্রব্যের ক্ষেত্রে শুল্কের হারের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি এবং ব্রিটিশ আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের উপর শুল্কের হারের বিশেষ ছাড়ের

ব্যবস্থা। ভারতীয় ব্যবসায়ী সমাজ এই নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং ১৯৩২ খ্রিঃ 'অটোয়া চুক্তি' তারই ফলশ্রুতি। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে যখন এটি পুনর্বিবেচনার জন্য ওঠে, তীব্র প্রতিবাদের ফলে তা শেষ পর্যন্ত বাতিল বলে গণ্য হয়। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় ভারত-ব্রিটেন নতুন চুক্তিপত্র সাক্ষরিত হয়। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তীকালে 'বৃহৎ মন্দা' (Great Depression, 1930) থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পায়ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিদেশী দ্রব্যের যোগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দেশীয় নতুন শিল্পের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পুরানো শিল্পগুলি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে অধিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়। এই সমস্ত নতুন শিল্পগুলিকে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৪০ খ্রিঃ কিছু উদার মনোভাবাপন্ন রাজস্বনীতি গ্রহণ করে এবং প্রয়োজন অনুসারে সদ্য তৈরি শিল্পগুলিকে সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৯৩৯ খ্রিঃ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যৌথমূলধনী কারবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৫১-৫৬ খ্রিঃ) শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে (১৯৫৬-৬১) শিল্পের অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে ভোগ্যপণ্য থেকে মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তর বা অধিকতর গুরুত্ব এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে শিল্পের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। ভারতে প্রথম তিনটি পরিকল্পনাকালে শিল্পের অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা অনেকক্ষেত্রে পূরণ না হলেও, সার্বিক বিকাশ কোনভাবেই অসন্তোষজনক ছিল না। ১৯৬৫-৭৫ সালে শিল্পের অগ্রগতির চাকা হঠাৎই থমকে দাঁড়ায় একে ভারতীয় শিল্পে নিশ্চলতা ও মন্দাবস্থা রূপে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৮০-এর দশকের গোড়া থেকেই এই অচলাবস্থা এবং মন্দারভাব অনেকাংশে দূরীভূত হয় এবং ভারতীয় শিল্প কিছুটা পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এরপর মূলত সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভারতীয় অর্থনীতিতে এক মুক্ত অর্থনীতির সূত্রপাত ঘটে। এই নীতি অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বের কোন দেশের পক্ষেই বিশ্ব অর্থনীতির মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী বিশ্বায়নের পথে হাঁটা খুবই কঠিন বা প্রায় অসম্ভব। তাই শুরু হল বিশ্বায়নের তত্ত্বের প্রয়োগ এবং ১৯৯০-এর গোড়া থেকেই ভারতবর্ষ পুরোপুরিভাবে সারাবিশ্বের সাথে সেতুবন্ধন রচনা করল। শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের পথে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করে মুক্ত বা উদারনীতির সাথে তালে তাল মোলানোই হয়ে দাঁড়াল উন্নতির মূল মন্ত্র।

১৯৯১ সালে ঘোষিত হল নতুন আর্থিক নীতি (New Economic policy) এবং নতুন শিল্পনীতি। আর্থিক ও পরিকাঠামোগত সংস্কারের সাথে সাথে শিল্প লাইসেন্স নীতিকে আরো শিথিল করা হয়। উন্নতমানের বিদেশী প্রযুক্তিবিদ্যা, কম্পিউটার, টেলি-কমিউনিকেশন, ইন্‌ফরমেশন্ টেকনোলজির অধিক মাত্রায় প্রয়োগ শিল্পগুলির

উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটিয়েছে এবং তাদের প্রতিযোগিতার বাজারে টিঁকে থাকার শক্তি দিয়েছে। কিন্তু আধুনিক যুগের এই মূলধন নিবিড় প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে কর্মীছাঁটাই বা কর্মীসংকোচন ঘটেছে এবং মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের জীবনে বেকারত্বের সমস্যা এক অভিশাপের রূপ নিয়েছে। আবার বর্তমানে এই মুক্ত অর্থনীতির হাত ধরেই বিদেশী ভোগ্যপণ্য — বস্ত্র, প্রসাধনী সামগ্রী, মোবাইল ফোন, গাড়ি এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য—দেশীয় শিল্প দ্রব্যকে প্রতিস্থাপিত করে বাজার প্রায় ছেয়ে ফেলেছে। তাই দেশীয় শিল্পে মন্দারভাব পুনরায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অবশ্য এর অন্যতম কারণরূপে বিভিন্ন বৈদেশিক বহুজাতিক সংস্থা এর প্রবেশ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত সংস্থা সারা বিশ্বজুড়ে তাদের উৎপাদন ক্ষেত্রকে বিস্তার করে অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের দ্রব্য স্বল্পমূল্যে যোগান দিতে সক্ষম। তাই দেশীয় শিল্প দ্রব্যের বাজারের চাহিদা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে অনেক দেশীয় সংস্থা বেসরকারীকরণ ও বিলগ্নীকরণের দিকে কিছুটা অগ্রসর হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার দিক নির্দেশিত পথে শিল্পোন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে চলাই এখন ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অন্যতম লক্ষ্য। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এবং একবিংশ শতাব্দীর সূচনাতে ভারতীয় শিল্পায়ন অনেকটাই বিজ্ঞান ও প্রচার মাধ্যমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমী দেশগুলির ছাঁচে তৈরি। আধুনিক শিল্পের যুগে আমাদের মধ্যেও পশ্চিমী সংস্কৃতিকে অনুকরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাই বিশ্বের উন্নত দেশগুলির অনুকরণ করতে গিয়ে শিল্পোন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য থেকে আমরা অনেকাংশেই সরে বসেছি — ভুলতে বসেছি আমাদের দেশের সমস্যার কথা, প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের কথা। ব্রিটিশ শাসনের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দেশীয় চাহিদা অনুযায়ী শিল্পোন্নয়নের দিকে অগ্রসর হলেও নব্বইয়ের দশকের উদারনীতি কিন্তু দেশীয় শিল্পের অগ্রগতির চাকাকে দ্রুততর করেনি; বরং শ্রম নিবিড় (Labour intensive) শিল্পনীতিকে বিমুখ করেছে। তাই ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির শিল্পনীতি পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত — অর্থাৎ পুনরায় কি আমরা উন্নত দেশগুলির কলোনিতে পরিণত হতে চলেছি? আমাদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে যা করা উচিত, তা হল, আধুনিক শিল্পের বিকাশে বিশ্বায়নের কুপ্রভাবগুলিকে যতটা সম্ভব দূরে রেখে, তাকে অগ্রগতির পাথেয় রূপে ব্যবহার করা।

আধুনিক ভারতে প্রথম ধর্মঘট—একটি সমীক্ষা

কিশোর কুমার দাস

ধর্মঘট একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। কিন্তু ভারতীয়রা উনবিংশ শতকের আগে পর্যন্ত এই শব্দটি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিলেন না।[১] অবশ্য মধ্যযুগের ভারতবর্ষে ধর্মঘটের বিক্ষিপ্ত নজির পাওয়া যায়। কুতুবশাহী শাসনের অথ্যাচারের বিরুদ্ধে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি হায়দ্রাবাদের মহাজনরা হরতাল করে এবং সফলও হয়। ১৬৩০ সনে ব্রোচে এবং ১৬৮৬ সনে মাদ্রাজে তাঁতিরা অত্যাচার ও কর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে ও স্থানত্যাগ করে।[২] ১৬৬৮-৬৯ সনে একটি ধর্মান্তরকরণকে কেন্দ্র করে সুরাটের বানিয়াদের হরতাল এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলতে পারে।[৩] পাঞ্জাবে বাটালা শহর আমরা একটি আবেদনপত্রে জানতে পাই যে, হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে একদল হস্তশিল্পী অত্যাচারী কাজীর বিরুদ্ধে রাজদরবারে আবেদন পাঠাচ্ছে এবং আবেদন নামঞ্জুর হলে শহর পরিত্যাগ করার ভয় দেখাচ্ছে। আবেদনপত্রের সময় হলো খুব সম্ভবত বাহাদুর শাহের আমল। মধ্যযুগে স্থানান্তর সমনের ভীতি প্রদর্শনকে বানিয়ারা প্রতিবাদের অন্যতম অস্ত্র বলে ব্যবহার করেছে। অষ্টাদশ শতকের এক ফরাসী পর্যটক হরতালকে বণিক ও শিল্পীদের প্রতিবাদের স্বাভাবিক মাধ্যম হিসাবে বর্ণনা করেছেন।[৪]

আধুনিককালে ১৮২৭ খ্রিঃ উড়িয়া পালকি বাহকরা ধর্মঘট করে।[৫] বর্তমানে যাদুঘরে ঠাঁই পেলেও মানুষের স্কন্ধযান পালকি প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শন। তার উদবর্তন আধুনিক যুগেও সম্ভব হয়েছিল নতুন অশ্বযানের ব্যয় বাহুল্যের জন্য। উনিশ শতকের তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত তো বটেই তার পরেও অনেক দিন পর্যন্ত পালকির প্রতিপত্তি কমেনি। বাংলার কথিত নবজাগরণ আন্দোলন যখন তরঙ্গশীর্ষে পৌঁছেছে তখনও কলকাতার রাজপথে পালকি - বেয়ারাদের পথচলার ধ্বনি শোনা গেছে।[৬] কাজেই সেদিনের পালকি ধর্মঘট কলকাতায় হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল।

পালকি বাহকদের নিয়ন্ত্রণ করার কোন আইন না থাকায় বাহকরা ইচ্ছামত ভাড়া দাবি করত। জনসাধারণের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে আবেদন করলে সরকার বাহকদের উপর কতকগুলি হুকুম জারি করে।[৭]

(১) প্রত্যেক পালকি বেয়ারাদের পুলিশের খাতায় নাম লেখাতে হবে।

(২) প্রত্যেক বেয়ারাকে পরতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে সংখ্যা নির্দেশক পিতলের চাকতি।

(৩) ঘন্টা অনুযায়ী মজুরী নির্দিষ্ট হলো। আইনের সব ধারাগুলিই বেয়ারাদের উত্তেজিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। বিশেষ করে মজুরী কমিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটিকে কেউ সহজে মেনে নিতে পারেনি।[৮]

পালকিবাহকরা সরকারের নতুন আইনকে নত মস্তকে মেনে নেননি। প্রতিরোধে ও প্রতিবাদে তারা মুখর হয়ে ওঠেন। প্রায় ১১,০০০ পালকি বাহক কাজ ছেড়ে দিয়ে ধর্মতলায় এসে জড়ো হন। সেদিনের ঐ সংগঠিত শ্রমিক সভায় সভাপতিত্ব করেন পাঁচু সুর। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন পালকি বাহক গঙ্গাহরি। তিনি তার ভাষণে বলেন এ অন্যায় জুলুম কখনও মেনে নেওয়া যায় না। পালকি বেয়ারাদের এই সাধারণ সভায় মাঝি, মাল্লা, গাড়োয়ান প্রমুখ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। মাঝি মাল্লাদের নেতা তিনকড়ি সেদিন তার উদীপ্ত ভাষণে ভাবীকালের ট্রেড ইউনিয়নের সম্ভাবনার উজ্জ্বল দিকটির কথাই ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। মাঝি মাল্লাদের নেতা হিসাবে তিনকড়ির রাজনৈতিক চেতনা ভাবীকালের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠিত করার পক্ষে ছিল প্রথম পদক্ষেপ।[৯]

ময়দানে অনুষ্ঠিত সভা ছাড়াও সরকারের নতুন আইনের বিরুদ্ধে একটি সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি হিসাবে পালকি বেয়ারারা গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করার কথা চিন্তা-ভাবনাও করেছেন।[১০]

পালকি বেয়ারাদের বিরুদ্ধে প্রবর্তিত নতুন আইনকে কাজে পরিণত করার জন্যে কর্তৃপক্ষ পুলিশকে সব রকম নির্দেশ দিয়েছিলেন। যার বিরুদ্ধে অমিতবিক্রমে রুখে দাঁড়ায় পালকি বেয়ারারা। পাড়ায় পাড়ায় গণসংগঠন, সভা-সমিতি, মিছিলের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাতে এবং বৃহত্তর আন্দোলনের প্রাক্-প্রস্তুতি হিসাবে গোটা পালকি বাহক সমাজ-শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অগ্রবাহিনী শক্তি হিসেবে, 'ধর্মঘটের' মত অস্ত্র ব্যবহার করে মাথা তুলে দাঁড়াবার সৎ সাহস অর্জন করেছে।[১১]

সরকারী হুঁশিয়ারী কাগজে বিজ্ঞাপিত হওয়ার পাঁচ দিনের মধ্যেই হাজার হাজার পালকি বেয়ারা লালবাজারের পুলিশ দপ্তরের সামনে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। মিছিলে বিক্ষোভে ও প্রতিবাদে সারা কলকাতার চেহারাই পাল্টে যায়। বোধ করি কলকাতার ইতিহাসে সংগঠিত বিক্ষোভ মিছিলের প্রথম নিদর্শন তৈরি করা পালকি বেয়ারাদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল।[১২]

ভারতের প্রথম ধর্মঘট বা ধর্মঘটের ইতিহাসে পালকি বেয়ারাদের ধর্মঘট নামে বিখ্যাত হয়ে আছে, তাতে অংশগ্রহণ করে পুলিশ অফিসে ধর্না দেওয়া, নতুন আইন বাতিল করা, বিক্ষোভ মিছিল সংগঠন করা ও উচ্চকণ্ঠে স্লোগান তুলে সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্য রাখা সেকালের পক্ষে কম কথা নয়। পালকি বেয়ারাদের এই চেতনা আগামী দিনের বৃহত্তর সংগ্রামেরই শুভ ইঙ্গিত বহন করেছে।[১৩]

সূত্রনির্দেশ

১। বাসুদেব মোশেল ঃ ভারতে ধর্মঘটের ইতিহাস কলকাতা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ১।

২। গৌতম ভদ্র ঃ মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ, কলকাতা, ১৯৯১ পৃঃ ২৮৯।

৩। শেখর বন্দোপাধ্যায় ঃ অষ্টদশ শতকের মুঘল সংকট ও আধুনিক ইতিহাস চিন্তা কলকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ৭১।

৪। গৌতম ভদ্র ঃ তদেব, পৃঃ ২৮৯।

৫। রায় নিশীথরঞ্জন ঃ "কলকাতার গাড়ী ঘোড়া" প্রসঙ্গ কলকাতা, পৃঃ ৩১।

৬। বিনয় ঘোষ ঃ কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত কলকাতা, ১৯৯৭ পৃঃ ৯২।

৭। নিশীথরঞ্জন রায় ঃ তদেব।

৮। বাসুদেব মোশেল ঃ তদেব, পৃঃ ২৭।

৯। তদেব, পৃঃ ২৮-২৯।

১০। তদেব, পৃঃ ২৯।

১১। তদেব।

১২। তদেব, পৃঃ ৩০।

১৩। তদেব পৃঃ ৩০-৩১।

উনিশ শতকের কলকাতায় মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন

শিবাজী কয়াল

কলকাতার দীর্ঘ তিনশো বছরের ওপরের ইতিহাসে নানা আন্দোলন ঘটেছে। তার মধ্যে মাদক দ্রব্য বর্জন আন্দোলন বা Temperance Movement হচ্ছে একটি। এই সংস্কার মূলক আন্দোলন প্রায় একশো তিরিশ বছর আগে শুরু হয়েছিল। খ্রিস্টান মিশনারি এবং বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

'Temperance' কথাটির সাধারণ অর্থ হচ্ছে মিতাচার; তবে মদ্যপান বর্জন অর্থে উনিশ শতকে শব্দটি ব্যবহৃত হতো। মদ্যপান জনিত মত্ততা শুধু ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি করে না, সমাজজীবনেও বিপর্যয়ের কারণ হয়। অনুরোধের মাধ্যমে, নৈতিক যুক্তির সাহায্যে, প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন-সংক্রান্ত বিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞান দ্বারা, আইন দ্বারা ও ন্যায় ও মানবতাবোধের আবেদনের মাধ্যমে মাদক দ্রব্য বর্জনকেই 'Temperance' আন্দোলন বলা যায়।

Temperance শুধু কলকাতার এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্যা ছিল না। আমেরিকা এবং ব্রিটেনেও এই সমস্যা বর্তমান ছিল। প্রকৃত অর্থে এই আন্দোলনের উৎপত্তি *New England* অঞ্চলে, যদিও অনেকের ধারণা যে Old England-এ এই আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছিল। (*C. H. A. Dall, On the Temperance Movement in Modern Times, Counterpoint, ed. by Alok Roy, Calcutta 1978.*)! অভিজ্ঞতার কণ্ঠস্বর এবং ব্যবহারিক বিচক্ষণতা আমেরিকার কৃষক ও শ্রমিক মদ্যপানের বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলন শুরু করে।

Wales এর লোহা এবং কয়লা প্রধান জেলাগুলিতে মাদক দ্রব্য পানের বহু উদাহরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। এই অঞ্চলের শ্রমিক প্রতি সপ্তায় 10,000 টাকা ব্যয় করতো মাদক জাতীয় দ্রব্য ক্রয় করতে কিন্তু তারা ছেলে বা মেয়ের শিক্ষার জন্য ব্যয় করতো না। (*Calcutta Christian Advocate, May, 1849*)[২] *The Scottish Temperance Review* থেকে জানতে পারা যায় যে Dundee বছরে £ 2,00,000 ব্যয় করতো মাদক দ্রব্যে এবং

ধর্মীয়, শিক্ষা এবং কল্যাণকারী উদ্দেশ্যে £ 7,000 ব্যয় করতো। (*Calcutta Chrjstian Advocate, June, 1849*)।[৩]

১৮১৬র Police Report থেকে জানা যায় যে London এর রাস্তায় বহু নারী ও পুরুষ মাতাল হয়ে গড়াচ্ছে। এই জন্য আইনসভা এরূপ অবস্থার উন্নতি সাধনে এক gallon বা সাড়ে চার লিটার পরিমাণ মদের ওপর 20 s কর বসায় এবং মদের খুচরো বিক্রয় নিষিদ্ধ করে। (*Calcutta christian Advocate, June, 1849*)।[৪]

মদ্যপান বিদেশে ও এদেশে ভয়াবহ সমস্যা রূপে দেখা দিয়েছিল। বিদেশে এতো ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল যে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন মদ্যপান সমস্যার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিয়েছিল। মিশনারিরা এই গবেষণালব্ধ জ্ঞান সঙ্গে নিয়েই কলকাতায় উপস্থিত হয়েছিলেন উনবিংশ শতাব্দীতে।

কলকাতা, বোম্বাই এবং দেশের অন্যত্র মাতালের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ায় মিশনারিরা মাদক বর্জন আন্দোলন শুরু করেন ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে *ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের* একাধিক সভায় এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় এবং সংস্কারের দাবি জানানো হয়। রাধাকান্ত দেবও এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (*Letter of Radhakanta Deb, dated 23rd November, 1863 to Rev C H A Dall*)।[৫]

১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের *হিন্দু ইন্টেলিজেনসার* লেখে যে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষ যারা মদ্যপান ব্যাপারে এতোদিন মিতাচারী ছিল, এখন তারা পানাভ্যাস শুরু করেছে। কলকাতার অধিকাংশ মানুষ মদ্যপানে অভ্যস্ত। মদ্যপান এতো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল যে তার ফলে অনেক পরিবার দুঃখের জীবন যাপন করছিল এবং শেষ হয়ে যাচ্ছিল। গ্রাম বাঙলাও মদ্যপান দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল এবং খুব কম গ্রামই ছিল যেখানে শুঁড়িখানা বা ভাটিখানা ছিল না।

কলকাতার বন্দরে নাবিকদের মৃত্যু সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রধানত মদ্যপান করার ব্যাপারে, তারা অমিতাচারী ছিল বলেই। এই ধারণা রেভারেন্ড জেম্স্ লঙ পোষণ করেন। (*Reverend James Long, Calcutta and Its neighbourhood, Calcutta, Indian Publications, 1974*)।[৬]

আঠারোশো তিরিশের দশকে ভদ্রলোকেরা মদ্যপান শুরু করেন এবং অনেকে ডিরোজিয়ানদের অভিযুক্ত করতে চান। শিবনাথ শাস্ত্রী মনে করেন যে যদি কাউকে অভিযুক্ত করতে হয় তাহলে তিনি হচ্ছেন রামমোহন রায়। তাঁর কাছে যা সীমিত পান ছিল তা সাধারণের ক্ষেত্রে বিষের আকার ধারণ করেছিল। মদ্যপান ধীরে ধীরে শিক্ষিত শ্রেণী থেকে অশিক্ষিতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। সামাজিক ও ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের অভাবের ফলে এবং পশ্চিমকে অনুকরণের জন্যই মদ্যপান এতো অভাবনীয় রূপ ধারণ করেছিল।

মিশনারিরা কেন মদ্যপান বর্জনের কথা বলেছিলেন? সমস্যাটি বিভিন্ন জন বিভিন্ন চোখে দেখে। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে পুণায় কার্যরত একজন স্কটিশ মিশনারির বক্তব্য ছিল একজন মাতাল বিভিন্ন ধরণের দায়িত্ব পালনে অক্ষম। একজন মাতাল উপযুক্ত স্বামী বা স্ত্রী হতে পারে না; সে একজন উপযুক্ত পুত্র বা কন্যা হতে পারে না; সে একজন সুবিচারক বা সুশিক্ষক হতে পারে না। (*Oddie social protest in India, 1978, Manohor*)।[৮]

রেভারেন্ড স্টরো (L.M.S) যিনি ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এসেছিলেন। মনে করতেন যে ভারতবর্ষে বহু অপরাধের উৎস হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত মদ্যপান। আরও অনেকের ধারণা ছিল যে পাগলামির, ব্যাধির ও দারিদ্রের কারণ হচ্ছে মদ্যপান। রেভারেণ্ড গোল্ডস্মিথ যিনি ভারতবর্ষে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে এসেছিলেন মনে করতেন যে মদের পেছনে মানুষ অনেক টাকা খরচ করে। আরামদায়ক ও প্রয়োজনমূলক দ্রব্য ক্রয় করার জন্য যে তাদের বেতনের যে অংশ ব্যয় হয় তারা তা পারতো না। এর স্বাভাবিক ফল হচ্ছে দুঃখ, কষ্ট, ব্যাধি এবং মৃত্যু।

কেবলমাত্র সামাজিক চিন্তা ভাবনা নয়, ধর্মান্তরীকরণের কথা ভেবেও মিশনারিরা মদ্যপান নিবারণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা বলতেন যে খ্রিস্টধর্ম মাতলামি ক্ষমা করে না। মদ্যপান বর্জন আন্দোলন তাঁদেরকে যারা খ্রিস্টান নয় তাদের সংস্পর্শে এনে দিয়েছিল।

বুদ্ধিজীবী ভারতীয়রা মানবতাবোধ ও সমাজসেবা আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মাদক দ্রব্য বর্জনে অংশ নিয়েছিল।

মদ্যপানের বিরুদ্ধে মিশনারিরা আন্দোলন শুরু করেছিল পশ্চিমী ধরণের সংগঠনের মাধ্যমে। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে ডঃ আলেকজান্ডার ডাফ্, রেভারেন্ড গগার্লি (L.M.S), বোত্রজ্ (L.M.S), ইনেস্ (L.M.S) এবং লঙ্ আরও কয়েকজন ইউরোপীয়কে নিয়ে Calcutta Temperance Society প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল মদ্যপান বর্জন প্রচার করা এবং মদ খাওয়ায় মিতচারী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা। (*Calcutta Christian Observer April, 1841*)।[৮]

ভারতীয়রাও পশ্চিমী কায়দায় কিছু মদ্যপান নিবারণ সংগঠন গড়ে তুলেছিল। বোধহয় এই ধরণের প্রথম সংগঠন হচ্ছে *রাজ নারায়ণ বসু কর্তৃক মেদিনীপুরে* প্রতিষ্ঠিত *Bengal Temperance Society* (১৮৬১)। রাজনারায়ণ লিখেছেন যে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারে তাঁকে যত না বাধা পেতে হয়েছিল তার অধিক বাধা পেয়েছিলেন এই আন্দোলন সংগঠনে। (Tattwabodhni Patrika, Sravan, 1805)।[৯] দুবছর পর কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। *Bengal Temperance Society. প্যারীচরণ সরকার হচ্ছেন* প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে এর কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন *রেভারেন্ড ম্যাকডোনাল্ড, রেভারেন্ড ডাফ্, কেশব চন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল* এবং বিদ্যাসাগর (Banerjee, S.N. A Nation in making Oxford

University Press, 1963)।[১০] প্যারীচরণ মদ্যপান বর্জন বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন।

মদ্যপান বর্জন আন্দোলন ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করেছিল এবং *জোড়াসাঁকো, আহিরীটোলা, লালবাজার, পটলডাঙ্গা, চোরবাগান, সিমলা, পাথুরিয়াঘাটা, কলুটোলা* এবং *মাণিকতলায়* Bengal Temperence Society-র অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল (Counterpoint Vol.2 Ed, by Alok Roy, Peary Charan Sarkar, The Bengal Temperance Society)।[১১] এর দ্বারা কলকাতায় এই আন্দোলনের জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়।

যখন *Bengal Temperance Society*-র কর্মপন্থা উত্তরপাড়ায় পৌঁছেছিল তখন *উত্তরপাড়া হিতকরী সভা* মদ্যপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য এই সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চেয়েছিল এবং *Uttarpara Temperance Society, Hitakari Sava*-র শাখারূপে কাজ শুরু করলো। (Mukherjee, Nilmani, Charitable efforts in the nineteenth century, Vol. LXXXIX, P - 2, No. 168, Jully - December, Bengal past and present, Jadunath Sarkar Birth Centenary Number)।[১২]

মদ্যপান বন্ধ করা জন্য রেভারেন্ড *জন ওয়েঙ্গার* এবং *ম্যাকডোনাল্ড* তাঁদের নিজেদের দ্বারা মদ্যপান সম্পূর্ণ বন্ধ করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু ডাফ্ এই ধরণের বক্তৃতাকে "most intemperate lecture on temperance বলে বর্ণনা করেছিলেন। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের *Calcutta Missionary Conference* এর কাগজপত্র যদি পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে ওই সময়ে অধিকাংশ মিশনারি ছিলেন মিতাচারী। তাঁরাও মদ্যপান বর্জনের ওপর বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

এরপর কৃষকদের যতো যতো পরিমাণ খুশি চোলাই প্রস্তুত করতে দেওয়ার সরকারি নীতিকে সমালোচনা করা হয়। এরূপ নীতির ফলে চোলাই খাওয়ার কোন সীমা ছিল না। সরকারি নীতির সমালোচনায় সবচেয়ে স্পষ্ট বক্তা ছিলেন *রেভারেন্ড ইভান্স* (B. M. S.)। বহু ভারতীয় যেমন কৃষ্ণ কুমার মিত্র, কালীশঙ্কর সুকুল এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় চোলাই প্রস্তুত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিলেন (Banerjee, S.N., A Nation in making, Oxford University press, 1963)।[১৩]

বিংশ শতাব্দীতেও মদ্যপানের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা শোনা যায়। *Temperance committee of the General Assembly of the Duff Church* এর আহবায়ক মদ্যপানের কুফল প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য আগ্রহী ছিলেন। *Temperance Federation of Bengal* এর সঙ্গে ডাফ চার্চ সহযোগিতা করবে বলে ঘোষণা করেছিল।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যাবে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় মদ্যপানের বিরুদ্ধে কি ভাবে একটি সংস্কারের প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। আন্দোলনটি কতোটুকু সফল হয়েছিল তা বর্তমান কলকাতা নিবাসীরাই বলবে।

ঔপনিবেশিক ভারতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ঃ আজকের ভাবনায় তার প্রাসঙ্গিকতা অনুসন্ধান

নবনীতা দত্ত

গবেষণা পত্রের আলোচনার বিষয় একটি ঔপনিবেশিক তথা পরাধীন দেশে 'সন্ত্রাসবাদী' আন্দোলন বা কার্যকলাপের সঙ্গে বর্তমান কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে 'সন্ত্রাসবাদী কর্মসূচী'র চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য কোথায় — সেবিষয় ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে একটি তুলনামূলক অনুসন্ধান করা। এই আলোচনার সময় যেমন ব্রিটিশ শাসিত পরাধীন ভারতের প্রসঙ্গ আসবে, তেমনি আসবে স্বাধীনতা পরবর্তীকালের রাজনৈতিক ভাবাদর্শপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের প্রসঙ্গ এবং এই উভয় প্রেক্ষাপটেই খোঁজার চেষ্টা হবে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় 'সন্ত্রাসবাদী' কার্যকলাপের সঙ্গে — পূর্বেকার 'সন্ত্রাসবাদ' বা বৈপ্লবিক আন্দোলনের মিল বা অমিলের প্রশ্নটি। এটি একটি বৃহৎ আলোচনা ও জটিল বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমি শুধু কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাকে তুলে ধরবো।

ঔপনিবেশিক শাসনকালে ব্রিটিশ ভারত সরকার নিজেদের সুবিধার্থে মুক্তি সংগ্রামে নিবেদিত সেইসব বিপ্লবীদের ও তাদের কার্যকলাপকে 'সন্ত্রাসবাদী' ও 'সন্ত্রাসবাদ' বলে অভিহিত করত। এমনকি আমরাও যখন আজ সেই আত্মত্যাগী শহীদ বীরদের অনেকসময়ে 'বিপ্লবী' বলে অভিহিত না করে 'সন্ত্রাসবাদী' বলে চিহ্নিত করি তখন তা তাঁদের দেশপ্রেম সম্পর্কে এবং সে-বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে নিঃসন্দেহে প্রশ্ন ও বিভ্রান্তি উৎপাদন করে থাকে। স্বাধীনোত্তর ভারতের 'সন্ত্রাসবাদ' ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। একবিংশ শতাব্দীতে আমরা যে 'সন্ত্রাসবাদ' কথাটির সঙ্গে পরিচিত, তা সাধারণের স্বার্থ থেকে দূরে অবস্থিত ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠী ও কৌমের স্বার্থে পরিচালিত — যা কয়েকদশক ধরে আমরা কাশ্মীরসহ উত্তর-পূর্ব ভারতে ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্য করছি।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা 'সন্ত্রাসবাদী' আন্দোলনে সহায়তা করেছিল বলা যায়। জাতীয় কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে ব্যর্থ হয়। এই সময়ে অরবিন্দ ঘোষ বলেছিলেন, "যে দেবতার সমীপে আত্মবলিদান সম্পন্ন হবে, শ্রেষ্ঠ এবং মহত্তমের আত্মনিবেদন ছাড়া তাঁর সন্তুষ্টি বিধান সম্ভব নয়।"[১] এই বক্তব্যের মধ্যেই আমরা 'সন্ত্রাসবাদী' কার্যের সমর্থন পাই। 'সন্ত্রাসবাদে'র সূচনার

পশ্চাতে একদিকে যেমন ভারতের অর্থনীতি ও সমাজনীতি দায়ী ছিল, তেমনি অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনমূলক নীতিকেও দায়ী করা যায়। নরমপন্থী কংগ্রেসীদের দুর্বলতা, কংগ্রেসের যুবক সদস্যদের মধ্যে বিপিন চন্দ্র, লালা লাজপৎ রায়, অরবিন্দ ঘোষ ও তিলক প্রমুখরা সন্ত্রাসবাদী তথা বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচার করে যুবকদের উদ্দীপিত করে তোলেন।

ঔপনিবেশিক ভারতের 'সন্ত্রাসবাদী'দের কার্যকলাপের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মের সঙ্গে 'সন্ত্রাস'কে সম্মিলিত করা। এর ফলে হিন্দু বিপ্লবীদের গুপ্তসমিতি সমূহকে মুসলিম যুবসমাজ এড়িয়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন, "ধর্ম দিয়া লোক ক্ষেপাইয়া ভারতের মুক্তিলাভ হইবে না, বরং তাহার অবসাদের পরিণাম অতিভীষণ হইবে।"[২] 'হিন্দু' বিপ্লবীবর্গ কখনই উপলব্ধি করেননি যে ধর্মমত নির্বিশেষে একত্র হয়ে বৈপ্লবিক কর্মসূচী পরিচালনা করতে পারলে তবেই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে। তাই বাঙলায় দেখা যায় মুসলিম সমাজের একটি বিশাল অংশ গুপ্তসমিতি গুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেনি। কিন্তু এইসকল বিপ্লবীদের কখনই সাম্প্রদায়িক রূপে আখ্যা দেওয়া যাবে না। কারণ আজকের ধর্ম বা কৌমভিত্তিক 'সন্ত্রাসবাদের' সাম্প্রদায়িক চরিত্র তখন ছিল না।[৩] তাই এই সময় ধর্ম বা ধর্মীয় প্রতীককে ভিত্তি করে সন্ত্রাসবাদী কাজে বিপ্লবীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

স্বাধীনোত্তর ভারতে অব্যাহত 'সন্ত্রাসবাদ' মূলত বিচ্ছিন্নতাবাদী স্বার্থগোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত। মানুষ আজ উপলব্ধি করছে যে এইসকল জঙ্গী সন্ত্রাস থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম ঘটছে যা দেশের স্বার্থের পরিপন্থী। কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতে সন্ত্রাসবাদকে আমরা কোনভাবেই বিচ্ছিন্নতাবাদী বলতে পারি না। বরঞ্চ তাকে জাতীয়তাবাদেরই রূপক রূপেই চিহ্নিত করা চলে। এই সময়কার বিপ্লবীদের কার্যকলাপে একটি মধ্যভারতীয় চরিত্র লক্ষ্য করা যায়, যা বর্তমান সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে নেই। পরাধীন ভারতের সন্ত্রাসবাদীরা দেশের স্বার্থে ভারতকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিপ্লবী মাষ্টারদা সুর্য সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সামরিক বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সরকারের উদ্দেশ্যে তাঁর ঘোষণাটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "চট্টগ্রাম ভারতের একটি ক্ষুদ্র অংশ তবু আশা ও ভরসা করা যায় আজকের জয় ব্রিটিশ দস্যুর কবল হতে ভারতমাতাকে মুক্ত করবার জন্য ভারতবাসীকে সারা দেশে অনুরূপ বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত করবার উৎসাহ দেবে।"[৪] এই সকল সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভারতমাতার প্রতি ভক্তি, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সহানুভূতি, সহযোগিতা ও উৎসাহ পেয়েছিলেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তারা প্রত্যক্ষ সাহায্যও লাভ করেছিলেন। এই বিপ্লবীরা বিচ্ছিন্নভাবে না থেকে জনসংযোগ গড়ে তুলেছিলেন এবং এই ব্যাপারে বিপ্লবী

ভগত সিং বৃহৎ ও সংগঠিত প্রচেষ্টা অবলম্বন করে আদালতকে নিজের মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্র রূপে ব্যবহার করেছিলেন। 'সন্ত্রাসবাদ'কে এই অর্থে সবলের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম রূপেই মনে করা ভুল হবে না।

এই প্রসঙ্গে বিপ্লবী শিব বর্মা তাঁর সহকর্মী ভগত সিং সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "ভগৎ সিং, সুখদেব, ভগবতী চরণ, যশপাল প্রমুখেরা ১৯২৬ সালে লাহোরে নওজওয়ান ভারতসভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটা ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের প্রকাশ মাত্র। জনসভা, বক্তৃতা, ইশতেহার প্রভৃতি মারফত বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য ও তাঁদের ধ্যানধারণার প্রচারই ছিল এর কাজ। শোষণ, দারিদ্র্য, অসাম্য প্রভৃতি দুনিয়াজোড়া সমস্যা সম্পর্কে পড়াশোনা ও আলোচনার পর তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, ভারতের পূর্ণস্বাধীনতার জন্য শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই নয়, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও চাই।"[৫] সুতরাং বলা যায় যে বিপ্লবীরা সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে গিয়ে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি অর্জনের আদর্শ প্রচার করতেন। বহু সাধারণ মানুষও তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিতও হয়েছিলেন। কার্যত উপনিবেশিক শাসনকালে সশস্ত্র বিপ্লবীদের সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চরিত্র বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। কিন্তু বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর সন্ত্রাসবাদী চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির।

একথা স্বীকার্য যে বাঙলাসহ ভারতবর্ষের অন্যত্র সশস্ত্র-বিপ্লববাদ তরুণ যুবকদের সামাজিক উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছিল। এছাড়াও যতদিন রাজশক্তির 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ' অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন বিক্ষুব্ধ ও নিপীড়িত প্রজাশক্তিও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বিশ্বের নানা দেশে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী ও অত্যাচারী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাসবাদ' গণ-প্রতিরোধের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়েছে। চীন-রাশিয়া-আয়ারল্যান্ড-দক্ষিণ আমেরিকা সর্বত্রই এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।

সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক আদর্শে 'সন্ত্রাসবাদ' তার পূর্বের গরিমা হারায়। রাশিয়ায় দেখা যায় যে নারদনিকদের ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের নীতিকে লেনিন, প্লেখানভ প্রমুখ নেতৃবর্গ বর্জন করেছিলেন। 'ঘরেবাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্ত্রাস সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। একথা সত্য যে সংগ্রামের লক্ষ্য মহৎ হলে তার সিদ্ধির পথটিও মহৎ হতে হবে। ভারতের মুক্তি অর্জনের জন্য সন্ত্রাসবাদীদের আত্মবিসর্জন একেবারেই নিষ্ফল এবং অকারণে ছিল না। শত শত তরুণ প্রাণ আত্মোৎসর্গে দেশবাসীর নিদ্রাভঙ্গ ঘটেছিল। বীরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দুর্বলচিত্ত, অখ্যাত, অবহেলিত ভারতবাসী নির্বিশেষে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে হেঁটেছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হৃদয় কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু গান্ধীজীর ডাকে সমগ্র ভারত সাড়া দিতে কার্পণ্য করেনি। তাতে যে গণজাগরণ বা আলোড়ন ওঠে — তা 'সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে' সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং

মার্কসবাদী ভাবাদর্শ বা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী লিবারেল বুর্জোয়া ভাবাদর্শ কোনোটাতেই 'সন্ত্রাসবাদের' স্বপক্ষে সমর্থন নেই। ১৯৩১ সালে ভগৎ সিং এর ফাঁসিতে গান্ধী তাই নীরবই থেকেছিলেন।

তবে কি একথা সত্য সন্ত্রাসবাদ কখনো কোনরূপেই ভালো হতে পারে না? তা কি গণ-বিচ্ছিন্নতাবাদ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম দেয়? ঔপনিবেশিক ভারতে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও সন্ত্রাসবাদের প্রসারে সহায়তা করেছিল এবং সন্ত্রাসবাদের প্রভাবে কিছুকাল ব্রিটিশ শক্তিও চাপের মধ্যে ছিল এবং কংগ্রেসকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে বাধ্য হয়েছিল। ঠিক সেভাবে ১৯৭০-এর দশকে নকশাল আন্দোলন দমনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন শাসকশ্রেণীর প্রধান ইস্যু ছিল। একথা মনে রাখলে 'সশস্ত্র বিপ্লববাদ' রূপে 'সন্ত্রাস' সঠিক। যাহোক সামগ্রিক বিচারে ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তিমপর্বে সন্ত্রাসবাদ পরিত্যক্ত হয়। এরমূলে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন এই পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। অবশেষে প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদীরা কমিউনিস্ট পার্টি, RSP, RCPI প্রভৃতি গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে জাতীয় রাজনীতির মূলস্রোতে মিশে যায়।

তথাপি সন্ত্রাসবাদের অবসান ঘটেনি। ধর্মকে পরিত্যাগ করে তা রাজনৈতিক মতবাদ বা ভাবাদর্শকে আশ্রয় করে। ১৯৪২ সালের আন্দোলনে যেমন বামজাতীয়তাবাদ, ১৯৪৮ সালে RCPI, এমনকি বেআইনী ঘোষিত CPI-র কার্যকলাপেও তা পরিলক্ষিত হয়েছে দুটি চরিত্র ঃ যথা— ১) শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী, ২) রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতা।

বর্তমানে যে সন্ত্রাসবাদ ফিরে আসছে নতুন চেহারায় তার মধ্যে ১৯০৭-১৯৩৪ সালের 'সন্ত্রাসবাদের' চেহারা বা চরিত্র কোনটাই পরিলক্ষিত হয় না। এই সময় তা ছিল বস্তুতপক্ষে আত্মসমীক্ষার, যে-কারণে পরবর্তীপর্বে তা পরিবর্তিত হয়েছিল। সূর্য সেন, বিনয়, বাদল, দীনেশ, প্রীতিলতা, বীণা দাশ, শান্তি, সুনীতি প্রমুখ বিপ্লবীবর্গের গৃহীত সন্ত্রাসবাদ ছিল বহুলাংশে ধর্মবিবর্জিত অর্থাৎ বর্তমানে সন্ত্রাসবাদের চরিত্রের রূপান্তর ঘটেছে। অবশেষে সেসব সন্ত্রাসবাদী তথা বিপ্লবীবর্গ Organised Polities-এ তাঁদের পথ খুঁজে পায়। তাঁদের এই ক্রমবিবর্তন ঘটেছিল ইতিবাচক পন্থায়। কিন্তু বর্তমানকালের 'সন্ত্রাসবাদে' তথা 'সন্ত্রাসবাদী'-দের মধ্যে তা কতটুকু লক্ষ্য করা যায়।

সূত্রনির্দেশ

১। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস।

২। উপরোক্ত।

৩। Tapan Roychoudhury, Europe Reconsidered.

৪। দেশ, ২য় খণ্ড, ১৩৯৮।

৫। শিববর্মা, শহীদ স্মৃতি।

পূর্বভারতে যুক্তবঙ্গের প্রয়াস ঃ কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা

দেবনারায়ণ মোদক

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনের অনিবার্য পরিণতিতে দেশবিভাগের প্রস্তাবের সঙ্গে বঙ্গ-বিভাজনের প্রশ্নটিও সামনে এসে পড়ে। দেশের দুই বৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠন — জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এক অর্থে প্রাথমিকভাবে বাংলাকে অখন্ড রাখারই পক্ষপাতী ছিল, কারণ উভয় সংগঠনই সমগ্র বাংলাকে যথাক্রমে ভারত বা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু সামগ্রিক রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝে যথার্থ অর্থে সেদিন বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখার একাধিক আন্তরিক প্রয়াস দৃষ্টিগোচর হয়েছিল এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা গঠনের প্রচেষ্টায় রূপপরিগ্রহ করেছিল। শরৎ বসু ও আবুল হাশিমের উদ্যোগ এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কমিউনিস্ট পার্টিও সেদিন যুক্তবঙ্গের এই আন্দোলন সমর্থন করেছিল। কেবলমাত্র আন্দোলনের সমর্থক হিসাবেই নয়; ভারতবর্ষের জাতিসমস্যার ব্যাপকতর তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে ঐক্যবদ্ধ ভারতে 'নূতন বাংলা' গঠনের এক রূপরেখা সেদিন পার্টির ভাবনায় বিধৃত হয়েছিল। এমন কি পাশ্পবর্তী বিভিন্ন বঙ্গভাষী এলাকা নিয়ে 'পূর্ণবঙ্গ' গঠন ও সেই পরিকল্পনার অঙ্গ ছিল। কিন্তু সে সময়ে জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, এমন কি শরৎ বসু অথবা পরবর্তী সময়ের ইতিহাসবিদদের কাছেও নানা কারণে বিষয়টি গুরুত্বলাভ করেনি। বর্তমান নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সামগ্রিকভাবে জাতিপ্রশ্নে এবং বিশেষত ভারতে জাতিসত্তা সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গে পার্টির বিকাশমান ধ্যানধারণার প্রেক্ষিতে যুক্তবঙ্গের প্রয়াসে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা বিশ্লেষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।[১]

।। এক ।।

১৯৪০-এর মার্চে মুসলিম লীগের অধিবেশনে 'লাহোর প্রস্তাব' গৃহীত হওয়ার সময় থেকেই ভারতবর্ষে জাতিপ্রশ্ন (national question) সম্পর্কিত আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে। মুসলিম লীগ দ্বিজাতিতত্ত্ব (two-nation theory)-র অবতারণা করে দেশ বিভাজনের মাধ্যমে মুসলিম জনগণের জন্য পৃথক আবাসভূমি (separate homeland) গঠনের দাবি উত্থাপন করে প্রচারাভিযান সংগঠিত করতে থাকে। অন্যদিকে হিন্দু মহাসভা এবং জাতীয় কংগ্রেস ভারতবর্ষকে একজাতি (one nation) হিসাবেই গণ্যকরে এই ধারণার

চৌহদ্দির মধ্যেই যাবতীয় সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে তৎপর হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট পার্টি এই বিতর্কের প্রেক্ষাপটেই জাতিপ্রশ্ন সম্পর্কে নিজস্ব অবস্থান নিরূপণ করে। এ-বিষয়ে বিদ্যমান উভয় মতেরই সমালোচনা করে পার্টি 'বহুজাতিক ভারতবর্ষ' (multi-national India)-র ধারণাকে আশ্রয় করে একই সঙ্গে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং ভারতীয় ঐক্যের উপরে গুরুত্ব আরোপ করে। ১৯৪০ সাল থেকেই জাতিপ্রশ্নে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৪২-এ পার্টি মুখপত্রে প্রকাশিত তৎকালীন পার্টির অন্যতম শীর্ষনেতা গঙ্গাধর অধিকারীর নিবন্ধ "National Unity Now"-তে ভারতের ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে জাতিসমস্যা সম্পর্কিত মার্কসবাদী তত্ত্বের আলোকে ব্যাখা করার চেষ্টা করা হয়।[২] ঐ বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে অধিকারীর প্রতিবেদন বিষয়টিকে অধিকতর পরিস্ফুট করে।[৩] প্লেনামে গৃহীত প্রস্তাব "On Pakistan and National Unity", যা ১৯৪৩-এ পার্টির প্রথম কংগ্রেস দ্বারা অনুমোদিত হয়, জাতিপ্রশ্নে পার্টির 'নূতন দৃষ্টিভঙ্গী' হিসাবে রূপ পরিগ্রহ করে। এই প্রস্তাবে বলা হয় ঃ

> Every section of the Indian people which has a contiguous territory as its homeland, common historical tradition, common language, culture, psychological make-up and common economic life would be recognised as a district nationality with the right to exist as an autonomous state within the free Indian union or federation and will have the right to secede from it if it may so desire... Thus free India of tomorrow would be a federation or union of autonomous states of the various nationalities... ।[৪]

জাতিপ্রশ্নে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গীতে কিছু পরিবর্তন ঘটলে ও স্বাধীনতা-পূর্ব কালে এ-বিষয়ে পার্টির মৌলিক অবস্থান অপরিবর্তিত ছিল। বাংলা-সহ ভারতবর্ষের ১৭-টি "সুনির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠী"র জন্য বিচ্ছিন্নতার অধিকার (right to secede)-সহ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা ইউনিয়নের মধ্যে সার্বভৌমত্ব ও স্বশাসনের স্বীকৃতিপ্রদান এই দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। সেকারণেই, দেশভাগের প্রস্তারেব পটভূমিতে বাংলা বিভাজনের প্রশ্ন উত্থাপিত হলে পার্টি তার সামগ্রিক অবস্থানের নিরিখেই "স্বাধীন ভারতে ঐক্যবদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলা" গঠনের পক্ষে অভিমত প্রদান করে।

এই প্রসঙ্গে শরৎ বসুর ভাবনাও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে কারাজীবনে ভারতের জাতিপ্রশ্ন সম্পার্কে তিনি গভীর অনুশীলন করেন এবং ১৯৪৪-এর প্রথম দিকে এ-বিষয়ে তাঁর ভাবনা সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপিত করেন। স্বাধীন ভারতবর্ষকে

তিনি দেখতে চেয়েছিলেন একটি 'সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সমূহের ইউনিয়ন' (Union of socialist republics) হিসাবে, যেখানে বিভিন্ন রাজ্যসমূহকে ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠন করে এক একটি স্বয়ংশাসিত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (autonomous socialist republics) হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে ভারতীয় ইউনিয়ন গঠনে স্বতঃস্ফুর্ত সহযোগিতা নিশ্চিত করা যাবে। কারামুক্ত হয়ে দেশভাগ রোধ করার জন্য তিনি জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করে বিকল্প পথের সন্ধান করতে থাকেন। তাঁর মতে, পাকিস্তানের দাবি ভারতের স্বাধীনতা ও সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে 'আত্মঘাতী' (suicidal) হবে এবং তা সাম্রাজ্যবাদী, সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিকাশের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। তাই তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন ঃ

> The real solution of the existing communal differences to my mind lies in the creation of socialist republics on a linguistic basis and in the establishment in this country of a central union of Socialist Republics.[৫]

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক অমলেন্দু দে যথার্থ ভাবেই এক্ষেত্রে শরৎ বসু'র বিশ্লেষণের সঙ্গে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গীর সাযুজ্য লক্ষ্য করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "He (Bose) used the term 'Socialist Republic', whereas the Communists used the term 'Sovereign National Constituent Assembly'. Besides that there was no basic difference in their approach to this particular question."[৬]

।। দুই ।।

১৯৪৬-এর আগষ্ট থেকে ১৯৪৭-এর জানুয়ারী পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অংশে যে অভাবিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে দেশবিভাগ যেন অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং তারই স্বাভাবিক পরিণতি-তে পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাজনও যেন প্রায় নিশ্চিত হয়ে পড়ে। ১৯৪৬-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার গোরক্ষপুর অধিবেশনের মঞ্চ থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে দেশভাগের দাবি ওঠে। ১৯৪৭-এর প্রথম দিক থেকেই হিন্দু-মহাসভা বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাব নিয়ে ব্যাপক প্রচারাভিযান শুরু করে। ৪ এপ্রিল, ১৯৪৭, তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহসভার প্রাদেশিক সম্মেলনে এ-বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। একই দিনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতি বঙ্গ-বিভাজনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। এইভাবে উভয় সংগঠনই একই ধরণের প্রস্তাব নিয়ে প্রায় একযোগে বাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলিকে নিয়ে পৃথক প্রদেশ গঠনের লক্ষ্যে কাজে নেমে পড়ে। তৎকালীন বাংলার মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার অবিমৃষ্যকারিতা এই লক্ষ্যপূরণের অনুকূল পরিস্থিতি রচনা করে।

সামগ্রিকভাবে বঙ্গ-বিভাজনের প্রস্তাবের বিরোধী হলেও মুসলিম লীগ নেতৃত্ব এই প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন। এক গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং মহম্মদ আলি জিন্না এবং তাঁর বিশ্বস্ত প্রাদেশিক সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আক্রাম খাঁ এবং অপরদিকে ছিলেন তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাবর্দি এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাশিম। জিন্না এবং তাঁর অনুগামীবৃন্দ পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাজনের বিরোধী হলেও তারা সমগ্র পাঞ্জাব এবং বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সোহরাবর্দি এবং আবুল হাশিম ছিলেন যুক্তবঙ্গের পক্ষপাতী। ৮ এপ্রিল, ১৯৪৭ এক বিবৃতির মাধ্যমে সোহরাবর্দি ঐক্যবদ্ধ ও বৃহত্তর বঙ্গের দাবি প্রকাশ্যে উত্থাপন করেন।[৭] ২৭ এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন ঃ "I am visualising an independent, undivided, sovereign Bengal in a divided India."[৮]

কেবলমাত্র স্বাধীন, অবিভক্ত সার্বভৌম বাংলাই নয়, সোহরাবর্দির বক্তব্যে এক বৃহত্তর বঙ্গের রূপরেখাও পরিস্ফুট হয়।[৯]

তিনিও এক ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন বাংলার পক্ষে দৃঢ়ভাবে মতপোষণ করেন।[১০]

বাংলার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের এই মতপার্থক্য সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সুমিত সরকার লিখেছেন ঃ "বাংলা মুসলিম লীগের অনেকেই কিন্তু সুদূর পাঞ্জাবের তাঁবেদারি মেনে নিতে রাজী নন। যেমন সোহরাবর্দি ও আবুল হাশিম। তাঁরা হিন্দুস্তান-পাকিস্তান দুটোরই বাইরে অবিভক্ত বাংলা গঠনের পরিকল্পনা তৈরি করেন। শরৎ বসুর মতো কয়েকজন কংগ্রেস নেতাও প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখতে রাজি হন।[১১] বস্তুত ১৯৪৬-এর অক্টোবর থেকেই এ-বিষয়ে শরৎ বসু ও আবুল হাশিমের কথাবার্তা চলতে থাকে। শরৎ বসু কলকাতার ভয়াবহ দাঙ্গার পরও ১৯৪৭-এর জানুয়ারীতে বাংলায় নূতন এক মন্ত্রিসভা গঠন ও বাংলার জন্য স্বতন্ত্র সংবিধান রচনার পরিকল্পনা করেন।[১২] স্বাধীন বাংলা গঠনের পরিকল্পনা সম্পর্কে শরৎ বসু গান্ধীজির সঙ্গেও আলোচনা করেন এবং গান্ধীজির সোদপুরে অবস্থান কালে বিশদ আলোচনার জন্য আবুল হাশিমকে নিয়ে গান্ধীসমীপে উপস্থিত হন। এ-বিষয়ে অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু লিখেছেন ঃ "আবুল হাশিম প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে গান্ধীজির সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করেন।... হাশিম সাহেবের মূল কথা হচ্ছে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক - শেষ পর্যন্ত সবাই বাঙালী। সকলেরই ভাষা এক - সংস্কৃতি এক। তারা কেন হাজার মাইল দূরের পাকিস্তানিদের শাসন মেনে নেবে?"[১৩] সোহরাবর্দিও সোদপুরে গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং গান্ধীজির সামনে সংযুক্ত সার্বভৌম বাংলার এক উজ্জ্বল ছবি আঁকেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও এ-বিষয়ে গান্ধীজির কথা হয়। ব্যক্তি সোহরাবর্দি সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদের অনাস্থা সম্পর্কে - অবহিত হয়েও গান্ধীজি

প্রস্তাবের ভালোমন্দ বিবেচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। গান্ধীজি মন্তব্য করেন ঃ "বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান - তারা এক ও অভিন্ন। এটা একবার স্বীকার করে নিলেই — লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর বড় আঘাত হানা হবে।"[১৪]

এই পরিপ্রেক্ষিতেই অখন্ড বাংলার পরিকল্পনা নিয়ে লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শরৎ বসু, কিরণশঙ্কর রায়, সত্যরঞ্জন বক্‌সি প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের কয়েক প্রস্থ আলোচনা হয়। সেই আলোচনার ভিত্তিতে শরৎ বসু স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলার একটি খসড়া রূপরেখা তৈরি করেন এবং তার বাস্তব রূপায়ণ বিষয়ে গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনাও করেন।[১৫] ২০মে, ১৯৪৭, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অনুমোদন সাপেক্ষে সার্বভৌম অখন্ড বাংলা গঠনের এক দলিল গৃহীত হয় এবং এতে কংগ্রেসের পক্ষে শরৎ বসু ও লীগের পক্ষে আবুল হাশিম স্বাক্ষর করেন।[১৬] ২৩মে' ৪৭, গান্ধীজির অনুমোদনের জন্য দলিলটি তাঁর কাছে পাঠানো হয় এবং গান্ধীজির পরামর্শমতো দলিলে কিছু সংশোধনও করা হয়।[১৭]

এতদ্‌সত্ত্বেও ঘটনাপ্রবাহ এই দলিল কার্যকরী করার পথে অনতিক্রম্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ভারত ও বঙ্গবিভাজনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নেহরু-প্যাটেল সহ কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব স্বাধীন বঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। গান্ধীজিকেও তারা এ-বিষয়ে উৎসাহ প্রদানে নিরস্ত করেন। শরৎ বসু-কে প্যাটেল এ-বিষয়ে জড়িত থেকে কংগ্রেস রাজনীতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন না করতে সতর্ক করেন। কিরণশঙ্কর রায় প্যাটেলের নির্দেশে এই আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান। মুসলিম লীগের কার্যকরী সমিতিও স্বাধীন বাংলার এই প্রস্তাব অনুমোদন করে না। সোহরাবর্দিও নিজের অবস্থান পরিবর্তন করেন। ৩ জুন' ৪৭, মাউন্টব্যাটেনের ভারত ভাগ সম্পর্কিত বেতার ঘোষণার পরেও কেবলমাত্র শরৎ বসু ও আবুল হাশিম এ-বিষয়ে তাঁদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ৯ জুন '৪৭, লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন মাউন্টব্যাটেনের রোয়েদাদ গ্রহণ করে। ১৪ জুন '৪৭, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাজনে সম্মতি প্রদান করে। শরৎ বসু বাংলাকে অখন্ড রাখার শেষ চেষ্টা করেন জিন্নাকে লিখিত তাঁর ৯ জুনের পত্র মারফৎ; কিন্তু মুসলিম লীগ অখন্ড বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে মতপোষণ করে। ২৯ জুন '৪৭-এর অবিভক্ত বিধানসভার অধিবেশনে লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুবাদে সেরকম প্রস্তাবই গৃহীত হয়। এই যৌথ অধিবেশনের পরেই অবশ্য বাংলার হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার সদস্যগণ পৃথক পৃথক সভায় মিলিত হন। পূর্ববঙ্গের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কগণ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে ভোট দেন এবং পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কেরা বঙ্গভঙ্গ ও ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ ভাবেই দেশভাগের আগেই কার্যত বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত বৈধতা লাভ করে।[১৮]

।। তিন।।

বিভাগ-পূর্ব ভারতে যুক্তবঙ্গের এই প্রয়াসে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বস্তুতপক্ষে, শরৎ বসু - আবুল হাশিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উদ্যোগ সূচিও হওয়ার বহু আগেই জাতিপ্রশ্নে কমিউনিস্ট অবস্থানের মধ্যেই এ-বিষয়ে পার্টির বক্তব্য সূত্রায়িত হয়। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে জাতিপ্রশ্নে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা সংশোধিত হয় এবং পার্টি দেশ-বিভাগের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে।[১৯] এই পরিপ্রেক্ষিতেই পার্টি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ও সুনির্দিষ্ট অবস্থান নির্ণয় করে। ১৯৪৬-এর ১ জানুয়ারী দলের বাংলা কমিটির মুখপত্র *স্বাধীনতা*-য় প্রকাশিত 'ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বাংলার জন্য সংগ্রাম' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ-বিষয়ে পার্টির বক্তব্য পরিস্ফুট হয়। ঐ বৎসরই অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচনগুলির আগে প্রকাশিত পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহারে বলা হয় ঃ

> The Communist Party stands for a united and free Bengal in a free India. Bengal as the common homeland of the Bengali Mushims and Hindus should be free to exercise its right of selt-determination through a soverign constituent assembly based on admit franchise and to define its relations with the rest of India.[২০]

কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি.সি. জোশী রচিত *For the Final Bid for Power* নামাঙ্কিত দলিলেও জাতিপ্রশ্নে পার্টির অবস্থানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থিত করে স্বাধীন ভারতে বাংলা সহ সতেরোটি স্বাধীন একক গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। সংবিধান সভায় একমাত্র কমিউনিস্ট সদস্য সোমনাথ লাহিড়ীর উত্থাপিত খসড়া প্রস্তাব এবং ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশনের নিকট প্রদত্ত স্মারকলিপিতেও পার্টির এই বক্তব্য পরিস্ফুট হয়েছে। সংবিধান সভায় লাহিড়ীর বক্তব্যেও 'ভারতের অপরাপর অংশের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা'-র কথা বিভিন্নভাবে এসেছে।[২১] তবে, এই দলিল গুলিতে সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষাপটেই 'স্বাধীন বাংলা' সম্পর্কে পার্টির বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে।

স্বাভাবিক ভাবেই পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা' সম্পর্কে অধিকতর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপিত করেছে। ১৯৪৫-এর ডিসেম্বরে পার্টির বাংলা কমিটির তৎকালীন সম্পাদক ভবানী সেন *মুক্তির পথে বাংলা* শীর্ষক এক পুস্তিকা রচনা করেন, পরবর্তী সময়ে তা *Nutan Bangla : Plan for a Free and Happy Bengal* শিরোনামে ইংরেজীতেও প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি লেখেন ঃ

> The East and the West Bengal, the Hindus and the Muslims – the interests and the fortunes of both are so intertwined that

> the growth and the well being of the one can not be considered, leaving out the other. Together their destiny has to be moulded, and together they shall have to build Bengal anew.[২২]

তাই, তিনি দাবি জানান ঃ

> We, therefore, demand that the entire *Bangabhumi* extending from the borders of Behar to the frontiers of Asam may unite. The people of this greater Bengal must have the right to vote, and with their votes, let the constituent assembly be called for Bengal. In accordance with the verdict of the constituent assembly decide whether Bengal must go into Pakistan, or remain separate or independent, or voluntarily join the Indian Union as a self-government state.[২৩]

১৯৪৬-এ প্রাদেশিক নির্বাচনের আগে পার্টির বাংলা কমিটি প্রচারিত ইস্তাহারে "সমগ্র বাংলাদেশ অখন্ড থাকুক, ইহা মুসলমানেরও দাবি, হিন্দুরও দাবি -" একথা উচ্চারণ করে শুধু 'স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ বাংলা'-ই নয়, এক বৃহত্তর বাংলারও রূপকল্প অঙ্কন করা হয়েছে। ইস্তাহারে "বিহারের প্রান্ত হইতে আসামের প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গভূমিকে একতাবদ্ধ" করার কথা বলা হয়েছে। এতে সকল বাঙালীকে আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, "সাম্রাজ্যবাদ আজ বাংলার অস্তিত্ব লোপের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে, সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলার সর্বসাধারণ আজ এক হউক।[২৪]

১৯৪৭-এ যখন বঙ্গ-বিভাজনের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে; হিন্দু-মহাসভা ও জাতীয় কংগ্রেস তার সপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে প্রচারাভিযানে নেমে পড়েছে; কমিউনিস্ট পার্টি তখন ভারতবিভাগ ও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করেছে। ৯ এপ্রিল, ১৯৪৭-এর *স্বাধীনতা* পত্রিকায় "ভারত বিভাগ এবং বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিব কেন?"- এই শিরোনামে পার্টি বিস্তারিত ব্যাখায় নিজ অবস্থান পরিস্ফুট করে। পার্টি আশংকা প্রচার করে যে, বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হলে ভারতে ব্রিটিশ ফৌজ, ব্রিটিশ মূলধন ও ভারতবাসীর গোলামী স্থায়ী হবে; হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্য কলঙ্কিত হবে; শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন দুর্বল হবে ও জোতদার ও মালিকদের শোষণ তীব্র হবে; এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে তা আরো ব্যাপক আকার ধারণ করবে। তাই, "স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ বাংলার জন্য আওয়াজ" তুলতে পার্টি সকলকে আহ্বান জানায়।[২৫]

এই সময়ে শরৎ বসু- আবুল হাশিম - সোহরাবর্দি প্রমুখের 'স্বাধীন বাংলা' আন্দোলনের প্রতি পার্টি সহমত পোষণ করে, যদিও সোহরাবর্দির 'বৃহত্তর বঙ্গ'-এর ধারণার সঙ্গে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল। এ-বিষয়ে নিজেদের পার্থক্য তুলে ধরে পরের দিনই

স্বাধীনতা পত্রিকায় লেখা হয় ঃ "বঙ্গভঙ্গ চাই না, সোহরাবর্দি সাহেবের 'বৃহত্তর বঙ্গ' ও চাই না।" নিজেদের দাবিকে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয় ঃ

আমাদের দাবি,

(১) স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ বাংলা।

(২) বাংলাদেশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিবে কি দিবে না, সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক বাঙালীর ভোটে তাহার মীমাংসা।

(৩) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার, যুক্ত নির্বাচনী ব্যবস্থা ও আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব।

(৪) জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ও ব্রিটিশ মূলধন বাজেয়াপ্ত করার কার্যক্রমের ভিত্তিতে এখনই কোয়ালিশন করকার গঠন।[২৬]

এই সময়ে বঙ্গবিভাজনের দাবিকে জোরদার করতে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন পৌরসভা ও বার অ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রস্তাব গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কমিউনিস্টরা অখন্ড বাংলার পক্ষে বিকল্প প্রস্তাব রাখেন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠতার কারণে সেগুলি নাকচ হয়ে যায়। বর্ধমান পৌরসভায় ১৮ এপ্রিল, ১৯৪৭ এরূপ একটি বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করেন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা সৈয়দ শাহেদুল্লাহ এবং তা সমর্থন করেন সন্তোষ খাঁ। ফরওয়ার্ড ব্লক সদস্য অজিত রায়ও এই বিকল্প প্রস্তাব সমর্থন করেন। ১১-৪ ভোটে প্রস্তাবটি বাতিল হয়।[২৭]

১৯৪৭-এর মে মাসে কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাব ব্যাখ্যা করে ভবানী সেন *বঙ্গভঙ্গ ও পাকিস্তান* -শিরোনামে একটি পুস্তিকা লেখেন। এতে ভারত বিভাগ ও বঙ্গভঙ্গকে 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দুরভিসন্ধি' আখ্যা দিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে যে, "ভারত বিভাগ ও বঙ্গভঙ্গ ধ্বনি স্বাধীনতার ধ্বনি নয়, ইহা হতাশা, বিক্ষোভ ও মৃত্যুর আলিঙ্গন।" বঙ্গভঙ্গে কিভাবে বাঙালী জাতির ধ্বংস ও মজুর কৃষকের সর্বনাশ ঘটিতে পারে এবং তা কিভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থামানোর পরিবর্তে বাড়িয়ে তুলতে পারে তার সবিস্তার আলোচনা করে এখানে 'স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলা'-কেই সমাধান সূত্র হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছে। সোহরাবর্দির 'বৃহত্তর বঙ্গ'-এর ধারণা সীমাবদ্ধতাগুলির উল্লেখ করে পুস্তিকাটিতে 'পূর্ণবঙ্গে'-এর ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ "ব্রিটিশ শাসন বঙ্গভূমিকে বিভক্ত করিয়া বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ঢুকাইয়া দিয়াছে। বাঙালী জাতিকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী করিতে হইলে এই সমগ্র বঙ্গভূমিকেই ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে।" উল্লেখ্য যে, পুস্তিকায় ভারতীয় ঐক্যের উপর ও সবিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মন্তব্য করা হয়েছে যে, "স্বাধীন ভারতেই স্বাধীন বাংলা সম্ভব।"[২৮]

এই পুস্তিকা যখন প্রকাশিত হতে চলেছে, সে সময়েই গান্ধীজিব উপস্থিতিতে শরৎ বসু প্রমুখ কংগ্রেস নেতা এবং আবুল হাশিম ও সোহরাবর্দি প্রমুখ লীগ নেতাদের 'স্বাধীন বাংলা' সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা চলছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি.সি. জোশী এবং বাংলা কমিটির সম্পাদক ভবানী সেন ঐই আলোচনাকে স্বাগত জানিয়ে এক যুক্তবিবৃতি দেন। এতে বলা হয় যে, "ঐক্যবদ্ধ বাংলা সম্বন্ধে সংবাদপত্রে প্রকাশিত আলোচনা সাফল্যলাভ করিবে যদি উভয় পক্ষের নেতারা কমপক্ষে এই কয়টি বিষয়ে একমত হন : সার্বজনীন ভোট, যুক্ত নির্বাচন প্রথা, জমিদারী প্রথার অবদান, বিদেশী মূলধনকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা, ভারতের সঙ্গে এই বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্ক স্থির করিবার জন্য গণভোট. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংযুক্তফ্রন্ট বা মোর্চা এবং অবিলম্বে সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠন।" বিবৃতিতে এই আলোচনার সাফল্য কামনা করা হয়।[২৯]

কেবলমাত্র প্রস্তাব গ্রহণ, পুস্তিকা প্রকাশ বা বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমেই নয়; কমিউনিস্ট পার্টি এই সময়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলার দাবিতে মাঠে-ময়দানে আন্দোলন গড়ে তুলতেও উদ্যোগী হয়ে ওঠে। 'ভাইয়ে ভাইয়ে লড়ব না', 'দাঙ্গা করে মরব না', 'বাংলা ভাগ করব না' — ইত্যাদি আওয়াজ তুলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে সংগঠিত করে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে পার্টি জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। অমলেন্দু সেনগুপ্ত লিখেছেন : "কমিউনিস্ট পার্টি - শরৎচন্দ্র বসু - সোহরাবর্দির মিলিত উদ্যোগে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার অভিযান শুরু হয়। ক্রমশ বিভিন্ন মহলের মানুষ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে।[৩০] সেই সময়ের পত্র-পত্রিকায়, বিশেষত *স্বাধীনতা*-র পাতায় এরূপ অসংখ্য সমাবেশের বিবরণী রয়েছে। সেনগুপ্ত তাঁর গ্রন্থে এরূপ বেশ কিছু উদাহরণ সন্নিবিষ্ট করেছেন। এতদসত্ত্বেও শেষরক্ষা হয়নি। ২০ জুন '৪৭, অবিভক্ত বাংলার আইনসভায় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব পাশ হওয়ার পরেই বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম অংশের বিধায়কগণ পৃথক পৃথক সভায় কার্যত বিভাজনের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন। কমিউনিস্ট পার্টিও উপায়ান্তর না দেখে হতাশ হয়ে বঙ্গ-বিভাজনের এই বাস্তবতা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

ভাবত-ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন বাংলার এই আন্দোলন এবং এক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হলেও নানাকারণে তা অপেক্ষাকৃত অনালোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সমকালে তা উপেক্ষিত হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ বোধ করি এই যে, তৎকালীন ভারতের এবং অবশ্যই বাংলার ও দুঃসহ সাম্প্রদায়িক বাতাবরণে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস মানুষের স্থৈর্য্য ও বিচার বুদ্ধিকে অনেকটাই আচ্ছন্ন করতে সমর্থ হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে বাড়তি

পাওনা! ছিল জাতিপ্রশ্নে তার অবস্থানকে ঘিরে নানা বিভ্রান্তি, যা তাকে কার্যত পাকিস্তানের দাবির সমর্থক হিসাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলো, যদিও প্রকৃত বিচারে তা পুরোপুরি ঠিক নয়। রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে পার্টির শক্তির সীমাবদ্ধতা মনে রেখে বলতে হয় যে, ইতিহাসের গতিপথ নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতাই তার ছিল না এবং দেশের মূল রাজনৈতিক শক্তিসমূহের সক্রিয় বিরোধিতা এই আন্দোলনকে সহজেই ব্যর্থ করে দেয়। এই উপমহাদেশে পরবর্তী সময়ের ঘটনাপ্রবাহ বঙ্গ-বিভাজন তথা দেশভাগের নেতিবাচক দিকগুলিকে প্রকটিত করায় সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে গবেষণা ও আলাপ-আলোচনার প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হলেও যুক্তবঙ্গের আন্দোলন এবং বিশেষত এ-বিষয়ে কমিউনিস্টদের ভূমিকা নিয়ে সবিশেষ আলোচনা হয়নি।[৩১] এমন কি কমিউনিস্ট পার্টিও বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী সময়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করেনি। ঐতিহাসিকদের কাছে ও বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে। ফলত সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরণের বিভ্রান্তি। এতদসত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিভাগ পূর্বভারতে যুক্তবঙ্গের আন্দোলন একটি ব্যর্থ প্রয়াস হিসাবে চিহ্নিত হলেও এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং একইসঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলনে এটি একটি সংক্ষিপ্ত অথচ উজ্বল অধ্যায়।

সূত্রনির্দেশ

১। বর্তমান নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে ভারতের জাতিপ্রশ্নে কমিউনিস্টপার্টির অবস্থান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়নি। *বিশদ আলোচনার জন্য লেখকের অপর দুটি নিবন্ধঃ* "জাতিপ্রশ্ন, মার্কসবাদ ও ভারতবর্ষঃ একটি তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট", *সমাজ জিজ্ঞাসা*, ২য় বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, ১৯৯৭ (বিদ্যাসাগর সমাজবিজ্ঞান কেন্দ্র, মেদিনীপুর) এবং "ভারতে জাতিসত্তার প্রশ্ন ঃ কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গীর ক্রমবিকাশ", *ইতিহাস অনুসন্ধান*, চতুর্দশ খন্ড, ফার্মা কে.এল.এম., কলকাতা, ২০০০, *দ্রষ্টব্য*।

২। Gangadhar Adhikari, "National Unity Now" in *Peoples War,* August 8, 1942. Adhikari (ed) *Pakistan and National Unity – The Communist Solution,* Peoples Publishing House, Bombay, 1943 [Also reprinted in T.G. Jacob (ed) *National question in India : CPI Documents, 1942-47,* Odyssey Press, New Delhi, 1988, pp. 16-28; Jyoti Basu et.al. (eds) *Documents of the Communist Movement in India,* Vol. IV, National Book Agency, Calcutta, 1997, pp. 450-462.

৩। Report by Adhikari in the Enlarged Plenum of the Central Committee of the Communist Party of India in September, 1942, Adhikari (ed) *op.cit;* Jacob (ed), *op cit.* pp. 33-71; Basu (ed), *op.cit* pp. 464-505.

৪। "On Pakistan and National Unity", Resolution passed by the Enlarged Plenum and confirmed by the First Congress of the CPI in May, 1943;

Adhikari (ed) *op.cit,* p. 15: Jacob (ed), *op.cit,* pp. 30-31, Basu (ed) op.cit pp. 462-64.

৫। The Statesman, 21 May, 1947; Sarat Chandra Basu, *I warned my countrymen*, Netaji Research Bureau, Calcutta, 1968, pp. 183-90 [Also see, Amalendu De, *Islam in Modern India,* Maya Prakashan, Calcutta, 1982, pp. 231-33].

৬। De, *Ibid*, pp. 232-33.

৭। সত্যব্রত দত্ত, *বাংলার বিধানসভার একশো বছরঃ রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র*, প্রগেসিভ পাবলিসার্স, কলকাতা, ২০০২, পৃঃ ১৯০।

৮। De, op.cit, p. 235.

৯। দত্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৯০।

১০। *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৯০-৯১।

১১। Sumit Sarkar, *Modern India,* p. 449 [অমলেন্দু সেনগুপ্ত, *উত্তাল চল্লিশঃ অসমাপ্ত বিপ্লব*, পার্ল পাবলিসার্স, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ২২৩-এ অনুদিত ও উদ্ধৃত]।

১২। দত্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৮৭-৯০।

১৩। Nirmal Kumar Bose, *My Days With Gandhi,* p. 227 [সেনগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২২৩-এ অনুদিত ও উদ্বৃত।]

১৪। সেনগুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২২৪।

১৫। দত্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৯১।

১৬। দলিলের বয়ানের জন্য দেখুন ঃ *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২২৬-২৭; Bose, *op.cit* pp. 186-87; বঙ্গানুবাদের জন্য ঃ দত্ত *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৯২-৯৩; সুনীতি কুমার ঘোষ, *বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি রাজনীতি*, নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ২০০১, পৃঃ ২৮৫-৮৬।

১৭। দত্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৯৩-৯৪।

১৮। ঘটনাপ্রবাহের বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন ঃ Joya Chatterjee, *Bengal Divided : Hindu Communalism and Partition,* Cambridge University Press, 1995; Musfirul Hassan (ed) *Indias Partition : Process, Strategy and Mobilisation,* Oxford University Press, New Delhi, 1993; Shila Sen, Muslim Politics in Bengal (1937-47), Impex India, New Delhi, 1976; Leonard Gordon, *Brothers Against the Raj.*, Viking, New Delhi, 1990; Amalendu De, *op. cit;* অমলেন্দু দে, *স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা ঃ প্রয়াস ও পরিণতি*, রত্না প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৫; কালীপদ বিশ্বাস, *যুক্তবাংলার শেষ অধ্যায়*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৬৬; সুনীতি কুমার ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, ইত্যাদি।

১৯। ইতিহাস অনুসন্ধান, চতুর্দশ খন্ডে প্রকাশিত লেখকের পূর্বোক্ত নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২০। C.P.I., "Election Manifesto", *Peoples Age,* January 6, 1946 [Also see, Appendix to the *For The Final Bid for Power...*]

২১। P.C. Joshi, *For the Final Bid For Power : Freedom Programme of the*

Indian Communists The Communist Plan Explained, Peoples Publishing House, Bombay, nd. [1946(?)] Reprinted in Jacob, *op.cit,* pp. 241-325; CPI, "Draft Resolution for the Constituent Assembly", *Peoples Age,* 15 December, 1946, Jacob, *op cit,* pp. 229-34; CPI, "Memorandum of the Communist Party of India to the British Cabinet Mission", People Age, April 21, 1946; Jacob, *op.cit,* pp, 235-40 [These two documents were published as a pamphlet entitled : *Decleration of Independence : Community Party Resolution for the Constituent Assembly,* Peoples Publishing House, Bombay, 1946] Somenath Lahiri, "Lahiris speech to the Constituent Assembly", *Peoples Age,* 29 December, 1946 (Also see, Lahiri, *Collected Works,* Vol. II, Manisha, Calcutta, 1986, pp. 70-91)

২২। Bhawani Sen, *Nutan Bangla Plan for a Free and Happy Bengal,* CPI, Bengal Committee, February, 1946, p-53.

২৩। Ibid, p. 64.

২৪। *সংগ্রামের পথে বাংলা...*, ভারতের কমিউনিস্টপার্টি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি, ১৯৪৬ [অনিল বিশ্বাস (সম্পাঃ) *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন ঃ দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য,* প্রথম খন্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০০২, পৃঃ ৩৩৬-৩৯]

২৫। *স্বাধীনতা*, ৯ এপ্রিল, ১৯৪৭ [সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত-তে উদ্ধৃত, পৃঃ ২২৯]

২৬। *স্বাধীনতা*, ১০ এপ্রিল, ১৯৪৭ [জ্যোতি বসু, *জনগণের সঙ্গে*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ৬৩-তে উদ্ধৃত]

২৭। সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, *বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ*, নূতন চিঠি প্রকাশনা, বর্ধমান, ১৯৯১, পৃঃ ২০৮-৯ এবং ৪০১-৩ [বিকল্প প্রস্তাব সহ মূল প্রস্তাবের বয়ান এখানে উদ্ধৃত হয়েছে।]

২৮। ভবানী সেন, *বঙ্গভঙ্গ ও পাকিস্তান*, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি, কলকাতা, মে, ১৯৪৭ [অনিল বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৯৮-৪২২]

২৯। বিবৃতিটি পূর্বোক্ত পুস্তিকার 'পরিশিষ্ট' হিসাবে সংশোধিত হয়েছে [বিশ্বাস *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৪২১-২২]

৩০। সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩১।

৩১। উল্লেখ্য যে, অত্র নিবন্ধে নির্দেশিত রচনাবলী ছাড়াও যুক্তবঙ্গের প্রয়াস সম্পর্কিত আলোচনা আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু সেগুলির অধিকাংশেই কমিউনিস্টপার্টির ভূমিকা উপেক্ষিত হয়েছে। যেমন, Partha Chatterjee, "*The Second Partition of Bengal*", *The Present History of West Bengal*, Oxford University Press, Delhi, 1997, Pravash Chandra Ray, "Communal Harmony and the Idea of United Independent Bengal" in The *West Bengal Political Science Review*, III (1) January-June, 2000; ইত্যাদি। এ-দিক থেকে অমিতাভ চন্দ্রের নিবন্ধ, " 'স্বাধীন বঙ্গ' পরিকল্পনা ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি", *ইতিহাস অনুসন্ধান*, ত্রয়োদশ খন্ড, ফার্মা কে.এল.এম, কলকাতা, ১৯৯৯ পৃঃ ৪৬৯-৮৪ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চাশের দশকের কমিউনিস্ট আন্দোলন ঃ প্রতিবাদী রাজনীতির এক দশক

অমিতাভ চন্দ্র

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের সূত্রপাত ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ও কমিউনিস্ট রাজনীতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ জলবিভাজিকা। এই পঞ্চাশের দশকের সূত্রপাতের সঙ্গেই ভারতের কমিউনিস্ট রাজনীতি এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় ঘুরেছিল, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির লাইনে ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে এসেছিল এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। দেশজোড়া 'বৈপ্লবিক সশস্ত্র অভুত্থান'-এর এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের লাইন পরিবর্তন করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পঞ্চাশের দশকের সূচনাতেই গ্রহণ করেছিল সাংবিধানিক পথ, সাংবিধানিক লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম বা অগ্রাহ্য বা অস্বীকার না করে আন্দোলনের পথ, সাংবিধানিক সীমারেখার মধ্যে থেকেই ও আন্দোলন করে শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের লাইন। সুতরাং বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকের সূচনা ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ও কমিউনিস্ট রাজনীতির ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সন্ধিক্ষণ।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান চালু হয়েছিল। ১৯৫০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা হাইকোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে ঘোষণা করল, ব্রিটিশ শাসকদের রচিত ও প্রযুক্ত যে বঙ্গীয় ফৌজদারি বিধি সংশোধন আইন বলে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছিল, তা সংবিধান - বিরোধী। হাইকোর্টের এই রায়ে কমিউনিস্ট পার্টি আবার বৈধ ঘোষিত হল। কিন্তু বৈধ ঘোষিত হবার পরই সমস্ত কমিউনিস্ট রাজনৈতিক বন্দীকে একসঙ্গে এবং অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হয়নি। বরং হাইকোর্টের রায়ে কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিক ভাবে বৈধ ঘোষিত হওয়ার পরও পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের নির্দেশে এই রাজ্যে নিয়মিত কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার ও আটক করা হতে থাকে। এমনকি পরবর্তী এক বছরের মধ্যেও অনেক কমিউনিস্টের ওপর থেকে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা প্রত্যাহার করা হয়নি। তবে হাইকোর্টের রায়ে বেশ কিছু সংখ্যক কমিউনিস্টের মুক্তি সেই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি নিষেধাজ্ঞার প্রত্যাহার দিয়ে ১৯৫১ সালের শুরু। ১৯৫১ সালের ৫ জানুয়ারি নিষেধাজ্ঞামুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য আবির্ভাব ঘটল জনজীবনে

— সম্পূর্ণ অবসান ঘটল কমিউনিস্ট পার্টির বে-আইনী যুগের। এর পেছনে ছিল হাইকোর্টের এক গুরুত্বপূর্ণ রায়। সেই গুরুত্বপূর্ণ রায়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে অবৈধ ঘোষণা করাকে বে-আইনী বলল হাইকোর্ট। তারিখটা ছিল ৫ জানুয়ারি ১৯৫১। কমিউনিস্ট পার্টির বে-আইনী যুগের সম্পূর্ণ অবসানে ক্ষমতা হস্তান্তর পরবর্তী স্বাধীন ভারতে আবার শুরু হল নিষেধাজ্ঞামুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য কাজকর্ম।

জওহরলাল নেহ্‌রু সরকার ঘোষিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৫১ সালের মে মাসে আবার পার্টি নেতৃত্বে ও লাইনে পরিবর্তন ঘটল। সি রাজেশ্বর রাও - এর জায়গায় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে এলেন অজয়কুমার ঘোষ। সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি আবার সাংবিধানিক পথে ফিরে এল। আবার শুরু হল 'সাংবিধানিক কমিউনিজম'-এর।[১]

অসাফল্যের মধ্য দিয়েই ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ কালপর্বের কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লব প্রয়াসের পরিসমাপ্তি ঘটলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, স্বাধীন ভারতে প্রতিবাদী রাজনীতির সূত্রপাত ঘটেছিল তৎকালে কমিউনিস্ট পার্টির হাত ধরেই। কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন রাজনীতিই বেঁধে দিয়েছিল স্বাধীন ভারতে প্রতিবাদী রাজনীতির সুর। পরবর্তীকালে প্রতিবাদী রাজনীতির এবং জনগণের দাবিদাওয়া নিয়ে ব্যাপক গণ আন্দোলনের পথও নিঃসন্দেহে প্রস্তুত করে দিয়েছিল সদ্য স্বাধীন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রামী রাজনীতি। পঞ্চাশের দশকের কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপ ধরে আসা স্বাধীনতা উত্তর ভারতে প্রথম দশকের প্রতিবাদী রাজনীতিই নিজেকে প্রকাশিত করেছিল।

বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে বিভিন্ন কারণেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। পঞ্চাশের দশকে একদিকে নতুন করে এবং শিকড় বিস্তার করে, প্রায় স্থায়ী ভাবে 'সাংবিধানিক কমিউনিজম'-এর সূত্রপাত ঘটল। আর অপরদিকে পঞ্চাশের দশকে দেখা গেল দুর্বার গণ আন্দোলনের জোয়ার, যার প্রতিটিতেই অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব ছিল কমিউনিস্ট পার্টির। আবার ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিখণ্ডিত হলেও পার্টি ভাঙ্গনের বীজ কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে রোপিত হয়েছিল পঞ্চাশের দশকেই — পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকেই পার্টি বিভাজনের প্রক্রিয়ার সূত্রপাত। সুতরাং নানাবিধ কারণেই ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের গুরুত্ব।

বর্তমান নিবন্ধে আলোচ্য কালপর্বে কমিউনিস্ট পার্টির এবং অন্যান্য অকমিউনিস্ট বামপন্থী শক্তি সমূহের যৌথ অংশগ্রহণের মাধ্যমে ও যৌথ নেতৃত্বেই পরিচালিত হত উত্তাল গণ আন্দোলনগুলি এবং এর প্রতিটিতেই এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করত কমিউনিস্ট

পার্টি। আর এই গণ আন্দোলনগুলি থেকেই কমিউনিস্ট আন্দোলন সংগ্রহ করে নিত তার বিকাশের প্রয়োজনীয় রসদ। গতি সঞ্চারিত হত কমিউনিস্ট আন্দোলনে, শক্তি বৃদ্ধি ঘটত কমিউনিস্ট পার্টির। এই গণ আন্দোলনগুলি থেকে শুধু যে কমিউনিস্ট পার্টি শক্তি সঞ্চয় করত, তা নয়, অংশগ্রহণ ও যৌথ নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে অন্যান্য অকমিউনিস্ট বামপন্থী শক্তিসমূহও এই গণ আন্দোলনগুলি থেকে তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় করত। ফলে সংসদীয় পথ এবং সংসদের বাইরে গণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদান — উভয়ের সংমিশ্রণে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল কমিউনিস্ট পার্টি।[২]

বর্তমান নিবন্ধে পঞ্চাশের দশকের এই গণ আন্দোলনগুলির বিস্তারিত বিবরণ ও আলোচনায় প্রবেশ করার কোনও অবকাশ নেই। আলোচ্য দশকে কমিউনিস্ট পার্টির অংশগ্রহণে ও নেতৃত্বে যে গণ আন্দোলনগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেইগুলির শুধুমাত্র উল্লেখ ও নিতান্তই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে পঞ্চাশের দশকের প্রতিবাদী রাজনীতির চরিত্রটিকে ধরার ও বোঝার এক প্রয়াস এখানে গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯৫১ সালের ২১ এপ্রিল ও ২২ এপ্রিল দুদিন কোচবিহার শহরে পাঁচ হাজার মানুষের এক ভুখা মিছিলের ওপর পুলিসের বেপরোয়া লাঠি চার্জ ও গুলি চালনায় ৫ জন নিহত এবং অন্তত ৪০ জন আহত হন। কমিউনিস্ট পার্টি সহ সমগ্র কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থী শক্তির তরফেই কোচবিহার শহরের এই ভুখা মিছিলের ওপর পুলিসের বেপরোয়া লাঠি চার্জ ও গুলি চালনার বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত জাগ্রত করার প্রয়াস গ্রহণ করা হল, দাবি করা হল কোচবিহার হত্যার ঘটনাবলীর বেসরকারি ও বিচারবিভাগীয় তদন্ত এবং দুর্ভিক্ষ-সৃষ্টিকারী ও হত্যাকারীদের ব্যাপক বিচার।

১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে কংগ্রেস সরকারের অনুমোদন সহ কলকাতার তৎকালীন ব্রিটিশ ট্রাম কোম্পানি কর্তৃক ট্রাম ভাড়া এক পয়সা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি সহ সব বামপন্থী দলগুলির যৌথ নেতৃত্বে সারা কলকাতায় ও হাওড়ায় তীব্র, ব্যাপক, ধারাবাহিক ও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন হয়েছিল। আন্দোলন চলেছিল এক মাস। আন্দোলন দমনের জন্য কংগ্রেস সরকার এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল সারা কলকাতায়।

দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছিল ভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন। শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল সরকার। প্রত্যাহৃত হয়েছিল এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি। বসেছিল তদন্ত কমিশন। মুক্তি পেয়েছিলেন আন্দোলনে জড়িত বন্দীরা। ফলে প্রত্যাহৃত হয়েছিল আন্দোলন।

১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্মরণীয় শিক্ষক আন্দোলন। এই মাসে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ডাকে কয়েকটি আশু ও জরুরি দাবির সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গের ১৮ হাজার মাধ্যমিক শিক্ষক গ্রহণ করেছিলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রাস্তা।

এটাই ছিল স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের দাবি আদায়ের জন্য প্রথম ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন।

এই আন্দোলন ক্রমশ ব্যাপক রূপ গ্রহণ করতে থাকে। সমর্থন এসেছিল কমিউনিস্ট পার্টি সহ বামপন্থী শক্তিসমূহের কাছ থেকে, নেতৃত্বও দিয়েছিলেন তাঁরাই।

এই আন্দোলনের ওপরও নেমে এসেছিল পুলিসি দমন - নিপীড়ন ও সন্ত্রাস। কিন্তু আন্দোলন ছিল অব্যাহত।

সবগুলি দাবি আদায় করতে সক্ষম না হলেও বেশ কিছু দাবি সরকারের অনিচ্ছুক হাত থেকে আদায় করতে সমর্থ হওয়ার মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটল ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাধ্যমিক শিক্ষকদের এই গৌরবোজ্জ্বল আন্দোলনের। মুক্তি পেলেন বন্দী শিক্ষক - শিক্ষিকারা এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য বন্দীরা।

১৯৫৫ সালে শুরু হল গোয়ায় পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে গোয়া মুক্তি আন্দোলন। পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই গোয়া মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন সব রাজনৈতিক শক্তিই। উৎসাহী ও সক্রিয় সমর্থন এসেছিল কমিউনিস্ট পার্টি সহ বামপন্থী শক্তিসমূহের কাছ থেকে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করা হয়েছিল।

গোয়া মুক্তি আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল ব্যাপকভাবে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় গোয়ার মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে পালিত হয়েছিল ছাত্র ধর্মঘট ও শ্রমিক ধর্মঘট।

সারা বছরই চলেছিল গোয়া মুক্তি আন্দোলন এবং তার সমর্থনে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংহতি আন্দোলন। গোয়া অবশ্য তখনই মুক্ত হয়নি। পরবর্তী কালে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার বাধ্য হয়ে সামরিক বাহিনী পাঠিয়ে গোয়াকে মুক্ত করেছিল।

১৯৫৬ সালের ২৩ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার এই দুইটি রাজ্যকে যুক্ত করে পূর্ব প্রদেশ নামে একটিমাত্র রাজ্য গঠন করার প্রস্তাব দিয়ে একটি যুক্ত বিবৃতি দিয়েছিলেন। এই সংযুক্তিকরণের প্রয়াসের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সর্ব স্তরের মানুষ। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহা, খ্যাতনামা আইনজীবী অতুল গুপ্ত সহ বহু বিশিষ্ট ও বিদগ্ধ দেশপ্রেমিক ব্যক্তিত্বও এই সংযুক্তিকরণ বিরোধী আন্দোলনে গ্রহণ করেছিলেন মুখ্য ভূমিকা। কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য অ-কমিউনিস্ট বামপন্থী শক্তি যৌথভাবে এই সংযুক্তিকরণ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদান করেছিল। ব্যাপক রূপ গ্রহণ করেছিল এই সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন। বিক্ষোভে

ফেটে পড়েছিল সারা পশ্চিমবঙ্গ। শেষ পর্যন্ত গণআন্দোলনের চাপে সংযুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়েছিল।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুযায়ী সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সারা দেশে ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে লোকসভা ও বিধানসভাগুলির প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসের গোড়ায় কয়েক দফায় সারা ভারতে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নির্বাচন হয়েছিল লোকসভায় এবং পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল সহ বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায়। এই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সম্ভব না হলেও কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হল কেরলে।

১৯৫৭ সালের নির্বাচনে জিতে কেরলে ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল কমিউনিস্ট সরকার। এই প্রথম ভারতের একটি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হল কমিউনিস্ট সরকার, যার মুখ্যমন্ত্রী হলেন নাম্বুদ্রিপাদ। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেই ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ ভূমি সংস্কার, ভূমিতে কৃষকদের স্থায়ী স্বত্বদান, কৃষিশিল্পের উন্নয়ন হওয়া প্রভৃতি ১৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। আরও ঘোষণা করা হল, কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ভাঙ্গতে পুলিসকে ব্যবহার করা হবে না।

নানা গণ আন্দোলনের ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হল ১৯৫৭ থেকে পরবর্তী দুই বছর। এই গণ আন্দোলনগুলিতে যৌথ অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব ছিল কমিউনিস্ট পার্টির এবং অ-কমিউনিস্ট বামপন্থী শক্তিসমূহের।

এল ঘটনাবহুল ১৯৫৯ সাল। ১৯৫৯ সালের ৩১ জুলাই সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বাধীন কেরলের প্রথম কমিউনিস্ট সরকারকে অপসারিত করা হল। সংবিধানের ৩৫৬ নং ধারা প্রয়োগ করে নাম্বুদ্রিপাদ সরকারকে বরখাস্ত করে কেরলে জারি করা হল রাষ্ট্রপতির শাসন, ভেঙ্গে দেওয়া হল রাজ্য বিধানসভা। কেরল সরকারকে অপসারিত করার জন্য যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত করা হয়েছিল, তার প্রধান হোতা ছিলেন তৎকালীন কংগ্রেস সভানেত্রী ইন্দিরা গান্ধী। কেরলে নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট সরকারকে অপসারিত করার জন্য সমস্ত ধরণের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইন্দিরা গান্ধী শুরু করেছিলেন বিমোচন আন্দোলন, যার পরিণতিতে বরখাস্ত হয়েছিল এই সরকার।

সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে কেরল সরকারকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল সারা পশ্চিমবঙ্গ। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেই প্রতিবাদে গলা মিলিয়েছিল অন্যান্য বামপন্থী শক্তিসমূহ, প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বামপন্থী - অবামপন্থী নির্বিশেষে গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজন।

১৯৫৯ সালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন। এই খাদ্য আন্দোলন যৌথ ভাবে পরিচালনা করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য অ-কমিউনিস্ট বামপন্থী শক্তিসমূহ।

১৯৫৯ সালের জুন মাস থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল এই খাদ্য আন্দোলন। ক্রমশ এই আন্দোলন ব্যাপক রূপ ধারণ করতে থাকে। ১৯৫৯ সালের অগস্ট মাসে আন্দোলন তুঙ্গে গিয়ে পৌঁছয়।

১৯৫৯ সালের ৩১ অগস্ট খাদ্যমন্ত্রীর অপসারণ ও খাদ্যের দাবিতে এবং পুলিসি দমন নীতির প্রতিবাদে তৎকালীন অক্টার্লোনি মনুমেন্ট (বর্তমানে শহিদ মিনার) ময়দানে ৩ লক্ষ নরনারীর এক বিশাল জমায়েত অনুষ্ঠিত হল। মহাকরণ অভিমুখে অভিযানের ওপর চলল পুলিসের গুলি। সহস্রাধিক মানুষ পুলিসি তান্ডবে আহত হলেন, নিহত হলেন কয়েকজন। পুলিসি তান্ডব অব্যাহত রইল ১ সেপ্টেম্বরও। কলকাতার বিভিন্ন স্থানে পুলিসের বেপরোয়া গুলি চালনার ফলে ৮ জন নিহত এবং বহু লোক আহত হলেন।

আন্দোলন কিন্তু চলতেই থাকল। যৌথ বিবৃতিতে কমিউনিস্ট পার্টি সহ বামপন্থী দলগুলি ঘোষণা করল, পুলিসের দমন - নিপীড়ন এবং সন্ত্রাস সত্ত্বেও পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী খাদ্য আন্দোলন চলছে এবং চলবে।

শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার খাদ্য আন্দোলনের কয়েকটি দাবি মেনে নিল। মুক্তি পেলেন কারারুদ্ধ বন্দীরা এবং প্রত্যাহৃত হল গ্রেপ্তারি পরওয়ানাগুলি।

১৯৫৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর কলকাতার তৎকালীন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমানে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) কমিউনিস্ট পার্টি সহ বিভিন্ন বামপন্থী দলের যৌথ উদ্যোগে পুলিসি দমন - পীড়ন - সন্ত্রাসের শিকার খাদ্য আন্দোলনের শহিদদের স্মরণস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল; কমিউনিস্ট পার্টি সহ সব বামপন্থী দল যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, প্রতি বছর ৩১ অগস্ট শহিদ দিবস হিসাবে পালিত হবে। সেই থেকে প্রতি বছরই ৩১ অগস্ট শহিদ দিবস হিসাবে পালিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রতিবাদী গণ আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত, তা স্বীয় অঙ্গে ধারণ করে আছে প্রতিবাদী রাজনীতিকে। আবার পরবর্তী কালে ষাটের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজনের প্রক্রিয়াটির সূত্রপাত আমাদের আলোচ্য পঞ্চাশের দশকেই। ১৯৬৪ সালে সংঘটিত হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম বড় বিভাজন। দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হলেও পার্টি ভাঙ্গনের বীজ কমিউনিস্ট পার্টির

মধ্যে নিহিত ছিল পঞ্চাশের দশকেই। প্রসঙ্গটির সূত্রপাত সেই কারণে পঞ্চাশের দশক থেকেই।

পঞ্চাশের দশকে ভারতে ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি অবস্থিত থাকলেও তা ছিল নেহাতই আনুষ্ঠানিক ঐক্যবদ্ধতা। পার্টির মধ্যে ছিল তীব্র মতবিরোধ ও মতপার্থক্য, শুরু হয়েছিল পার্টির মধ্যে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম। নানা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্ন ও বিষয়কে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল এই মতপার্থক্য ও মতবিরোধসমূহ, সেগুলির ওপর ভিত্তি করেই চলছিল আন্তঃপার্টি মতাদর্শগত সংগ্রাম।[৩]

১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে নিকিতা ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব কর্তৃক নিঃ-স্তালিনীকরণ (De-Stalinization) প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর এবং 'তিন পি-র তত্ত্ব' উপস্থাপিত হওয়ার পর থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এই নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই 'তিন পি-র তত্ত্ব' বা 'Three P's Thesis' হল — ১) শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ (Peaceful Transition to Socialism), ২) ধনতান্ত্রিক - সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান (Peaceful Co-existence with the Capitalist - Imperialist States) এবং ৩) ধনতান্ত্রিক - সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা (Peaceful Competition with the Capitalist - Imperialist States)। মাও সে-তুং (মাও জে-দং)-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই নিঃ-স্তালিনীকরণ প্রক্রিয়া এবং এই 'তিন পি-র তত্ত্ব' প্রত্যাখ্যান করে তার বিরোধিতায় অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরস্থ 'বাম-দক্ষিণ' দ্বন্দ্ব নতুন এক মাত্রা পেল এবং আরও তীব্র হয়ে উঠল। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এক অংশ ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের মতের সম্পূর্ণ অনুগামী, আর অপর অংশটি চীনের মতের সম্পূর্ণ অনুগামী না হলেও তাঁদের অবস্থান ছিল চীনের অবস্থানের কাছাকাছি। সাধারণভাবে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে আন্তর্জাতিক প্রশ্নে এক পক্ষ 'সোভিয়েতপন্থী' বা 'রুশপন্থী' এবং অপরপক্ষ 'চীনপন্থী' হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। বাম-দক্ষিণ বিচারে কমিউনিস্ট পার্টির 'সোভিয়েতপন্থী' বা 'রুশপন্থী' অংশ 'দক্ষিণপন্থী' এবং সাধারণভাবে 'চীনপন্থী' বলে পরিচিত অপর অংশ 'বামপন্থী' বলেই পরিচিত ছিলেন।

১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া চীন - ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ এই 'দক্ষিণপন্থী' ও 'বামপন্থী' অবস্থানদ্বয়কে আরও জোরদার করে মেরুকরণ প্রক্রিয়াকে প্রায় সম্পূর্ণ করে তুলে পার্টির ভাঙ্গনকে অনিবার্য করে তুলল।

এই আন্তর্জাতিক প্রশ্নাবলীর সঙ্গেই যুক্ত ছিল জাতীয় প্রশ্নাবলী এবং বিষয়সমূহ। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় প্রশ্নাবলী এবং বিষয়সমূহ নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতপার্থক্য

ও মতবিরোধ এবং মতাদর্শগত সংগ্রাম আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। এগুলির সঙ্গেই যুক্ত হয়েছিল আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী এবং তাই নিয়ে বিতর্ক।

কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যে জাতীয় প্রশ্ন ও বিষয়গুলি নিয়ে অন্তর্বিরোধ ও মতপার্থক্য ছিল, সেগুলি ছিল সাধারণভাবে ভারতীয় রাষ্ট্র ও ভারতের শাসক শ্রেণী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, ক্ষমতাসীন নেহ্‌রু সরকার ও কংগ্রেস সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় যে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করা দরকার, তার চরিত্র কি হবে এবং তাতে কোন্ কোন্ শক্তি যোগ দেবে, কোন্ কোন্ শ্রেণীর সমন্বয়ে তৈরি হবে এই গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, নেতৃত্ব থাকবে কোন্ শ্রেণীর হাতে ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দুটি শিবির তৈরি হয়ে গিয়েছিল। একটি শিবিরের নাম ছিল জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা এন ডি এফ (National Democratic Front or NDF) শিবির, এবং অপর শিবিরটির নাম ছিল জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা পি ডি এফ (People's Democratic Front or PDF) শিবির।

কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকেই এই জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা এন ডি এফ বনাম জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা পি ডি এফ বিতর্ক শুরু হয়ে যায়।[৪] ১৯৫৬ সালের ১৯ এপ্রিল থেকে ২১ এপ্রিল কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল কেরলের পালঘাটে। এই পালঘাট কংগ্রেসেই এই বিতর্ক সামনে চলে এসেছিল। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তাদের বক্তব্য ছিল কংগ্রেসের একাংশকে অর্থাৎ কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক অংশকে এই জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মধ্যে টেনে আনতে হবে, সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে কংগ্রেসের প্রভাবাধীন জনগণের সঙ্গে, তাঁদেরও টেনে আনতে হবে এই ফ্রন্টের ভেতর। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল অংশকে সঙ্গে রাখতে হবে। অপরদিকে জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তারা শ্রমিক শ্রেণীর একক নেতৃত্বের ওপরই জোব দিতেন, এবং সেই কারণেই কংগ্রেস বিরোধী অবস্থানে তাঁরা দৃঢ় ছিলেন, কংগ্রেসের নেহ্‌রু নেতৃত্ব সম্পর্কে তাঁদের কোনও অহেতুক মোহ ছিল না এবং কংগ্রেসের নেহ্‌রু নেতৃত্বের প্রতি অপর মতের প্রবক্তাদের মত কোনও দুর্বলতা তাঁরা পোষণ করতেন না।

কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তারা সাধারণভাবে 'দক্ষিণপন্থী' হিসাবে এবং জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তারা সাধারণভাবে 'বামপন্থী' হিসাবে পরিচিত ছিলেন। পার্টির মধ্যে যাঁরা 'রুশপন্থী' ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তা ছিলেন, অর্থাৎ সাধাবণভাবে যাঁরা 'দক্ষিণপন্থী' বলে পরিচিত ছিলেন, ১৯৬৪ সালে পার্টি বিভক্ত

হওয়ার পর তাঁরা প্রায় সকলেই থেকে গেলেন সি পি আই-তেই। আর অপর দিকে পার্টির মধ্যে যাঁরা সাধারণভাবে 'চীনপন্থী' বলে পরিচিত ছিলেন ও জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তা ছিলেন, অর্থাৎ সাধারণভাবে যাঁরা 'বামপন্থী' বলে পরিচিত ছিলেন, পার্টি ভাগের পর কয়েকজন ব্যতীত তাঁদের প্রায় সকলেই যোগ দিলেন নবগঠিত সি পি আই (এম)-এ।

পঞ্চাশের দশকের এই প্রতিবাদী গণ আন্দোলন ও প্রতিবাদী রাজনীতি, যার সামনের সারিতে ও নেতৃত্বে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি, আরও সংগ্রামী রূপ গ্রহণ করেছিল ষাটের দশকে এসে। আর এই প্রতিবাদী রাজনীতির স্বরণি ধরেই অন্যান্য অ-কমিউনিস্ট বামপন্থী শক্তির সঙ্গে যৌথ ভাবে পশ্চিম বাংলায় ও কেরলে ক্ষমতায় এসেছিলেন কমিউনিস্টরা। আবার অপরদিকে এই প্রতিবাদী রাজনীতির সংগ্রামী রূপই প্রশস্ত করে তুলেছিল ষাট - সত্তর দশকের বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনের আবির্ভাবের পথ, যে আন্দোলনের নাম নকশালবাড়ি আন্দোলন, যা পরবর্তী কালে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে পরিচিত হয়ে আছে নকশালপন্থী আন্দোলন নামে।

সূত্রনির্দেশ

১। Gene D Overstreet and Marshall Windmiller, *Communism in India*, The Perennial Press, Bombay, 1960, p. 309 Overstreet and Windmiller এই পর্যায়কে আখ্যা দিয়েছেন — 'The Return to Constitutional Communism'.

২। বিভিন্ন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্ট ব্যক্তিত্বের স্মৃতিচারণে পঞ্চাশের দশকের গণ আন্দোলনগুলির পরিচয় ও বিবরণ পাওয়া যায়, যেগুলির প্রতিটিতেই অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব ছিল কমিউনিস্ট পার্টির। এই সকল কমিউনিস্ট স্মৃতিচারণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির উল্লেখ এখানে করা হল : জ্যোতি বসু, 'জনগণের সঙ্গে', (প্রথম খন্ড), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৮৬, পৃঃ ১-৪ + ১-১৫৭; জ্যোতি বসু, 'জনগণের সঙ্গে', (দ্বিতীয় খন্ড), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৯১, পৃঃ ১-২০৭; বিপ্লব দাশগুপ্ত, 'জ্যোতিবাবুর সঙ্গে', (প্রথম পর্ব), (১৯৬৭ পর্যন্ত), নন্দন, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, পৃঃ ১-১০৫; রণেন সেন, 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কথা (১৯৪৮-১৯৬৪)', বিংশ শতাব্দী, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২, পৃঃ ১-৩৮৮; রণেন সেন, 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিবৃত্ত', নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৯৬, পৃঃ ১-১২ + ১-২৪৪; হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'তরী হতে তীর : পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত', মনীষা, কলকাতা, মে, ১৯৮৬, পৃঃ ১-৪ + i-x + ১-৪১৬ + ১-২৪—i-viii; মণিকুন্তলা সেন, 'সেদিনের কথা', নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৮৬, পৃঃ ১-৬ +১-৩০৯; মনোরঞ্জন রায়, 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও শ্রমিক আন্দোলন', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, জুলাই, ১৯৮৭, পৃঃ ১-৬+১-২৫৮; সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্, 'বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট

আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ', নতুন চিঠি প্রকাশনা, বর্ধমান, সেপ্টেম্বর, ১৯৯১, পৃঃ এক-বারো +১-৪৬৪।

নিম্নে উল্লিখিত বইটিতে এই গণ আন্দোলনগুলির ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকেরই প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে লেখক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আন্দোলনগুলির মূল্যায়ন করেছেন। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রণক্ষেত্র রাজপথ ঃ পঞ্চাশ-ষাট দশকের কলকাতায় যুব বিক্ষোভ', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২, পৃঃ ১-১২+১-৯৯।

৩। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চাশের দশকের বিভিন্ন দলিল সংকলিত হয়েছে নিম্নলিখিত গ্রন্থটিতে ঃ Mohit Sen (ed.). *Documents of the History of the Communist Party of India,* Volume VIII (1951-1956), People's Publishing House, New Delhi. October, 1977. p - i-xii–1-656.

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতেও পঞ্চাশের দশকের কয়েকটি কমিউনিস্ট দলিলের উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ Overstreet and Windmiller, op. cit., pp. 309-31; রণেন সেন, 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কথা (১৯৪৮-১৯৬৪)', পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৭৫-৩৩৯; রণেন সেন, 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিবৃত্ত', পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৩৬-৫৭।

৪। বিতর্কটির উল্লেখ পাওয়া যায় নিম্নলিখিত প্রবন্ধটিতে ঃ Bipan Chandra, 'A Strategy in Crisis — The CPI Debate : 1955-56', in Bipan Chandra (ed.). *The Indian Left* : Critical Appraisals, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, 1983, pp. 259-400. এই প্রবন্ধটি ছাড়াও নিম্নলিখিত বইগুলিতেও বিতর্কটির উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ Overstreet and Windmiller, op. cit., pp. 317-31; রণেন সেন, 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কথা (১৯৪৮-১৯৬৪)', পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২০৯-৩৩৯।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও যুক্তফ্রন্ট রণনীতি ঃ একটি পর্যালোচনা

অঞ্জন সাহা

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার (১৯২৯-৩৩) ফলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সবচাইতে অভিজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয় এবং সাময়িকভাবে ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে এর দীর্ঘমেয়াদী সুফল অনস্বীকার্য, কেননা এর ফলে কমিউনিস্টদের নীতি ও আদর্শ বহুল পরিচিতি লাভ করে।[১] কিন্তু ইতিমধ্যে ষষ্ঠ কমিনটার্ন কংগ্রেস (১৯২৮) চীনে কুয়োমিন্টাং দলের বিশ্বাসঘাতকতা,[২] বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের তীব্র সঙ্কট এবং ভারতে ক্রমবর্ধমান গণ আন্দোলনের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে[২এ] বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। সম্ভবত জাতীয় কংগ্রেসের 'নেহরু রিপোর্ট' গ্রহণ করা ও কমিনটার্নের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছিল।[৩] কমিনটার্ন নির্ধারিত পন্থা অনুসারে ১৯৩০-এ প্রকাশিত "Draft Platform of Action of the Communist Party of India"[৪]-তে কেবলমাত্র জাতীয় কংগ্রেসের গান্ধীবাদী নেতৃত্বই নন, তীব্রভাবে সমালোচিত হন নেহরু ও সুভাষের মত বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরাও। তাছাড়াও এতে ভারতীয় কমিউনিস্টদের ব্রিটিশ শাসনের বলপূর্বক উচ্ছেদ ঘটিয়ে, শ্রমিক-কৃষকের সোভিয়েত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আন্দোলন পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টি দলগত ভাবে আইন অমান্য আন্দোলনে[৪এ] অংশগ্রহণের অস্বীকার করায় স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলধারার সাথে তাঁদের প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে। ইতিমধ্যে মীরাট মামলায় অন্তরীণ নেতৃত্বের অনুপস্থিতির ফলে পার্টিতে এক নতুন নেতৃত্বের উত্থান ঘটে[৫] (কলকাতায় সোমনাথ লাহিড়ী, আবদুল হালিম এবং বোম্বেতে এম.ভি. দেশপান্ডে, বি.টি. রণদিভে প্রমুখ)। কিন্তু ক্রমাগত অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ও সুসংহত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাবে কমিউনিস্টদের অবস্থান ক্রমশ আরো দুর্বল হয়।[৬] C.P.I.-এর দুরবস্থা সম্পর্কে কমিনটার্নের উদ্বেগের প্রতিফলন ঘটে একাধিক প্রতিনিধি পাঠানোর মধ্য দিয়ে (১৯৩০-৩১), যদিও তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করেন কেবলমাত্র আমির হায়দার খান।[৭] সম্ভবত মীরাট মামলায় অভিযুক্ত নেতৃবৃন্দের আহ্বানে সাড়া দিয়ে[৮] কমিনটার্ন ১৯৩২-এর জুন ও ১৯৩৩-এর নভেম্বরে দুটি 'খোলা চিঠি' প্রকাশ করে — যাতে ভারতীয় কমিউনিস্টদের জাতীয় আন্দোলনে (যা

প্রধানত কংগ্রেসের পরিচালনাধীন) সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের মুখোশ খুলে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। যদিও কিভাবে এই পরস্পরবিরোধী লক্ষ্যের একত্র সম্মিলন সম্ভব, তা ব্যাখ্যা করা হয়নি। তাছাড়াও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় দলীয় সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রসঙ্গেও। অবশ্য ১৯৩৩-এর অগস্ট থেকে মীরাট মামলার অভিযুক্তরা মুক্তিলাভ করতে থাকেন এবং ডিসেম্বরে CPI-এর একটি অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটিও গঠিত হয়। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের সবচাইতে শক্তিশালী শত্রু হিসেবে নাৎসী জার্মানীর আবির্ভাব হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এবং ফ্রান্সের 'Popular Front'[৯]-এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে সপ্তম কমিনটার্ন কংগ্রেস (১৯৩৫) ফ্যাসি-বিরোধী বৃহত্তর যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। যদিও সোভিয়েত রাশিয়ার বিদেশনীতির গতি প্রকৃতি ও নিজস্ব স্বার্থ ঐ সিদ্ধান্তকে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।[১০] অবশ্য ভারতবর্ষে যুক্তফ্রন্ট রণনীতির প্রয়োগ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি তাত্ত্বিক ও কৌশলগত প্রশ্নের মীমাংসাও সপ্তম কমিনটার্ন করতে পারেনি। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে[১১] রজনী পাম দত্ত এবং বেন ব্রাডলে ভারতে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কংগ্রেসের শ্রেণীচরিত্র সংক্রান্ত বিতর্কটিকে অগ্রাহ্য করেই তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করেন। এমনকি কালক্রমে কংগ্রেসের চরিত্রগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্টে পরিণত হবার সম্ভাবনা সম্পর্কে আশা প্রকাশ করা হয়। আহ্বান জানানো হয় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে বিচ্ছিন্ন করার এবং ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে বামপন্থীদের ঐক্যের। স্বীকার করা হয় যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নয়, যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবে স্বাধীনতা ও জনগণের আশু প্রয়োজনগুলি মেটানোর দাবীতে — সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের ভিত্তিতে।

প্রাথমিক দ্বিধা ও মতানৈক্য অতিক্রম করে পি.সি. যোশী সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হবার পর পলিটব্যুরো 'Dutt - Bradley Thesis' গ্রহণ করে অবিলম্বে তা বাস্তবায়িত করার আহ্বান জানায়।[১২] সমকালীন জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিও এর অনুকূল ছিল। ১৯৩৪ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একটি বামপন্থী গোষ্ঠীরূপে গঠিত হয়েছে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি (CSP) — কংগ্রেসের নীতি ও কার্যপন্থা পরিবর্তনের দাবীতে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। ১৯৩৬ সালে CSP-র মীরাটঅধিবেশনে প্রধানত জয়প্রকাশের উদ্যোগে কমিউনিস্টদের সদস্যপদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়[১৩] এবং এর মধ্য দিয়ে তারা জাতীয় রাজনীতির মূলস্রোতে ফিরে আসে। পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে উপকৃত হয়েছিল উভয় পক্ষই — কমিউনিস্টরা জাতীয় রাজনীতিতে নিজস্ব প্রভাব ও সাংগঠনিক ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়, অন্যদিকে সোসালিস্টরা লাভবান হয়েছিল ভালো সংখ্যক

সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক কর্মী পাওয়ায় এবং কমিউনিস্টদের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের সাথে যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ায়। যদিও পরবর্তীকালে আদর্শকেন্দ্রিক মতানৈক্য[১৪] ও সংগঠনের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট প্রভাব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তাছাড়া ঐ সময় সংগঠিত শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের উত্থান এবং তাদের নিজস্ব দাবীগুলির সাথে জাতীয় রাজনৈতিক বিষয়গুলির সংমিশ্রণ[১৪এ] যুক্তফ্রন্ট রণনীতি প্রয়োগের সহায়ক ছিল। যুক্তফ্রন্ট তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটিয়ে ১৯৩০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থীরা ক্রমশ একটি উল্লেখযোগ্য শক্তিতে পরিণত হন এবং ফৈজপুর অধিবেশনে কমিউনিস্টদের প্রস্তাবিত 'স্বরাজ' সংক্রান্ত একটি সংশোধনী AICC সদস্যদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের সমর্থন লাভ করেছিল। কংগ্রেসের বামপন্থী প্রবণতার প্রতিফলন ঘটেছিল ১৯৩৬-এর লক্ষ্মৌ ও ফৈজপুর অধিবেশনে সভাপতিরূপে জওহরলাল নেহরুর ভাষণে, ১৯৩৭-এর প্রাদেশিক আইনসভা গুলির নির্বাচন উপলক্ষ্যে দেওয়া প্রতিশ্রুতিসমূহে এবং অন্তত আংশিকভাবে কংগ্রেসের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলির প্রারম্ভিক কার্যকলাপে।

প্রাথমিক কিছু অস্পষ্টতা থাকা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৩৭-এর নির্বাচনে কর্মীদের কংগ্রেসের সপক্ষে প্রচারে নামার নির্দেশ দেয় এবং আশা প্রকাশ করে যে যৌথ নির্বাচনী প্রচারের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ-ফ্রন্ট।[১৫] নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়লাভের পর ১৯৩৭-এর মার্চে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মন্ত্রিত্ব গ্রহণের অনুকূলে সিদ্ধান্ত নেন। যদিও বড়লাট লিনলিথগো এই প্রসঙ্গে দৃঢ়ভাবে জানান, ইংরেজ সরকার কংগ্রেসকে কোন প্রতিশ্রুতি দেননি যে প্রাদেশিক গভর্নররা মন্ত্রিসভাগুলির কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না এবং তাদের "বিশেষ ক্ষমতা" প্রয়োগে বিরত থাকবেন।[১৬] ওয়ার্কিং কমিটির ঐ সিদ্ধান্ত ছিল প্রকৃতপক্ষে বামপন্থীদের পরাজয়, কেননা সরকারী ক্ষমতা গ্রহণ না করার বিষয়টি তাঁদের মৌলিক নীতির অঙ্গীভূত ছিল — যার প্রতিফলন ঘটেছিল লক্ষ্মৌতে জওহরলালের ভাষণে।[১৭] ঐ সিদ্ধান্তকে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় বলে চিহ্নিত করেছিলেন গান্ধীর ঘনিষ্ঠ বিশিষ্ট শিল্পপতি ঘনশ্যাম দাস বিড়লা,[১৮] বড়লাটের কাছে লেখা একটি চিঠিতে। যদিও পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি "বর্তমান পরিস্থিতি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উপযুক্ত নয়" এই যুক্তিতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্তের সক্রিয় বিরোধিতা করেনি। সর্বোপরি, নেহরু ও সুভাষ কংগ্রেস সভাপতির পদ অলংকৃত করা সত্ত্বেও দক্ষিণপন্থী গান্ধীবাদীদের সাংগঠনিক অবস্থান ছিল সুদৃঢ় — যেজন্য এমনকি নেহরুর নেতৃত্বাধীন ওয়ার্কিং কমিটিতেও মাত্র চারজন বামপন্থী সদস্য ছিলেন। কংগ্রেসের দ্বারা গণসংগঠনগুলির স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাভ, যেটি কমিউনিস্টদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবী ছিল — সেটিও বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়। তবে লক্ষ্মৌ অধিবেশনে জনসাধারণের

সাথে কংগ্রেস সংগঠনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি গণসংযোগ কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং করাচী অধিবেশনে (১৯৩১) গৃহীত মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবটির প্রতি পুনরায় সমর্থন জানানো হয়। কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতাহারে (১৯৩৬)[১৮এ] শ্রমিক - কৃষকদের নিজস্ব সমস্যাগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয় এবং তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল। লক্ষ্ণৌ ও ফৈজপুর অধিবেশনকে স্বাগত জানিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি মন্তব্য করেছিল, গত একদশক ধরে বামপন্থীরা যে কর্মসূচীর সপক্ষে প্রচার চালিয়েছেন, অবশেষে কংগ্রেস সেটি গ্রহণ করেছে[১৯] — যদিও ফৈজপুর ও লক্ষ্ণৌতে কমিউনিস্টদের আনা প্রস্তাবগুলি পরাস্ত হয়েছিল। ঐ মন্তব্যে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়েছিল কংগ্রেসেব প্রতি কমিউনিস্টদের আপোষ ও সমর্থনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি।

জনগণের প্রবল উচ্ছ্বাস ও সমর্থনের মধ্যে ক্ষমতাসীন হওয়া সত্ত্বেও প্রাদেশিক কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছিল। প্রাথমিক ভাবে কিছু প্রশংসনীয় পদক্ষেপ[২০] নেওয়া সত্ত্বেও গণ আন্দোলনের চাহিদা ও কংগ্রেসী প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বাড়তে থাকে। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি কৃষিক্ষেত্রে খাজনা হ্রাস, ঋণ মকুব ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি আইনী ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও (যথা ঃ Bihar Tenancy Amendment Act, 1937) সেগুলি এমনকি ফৈজপুর অধিবেশনের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকেও বাস্তবায়িত করতে পারেনি। উপরন্তু ১৯৩৭-এর শেষার্ধে যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে কংগ্রেসী সরকার আন্দোলনরত কৃষকদের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা সহ অন্যান্য দমনমূলক আইন প্রয়োগে দ্বিধাবোধ করেনি।[২১] কৃষক সংগঠনগুলির প্রতি কংগ্রেসের দমনপীড়ণ মূলক দৃষ্টিভঙ্গির কথা এমনকি ইংরেজ কর্তৃপক্ষের দ্বারাও[২২] স্বীকৃত হয়েছিল। অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছিল শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও — কানপুর, আমেদাবাদ এবং শোলাপুরে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত শ্রমিক বিক্ষোভের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন মহাত্মা গান্ধীর সচিব মহাদেব দেশাই।[২৩] Bombay Trades Dispute Act '1938-এর বিরুদ্ধে আহ্বান করা একটি বিশাল শ্রমিক সমাবেশ পুলিশী গুলিবর্ষণের সম্মুখীন হয়। তাছাড়া, ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে AICC-র দিল্লী অধিবেশনে "জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষার্থে" যেকোন ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলিকে।[২৪] বিশেষত মাদ্রাজ ও বোম্বাই এদেশে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সাথে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির উৎসাহপূর্ণ অতি সক্রিয় সহযোগিতায়, এমনকি বড়লাট এবং প্রাদেশিক গভর্নররাও, আশ্চর্য হয়েছিলেন।[২৫]

সংঘাত ও পারস্পরিক অবিশ্বাসময় আবহাওয়ায় অনুষ্ঠিত হরিপুরা অধিবেশনে (September, 1938) মতভেদ আরো গভীর হয়; কেননা "ভারত শাসন আইন '১৯৩৫"-

এর যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা 'Federal Scheme' প্রসঙ্গে বামপন্থীরা দক্ষিণপন্থীদের (বিশেষত রাজাজী, প্যাটেল প্রমুখ) আন্দোলনবিমুখ, আপোষমূলক মনোভাবকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন[২৬] এবং দেশীয় রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলির ভিতরে গণ-আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেসের কোনরকম হস্তক্ষেপ ছাড়া কেবলমাত্র মৌখিক সমর্থন জানানোর নীতিরও বিরূপ সমালোচনা করেন।[২৭] তবে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ তীব্রতর হলেও ঐ অধিবেশনে আনা কমিউনিস্টদের কোন প্রস্তাবই সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন লাভ করেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কমিউনিস্টরা ঐক্যের স্বার্থে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটিয়ে। স্বীকার করা হল যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতীয় পুঁজিপতিরা দোদুল্যমানতা সত্ত্বেও প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।[২৮] এমনকি 'কংগ্রেস একটি বুর্জোয়া সংগঠন' — এই অভিমতকেও 'বর্তমান পরিস্থিতিতে ভুল' বলে ঘোষণা করা হল।[২৯] আরো বলা হল যে কেবলমাত্র সরকারী ক্ষমতা গ্রহণের ফলে কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদের মিত্রে পরিণত হয়নি।

দক্ষিণ ও বামপন্থীদের বিবাদ চরমে ওঠে ১৯৩৯-এর ত্রিপুরি অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ ঐ নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র বসু জয়লাভ করলেও তিনি শীঘ্রই দক্ষিণপন্থীদের কূটচালে পরাস্ত হয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এছাড়াও ত্রিপুরিতে কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস সোসালিস্টদের বিচ্ছেদ ঘটে — Subject Committee-তে তাঁরা একত্রে 'পন্থ প্রস্তাবের' বিরোধিতা করলেও প্রকাশ্য অধিবেশনে CSP নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে। উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থনে জয়প্রকাশ নারায়ণের বক্তব্য ছিল, কংগ্রেসের ঐক্য রক্ষা করতে এবং গোবিন্দবল্লভ পন্থের সুনির্দিষ্ট আশ্বাসের ভিত্তিতে তাঁরা ঐ পদক্ষেপ নেন।[৩০] তাই যথার্থ ভাবে বলা চলে যে,[৩১] লক্ষ্ণৌতে তাঁদের সহযোগিতার সূচনা হলে তার সমাপ্তি ঘটেছে ত্রিপুরিতে। অবশ্য কমিউনিস্টদের আচরণও সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল না। গান্ধী তাঁর মনোনীত প্রার্থীর পরাজয় মেনে নিতে অস্বীকার করায় কমিউনিস্টরা দৃঢ়ভাবে সুভাষকে সমর্থন জানাননি — উপরন্তু অভিমত দেন যে সুভাষ বসুর নির্বাচনকে একটি বিকল্প নেতৃত্বের বিজয় বলে ব্যাখ্যা করা সমীচীন নয়।[৩২] এমনকি তাঁরা আদর্শগত পার্থক্যকে গুরুত্ব না দিয়ে তৎকালীন পরিস্থিতিতে গান্ধীর নেতৃত্বকে অনিবার্য বলেও মেনে নেন।[৩৩] আদর্শগত অবস্থানের হঠাৎ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী পরিবর্তন তাঁদের নিজেদের মধ্যেও যথেষ্ট বিভ্রান্তি ও হতাশার সৃষ্টি করে, যার পরিচয় পাওয়া গেছে বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা অজয় ঘোষের লেখনীতে।[৩৪]

এইভাবে কমিউনিস্টরা আদর্শগত ক্ষেত্রে যথেষ্ট নমনীয় অবস্থান নিলেও দক্ষিণপন্থীরা সাংগঠনিক একাধিপত্যের পক্ষপাতী ছিলেন। সুভাষ চন্দ্রের পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর ওয়ার্কিং কমিটিতে কোন বামপন্থীকে গ্রহণ করেননি এবং ১৯৩৯-এর

জুনে AICC-র বম্বে অধিবেশনে গৃহীত কয়েকটি সংশোধনীর[৩৫] প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের ভিতর কমিউনিস্টদের প্রভাব বিস্তার রোধ করা। অতএব ত্রিপুরি কার্যত যুক্তফ্রন্ট তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা উন্মোচন করে এর সফল প্রয়োগের সমাপ্তি ঘটায়। যুক্তফ্রন্ট রণনীতি গ্রহণের পর CPI কংগ্রেস সম্পর্কে তার বিরূপ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়ে কংগ্রেসের ঐক্যের উপর চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করলেও ঐ কৌশল শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। প্রমাণিত হয় যে, কংগ্রেসের সাংগঠনিক ঐক্য বজায় রাখা এবং তাকে একটি সুনির্দিষ্ট বামপন্থী অভিমুখে পরিচালনা করা — এই দুইয়ের একত্র সম্মিলন অসম্ভব। বামপন্থীদের ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধির ফলে যখন কংগ্রেস ভাঙনের সম্মুখীন হয়েছিল, তখন ঐক্য রক্ষার স্বার্থে CPI-কে নিজের আদর্শগত অবস্থান পরিত্যাগ করে কার্যত আত্মসমর্থন করতে হয়েছিল।

সূত্রনির্দেশ

১। Philip Spratt, Blowing up India. (Calcutta, 1955) p. 53.

২। K. Radek, "Problems of the Revolution in India" in Inprecor, June 1930.

৩। Utpal Ghosh. The Communist Party of India and India's Freedom Struggle : 1937-1947 (Calcutta, 1995) p. 27.

৪। G. D. Overstreet & M. Windmiller. Communism in India (Berkeley, 1959) p. 145.

৫। S. C. Jha. Indian Party Politics · Structure. Leadership and Programme (New Delhi, 1989) p. 144.

৬। Muzaffar Ahmed, Communist Party of India - Years of Formation : 1921-1933 (Calcutta, 1959) p. 37

৭। H. Williamson. India and Communism (Shimla, 1933) p. 53.

৮। Ibid, pp. 176, 177.

৯। Sanjay Seth. Marxist Theory and Nationalist Politics . The case of colonial India (New Delhi, 1995) p. 151.

১০। Gunther Nollau. International Communism and World Revolution (London. 1961) pp. 122-123.

১১। Dutt & Bradley. "The Anti - Imperialist Peoples Front in India" in Labour Monthly, March 1936, London.

১২। "Statement of the Palitbureau of the Communist Party of India on Comrade Dutt & Bradleys Article" in the Communist. September 1936.

১৩। Jayaprakash Narayan, Socialist Unity and Congress Socialist Party (Bombay. 1941) p. 3.

১৪। Shashi Bairathi. Communism & Nationalism in India : A Study in Inter Relationship, 1919-1947 (Delhi. 1987) pp. 147, 148.

১৫। "Communist Party and the coming Election" (Editorial) The Communist. July 1936.

১৬। Linlithgow to Zetland. 19th March 1937, Linlithgow Papers. National Archive of India, pp. 79-80.

১৭। Utpal Ghosh. Ibid. p. 42.

১৮। G. D. Birla, In the Shadow of the Mahatma. A personal Memoir (Bombay. 1953) p. 214.

১৯। "Unity of the Left" in New Age, Volume-V. October 1938, p. 162.

২০। L. P. Sinha. Left Wing in India : 1919-1947 (Muzaffarpur, 1965) p. 439

২১। Utpal Ghosh, Ibid. p. 47.

২২। "Quarterly Survey of the Political & Constitutional Position in British India" No. 3 (1st February - 30th April 1938) Linlithgow collection. p. 447. India Office Library, London.

২৩। Mahadeb Desai. "Non-Violence in Action" in Harijan. 27th November. 1937. pp. 348-349.

২৪। Zaidi & Zaidi. Encyclopaedia of the Indian National Congress, Volume-XI. p. 447.

২৫। Shashi Bairathi. Ibid. pp. 156. 157.

২৬। "Indian Communists Greet Haripura" in National Front February 1938. pp. 5-9.

২৭। Ajay Ghosh, "Tasks before the States People" National Front 6th March, 1938, pp. 6-8.

২৮। G. Adhikari. "Royism Exposed : Inverted Rightism" in National Front. 23rd April. 1939. pp. 181-183.

২৯। "Draft Thesis : The National Congress and the Working class" in National Front. 17th April, 1938. pp. 6. 7.

৩০। Shashi Bairathi. Ibid. p. 163.

৩১। E.M.S. Namboodiripad. "The CSP and the Communists" in The Marxist, 2(1). 1984. p. 58.

৩২। "Tripuri Must Sound the War Drum" (Editorial) New Age. Volume-IX, February 1939, p. 329.

৩৩। "Tripuri - A Review" (Editorial) New Age, Volume-XI, April 1939, p. 412.

৩৪। National Front, 19th March 1939. p 101.

৩৫। Sanjay Seth, Ibid. pp. 178-179.

২এ। উদাহরণ ঃ গিরনি - কামগড় ইউনিয়নের নেতৃত্বে ১৯২৯ সালে বোম্বের বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের ধর্মঘট, ১৯৩০-এর GIP - Railway শ্রমিকদের আন্দোলন প্রমুখ।

৪এ। যদিও ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন কমিউনিস্ট আন্দোলনে অংশ নেন। See Shashi Bairathi, Ibid, p. 121.

১৪এ। Sanjay Seth, Ibid. pp 160-161

১৮এ। L. P. Sinha, Ibid, pp. 432-434.

জাতি পরিচিতি গঠন, উত্তরণ ও এলিট নেতৃত্ব : ঔপনিবেশিক বাংলায় রাজবংশী — ক্ষত্রিয় আন্দোলনের একটি সমীক্ষা।

রূপ কুমার বর্মন

ঔপনিবেশিক ভারতে, বিশেষত উনবিংশ শতকের শেষ দিক হতে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত "জাতি উত্তরণ" (Caste mobility) এর আন্দোলন সমাজবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের অন্যতম উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে বেশ কয়েক দশক ধরে। নিজস্ব "জাতিসভা"-র মাধ্যমে জাত্যাগ্রসরণ আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণকারীগণ তৎকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন পদ্ধতি ও পথ গ্রহণ ও অনুসরণ করবার মাধ্যমে "জাতিপ্রথা"-র বিলুপ্তির বদলে একে আরো মজবুত করার প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। আদমসুমারীর পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন,[১] উচ্চজাতি / বর্ণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত বর্ণের প্রতিবাদ[২] ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন[৩] - প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে জাত্যাগ্রসরণ আন্দোলনকে সমাজবিজ্ঞানীরা এযাবতকাল আলোচনা করলেও "জাতি পরিচিতি গঠন" (Caste identity formation)-এর জন্য জাত্যাগ্রসরণ আন্দোলনকে তাদের বিচার - বিশ্লেষণে স্থান দেননি। এলোমেলো, সন্দেহজনক ও দ্ব্যর্থবোধক "জাতি" (Caste)-এর পরিবর্তে সমাজে একটি নির্দিষ্ট জাতি - পরিচিতি গঠনের উদ্দেশ্যে "জাত্যাগ্রসরণ আন্দোলনের আঙ্গিনায় ঢুকে পড়েছিল। এমন একটি আন্দোলন হল রাজবংশী - ক্ষত্রিয় আন্দোলন, যাকে প্রতিবিম্বিত করাই আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সামাজিক রীতিনীতিতে সংস্কৃত্যায়ণ আদমসুমারীতে আবেদন ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপবীত গ্রহণ প্রভৃতির সাহায্যে সমাজে রাজবংশী সম্প্রদায়ের একটি 'নির্দিষ্ট' পরিচিতি গঠনের জন্য আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল ঐ সম্প্রদায়ের "এলিট" নেতাদের দ্বারা, যার মধ্যে শিক্ষিত ও ভূস্বামী উভয়েই ছিলেন। "ক্ষত্রিয় জাতি" (Kshatriya caste) হিসাবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রাজবংশী সম্প্রদায়ের "ক্ষত্রিয়করণ" আন্দোলনকে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনার চেষ্টা করা হল বর্তমান প্রবন্ধে।

"পরিচিতি" সম্পর্কে এরিক. এইচ. এরিকসন লিখেছেন - 'a universal psychological mechanism for adaptation in face of change.' 'সামাজিক

পরিচিতি'-র (Social identity) প্রশ্নটি নির্ভর করে কোন বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে যখন অন্যরা কোন গ্রুপ বা ব্যক্তিকে পরিচিত করে, অর্থাৎ সামাজিক পরিচিতি পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়। বৃহত্তর সমাজে কোন ছোট সামাজিক গ্রুপের পরিচিতি তাই .কোন নির্দিষ্ট স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টাতে পরিণত হয়, পাশাপাশি নির্দিষ্ট গ্রুপের সভ্য হিসাবে পরিচয় দিতে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আনন্দ অনুভব করে।[৪] কিন্তু কোন সামাজিক গ্রুপের অনির্দিষ্ট স্থান তাদের পরিচিতি গঠনের আন্দোলনে ও আত্মসম্মানবোধ বিকাশের দিকে ঠেলে দেয়। কোন সামাজিক বর্গের পরিচিতি গঠনের আবার দুটো ভাগ রয়েছে - (১) গঠনমূলক একতাবদ্ধকরণ (Structural Integration) এবং (২) অর্থনৈতিক উন্নয়ন।[৫] তাই জাতি পরিচিতি গঠনের এবং অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্য দিয়ে জাতির উন্নয়ন (Standardization of Caste) নির্ভর করে। জাতি উন্নয়নের নেতৃত্ব আসতে পারে ঐ জাতির উপর আধিপত্যকারী গোষ্ঠী বা ব্যক্তির (এলিট) মধ্যে থেকে, যাদের জাতিবিকাশের ইস্যুগুলিকে দৃঢ়ীকরণের পূর্ণ দক্ষতা রয়েছে।[৬] আলোচ্য প্রবন্ধটিতে তাই রাজবংশী জাতিপরিচিতি গঠন ও এলিট নেতৃত্বের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

II

রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতি পরিচিতি প্রশ্নটি উপস্থাপিত হয় ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে, যখন Mr. F.A. Skyne, রংপুরের তৎকালীন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও সেনসাস সুপার-ইনটেন্ডেন্ট-ইন-চার্জ জাতি নির্ধারণের প্রশ্নে রাজবংশীদের কোচ হিসাবে উল্লেখ করতে আদেশ দেন।[৭] অর্থাৎ "রাজবংশী" ও "কোচ" এই দুটি জাতি সমার্থক হয়ে পড়ে। এই ব্যাপারটি রাজবংশী সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের কাছে একটি সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল, এবং তারা এই আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে দাবি করলেন "কোচ" ও "রাজবংশী" দুটি পৃথক জাতি, এবং সামাজিক মর্যাদায় রাজবংশীরা কোচদের তুলনায় অনেক উন্নত। "কোচ - রাজবংশী"-দের পৃথকীকরণের দাবি (dichotomization / differentiation) প্রকৃতপক্ষে কোচ - রাজবংশীদের সম্পর্কে বিভিন্ন ব্রিটিশ আধিকারিকদের পর্যবেক্ষণ ও মতামতের ফল যেখানে রাজবংশীদের জাতি হিসাবে সামাজিক স্থান সুনির্দিষ্ট নয়। কোচ - রাজবংশীদের ethnic root নির্ণয় করা আমার উদ্দেশ্য না হলেও রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের শক্তি (Force) কে আলোচনা করতে গেলে ব্রিটিশ আধিকারিকদের পর্যবেক্ষণসমূহ একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

কোচ - রাজবংশীদের সম্পর্কে প্রথম মতামত জ্ঞাপন করেন Dr. Buchanan Hamilton, যিনি ১৮০৭-১৪ খ্রিস্টাব্দে রংপুর ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন। এইভাবে তিনি all Rajbanshis are not koch. - এই সিদ্ধান্তে আসেন। তিনি আরো লিখেছেন - "All the koches are sprung from the same stock and most of the Rajbanshis

are koches; but many of the Rajbanshis belong to different tribes; who have abondoned their practices and have been admitted to communion."[৮] হ্যামিল্টন এর এই দ্ব্যর্থক মতামতকে আরো জটিল করে তোলেন Mr. B. H. Hodgson (1848), যাকে অনুসরণ করে Dr. Lathan লিখেছেন, "The koches, the Meches, the kachares are the members of the same race." অন্যদিকে Mr. E. T. Datton (1872) এই জটিলতাকে আরো জটিলতর করে তোলেন এই বলে - "The Rajbanshis and few other North-eastern tribes are cognates.[৯] Dalton-এর মতো Mr. W. W. Hunter (1876), Director General of Statistics of Govt. of India, বলেন, "Rajbanshi an epithet properly applied to persons the highest caste, such as Rajputs, an has evidently been adopted by the koches to corroporate their cherished tradition, that they represent the remain of the old Kshatriya caste."[১০] এই পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার যে কোচ ও রাজবংশীদের সামাজিক মর্যাদা ও পরিচিতিতে কোন নির্দিষ্ট পার্থক্য বা স্থান ছিল না। এমনকি ১৯০১খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারীও কোচ ও রাজবংশীদের পৃথক জাতিসত্তা (caste identity) প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। H. H. Risely, ১৯০১ সালের আদমসুমারীতে মন্তব্য করেন - The great Majority of koch, inhabitants of Jalpaiguri, Rangpore and part of Dinajpur now invariably deseribe themselves as an outlying branch of the Kshatriya of Hindu tradition although there has been no mixture of blood and they remain thoroughly koch under the name of Rajbanshi."[১১]

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও যুক্তি সমন্বয়ে গড়ে ওঠা নবোদ্ভূত রাজবংশী শিক্ষিত "এলিট গ্রুপ", সন্দেহজনক দ্ব্যর্থক ও ভঙ্গুর এই জাতি পরিচয় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি, বা Mr. Skyne-এর আদেশকে মান্য করেনি। রাজবংশী ভূস্বামী এলিটরা, বিশেষত রংপুরবাসী শ্রী হরমোহন রায় (শ্যামপুরের জমিদার) তাঁদের স্বজাতীয়দের নিয়ে "রংপুর ব্রাত্যক্ষত্রিয় জাতির উন্নতি বিধায়নী সভা" স্থাপন করেন ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে, যা Mr. Skyne-কে বাধ্য করে রাজবংশীদের জাতির মর্যাদা নিয়ে রংপুরের পন্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করতে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে রাজবংশীরা ১৮৯১ ও ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারীতে তাদের দাবীমত ক্ষত্রিয় জাতিতে স্থান পায়নি। যদিও Mr. Skyne শেষ পর্যন্ত রাজবংশীদের জাতি হিসাবে 'ব্রাত্যক্ষত্রিয়' লেখার অনুমতি দিয়েছিলেন।[১২] অনুমতি থাকা সত্ত্বেও আদমসুমারীতে স্বীকৃতি পাওয়ার ব্যর্থতা রাজবংশীদের এবার নতুন পথে চালনা করে। তারা ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের বদলে এবার পুরোপুরি ক্ষত্রিয় (অথবা standard Kshatriya) মর্যাদা দাবী করে। কিন্তু তাদের এই দাবীকে প্রাতিষ্ঠানিক ইস্যুতে পরিণত করে আন্দোলন চালনার মত কোন নেতা, পঞ্চানন বর্মার আবির্ভাবের পূর্বে ছিলেন না।

III

কোন অক্ষত্রিয় হিসাবে পরিগণিত জাতির ক্ষত্রিয় মর্যাদা প্রাপ্তির দাবীকে জনপ্রিয় ও আইনসিদ্ধ করবার জন্য প্রয়োজন পৌরাণিক কাহিনী বা রাজকীয় ঘটনার সঙ্গে সংযোগ। পাশাপাশি ব্রাহ্মণদের ব্যবস্থাপত্রও ছিল অত্যাবশ্যক। কারণ জাতিপ্রথার উৎপত্তির সময় থেকেই কেবলমাত্র ব্রাহ্মণরাই শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান বা সামাজিক রীতিনীতির ব্যাখ্যাকর্তা। স্বভাবতই রাজবংশী এলিটরা নিজেদেরকে কোচদের চেয়ে উন্নত প্রমাণ করার জন্য রাজপরিবারের সঙ্গে (কাল্পনিক?) সংযোগ সাধনের যজ্ঞে নেমে পড়লেন। এই ধরণের প্রথম পদক্ষেপ হল গোয়ালপাড়া জেলার হরিকিশোর অধিকারীর "রাজবংশী কুলপ্রদীপ," যা সিদির দেশীয় নৃপতি অভয়নারায়ণের অর্থানুকূল্যে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। শ্রী অধিকারীর এই বইটি জাতি হিসাবে রাজবংশীদের সামাজিক মর্যাদা স্থির করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এমনকি পরবর্তী লেখকেরাও একে সর্বতোভাবে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবেই ব্যবহার করেছেন। এই গ্রন্থে শ্রী অধিকারী রাজবংশীদের পৌন্ড্রক্ষত্রিয় হিসাবে প্রমাণ করেছেন। পাশাপাশি দিনাজপুর জেলার মণিরাম কাব্যভূষণের "রাজবংশী ক্ষত্রিয় দীপক" ও "পৌন্ড্রক্ষত্রিয় কুলদীপ" এবং রংপুরের পন্ডিত জগমোহন সিংহের " ক্ষত্রিয় রাজবংশী কৌমুদী" রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষত্রিয় সেন্টিমেন্টের সৃষ্টি করে। এমনকি উমেশচন্দ্র বর্মন রাজবংশীদের সপ্তম শতকের বিখ্যাত কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টাও করেন। এই প্রচেষ্টাগুলি ক্ষত্রিয়ত্ব দাবীর তত্ত্বগত ব্যাপারটিকে আরো জোরদার করে।

জাতি পরিচয় গঠনের জন্য আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানকারী গোষ্ঠীর মধ্যে নিবিড় সংযোগ স্থাপন সর্বদাই অত্যন্ত জরুরী। রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনকে বাস্তবায়িত করার জন্য ঐ সম্প্রদায়ের শিক্ষিত এলিটরা একজন অবিসংবাদী নেতার অপেক্ষায় ছিলেন। শ্রী পঞ্চানন বর্মা, যিনি পেশায় ছিলেন আইনজীবী, এই অভাবপূরণ করতে এগিয়ে এলেন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে আসাম, বাংলা, বিহার ও কোচবিহার দেশীয় রাজ্যের চারশত রাজবংশী সদস্য (যারা সবাই ছিলেন ঐ সম্প্রদায়ের আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রভুত্বকারী গোষ্ঠী)-দের নিয়ে শ্রীবর্মা রংপুরে "ক্ষত্রিয় সমিতি" গঠন করেন। ক্ষত্রিয় সমিতির মূলত দুটি দাবী ছিল। যথা (১) রাজবংশী ও কোচ জাতিগতভাবে আলাদা এবং রাজবংশীরা তুলনামূলকভাবে শ্রেষ্ঠ, এবং (২) সংস্কৃত্যায়ণের মাধ্যমে রাজবংশী জাতির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা। উচ্চবর্গ ও উচ্চবর্ণের বাঙালীদের রাজবংশী জাতির প্রতি অসম্মানসূচক ব্যবহার ও অত্যাচার ক্ষত্রিয় সমিতির দাবীকে আরো জোরালো করে। উচ্চবর্গীয় বর্ণহিন্দুদের মতোই সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও কেবল জাতি পরিচয়ের জন্যই শ্রী পঞ্চানন বর্মাকে তার সহকর্মীর কাছে চূড়ান্তভাবে অপমানিত হতে হয়। শ্রীবর্মা এতে কিন্তু মোটেও দমে

যাননি। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় "রাজবংশী' ও "কোচদের" পৃথক জাতির মর্যাদা ১৯১১-র আদমসুমারীতে স্বীকৃতি লাভ করে, যা ক্ষত্রিয় সমিতির অন্যতম দাবী ছিল। O! Malley, census Superintendent ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে লেখেন - "The former request was granted without hesitation, as there is no doubt that at the present day irrespective of any question of origin the Rajbanshis and the koch are separate caste.[১৩] শুধু তাই নয়, পঞ্চানন বর্মা, কোচবিহার দেশীয় রাজ্য, মিথিলা, কামরূপ, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণগণের পরামর্শ ও সহযোগিতায় রাজবংশীদের ব্রাত্যক্ষত্রিয় থেকে ক্ষত্রিয়ত্বের মর্যাদায় স্থাপন করার মহাযজ্ঞে ব্রতী হলেন। করতোয়া নদীর পুণ্যসলিলে অবগাহন করে ১৩১৯ সনে (১৯১৩ খ্রিঃ) রংপুরের পেড়লবাড়ী গ্রামে পঞ্চানন বর্মা ও অন্যান্য রাজবংশী এলিটদের নেতৃত্বে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন ও উপবীত ধারণ করে রাজবংশী সম্প্রদায় নিজেদের "ক্ষত্রিয়" হিসাবে ঘোষণা করে, যার জন্য তারা দুই দশক ধরে আন্দোলন করে চলেছেন।

পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে "জাতি পরিচিতি গঠনের" আন্দোলন, বাজবংশী জাতিকে আন্দোলিত করেছিল, এবং "ক্ষত্রিয়" এই ধারণাতে নিজেদের একতাবৃদ্ধির পথকে প্রশস্ত করেছিল। তৎকালীন ঔপনিবেশিক সরকারের নিয়মনীতিও এর সহযোগিতা করেছিল। ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্গীয় ও নিম্নজাতির স্তর থেকে সেনা - নিয়োগের নীতি (কারণ ব্রিটিশ সরকারের ধারণা ছিল সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ মূলত উচ্চবর্ণ ও উচ্চবর্গীয়দের ষড়যন্ত্রের ফলেই সম্ভব[১৪]) রাজবংশী সম্প্রদায়কে নিজেদের ক্ষত্রিয়, অর্থাৎ যোদ্ধা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ এনে দিয়েছিল। এভাবেই তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের সুযোগ পেয়েছিলেন। জাতি, সামাজিক স্তরবিভাজনের একটি সূচক, (parameter) যা বিভিন্নসময়ে, বিভিন্নভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে, পঞ্চানন বর্মার সুযোগ্য নেতৃত্বে বিলোপের পরিবর্তে সমাজে আরো স্পষ্টতরভাবে প্রকট হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল, অন্তত ঔপনিবেশিক বাংলায়, যা নিম্নবর্গীয়দের আর্থ সামাজিক উন্নতির অন্তরায় নয়, বরং সাহায্যকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

IV

রাজবংশী 'সামাজিক (জাতি) পরিচিতি' পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল কেননা 'সামাজিক পরিচিতি' পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অচল থাকতে পারে না যা এই প্রবন্ধের প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারীতে উত্তরবঙ্গের কোচদেরকেও ক্ষত্রিয় মর্যাদা[১৫] দেওয়া হয় যা রাজবংশী ক্ষত্রিয় পরিচিতির একটি বিশেষ অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় কেননা কোচ-রাজবংশী পৃথকীকরণের বদলে পরোক্ষভাবে সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। কোচদের ক্ষত্রিয় পরিচিতি শীঘ্রই তাদের রাজবংশীর

পর্যায়ে উন্নীত করে এবং ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারীতে কোচরা দলে দলে রাজবংশী হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতে থাকেন। ১৯২১ ও ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারীগুলি তুলনা করলে দেখা যায় রাজবংশীদের সংখ্যা ১৭,২৭,১১১ (১৯২১) থেকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে বেড়ে হয় ১৮,০৬,২৯০ জন। অন্য দিকে কোচদের সংখ্যা ১,৩১,২৭৩ থেকে গিয়ে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ৮১,২৯৯ দাঁড়ায় যা কেবলমাত্র জন্মমৃত্যুর হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে হয়নি। ক্ষত্রিয় আন্দোলনের নেতৃবর্গও অনবহিত ছিলেন না। ক্ষত্রিয় আন্দোলনের এই দশা সম্বন্ধে রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের নেতৃবর্গ অনবহিত ছিলেন না। ক্ষত্রিয় সমিতি একসময় কোচদের থেকে রাজবংশীদের আলাদা করার যে চেষ্টা চালিয়েছিল এখন তা আদমসুমারীর পরোক্ষফল গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তাই বলা য়ায় 'ঔপনিবেশিক আদমসুমারী একসময় অবচেতনভাবে রাজবংশীদের সামাজিক আন্দোলন ও উন্নতির পক্ষে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিল কিন্তু তা এখন 'রাজবংশী পরিচিতির' প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

সামাজিক ক্ষেত্রে রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনে বাধা এলিট নেতৃত্বকে অন্যান্য ক্ষেত্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে বাধ্য করে। 'ক্ষমতা রাজনীতি' / 'জাতি রাজনীতি' তাদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু হিসাবে আবির্ভূত হয়।[১৬] এমন কি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন 'নিম্ন-জাতি' থেকে বঙ্গীয় আইন পরিষদে 'বিশেষ প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করে।[১৭] তদনুসারে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক সরকারের নির্বাচনে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির অবিসংবাদিত নেতা শ্রী পঞ্চানন বর্মা রংপুর নির্বাচনী ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হন। পাশাপাশি ক্ষত্রিয় সমিতি সমর্থিত প্রার্থী শ্রী যোগেশ চন্দ্র সরকারও জয়লাভ করেন। ১৯২০র ব্যবস্থাপক সভা Bengal Tenancy Act সংশোধন করার মত অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে যেখানে শ্রীবর্মা 'খসড়া কমিটির' সদস্য নির্বাচিত হন। রংপুর জেলার বুড়িগ্রাম মহকুমার একদল জোতদার শ্রী বর্মার শরণাপন্ন হন যারা জমির স্বত্ত্বাধিকারী হিসাবে কোনদলেই পড়ছিলেন না। শ্রী বর্মা এই সুযোগ হাতছাড়া করেননি। তিনি তাদেরকে High Breed Holder হিসাবে খসড়া প্রতিবেদনে স্থান দেন এবং বিনিময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা লাভ করেন। কেননা ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের আগে ঐ প্রতিবেদন আলোচিত হওয়ার কোন সুযোগ পায়নি এবং ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনেও দুজন ক্ষত্রিয় সমিতির প্রার্থী নির্বাচিত হন। তাই বলা যায় 'জাতি উত্তরণের মাধ্যমে জাতি পরিচিতি গঠনের আন্দোলন ধীরে ধীরে এলিট নেতৃবর্গের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ও ভোগের আন্দোলনে পরিণত হয়।' যখন একই সামাজিক বর্গের (Social Category) একটি অংশ অধিক ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পন্ন, অংশের সঙ্গে তাদের 'ক্ষমতায়' অধিকার মর্যাদা ও সম্পদের তুলনা করে ও এই পার্থক্যের বৈধতা সমন্ধে প্রশ্ন তোলে; তখন সামাজিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি

হতে পারে। সুতরাং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অসংখ্য রাজবংশী যুবকের জীবন উৎসর্গ, (যা কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়ত্বের বৈধতা প্রমাণের জন্য) এবং অসংখ্য রাজবংশীর পরিশ্রম ও মানসিকতা যখন ঐ সামাজিকবর্গের Governing Elite-রা করায়ত্ব করে, ঐ সমাজের একটি বৃহৎ অংশ তাদের নেতৃবর্গের প্রতি প্রত্যাশা রাখতে পারে না। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জাতি পরিচিতির আন্দোলন একটি বৃহৎ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়।

সামাজিক পরিচিতি গঠনের জন্য অর্থনৈতিক উন্নতি ও স্থিরতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলন ঐ সমাজের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সুরাহার তেমন কোন ব্যবস্থা করেনি। সুতরাং একে Mobility for consolidation বলা যায় না। এমনকি শ্রী পঞ্চানন বর্মা নিজেও অবহিত ছিলেন যে বিশ্বব্যাপী মহামন্দার (১৯৩২) সময়ে কোচবিহার দেশীয় রাজ্য কর্তৃক কৃষকদের নিকট হতে ভূমিকর সংগ্রহে অকঠোরতা ও দেয় ভরতুকী কেবলমাত্র জোতদার ও মহাজনদের কোষাগারই পূর্ণ করছে সাধারণ কৃষক বা ভাগচাষীরা এথেকে কোন উপকার পাচ্ছেন না।' কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'পৈতাধারণ' কোনভাবেই প্রকৃত প্রগতির পরিচয় বহন করে না। যদিও প্রথমদিকে ক্ষত্রিয় আন্দোলনের নেতৃবর্গ 'জাতি সচলতার মাধ্যমে সমগ্র রাজবংশী জাতিকে আন্দোলিত করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতাই আন্দোলনের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায় যখন কোচ - রাজবংশী পরোক্ষভাবে পুনরায় একই মর্যাদার অধিকার লাভ করে।

উপসংহার

'জাতি' (caste) র মত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান জাতি সচলতা (caste mobility) আন্দোলনের ফলে, বিলোপের পরিবর্তে আরো বেশী মাত্রায় শক্তি অর্জন করেছিল। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে আহৃত 'যুক্তিবাদ' জাতি - পরিচিতি আন্দোলনকারীগণের হাতে প্রকৃত প্রগতির পরিবর্তে 'জাতি - ব্যবস্থার (caste system) অযৌক্তিক বৈষম্যের সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়। ঔপনিবেশিক শাসক কূলের সামাজিক নীতিও ভারতীয় সমাজব্যবস্থার এই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গকে উচ্ছেদের বদলে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত সমর্থন জুগিয়েছিল। জাতিস্তরের নীচুতলা থেকে উদ্ভূত অসংখ্য বুদ্ধিজীবী যখন জাতিব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে রাজনৈতিক অধিকার আদায়সহ পার্থিব উন্নতির আন্দোলনে লিপ্ত একটি ছোট অংশ সেই সময় 'জাতি পরিচিতি' (Caste Identity) গঠনের নামে জাতির নগ্নরূপকে আরো মজবুত করার কাজে অংশগ্রহণ করে নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টায় ব্রতী হয়। এলিট অংশ কর্তৃক জাতি আন্দোলনে প্রদত্ত নেতৃত্বও নিজস্ব স্বার্থের বাইরে ছিল না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন ও আইন পরিষদে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শাসকীয় এলিট (Governing Elite) রা, অশাসকীয় এলিট (Non - Governing Elite) অর্থাৎ জোতদার /

জমিদারদের, স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট হয়। স্বাভাবিক ভাবেই রাজবংশী এলিট অংশ একটি সামাজিক আন্দোলনকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার মূল লক্ষ্য থেকে দূরে ঠেলে দেয়। তাসত্ত্বেও এই আন্দোলন ছিল তাদের কাছে অপরিহার্য কেননা এর সঙ্গে যুক্ত ছিল 'রাজবংশী' সামাজিক 'পরিচিতি', অবস্থান ও মর্যাদার প্রশ্ন যা, শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণিক ব্যবস্থাপত্রের সহায়তায় পূর্ণ হয়েছিল।

অবস্থানগত সমসাময়িক সুযোগকে কাজে লাগিয়ে যদিও 'পেশাদারী এলিটগণ' জাতি পরিচিতি আন্দোলনে নেমে পড়েন তাসত্ত্বেও গঠনমূলক একতাবদ্ধকরণ সামাজিক পরিচিতি গঠনের একটা দিক মাত্র। অর্থনৈতিক উন্নয়ন' রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে হয় অগ্রাহ্য করা হয়েছিল নতুবা সম্ভব হয়নি। শিক্ষাবিস্তার ও ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে রাজবংশী যুবকদের ভর্তি করানোর মত নামমাত্র চেষ্টা কখনই সার্বিক উন্নয়নের পদ্ধতি হিসাবে গণ্য হতে পারে না। 'পৈতাধারণ' রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংস্কৃত্যায়ণের একটা চেষ্টা নয় এমনকি এটা Demonstration effect ও নয় কেননা এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল অনির্ধারিত সামাজিক অবস্থান (Undefined Social status) থেকে এবং পেশাগতভাবে এরা ছিলেন বিক্ষিপ্ত। নমশূদ্র আন্দোলনের মত রাজবংশী আন্দোলন প্রত্যক্ষ জাতিদ্বন্দ্বের (Caste conflict) ফলও নয় যেহেতু কোচ ও রাজবংশী উভয়ের অবস্থানই ছিল অনির্ধারিত বা ভঙ্গুর। আদমসুমারীও এই ক্ষেত্রে সামাজিক অবস্থান (Social status) উন্নয়ণের সুযোগ দেয়নি যা অন্যান্য জাতির ক্ষেত্রে হয়েছিল বরং পরোক্ষভাবে শিক্ষিত রাজবংশী অংশকে জাতি পরিচিতি গঠনের আন্দোলনে নামতে বাধ্য করেছিল যারা রাজবংশী জাতির 'গৌরবোজ্জল ইতিহাস' তথা 'রাজকীয়' ক্ষত্রিয় জীবনের সন্ধান 'এ লিপ্ত হয়েছিলেন। সুতরাং একথা বলতে কোন বাধা নেই যে ঔপনিবেশিক শাসককূলের আদমসুমারী পরিচালনা ছিল রাজবংশী সহ বহুজাতি সমন্বিত ভারতীয় সমাজের প্রগতির অন্তরায়ের প্রতীক। সবমিলিযে বর্তমান পর্যবেক্ষক মনে করেন, রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলন 'Caste Mobility Discourse' এর অন্যান্য মডেল এর সঙ্গে মানানসই নয়। তাই Movement for Social Identity Formation ঔপনিবেশিক আমলের বঙ্গীয় সমাজের Caste Mobility Movement এর মধ্যে একটি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসতে পাবে যা বৃহত্তর সামাজিক বর্গের (Broader Social Category) ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পাবে।

সূত্রনির্দেশ

১। M. N. Srinivas - Social change in modern India, reprint. New Delhi 1995. p. 6.

২। Sekhar Bondhopadhyay — Caste. Politics and the Raj : Bengal 1872-1937. Calcutta 1990. p. 98.

৩। Srinivas - প্রাগুক্ত p. 96.

৪। Arnold Rose and Caraline B. Rose (eds) : Minority Problems. New York 1965, p. 247

৫। Stuart L. Hauser – Black and White Identity Formation and the Future in Arnold Dashefsky (ed) - Ethnic Identity in Society, Chicago 1976, p. 167.

৬। T. B. Bottomore – Modern Elites in India in T. K. N. Onnithan, Indra Dev, Yogendra Sing (eds) - towards a Sociology of culture in India, New Delhi 1965. p 180.

৭। উপেন্দ্রনাথ বর্মন ঃ ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবনচরিত, জলপাইগুড়ি ১৩৮৭, পৃ-১০।

৮। W. W. Hunter – A Statistical Accocunt of Bengal - Vol-X. Reprint. Delhi 1984. p 353.

৯। E T. Dalton - Tribal History of Eastern India Reprint, Delhi 1973, p.90.

১০। Hunter - প্রাগুক্ত - পৃ-৩৪৮।

১১। H. H. Risley – The People of India, W Croake (ed) Reprint. Delhi 1969. p. 74-75.

১২। উপেন্দ্রনাথ বর্মন - প্রাগুক্ত পৃ- ১০-১১।

১৩। Census of India - 1911

১৪। G S. Ghurye - Caste and Race in India, Bombay - 1969, p- 284-285

১৫। C C Sanyal - The Rajbanshis of North Bengal. Calcutta 1965. p-14.

১৬। Morley · Minto Reforms এরপর অনেকগুলি জাতিসভা প্রাদেশিক আইন পরিষদে সংরক্ষণের দাবী জানিয়েছিল।

১৭। S. Banerjee - প্রাগুক্ত - p 150

বিজ্ঞান আন্দোলন ও সরকার : প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

প্রথমেই বলা দরকার এই গবেষণানিবন্ধের উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান আন্দোলন এবং সরকারের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ অনুসন্ধান করা। বিজ্ঞান আন্দোলন বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে বিজ্ঞান প্রচার বা বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ, বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার এবং রাষ্ট্রের / রাজ্যের বিজ্ঞান নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে মানুষের চাহিদাকে তুলে ধরা তথা গণমুখী উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা। আর সরকার বলতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কথা বলা হচ্ছে যদিও এরাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভারত সরকারের কথাও প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। আর পশ্চিমবঙ্গ বলতে অবশ্যই ১৯৪৭ পরবর্তী ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গকে বোঝানো হচ্ছে।

এই আলোচনার ভৌগোলিক পরিধি বা স্থান সীমানা যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ তাই তার সূচনাবিন্দু ১৯৪৭। সাতচল্লিশ মানে স্বাধীনতা; সাতচল্লিশ মানে দেশভাগ। কাজেই গোড়াতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সামনে প্রধান হয়ে দাঁড়াল উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা। সেই সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানকে পাথেয় করা হল না। উল্টে উদ্বাস্তু সমস্যার চাপে সরকার ও বিজ্ঞান আন্দোলনের পথে বিশেষ হাঁটতে পারলেন না। যে কোনও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল তার নাগরিকদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রদান করা। যেখানে নিরক্ষরতাই একটা বড় সমস্যা সেখানে বিজ্ঞান প্রচার তো দূর অস্ত্। তবে এটা ঠিকই পাঠ্যসূচির মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের সুযোগ সরকারেরই বেশি। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ প্রতিষ্ঠিত হলেও পঞ্চাশের দশকে মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শুধুমাত্র ঐচ্ছিক বিষয় ছিল।[১] ১৯৬০ এর পরে বিজ্ঞান আবশ্যক হয়। ১৯৬১-র The Indian Year Book of Education এ বলা হয় : 'বিদ্যালয় স্তরের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ সমস্ত ছাত্রদের কাছে সাধারণ বিজ্ঞান এখন বাধ্যতামূলক বিষয়'। ১৯৭৪ সালে মাধ্যমিক স্তরে নতুন পাঠ্যসূচি রচিত হয়। এতে বিজ্ঞান বিভাগে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় - গণিত, ভৌতবিজ্ঞান এবং জীবনবিজ্ঞান। একশো নম্বর করে এই তিনটি বিষয় পড়ানোর বিষয়টি সারা দেশেই প্রবর্তিত হয়; ১৯৬৪-৬৬ র কোঠারী কমিশনের প্রতিবেদনে এই সুপারিশ করা হয়েছিল। বিজ্ঞান বিষয়কে আবশ্যক করা হলেও তাতে বৈজ্ঞানিক

দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল। এই পাঠ্যসূচিতে কোন ব্যবহারিক অংশ অধ্যয়ন করার সুযোগ শিক্ষার্থীদের ছিল না। ফলে সরকারিভাবেও স্বীকার করা হয়, বিজ্ঞান হাতে-কলমে শেখা হয় না, বিজ্ঞানের তথ্য মুখস্থ করতে হয়। হাতে-কলমে বিজ্ঞান চর্চার উপযোগী যন্ত্রপাতিও স্কুলে না থাকায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্পূর্ণই থেকে যায়।[২]

এই অসম্পূর্ণতা দূর করার জন্যই বিজ্ঞান প্রচারের কাজে সরকার প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার উপর নির্ভর করতে শুরু করে। ১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদ্‌কালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বিড়লা বিজ্ঞান ও কারিগরী সংগ্রহশালা।[৩] বিজ্ঞান সংগ্রহশালার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের এই প্রয়াস এদেশে এই প্রথম। এর আগে ভারতীয় যাদুঘরে প্রাণীবিদ্যা বা উদ্ভিদবিদ্যার শাখা ছিল একথা ঠিক, কিন্তু দর্শক নিজের হাতে চালিত করতে পারবে, এমন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সামগ্রী প্রদর্শনের সুযোগ আগে ছিল না। সে হিসেবে অভিনব এই প্রয়াস এই রাজ্য তথা দেশে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটায়।

১৯৬৫-তে এই সংগ্রহশালা ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনী শুরু করে। প্রত্যন্ত গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে বিড়লা মিউজিয়ামের এই 'মিউজিও- বাঘ' প্রকল্প। এই ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনীর প্রয়াস শহর মফঃস্বলে বহু মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। ফলে সেই সব এলাকার বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী মানুষজন উপলব্ধি করেন, এরকম হাতে কলমে বিজ্ঞান শেখা আর তার প্রয়োগ করার ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী যদি এত সাড়া জাগাতে পারে তবে স্থায়ী বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে তুললে তো আরও ভাল হয়।[৪]

ইতিমধ্যে ১৯৫৮ সালে ভারতের সংসদে বিজ্ঞান নীতি ঘোষিত হয়েছে যাতে বিজ্ঞান প্রচারকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এও বলা হয় যে সরকারের লক্ষ্য হল 'বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থা, আয়োগ, স্বশাসিত নিযুক্তক এবং বিভিন্ন মন্ত্রকের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করা'। তবে পশ্চিমবঙ্গের কোন বিজ্ঞান নীতি ঘোষিত হয়নি।

'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' (প্রতিষ্ঠা - ১৯৪৮)-এর মত প্রবীন বিজ্ঞান সংগঠন হাতে-কলমে বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। ১৯৭৪এর ১৪ অক্টোবর বিজ্ঞান পরিষদে স্থাপিত হয় 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র'। এই কেন্দ্রর উদ্বোধন করতে গিয়ে রাজ্যের সেই সময়কার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় বলেন, 'কিশোর কিশোরীরা তাদের অনুসন্ধিৎসু মনের নানান প্রশ্নের উত্তর নিজেরাই পরীক্ষা করে যাতে যাচাই করতে পারে, সে ব্যাপারে এধরণের হাতে-কলমে কেন্দ্রের ভূমিকা আজ অপরিসীম'।[৫] এই বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সম্বন্ধে কিছুটা উৎসাহী হচ্ছেন। তবে এই চিত্র একমাত্রিক ছিল না। ঠিক

এর এক মাস পরে জওহর শিশু ভবনে আয়োজিত একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে রাজ্য সরকারের কোন প্রতিনিধি ছিল না। ফলে একটি সাময়িকপত্র মন্তব্য করে, 'জনশিক্ষার এদিকটির ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চিরাচরিত অনীহা দেখিয়ে এসেছেন, এবারও সেটাই চোখে পড়ল।'[৬]

১৯৭৭ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হয়; ক্ষমতার আসে ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট। প্রথম দিকে বিজ্ঞান ক্লাবের কাজকর্মে এদের অংশগ্রহণ তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। তবে ১৯৭৯ সালের ১৪ এবং ১৫ আগস্ট গোবরডাঙ্গায় যখন প্রথম বিজ্ঞান ক্লাব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখন রাজ্যের তদ্‌কালীন যুব-কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস এক শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান। এই শুভেচ্ছাবার্তায় তিনি লেখেন — "সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি ঔৎসুক্যবোধ সৃষ্টি, বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করা, প্রাত্যহিক জীবনের সাথে বিজ্ঞানের যোগসূত্র সম্পর্কে মানুষের চেতনার মানকে উন্নত করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ক্লাবগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।"[৭]

১৯৮০ সালে যখন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয় তখন রাজ্য সরকার রীতিমতো অবৈজ্ঞানিক আচরণ করে। ১৬ ফেব্রুয়ারি, সূর্যগ্রহণের দিন সরকারি ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। গ্রহণ নিয়ে নানান প্রচলিত কুসংস্কারের বিরোধিতা করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি; গ্রহণ না দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়।

তবে কয়েক বছরের মধ্যে রাজ্যে বিজ্ঞান আন্দোলন প্রসার লাভ করায় সরকারে আসীন দল অন্যরকম ভাবতে শুরু করে। ১৯৮৬ সালের ২০ জুলাই সরকারে আসীন বামফ্রন্টের গরিষ্ঠ শরিক সি.পি.আই. (এম) এর একটি পার্টি চিঠিতে (৬ নম্বর) বলা হয় — "পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার বিজ্ঞান আন্দোলনের সহায়ক হিসাবে ভূমিকা পালনে সক্ষম। বামফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন দপ্তর তাদের কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে, জনগণের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের ব্যবহারকে কিছুটা বাস্তবায়িত করতে এবং সর্বোপরি জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সক্ষম। ... এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের শিক্ষা, যুবকল্যাণ, পরিবেশ, বন, নগর উন্নয়ন, পঞ্চায়েত প্রভৃতি দপ্তরগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।"[৮] বিজ্ঞান আন্দোলনের মাধ্যমে কেন্দ্রের বঞ্চনা এবং জনবিরোধী কেন্দ্রীয় শিল্পনীতির বিরোধিতা করার কথাও এই পার্টি চিঠিতে বলা হয়। এরই রেশ ধরে ১৯৮৬ সালের ১৪ নভেম্বর, একটি প্রচারপত্র[৯] প্রকাশিত হয় যাতে সারা রাজ্যব্যাপী বিজ্ঞান আন্দোলনকে এক অভিন্ন স্রোত ধারায় রূপান্তরিত করতে রাজ্যভিত্তিক এক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ২৯ নভেম্বর ১৯৮৬ তে এক কনভেনশন আহ্বান করা হয়। এই প্রচারপত্রে সরকারের তরফে তদ্‌কালীন ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রী

সুভাষ চক্রবর্তীর নাম ছিল। এই কনভেনশন থেকেই আত্মপ্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ।

এদিকে রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান দপ্তর কিন্তু তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গোড়াতে ছিল উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দপ্তরের অধীন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিটি। ১৯৮৮র মার্চ মাসে রাজ্য সরকারের রুলস্ অব বিজনেস সংশোধিত হয়ে তৈরি হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর। তার কাজকর্ম শুরু হয় '৮৮র জুন মাস থেকে। ঐ বছরই আগস্টে একটি পরামর্শদাতা পরিষদ হিসেবে গঠিত হয় রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংসদ।[১০] এই প্রকল্পের প্রস্তাবক কেন্দ্রীয় সরকার। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই প্রস্তাব পেশ করা হয়। ১৯৮১-তে এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর ব্যাঙ্গালোরে একটি সর্বভারতীয় কর্মশালার আয়োজন করে। এই কর্মশালায় প্রতিটি রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংসদ (কাউন্সিল) গঠনের পক্ষে ঐক্যমতে পৌঁছোয়। তবে এর কোন স্বয়ংশাসিত চরিত্র বা কার্যকরী ক্ষমতা ছিল না। এই দপ্তর বা সংসদ কারুরই তাদের প্রকল্প রূপায়ণ করার জন্য কোন টাকা বরাদ্দ করার ক্ষমতা ছিল না। ফলে অর্থমঞ্জুরীর জন্য তাদের নির্ভর করতে হত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন আন্ডারটেকিং, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্পোরেশন বা বেসরকারি সংস্থার ওপর, কিন্তু তাদের নিয়ন্ত্রণ করার কোন ক্ষমতা দপ্তর বা সংসদের না থাকায় প্রকল্পগুলো লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। এই প্রকল্পগুলোকে সরকারিভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে[১১] (১) রিমোট সেন্সিং, (২) বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ এবং (৩) সমাজ সম্পর্কিত কার্যক্রম।

সরকাবি প্রতিবেদনে বলা হয়, কেন্দ্রীয় সরকার এই দপ্তরের জন্য অর্থ বরাদ্দ করলেও তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খরচ করা যায়নি। ঠিকমত হিসেবও রাখা হয়নি। স্বভাবতই পরে ভারত সরকার নতুন অর্থ বরাদ্দ করতে নিরুৎসাহিত হয়েছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাউন্সিলের পঞ্চম সভায় (১০ ডিসেম্বর '৯০), মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ভারতের আটটি রাজ্যে (উত্তর প্রদেশ, তামিলনাডু, কর্ণাটক, ওড়িশা, ত্রিপুরা, হিমাচলপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব) যেমন স্বশাসিত কাউন্সিল গড়ে উঠেছে সেরকম এরাজ্যেও গড়ে তোলা হবে। মুখ্যসচিব বলেন, এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ব্যয় করে প্রকল্প রূপায়ণ করা যাবে। এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর, মন্ত্রীসভায় অনুমোদন লাভের জন্য একটি প্রস্তাব রচনা করে এবং তা গৃহীত হয়। ১৯৬১র পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আইন অনুযায়ী 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাউন্সিল' পঞ্জীকৃত হয় ১৯৯৩এর ১৪ অক্টোবর।[১২]

তারপর থেকে সরকারি তরফে বিজ্ঞান প্রচারের কাজে জোয়ার আসে। ১৯৯৪ সাল

থেকে শুরু হয় রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস। এর দুটো দিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য — (১) বাংলা ভাষার মাধ্যমে গবেষণালব্ধ ফল উপস্থাপন এবং (২) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিজ্ঞান ক্লাবের গবেষকদেরও গবেষণানিবন্ধ পেশের সুযোগ করে দেওয়া।

সরকার যে বিজ্ঞান প্রচারের কাজে যুক্ত সংগঠন গুলির সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে আগ্রহী তার প্রমাণ মেলে বিজ্ঞান দপ্তরের কাজকর্মে। যেমন ১৯৯০ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর, ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে যে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন করে তাতে ৮৬টি বিজ্ঞান সংগঠন যোগ দেয়।[১৩] এর আগে ১৯৮৯ সালের ১৯-২০ মার্চে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের প্রথম রাজ্য সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মঞ্চের সভাপতি শঙ্কর চক্রবর্তী বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ গ্রামবাংলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের জন্যে উদ্দ্যোগী ব্যক্তি ও সংস্থাদের সাহায্যের জন্য যেভাবে এগিয়ে আসছেন তা খুবই প্রশংসনীয়। বিভিন্ন কর্মোদ্যোগ রূপায়ণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের ওপরেও তারা বিশেষ আস্থা পোষণ করেছেন।''[১৪]

১৯৯৫ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজে বিভিন্ন জনমুখী বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মসূচী পরিচালনার জন্য বিজ্ঞান সংগঠনের ভূমিকাকে স্বীকৃতি জানানোর উদ্দেশ্যে চালু করে 'মেঘনাদ পুরস্কার'। পাশাপাশি 'সত্যেন্দ্র পুরস্কার' নামে আর একটি পুরস্কারও চালু হয় যা দেওয়া হয় বাংলা ভাষায় স্কুল ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী জনপ্রিয় বিজ্ঞান পুস্তকের লেখককে। অর্থাৎ, বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজে বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন তথা ব্যক্তির নানাবিধ প্রয়াসের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা সহযোগীর। তাই দপ্তরের 'ত্রৈমাসিক মুখপত্র'-র চতুর্থ সংখ্যায় (পরে যার নাম হয় 'বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রগতি') মন্তব্য করা হয় — পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নবগঠিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের যে কয়টি প্রধান কর্মসূচি রয়েছে, বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ রসদ যোগানো তার অন্যতম।[১৫]

কিন্তু এখান থেকে যদি মনে কবা হয় এরাজ্যে বিজ্ঞান আন্দোলন এবং সরকারের মধ্যেকার সম্পর্ক একমাত্রিক এবং তা শুধুমাত্র সহযোগিতার তাহলে ভুল করা হবে। যেসব ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আন্দোলন সরকারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির বিরোধিতা করেছে সেখানে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে আবার কেন্দ্র - রাজ্য সরকারের বিষয়টিও লক্ষণীয়। যেমন, ১৯৯৮ এর পোখরান বিস্ফোরণের পর বিজ্ঞান আন্দোলনের পরমাণু অস্ত্রবিরোধী প্রচারাভিযানের সময় কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার ছিল আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায়। আবার এরাজ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব যখন ১৯৮৭ সালে সরকারি তরফে ওঠে তখন গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ এবং অ্যান্টি নিউক্লিয়ার ফোরাম এই উদ্যোগের বিরোধিতা করে। অর্থাৎ পরমাণু শক্তিকে

কেন্দ্র করে বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে সরকারের সংঘাত শুরু হয়ে যায়।[১৬] এই সংঘাত আবার দেখা যায় যখন ১৯৯৯-২০০০ সালে ফের এরাজ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব ওঠে।[১৭]

সংঘাতের আর একটি ক্ষেত্র হল উন্নয়ন বনাম পরিবেশের প্রশ্ন। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিবেশের পক্ষে কতটা ভাল এই প্রশ্ন তুলে প্রতিবাদী হয়েছেন বিজ্ঞান কর্মীরা। এপ্রসঙ্গে রাজারহাট উপনগরী গড়ে তোলার জন্য কৃষি ও জলা জমি বোজানোর বিরুদ্ধে এবং গড়িয়াহাটে উড়ালপুল নির্মাণের প্রয়োজনে গাছ কাটার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকর্মীদের জোরালো প্রতিবাদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

আবার স্বাস্থ্যক্ষেত্রে একই সঙ্গে সহযোগিতা এবং সংঘাত প্রত্যক্ষ করা যায়। মরণোত্তর দেহদান আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রধান সংগঠক গণদর্পনের মুখ্য সহযোগী রাজ্য সরকার। আবার যখন স্বাস্থ্যব্যবস্থার দুরবস্থার অভিযোগ এনে কোন বিজ্ঞান সংগঠন (যেমন কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি) আন্দোলন করেছে তখন সরকারের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে।[১৮]

অনেক সময় বিজ্ঞানমনস্কতা বিকাশের অনুকূল আইন প্রয়োগ না করার অভিযোগে রাজ্য সরকারের সঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলনের সংঘাতমূলক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। যেমন ১৯৫৪-র 'ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিজ অবজেকশনাবল অ্যাডভারটাইজমেন্ট অ্যাক্ট' প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সরকারের শৈথিল্যের অভিযোগ এনেছে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ। ২০০০ সালের জানুয়ারিতে এই ইসুকে কেন্দ্র করেই সরকারি পুলিসের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন রাজ্যের বিজ্ঞান কর্মীরা। আবার জ্যোতিষচর্চার মত অবৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের সম্মেলনে সরকারি মন্ত্রীর উপস্থিতি এক সরকারি প্রেক্ষাগৃহ ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন বিজ্ঞান কর্মীরা।[১৯]

বিজ্ঞান আন্দোলন এবং সরকারের সম্পর্ক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আর একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তোলাও জরুরি। ভুবনীকরণ, উদারীকরণ প্রভৃতি প্রবণতা এবং নীতির ফলে ভারত সরকার যেমন প্রযুক্তি প্রসারের ওপর জোর দিচ্ছেন আমাদের রাজ্য সরকারও তথ্যপ্রযুক্তি, প্রায়োগিক বিজ্ঞান প্রসাবের ওপরই গুরুত্ব দিচ্ছেন। কাজেই বিজ্ঞান খাতে যে অতি অল্প অর্থ বরাদ্দ হয় তা ব্যয়িত হচ্ছে প্রযুক্তি উদ্ভাবনে; সামরিক গবেষণার জন্য অর্থব্যয় হচ্ছে। ফলস্বরূপ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ এবং বিজ্ঞানচেতনা প্রসার ও জনমুখী বিজ্ঞান প্রয়োগে অর্থ বরাদ্দ কমে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে এই সমস্ত খাতে অর্থ মঞ্জুরি বৃদ্ধি এবং জনপ্রযুক্তির প্রসার বিজ্ঞান আন্দোলনের এক বড় দাবি। আর অবশ্যই সেটা আগামী দিনে সরকার এবং বিজ্ঞান আন্দোলনের সংঘাতের একটা বড় ক্ষেত্রে পরিণত হতে চলেছে।

এই সংঘাতগুলো সবটাই যে নেতিবাচক তা নয়। এই সংঘাতের ফলে সরকারি নীতিতেও পরিবর্তন ঘটেছে। স্থানীয় মানুষের চাহিদা অনুসারে উন্নয়নপ্রকল্প গৃহীত হয়েছে। তবে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত বোধহয় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের ঘটনা। ১৯৮০র ১৬ ফেব্রুয়ারি গ্রহণ দেখার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ভূমিকা ছিল নেতিবাচক। কিন্তু ১৯৯৫-এর ২৫ অক্টোবর সূর্যগ্রহণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর গ্রহণ দেখার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে নিরুৎসাহিত করলেও বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনের সঙ্গে ঐ দপ্তরের সংঘাত শুরু হয়, সেইসময় বিজ্ঞান দপ্তর থেকে, বিশেষত মন্ত্রী শঙ্কর সেনের উদ্যোগে, ভয় না পেয়ে কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ দেখার জন্য প্রচার করা হয়। অর্থাৎ একটা ঘটনাতেই দেখা যাচ্ছে সংঘাত থেকে সহযোগিতাতে উত্তরণ।[২০]

আবার ভূগর্ভস্থ পানীয় জলে আর্সেনিক দূষণের ভয়াবহ সমস্যার গুরুত্ব তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আন্দোলনের ভূমিকা অপরিসীম। এদের ক্রমাগত প্রচারের ফলে সরকার এ সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন এবং তা দূর করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

এই আলোচনার উপসংহারে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলন এবং সরকারের পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস একমাত্রিক নয়। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক সহযোগিতামূলক হলেও সরকারি নীতি প্রণয়ন ও তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং বিজ্ঞানমনস্কতার বিকাশ ঘটানোর ব্যাপারে সংঘাতের ইতিবৃত্তান্তও নেহাৎ কম নয়। তবে সংঘাত থেকে সহযোগিতায় উত্তরণও এরাজ্যে ঘটেছে যা বিজ্ঞান আন্দোলনের নিজস্ব শক্তিরই ইঙ্গিতবাহী।

সূত্রনির্দেশ

১। মৃণাল কান্তি দত্ত, *The origin and Development of the West Bengal Board of Secondary Education*. Cal, 1988, p-24.

২। কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত, '*সাম্প্রতিক সংবাদ*', '*ত্রৈমাসিক মুখপত্র*', বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জুলাই - সেপ্টেম্বর, সংখ্যা -৩, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা - ৩০।

৩। বি. আই. টি. এম., চল্লিশ বছর উদযাপন স্মরণিকা, ১৯৯৯।

৪। Chatterjee Sabyasachi. *A Historical Study of the Science Club Movement in Bengal*, QRHS. Vol-39, No-142, p-77.

৫। জয়ন্ত বসু, *বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রেক্ষাপটে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ* ঃ পঞ্চাশ বছর পরিক্রমা, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা-১৬৩।

৬। *'দেশ'*, ডিসেম্বর ৯, ১৯৭৪।

৭। Proceedings of All India Science Club conference held in 1979 at Gobardanga. p-2.

৮। *৬ নম্বর পার্টি চিঠি*, ২০ জুলাই ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-৬।

৯। 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান আন্দোলন প্রস্তুতি কমিটি' প্রচারপত্র, ১৪ নভেম্বর ১৯৮৬।

১০। সরকারি নথি W. B. S. C. S. T /A/0080/0142/96

১১। পূর্বোল্লিখিত।

১২। পূর্বোল্লিখিত।

১৩। রীতা ব্যানার্জী, *'জাতীয় বিজ্ঞান দিবস'*, *'ত্রৈমাসিক মুখপত্র'*, সংখ্যা - ৪, জুলাই - সেপ্টেম্বর ১৯৯০, পৃষ্ঠা - ৪১-৪৪।

১৪। শঙ্কর চক্রবর্তী, *'পশ্চিমবাংলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রায়োগিক সমস্যা ও সমাধানের রেখাচিত্র'*, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, প্রথম রাজ্য সম্মেলন, রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তাব, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, ১৯-২০ মার্চ '৮৯।

১৫। রীতা ব্যানার্জী, পূর্বোল্লিখিত।

১৬। প্রদীপ দত্ত (সম্পাদিত), *'কেন আমরা পরমাণু শক্তির বিরুদ্ধে'*, অ্যান্টি নিউক্লিয়ার ফোরাম (পশ্চিমবঙ্গ), কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৮৯ এবং *'পরমাণু বিদ্যুৎ নয়, চাই বিকল্প'*, গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, ডিসেম্বর '৯২।

১৭। *'কেন আমরা পরমাণু বিদ্যুৎ-এর বিরোধী'*, ক্যানিং বিজ্ঞান তৃষ্ণা, তারিখ অনুল্লেখিত এবং *'পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিদ্যুৎ-এ উন্নয়ন চাই না'*, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *যুক্তিবাদী* সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং, জুলাই ২০০০।

১৮। ডাঃ বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, 'আন্ত্রিক নয় কলেরা ঃ বিশ্বব্যাপী মহামারীর আশঙ্কা', যুক্তিবাদী, বর্ষ-২, সংখ্যা-৪, ১৯৯৩।

১৯। 'যুক্তিবাদী', বিশেষ আইনি সংখ্যা, বর্ষ-৩, সংখ্যা-৩, ১ মার্চ ১৯৯৪।

২০। সবুজ মুখোপাধ্যায়, *'গণবিজ্ঞান আন্দোলনের পথে পশ্চিমবঙ্গ — সূর্যগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা'*, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মাস কমিউনিকেশন' বিভাগের অপ্রকাশিত অধ্যয়ন পত্র, ১৯৯৬।

সারাংশ

ভারতের প্রথম জাতীয়তাবাদী বিজ্ঞান আন্দোলন
ও
ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার

ইন্দ্রনীল মজুমদার

উন্নাসিক আত্মঅহংকারী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শক্তির কাছে প্রায় পাঁচহাজার বছর পুরাতন ঐশ্বর্য্যশালী ভারতীয় সভ্যতা ছিল মধ্যযুগীয় বর্বর-অসভ্য 'কালা আদমী'-দের ঘৃণ্য জাতি। মিল যাকে চিহ্নিত করেছেন In truth the Hindu, like the eunuch, excels in the qualities of a slave" বলে। প্রাচীন ভারতীয় ভাষাগুলি সম্পর্কে মেকলে বলেছিলেন এই ভাষাগুলি ইয়োরোপীয় ভাষাগুলির তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট এবং ভুলে ভরা। মেকলে আরো বলেছেন A single shelf of a good European Library was worth of whole Native Literature of India and Arabia আসলে এটিকে কোন সভ্যতার আত্মঅহংকার বললে সভ্যতা শব্দটির অপপ্রয়োগ করা হয়। আসলে এটি ছিল আধুনিক প্রযুক্তি, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী বণিক শ্রেণীর ভাষা। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা যে white man burden এর কথা বলে তারা যে সমাজ তৈরি করতে চেয়েছিল তা ছিল A Class of persons Indian in blood and colour but English in test opinion and intellect এই রকম একটিসার্বিক আগ্রাসনকামী শক্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষকে তথা বাংলার মানুষকে চিন্তা করতে হয়েছিল চিরাচরিত সংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান ধারণাকে বিসর্জন দিয়ে আধুনিক চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার প্রকৌশলকে আয়ত্ব করতে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রামমোহনই ছিলেন সেই পথের প্রথম পথ প্রদর্শক। এ. এফ সালাউদ্দিন আহ্‌মেদ দেখিয়েছেন যে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রামমোহন ১৮১৩ আইন অনুযায়ী ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্ট-কে একটি চিঠি পাঠান যেখানে তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে তিনি বলেছেন "the introduction and promotion of Western Science of the Educational Curriculum of India". রামমোহনের এই পথ অবলম্বন করেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত, কৃষ্ণ মোহন ব্যানার্জী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ। অরুণ কুমার বিশ্বাস লিখেছেন ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার must be considered the first apostle who promoted the cultivation of popular science and scientific research in India, conducted controled and founded by only Indians

দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রকৃত প্রচলন সম্ভবপর করতে হলে, সেই সঙ্গে উচ্চমানের বিজ্ঞান শিক্ষা ও মৌলিক গবেষণার যে সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার — এই সত্যটি ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কখন কিভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তা বলা শক্ত। তবে 'কলকাতা জার্নাল অফ্ মেডিসিন' -এর আগষ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে প্রথম এ জাতীয় সুযোগ সুবিধার জন্য শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। 'কলকাতা জার্নাল অফ্ মেডিসিন' এর প্রবন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি বলেছিলেন —

"আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান চাই যাতে একসঙ্গে মিলিত হবে লণ্ডনের রয়্যাল ইনষ্টিটিউশন এবং ব্রিটিশ এ্যাসোসিয়েশন ফর দি এ্যাডভান্সমেন্ট অফ্ সায়েন্সর চরিত্র ও উদ্দেশ্য। আমরা যে প্রতিষ্ঠানটি চাই তার কাজ হবে জনশিক্ষা, যেখানে বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ওপর নিয়মিতভাবে বক্তৃতার ব্যবস্থা থাকবে। বক্তারা বিষয়বস্তু বোঝাবার জন্য পরীক্ষা দেখাবেন এবং শ্রোতাদেরও আহ্বান করা হবে নিজেদের হাতে সেইসব পরীক্ষা সম্পাদন করতে। আমাদের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠানটি থাকবে সম্পূর্ণরূপে এদেশীয়দের পরিচালনার এবং নিয়ন্ত্রণাধীনে"।

এই সময় ভারতীয়দের পক্ষে বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার কথা একরকম অভাবনীয় ছিল। গবেষণা বলতে যা বোঝাত তা গভর্নমেন্টের গুটি কয়েক সরকারী বা মুষ্টিমেয় ইউরোপীয় অফিসারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সব দপ্তরের মধ্যে সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ সমীক্ষার কাজে লিপ্ত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিত এই বিষয়ে বলেছেন —

"The pursuit of science and technology during his (M. Sarkar.) time was completely in colonial interest and had very little to offer Indians for indigenous aspirations and needs. তিনি আরও বলেছেন "The Asiatic Society Botanical garden, agri hortriculture society and medical college were all institute of science but their main objectives"

কাশ্মীর, সন্ত্রাসবাদ — একটি আলোকপাত

রূপক ঘোষাল

সন্ত্রাসবাদ, সন্ত্রাসবাদী, উগ্রপন্থী এই সব শব্দগুলো এখন সকলেরই জানা। সন্ত্রাসবাদ বিষয়টি নতুন নয়, তবে এর ইতিহাস এখানে আলোচ্য নয়। এখানে আলোচ্য - কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদের চেহারাটা কেমন। কাশ্মীর যেহেতু ভারতের অবিচ্ছেদ অঙ্গ, তাই প্রতিটি দেশপ্রেমিক মানুষ যেমন চাইবেন যে রাজ্যটি ভারতের থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না হয়। আবার

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী যাঁদের আছে তাঁরা অবশ্যই চাইবেন কাশ্মীরের মানুষগুলোর শান্তি ও নিরাপত্তা। কিন্তু বলা বাহুল্য সেই শান্তি ও নিরাপত্তা কাশ্মীরবাসীর জন্যে আর নেই। সমগ্র জম্মু কাশ্মীরই নয়, সমগ্র ভারতে আজ এক আতঙ্ক দিনের পর দিন ছড়িয়ে পড়ছে, বিস্তারিত করছে তার শাখা প্রশাখা। আপাতত আমাদের আলোচ্য — কাশ্মীর।

জম্মু-কাশ্মীর প্রদেশটি ভারতবর্ষের উত্তরতম অংশের একটি রাজ্য। রাজ্যটির পূর্বে চীন ও পশ্চিমে পাকিস্তান একে ঘিরে রয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ এবং ১৯৬২ পর্যন্ত নানা রাজনৈতিক ঘটনাক্রম, যুদ্ধ ইত্যাদির ফলে আজ এর পূর্ব ও পশ্চিমের অংশ বিশেষ চীন ও পাকিস্তানের দখলে। কাশ্মীর ও জম্মু অঞ্চলের অধিবাসীরা নিতান্তই দরিদ্র। স্থানীয় কিছু হস্তশিল্প এবং পর্যটনকে ঘিরেই আবর্তিত হয় এদের পেশা। দিনগুজরানের জন্যে বড় কোন শিল্প এখানে চালু হয়নি, যেহেতু এর ভৌগলিক অবস্থান প্রতিকূল। কিন্তু ভারত সরকার তথা জম্মু কাশ্মীরের রাজ্যসরকারের তরফ থেকেও কোন সুদৃঢ় বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি; ফলে রাজ্যবাসীরা চূড়ান্ত এক দারিদ্রের মধ্যেই থেকে গেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সরকার পক্ষের চরম দূর্নীতি ও অন্যায়, চুরি, বেহিসেবী অর্থ অপচয়। এটা ছিল প্রেক্ষাপটের একটা দিক। অন্য দিকটায় তৈরি হচ্ছিল হতাশা, ক্ষোভ, বিদ্রোহের প্রস্তুতি। এর সঙ্গে যুক্ত হলো বৈদেশিক ইন্ধন। জম্মু কাশ্মীরের অবশিষ্ট অংশ দখল করতে চায় পাকিস্তান। আর বহুজাতি অধ্যুষিত রাষ্ট্রের রাজ্যগুলির অনেক সময় বিচ্ছিন্নতাবাদী একটা প্রবনতা, প্রাদেশিকতার একটা চোরা স্রোত থাকেই; সেটা কখনো কখনোও তীব্র আকার ধারণ করে। হতাশা সেই তীব্রতাকে তীব্রতর করে। আর তাতে লোভের টোপ দেয় বৈদেশিক ইন্ধন। জম্মু কাশ্মীরের অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলিম। বিচ্ছিন্নতাবাদীরাও মুসলিম। পাকিস্তানের ইন্ধনের এখানেই একটা বড় ক্ষেত্র প্রস্তুত। ১৯৪৭ সালের পর থেকে সেই পাক মদত বাড়তে বাড়তে ১৯৮৮'র সময় নাগাদ তা কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদের চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করে। জন্ম হয় বহু উগ্রপন্থী সংস্থার। আল-ফারান, আল্লাহ টাইগার্স, হিজবুল মুজাহিদিন, মুসলিম মুজাহিদিন এই সব দলের পেছনে প্রচুর টাকা ঢালতে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী দেশগুলো।

ভারত থেকে কাশ্মীরকে মুক্ত করো, তারপর নয় স্বাধীন জম্মু-কাশ্মীর। না হলে পাকিস্তানের সঙ্গে মিশে যাও। আজ পর্যন্ত যে কত হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-শিখ থেকে শুরু করে বিদেশী নিরীহ মানুষ এই পশুদের শিকার হয়েছে, তার বর্ণনা পড়লে ভয়ে শিউরে উঠবে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্বপ্রভু আমেরিকা, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এবং পাকিস্তান আজ জম্ম-কাশ্মীরে এই উন্মত্ত হিংস্রতায় অর্থ, অস্ত্র-সহ এক নিরবিচ্ছিন্ন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আই. এস. আই., এফ. আই. ইউ., প্রভৃতি পাক-গুপ্তচর সংস্থা এই রাজ্যকে

বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে সারা ভারত জুড়ে তাদের বর্বর পাশবিক নাশকতামূলক কার্য কলাপের জাল বিস্তার করে চলেছে, যার নিদর্শন দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। পাকিস্তান বলেছে এইসব মানুষ, উগ্রপন্থী নয়, এরা স্বাধীনতার যোদ্ধা বা মুজাহিদিন এবং এদের পেছনে আমরা আছি, দরকার হয় হাজার হাজার বছরের যুদ্ধ চলবে ভারত থেকে জম্মু কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নিতে। রীতিমতো সরকারীভাবে এই কথা পাকিস্তান ঘোষণা করেছে।

চক্রান্তের জাল কিন্তু বহু গভীরে প্রোথিত। আজ ভারতের বহু মন্ত্রী, আমলা, সেনা প্রধান, পুলিশ, প্রশাসনের একাংশ এবং সাধারণ মানুষও কিন্তু এই কালো অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িত। কী করবে সাধারণ সুস্থ চেতনাসম্পন্ন জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকের দল? দেশের ভেতরেই ছড়িয়ে রয়েছে বিভীষণের লক্ষ লক্ষ নিদর্শন।

একটি শেষ কথা বলে এই প্রসঙ্গের ইতি টানি। শেষের পাতায় প্রথমেই মনে পড়ে মহান মানবতাবাদী হজরত মহম্মদের মুখ। সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী শুধু তাঁর মুখেই থেমে থাকেনি, সকল মানুষের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন ঈশ্বর। তাঁকে হত্যা করতে হিংস্র হয়ে উঠেছিল একদল পশু। তবে কি তারা আজকের এই আতঙ্কবাদীদেরই পূর্বপুরুষ? গোটা বিশ্ব শুধু আজ বলে নয়, ইতিহাসের যে দিন থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্ম, সেদিন থেকেই বৈষম্যের শিকার। আর এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে শাসক বিরোধী বহু বিপ্লব ঘটে গেছে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে নিরীহ মানুষকে নিষ্ঠুর আঘাত করার মতো উগ্রপন্থী পশুদের এই জঘন্য কার্যকলাপ কোনও বিপ্লবের পেছনে নেই। উগ্রপন্থীরা যাদের প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছে বলে দাবী করছে, কোন্ যুক্তিতে তারা অন্যায়ের শিকারদেরই হত্যা করছে নিষ্ঠুরতম ভাবে, তার উত্তর তারা দিতে পারে? এর সমাধান খুব সহজ নয়। কারণ আমরা, শাসক ও শাসিত সকলেই এর সঙ্গে জড়িত। আমাদের লোভ আজ আমাদেরই দোরগোড়ায় সর্বনাশের কড়া নাড়ছে। সমগ্র মানুষের চেতনা পৃথিবীর কোথাও কোনও দিনই আসেনি। অতএব প্রতীক্ষা - শেষের সেই ভয়ংকর দিনের জন্যে।

উত্তরবঙ্গে ইতিহাসের ঘরবাড়ি

ধনঞ্জয় রায়

অষ্টাদশ শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের গোড়া থেকে ইংরেজরা উত্তরবঙ্গে শহর বিন্যাস সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রিঃ) থেকে শুরু করে লর্ড কার্জনের (১৮৯৯-১৯০৫ খ্রিঃ) শাসনকাল পর্যন্ত চলেছিল জেলাগুলি উন্নয়ণের জোর পরিকল্পনা। এই সময়কালে যে সব বাড়িঘর স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিদের একাংশ এবং ইংরেজরা এখানে তৈরি করেছিলেন, ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়াও স্থাপত্যকীর্তি হিসেবে তার মূল্য ছিল অপরিসীম। জেলাগুলিতে এই সময় প্রাসাদোপম ঘরবাড়ি, প্রশস্ত রাস্তাঘাট, ক্রমবর্ধমান জনতার সমাবেশ, একদিকে যেমন একে দিয়েছিল টাউন অব প্যালেসেস-এর মর্যাদা, অপরদিকে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্তরোত্তর প্রাধান্য সমাজে সঞ্চারিত করেছিল নতুন জীবনের প্রাণস্পন্দন।[১] ১৭৮০-১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির আমলে দিনাজপুর রাজ জমিদারীর অংশ ক্রয় করে এই সময় দিনাজপুর জেলায় আরও অনেক অভিজাত পরিবারের অস্তিত্ব গড়ে উঠে। এইসব জমিদারদের মধ্যে মালদুয়ার, হরিপুর, বাহিন, চূড়ামন, জগদল, মনহলি, বড়ালকুঠি প্রভৃতি জমিদার বংশগুলির নাম উল্লেখযোগ্য। এইসব জমিদারদের বেশির ভাগেরই উৎপত্তি হয়েছিল দিনাজপুর রাজেব দেওয়ান দেবীসিংহের কুকীর্তির বলে রাজসম্পদ ও জমিদারী হরণসূত্রে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পতিরাম সমৃদ্ধ ও ইতিহাস খ্যাত অঞ্চল। বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের অন্যতম শরিক রঘুনন্দন ঠাকুরের বিশাল জমিদারী এখানে। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর পরিবারের কাছারি বাড়িটি নির্মিত হয়েছিল আত্রাই নদীর পূর্বতীরে। বিরাট আয়তনের মধ্যে ১২টি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ভবনের মধ্যে সদরমহল, অন্দরমহল, কাছাবিঘর যেন একটি ক্ষুদে রাজবাড়ি। ইতালীয় শিল্পকলার[২] সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ভবনটি বর্তমানে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকার গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এর অস্তিত্ব শিথিল হয়ে পড়েছে, তার ছাদ ও দেয়ালের পলেস্তারা খসে কঙ্কাল চেহারা ফুটে উঠেছে।

খণ্ডিত উত্তরবঙ্গে[৩] বাঙালি মনীষার ব্যক্তিত্ব ও পুরানো স্থাপত্য রীতির ঘরবাড়ির পুরাকীর্তি নিতান্তই সীমিত। প্রত্ন ছোঁয়া এইসব ঘরবাড়ি সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা নেই বললেই চলে। (খোদ কলকাতা শহরে কোন্ বাড়িতে ঋষি অরবিন্দ জন্মেছিলেন? কোন্ বাড়িতে মধুসূদন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন? মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির জন্য বেছে

নেওয়া হয়েছিল কোন্ জায়গাটি? কোন্ জায়গায় পাওয়া যাবে নবাব ওয়াজির আলির সমাধি? আমরা কি জানি? এসবের খবর যেমন আমরা জানি না, তেমনি সঠিকভাবে সন্ধান দেবার চেষ্টাও প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ করে না।) তেমনি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পতিরামে পিরালি কাছারী কোথায়? এই প্রজন্মের তরুণেরা তার আর হদিশ রাখেও না, দিতেও পারে না। পুরা বিভাগের অবজ্ঞায় বালুরঘাটে আরও দুটি প্রাচীন কাছারী ধ্বংসের পথে। এদের একটি ধনপৎ সিংহের 'কুঠি কাছারী' অপরটি জমিদার শ্রীনাথ সান্যালের 'সাহেব কাছারী'। উত্তর দিনাজপুরে রায়গঞ্জের অদূরে দুর্গাপুর জমিদার বাড়ির পুরনো স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কীর্ত্তি এখনও জীবন্ত হয়ে আছে। এমন একটা সময় গেছে যখন অনেক ইংরেজই এই বাড়িতে প্রবেশ করে দেখেছেন স্বদেশের একটি নস্টালজিক প্রতিচ্ছবি। এর বাস্তব পরিবেশটিকে বাদ দিলে এই বাড়ির মধ্য থেকে এখনও ভেসে আসে ইংলন্ডের শেষ আঠারো অথবা গোড়ার দিকে উনিশ শতকের হারিয়ে যাওয়া যুগের হুবহু অনুকরণ। এই বাড়িটি এখনও টিকে আছে জমিদারপুত্র শিবপ্রসাদ রায়চৌধুরীর দৌলতে।

মালদার চাঁচল রাজের জমিদারীর উদ্ভব হয় বর্গির হাঙ্গামা কালে। না, বুলডোজারের চাপে চাঁচল রাজের বাসভবনটি নিশ্চিহ্ন হয়নি। তবে পলেস্তারা খসে পড়ছে, জায়গায় জায়গায় ফাটল, তারই ফাঁকফোকরে অশ্বত্থের শেকড়, দেয়ালের গায়ে ইটের পাজরা, এইভাবে নষ্ট হচ্ছে এককালের শৌখিন ইমারতের জলুস। এই রাজপ্রাসাদের স্থাপত্য রীতির বিশেষত্বগুলির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় সূচিমুখ খিলান, মেহরাব, গোল খিলান, স্থূলাগ্রখিলান, শিকল, ঘন্টার মোটিফ। বিচিত্র পত্রপুষ্প ও জ্যামিতিক নকশার অলংকরণ প্রাক্ মুসলিম ও মুসলিমোত্তর যুগের শিল্পকলার নিদর্শনকে মনে করিয়ে দেয়। মালদার শেরশাহীর জমিদার প্রাসাদ, জমিদার আশুতোষ চৌধুরীর বাসভবন, হায়াৎ আলিখান চৌধুরীর সাবেক বাসভবন প্রভৃতি কোনওটি মুসলিম স্থাপত্য রীতিতে গড়া, কোনওটি ইতালীয়, সারাসেন ও বাইজান্টাইন ধারার তাঁবু, দন্ড, সমমুক্ত জাফরির কাজ, ঝুলন্ত দন্ডপ্রায় অলংকরণ ইত্যাদির সমন্বয়ে তৈরি। মালদার জমিদার আশুতোষ চৌধুরীর বাসভবনটির ইট খসে খসে জায়গায় জায়গায় স্তূপে পরিণত হয়েছে, দরজা জানালা ও ছাঁদের কার্নিশে বড় অশ্বথ গাছ ডালপালা ছড়িয়ে আরামে ছায়া বিতরণ করছে। ঐতিহ্যমন্ডিত এই প্রাসাদটি যত্ন-আত্তি করলে আজকের প্রজন্মের কাছে পুরনো স্থাপত্যরীতির অন্যতম নজীর রূপে পরিচয় পেত। এই প্রজন্মের কেউ আজ বলতে পারবে না বাঙালির বিশিষ্ট মনীষী মালদার বিনয় সরকার কোন্ বাড়িটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে কোন্ বাড়িটি ছিল পন্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর? শিবরাম চক্রবর্তী চাঁচলে কোন্ বাড়িটিতে থাকতেন? আমরা আজ অনেক কিছুই নষ্ট করে ইতিহাস ও রুচিবোধের প্রতি দেখাচ্ছি চরম অবজ্ঞা। আর এভাবেই অবহেলার শিকার হয়ে আমরা হারিয়ে ফেলছি আমাদের ঐতিহ্য।

রাজা প্রসন্নদেব রায়কতের সময়ে সঙ্গীত, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে জালপাইগুড়ি রাজপ্রাসাদ শুধু উত্তরবঙ্গেই নয়, সমগ্র বঙ্গ দেশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছে। এই রাজপ্রাসাদটিই প্রথম স্থানীয় ঐতিহ্য, সৃষ্টি এবং সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্য পাশ্চাত্য স্থাপত্য রীতিকে বর্জন করেছিল। বাসস্থানটি তৈরি হয়েছিল ১৬ চালা কাঠের। এই ধরণের মোটিফ ও স্টাইলে নির্মিত রাজপ্রাসাদ বঙ্গ দেশে নেই বললেই চলে। আজ এ বাড়িটি কালের এক ঐতিহ্যমন্ডিত সাক্ষী। বাসভবনটি স্মরণ করিয়ে দেয় নরেন্দ্র দেব অনূদিত সুফী কবি ওমর খৈয়ামের রুবায়েৎ। 'সনাতনী প্রাসাদ যার বিপুল আকার / দীর্ঘ স্তম্ভ স্পর্শিত গগন / যাহার তোরণ দ্বারে বারে বারে নোয়াইত শির / নিস্তব্ধ গভীর / আজি তার শূন্য ঘরে ঘরে। বনের কপোত একা কাতরে কুজিয়া শুধু মরে।' জলপাইগুড়ি জেলার অন্যান্য সাবেক ঘরবাড়িগুলির মধ্যে নবাব বাড়ি স্থাপত্য রীতির এক আলোক উজ্বল নির্দশন। গৃহ নির্মাণ বিষয়ে এ জেলার প্রবাদ ঃ পূবে হাঁস*, পশ্চিমে বাঁশ, উত্তরে কলা, দক্ষিণে মেলা। দক্ষিন দেড়ে, উত্তরে বেড়ে[৬], ঘর করগে পোতা জুড়ে।

কোচবিহার রাজবাড়ির কথায় ফিরে আসি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ 'হেরিটেজ' বাড়ি রূপে ঘোষণা করেছেন কোচবিহার রাজবাড়ি। কোম্পানি সরকারের প্রধান স্থপতি মিষ্টার মার্টিন ইতালীয় স্থাপত্যকলার অনুকরণ করে রোম, ভেনিস ও ফ্লোরেন্সের বিভিন্ন ধারা ও রীতির মিশ্রণে কোচবিহার রাজাদের প্রাসাদটির নকশা তৈরি করেছিলেন। মোট ৫১ হাজার ৩ শো ৯ বর্গফুট বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে ভবনটি তৈরি করতে ব্যয় হয়েছিল ৮ লাখ ৯২ হাজার টাকা। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রাসাদটি তৈরির কাজ শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে। ইতিহাসের বহুসাক্ষী এই বাড়িটিকে ঘিরে দীপ্ত করে রেখেছে। বিশিষ্ট মণীষী স্যার আশুতোষ মুখার্জি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের সদস্যরূপে কোচবিহারে এসেছিলেন। কোচবিহার সাহিত্য-সভা তাঁকে অভিনন্দিত করেছিল।[৭] তিনি কোচবিহারে কোন্ বাড়িটিতে এসে উঠেছিলেন, তার সন্ধান অনেকেই আজ জানে না।

নিজের জায়গাতেই যে পর্যটনের প্রাচুর্য আছে, দেখার, জানার, উপভোগ করার অনেক কিছুই আছে আমরা তার খোঁজই রাখি না। টেমস্ নদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিদেশের পুরাকীর্তি, স্থাপত্যরীতিতে গড়া ঘরবাড়ি দূরদর্শনের পর্দায় দেখে তার স্মৃতি কথা আমরা গৌরবের সঙ্গে গল্প করি। অথচ, নিজের জায়গার ইতিহাস খুঁজি না, চোখ খুলে তাকাই না আমাদের চারপাশে। এখন আমাদের চোখ তথ্য প্রযুক্তির চোখ। নিজের শেকড় খুঁজি না অথচ যন্ত্র সভ্যতার দৌলতে চাই তড়িঘড়ি কাজ। বণিক সভ্যতার চাপে মানুষ সময়কে যতই করতলগত করার চেষ্টা করুক, শেকড়ের সন্ধান না পেলে ততই সে ব্যর্থ হবে।

অবহেলা, উদাসীনতায় আমাদের ইতিহাসের ঘরবাড়ি আজ ধ্বংসের পথে। যেগুলি

টিকে আছে কাল উপেক্ষা করে, সে সবের রক্ষণাবেক্ষণারও উদ্যোগ নেই। এইসব চিরত্ন সম্পদ সমাজবদ্ধ মানুষ এগিয়ে এসে প্রাণদিয়ে না আগলালে এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা যাবে না। আধুনিক সময়ের স্থূলহস্তালেপে তা বিলীন হয়ে যাবে। এরজন্য প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের দায়িত্বও অপরিসীম। মনে পড়ে, কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতার কটি লাইনঃ

'তোমাকে দেখার মত চোখ নেই
তবু গভীর বিশ্বাসে আমি টের পাই
তুমি আজো এই পৃথিবীতে রয়ে গেছো?'

উত্তরবঙ্গে ওই সময় নিম্নবর্গের মানুষেরা বাড়িঘর নির্মাণ করত সাধারণত বাঁশ, কাঠ, নল, খাগড়া, খড় প্রভৃতির সাহায্যে। উষ্ণ ও জলীয় আবহাওয়ায় কোনও কোনও অঞ্চলে ইট সহজেই নষ্ট হয়ে যেতো। বাঁশ, কাঠ, নল, খাগড়া, খড়, এইসব জিনিস দিয়ে তৈরি ঘরবাড়ির কাল জয় করবার মত শক্তি ছিল না।[৬]

* রেনেসাঁস — ''ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ খ্রিস্টাব্দ'' ইতালীয় রেনেসাঁস। স্থাপত্য-শিল্পকলায় সূক্ষ্ম পরিকল্পনা, পরিমিতিবোধ, ভারসাম্য এবং সুনির্দিষ্ট সূক্ষ্ম অলংকরণ এযুগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।
* খণ্ডিত উত্তরবঙ্গে ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, মালদহ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার।
* হাঁস ঃ হাঁস চরবার পুষ্করিণী।
* উত্তরে বেড়ে ঃ উত্তর দিক থেকে বাতাস যেন না আসে।

সূত্রনির্দেশ

১। ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ, *গৌড় বঙ্গের স্থাপত্য*, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।

২। *আবুলকালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া*, দিনাজপুর মিউজিয়াম, *দিনাজপুর মিউজিয়াম থেকে* প্রকাশিত, দিনাজপুর, বাংলাদেশ।

৩। *দৈনিক বসুমতী*, ছুটির পাতা, ৭ই জুলাই ২০০২।

৪। নিশীথ রঞ্জন রায়, *প্রসঙ্গ ঃ কলকাতা*, নাভানা, কলকাতা।

৫। কৃষ্ণেন্দু দে, নীরজ বিশ্বাস প্রমুখ সম্পাদিত, *কোচবিহার পরিক্রমা*, কোচবিহার গ্রন্থ প্রকাশনা প্রস্তুতি সমিতি, কোচবিহার।

৬। ধনঞ্জয় রায়, *উত্তরবঙ্গ ঃ উনিশ ও বিশ শতক*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা।

জলপাইগুড়ি জেলার অভিবাসী সমাজ ঃ সমন্বয় ও সংঘাতের রূপরেখা (১৮৬৯-১৯৭১)

পাপিয়া দত্ত

জলপাইগুড়ি জেলার রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক - সামাজিক - সাংস্কৃতিক ইতিহাসের রূপান্তরের ক্ষেত্রে অভিবাসী সমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। একদা 'পাণ্ডব বর্জিত', ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের পীঠস্থান এই সবুজ জনবিরল অঞ্চলের বর্তমান চেহারায় উন্নীত হওয়ার উপাদানই হলো তার আভিবাসী সমাজ। বর্তমান আলোচনার স্বল্প পরিসরে এই অভিবাসন ও তার ফলস্বরূপ জেলার আর্থসামাজিক - রাজনৈতিক চিত্রবদলের ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আলোচনার সুবিধার্থে এই প্রবন্ধকে প্রাক্-স্বাধীনতা (১৮৪৯ - ১৯৪৬), স্বাধীনতা (১৯৪৭) এবং স্বাধীনোত্তর (১৯৪৭ - ৭১) এই তিন পর্যায়ে ভাগ করেছি।

সরকারী নথি পত্রাদির ভিত্তিতে বলা যায় উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে জেলায় অভিবাসন জনিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ক্রমোচ্চ ও ব্যাপক।[১] শহর এবং গ্রামাঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে জেলার এই দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ও বৈশিষ্ট্য ছিল স্বতন্ত্র।[২] সরকারী খাসমহলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং জেলা সৃষ্টির পর প্রশাসনিক প্রয়োজনে স্থাপিত হয় অফিস - আদালত। সেইসূত্রে আইনজীবী, মোক্তার, পেশকার, ক্রমে ডাক্তার, সরকারী কর্মচারী ইত্যাদি নানা কাজের সূত্র ধরে পূর্ববঙ্গ ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে মানুষ আসতে শুরু করেন।[৩] ব্যবসার প্রয়োজনে এবং নানা ধরণের অ-কৃষি মূলক কাজকে কেন্দ্র করে এসেছিলেন সাহা, মাড়োয়ারী, বিহারী, উত্তরপ্রদেশের অধিবাসীগণ।[৪] নব্বই এর দশক থেকে চা বাগানের সূত্রে ডুয়ার্স অঞ্চলে অভিবাসন ঘটেছিল।[৫] চা বাগানের প্রয়োজনে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনা থেকে ওরাঁও, মুন্ডা, সাঁওতাল ইত্যাদি বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নর-নারী ও শিশু।[৬] চা বাগানকে কেন্দ্র করেই এবং অভাবের চাপে নেপাল থেকে আসতে শুরু করেন নেপালী ও অন্যান্য পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা।[৭] কর্মবিভাজনের ফলে এখানে বাগানের মালিক ছিলেন বিদেশী সাহেব (যদিও দেশীয় উদ্যোগে দু-একটি চা-বাগিচা গড়ে উঠেছিল, তবে সামগ্রিক হিসেবে তা ছিল নগণ্য), পরিচালন ব্যবস্থায় ছিলেন ইংরেজ

সরকারের 'তল্পিবাহক' মাঝারি ও নিম্নস্তরের বাঙালী বাবু আর শ্রমিকরা হলেন উল্লিখিত আদিবাসী।[৮] কোন কোন সূত্র থেকে জানা যায় পাঠান ও মুঘল বিজয়ের অব্যবহিত পরে মুসলিম সৈনিকও কিছু সংখ্যায় এসেছেন।[৯] কালের নিয়মে সহাবস্থান ও পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে এরা সকলেই হয়ে পড়েছেন স্থানীয় অধিবাসী।

এতো গেল শহরের কথা, গ্রামাঞ্চলের চিত্র ছিল খানিকটা স্বতন্ত্র। তিস্তার পশ্চিমে ও পূর্বের সামান্য কিছু অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত ছিল। কৃষি ছিল একান্ত পশ্চাৎপদ। এই অঞ্চলে মূলত কৃষিকে ভিত্তি করে এসেছিলেন - দিনাজপুর, রংপুর এবং পূর্ণিয়া, গোয়ালপাড়া থেকে প্রচুর সংখ্যক কৃষক।[১০] যারা উন্নত কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতির গোড়াপত্তন করে ক্রমশ স্থায়ী অধিবাসী বনে গিয়েছিলেন।

এদের আগমনের কারণ হিসেবে বলা যায়, বৈকুণ্ঠপুরের রাজারা কৃষির সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের সামরিক বৃত্তিধারী লোকেদের অভিবাসনে উৎসাহিত করেছিলেন।[১১] এছাড়া চাষ-আবাদের জন্য দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক চাষী বিশেষত মুসলমান চাষী বসিয়ে ছিলেন পতিত জমি চাষের জন্য।[১২] প্রতিবেশী জেলা থেকে লোক আসার কারণ হিসেবে সান্ডার্স রিপোর্টে বলা হয়েছে জমির খাজনার উচ্চহার এবং তা আদায়ে জোতদারদের কঠোরতা।[১৩] আধুনিক চিন্তাবিদগণের অনেকে তিস্তার পূর্বপার অর্থাৎ Regulated অঞ্চলটিকে Sehlers town বলে অভিহিত করেছেন। এদেব অধিকাংশই ছিল পূর্ববঙ্গের লোক ও কিছু মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী। কাঠ ব্যবসার সূত্র ধরে বহু বাঙালী বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের সুখানী গ্রামে এসেছিলেন, যেটি ছিল সেই সময়ের প্রশাসনিক কেন্দ্র।[১৪] ভিন্ন রাজ্য থেকে যারা এসেছিলেন তাদের একটি বড় অংশ চা বাগানে গেলেও চাষ বাসের কাজেও নিযুক্ত হয়েছিলেন অনেকে। ডুয়ার্সের জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষ — আবাদ করার জন্য ইংরেজ সরকার ছোটনাগপুর থেকে সাঁওতালদের আনার জন্য নানারূপ পরিকল্পনা ও সুযোগ সুবিধা দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, যদিও মূল উদ্দেশ্য ছিল শুল্ক আদায়।[১৫] ইংরেজ শাসন প্রবর্তন, জেলাস্থাপন, চা বাগানের প্রসার ও রেললাইনের সূত্র ধরে পরবর্তীকালে বাঙালী হিন্দুরা আসতে শুরু করেন ব্যাপক হারে।[১৬]

জেলার জনবিন্যাসের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৮৭২ সালের আদমসুমারীতে বেভারলি লিখে ছিলেন 'In the recently acquired Dooars the Population is 67 to the squire mile ......ম' ১৮৮১ সালে আলিপুরদুয়ার মহকুমায় প্রতিবর্গমাইলে লোক সংখ্যা ছিল ৫৭ জন ও ১৮৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৮৯ জন দাঁড়ায়।[১৭] ডুয়ার্সের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির একটি পরিসংখ্যান দেওয়া যাক।

বছর	জনসংখ্যা
১৮৬৪-৬৫	৪৯,৬২০
১৮৭২	১০০,১১১
১৮৯১	২,৯৬,৯৬৪

ডুয়ার্সের এই বাড়তি লোক এসেছিল পার্শ্ববর্তী জেলা ও রাজ্য থেকে। নিম্নলিখিত সারণী দিয়ে বিষয়টি লক্ষ্য করা যেতে পারে।

জেলা / রাজ্য	লোকসংখ্যা
দার্জিলিং	১৫৮৮
দিনাজপুর	৫০৫
রংপুর	১০,১০১
কুচবিহার	৩২,২২৪
অন্যান্য জেলা ও প্রদেশ	১,১৪,২৭৭

তাহলে দেখা যাচ্ছে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো থেকে মাত্র ৪৪,৪১৮ জন লোক এসেছেন। কিন্তু তুলনায় প্রতিবেশী রাজ্য থেকে ১,১৪,২৭৭ জন লোক এসেছেন। অর্থাৎ প্রায় তিনগুণ বেশী। অন্য প্রদেশ অর্থাৎ বিহার ও মধ্যপ্রদেশ থেকে চা বাগানের সূত্রেই লোকেরা এসেছিলেন। আবার প্রতিবেশী জেলাগুলোর মধ্যে কোচবিহার ও রংপুর থেকেই সবচেয়ে বেশী লোক এসেছেন এবং এরা অধিকাংশই রাজবংশী কৃষক।[১৮]

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সূচিত হয় ব্যাপক আভ্যন্তরিণ ও বাহ্যিক পরিবর্তন, যা জেলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। শহর ও গ্রামাঞ্চলে এই পরিবর্তনও ছিল ভিন্ন ধরণের। শহরে - বন্দরে মিশ্র সাংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে শুরু করে। শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটতে শুরু করে।[১৯] শহরে বসবাসকারী অনেকে কালক্রমে জেলায় ও বাইরে ছোট-বড় শিল্পের উদ্যোগপতি হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। সর্বভারতীয় আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের শরিক হিসেবে জেলার অভিবাসী জনগণের অনেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনের আঞ্চলিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

দেশবিভাগের পর পরিস্থিতি ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। আগমন বিশেষত পূর্ববঙ্গ থেকে অব্যহত থাকলেও আগমনকারীদের নতুন নামকরণ হয় 'উদ্বাস্তু'। এই উদ্বাস্তুদের একটি বড় অংশ ছিলেন নমঃশূদ্র চাষী। তাদের উদ্যোগে ও পরিশ্রমে কালক্রমে শুধু যে চাষের এলাকারই প্রসার ঘটে তাই নয়, চাষ বাসের রীতি প্রযুক্তি ও ফসলের প্রকৃতির ও পরিবর্তন ঘটে।[২০] এই উদ্বাস্তু নবইহুদী সমাজ অর্থনৈতিক - সমাজতত্ত্বের নিয়ম অনুযায়ী

স্বভাবতই চলমান, উদ্যমী। তাই পুরোনো দিনের জোতদারদের পরিবর্তে একধরণের সম্পন্ন বিত্তবান কৃষক, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের উদ্ভব ঘটে, যার ফলস্বরূপ সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়।[২১] জেলার আদি অধিবাসীদের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ব্যবধান ক্রমশ দ্বন্দ্বের রূপ পরিগ্রহ করে। যার প্রকাশস্বরূপ বিভিন্ন ধরণের সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। তবে এই মনঃস্তাত্ত্বিক সাংস্কৃতিক বিবাদ - বিসংবাদ বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের আগে কখনোই হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের আকার ধারণ করেনি।[২২]

বিগত শতাব্দীর সাতের ও আটের দশকে সরকারী খাস জমির স্বল্পবসতি জনপদে অসম মেঘালয় থেকে বিতাড়িত নেপালী, ভুটান থেকে বহিষ্কৃত নেপালী ও বাংলাদেশের বিহারী মুসলমানেরা একরকম বিনা বাধায় বসবাস শুরু করেন।[২৩] ফলে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৫০ এবং এর পর থেকে জেলার জনবিন্যাসের কাঠামোগত পরিবর্তন অর্থনীতিকে সরাসরিভাবে প্রভাবিত করতে শুরু করে। বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষি অর্থনীতির ভারসাম্য নষ্ট হতে শুরু করে। ভূমিতে টান পড়তে থাকে। আদি অধিবাসীদের বদলে উদ্বাস্তুদের হাতে কৃষি জমির অধিকাংশ চলে যেতে থাকে।[২৪] 'লাঠি যার মাটি তার' প্রবাদটি জোরদার হয়ে ওঠে। ধর্মীয় সাংস্কৃতিক বিরোধ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হলে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। ধর্মীয় - সামাজিক আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসানের দাবীতে উদ্ভব ঘটে জেলায় প্রথম নৃ-গোষ্ঠীগত রাজনৈতিক আন্দোলন, উত্তরখন্ড নামে পরিচিত নৃ--গোষ্ঠী ভিত্তিক এই আঞ্চলিক দলের আন্দোলন ১৯৬৯ সালে জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে।[২৫] কারণ অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলন শহরকে কেন্দ্র করে গ্রামাঞ্চলে সঞ্চালিত হয়ে থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে এই অর্থনৈতিক - মনঃস্তাত্ত্বিক বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল গ্রামাঞ্চলেই সর্বপ্রথম।[২৬]

পরবর্তীকালে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পর মূল সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সংরক্ষণ জনিত বৈষম্য। কারণ রাজনীতি থেকে সরকারী চাকুরী সবক্ষেত্রেই সংরক্ষণের বিশেষ সুবিধার অধিকারী হয়ে পড়েছে তপশিলী উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের অধিকাংশ।[২৭] জেলার আদি অধিবাসীদের এই একদা মনঃস্তাত্ত্বিক বিরোধের চোরা স্রোত তাই সরাসরি অর্থনৈতিক দাবীর মূল স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়েই সৃষ্টি করেছে নব্বই এর দশকের অস্থিরতা।[২৮] জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের বর্তমান অস্থিরতার বীজ নিহীত রয়েছে প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের এই অধ্যায়েই।

সূত্রনির্দেশ

১। A. Mitra. *Census 1951*. District Hard books. Jalpaiguri. page-1i

২। রণজিত দাশগুপ্ত, 'জলপাইগুড়ি জেলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে কিন্তু প্রাথমিক মন্তব্য', *কিরাত ভূমি*, জলপাইগুড়ি জেলার ১২৫ বর্ষ সংখ্যা পূর্তি পৃঃ ১১৫।

৩। Ranajit Dasgupta. *Economy. Society and polities in Bengal Jalpaiguri 1869-1947*. page-21

৪। *Ibid*. p-22.

৫। *Ibid*. p-23

৬। *Ibid*. p-23

৭। *Ibid*. p-116

৮। ডঃ আনন্দ গোপাল ঘোষ, 'ভূগোল-ভূমি-ভূমিপুত্র-ভাষা ঃ প্রসঙ্গ ডুয়ার্স - তরাইয়ের সবুজ উপনিবেশ', *প্রবাহ তিস্তাতোর্ষা*, শারদ সংখ্যা ১৪০৮।

৯। *Ibid*. p-22.

১০। *Ibid*. p-116-117

১১। ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ, 'ভারত তীর্থ উত্তরবঙ্গ', *সীমান্ত সাহিত্য*, ৪৭তম বর্ষ, জুন-ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃঃ ২৬।

১২। *Ibid*. p-21-22

১৩। C. H Sander. *Survey and Settlement of Western Dooars in the District* of *Jalpaiguri - 1889-95*.

১৪। সম্পাদক - চারুচন্দ্র সান্যাল ও অন্যান্য. সীমান্ত সাহিত্য উল্লিখিত প্রবন্ধ উদ্ধৃত জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ , ১৯৭০।

১৫। *Ibid*. p-27

১৬। *Ibid*. p-28.

১৭। A Running. *Jalpaiguri District Gazetteer*.

১৮। *Ibid*

১৯। *Ibid*. p-71-81

২০। *Ibid*. p-120

২১। *Ibid*. p-120

২২। *Ibid*. p-118.

২৩। *প্রবাহ তিস্তা-তোর্ষা* উল্লিখিত প্রবন্ধ।

২৪। *Ibid.* p-33

২৫। আনন্দ গোপাল ঘোষ, "জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইতিহাস (১৮৬১-১৯৯৪)", *কিরাত ভূমি*, ১২৫ বর্ষ সংখ্যা, পৃঃ ৪৪৯।

২৬। 'The Kamtapur State movement in West Bengal and Assam : conflict of identity and economic Dislocation' - Dr. Ananda Gopal Ghosh. National seminar on 'Ethnicity Movement and Social Structure in North East India' 2002, Department of Sociology. North Bengal University. quoted – তিস্তাপাড়ের অস্থিরতা — সুখবিলাস বর্মা, হিতসাধনী থেকে কামতাপুরী — দীনেশ ডাকুয়া।

২৭। OBC - SC গোষ্ঠীর 'অন্য কাহিনী' — *রাষ্ট্রীয় সাহারা*, অক্টোবর - ২০০১; *ফ্রন্টলাইন* - ২৫-৫-২০০১; ইন্ডিয়া টুডে'; ১২-১১-২০০১; *ভারতের সমাজ ভাবনা*, ১ম খন্ড, বর্ণালী — বসিরহাট ৩০ বর্ষ ১৪০৮ (দেশ-বিদেশের নানা খবর)

২৮। এই প্রবন্ধের কাঠামো নির্মাণে, তথ্য সংগ্রহে ও বিশ্লেষণে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন আমার শ্রদ্ধাভাজন, অধ্যাপক ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ।

জলপাইগুড়ি জেলা গঠনের প্রথম দশকের ডুয়ার্স অঞ্চলের জন বিন্যাসের রূপরেখা ঃ

নিরঞ্জন অধিকারী

উত্তর-পূর্ব ভারত একদা প্রাগ - জ্যোতিষপুর ও কামরূপ নামে পরিচিত ছিল। বর্তমান উত্তরবঙ্গের (পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত) বৃহত্তম এলাকা ছিল প্রাগ - জ্যোতিষপুর কামরূপের অন্তর্গত তখন সেখানকার অধিবাসীদের বৃহত্তর অংশ ছিল মঙ্গোলয়েড বা কিরাত নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্গত। এই কিরাত জন-জাতির কথা আমরা জানতে পাই মহাভারতে, রামায়ণের কিস্কিন্ধ্যাকান্ডের এবং প্রথম শতাব্দীর লেখা এক গ্রীক নাবিকের লেখায়। পন্ডিত মহল মনে করেন কিরাত নামটি দেওয়া আর্যদের। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ''কিরাত জন-কৃতী'' গ্রন্থে এদের নিষ্ঠুর হৃদয়হীন বলে বর্ণনা করেছেন।[১]

মার্টিনের 'Eastern India' গ্রন্থে পশ্চিম ডুয়ার্স অর্থাৎ জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তা নদীর পূর্বাংশে যে জন-জাতির রূপরেখা পরিলক্ষিত হয় তাতে কোচ, রাজবংশী ছাড়াও খেন, জুগী (নাথপন্থী) ইত্যাদি জন-জাতির পরিচয় পাওয়া যায়।

ডঃ বানীকান্ত কাকতী তাঁর "The Assamese Its Formation and Development." গ্রন্থে বলেছেন ঃ ''প্রাগ জ্যোতিষপুর ও কামরূপ নাম দুটির উৎস আসলে অস্ট্রিক উপাদান অর্থাৎ মঙ্গোলয়েড নৃ-গোষ্ঠীর লোকেরা এখানে বসবাস করার পূর্বে অস্ট্রিক লোকদের বসতি ছিল এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য মঙ্গোলয়েড শাখার অন্তর্গত কোচ, মেচ, গারো, রাভা ইত্যাদি জন-গোষ্ঠী plough cultivation গ্রহণ করে অস্ট্রিকদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়।''[২] সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ''কিরাত জন-কৃতী'' গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে ''নেপালের কাঠমান্ডু পর্যন্ত মঙ্গোলয়েড নৃ-গোষ্ঠীর আধিপত্য ছিল।''[৩]

১২৬০ খ্রিস্টাব্দে লিখিত মিনহাজ-উদ্দীন সিরাজের লেখা ''তবাকত-ই-নাসিরী'' গ্রন্থে উল্লেখ আছে ''খিলজী আক্রমণের সময় হিমালয়ের পাদদেশে অর্থাৎ উত্তর বঙ্গে কোচ মেচ ও থারু এই তিন গোষ্ঠীর বসবাস ছিল। থারুরা ক্রমশ নেপালের দিকে চলে যায়, বিশেষত দার্জিলিং জেলা সমতল অংশে বিংশ শতকের তিরিশের দশকে ক্ষত্রীয় পরিচয়ের মধ্য দিয়ে রাজবংশীতে পরিণত হয়।''[৪] তাই রাজবংশীরা মারঙ্গীয় রাজবংশী নামে পরিচিত, কোচরা পরবর্তী কালে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে রাজবংশী নামে পরিচয় দিতে

থাকে। জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম ডুয়ার্সের অন্তর্গত বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের মধ্যে এরূপ Sanskritization বহুলভাবে লক্ষ্য করা যায়।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে লিখিত D.H.E. Sunders-এর Report-এ পশ্চিম ডুয়ার্সের একটি সুবিস্তৃত রূপরেখা পরিলক্ষিত হয়। এখানকার জনবিন্যাসে তিনি "কোচ রাজবংশী মেচ, থারু, কৈবর্ত্য, খেন, জুগী, নমশূদ্র, বাঙালী ব্যবসায়ী, মাড়োয়াড়ী ইত্যাদি জন-জাতির কথা উল্লেখ করেছেন।"[৫]

জলপাইগুড়ি জেলা সৃষ্টির (সরকারী ভাবে ১লা জানুয়ারী ১৮৬৯) পর ডুয়ার্স অঞ্চলে নানা দিক থেকে উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়। এই জেলা ইংরেজদের সৃষ্টির আগে পর্যন্ত এখানকার 'দুয়ার' বা ডুয়ার্স অঞ্চলগুলি কোচবিহার বা জলপাইগুড়ি রাজার ক্ষমতাধীন ছিল, পরে ভূটানের অধিকারে চলে যায়। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, বিজয়ী শক্তি কোন অঞ্চল দখল করলে বা নিজ ক্ষমতাধীনে আনলে সেখানে সেই জাতি-জনজাতির বসতি বা জনবিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। ১৮৬৪-৬৫ সালে ইঙ্গ-ভূটান যুদ্ধে ভূটিয়াদের পরাজয় ঘটে, তা সত্ত্বেও কিছু কিছু জায়গায় ভূটিয়াদের বসতি পরিলক্ষিত হয়। জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত ময়নাগুড়ি থানার দক্ষিণে এই ধরণের এই রকম একটি ভূটিয়া বসবাসকারী জায়গা হল ভোটপাট্রি বা ভোটপট্টী।

"ডুয়ার্স অঞ্চল ছিল জঙ্গলে পরিপূর্ণ, ভয়ঙ্কর জীবজন্তুর আশ্রয়স্থল, ইংরেজগণ ভূটিয়াদের কাছ থেকে ডুয়ার্স অঞ্চল অধিকার করার পর এখানকার আয়তন ছিল ১৯৬৯ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ছিল ৪৯,৬২০ জন।"[৬] হান্টার সাহেব তাঁর "A Statistical Account of Bengal" গ্রন্থে এই তথ্য দিয়েছেন। হান্টার বিস্তারিতভাবে এই সব মানুষের বর্ণনা সঠিকভাবে না দিলেও তিনি বলেছেন এরা রাজবংশী, মেচ ও ভূটিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, তবে পরবর্তী আদমসুমারীতে দুইটি ডুয়ার্সের লোক সংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

নিম্নবর্ণিত পরিসংখ্যানটি থেকে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির হারটি বুঝে নেওয়া যেতে পারে

বছর	জনসংখ্যা
১৮৬৪-৬৫	৪৯,৬২০
১৮৭২	১,০০,১১১
১৮৯১	২,৯৬,৯৬৪[৭]

উপরের আদমসুমারী থেকে একথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ডুয়ার্স অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তার কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কারণও ছিল, যেমন - নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থার পত্তন, নতুন ভূমি ব্যবস্থা, চা-বাগিচা সৃষ্টি, প্রচুর উর্বর ও আবাদী জমি এবং অন্যান্য অঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। জেলা সৃষ্টির

প্রথম দশক ও তার পূর্বে ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় যারা আসেন তারা হল মাড়োয়ারী সম্প্রদায়, বাঙালী ব্যবসায়ী ও মুসলমান সম্প্রদায়, তবে ডুয়ার্স অঞ্চলে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের তুলনায় বাঙালী ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য ছিল বেশী। Mr. C. F. Magrath এর তথ্য অনুসারে (১৮৭২ সালের) দেখা যায় যে "সেই সময় সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলায় ব্যবসায়ী ছিল ৬৩০ জন যার মধ্যে আগরওয়াল ছিল ৪৪ জন এবং ওসওয়াল ছিল ৫৩ জন"।[৮] সুতরাং বাকীরা যে অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এখন আসা যাক ডুয়ার্সে কোন কোন অঞ্চল থেকে কত লোক এসেছিল। ডুয়ার্সে বাড়তি লোক এসেছিল বিভিন্ন পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো থেকে। ধারণাটি পরিষ্কার করার জন্য নিচের সারণিটি দেখানো যেতে পারে ঃ[৯]

জেলা / রাজ্য	লোকসংখ্যা
দার্জিলিং	১৫৮৮
দিনাজপুর	৫০৫
রংপুর	১০১০১
কোচবিহার	৩২২২৪
অন্য জেলা ও প্রদেশ	১১৪২৭৭,"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রতিবেশী জেলাগুলো থেকে লোক এসেছে মাত্র ৪৪৪১৮ জন। "অন্য প্রদেশ অর্থাৎ বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুর থেকে চা বাগানের সূত্র ধরে লোক এসেছে ১১৪২৭৭ জন অর্থাৎ প্রায় তিন গুণের কাছাকাছি।"[১০] এরা এখানকার রাজবংশী ও অন্য স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে, এই সব মানুষের মধ্যে রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যাই ছিল বেশী। এদের আসার কারণ সম্পর্কে তৎকালীন জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনার ১৮৭০ সালে লিখেছেন "..... In the Western Dooars portion of the District the area under rice cultivation was very considerably extended, owing to the influx of new settlers from Kochbehar State and Rangpur District" কাজেই অন্য অঞ্চলের তুলনায় ডুয়ার্সে জমির প্রাচুর্য, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এবং ইংরেজদের জমির ওপর থেকে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা ইত্যাদির ফলে এখানে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় এখানে যে রাজবংশী মানুষের সংখ্যা বেশী তার কারণ হিসাবে বলা যায় যে, কিছু কিছু রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে বিভিন্নভাবে প্রচুর জমির মালিক হয়ে গিয়েছিল, তবে সেটা নিশ্চয়ই পরিশ্রমে বা ঐ উপায়ে। ইতিহাস বলে যে প্রত্যেক জাতিরই জাতির মানুষের প্রতি টান থাকে, যে জিনিস লক্ষ্য করা যায় কোন মাতার যেমন তার নিজের সন্তানের

প্রতি টান। সেই সূত্র ধরেই রাজবংশী সম্প্রদায়ের জোতদারদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে প্রচুর রাজবংশী মানুষ ডুয়ার্স অঞ্চলে ছুটে আসে। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে রংপুর বা কোচবিহারেও তো রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বেশী? সেই জায়গা থেকে এরা ডুয়ার্সে বা অন্য অঞ্চলে পাড়ি দিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার হবে যদি আমরা Sunders এর তথ্য তুলে ধরি। Sunders এর লেখা "Survey and Settlement of Western Dooars" গ্রন্থে তিনি বলেছেন "I have questioned many of these immigrants, who came here told that rent for land is too high there, that the Jotedars are oppressive and sometimes that the productive power of the soil have decreased."

পশ্চিম ডুয়ার্সের অন্তর্গত ময়নাগুড়ি থানার কয়েকটি জোতদার পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে জানা যাচ্ছে যে, তারা এখানে এসেছিল শূন্য হাতে কিন্তু কেউ কেউ এখানকার জঙ্গল পরিষ্কার করে জমির মালিক হন। আবার কেউ সুদের ব্যবসা করে প্রচুর জমির মালিক হন নিলামের মাধ্যমে। যেমন পানবাড়ির (বর্তমানে বড়বাড়ি নামে পরিচিত) মথুরাম দাস তাঁর পিতা ভগৎ দাস (সন্ন্যাসী নামে পরিচিত) প্রচুর জমির মালিক হন জঙ্গল ভেঙে। তবে পরে তিনি অনেক জমি ক্রয়ও করেন।

আমগুড়ি জোতদার মুসব্বর বসুনীয়া তিনি এখানে আসেন ১৮৬০ এর দশকের পরে ফালাকাটা থেকে। এখানে এসেই তিনি জলপাইগুড়ির রায়কত পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হন এবং পরে তাদের সুনজরে আসলে দোমোহনী হাট ও নাথুয়া হাটের দেখাশুনার দায়িত্ব পান এবং ১৯২২ সনের মধ্যে, বর্তমানে যা কাগজপত্র পাওয়া গেছে তাতে তিনি ১২০০ একর জমির মালিক ছিলেন। বার্নেশের অপর আর এক জোতদার ভোচক দাস (জন্মস্থান বার্নেশ) তার জমির পরিমাণ ছিল ২০০ একর। তাঁর প্রপৌত্র কালীকমল রায়ের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে তাঁর পূর্ব-পুরুষ আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর পূর্বে রংপুরে থেকে এখানে আসেন। আমি এই অঞ্চলের কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করে জানতে পেরেছি যে, তারা আগে হোক বা পরেই হোক বিভিন্ন জায়গা থেকে জমির সূত্র ধরেই ডুয়ার্স অঞ্চলে ছুটে আসেন। পরে কয়েক বছরের মধ্যেই ময়নাগুড়ি এলাকার লক্ষ্মীকান্ত দাস (পরে সেন) এবং মুসব্বর বসুনীয়ার প্রপৌত্র রামচন্দ্র বসুনীয়া গিরেন্দ্রনাথ বসুনীয়া ও উপেন্দ্রনাথ বসুনীয়া চা বাগানেও অর্থ বিনিয়োগ করেন।

ভিন্ন রাজ্য থেকে যে, "১১৪২৭৭ জন"[১১] লোক এসেছিলেন তাদের মধ্যে ছিল সাঁওতাল, ওরাঁও, গারো, বাঙালী ব্যবসায়ী, মাড়োয়ারী ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। আমাদের ধারণা মুসলমানগণ এখানে এসে জমির সঙ্গে যুক্ত হয়। বাঙালীরা এখানে এসে অনেকে কাঠ ব্যবসা শুরু করেন, অনেকে চা-বাগান স্থাপন করেন এবং অনেকে ইংরেজদের চাকুরীতে যুক্ত হন। চায়ের ব্যবসায়ে প্রচুর মুনাফার সম্ভাবনায় "১৮৭৮ সাল

অবধি বাঙালীদের দ্বারা বেশ কয়েকটি চা-বাগান শুরু হয়, তার মধ্যে মোগোলকাটা চা বাগান, আঞ্জুমান টি কোম্পানী লিমিটেড, চুনিয়াঝোড়া চা-কোম্পানী লিমিটেড, কলাবাড়ি রাঙ্গাটি চা-বাগান ইত্যাদি। পরে অবশ্য মাড়োয়ারী সম্প্রদায়গণ চা বাগান নির্মাণে এগিয়ে আসেন।"[১২]

ডুয়ার্স অঞ্চলে সাঁওতালদের আসার জন্য ইংরেজ তিনটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন রাজস্ব সংগ্রহের জন্য।

1. "That timber should be allowed to the santhals free for fuel and housing building purposes."

2. "That no revenue should be charged for land for the first three years."

3. "That each family should be granted an advance of Rs. 50 to be repaid with interest at 3 percent within five years."[১৩]

ডুয়ার্স অঞ্চলে জনবিন্যাসের অপর আর একটি কারণ হল রাজনৈতিক শক্তির পরিবর্তন। কারণ রাজনৈতিক শক্তির উত্থান পতনের উপর ভিত্তি করে জনবিন্যাসের পরিবর্তন নির্দেশ করে। "তরাই বা দার্জিলিং থেকে মানুষগণ আসার কারণ সম্পর্কে বলা যায় যে, তরাই অঞ্চলে ইংরেজ শাসন শুরু হয় ১৮৫০ এর দশকে। সেই সময় কিছু ভূটানী কর্মচারী কৃষকদের উপর নানা ভাবে অত্যাচার চালাত। তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অনেক রাজবংশী কৃষক তরাই বা দার্জিলিং এলাকা ত্যাগ করে ডুয়ার্সে আসেন স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য। আর ঠিক সেই সময় ডুয়ার্স অঞ্চলে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা শুরু। সেই সূত্র ধরে শুধু রাজবংশী কৃষকরাই নয়, আসেন পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের বাঙালীরা, তবে তারা ইংরেজদের সরকারী কর্মচারী হিসাবে এখানে আসেন, কেউ রাজস্ব সংগ্রাহক হিসাবে আবার কেউ ব্যবসায়ী হিসাবে।"[১৪] ডুয়ার্সে পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাতে সন্দেহ নেই। ১৮৭২ সালের আদমসুমারীতে বেভারলী জনসংখ্যা সম্পর্কে বলেছেন "In the recently acquired Dooars the population is 67 to the squire mile ...."

ডুয়ার্স অঞ্চলে জনবসতির ভিত্তি যে ইংরেজরা স্থাপন করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সাঁওতাল, গারো, মুন্ডা ও রাভা এরাই পরে এখানকার আদিবাসী বলে পরিচিত হন। ওঁরাওরা এখানে জোতদারদের মত স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করে এই সম্পর্কে Sunders লিখেছেন, "Many Oraus of Ranchi District may be found in Mynaguri, Falakata and Alipur Tewsil, where they settled permanently as Jotedars."

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ডুয়ার্সের বর্তমান প্রজন্মের যারা বসবাসকারী তাদের পূর্ব পুরুষেরা কোন না কোন সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে যে কোন সূত্র ধরেই হোক বা জীবিকা নির্বাহের তাগিদেই হোক এসেছিলেন, এরা বহিরাগত।

সূত্রনির্দেশ

১। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, *কিরাত জন কৃতী*।

২। বানীকান্ত কাকতী, *The Assamese · Its Formation and Development*।

৩। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, *কিরাত জন কৃতী*।

৪। মিনহাজ-উদ্দীন সিরাজ ঃ *তবাকত-ই-নাসিরী*।

৫। D.H.E. Sunders. *Survey and settlement of Western Dooars.*

৬। আনন্দ গোপাল ঘোষ, *সীমান্ত সাহিত্য*।

৭। ঐ

৮। নারায়ণ চন্দ্র সাহা, *কিরাত ভূমি*।

৯। আনন্দ গোপাল ঘোষ, *সীমান্ত সাহিত্য*।

১০। ঐ

১১। ঐ

১২। কামাখ্যা প্রসাদ চক্রবর্তী, *কিরাত ভূমি*।

১৩। পূর্বোক্ত, *সীমান্ত সাহিত্য*।

১৪। ঐ

সাক্ষাৎকার, ব্যক্তিগণের পরিচয়।

১। কালীকমল রায়, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি বয়স-৮৩।

২। শ্রীনিবাস রায় লস্কর, হেলাপাকিড়ী, জলপাইগুড়ি বয়স-৯২।

৩। মপেন্দ্রনাথ রায়, আমগুড়ি - জলপাইগুড়ি বয়স - ৮০।

৪। উপেন্দ্রনাথ বসুনীয়া, খাগড়াবাড়ী, জলপাইগুড়ি বয়স-৭০।

৫। গিরেন্দ্রনাথ বসুনীয়া, আমগুড়ি জলপাইগুড়ি বয়স-৭৫।

৬। শৈলেন বিশ্বাস, পানবাড়ী, জলপাইগুড়ি বয়স-৭৫।

৭। মন্থথ রায় বসুনীয়া, জল্পেশ, জলপাইগুড়ি বয়স-৬৫।

৮। কমল কুমার দাস, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি বয়স-৬০।

৯। জ্যোতিন্দ্রনাথ সরকার, পানবাড়ী, জলপাইগুড়ি বয়স-৮২।

১০। মহেন্দ্রনাথ সেন, জল্পেশ, জলপাইগুড়ি, বয়স-৬০।

১১। কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ তথ্য-বিশ্লেষণ ও কাঠামো নির্মাণে সাহায্য করেছেন, আনন্দ গোপাল ঘোষ, অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

পশ্চিম ডুয়ার্সের লোকসংস্কৃতিতে সামাজিক ইতিহাসের উপাদান

জিতেশ চন্দ্র রায়

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে তিস্তা নদীর পূর্বাংশ থেকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত এই জনপদ অতীতে ডুয়ার্স নামে পরিচিত ছিল। ডুয়ার্সের পশ্চিমভাগ অর্থাৎ ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি লাটাগুড়ি, গয়েরকাটা, বীরপাড়া, ফালাকাটার পূর্বাং সাধারণত পশ্চিম ডুয়ার্স নামে চিহ্নিত। তিস্তা - জলঢাকা বিধৌত পশ্চিম ডুয়ার্সের এই জনপদটি প্রাচীনকালে প্রাগ্ - জ্যোতিষপুর ও কামরূপের অন্তর্গত ছিল; পরে ভূটান এবং কোচবিহার রাজ্যের একটি অন্যতম পরগনায় পরিণত হয়। এতদ্ অঞ্চলে প্রাপ্ত দলিল দস্তাবেজ থেকে জানা যায় যে, এই অঞ্চলটি একদা ভূটানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মীরজুমলার কোচবিহার এবং আসাম অভিযানের সময় থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম এগার বছর পর্যন্ত কোচবিহারকে মুঘল শক্তির ধাক্কায় নাজেহাল হতে হয়েছিল; এ সময় বিপন্ন কোচবিহারকে ভূটান সৈন্য দিয়ে সাহায্য করে, ফলে কোচবিহারে ভূটান সহজেই সম্মানিত আসন অর্জন করে। ভূটানী ব্যবসায়ীরা বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে পাহাড় থেকে নেমে এসে পশ্চিম ডুয়ার্সের উপর দিয়ে রংপুর পর্যন্ত সংগ্রহ করা পণ্য নিয়ে যেত। জল্পেশ ছিল এই ভূটানীদের পশম বিক্রয় কেন্দ্র। তিব্বতী ভাষায় জল্পেশ শব্দটির উৎস — 'জে-লে-পে-শ্বর' (JE-LE-PE-SWAR) অর্থ পশম বিক্রয় কেন্দ্র।[১] আবার বর্ষা আরম্ভ হওয়ার আগেই ভূটানী ব্যবসায়ীরা সংগৃহীত পণ্য নিয়ে ফিরে যেত নিজের দেশে। অবশেষে "দুয়ার এলাকার উপর ভূটানের অধিকার কবুল করেছিল। কিন্তু এই এলাকার কতখানি অংশ ভূটান জবরদখল করেছিল আর কতখানি কোচবিহার স্বেচ্ছায় দিয়েছিল উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে সঠিক বলা সম্ভব নয়। প্রধানত মেচ, গারো এবং রাভা গোষ্ঠীর মানুষ ঐ অরণ্যের গ্রাম থেকে জমি কেড়ে নিয়ে চাষবাস করত, জীবন যাপন করত। জমি সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ভূটান আনেনি। কোচবিহারের প্রথা অনুযায়ী জোতদার, চুকানিদার, রায়ত এবং প্রজার বিধিবদ্ধ ভুমিস্বত্ত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে রাজস্ব আদায় করে ভূটান সরকারে জমা দেবার দায়িত্ব রইল কাঠাম নামে কর্মচারীর উপর। এই কর্মচারীটি স্থানীয় লোক। একদিক থেকে কাঠাম দুয়ার এলাকার সর্বোচ্চ কর্মচারী, অন্য দিক থেকে সে রাজস্বের ইজারাদার। ভূটানের পার্বত্য উপত্যকার উৎপাদন অপ্রতুল বলেই দুয়ারের রাজস্বের

জন্য ভুটানের রাজ কর্মচারীরা হন্যে হয়ে থাকতেন, যে রাজস্বের ষোল আনা ভুটান রাজকোষে জমা পড়বার কোন সম্ভাবনা ছিল না; কারণ দুয়ারের নিকটতম প্রাদেশিক শাসনকর্তারা নিজের ভাগটুকু আগেই আলাদা করে রেখে তবে রাজস্ব কেন্দ্রে পাঠাতেন। এই দৃষ্টান্ত কাঠামকেও প্রভাবিত করেছিল যার দরুণ জমি চাষ করা যাদের দায় সবদিক থেকে তারাই ছিল বঞ্চিত।''[২]

পশ্চিম ডুয়ার্সের বর্তমান ময়নাগুড়ি জনপদের বৃহত্তর অংশে একদা ছাব্বিশটি তালুক নিয়ে গঠিত হয়েছিল চাপগড় পরগনা। চাপগড়ের ছাব্বিশটি তালুক হল—চাপাডাঙ্গা, চাপগড়, বোলবাড়ী, কাঁঠালবাড়ী পুটিমারী, ভোলাভাববি, গৌরগ্রাম, ব্রহ্মপুর, শালবাড়ী, খয়েরকুল, হরিমতী, ঘোকসাডাঙা, পূর্বদহ, মাধবডাঙা, মোওয়ামারি (মৌয়ামারী), বেংকান্দি বেতগাড়া, চূড়াভান্ডার, বড়গিলা, বাংলাঝাড়, খাগরাবাড়ী, মরিচবাড়ী, শিশুয়াবাড়ী, নারিকামারি (দ্বারিকামারি?), বোরাঝাড় এবং গড়তলি।[৩] এই পরগনাটি কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'কোচবিহারের ইতিহাস' গ্রন্থে ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ পাল লিখেছেন — ''চাপগড় জলপাইগুড়ির অন্তর্গত ময়নাগুড়ি-র নিকট অবস্থিত। বজ্রধরের (কোচবিহারের মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণের শ্বশুর) পূর্বপুরুষেরা কোচবিহার মহারাজার অধীনে তথাকার শাসনকর্তা ছিলেন। চাপগড় পরে ভুটিয়া কর্তৃক অধিকৃত হয়। ইংরেজ আমলেএঁরা রাজ্যহীন হন। বজ্রধরের বংশধরেরা বর্তমানে মাথাভাঙার দক্ষিণ চকিয়ার ছড়া গ্রামে বসবাস করছেন''।[৪] চাপগড় ভুটিয়াদের দখলে যাওয়ার পর বৈকুণ্ঠপুরের রাজা সর্বদের রায়কত (১৮০০ ১৮৮৭) সে তালুক ও জল্পেশসহ অন্যান্য দাবী করে ইংরেজদের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছিলেন। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ঐ পরগনার অধিকাংশ তালুক বৈকুণ্ঠপুরের অধীনে ছিল।[৫] অবশেষে ব্রিটিশ সরকার কোচবিহার ও বৈকুণ্ঠপুরের সমস্ত দাবী নস্যাৎ করে ডুয়ার্সের পশ্চিমাঞ্চল ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে নিজেদের দখলে নিয়ে যায়।

পশ্চিম ডুয়ার্সের লোকসংস্কৃতিতে আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রচুর উপাদান আছে। লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকগল্প, লোকগান, পূজাপার্বণ তথা লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে লুকিয়ে আছে এতদ্ অঞ্চলের জাতি জনজাতির প্রেক্ষাপটে অলিখিত ইতিহাসের উপাদান। কৃষকদের মুখে শোনা যায় একটি প্রতিবাদী গান, যে গানের মধ্য দিয়ে জমিদারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় আছে এই গানে —



'চল চল কিষাণ ভাই
জমিদারী উঠিবার তানে ভোট দিবার যাই।
শ্যাষ কইরবার তানে জমিদারী, জমিদারে নামে করিম শমন জারী

হা খোরাকিয়া দ্যাশ্‌টাক্‌ করিম ঠিক,
ভিন্‌ দ্যাশোত না মাগিম ভিক্‌
আপনা জমিত ঠাসিয়া ধরিম হাল
বাঙলা দ্যাশের হামারা খেদাইম জঞ্জাল।'[৬]

১৯৪৮-এ জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ও রংপুরে তেভাগা আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। জলপাইগুড়ি জেলায় রাজবংশী মহিলারাও তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে; খাগরী বর্মনী, পূন্যেশ্বরী বর্মনী (বুড়িমা) এ অঞ্চলে সর্বজনবিদিত।[৭] পশ্চিম ডুয়ার্সেও এই আন্দোলন বিশেষ আকার ধারণ করে। তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কিছু প্রতিবাদী গান শোনা যায়। যেমন —

তুলব না ধান পরের গোলায়
মরবোনা ক্ষুধার জ্বালায়, মরবোনা।
পঞ্চাশে লাখ প্রাণ দিছি
মা বোনদের মান দিছি
সাদা হাতীর মাহুত তুমি না।[৮]

তেভাগার ঘটনাবলীতে জানা যায় ''মালবাজার রেলের ইউনিয়ন অফিসে মিটিং চলছিল। সেখানে কয়েকজন উপজাতি কৃষক এসে বলল 'একঠো ঝান্ডা দিজিয়ে'। পটলবাবু ওদের হাতে একটা লাল ঝান্ডা দিয়ে বললেন 'পহেলা মার্চ' দোমহনি মিটিংয়ে যায়গা। ঠিক ওরা মিটিংএ গেলেন। কিন্তু যে যাওয়া সাধারণ মিছিল মিটিংএ যাওয়া নয়। ডুয়ার্সের কৃষক, চা-শ্রমিক ও রেল শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ উত্তাল তরঙ্গ। লালমণির হাট থেকে মাদারী হাট ২০০ মাইল রেলপথের উপর যেন ডুয়ার্সের জনজীবন ঝাপিয়ে পড়ল। গাড়ির অভাবে বহু লোক পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন। মায়েরা পিঠে বাচ্চা বেঁধে চলেছেন; ছেলেদের কাঁধে তীর ধনুক, টাঙ্গি, কিছু চিড়া মুড়ির পোট্‌লা, বালকদের হাতে ঝান্ডা। গোটা গোটা পরিবার চলেছে। যারা চোখে দেখেননি তাদের পক্ষে সে জিনিস বোঝা শক্ত। জেলাশাসক দোমহনীতে ১৪৪ ধারা জারি করে জনসভা নিষিদ্ধ করে দিলেন।''[৯] তেভাগার প্রেক্ষাপটে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে শ্রমিক লাল শুকরা ওঁরাও এর সাদরী ভাষার গান —

মালবাজার আনা যানা
মাটিয়ালী থানা রে
শুনো ভাই স্বাধীন দেশকা গানা রে।

এক বিতা পেট লিগিন

গিলি জেলখানা রে

শুনো ভাই - স্বাধীন দেশকা গানা রে।[১০]

পশ্চিম ডুয়ার্সের লোকায়ত ছড়ায় খুঁজে পাওয়া যায় আঞ্চলিক ইতিহাসের উপাদান। যেমন —

উপেনটি বাস্কো

নাইন টেন টেক্সো

চুলটানা বিবিয়ানা

সাহেব বাবুর বৈঠকখানা।

এটি লোকক্রীড়ার ছড়া। এখানে সাহেবদের কথা আছে। "এই সাহেব বাবুদের পরিচয় পেতে হলে বাংলার ইতিহাসের বেশ কিছু পিছন দিকে ফিরে যেতে হবে। ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে থেকে বাংলাদেশের মানুষ পর্তুগীজদের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে। এই পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের কিছু দেশীয় বণিকও যথেষ্ট ধনাঢ্যতা লাভ করে। চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় সপ্তগ্রামের বণিকদের ধনাঢ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় — 'হিরণ্য গোবর্ধন নামে দুই সহোদর। সপ্তগ্রামে বারোলক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর'। এই পর্তুগীজরাই হলেন ঐ 'সাহেববাবু'গণ। তাঁদের কামিনীরসিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে এদেশে তাদের ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে।"[১১]

বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলে জোতদার আধিয়ারের সম্পর্ক যাই থাকুক না কেন, পশ্চিম ডুয়ার্সে বিশ শতকের পাঁচের দশক পর্যন্ত জোতদার আধিয়ার সম্পর্ক ছিল মধুর। আধিয়ার ছিল সম্পূর্ণ জোতদারের উপর নির্ভরশীল। এই প্রেক্ষাপটে 'ভুতা খোয়া' নামে একটি জনপ্রিয় লোক প্রবাদ প্রচলিত আছে। বলাবাহুল্য 'Bengal Tenancy Act 1885' ডুয়ার্স এলাকায় প্রযোজ্য হয়নি। তখন সমগ্র ডুয়ার্স অঞ্চল ছিল Non-regulated এলাকা। ১৮৬৩ সালে ওয়েস্টল্যান্ড ক্লেমস্ অ্যাক্ট এই অঞ্চলে বলবৎ করা হয়। এই আইন অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি, খাজনা ইত্যাদির উপর দেওয়ানী আদালতের কোন এক্তিয়ার ছিল না। পশ্চিম ডুয়ার্সে ৫.১১.১৮৯৮ তারিখের ৯৬৮ টি.আর. নোটিফিকেশন বলে গত ১.১.১৮৯৯ তাং থেকে ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ত্ব আইন আংশিকভাবে চালু করা হয়। সৃষ্টি হয় জোতদারী ব্যবস্থা। জোতদাবের নীচে অবস্থান করেন আধিয়ার বা 'পরজা'। আধিয়ারদেরকে খোরাকী বাবদ 'ভুতা' নামে একপ্রকার ধান দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। যার জন্য জোতদারকে কোনরকম সুদ দেওয়া হত না।[১২] এলাকা বিশেষে ভুতা ধানের পরিমাণ দেড় বিশ (৪৮০ কেজি) থেকে আড়াই বিশ (৮০০ কেজি)। ভুতা

সম্পর্কে হান্টার সাহেব বলেছেন — "in the Western Duars .... There is still a great deal of available uncultivated jungle land, and the tenure holders have to offer additional inducements to the husbandman."[১৩]

পশ্চিম ডুয়ার্সের রাজবংশী লোকজীবনে গারাম পূজা প্রচলিত আছে। গারাম পূজার বিভিন্ন দেবদেবীর মধ্যে অন্যতম পূর্বপুরুষ দেবতা। অর্থাৎ পুর্বপুরুষ দেবতার মধ্যে আছে আঞ্চলিক ইতিহাসের উপাদান। যেমন ময়নাগুড়ি থানার উত্তরে চাপগড় গারাম থানে (কার্জী সাইবের থান) কার্জী সাইবের পূজা করা হয়। এই কার্জী সাহেব হলেন চাপগড় পরগনার কার্জী রাজবংশের পূর্বপুরুষ, যার কন্যা কামেশ্ববী দেবী ছিলেন বজ্রধর কার্জীর কন্যা। বলাবাহুল্য কামেশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন কোচবিহারের রাজা শিবেন্দ্র নারায়ণকে (১৮৪০-৪৭)। ময়নাগুড়ির উত্তরে পূর্ব্ববড়গিলা গ্রামে স্থানীয় জমিদারের অধীনে জনৈক দেওয়ান ছিলেন। তিনি এখন দেবায়িত, গারাম থানে পূজা করা হয় 'দেওযান ঠাকুর' রূপে। ''জলপাইগুড়ি শহর থেকে মাইল আঠারো দূরে কানাইয়া নামে এক বিল আছে। বিলের এপাড়ে 'কানাইয়া ঠাকুর' নামক বাঘছাল পরিহিত দেবতা আছেন, যার বাহন ছিল ব্যাঘ্র। ঐ রাস্তারই বিপরীত দিকে সিকি মাইল দূরে 'পাগলী ঠাকুরাণী' নামে এক দেবী পূজিতা হন — তাঁরও বাহন ব্যাঘ্র। কিংবদন্তী এই, অতীতে 'কানাইয়া ঠাকুরের' বাঘের সঙ্গে 'পাগলী ঠাকুরাণী'র বাঘের যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধের ফলে কানাইয়া ঠাকুরের বাঘ মারা যায় এবং বাঘের মৃতদেহ ময়নাগুড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। এই কিংবদন্তীটি আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত মনে হলেও এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে বলে মনে হয়। সে ইতিহাস - ডুয়ার্সের আধিপত্য নিয়ে কোচবিহার রাজ্যের সঙ্গে ভূটান রাজ্যের যুদ্ধ এবং ইংরেজদের সাহায্যে কোচবিহারের জয় ও ভুটানের পরাজয়। মনে রাখা দরকার ময়নাগুড়ি ছিল সে সময়কার (উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য দিকে) ইংরেজ সেনাদেব অগ্রগামী ঘাঁটি। ইতিহাস এভাবেই কিংবদন্তীর ভিতর আত্মগোপন করে আছে। যেখানে এই দুটি দেবতা আছেন, সেখানে আগে ছিল ভূটানের রাজকাহিনী, যেটা পরে হয় কোচবিহারের কাটীয় বাসস্থান; নাম চাপগড়।''[১৩] এছাড়াও পশ্চিম ডুয়ার্সের বিভিন্ন স্থানে গাবুর ঠাকুরের পূজা প্রচলিত। গাবুর ভুটান প্রদত্ত স্থানীয় শাসক মল্লিক পদবীধারী ব্যক্তির সন্তানের পদবী।

বিভিন্ন স্থান নামে আছে ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ। ভোটপট্টি জনপদ ছিল ভূটিয়াদের বাসস্থান। অর্থাৎ ভোটপট্টি ছিল ভূটিয়াদের এক্তিয়ারভুক্ত। চাপগড় শব্দটি এসেছে চাপাগড় শব্দ থেকে। অর্থাৎ এখানে একটি গোপন গড় ছিল। জল্পেশ মন্দিরের এলাকাটি 'গড়তলি নামে পরিচিত। এখানকার মাটিকিল্লা সম্ভবত ভূটানের কেল্লা ছিল। সম্ভবত এটি ভূটানের অস্ত্রভান্ডারও ছিল। জল্পেশের দক্ষিণে মোগলের ডাঙ্গা স্থানটি মোঘল

আক্রমণের ঐতিহ্য বহন করে। বার্নেশ ঘাট ছিল একদা নদীপথে (তিস্তা) জলপাইগুড়ি শহরের অন্যতম যোগাযোগ মাধ্যম এবং বাণিজ্য কেন্দ্র। বেঙ্গল ডুয়ার্স রেল যোগাযোগ বার্নেশ-এর উপর দিয়ে চাংরাবান্দা হয়ে লালমণির হাট পর্যন্ত (এম. জি.) বিস্তৃত ছিল। বলাবাহুল্য বার্নেশে বার্ন সাহেবের একটি কুঠি ছিল। উক্ত ইংরেজ সাহেবের নামানুসারে স্থানটির নাম হয় বার্নেশ। বার্ন > বার্নস > বার্নেশ > বার্নিশ (বর্তমানে এই নাম বহুল প্রচলিত)।

পশ্চিম ডুয়ার্সের বিখ্যাত লোকনাট্য পালাটিয়া, পালাটিয়াকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন খাস পাঁচালী, মান পাঁচালী এবং রং পাঁচালী। খাস পাঁচালীর অন্যতম জনপ্রিয় পালা 'মাইয়া বন্ধক'। এই পালায় ফুটে উঠেছে এতদ্ অঞ্চলের মন্বন্তরের ছবি। সম্ভবত ১৯৪৩-খ্রিস্টাব্দে দোমহনী এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তারই ছবি আছে এই পালাটিয়া লোকনাট্যে। এভাবে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানে সামাজিক ইতিহাসের উপাদান পরিলক্ষিত হয় যা সাবঅলটার্ন ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সূত্রনির্দেশ

১। পরিতোষ দত্ত, *মধুপর্ণী*, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা।

২। অরুণ ভূষণ মজুমদার, *মধুপর্ণী*, বিশেষ উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, ১৩৮৪; পৃঃ ৮৪-৮৫।

৩। উমেশ শর্মা, *ময়নাগুড়ি ঃ অতীত ও বর্তমান*, ২০০৩, পৃঃ ২১।

৪। নৃপেন্দ্রনাথ পাল, *কোচবিহারের ইতিহাস*, পৃঃ ৬২।

৫। উমেশ শর্মা, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ২২।

৬। বিমল চট্টোপাধ্যায়, *উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা*, ১৯৯৮, পৃঃ ৮৪।

৭। রণজিৎ দাশগুপ্ত, *ইকনমি, সোসাইটি এণ্ড পলিটিকস্ ইন বেঙ্গল ঃ জলপাইগুড়ি ১৮৬৯-১৯৪৭*, পৃঃ ২২৭।

৮। বিমল দাশগুপ্ত, *কিরাতভূমি*, ১২৫ বর্ষ, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৯৯৪, পৃঃ ৫০৭।

৯। *পূর্বোল্লেখিত*, পৃঃ ৫০৮-৫০৯।

১০। জগৎ সাহা, *জলপাইগুড়ি লোকসংস্কৃতি উৎসব স্মরণীকা*।

১১। অসীম দাস, *বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস*, ১৯৯১, পৃঃ ১৩৯।

১২। হরিপদ রায়, *ময়নাগুড়ি ঃ অতীত ও বর্তমান*, ২০০৩, পৃঃ ২৬-২৯।

১৩। নির্মল চন্দ্র চৌধুরী, *মধুপর্ণী*, বিশেষ উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, ১৩৮৪, পৃঃ ১২৪-১২৫।

খাসমহল থেকে তে-ভাগা
ডুয়ার্সে জোতদার শ্রেণীর বিকাশ

বিষ্ণুদয়াল রায়

জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স এলাকা দীর্ঘদিন ধরে ছিল ভূটানীদের দখলে। প্রায় দেড়শ বছর ভূটান তাদের শক্তির জোরে শাসন করেছিল সমতলের এই ডুয়ার্স ভূ-খন্ড। সমতলের ডুয়ার্স ভূ-খন্ডটি হল ইংরেজ শাসনের পশ্চিম ডুয়ার্স। এখানে পশ্চিম ডুয়ার্স মানে ময়নাগুড়ি থেকে ভল্‌কা — বক্সা দুয়ার অবধি বিস্তীর্ণ এলাকা। আরো পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে তিস্তা থেকে সঙ্কোষ নদীর মধ্যবর্তী ভূ-খন্ডটি। এই ডুয়ার্স অঞ্চলে কি ভাবে জোতদার শ্রেণীর বিকাশ ঘটে - এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করতেই এই শিরোনামের অবতারণা।

ভূটানীদের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের দীর্ঘ দিনের আগ্রাসন নীতির পরিসমাপ্তি ঘটে ইঙ্গ -ভূটান যুদ্ধের মধ্যদিয়ে। ১৮৬৫ সালে নভেম্বর মাসে উভয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় সিঞ্চুলা চুক্তি। যদিও বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক লালসায় জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চল সে সময় পরিণত হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। ব্রিটিশরা চেয়েছিল তিব্বতে তাদের বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে আর ভূটান চেষ্টা করেছিল তার নিজস্ব দখলকে সম্প্রসারিত করতে।

১৮৬৫ সালে পশ্চিম ডুয়ার্স অঞ্চল ইংরেজ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সময় এর লোক সংখ্যা ছিল ৪৯,৬২০ জন। কিন্তু ১৯০১ সালে এই লোকসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৪,১০,৬০৬ জন। তবে নানা কারণেই লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বলে মনে করা হয়। যেমন - প্রথমত ঃ একদল লোক আসে ইংরেজ সরকারের বিভিন্ন অফিস - আদালতে চাকুরির সূত্র ধরে, দ্বিতীয়ত ঃ কিছু মানুষ সহজ লভ্য জমির আকর্ষণে ভীড় করে এই এলাকায়। তৃতীয়ত ঃ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যকে সফল রূপদান করার আশা নিয়ে এই এলাকায় চলে আসে বিভিন্ন জায়গার মানুষ।

এই জনবিরল ডুয়ার্স ভূখন্ডে ইংরেজ সরকার জনবসতি গড়ে তোলার উদ্দ্যেগ নেয়। সরকার চাষীদের সংখ্যা বাড়িয়ে চাষ আবাদ বাড়ানোর লক্ষ্যে খুব সহজ শর্তে জমি লীজ দিতে শুরু করে। এর ফল হিসাবে রংপুর, দিনাজপুর এবং পার্শ্ববর্তী দেশীয় রাজ্য কোচবিহার থেকে প্রচুর কৃষিজীবি মানুষ আসে এই পশ্চিম দুয়ারে জীবন ও জীবিকার অন্বেষণে। কৃষক, কৃষিজীবিদের পাশাপাশি বহু উকিল, মোক্তার ও মুহুরী বাবুরা আসেন রংপুর,

দিনাজপুর এমন কি পাবনা থেকে। ডুয়ার্সের সব জমিই সেই সময় খাসমহলে পরিণত হয় এবং এই এলাকার জমিজমা নিয়ে মামলা মকদ্দমা বেড়ে যায় যথেষ্ট পরিমাণে।

শুধু পার্শ্ববর্তী এলাকা রংপুর, দিনাজপুর থেকেই নয়, রাজস্থান থেকেও এই অঞ্চলে জমি ক্রয় করেছিল মাড়োয়ারীরা, যদিও তাঁরা এই ডুয়ার্স ভূ-খন্ডে এসেছিল মূলত ব্যবসা-বাণিজ্য করার লক্ষ্য নিয়ে। সুতরাং প্রথম অবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করলেও পরবর্তীকালে দেখা যায় মারোয়ারীরা তাদের ব্যবসার একটি বিরাট টাকার অঙ্ক বিনিয়োগ (Invest) করে জমি ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। ১৯২৯ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা (Great Economic Depression) দেখা দিলে ভারতে তার ব্যাঁপক প্রভাব পড়েছিল। এই ডুয়ার্স ভূ-খন্ডেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই এলাকার সন্নিহিত মাথাভাঙ্গায় মাড়োয়াড়ীরা অনেকেই তাদের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে চলে আসে জমিতে। ব্যাপক ভাবে শুরু হয়েছিল ভূমি - হস্তান্তর।

সুতরাং দেখা যায়, ডুয়ার্স এলাকায় এক শ্রেণীর মানুষের হাতে চলে আসে এক বিশাল আকারের জোতজমি এবং তাদের পরিচিতি ঘটে Landed Gentry হিসাবে। এই ভাবেই ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ হয় জোতদার শ্রেণীর। পরবর্তীকালে ডুয়ার্সে তৈরি হয় জোতদারদের সংগঠন। এই জোতদার সমিতি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। ডুয়ার্সের উন্নয়নের জন্য জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনার ১৮৯০ সালে 'জোতদারস্ ইউনিয়ন ফান্ড' (Jotedar's Union Fund) গঠন করেন।

ডুয়ার্স খ্যাত এই জোতদারদের মধ্যে যাদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে রাজবংশী, মুসলমান, মেচ, মাড়োয়াড়ী ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ হলেন, মেছুয়া মহম্মদ, গয়ানাথ দাস, পঞ্চানন মল্লিক, বীরেন্দ্রনাথ কাঠাম, গজেন্দ্র নাথ রায় বসুনীয়া, রাজেন্দ্র নাথ রায়, আব্দুল করিম, তারিনী কান্ত রায়, কামিনী মোহন মল্লিক, বীরেন্দ্র নাথ বসুনীয়া, গোকুল সিং হাজরা, রহিম উদ্দীন আহম্মেদ, বলিচাঁদ কার্জী, মোহন সিং বড়ুয়া, কুমার ভূপেন্দ্র দেব রায়কত, গিরিশ চন্দ্র রায়, নগেন্দ্র নাথ রায়, ভবানী রায়, বিহারী লাল রায়, রামকান্ত রায় প্রমুখ। জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলে এই জোতদারের সংখ্যা কিন্তু খুব একটা কম নয়। সমাজ, সংস্কৃতি ও সামাজিক চরিত্র গঠনে এই জোতদার শ্রেণীর অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসাবে গ্রামের বিভিন্ন স্থানে স্কুল প্রতিষ্ঠায় তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষায়তন গড়ে তুলতে, সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান গড়ে তুলতে কিংবা খেলাধূলার মাঠ তৈরি করতেও অর্থশালী জোতদারগণ এক বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ডুয়ার্সের ময়নাগুড়ি থানার সাধারণ হাইস্কুলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - বাকালীর

হাইস্কুল, রহিমউদ্দীন হাইস্কুল (পদমাত ইউনিয়নের), জোড় পাকড়ি এ.জি. হাইস্কুল, জলপেশের লক্ষ্মীকান্ত হাইস্কুল, সাত ভেন্ডির ভবানী হাইস্কুল, টেকাটুলিতে রামকান্ত হাইস্কুল, আমগুড়িতে রামমোহন হাইস্কুল, চারের বাড়ি হাইস্কুল,পুটিমারী মথুরামোহন হাইস্কুল, নিগমানন্দ সরস্বতী হাইস্কুল, ভোটপাট্টী হনুমান ব্লক লোহিয়া হাইস্কুল ইত্যাদি এই স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় জোতদারগণ বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করেন।

ডুয়ার্সের কৃষক আন্দোলনের বর্ণনা দিতে গেলে অবিভক্ত বাংলার জলপাইগুড়ি জেলার পচাগড়, দেবীগর্জ, তেঁতুলিয়া, বোদা, পাটগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের কথা বলা দরকার। এই এলাকাগুলির প্রায় সব ইউনিয়নগুলিতে কৃষক সভার সমিতি গঠন হয়। ১৯৩১ সাল থেকে কংগ্রেস গ্রামাঞ্চলে তাদের প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। কিন্তু তাদের এই প্রচারকার্য সীমাবদ্ধ ছিল দেবীগর্জ, বোদা, পাটগ্রাম ইত্যাদি এলাকাগুলিতে। কিন্তু তিস্তার পূর্ব পারে ডুয়ার্সের বিস্তীর্ন অঞ্চলে কংগ্রেসের প্রচার ও প্রসার কোনটাই সম্ভব হয়ে উঠেনি। কারণ ডুয়ার্স অঞ্চল ছিল খাসমহল এবং Non-Regulated Area। ফলে পরিস্থিতি ও আইন সংক্রান্ত বাধার জন্য এটা সম্ভব হয়নি। প্রাক্ তে-ভাগা পর্বে ডুয়ার্সে জোতদারদের সঙ্গে আধিয়ারদের বিরোধের খবর পাওয়া যায়নি। তাই জোতদারদের সঙ্গে প্রজাদের সম্পর্ক কেমন ছিল - তা এই প্রবন্ধ নতুন করে আলোচনার দাবি রাখে।

১৯৪০-৪৬ সালে জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগানগুলিতে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। মাল, মেটেলি এলাকায় চা-বাগানে ঠিকা প্রথা উচ্ছেদ, মজুরী বৃদ্ধি, শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ প্রভৃতি নানা দাবিতে শ্রমিক সংগঠন সোচ্চার হয়ে উঠে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই দোমহনীতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'Rail Workers Union.' এই ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হন দেব প্রসাদ ঘোষ (পটল ঘোষ), পরিমল মিত্র, অপরেশ রায়. রেবতীমোহন বসু প্রমুখ। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আসামের লামডিং শহরে অনুষ্ঠিত হয় "Assam Bengal Rail Union" এর চতুর্থ সম্মেলন। এই চতুর্থ সম্মেলনেও তে-ভাগা আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৪৭ সালে ১-লা মার্চ মেটেলি থানার অন্তর্গত নেওরা - মাঝিয়ালি গ্রামের ভোদলে দেউনিয়ার (আতাহার উদ্দিন) খোলানে তে-ভাগার সময় ৫ জন কৃষক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ১৯৪৭ সালের ৪ই এপ্রিল মেটেলি থানার মঙ্গল বাড়ির গয়ানাথ দাসের খোলানে ধান ভাগের ঘটনা জলপাইগুড়ি জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। সে এক করুণ এবং মর্মস্পর্শী কাহিনী। গয়ানাথ দাসের খোলানে ১০ (দশ) জন মৃত্যুবরণ করেন এবং গুরুতর আহত হন আরো ১২ (বার) জন। এই আহত ও নিহতদের মধ্যে ছিল একটি ৮ (আট) বছরের বালক। রেলের শ্রমিকদের সাহায্যে জলপাইগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় আহত ও নিহতদের। এখানে উল্লেখ্য বিষয়

হল যে, গয়ানাথ দাসের আধিয়ারদের মধ্যে শুধু রাজবংশীরাই ছিলেন না, সাঁওতাল ও নেপালীরাও ছিলেন।

মেটেলি থানার তে-ভাগা আন্দোলনে যে সকল শ্রমিক ও কৃষক শহীদ হয়েছেন তাদের নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হল ঃ—

১।	কমরেড	হপনা মাঝি	—	চা শ্রমিক
২।	,,	বুধু খেড়িয়া	—	,, ,,
৩।	,,	কৃষ্ণ উরাও	—	,, ,,
৪।	,,	রামু মুন্ডা	—	,, ,,
৫।	,,	সরবরু মহম্মদ	—	কৃষক
৬।	,,	বিরশা উরাও	—	,,
৭।	,,	জিতু কুমহার	—	চা শ্রমিক
৮।	,,	বেচপা খেড়িয়া	—	,, ,,
৯।	,,	লোধরা বুড়া	—	,, ,,
১০।	,,	লছমন সিং	—	রেলশ্রমিক
১১।	,,	শহরাই মুন্ডা	—	কৃষক
১২।	,,	করমী উরাওনী	—	কৃষক রমনী
১৩।	,,	বুধনী উরাত্তনী	—	,, ,,
১৪।	,,	স্বর্ণময়ী উরাত্তনী	—	,, ,,
১৫।	,,	এতোয়ারী উরাত্তনী	—	,, ,,

ইংরেজ শাসিত অবিভক্ত বাংলায় জোতদার জমিদারদের বিরুদ্ধে তে-ভাগা আন্দোলন সংগঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে 'কৃষক সভার সংগঠন' এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। যদিও একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ডুয়ার্স এলাকায় ময়নাগুড়ি থেকে কুমার গ্রাম দুয়ার পর্যন্ত কৃষক আন্দোলনের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমনকি প্রতিবেশী দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের উচলপুকুর অঞ্চলের রাজা দীনেশ্বরের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের কোন প্রভাব ডুয়ার্সের কৃষক আন্দোলনে পড়েনি। ডুয়ার্সের মেটেলি অঞ্চলের তে-ভাগা আন্দোলন তাই কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। সুতরাং লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো - এই ডুয়ার্স এলাকার মেটেলি অঞ্চলে তে-ভাগা আন্দোলন যে ভাবে সংগঠিত হয় ডুয়ার্সের অন্যপ্রান্তে সেই আন্দোলন কিন্তু চোখেই

পড়ে না। ডুয়ার্স ভূ-খন্ডে তে-ভাগা আন্দোলনের এই পার্থক্য কেন হল — সমাজ বিজ্ঞানের নিরিখে এর কারণ অন্বেষণ করা অত্যন্ত জরুরী বলে আমার মনে হয়।

সূত্রনির্দেশ

১। Ghon F. Gruning, Eastern Bengal and Assam District Gazetteers. Jalpaiguri. 1911.

২। *পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি সংখ্যা*, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ১৪০৮, পঃ বঃ সরকার।

৩। DHE. Sunder.v. Survey and Settlement of the Western Duars - 1889-95।

৪। *'পশ্চিমবঙ্গ' — তে-ভাগা সংখ্যা*, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ১৪০৪, পঃ বঃ সরকার।

৫। Ranjit Das Gupta. *Economy. Society and Politics of Bengal Jalpaiguri - 1869-1947*।

৬। বিমল দাশগুপ্ত, *আমার কথা ও ডুয়ার্সের কথা*, প্রথম সংস্করণ, ১-লা বৈশাখ - ১৪০১।

৭। সম্পাদনা - চারুচন্দ্র সান্যাল ও অন্যান্য, *জলপাইগুড়ি শতবার্ষিকী গ্রন্থ* - ১৮৬৯-১৯৬৮।

৮। সম্পাদক - আনন্দ গোপাল ঘোষ, *মধুপর্ণী* - জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৩৯৪, সংখ্যা।

৯। সম্পাদক - শ্রী অরবিন্দ কর, *কিরাত ভূমি* - জলপাইগুড়ি জেলার ১২৫ বর্ষ জেলা সংকলন - ১৮৬৯-১৯৯৪।

১০। আনন্দ গোপাল ঘোষ, জলপাইগুড়ি জেলার রাজনৈতিক জীবন (১৮৬৯-১৯৬৯) - *ত্রিস্রোতা*, সাপ্তাহিক পত্রিকা-১৯৯০ প্রাসঙ্গিক সংখ্যা, সম্পাদক - বিশ্বনাথ কর্মকার।

১১। সম্পাদক - তনয় মন্ডল, জল, *ময়নাগুড়ি - অতীত ও বর্তমান*, ২০০৩।

১২। সম্পাদক - কল্যান শিকদার, 'জলপাইগুড়ি' পত্রিকা, ১৯৬৯, জলপাইগুড়ি জেলা সি.পি.এম. এর মুখপত্র।

১৩। সাক্ষাৎকার ঃ- (ক) সুধীর চন্দ্র রায়, কালীর হাট, জলপাইগুড়ি, বয়স - ৬৫, (খ) হরিমোহন বর্মন, রাঙ্গালী বাজনা, জলপাইগুড়ি, বয়স - ৭০, (গ) ফজলে করিম, এথেল বাড়ী, জলপাইগুড়ি, বয়স - ৫৫।

এই প্রবন্ধের কাঠামো নির্মানে ও তথ্য বিশ্লেষণে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আনন্দ গোপাল ঘোষ।

১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি

আরতি কাহালি গোস্বামী

তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, কালজানি, রায়ডাক, ধরলা, মানসাই গদাধর ও সঙ্কোষ নদী বিধৌত কোচবিহার রাজ্যটি।[১]

রাজ্যটির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি আলোচনা করতে গেলে রাজ্যটির নামকরণ নিয়ে প্রশ্ন জাগে। ঐতিহাসিক বিবরণী ও মানচিত্রে রাজ্যের নামকরণে মতবিরোধ ও বিতর্কের অবসান ঘটে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের রাজবিজ্ঞপ্তি দ্বারা রাজ্যটির নামকরণ (Cooch Behar) কোচবিহার স্থিরিকৃত হয়।[২]

নাবালক রাজার রক্ষণাবেক্ষণ, রাজ্য রক্ষা, রাজস্ব রক্ষার জন্য রাজ্যের শাসনভার ইংরেজ সরকার গ্রহণ করে। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬সে জানুয়ারীতে Colonel J. C. Haughton সাহেব কোচবিহারের কমিশনার নিযুক্ত হন। তিনি ঐ পদে ১৮৭৩ পর্যন্ত ছিলেন। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে একজন ডেপুটি কমিশনারের পদ সৃষ্টি হয়। এই পদে প্রথম আসেন Mr. H. Beveridge। হটন সাহেব নাবালক রাজার রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষা অতি সচেতনায় পালন করেন, ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে রাজাকে (নৃপেন্দ্রনারায়ণকে) বারাণসীর কোর্ট অব ওয়ার্ডে শিক্ষার জন্য ভর্তি করে দেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে উত্তরপ্রদেশের বাকিপুরে এবং বিহারের পাটনার কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশুনার ব্যবস্থা করেন। রাজার তত্ত্বাবধায়ক ও শিক্ষক ছিলেন knellor সাহেব। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে Mr. J.G.B.T. Dalton কোচবিহারের কমিশনার হয়ে আসেন। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর সহিত রাজার বিবাহ হয়। ঐ বছর ১৫ মার্চ তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়েন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর ছিলেন River Thomson। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা স্বহস্তে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন।[৩]

মহারাজার আমলে Mr. O. Donel সাহেব এলাকাভিত্তিক জমি জরিপ করেন যার ফলস্বরূপ কোচবিহার মাথাভাঙ্গা, দিনহাটা, হলদিবাড়ি মেখলিগঞ্জ ও তুফানগঞ্জ পাঁচটি

মহকুমার সৃষ্টি হয়। বকেট সাহেব জমি বিঘা কাঠা ও ধুর হিসাবে ভাগ করেন। মোট জমির পরিমাণ ছিল ২৪,৮২,১৮৩ বিঘা। রাজা ছিলেন জমির মালিক। জমি আবার দু'ভাগে বিভক্ত ছিল—রাজস্বপ্রদায়ী ও নিষ্কর। রাজস্বপ্রদায়ী জমি রাজ্য খাজনার বিনিময়ে জোতদারদের দিয়ে দিতেন। জোতদার তার জমি অধস্তন প্রজাদের দিয়ে দিত।[৪-৫]

এছাড়া কিছু অনাবাসিক (Non Resident Ryots) জোতদার ছিল যারা চাষবাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন বহিরাগত। হয়তো একসময়ে রাজার আমলা বা অনুগত কর্মচারী এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে স্থানীয় জোতদাররা অনেকাংশে অধস্তন প্রজাতে পরিণত হয়।[৬]

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী রাজ্যের লোকসংখ্যা ছিল ৬,০০,৯৪৬ জন, এদের মধ্যে —

হিন্দুর	সংখ্যা	ছিল	৪,২৫,৪৭৮	জন
মুসলিম	,,	,,	১,৭৪,৫৩৯	,,
জৈন	,,	,,	১৪৪	,,
খ্রিস্টান	,,	,,	৪৮	,,
সাঁওতাল	,,	,,	১৯	,,
আদিমজাতীয়	,,	,,	৩৯৬	,,
অন্যান্য	,,	,,	৩২২	,,
			৬,০০,৯৪৬[৭]	,,

প্রজাদের মধ্যে রাজবংশী প্রজার সংখ্যা ছিল বেশি। এছাড়া কোচ, মেচ, গাড়ো দো-ভাষীয়া, মোরাঙ্গিয়া এবং আর্য বংশভূত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থের বসতি। রাজবংশী প্রজারা ছিল হিন্দু ও ক্ষত্রিয়। রায় পঞ্চানন ঠাকুরের প্রচেষ্টাতে রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের সময়ে রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় হিসাবে স্বীকৃতি পায়। রাজ্যের লোকসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মহামারী ইত্যাদির জন্য। এরা হিন্দু আচার কিছু লোকাচার লৌকিক দেবদেবী পূজা করত। কিন্তু সুনীতি দেবীর আগমনে রাজ্য ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব ও ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাব দেখা যায়।[৮]

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা ও সুনীতিদেবীর বিবাহ বন্ধন কোচবিহার রাজ্যটিতে এক নূতন সংস্কৃতির ভাবনার ধারা প্রবাহিত করে রাজার সহযোগিতা ও মহারাণীর উদ্ভাবনী প্রচেষ্টাতে রাজ্যটি শিক্ষা সংস্কৃতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে চলে। শুধু মাত্র শিক্ষা ব্যবস্থা বললে ভুল হবে প্রকৃতপক্ষে নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল কোচবিহার রাজ্যের নবজাগরণের যুগ' বলা হয়। তার রাজত্বকাল বৃহত্তর ভারতের সাথে সর্বক্ষেত্রে যোগাযোগ হয়। এখন

শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে হটন সাহেব মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ, দিনহাটা ও তুফানগঞ্জে বাংলা পঠনপাঠনের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত করে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ দেখা যায়। বিদ্যালয়ের কাজকর্মের দেখভালের জন্য শ্রীরমেশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে শিক্ষার কাজের ভার দেওয়া হয়। সেই সময়ে ইংরেজ সরকারের শিক্ষানীতি কোচবিহারেও চালু করা হয়। রাজার পৃষ্ঠপোষকতা ও রাজার ভাণ্ডার হতে শিক্ষার জন্য অর্থদান শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক সাড়া জাগায়। কোচবিহার রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা ছিল যে অর্থের অভাব ছিল না, বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫৮টি। ৩৭টি ছিল অনুমোদিত, ২১টি অননুমোদিত, ৫টি ছিল বালিকা বিদ্যালয়। ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৩০ জন। শিক্ষা ব্যয় ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ৭০২২ টাকা। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ব্যয় ছিল ২৯,৫১৫ টাকা, এর মধ্যে জনসাধারণের দেয় চাঁদা ছিল ২,৮৮৪ টাকা।[৯]

বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি ও অবস্থানগত দূরত্বের জন্য শিক্ষার কর্মসূচী ও তত্ত্বাবধানের জন্য Government Inspector of School, পদের সৃষ্টি হয় ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে। Rev. R. Robinson ঐ পদে নিযুক্ত হন। বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ের দেখভালের জন্য ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে কৈলাশ নাথ মুখার্জীকে নিযুক্ত করা হয়।[১০]

১৮৭৬ থেকে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে Deputy Inspector of Schools, Sub Inspector of Schools এবং চারজন Inspecting Pandit এর পদ সৃষ্টি হয়। যথাযোগ্য ব্যক্তিত্বকে ঐ সকল পদে নিয়োগ করা হয়। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে J.G.B.T. Dalton কোচবিহারে Deputy Commissioner পদে নিযুক্ত হন। রাজ্যের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৮২টি। ১৮৭৬-৭৭ সালে জেনকিন্স বিদ্যালয় থেকে ৫ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ২ জন প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লাভ করে। এই সময়ে রাজ পরিবার থেকে একজন First Art পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। নিম্নলিখিত সারণী থেকে ১৮৭১-৭২ হতে ১৮৭৯-৮০ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যায় জানা যায় ঃ-

ইংরেজী সাল	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	অনুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা	অননুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট সংখ্যা
১৮৭১-৭২	৪	৪৯	২৯	৮২
১৮৭৫-৭৬	৭	১৭৭	৯৮	২৮২
১৮৭৯-৮০	৬	২৮৯	৯৫	৩৯০

ইংরেজী সাল	সরকারী ব্যয়	বে-সরকারী ব্যয়	শিক্ষাক্ষেত্রে মোট ব্যয়
১৮৭১-৭২	২২,২৩৩ টাকা	৬,২৭৩ টাকা	২৮,৫০৬ টাকা
১৮৭৫-৭৬	৪২,৪৯১ টাকা	২২,৩৫৭ টাকা	৬৪,৯৪৮ টাকা
১৮৭৯-৮০	৬০,৬৮৫ টাকা	৩৩,২১৩ টাকা	৯৩,৮৯৮ টাকা[১১]

শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা যায় যে সাবডিভিশনের অধিকাংশ ছাত্রই ছিল বাঙালী আমলাদের পরিবারভুক্ত — জমিদার, ডাক্তার ও উকিলদের সন্তান-সন্ততি। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বিশেষ করে খাগড়া বাড়ির ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ইংরেজী শিক্ষায় উৎসুক ছিল না। সম্ভবত রক্ষণশীলতা বা আর্থিক অসংগতি এর কারণ ছিল। এছাড়া রাজ্যের দূর প্রান্তের জোতদাররা চাষবাস ছেড়ে তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে অনিচ্ছুক ছিল।[১২]

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ রতিবাবুর বালিকা বিদ্যালয়টির অধিগ্রহণ করে সুনীতি কলেজ স্থাপন করেন; পরে সুনীতি একাডেমি নামে পরিচিত হয়। বিদ্যোৎসাহী মহারাণী ছাত্রদের প্রথাগত লেখাপড়ার সাথে সু আচরণ ও যথাযথ সামাজিক রীতিনীতির সাথে পরিচিত হবার শিক্ষা দেন। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা উচ্চশিক্ষার জন্য ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপন করেন ও ২৫,০০০ টাকা মহাবিদ্যালয়ের কক্ষ ও অন্যান্য খরচের জন্য দান করেন। মহাবিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন J. C. Godley. M.A.। ১৮৯৬ সালে দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অধ্যক্ষ হন। কলেজের শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১২৪ জন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে কলেজের ১৯৯ জন ছিল আণ্ডার গ্রাজুয়েট। ৭৩ জন BA, ৪ জন MA, ১৯ জন BL পাশ করে।[১৩] ১৮৮৩-৮৪ ইংরাজী সালে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যয় ছিল রাজার ৭৬,৪১৬ টাকা, জনসাধারণের চাঁদা ছিল ১৮,০২০ টাকা। এই সময়ে উচ্চশিক্ষার জন্য নিম্নশিক্ষার ব্যয় সংকোচন হয়। নিম্নলিখিত সারণী থেকে শিক্ষার ব্যয় সংকোচন জানা যায় ঃ-

ব্যয়	ইংরাজী সাল ১৮৭৭-৮৮	ইংরাজী সাল ১৮৯৪-৯৫
রাজ্যের মোট ব্যয়	৬৭,০১৬ টাকা	২৮,৪৩৫ টাকা
ইনস্পেকটিং চার্জ	১১,৯১১ টাকা	৫,৯০৯ টাকা
বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৩২৭ টি	৩১১টি
ছাত্র সংখ্যা	১০,২৪২ জন	১০,৫৬৫ জন

শিক্ষাক্ষেত্রে রাজার ব্যয় সংকোচন হলেও জনসাধারণ শিক্ষায় উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে

আসে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে। দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা ও মেখলিগঞ্জের জনসাধারণ Entrance School স্থাপনের জন্য ২৫,০০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে ঐ সব মহকুমাতে ঐ সালেই এনট্রান্স স্কুল স্থাপিত হয়। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৫৩টি, ছাত্রসংখ্যা ছিল ১১,৭৪০ জন, রাজ্য সরকারের দেয় অর্থ ছিল ৬৩,৭১০ টাকা, জনসাধারণের দেয় চাঁদা ছিল ১৯,৮১৯ টাকা। সুনীতিদেবী ও মহারাজ যে শিক্ষা ব্যাবস্থা চালু করেন তার পরবর্তী মহারাজারাও পিছুপা হননি। জিতেন্দ্রনারায়ণ তার কন্যা গায়েত্রীদেবীর (বর্তমান জয়পুরের রাজমাতা) নামে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় স্থাপন করে। মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের আমলে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয় সংখ্যা ছিল ৪৩৭টি ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৭,৯১৩ জন। সরকারের ব্যায় ছিল ৪২,৮৫৫ টাকা বেসরকারী উৎস থেকে টাকা আসতো ৬৬,০৪৪ টাকা। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ষ্টেট কাউন্সিল এক বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন শিক্ষার ক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে পাঁচ বছরের মধ্যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হবে। কিন্তু ভারত স্বাধীন হলে রাজনৈতিক পটভূমি পরিবর্তনের জন্য কাজ অসমাপ্ত রয়ে যায়।[১৪]

কোচবিহারের সাংস্কৃতিক ধারাটি সুনীতিদেবী ও মহারাজার পারিবারিক বন্ধনে এক নূতন ভাবনার জোয়ার আসে। নারী প্রগতি ধারাটি তিনিই প্রবাহিত করেছেন। তিনি সুনীতি কলেজের ছাত্রীদের সংস্কৃতি সম্পন্না করে তুলতেন। রাসমেলা ব্রহ্ম উৎসবের সময়ে মেয়েদের দিয়ে ট্যাবলোর ব্যবস্থা করতেন। কলকাতার কমলকুটিরে এবং উডল্যাণ্ড হাউজে মাঘ উৎসবের সময় তিনি মেলা বসাতেন। মহিলারাই সেই মেলা পরিচালনা করতেন। তিনি সু-গায়িকা ছিলেন। ঐ উৎসবে কীর্তন গাইতেন, তিনি সাহিত্যেও এগিয়ে ছিলেন তার আত্মজীবনী "The Autobiography of an Indian Princess" রচনা করে। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা সুনীতিদেবী বাংলায় ১০টি ও ইংরেজীতে ৮টি গ্রন্থ রচনা করেন, যদিও এসব গ্রন্থ ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের পর ছাপা হয়েছে। জিতেন্দ্র কন্যা গায়েত্রীদেবী সুনীতিদেবীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তার আত্মজীবনীতে ("The Princess Remembers") লিখেছেন ঃ "I never new my grand-father for he died long before I was born; but my grand mother Sunity Devi was gentle and afectionate presence all throughout my child-hood." রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের বেশ বড় লাইব্রেরী ছিল প্রতি বৎসর ২০০০ টাকার গ্রন্থ ক্রয় করতেন, তার লেখা "The Thirty Seven Years of Big Game shooting in Cooch Behar, Duars and Assam." একটি A Rough Diary-তে শিকার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও নানা মজার কাহিনী আছে। বইটি ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়। সুনীতি ভগ্নি গজেন্দ্র পত্নী ব্রহ্মধর্ম প্রচারে রত ছিলেন। এই সময়ে রাজ্যে ব্রাহ্ম ধর্মের জন্য ব্রাহ্মমন্দির তৈরি হয়। মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা ও মেখলিগঞ্জে পাঠাগার স্থাপন এবং কোচবিহারে

সাহিত্যসভার সৃষ্টি করেন। তিনি রাজ্যের গ্রন্থগারের উন্নতি সাধন করেন। তাঁর রচিত ২টি কাব্য ও একটি নাটক "Hello Darjeeling." তাঁর পত্নী ইন্দিরাদেবী ভাল বাংলা শিখেছিলেন, শরৎচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়তে ভাল বাসতেন। বই কেনার অভ্যাস ছিল, বই পড়া হলে লাইব্রেরীতে দান করে দিতেন। তার সম্পর্কে সুনীতিদেবী বলেছেন, "Indira is clever and very pretty. She knows several language and has travelled a great deal."

রাজকুমার ভিক্টোর নিতেন্দ্র নারায়ণ কৃষি বিশারদ হয়েও সাহিত্য-রসিক ছিলেন। তাঁর গৃহশিক্ষক ইন্দুভূষণ মজুমদারের লেখা "America through Hindu Eyes বইটি তাঁর সম্পাদনায় রচিত হয়। বইটি মহারাজা জিতেন্দ্রকে উৎস্বর্গ করেন। নিতেন্দ্র পত্নী নিরুপমা দেবী ছিলেন সাহিত্যিক। তাঁর সম্পর্কে সুনীতিদেবী বলেছেন, "Victors wife Nirupama; she is the same as we are a Brahmo, she is well educated and edits a Magazine in Bengalı." নিরুপমাদেবী "আমার জীবন"-এ লিখেছেন, ছোট থেকেই তার সাহিত্য প্রীতি ছিল এটা তাঁর মার কাছ থেকে পাওয়া। ১৯১১ সালে ২০ বছর বয়সে তিনি রাজ পরিবারের বধূ হিসেবে এলেন। মনের খোরাকের জন্য কেশব সেনের পরিচারিকা পত্রিকাকে "পরিচারিকা নবপর্যায়" নামে পুনঃপ্রকাশিত করেন। এ কাজে তাকে সাহায্য করেছেন কোচবিহার প্রেসের জানকিবল্লভ বিশ্বাস। পত্রিকাতে বড় বড় নামকরা সাহিত্যিকদের গল্প, কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটিকা প্রভৃতি ছাপা হতো। পরিচারিকার সম্পাদিকা হিসাবে সেই সময়ের বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকদের সাথে তার পরিচয় হয়। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তার কাব্যগ্রন্থ "ধুন" প্রকাশিত হয়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে "গোধূলি" প্রকাশিত হয়।

জিতেন্দ্র কন্যা ইলাদেবী প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর ছিলেন। প্যারিসে চিত্রকলা, শান্তিনিকেতনে চিত্রাঙ্কন ও চারুশিল্প শেখেন। ভাল স্প্যানীশ বাঁশী, বেহালা বাজাতে পারতেন। ভাল পাইলট ছিলেন। গায়েত্রীদেবী তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন এই সময়ে রাজ অন্তপুরের মেয়েরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতো। হয়তো বা সুনীতিদেবীর আমলের পর্দা-প্রথার পটপরিবর্তন কিছুটা হয়েছিল।[১৫]

বাংলার ঠাকুর পরিবারের জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর ছিলেন নৃপেন্দ্রনারায়ণের সমসাময়িক। ঠাকুর পরিবার কৃষ্টিতে ছিল অগ্রগণ্য। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে জোড়াসাঁকো থিয়েটার মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে। কোচবিহার রাজ্যটি নাট্যচর্চায় এগিয়েই ছিল। ১৮৭০ সালে নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার আগেই কোচবিহারে খাগড়াবাড়ির কৃতি সন্তান মোহনাথ, সিদ্ধিনাথ ও পুরুষোত্তম চক্রবর্তী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ সামাজিক জীবনের অঙ্গ হিসাবে নাটক ও রঙ্গমঞ্চ স্থাপনে উদ্যোগী হন। সিদ্ধিনাথের বাড়ির বহিরাঙ্গণে ছিল অস্থায়ী নাট্যমঞ্চ। এই মঞ্চে রত্নাবলী, চন্দ্রগুপ্ত, উপেক্ষিতা, সীতা, শ্রীবৎস, নরনারায়ণ, প্রফুল্ল, দেবলদেবী ও ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে

পণ্ডিত সিদ্ধিনাথের লেখা "দ্রৌপদীর পরিণয়" অভিনীত হয়। এই মঞ্চে রাজকুমার প্রসন্ন নারায়ণ অভিনয় করেন। স্ত্রীলোকের ভূমিকাতে শশীকান্ত, বনমালী ও যতিন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অংশ নেয়। প্রসন্ন কুমার ভট্টাচার্যকে উত্তরবঙ্গের গিরীশ ঘোষ বলা হত। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে অস্থায়ী মঞ্চে হরিশচন্দ্র, রিজিয়া ও প্রতাপাদিত্য নাটক অভিনীত হয়। হরিশ্চন্দ্র নাটক দেখে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর দাঁড়িয়ে অভিনেতাদের উৎসাহ দেন। এই ক্লাব ইয়ংমেন্স থিয়েট্রিকেল ক্লাব নামে যাত্রা থিয়েটার অভিনয় করে; এতে অংশ গ্রহণ করেন কুমার কনক নারায়ণ, সঙ্গীতে অংশ নিতেন চিন্তহরণ রায়। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেয় ল্যান্সডাউন হল। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেয় মিউজিকেল ক্লাব। এতে নাটকে অংশ নিতেন অশ্রুমান দাশগুপ্ত, হিমাদ্রি বল্লভ বিশ্বাস ও ললিত মোহন বকসী। এরা মোঘলসন্ধ্যা নাটক অভিনয়কালে ৫০০ টাকা চাঁদা তোলেন অভাবী মানুষের জন্য।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে টাউন ক্লাবে কর্ণাজুন অভিনীত হয়। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ক্লাবের স্থায়ী মঞ্চ তৈরি হয় তার নাম হয় "করুণাময়ী"। ১৯৩০ ইং সালে জন্ম নেয় পুরানো পোষ্ট অফিস পাড়াতে বাণী মন্দির ক্লাব। এরা প্রতি মাসে একটি নাটক মঞ্চস্থ করত। ঐ সালেই পাটাকুড়া ক্লাব, হাজরাপাড়া ক্লাব স্থাপিত হয়। ১৯৪৬ ইং সালে স্থাপিত হয় সাংস্কৃতিক সংঘ। জগদ্দীপেন্দ্রের রাজত্বকালে রাজ্যের জলমাটির পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে আব্বাসউদ্দীন, সুরেন বসুনীয়া, নায়েব আলি, কেশব বর্মণ, প্যারীমোহন দাস প্রমুখ শিল্পীরা ভাওয়াইয়া চর্চার লালন পালন করে যা আজও লোকসঙ্গীতে অমূল্য সম্পদ। এইসব সঙ্গীতে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ, বিরহ-বেদনা ও সাধনার কথা জনমানুষকে আকৃষ্ট করে। এছাড়া কোচবিহার পুণ্যাহ উৎসব রাসমেলা, হলদিবাড়ির মাঘ উৎসব, তুফানগঞ্জের দোল উৎসব প্রভৃতিতেও, যাত্রা, কথক, কীর্তন হতো যা সংস্কৃতিকে পরিবর্দ্ধন করেছে। রাজার আমলের মদনমোহন বাড়িতে নহবতের সঙ্গীতের সুর আজও বেজে চলছে। মানুষের কানকে তৃপ্তি দেয়।

এতে দেখা যায় সে প্রত্যন্ত প্রান্তে অবস্থিত দেশীয় রাজ্যটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বরং এক ধাপ এগিয়েই ছিল।[১৬]

সূত্রনির্দেশ

১। নৃপেন্দ্রনাথ পাল, *ইতিকথায় কোচবিহার*, পৃষ্ঠা নং ২।

২। খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমেদ; *কোচবিহারের ইতিহাস*, *The Cooch Behar Gazette*, Monday April 1896, Page No. 28, Part No. 1. Noticed by Superintendent of the State Dr. R. Lyall

৩। যাদব চন্দ্র চক্রবর্তী, দীনদয়াল চৌধুরী, *The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement*, Page 287।

৪। H. N. Choudhury, *The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlements.* *কোচবিহার পরিক্রমা*, কৃষ্ণেন্দু দে, পৃ. ৩২।

৫। ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কোচবিহারের ইতিহাস*, সম্পাদনায় নৃপেন্দ্র নাথ পাল, পৃ. ২৬-২৭, H. N. Choudhury, *পূর্ব্বোক্ত*, পৃ. ৫১১।

৬। H. N. Choudhury. *পূর্ব্বোক্ত*, পৃ. ৪৪১, ৪৪৬, ৪৬৬।

৭। ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদনায় নৃপেন্দ্রনাথ পাল ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ৩১।

৮। Charu Chandra Sanyal, *The Rajbanshi of North Bengal*, Page 15. Durga Das Mazumder, *West Bengal District Gazettes Cooch Behar,* Page 45 Chapter III. H. N. Choudhury, *পূর্ব্বোক্ত*, Page 123, 24, 25.

৯। সম্পাদনায় গৌতম চট্টোপাধ্যায়, *ইতিহাস অনুসন্ধান* - ১১, পৃষ্ঠা ৫০৬. H. N. Choudhury. *পূর্ব্বোক্ত*, পৃ. ৩১৭।

১০। H. N. Choudhury. *পূর্ব্বোক্ত*. Page 318.

১১। Durga Das Mazumder. *পূর্ব্বোক্ত*, Page 174. 75. H. N. Choudhury. *পূর্ব্বোক্ত*. Page 318 Chapter III

১২। H. N. Choudhury. *পূর্ব্বোক্ত*, Page 122

১৩। *ইতিহাস অনুসন্ধান* ১১, প্রকাশ ১৯৯৬ সাল, পৃষ্ঠা নং ৫০৮; Maharani Sunity Devi. *The Autobiography of an Indian Princess*, Page 5. 87 H N. Choudhury. *পূর্ব্বোক্ত*, Page 320, 22, 25. কৃষ্ণেন্দু দে, পূর্ব্বোক্ত, পৃ. ৪৮।

১৪। ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্ব্বোক্ত*, পৃ: ৩৮-৩৯, Gayatri Devi, *A Princess Rememberance*. Page 40, Maharani Sunity Devi, *"Autobiography of an Indian Princess "*. Page 178.

১৫। *এক্ষণ শারদীয়া সংখ্যা* ৪০১ সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা সম্পাদনায় নির্মাল্য আচার্য, পৃষ্ঠা ৮৯, ৯৭, ১০১, নৃপেন্দ্রনাথ পাল, *পূর্ব্বোক্ত*, পৃষ্ঠা নং ১১২, ১১৪।

১৬। *মধুপর্ণী শতবার্ষিক সংখ্যা*, ১৩৯৬ (কুচবিহার) বাংলা সাল, পৃষ্ঠা নং ২৯৭, কৃষ্ণেন্দু দে, *পূর্ব্বোক্ত*. পৃষ্ঠা নং 79. *District Gazette*. 1896. 11th May 1896.

ইতিহাস, উত্তরবঙ্গ ও কৃষ্টি

জিতেন্দ্র নাথ দাস

ডঃ সুরেন্দ্র নাথ সেন, তাঁর "প্রাচীন বাংলার পত্র সংকলন" গ্রন্থে কোচবিহারের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, "ইতিহাস যেখানে মূক, কিংবদন্তী সেখানে মুখর।"[১] প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় 'বহুজন নায়ক' পত্রিকার ১৯৯২ সালের সংখ্যায় বীর মল্লিক, কতগুলি গ্রামের নামের সূত্র ধরে তুর্কী আক্রমণের ভয়ে পলায়নরত সহজিয়া সাধকদের নেপাল অভিমুখে গমন পথ ও তার ইতিহাসের সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[২] পার্বতী প্রসাদ চোংদার 'কিরাতভূমি' পত্রিকার বাংলা ১৪০৮ সালের নববর্ষ সংখ্যায় "হার নামীয় কিছু গ্রাম ও সামাজিক ইতিহাসের দলিল" শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধে ইতিহাস রচনায় গ্রামের নামের গুরুত্ব নির্ণয়ে সফল হস্তে লেখনী ধরেছেন।[৩] ডঃ নৃপেন্দ্র নাথ পাল, বাংলা ১৪০৯ সালের "অঙ্গীকার" পত্রিকার শরৎ সংখ্যায় "কোচবিহার রাজবংশের শাখা রায়কত" শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধে 'গরুমারা' এবং জলপাইগুড়ির 'পান্ডাপাড়া' জায়গা দুটির ইতিহাস উদঘাটন করেছেন।[৪]

সাম্প্রতিক গবেষণার প্রবনতা থেকে বোঝা যায়, ইতিহাসের সবচেয়ে বড় উপাদান হল, মানুষ এবং তার পরিবেশ। লিখিত তথ্যের অনুপস্থিতি, রাজবংশহীন কোন এলাকা বা জনগোষ্ঠীকে ইতিহাসহীন বলা সহজ নয়। কোন অঞ্চল বা জনগোষ্ঠীর ইতিকথা ভেসে বেড়ায় ঐ সমাজের নীতিবাক্যতুল্য প্রচলিত কথা, আচার-অনুষ্ঠান, প্রচলিত লোকগান, নদী, গ্রাম, অরণ্য এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতির মধ্যে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উপজাতি বাস করে এবং করত, তাদের ইতিহাসে জড়িয়ে রয়েছে এক সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ইতিহাস। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক, সমাজবিদের জন্ম আমাদের জানা ইতিহাসে পাওয়া যায় না, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক ধারণা রয়েছে যা সমচিন্তাযোগ্য বলে দাবিদার হতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে উত্তরবঙ্গের লোককথায় কিভাবে অতীত কালের সমাজসহ বিভিন্ন বিষয়ে এই নীতিবাক্যতুল্য শ্লোকগুলি আলোকপাত করেছে, কিভাবে তারা ঐতিহাসিক সাক্ষী হয়ে রয়েছে তা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। এগুলি গৃহনির্মাণের প্রযুক্তি, আবহাওয়া বিষয়ক, সমাজে নারীর মর্যাদা নির্ণায়ক, আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিচায়ক এবং আরো বহুমুখী গবেষণার সন্ধানে অনুসন্ধিৎসু মনের খোরাক দিয়ে থাকে। যেমন - বাড়ি কেমন হবে, কিভাবে বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে সে বিষয়ে একটি শ্লোক হল -

"উত্তরে গুয়া, দক্ষিণে ধুয়া,

পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ।"

বাড়ির উত্তরে থাকবে নারিকেল সুপারী বাগান, দক্ষিণ দিক থাকবে খোলা, রৌদ্র আসার জন্য, বাড়ির পূর্ব দিকে থাকবে পুকুর যাতে চরবে হাঁস এবং পশ্চিম দিকে থাকবে বাঁশের ঝাড় যা, কালবৈশাখী ঝড়ের প্রকোপ প্রতিরোধ করবে। এ থেকে শুধু কালবৈশাখী ঝড়ের গতিপথই বোঝা যায় না, তার সাথে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদের গৃহ নির্মাণের রুচি জানা যায়।

আবহাওয়া বিষয়ক একটি শ্লোক হল -

"মাঘত নাই জার, মেঘত নাই জার,

যুধি না বহে বয়ার।"

যার অর্থ মাঘ মাস বা মেঘলা আকাশ কোনটিই শীতল নয় যদি না শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। আর একটি কথা যেমন -

"সদায় না রহে পূর্ণিমার চান।

সদায় না রহে বাকালীর দোকান।"

যার অর্থ হল বাকালীর দোকান পূর্ণিমার চাঁদের মতই ক্ষণস্থায়ী। এর কারণ হল - তিস্তাচরের বাকালী স্থানটি বন্যাপ্রবন। স্বাধীন ভারত সরকার বাকালীর বন্যা প্রবনতা দূর করেছে। এখন আর বাকালীর দোকান ক্ষণস্থায়ী নয়, কিন্তু এই প্রবাদ শ্লোকটি অতীত বাকালী যে বন্যা প্রবন ছিল তা লোককথায় ধরে রেখেছে এবং রাখবে।

নারীরা শ্রমজীবী কর্মজীবী সমাজে সবসময়ে ছিল মধ্যমনি। তাদের স্বাধীনতা, মর্যাদারক্ষা ছিল সামাজিক বিষয়। অনেক গবেষক একমত যে - আধুনিকতা উপজাতি নারীদের স্বাধীনতার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। উত্তরবঙ্গবাসীদের ক্ষেত্রে এই সত্য ফুটে উঠেছে নিম্নলিখিত কথাগুলিতে -

"রাজার সুখে রাইজ্যত বাস।

ঘন্নীর সুখে পন্তাৎ গাস।"

এখানে রাজ্যে রাজার ভূমিকার সাথে পরিবারে নারীর ভূমিকাকে সমদৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। জমিদারী আমলে নিচের এই শ্লোকটি নারীর মর্যাদা রক্ষা করত।

"বারকামে গিঁর্হাই।

তের কামে তিরি।"

জমিদারের চাইতেও একজন নারীর গুরুত্ব এখানে ধরা পড়েছে! প্রসঙ্গত বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাংসারিক জীবনে নারীর ভূমিকা তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন - 'সংসার সুখী হয় রমণীর গুণে।' উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষ সামাজিক সুখকে বিশ্লেষন করেছেন নিম্নলিখিতভাবে।

"অন্ চিন্তা চমৎকার, অধিক চিন্তা ধার।
তার চাহিতে অধিক চিন্তা থের বেশী মাইয়া যার।"

এখানে পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক অবস্থা ধরা পড়েছে। চানক্য একটি শ্লোকে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াকে 'বহ্বড়াম্বরে লঘু ক্রিয়া' বলে বর্ণনা করেছেন। তেমনি একটি শ্লোক হল -

"ভাতার মাইয়্যার কাচাল না হয় পর।
বড় বড় পিয়াজিলা কছাৎ কর।"

হিমালয়ের পাদদেশে তরাইয়ের সন্নিকটে এই মানুষগুলি কমবেশী পরিশ্রমী, ভাগ্য বিশ্বাসীর তুলনায় কর্ম বিশ্বাসী। তা ধরা পরেছে এক গুরুত্ব পূর্ণ কথায়-

"আমরের ঘাটত অমরক ছুবে,
ভিক্ করে খায় সোনা।
শ্মশান ঘাটত সুকো কান্দ্যা
জন খটে খায় ধনা।"

অধ্যাপক প্রণব কুমার ভট্টাচার্য কোচবিহার রাজ্যে শিব উপাসনার সফলতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন - "এখানকার লোকের জমির উর্বরা শক্তির প্রদাতা স্বয়ং মহাদেব।" অরণ্য এবং পার্বত্য অঞ্চলের লোকেরা শিব, যোগীনি ইত্যাদি শক্তির উপাসনা করত প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে "লিঙ্গ এবং লাঙ্গল শব্দ দুটি একই দ্রাবিড় শব্দ থেকে উদ্ভুত।"[৭] এইভাবে উত্তরবঙ্গবাসীরা গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখেছে, যার মধ্যে ফুটে উঠেছে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের মহা প্রয়াস।

এরূপ আরো বহু কথা, গান, আচার-অনুষ্ঠানের তুলনা পাওয়া যাবে, যার সৃষ্টিকর্তার নাম কারো জানা নেই, শত শত বৎসর এগুলি লোক মুখে রয়ে গেছে। প্রসঙ্গত বলা যায় এ কথা শুধু রাজবংশীদের নয়, এ ইতিহাস কামতাপুরের 'খেন' বা 'কোচ' রাজাদের নয়, এ ইতিহাস, লোককথা উত্তরবঙ্গের কোচ, রাজবংশী, হাড়ি, ধোপা, মালী, তেলী, কোয়ালী, যুগী সমগ্র উপজাতির, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকের মুখের কথা, যার মধ্যে আছে সমগ্র অঞ্চলের অতীত পরিচয়।

সূত্রনির্দেশ

১। *সেন সুরেন্দ্রনাথ, প্রাচীন বাংলার পত্র সংকলন*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২, পৃঃ ২।

২। মল্লিক, বীর, "লুপ্ত গৌরব", বহুজন নায়ক, কলিকাতা, ১৯৯২ মে সংখ্যা, পৃঃ ৪।

৩। চোংদার, পার্বতী প্রসাদ, "হ্যর নামীয় কিছু গ্রাম ও সামাজিক ইতিহাসের দলিল", *কিরাতভূমি*, জলপাইগুড়ি, ১৪০৮ (বাংলা) নববর্ষ সংখ্যা, পৃঃ ৩৪।

৪। পাল, নৃপেন্দ্রনাথ, "কোচবিহার রাজবংশের শাখা রায়কত" অঙ্গীকার, বয়েজ রিক্রিয়েশন ক্লাব, দিনহাটা, ১৪০৯ (বাংলা) শারদ সংখ্যা, পৃঃ ৯১।

৫। Chatterjee Suniti Kumar. *Origin and Development of Bengali Literature*. Rupa & Co., Calcutta. 1985. Vol-I. Part-I, p.p.- 29-30. and Bhattacharya, Pranab Kumar. (ed). *Kingdom of Kamata Koch Behar in Historical perspective*. Ratna Prakashan. N.B.U., 1999, p. 38.

বিধবা বিবাহ ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ২৪ পরগনার মহিষবাথান গ্রাম ও স্বাধীনতা সংগ্রামী লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিক

সুধন্য কুমার মন্ডল

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ দু দশক ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেভাবে ব্রিটিশ বিরোধী গণ-আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল তাদের মধ্যে গান্ধীজীর ঘোষিত পরিচালিত ও প্রভাবিত ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের লবন আন্দোলন, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন ও মাদক দ্রব্য ব্যবহার বিরোধী আন্দোলনে ২৪ পরগনার লবন হ্রদ অঞ্চলের রাজারহাট থানার ''মহিষবাথান'' গ্রামের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বর্তমানে আজ যেখানে সল্টলেক পূর্বে তা জলাজঙ্গলে পরিপূর্ণ সুন্দরবন এলাকাভুক্ত ছিল। বিদ্যাধরী নদী ও তার শাখাপ্রশাখা দ্বারা বিধৌত ছিল অঞ্চলটি। বঙ্গোপসাগরের জলে বিদ্যাধরী নদীতে জোয়ার ভাটা হওয়ার দরুন এলাকাটিতে লোনা জলের আধিক্য থাকায় জায়গাটির নাম হয়েছিল সল্টলেক বা লবন হ্রদ। পূর্বতন সেই সল্টলেকের প্রায় ২০ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে মাত্র শহর সংলগ্ন ৩.৭৫ বর্গমাইল এলাকা গঙ্গার পলি ও বালি পাইপ যোগে এনে ১৯৬২ খ্রিঃ ভরাট করার পরিকল্পনা করেন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। এই কাজের টেন্ডার পেয়েছিলেন যুগোশ্লাভিয়ার ''ইনভেস্ট ইম্পোর্ট'' নামক ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী।[১] বর্তমানের সল্টলেক তাই অতীতে মজে যাওয়া বিদ্যাধরী নদীর চড়াভূমি। পূর্বে এই নদীর জল তার শাখানদী দিয়ে পূর্বের কুলটি থেকে বেলেঘাটার কোল ঘেঁসে দক্ষিণ পূর্বে তাড়দা (তাড়দহ) গ্রামের পাশ দিয়ে বিধান নগর, লেকটাউন, বাঙ্গুড় ও দমদম পার্ক পর্যন্ত এমনকি যশোর রোড হওয়ার পূর্বে দমদম স্টেশন ছাড়িয়ে প্রবাহিত হত। একসময় নৌকাযোগে পূর্ববঙ্গ, আসাম ও সুন্দর বনাঞ্চল থেকে বহু পণ্য বেলেঘাটার বাজারে আসত, ফলে বেলেঘাটায় গড়ে উঠেছিল নানা পণ্যের আড়ত।[২] ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা ও ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে বাংলার নবাব মীরকাশিম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লা ও দিল্লীর নবাব শাহ আলম.কে পরাস্ত করার পর ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে তারা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। ব্রিটিশরা ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্যিক সুবিধার উদ্দেশ্যে এই লবন হ্রদও কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে

একটি খাল কাটা শুরু করেন। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ইজারার বিনিময়ে দুর্গাচরন কুন্ডু এই অগভীর লবন হ্রদে মাছের ভেড়ির মালিকানা লাভ করেন। পরে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মালিকানা শেষ হলে ইংরেজরা পুনরায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ৩৪০০ টাকায় ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ৩০শে এপ্রিল ১০ বছরের জন্য ভবনাথ সেনকে ঐ ভেড়ির মালিকানা দেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ১০ বছরের জন্য আবার ঐ ভেড়ি ইজারা দেওয়া হয়। পরে ১৯৪৭ খ্রিঃ স্বাধীনোত্তর ভারতে সল্টলেক পুনরুদ্ধারের জন্য "মাষ্টার প্লান টেকনিক্যাল কমিটি" গঠিত হয়। তারপর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের স্বনামধন্য মুখ্যমন্ত্রী বিধাননগরের রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে ভরাট শুরু হল অগভীর লবন হ্রদ। বর্তমান খ্যাতনামা সল্টলেক তখন জলাভূমি অধ্যুষিত, ঝোপজঙ্গল, হোগলা বন - বিষধর সাপ হিংস্র জন্তু ও নিম্নবর্গের মানুষের আবাসস্থল ছিল।[৩]

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিদ্যাধরী গতিহীন হয়ে যাওয়ায় তার গভীরতা কমে যায়। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বিধুভূষণ সরকার অগভীর বিদ্যাধরীর বদ্ধ ময়লাজলে প্রথম মাছ চাষের ভেড়ি তৈরি করেন। বহু ব্যক্তির উদ্যোগে ও চেষ্টায় তৈরি হয় নামকরা বহু ভেড়ি যেমন - হাঁসার ও কাঁজীর ভেড়ি (বর্তমানে কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থা যার ওপর), বাঘের ভেড়ি (বর্তমানে যেখানে নয়নাভিরাম নিক্কোপার্ক), বাবুদের ভেড়ি (বর্তমানে যেখানে ব্যস্ত বহুল শিল্পস্টেট), কাঁকড়ামারির ভেড়ি (বর্তমানে যেখানে আধুনিক পারমাণবিক গবেষণাগার "ভাবা আণবিক গবেষণা কেন্দ্র"), নোড়তলার ও খাসেব ভেড়ি (বর্তমানে যেখানে সল্টলেক স্টেডিয়াম)। এছাড়াও ছিল খোঁড়ার ভেড়ি, দাসের ভেড়ি, কিছু ভেড়ি ও ঝিল।[৪] লবন হ্রদের ঐ সকল ভেড়ির যাঁরা রক্ষণাবেক্ষণ করতেন তাদেরকে "মোক্তার" (বাবু) বলে ডাকা হোত। উদাহরণ স্বরূপ বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত মহিষবাথান গ্রামের ঠিক উত্তর পূর্ব দিকে মহিষগোট গ্রামের অধর মন্ডলের (মোক্তার) পরিবাররা লবন হ্রদে প্রায় ৫০০ একর ভেড়ির মালিকানা ভোগ করত। রূপকথার গল্পের মতো অত্যাশ্চর্য হলেও বাস্তব সত্য ছিল যে তখন প্রতিদিন শালতি (ছোট নৌকার মত) করে বা বাঁকে করে গাছায় (বাঁশের বোনা) কাঁচা টাকা মোক্তার বাড়িতে আসত। (এখনও বর্তমান) এক বিশাল লোহার সিন্দুকে তা রাখত। এই মোক্তাররাই মহিষবাথান অঞ্চলে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম দুর্গাপুজা মহাআড়ম্বর সহ আরম্ভ করেন। আজও মোক্তার বাড়ির প্রাচীন ঐতিহ্য রুগ্ন হলেও বর্তমান। আছেন অধর মোক্তারের উত্তর পুরুষরাও। বর্তমানে সত্যেন্দ্রনাথ মন্ডলের কর্তৃত্বে বিগত ২৩ বছর ধরে ঘটাকরে সেই দুর্গাপূজা হলেও পূর্বের জৌলুষ ও জাঁকজমক নেই। ১৯৩০ খ্রিঃ লবন আইন ও ১৯৩২ খ্রিঃ চৌকিদারী ট্যাক্স না দেওয়ায় আন্দোলনের সঙ্গে পরিবারটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ফলে ঐ সময় "৩" খানা ট্যাক্স বাকির জন্য অধর মন্ডলের পরিবারকে ১টি ঘড়া ও ১টি থালা সহ বহু আসবাবপত্র ব্রিটিশ সরকারকে দিতে হয়।[৫]

লবন আইন আন্দোলনে মহিষবাথান ও স্বাধীনতা সংগ্রামী লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিক ঃ-

পূর্বের সেই অখ্যাত লবন হ্রদের বুকে এক অজ্ঞাত গ্রাম ছিল মহিষবাথান। ঐ গ্রামকে কেন্দ্র করেই ঐ অঞ্চলের জমিদার গোবর্দ্ধণ প্রামানিকের দ্বিতীয় পুত্র সমাজসেবী লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিকের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল ১৯২১-২২ খ্রিঃ অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০ খ্রিঃ লবন আন্দোলন, ১৯৩১ খ্রিঃ আইন অমান্য আন্দোলন , ১৯৩২ খ্রিঃ চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন ও "মাদকদ্রব্য ব্যবহার বন্ধ" আন্দোলন। এই সকল আন্দোলনে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল মহিষবাথান অঞ্চলের আশেপাশের বহু গ্রাম যথা পাথঘাটা, শিখরপুর, বাগু, নয়াবাদ, হাতিয়াড়া জ্যাংড়া, চারিগ্রাম, মাটকোল, ঘুনি, যাত্রাগাছি, অর্জুনপুর, চন্ডিবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, জগৎপুর, মহিষগোট, তারুলিয়া, ঠাকুরদাড়ি, ও ভাঙ্গড় থানার বহু চাষী, জেলে, বাগ্দী, ধোপা. কুম্ভকার প্রভৃতি বৃত্তির পৌন্ড্র, বর্গক্ষত্রিয় রাজবংশী, পুঁড়ো, সম্প্রদায়ের বহু মানুষ। এছাড়াও যোগ দিয়েছিল কৃষ্ণপুর, মহিষগোট, তারুলিয়া গ্রামে দারিদ্রের তাড়নায় খ্রিস্টান পাদ্রীদের আর্থিক প্রলোভনে খ্রিস্টান ধর্মে ধমান্তরিত মানুষরাও, যারা একসময় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অত্যাচারে ধর্মান্তরিত হয়েছিল, এই সব পৌন্ড্রক্ষত্রিয়, রাজবংশী বর্গক্ষত্রিয় মানুষরাও।[৬]

মহিষবাথানের আদি বাসিন্দা ও জমিদার গোবর্দ্ধন প্রামানিক কলকাতার সঙ্গে তৎকালীন জল ও জঙ্গলাকীর্ন মহিষবাথান ও আশে পাশের গ্রাম যেমন নাভাঙ্গা, লেবুগোলা, শেওড়াতলা, দত্তাবাদ, ২৪ বিঘা, ঘাড়ভাঙ্গা প্রভৃতির সঙ্গে যাতায়াতের জন্য শ্যামনগর যশোর রোড থেকে মহিষবাথান পর্যন্ত তিন মাইল রাস্তা তৈরি করেন, যে রাস্তা টি ২০.১২.২৮ তারিখে ৩৪ ডি. নং রেজিলিউশনে তার পুত্র লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিক ২৪ পরগনা জেলা বোর্ডকে দান করেন। ঐ দিন থেকে রাস্তাটিও জেলাবোর্ডের সিডিউল ভুক্ত হয়।[৭] বাণিজ্যিক জাতি ব্রিটিশ সরকার কলকাতার সঙ্গে পূর্ববঙ্গ ও আসামের পণ্য ও কাঠ নৌপথে আনার জন্য ১৯০৭ সালে উল্টোডাঙ্গা থেকে কুলটি পর্যন্ত প্রায় ২৫ মাইল দীর্ঘ কৃষ্ণপুর কার্ট ক্যানেল নামে একটি খাল কাটতে শুরু করেন। উদ্দেশ্য ছিল উল্টোডাঙ্গা থেকে বাগবাজার গঙ্গা পর্যন্ত মারাঠা ডাচ্ ক্যানেলের সঙ্গে যুক্ত করে সরাসরি প্রায় ২৫ মাইল খালপথে গঙ্গায় (হুগলী) পণ্য নিয়ে (কাঁচামাল) নিয়ে আসা সম্ভব হবে। কিন্তু মহিষবাথানের কাছে কৃষ্ণপুর রোড কেটে খাল খননের সময় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রামানিক পরিবার আদালতে মামলা করেন। এখান থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তৈরি হয় পরিবারটির মধ্যে। এই পরিবারের স্বাধীনচেতা, মুক্তিকামী বীরপুরুষ জমিদার সন্তান ভোগ বিলাসিতা ত্যাগ করে, জমিদার চরিত্রের শোষণনীতি পরিহার করে ভারতের অধিসংবাদী নেতা গান্ধীজীর মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিক ব্রিটিশ বিরোধী গণসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে সামিল

হন। গ্রামগঞ্জে ঘুরে ঘুরে তিনি গ্রামের নিম্নবর্ণের মানুষজনকে বুঝাতে লাগলেন - "ব্রিটিশ সরকারের শোষণ থেকে মুক্তি পেতে হলে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হবে। এজন্য দীর্ঘ সংগ্রাম চাই, চাই ধৈর্য্য।"[৮]

মহিষবাথান গ্রামের কিছু দূরের পাথরঘাটার জমিদার বাড়ির সন্তান গৌরহরি বিশ্বাসও সে সময় স্বদেশী আন্দোলনে মেতে উঠেছিলেন। মেদিনীপুর সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। মহিষবাথানে এসে তিনিও লক্ষ্মীকান্ত বাবুকে উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। এই সময়ে ১৮ মার্চ ১৯৩০ খ্রিঃ কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে কংগ্রেস লবন আইন ভঙ্গের প্রস্তাব রাখে। ১২ মার্চ গান্ধীজীর ডাণ্ডি অভিযানের উদ্যোগে সমগ্র ভারতসহ কলকাতাতেও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। সতীশ দাশগুপ্তকে সভাপতি করে কলকাতায় লবন আন্দোলনের সূচনা হয়। ২৪ পরগনায় সত্যাগ্রহ কমিটির সভাপতি প্রফুল্লনাথ ব্যানার্জী ও কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীও ২৪ পরগনায় লবন আইন ভঙ্গ আন্দোলনের ডাক দেন। তারা দমদম থেকে ৫ মাইল দূরে এই অখ্যাত মহিষবাথান গ্রামে ও ডায়মন্ডহারবারের নীলে "হুগলী পয়েন্টে" লবন আন্দোলনের কেন্দ্র নির্বাচন করেন। মহিষবাথান সত্যাগ্রহ কমিটিতে ছিলেন প্রফুল্লনাথ ব্যানার্জী, সত্যনারায়ণ চ্যাটার্জী, কালীচরন সেন, ক্ষিতিশচন্দ্র দাশগুপ্ত, হরিপদ মুখার্জী, অশ্বিনীকুমার দে সরকার, নরেন্দ্র নাথ সরকার, অনিল সরকার ও লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিক।[৯] কৃষ্ণপুরের প্রখ্যাত কবি, ও লেখক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী বসন্ত কুমার মণ্ডল তাঁর একাধিক গ্রন্থে *কলকলতা কলকাতা, অগ্নিগর্ভ মহিষবাথান* ও *সেদিনের কথা*, মহিষবাথানের লবন আন্দোলন ও চৌকিদারী কর বন্ধ আন্দোলনের নেতা লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিককে 'মহিষবাথানের গান্ধী' বলে অভিহিত করেছেন। ৭ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধপূর্ণিমার পরের দিন মহিষবাথানের সিংহপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিকের আহ্বানে ধর্মচড়ক তলার মাঠে ও তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত "মহিষবাথান জাতীয় বিদ্যালয়" প্রাঙ্গনে সকাল থেকেই লবন সত্যাগ্রহীরা সমবেত হতে থাকে। তাঁরই দেশাত্মবোধক আহ্বানে হাতিয়াড়া, ঘুনি, চারিগ্রাম, মাটকোল, চন্ডিবেড়িয়া, মহিষগোট, নয়াপট্টি ঢালিপাড়া, তারুলিয়া, যাত্রাগাছি, ঠাকুর দাঁড়ীর ঘরের বধু ও মেয়েরাও ঘর ছেড়ে আন্দোলন কেন্দ্রে এসে হাঁড়িতে নুন জ্বাল দিতে বসে যায়। বৈশাখের খরতাপ উপেক্ষা করে পুরুষরাও নুনমাটি ছেনার লোহার পাত নিয়ে বিদ্যাধরী নদীর চড়ায় নুনমাটি সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়ে। সুউচ্চ বাঁশের ডগায় বিশাল তেরঙ্গা পতাকা উড়িয়ে দেয় আইন ভঙ্গকারীরা। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সম্মোচ্চারিত কণ্ঠে বিপ্লবী অগ্নিমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে কেঁপে উঠেছিল মহিষবাথানের আকাশ বাতাস মাটি। চণ্ডিবেড়িয়ার চারণ কবিয়াল বীরুপদ মন্ডল ও অভিমন্যু মন্ডলের গামছার দড়িতে গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে দেশাত্মবোধক ও স্বদেশী

গানে মাতোয়ারা করেছিল সেদিনের সত্যাগ্রহীদের।[১০] হাজার হাজার মানুষ মহিষবাথানের বিশাল কর্মযজ্ঞে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জমায়েত হতে লাগলো। খেটে খাওয়া দরিদ্র সম্প্রদায়ের জেলে, বাগ্দী, পুঁড়ো, পৌন্ড্র, রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের মনে স্বাধীনতা পাওয়ার কী উদ্বেল উন্মাদনা জেগেছিল সেদিন।

মহিষবাথানের ব্রিটিশ বিরোধী লবন সত্যাগ্রহের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। নৈহাটীর কাঁঠালপাড়ার বঙ্কিমভবন থেকে সত্যাগ্রহীরা ১১ এপ্রিল গোবরডাঙ্গা, হাবড়া, রামচন্দ্রপুর বাদুড়িয়া হয়ে রাজারহাটের মহিষবাথানে আসার সিদ্ধান্ত নিল। বড়িষা থেকে অপর সত্যাগ্রহীরা বেহালা, মহেশতলা, বজবজ, কোদালিয়া, চাম্পাহাটি, ভাঙ্গড় হয়ে ১২ এপ্রিল মহিষবাথানে আসার পরিকল্পনা করল। আড়িয়াদহ থেকে অপর সত্যাগ্রহীর দল মহিষবাথানের দিকে আসতে লাগলো।[১১] আরামবাগ থেকে এলেন বিখ্যাত জননেতা প্রফুল্ল সেন। শান্তিনিকেতন থেকে এসেছিলেন বিশ্বকবির স্নেহধন্য ব্রহ্মজ্ঞানী প্রভাতমোহন বন্দোপাধ্যায়, সোদপুর থেকে এসেছিলেন সতীশ দাশগুপ্ত ও ক্ষিতিশ দাশগুপ্ত। এসেছিলেন প্রখ্যাত লেখিকা অনুরূপা দেবীও। সবাই উৎসাহিত করলেন সত্যাগ্রহীদের। প্রবল উৎসাহ পেলেন মহিষবাথানের গান্ধী লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিকও। তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন — "আমরা লবন তৈরি করা বন্ধ করব না। দেশের লোনাজল যেভাবেই হোক ব্যবহার করার অধিকার আমাদের আছে এবং থাকবে। আমরা অহিংস — ইংরেজরা যত খুশী নির্যাতন চালাক, আমরা সংকল্পচ্যুত হব না। কত জেলখানা আছে সরকারের আমরা দেখতে চাই।"[১২] লক্ষ্মীকান্তবাবু, সতীশবাবু, ইন্দ্রনারায়ণবাবু, ও কৃষ্ণপুর কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ও লক্ষ্মীকান্ত বাবুর বাল্যবন্ধু সাথী কৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকচন্দ্র নস্কর লবন ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে সত্যাগ্রহীদের কর্তব্য কর্ম বুঝিয়ে দিচ্ছেন। চওড়া সবুজপাড়ের খাদির শাড়ি পরে স্বনামধন্যা লেখিকা অনুরূপা দেবী চোখে গোল্ডফ্রেমের চশমা লাগিয়ে প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে সত্যাগ্রহীদের উৎসাহ দিতে নুনের হাঁড়ি জ্বাল দিতে বসে গেলেন। আন্দোলনের স্থায়িত্ব বাড়াবার জন্য ও আন্দোলন যাতে সহিংস হয়ে না ওঠে সে বিষয়ে নেতারা লক্ষ্মীকান্ত বাবুর সাথে আলোচনাও করতে লাগলেন।[১৩]

মহিষবাথানের লবন সত্যাগ্রহের গতিবিধির উপর তীব্র নজর রেখেছিল ব্রিটিশ সরকার, মহিষবাথানের লবন যখন কলকাতায় এনে "আইন অমান্য পরিষদের" মাধ্যমে বর্ধমানে, ফণিভূষণ সেনগুপ্ত ও শরৎচন্দ্র দাশ সোদপুরে ১৩ এপ্রিল ১৯৩০-এ ৫০ টাকার লবন বিক্রি করেন সর্বত্রই তখন মহিষবাথানের লবন ক্রয়ের জন্য জনগণের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।[১৪] "বাংলার বাণী" পত্রিকার সম্পাদক নলিনীকিশোর গুহ ও ঢাকা জেলা কংগ্রেস সম্পাদকও ১৪ এপ্রিল মহিষবাথানের দেড়সের লবন ৫০ টাকায় বিক্রি করেন। ঢাকার সিরাজগঞ্জে ও মহিষবাথানের লবন বিক্রি হতে লাগলো।[১৫]

মহিষবাথানের সত্যাগ্রহীদের দমন ঃ- মহিষবাথান লবন সত্যাগ্রহীরা লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিকের আহ্বানে ও নেতৃত্বে লবন আইন ভঙ্গ করে যে মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেছিল রাজার হাট থানার তদানীন্তন কুখ্যাত ব্রিটিশ পদলেহী নিষ্ঠুর জিতেন দারোগা তা দমনের জন্য গোপনে রিপোর্ট সংগ্রহ করে তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. রেজ্জম্যানকে পাঠালেন। মহিষবাথান লবন সত্যাগ্রহীদের দমনের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিশাল পুলিসবাহিনী নিয়ে কৃষ্ণপুর বাজারের কাছ থেকে নৌকাযোগে খাল পার হয়ে মহিষবাথান লবন ক্যাম্পের লবন তৈরির মাঠ ঘিরে ফেললেন। এলোপাথাড়ি লাঠি আর বুটের আঘাতে ভেঙ্গে দিলেন সত্যাগ্রহীদের নুনজ্বাল দেওয়ার হাঁড়িগুলি। সঞ্চিত লবন স্তুপের চারপাশে সত্যাগ্রহীদের জীবনমরণ অবরোধ নির্মম লাঠির আঘাতে ভেঙে ফেলে পুলিস রাস্তায় ছড়াতে লাগলো সেই পবিত্র লবন। মহিলা সত্যাগ্রহী অষ্টমী ঢালি, করুনাময়ী, স্বর্ণময়ী, মোক্ষদা, সৌদামিনীকে সঙ্গে নিয়ে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুললেন অনুরূপা দেবীও। কিন্তু লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিক সহ মহিষবাথানের লবন সত্যাগ্রহের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে পুলিস গ্রেপ্তার করলে নিরক্ষর অচ্ছুৎ, পৌন্ড্রক্ষত্রিয়, রাজবংশী, বর্গক্ষত্রিয় বংশের গরীব সত্যাগ্রহীরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। পুলিসী নির্যাতনে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে মহিষবাথান লবন ক্যাম্প পরিত্যাগ করে। ব্রিটিশ ধরপাকড়ে বহু সত্যাগ্রহীর কারাদন্ড হয় যদিও কোন সত্যাগ্রহীর পুলিসী নির্যাতনে মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। তাই হয়তো মহিষবাথান সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সঠিক আলোচনা আজোও ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পায়নি। সঠিক মূল্যায়ন হয়নি মহিষবাথান সত্যাগ্রহী আন্দোলনের।

চৌকিদারী কর বন্ধ ও মাদক বর্জন আন্দোলনে মহিষবাথান ঃ- সম্পূর্ণ অহিংস পথে মহিষবাথানের লবন সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলার পর পুলিসী গ্রেপ্তার, নির্যাতন ও নিপীড়নে লবন আন্দোলন ব্যর্থ হলেও প্রত্যেক সত্যাগ্রহীর শিরায় শিরায় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তীব্র আকার ধারণ করে। লক্ষ্মীকান্ত বাবু সহ প্রথম সারির নেতারা জেল থেকে ছাড়া পেয়েই ঐ সকল দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ মানুষদের নিয়ে ১৯৩২ খ্রীঃ চৌকিদারী কর বন্ধ আন্দোলন শুরু করেন। পাশাপাশি বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলন শুরু করে মহিষবাথান, ঢালিপাড়া, তারুলিয়া মহিষগোটে বহু পরিবারে সুতাকাটার জন্য চরকা বিতরণ করেন লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিক। তারক নস্কর, হরিচরন নস্কর, অধর মোক্তার, লালচাদ প্রামানিক, ভূষণ নস্কর, বিহারী বাগ্দীও নো ট্যাক্স মুভমেন্টে সাড়া দেন।[১৬] চৌকিদারী কর বন্ধ আন্দোলনে নারী সমাজের অবদানও অবিস্মরণীয়। প্রামানিক বাড়ি, মোক্তার বাড়ি, মন্ডল বাড়ির ও ঢালী পরিবারের মহিলারা ও অবগুন্ঠন ত্যাগ করে কুখ্যাত জিতেন দারোগার বাড়ি তল্লাসী ও আসবাবপত্র লুটপাটের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। পুলিসী খানা তল্লাসীর বিরুদ্ধে বিধবা অষ্টমী ঢাল, মাঝের পাড়ার স্বর্ণময়ী মন্ডীল, প্রামানিক

পরিবারের রাধাকিঙ্করীদেবী ও অন্নপূর্ণা দেবী সোচ্চার প্রতিবাদ করেন। সরকার ও ট্যাক্সের বিনিময়ে মালপত্র ক্রোক করতে থাকে।

চৌকিদারী কর বন্ধ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার প্রচন্ড দমন নীতি চালান। প্রতিদিন পাড়া ঘেরাও, ঘরবাড়ি তল্লাসী ও পুকুর তল্লাসী শুরু করে। মালপত্র ক্রোক করে কৃষ্ণপুরের "বারোয়ারী তলার মাঠে নিলাম ডাকে। বারাসাত মহাকুমার এস.ডি.ও. কে.কে. হাজরা রাজার হাট থানার দারোগা কুখ্যাত অত্যাচারী জিতেন রায়ের সাহায্যে পুরুষশূন্য গ্রাম থেকে গরুর গাড়ি বোঝাই ক্রোক করা মাল বারাসাতে নিয়ে গিয়ে নিলাম করে।

ফলাফল ঃ- জিতেন দারোগার সীমাহীন অত্যাচার ও লুটে গ্রামে হাহাকার দেখা দেয়। থালার অভাবে লোক কলাগাছের পাতায় ভাত খায়। ধান, চাল, গরু বাছুর পর্যন্তও তারা নিয়ে যাওয়ায় দরিদ্র গ্রামবাসী আরো অভাব ও অনটনে দিন কাটাতে শুরু করে। সরকার কর বন্ধ না করায় চাষীর দুর্গতি বাড়ে।

মাদক দ্রব্য বর্জন আন্দোলন ঃ- ১৯৩২-৩৩ খ্রিঃ মহিষবাথানের সত্যাগ্রহীরা তবু দমলেন না, গান্ধীজীর মাদক বর্জন আন্দোলনের ডাকে তারা ও মহিষবাথান অঞ্চলের অনুন্নত সমাজের মদ, তাড়িখোর মানুষজনকে নৈতিক অবনতির হাত থেকে রেহাই দিতে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। তখন মহিষবাথান, পাঁচুড়ে, চারিগ্রাম, তেঘরিয়া, অর্জনপুর, রঘুনাথপুর ছিল তাড়িমদের আড্ডা, প্রবাদ ছিল "পাঁচুড়ে পরগনা তাড়ির কারখানা।" প্রবীনরা ছড়া কাটত - "চারিগ্রামের তাড়ি / কাশীপুরের হাঁড়ি।" তাই সত্যাগ্রহীরা মাদক দ্রব্য বর্জনের জন্য কৃষ্ণপুর বারোয়ারী তলায় সভা ডাকলেন। লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিক, প্রফুল্ল সেন, চারুচন্দ্র ভান্ডারী, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশ দাসগুপ্ত সবাই মর্মস্পর্শী ভাষায় অনুরোধ করে অঞ্চলবাসীর কাছে মাদকদ্রব্য বর্জনের আহ্বান জানান। প্রথমে গ্রামে গ্রামে ঘুরে করজোড়ে, পরে পায়ে ধরে আন্দোলনকারীরা অনুরোধ করে। এতে ফল না হলেও আন্দোলনকারীরা তাল গাছে উঠে তাল গাছের মোচ কেটে ফেলে দিল; তারা আফগারী বিভাগে অনুমোদিত মাদক দ্রব্যের দোকান অবরোধ করে। লক্ষ্মীকান্ত বাবু, গেরি বিশ্বাস, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে মাদক দ্রব্য বর্জন প্রচার করতে লাগলেন। গেছোয়ারা (তালরস যারা কেটে তাড়ি বানায়) মাদক বর্জন সত্যাগ্রহীদের ওপর লাঠি, হাঁসুয়া হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিসরাও আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার শুরু করে।[১৭]

প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রামে এই আন্দোলনের তেমন প্রভাব না পড়লেও পরে অনেকে অহেতুক মাদক সেবন বন্ধ করে। আন্দোলনকারীদের কারারুদ্ধ হওয়ার ঘটনা তাদের মনে রেখাপাত করে। স্বেচ্ছায় অনেকে তাড়িখোর থেকে "তাড়িবিরোধীতে" পরিণত হয়।

বিধবা বিবাহ ও সমাজ সংস্কারে মহিষবাথান গ্রাম ও লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিক ঃ- ব্রিটিশ বিরোধী লবন সত্যাগ্রহ, বিদেশী বর্জন, চৌকিদারী কর বন্ধ, মাদক দ্রব্য বর্জন প্রভৃতি আন্দোলন চালাবার সময় আন্দোলন কারীদের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে সংগঠন সভা ও সমিতি পরিচালনার সময় গ্রামের কুসংস্কারের প্রতি লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিকের নজর এসেছিল। তখন বিভিন্ন গ্রামে নানান কুসংস্কার যথা অস্পৃশ্যতা, নিদারুণ পণপ্রথা, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা বা একঘরে করা প্রভৃতি ছিল। আধুনিক শিক্ষায় ও আধুনিক ভাবধারায় প্রভাবিত লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিক যুক্তি দিয়ে মোড়ল প্রভাবিত গ্রামের মোড়ল মাতব্বরদের ও কুসংস্কারে আবদ্ধ নিম্নবৃত্ত মানুষদের তিনি বুঝাতে লাগলেন। তার যুক্তিপূর্ণ কথায় প্রভাবিত হল গ্রামের মানুষেরা। তাদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হতে লাগলো।

পণপ্রথা ছিল সমাজ জীবনের অতি করুণ কুপ্রথা। এই ভীষণতম সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার প্রতিবাদ করেন। পণ না গ্রহণের দাবী জানান সবার কাছে। সাড়া পড়ল সবার মনে। সমাজের অপর ব্যাধি সামাজিক বয়কট বা একঘরে প্রথার বিরুদ্ধেও তার আন্দোলন অবিস্মরণীয়। বাপ ঠাকুরদার সামান্য একটু দোষের জন্য বা অপরাধের জন্য সেই অপরাধজনিত শাস্তি হিসেবে তার পুত্র, নাতিনাতনিদের উপর সামাজিক বয়কট কার্যকর করত মোড়ল মাতববররা। যুক্তিহীন, প্রতিবাদহীনভাবে তারা অকপটে মোড়লদের আদেশ মাথা পেতে সহ্য করত। এই সকল একঘোরে পরিবারকে পুনরায় সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা যায় তা যুক্তিসহকারে গ্রামে সভাসমিতি করে রক্ষণশীল গোঁড়া মাতববর প্রধান সমাজকে বুঝালেন লক্ষ্মীকান্ত বাবু। পুনরায় সামাজিক উৎসবাদিও অনুষ্ঠানে স্বাভাবিক ভাবে যাতায়াতের সুযোগ পেল তারা।[১৮]

লক্ষ্মীকান্তবাবুর অপর প্রধান সমাজ সংস্কার ছিল অচ্ছুৎ সমাজের বাল্যবিধবাদের পুনরায় বিয়ে দিয়ে নারীর পূর্ণ মর্যাদা ও নারী জাতির সম্মান ও সামাজিকতায় ফিরিয়ে আনা। বিদ্যাসাগরের প্রভাবে তিনি মহিষবাথান কেন্দ্রিক গ্রামগুলির খেটে খাওয়া পরিবারের দুর্ভাগ্যক্রমে ঘটে যাওয়া অকাল বিধবাদের সারা জীবনের নিষ্ঠুর সমাজের কঠোর নিয়ম ভেঙে তাদের সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। একদিকে ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের সময় মহিষবাথানে তার বিশাল বাড়ি ব্রিটিশ সরকার ক্রোক করে।' নিয়ে যায় আসবাবপত্র, বাসন কোসন থেকে শুরু করে দরজা জানালা, চৌকাঠ পন্ডিত। সেই শ্রীহীন জমিদাব বাড়িতেই নিজব্যয়ে নিজ উদ্যোগে গ্রামের মোড়ল মাতব্বরদের উপস্থিতিতে তিনি একের পর এক "বিধবা বিবাহ" সংগঠিত করেছিলেন। বহু প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষাকরে তিনি প্রথম "বিধবা বিবাহ" নিজ উদ্যোগে নিজ বাড়িতে নিজ ব্যয়ে সম্পন্ন করেছিলেন তাঁর খুল্লতাত বালবিধবা বোন বীনা প্রামানিকের সঙ্গে নয়াপস্তি গ্রামের সদ্য বিপত্নীক তরুণ মনোহর মাঝির। অতঃপর পর্যায়ক্রমে ১৩৩৮ সালের ১০ই

আগষ্ট যশোহর জেলার আশুতোষ দাসের সঙ্গে ২৪ পরগনার বড়িষার মান্যবর মন্ডলের বিধবা কন্যা রানীবালা দাসের, ১৩৩৮ সালে ২৮শে অগ্রহায়ণ ২৪ পরগনা হাটগাছার অক্ষয় কুমার মন্ডলের, ১৩৪০ সালের ১লা আষাঢ় চন্ডীবেড়িয়ার বিরুপদ মন্ডলের সঙ্গে মহিষবাথানের ১৮ বছর বয়স্কা এক বিধবার, ১৩৪০ সালে ৩১শে আষাঢ় পাথরঘাটার কালীচরন নস্করের ১৯ বছরের বিধবা কন্যার সঙ্গে জগৎপুরের ৪০ বছর বয়স্ক সন্তোষ মন্ডলের, ১৩৪৩ সালের ১৮ই বৈশাখ মহিষবাথানের ৩৯ বছরের উদয় কুমার মন্ডলের সঙ্গে পাঁচুড়িয়ার বিশ্বম্ভর নস্করের বিধবা কন্যা ২৫ বছরের শ্রীমতী সুবোদবালার বিবাহ, ১৩৪৩ সালের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ মুকুন্দপুরের জ্যোতিষ প্রামানিকের সঙ্গে কৃষ্ণপুরের ১৫ বছরের বিধবা কন্যা যমুনাবালার বিবাহ, ১৩৪৩ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ চন্ডীবেড়িয়ায় ৪০ বছর বয়স্ক শরৎচন্দ্র নস্করের সঙ্গে কৃষ্ণপুরের ভগীরথ ঢালির ষোড়ষী বিধবা কন্যা অষ্টবালার বিবাহ এই মহিষবাথান প্রামানিক বাড়িতেই সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক বিবাহে পৌরোহিত করেছিলেন পুলিন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক কুসংস্কার মুক্ত ব্রাহ্মণ।[১৯] পরে আরো অনেক বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল তাঁরই প্রভাবে। এসকল বিধবা বিবাহের কোনটিই ভবিষ্যতে বিবাহ বিচ্ছেদের খবর পাওয়া যায়নি। এই সব বিধবা বিবাহে যেগুলি লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিক নিজ ব্যয়ে নিজ উদ্যেগে নিজ বাড়িতে সম্পন্ন করেছিলেন সেই সব বিয়েতে তাঁদের বাড়ির কুলপুরোহিত নয়াপস্তির রামব্রহ্ম চক্রবর্তী প্রথমে বিরোধিতা করে ঐ সব বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণ করতে অস্বীকার করলেও পরবর্তীকালে তিনি লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিকের নিকট নিজ ভুলের ক্ষমা চেয়েছিলেন।[২০]

এইভাবে শহর থেকে দূরে এক অজ্ঞ অশিক্ষিত নীচবৃত্তির ও জীবিকার অচ্ছুৎ মানুষের বসবাসকারী গ্রাম মহিষবাথানকে কেন্দ্র করে পর্যায়ক্রমে ব্রিটিশ বিরোধী গণসংগ্রাম, লবন আন্দোলন, আইনঅমান্য আন্দোলন, কর বন্ধ আন্দোলন মাদক দ্রব্য বর্জন আন্দোলনের পাশাপাশি নানাবিধ সামাজিক সংস্কারের ধারা ঐ গ্রামের মধ্যমণি সংগ্রামী স্বাধীনচেতা সিংহপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিক এক অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। অন্ধত্ব ঘুচিয়ে মানুষকে শিক্ষার জন্য তার প্রতিষ্টিত মহিষবাথান জাতীয় বিদ্যালয় আজোও বিদ্যমান, যদিও ৫ই অক্টোবর ১৯৫৫ এ বিদ্যালয়টি তিনি ২৪ পরগনা জেলা স্কুল বোর্ডকে দান করেন।[২১] ব্রিটিশের উপর্যপরি কারাগার বরণও বসতবাটি ক্রোক হওয়ার দরুণ পরবর্তীকালে বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারটি ক্ষয়িষ্ণু হতে হতে একেবারে হীন হয়ে পড়ে। বর্তমান স্বাধীন ভারতের মানুষ তথা সরকার কর্তৃক তাঁর অবদানের মূল্যায়নের অতীব প্রয়োজন।

সূত্রনির্দেশ

১। ভূপেশ কুমার প্রামানিক, *লবন হ্রদের উপকথা*, ১৪০৭, ২য় সংস্করণ, পৃ- ১৭৯, পৃ-২১।

২। *ঐ*

৩। *Calcutta Gazette*, 1956, 19th May.

৪। ভূপেশ কুমার প্রামানিক, - *পূর্ব্বোক্ত*, পৃঃ ১৬১।

৫। শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ মন্ডলের সাক্ষাৎকার (মোক্তার বাড়ি) ০২.০২.২০০৩।

৬। বসন্ত কুমার মন্ডল, *সেদিনের কথা*, প্রথম খন্ড, ১৯৯৯, পৃঃ ১৮২।

৭। The Twenty Four Parganas District Board, Alipur এর Secretary, A. Jawad কে 17.09.42 এ লেখা লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিকের (ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট) এক চিঠি থেকে সংগৃহীত।

৮। ভূপেশ কুমার প্রমানিক, *পূর্ব্বোক্ত*,, ১৪০৭, পৃঃ ১২৩।

৯। *Liberty*, 28 March 1930, p-5

১০। বসন্ত কুমার মন্ডল, *পূর্ব্বোক্ত*,, ১ম খন্ড, ১৯৯৯, পৃঃ ১৮৩।

১১। *Liberty*, 2 April, 1930, p-5.

১২। বসন্ত কুমার মন্ডল, *অগ্নিগর্ভ মহিষবাথান*, ১৯৮৩, পৃঃ ১৬।

১৩। *ঐ*

১৪। *The Mussalman*, 13th April, 1930, p-6.

১৫। *ঐ*, 15th April 1930.

১৬। বসন্ত কুমার মন্ডল, *পূর্ব্বোক্ত*, ১৯৯৯, পৃঃ ১৯২।

১৭। বসন্ত কুমার মন্ডল - *অগ্নিগর্ভ মহিষবাথান*, পৃঃ ৪৭।

১৮। ভূপেশ কুমার প্রামানিক, *পূর্ব্বোক্ত*, পৃঃ ১৮৫-৮৬।

১৯। লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিক পরিবারের রক্ষিত ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা থেকে সংগৃহীত।

২০। ভূপেশ কুমার প্রামানিক (লক্ষ্মীকান্ত বাবুর ভাইপো)-এর সাক্ষাৎকার ২০.০৪.২০০২ এ।

২১। Draft deed of gift, dt. 5.10.55.

রাজারহাটে আইন অমান্য, বিপ্লববাদ ও বামপন্থী চিন্তাধারা (১৯৩০-১৯৪০)

পুষ্পরঞ্জন সরকার

রাজারহাট অঞ্চলটির অবস্থান উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায়; কলকাতার গা ঘেঁষে উত্তর-পূর্বাংশে। ভারতের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক আন্দোলনে রাজারহাটকে কলকাতার অবদানের সঙ্গে যুক্ত করে রাজারহাটের স্থানীয় মানুষের অবদানকে উল্লেখ করাই আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

রাজারহাট কলকাতার কাছে থেকেও যেন অনেক দূরে একশ শতাংশই গ্রাম্য পরিবেশ। রাজারহাটের বিস্তীর্ণ এলাকা জলা জায়গা — মাছের ভেড়ি, অন্যত্র কৃষি এলাকা।

শহর কলকাতার সঙ্গে রাজারহাটের সহজ যোগাযোগ ছিল না। অন্য দিকে কোন এক সময়ে সুন্দরবন এলাকার অঞ্চল হওয়ার দরুন রাজারহাটের সঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ অনেক বেশি। স্থানীয় মানুষরা বেশির ভাগ কৃষক ও ধীবর সম্প্রদায়ের। তবে অনেক বর্ধিষ্ণু পরিবারও রাজারহাট মহকুমায় বাস করেন।

ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে রাজধানী শহর কলকাতার অবদান কম নয়। বরং বলা যায় জাতীয় আন্দোলন বা স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বভারতীয় স্তরে কলকাতার অবস্থান প্রথম সারিতে। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের পথিকৃৎ কলকাতা। বোমার রাজনীতি শুরু হয় কলকাতা থেকেই।

রাজারহাটের জনবসতি কিন্তু প্রাচীন। কলকাতা গড়ে ওঠার আগেও এই এলাকায় জমিদারীর পত্তন ছিল। হুগলি নদীর পূর্ব তীর ধরে (বর্তমান কুমারটুলি / বাগবাজার) কলকাতার উত্তর-পূর্বাংশে রাজারহাটের বিস্তীর্ণ এলাকায় লোকবসতি গড়ে ওঠে। গোপালপুর, কৃষ্ণপুর, অর্জুনপুর, রেখজানি ইত্যাদি এলাকার বনবসতির পরিচয় আছে। কুমারটুলির মিত্রদের (নীলমণি মিত্র) জমিদারী ছিল এই অঞ্চলে।[১] কলকাতা গড়ে ওঠার পূর্ব থেকে যে এ অঞ্চলে জনবসতির বিস্তার ছিল, এ তথ্য তা' প্রমাণ করে।

আলোচ্য প্রবন্ধের সঙ্গে বলতে হয়, তিন নগর — কলকাতা, সল্টলেক ও বর্তমান নির্মায়মান রাজারহাট 'মেগাসিটি'র (নিকটবর্তী গ্রামগুলি) সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আইন অমান্য আন্দোলন, বিপ্লববাদ, ও বামপন্থী কৃষক শ্রমিক আন্দোলনের পটভূমিকা

বিশেষভাবে জড়িত। কলকাতার জাতীয় আন্দোলন দ্বারা বর্তমান সল্টলেকের নিকটবর্তী মহিষবাথান, কৃষ্ণপুর এবং রাজারহাট ও সংলগ্ন বাগু, চাঁদপুর, ঘুনি, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলগুলো খুবই প্রভাবিত হয়েছিল।

ডাণ্ডীতে গান্ধীজি লবণ আইন ভঙ্গ শুরু করলে (৭ই এপ্রিল, ১৯৩০), লবণ সত্যাগ্রহের ঢেউ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার আইন অমান্য আন্দোলন অত্যন্ত জোরালো হয়ে ওঠে। মেদিনীপুরের সমুদ্রোপকূলবর্তী তমলুক, কাঁথি, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলে ব্যাপকহারে বে-আইনি লবণ প্রস্তুত করে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। কলকাতার নিকটবর্তী সল্টলেকের নোনা জল থেকে বে-আইনী লবণ তৈরির সুযোগ থাকায়, কলকাতার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীরা সল্টলেক সংলগ্ন মহিষবাথান গ্রামে স্থানীয় মানুষের সহায়তার লবণ আইন ভঙ্গের ক্যাম্প তৈরি করেন। স্থানীয় জমিদার লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিক[২] ও তমলুক প্রত্যাগত স্থানীয় যুবক অভিমন্যু মণ্ডল মহিষবাথানের গ্রামবাসীকে লবণ আইন ভঙ্গ করতে বিশেষ উৎসাহিত করেন। মহিষবাথানে ব্যাপকহারে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হয়েছিল।[৩] স্বাভাবিকভাবেই মহিষবাথানের লবণ সত্যাগ্রহের প্রভাব পড়েছিল সংলগ্ন রাজারহাটে।

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসেই রাজারহাটে চাঁদপুরের নিকটস্থ সপ্তগ্রামে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হয়।[৪] চাঁদপুর ও সপ্তগ্রামে বেশ কিছু নোনা জলের মাছের ভেড়ি বা গাঙ ছিল। এই নোনা জল লবণ তৈরির উপকরণ। চাঁদপুরের সপ্তগ্রামের অধিবাসীরা সে সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বে-আইনি লবণ তৈরি করে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হন। স্থানীয় বাগু গ্রামে লবণ আইন ভঙ্গ করা হয়। এছাড়া হাটখোলা (হাড়োয়ার নিকটবর্তী) ও খড়িবাড়ি অঞ্চলেও লবণ সত্যাগ্রহ হয়েছিল।[৫]

১৯৩০ সালে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের পাশে বাংলায় ইংরেজ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। পুলিশী ধরপাকড়ের জন্য কলকাতার অনেক বিপ্লবী কলকাতা ছেড়ে নিকটবর্তী শহরতলী বা নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে আত্মগোপন করে। রাজারহাটও ছিল বিপ্লবীদের আত্মগোপনের জায়গা। বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের এক সহকর্মী থাকতেন রাজারহাটে। যাদুগোপাল ও তার অন্যান্য সহকর্মীরা এখানে যাতায়াত করতেন ও বিপ্লবী কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতেন।[৬] বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশকে বিখ্যাত রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান ও অলিন্দ যুদ্ধের নায়ক ছিলেন তিন তরুণ বিপ্লবী বিনয়-বাদল-দীনেশ। এই ঘটনার নেপথ্যে ছিলেন রসময় সুর, নিকুঞ্জ সেন ও পরবর্তীকালের আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর সত্য গুপ্ত। এবা বাগু গ্রামে আত্মগোপন করেছিলেন।[৭] এরা পরে এখানেই বসবাস করতেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করেন। রসময় সুর ও নিকুঞ্জ সেনের সহযোগিতায় বাগু

হাইস্কুলের শিক্ষক কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত স্থানীয় অঞ্চলে ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন।[৮] এই বিপ্লবীরা কলকাতার বিপ্লবী সংগঠনগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন।

১৯১৭ সালের রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবের ঢেউ আসে কলকাতায়। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। কলকারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত হয়। এর সঙ্গে কৃষক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হতে থাকে। কলকাতার নিকটবর্তী রাজারহাটে কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্ফর আহমেদ কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হয়েছিলেন।[৯] কবি নজরুল ইসলাম্ এ সময়ে 'লাঙল' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। 'লাঙল'-এর প্রবন্ধাবলী স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মুজফ্ফর আহমেদ ও নজরুল ইসলাম রাজারহাটের ঘুনি, যাত্রাগাছি ইত্যাদি গ্রামগুলিতে কৃষকদের নিয়ে আলোচনা করতে একাধিক বার এখানে আসেন।[১০] তাঁরা এই অঞ্চলগুলিতে বামপন্থী কৃষক সংগঠন গড়ে তোলেন (১৯২৮)। কংগ্রেসের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন রাজারহাটে সাড়া জাগালেও পরবর্তীকালে বামপন্থী নেতৃত্বে দরিদ্র কৃষকেরা কৃষক সংগঠন গড়ে তোলে। অন্যদিকে স্থানীয় কংগ্রেসী নেতারা এখানকার বিপ্লবী চিন্তাভাবনাকেও উৎসাহিত করেছিল। বিশেষ উল্লেখ্য যে, দেশ বিভাগের পরে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন আন্দোলনের নেতা মেঘনাদ সাহা রাজারহাট অঞ্চলে ব্যাপক উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের পরিকল্পনা করেন।[১১]

কলকাতা বা বাংলার অন্য কোন বিশেষ অঞ্চলের ন্যায় রাজারহাটের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশাল অবদান ছিল, এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না। কিন্তু এ কথা সত্য যে. গান্ধীবাদী রাজনীতির আলোকে রাজারহাট আলোকিত হয়েছিল। আইন অমান্যের অঙ্গ ছিল লবণ সত্যাগ্রহ। রাজারহাটের প্রাকৃতিক পরিবেশে ছিল লবণ তৈরির সুযোগ। দেশের বিভিন্ন অংশে (যেখানে লবণ তৈরির সুযোগ ছিল) যখন লবণ সত্যাগ্রহ জোর কদমে শুরু হয়েছে, সেই সময় রাজারহাটও অনেকটাই স্বতঃস্ফূর্তভাবেই লবণ সত্যাগ্রহে এগিয়ে এসেছে। তার চেয়ে বড় কথা, রাজারহাটবাসীরা লবণ সত্যাগ্রহকে হাতিয়ার করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। স্থানীয় অধিবাসীরা ছিলেন বেশির ভাগ অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত ও দারিদ্র সীমার নীচে। স্থানীয় নেতারা যে এই গ্রামবাসীদের সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন, এটা ছিল তাদের বিশেষ কৃতিত্ব। গ্রামবাসীরা যে বিদেশী শাসন ও বুর্জোয়া শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পেরেছিলেন, তা'ই উল্লেখ্য। কলকাতা থেকে আগত আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা তাদের বিপ্লববাদে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। আবার বামপন্থী কৃষক সংগঠনও এখানে গড়ে ওঠে। সব মিলিয়ে বিগত শতকের তিরিশের দশকে রাজারহাটে সংগ্রামী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। কংগ্রেস, বিপ্লবী কার্যকলাপ বা কৃষক সংগঠনের কার্যক্রম তারই সাক্ষ্য বহন করে।

সূত্রনির্দেশ

১। বসন্তকুমার মণ্ডল, *অগ্নিগর্ভ মহিষবাথান,* কৃষ্ণপুর, স্বর্ণময়ী ১৩৯০ (বাং), ২৭ পৃঃ।

২। ভূপেশকুমার প্রামাণিক, *লবণ হ্রদের উপকথা,* ৮ পৃঃ।

৩। ঐ ১০ পৃঃ।

৪। রাজারহাট অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসী ও বামপন্থী আন্দোলনের নেতা বরুণ সরকারের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার। ৬ই মার্চ, ২০০২।

৫। ঐ। ৬ই মার্চ, ২০০২।

৬। রাজারহাট বিদ্যালয়ের শিক্ষক কালী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার। ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১।

৭। বরুণ সরকারের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার। ৬ই মার্চ, ২০০২।

৮। ঐ। ১০ই মার্চ, ২০০২।

৯। ঐ। ১২ই এপ্রিল, ২০০২।

১০। ঐ। ১২ই এপ্রিল, ২০০২।

১১। ঐ। ১২ই এপ্রিল, ২০০২।

এছাড়া সার্বিকভাবে —

১২। *The Liberty,* edited by Chittarajan Das 6-20 April, 1930.

১৩। মনোরঞ্জন রায়, *পরায়ত্ত পরগনা,* ১ম ও ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯০।

১৪। কৃষ্ণকালী মণ্ডল, *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা - আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ।*

১৫। L.S.S. O' Malle. *Bengal District Gazetteers - 24 Parganas.* Calcutta. 1914.

শিয়ালদহ বনগাঁ শাখা রেল পথের অতীত ও বর্তমান

তপন কুমার বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ রয়েছে তার মধ্যে শিয়ালদহ বনগাঁ শাখা রেলপথ স্বাধীনতার যুগ থেকে আজ পর্যন্ত তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরীসীম। এই শাখার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সাধ্যমত তুলে ধরবার চেষ্টা করছি।

১৮৪৪ সালে ভারতে প্রথম রেল লাইন পাতার তদারকি শুরু হয় রোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ড স্টিফেনসনের (জর্জ স্টিফেনসনের ভাইপো) তত্ত্বাবধানে।[১] এর ফলস্বরুপ ১৮৫৩ সালের ১৬ই এপ্রিল বোম্বাই থেকে থানে ২১ কিঃমিঃ প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন চলে, সে কথা প্রায় সবার জানা।

শিয়ালদহ রেল স্টেশন ১৮৬৯ সালে তৈরি হলেও ১৮৬২ সাল থেকেই এই বিভাগে ট্রেন যাত্রা শুরু করে। শিয়ালদহ স্টেশন বলতে ছিল একখানি মাত্র টিনের ঘর। এখন অবশ্য ভেঙে নতুন করে করা হয়েছে।[২] (১) শিয়ালদহ বনগাঁ শাখার দমদম জংশন থেকে দত্তপুকুর পর্যন্ত্য রেলপথ খোলা হয় ০২.০৪.১৮৮২, দত্তপুকুর থেকে গোবরডাঙা পর্যন্ত ১৭.১২.১৮৮৩, গোবরডাঙা থেকে বনগাঁ পর্যন্ত ২২.০৪.১৮৮৪ এবং এর পরে বনগাঁ থেকে যশোহর খুলনা পর্যন্ত বড়মাপের রেলপথ সম্প্রসারিত হয়।[৩] (২) তবে খুলনা মেল চলাচল করলেও ১৯৬৫ সালে তা বন্ধ হয়ে যায়। প্রথম পর্বে এই লাইনগুলিতে স্টিম বা কয়লার ইঞ্জিন চলাচল করলেও ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা কোনই রেলগাড়ী চলাচল করেনি। সরাসরি কয়লা থেকে বিদ্যুতে উন্নীত হয়।

ইংল্যান্ড ও ইউরোপে রেলে প্রথম গ্যাসের আলো জ্বলে ১৮৬০ সালে। আমাদের দেশে ১৮৭০ সালে প্রথম গ্যাসের আলো জ্বালানো হয়। আর বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে ১৯০২ সালে যোধপুর রেলে। ১৯০৭ সালে দেশের সব প্রধান রেলে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হয়ে যায়।[৪] (৩) এর সাথে সাথে শিয়ালদহ শাখায় ১৯৬৩ সালে বিদ্যুত দ্বারা ট্রেন চলাচল শুরু হয়।[৫] (৪) শিয়ালদহ বনগাঁ শাখার দমদম, বারাসাত, মছলন্দপুর, গোবরডাঙা ও বনগাঁ স্টেশন সমূহের স্থানীয় বেশ কিছু ইতিহাস জানা যায়, যা এই এলাকা সমূহকে সমৃদ্ধ করেছে, যদিও এখানে এই ইতিহাসের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

শিয়ালদহ থেকে বনগাঁ বিভাগের ২৫টি স্টেশন সমূহের মধ্যে প্রথম পর্বে দমদম ক্যান্টনমেন্ট, বিরাটি, মধ্যমগ্রাম, বারাসাত, বামনগাছি, দত্তপুকুর, দোগাছিয়া (বর্তমানের বিড়া) গুমা, হাবড়া, মছলন্দপুব, গোবরডাঙা, চাঁদপাড়া ও বনগাঁ নামক রেল স্টেশন সমূহ ছিল। পরবর্তীতে স্বাধীনতার পর ঠাকুর নগর, অশোক নগর, নিউবারাকপুর, হৃদয়পুর নামক স্টেশন সমূহের জন্ম হয় এবং নব্বই এর দশকে বিভূতিভূষন হল্ট ও সংহতি হল্ট স্টেশনের জন্ম হয়।

এ প্রসঙ্গে আরো বলা যেতে পারে যে, প্রথম পর্বের স্টেশন সমূহ তৈরি হবার সময় স্থানীয় গুরুত্ব প্রাধান্য পেলেও স্বাধীনতার পর যে সমস্ত স্টেশনগুলি তৈরি হয় জন্মের জন্য পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষের চাহিদা, তাদের স্থানীয় ভিত্তিতে বাসস্থানের ঘনত্ব, বিকল্প যানবাহনের অভাব ও তাদের দীর্ঘদিনের দাবির জন্যই তা রেল দপ্তরকে প্রভাবিত করতে বাধ্য করেছে, যদিও পুরানো স্থানীয় মানুষ জনও তাদের সাথে দাবিতে ছিলেন। সুতরাং নতুন স্টেশন সমূহ যে এই রেলপথকে প্রভাবিত করেছে তা নিশ্চিত করে বলা যায়।

এই রেল লাইন পর্যায়ক্রমে দমদম জংশন থেকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট, দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে বারাসাত, বারাসাত থেকে দত্তপুকুর, দত্তপুকুর থেকে গুমা ও গুমা থেকে হাবড়া পর্যন্ত আপ ও ডাউন দুটি লাইনে ট্রেন যাতায়াত শুরু হয়।

এই বিভাগের ট্রাকগুলি হল শিয়ালদহ থেকে দমদম জংশন - ৪ খানি, দমদম জংশন থেকে হাবড়া - ২ খানি, ও হাবড়া থেকে বনগাঁ - ১ খানি। সিগনাল ব্যবস্থা শিয়ালদহ থেকে দমদম জংশন - অটোমেটিক, দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে বনগাঁ - রঙীন আলো।

প্রতিদিন বনগাঁ বিভাগের সমস্ত রেল স্টেশন থেকে আনুমানিক ১,৫৩,৫২৩ জন মানুষ শিয়ালদহমুখী যাতায়াত করেন। প্রতিদিন আনুমানিক ৬,২১,৮২৭ টাকা গড়ে বর্তমানে আয় হয়। সবচেয়ে বেশি মানুষ যাতায়াত করেন দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে আনুমানিক ২০,০০০ এবং সবচেয়ে বেশি আয় হয় হাবড়া স্টেশন থেকে প্রতিদিন ৬৭,০০০ টাকা প্রতিদিন এই ৭৬.২৮ কিঃমিঃ যাত্রাপথে মোট ৪৯ জোড়া বিদ্যুত চালিত গাড়িতে যাতায়াত করে। এবং তাদের বগি সংখ্যা ৪৯×৯ বিশিষ্ট।[৮] (৫) উপরিউক্ত যাত্রী সংখ্যার হিসাবটি বৈধ যাত্রী সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু বাস্তবিক সঠিক যাত্রী সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। যারা বৈধ টিকিট ছাড়া যাতায়াত করেন তাদের সংখ্যাটি এই বিভাগে অন্য বিভাগের চেয়ে ঢের বেশি। তার কারণ ১৯৬৪ ও ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্থানের সাথে যুদ্ধের পর একটি ব্যাপক সংখ্যক পূর্ব পাকিস্থানের নাগরিক বনগাঁ ও তার পাশাপাশি সীমান্ত দিয়ে এদেশে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছে। এ ছাড়া অধুনা বাংলাদেশে মাঝে মধ্যেই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বা অত্যাচার তাদেরকে ওদেশ থেকে বিতাড়িত করে এদেশে

আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। যদিও ওদেশে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের চরিত্র অনুযায়ী এদেশে শরণার্থী আসার সংখ্যার তারতম্য ঘটে। এদেশে এদের বাসস্থানের পছন্দের জায়গা বলতে সীমানা পার হয়ে উত্তর ২৪ পরগনাকে বেছে নিয়েছে। কেননা স্বাধীনতার আগে বা ১৯৬৪ বা ১৯৭১ সালে যারা এসেছে তারা বেশির ভাগই এই অঞ্চলে থেকে গিয়েছে। এবং এদের আত্মীয়স্বজন এই অঞ্চলে থাকে বলেই এদের পছন্দের তালিকায় এই অঞ্চল সমূহ। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যারা এদেশে বিতাড়িত হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছে তাদের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগের বেশি মানুষ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত।

এই শাখার স্টেশন সমূহের গড়ে ওঠার পিছনে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের চাহিদা সেখানকার মানুষের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফল স্বরূপ তা সম্ভব হয়েছে। যদিও স্থানীয় ভিত্তিতে তাদের গুরুত্ব ইতিহাসের কাজে অনস্বীকার্য্য। এই সমস্ত উন্নয়নের মধ্যে প্লাটফর্ম সমূহের সংখ্যা এক থেকে দুই, তিন, চার করা তাদের ওভার ব্রীজ এর মাধ্যমে সংযোগ এলাকা ভিত্তিক সেগুলিতে কম্পিউটার আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা, প্লাট ফর্মে টেলিফোন বুথ চালু করা ইত্যাদিকে বোঝায়।

বছরের পর বছর টিকিটের দাম বাড়ানো হলেও উন্নতি হয় না পরিষেবায়। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ নেই বললেও চলে। ডেপুটেশন আন্দোলন বনগাঁ লোকাল সেই তিমিরেই থাকে। গাড়ি থাকলেও বসার জায়গা থাকে না। বসার জায়গা থাকলেও মাঝে মধ্যেই সিট উধাও হয়ে যায়। জানলার পাল্লা থাকে না। কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে ভিড় বেড়ে চলে। প্রয়োজন মত ট্রেন চালায় না পূর্ব রেল। বরাদ্দ গাড়িগুলির মধ্যে বিভিন্ন অজুহাতে মাঝে মধ্যেই কিছু ট্রেন বাতিল হয়। তখন ঐ গাড়ির যাত্রীরা ভিড় করেন অন্য গাড়িতে। তখন হয় আরও দুর্বিসহ অবস্থা। গেটে বাদুড় ঝোলার মতন ঝুলতে দেখা যায় যাত্রীদের। শিয়ালদহ থেকে প্রথম ৮/৯ টি স্টেশনে যে সংখ্যক যাত্রী নামেন ওঠেন তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। যদিও ছুটির দিন রবিবার গুলিতে এতটা দুর্বিসহ অবস্থা না থাকলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ফারাক চোখে পড়ে না। তবে বনগাঁ থেকে শিয়ালদহমুখী যাত্রীরা প্রথম দিকে কিছুটা সুস্থ বোধ করলেও প্রথম ৫/৭ টি স্টেশন পর থেকেই গতানুগতিক চেহারায় ফিরে আসে।

নিত্য যাত্রীদের অভাব অভিযোগের শেষ নেই তেমনি দুর্ভোগেরও শেষ নেই। গরমকালে পাখা ঘোরে না। শীতকালে পাখা চলতে থাকে। বন্ধের ব্যবস্থা নেই। বর্ষাকালে জানলা বন্ধের ব্যবস্থা নেই। দরজা খুললে বন্ধ হয় না। বন্ধ হোলে খোলে না। পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই। কারণ অকারণে ট্রেন বন্ধ হয়ে যায়। রেল সম্পর্কিত কারণ ছাড়াও পারিবারিক, সামাজিক কারণে রেল বন্ধের মত ঘটনাটিও নৈমিত্তিক ব্যাপার।

এক মাস টানা সঠিক সারণী মেনে টেন চলেছে একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। এ সবের প্রতিকার দূর অস্ত। হকারদের সংখ্যা এত বেশি যে সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও সাধারণ যাত্রীদের কাছে তা কমবেশি অসুবিধার কারন। এখানে আর্থিক সংগতি সম্পন্ন যাত্রীরা নিত্য যাত্রার দূরত্ব কমাবার জন্য ও স্বাচ্ছন্দের জন্য শিয়ালদহের কাছাকাছি স্টেশনগুলির কোথাও ভাড়া সম্ভব হলে ফ্লাট বা জমি কিনে বাড়ি করে বসবাস করেন দুর্ভোগ কমাবার আশায়।

এত অভিযোগের পরও বলতে হয় রেল প্রশাসনের তরফে একেবারে উদ্যোগ নেই সেটা বোধ হয় ঠিক নয়। মাঝে মধ্যেই ট্রেন বাড়ছে। বাড়ছে সিগনাল ও ট্রাকের উন্নয়ন, কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল এই উন্নয়ন এই যত্ন প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই। সরকারী পলিসি বা নীতি এর জন্য অনেকাংশে দায়ী বলে ভাবা হতে পারে।

শিয়ালদহ বনগাঁ শাখায় প্রতিদিন যাত্রা পথ ও তার পারিপার্শ্বিক চিত্রগুলি এই অঞ্চলের মানুষের রোজকার আলোচ্য বিষয়বস্তু। এই রেল পথকেই কেন্দ্র করেই মানুষের জীবন ধারণ, সমাজ সংস্কৃতি, চালচিত্র তবুও মানুষ একে নির্ভর করে তার জীবনধারণ বজায় রেখেছে, যদিও একে কেন্দ্র করেই তার আর্থ সামাজিক পরিকাঠামো পরিবর্তন হয়েছে; যদিও তা অন্য অধ্যায়।

সূত্রনির্দেশ

১। S. Chattapadhyay. *Calcutta and the Development of Railways* (Published by Eastern Railway) Page - 3.

২। রাধারমন মিত্র, *কলিকাতা দর্পন*, পৃষ্ঠা - ২২৬।

৩। ঐ, পৃষ্ঠা - ২২৭।

৪। ঐ, পৃষ্ঠা - ২০৬-২০৭।

৫। ঐ, পৃষ্ঠা - ২০৮।

৬। D.R.M office (Sealdah). Nov.-02

অসহযোগ আন্দোলন ও বীরভূম জেলা

পার্থ শঙ্খ মজুমদার

১৯২০র ডিসেম্বরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে চূড়ান্তভাবে অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় সারা ভারতে পরিচালিত হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলন। চৌরীচৌরা গ্রামে হিংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটার পর মহাত্মা গান্ধীর উদ্যোগে বারদৌলী প্রস্তাব দ্বারা (১২/২/২২) এই আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়েছিল।

নাগপুর অধিবেশনের মাধ্যমে স্থির হয়েছিল খিলাফত ও হান্টার কমিশন সংক্রান্ত অন্যায়ের প্রতিকারার্থে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে — (১) উপাধি ও অবৈতনিক পদ বর্জন এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পদত্যাগ, (২) সরকার আয়োজিত সভা অনুষ্ঠান বর্জন, (৩) সরকারী মালিকানাধীন, সাহায্য প্রাপ্ত বা পরিচালিত স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্রদের সরিয়ে আনা এবং জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠা, (৪) ব্রিটিশ আদালত বর্জন ও মীমাংসার জন্য সালিশী আদালত স্থাপন, (৫) সেনা, কেরানি ও অন্যান্য শ্রমিকদের মেসোপটেমিয়া বা ভারতের বাইরে কাজ না করা, (৬) বিদেশী দ্রব্য বর্জন, (৭) কাউন্সিল নির্বাচন বয়কট (অবশ্য এই নির্বাচন ডিসেম্বরের প্রথম দিকেই হয়ে গিয়েছিল) করা হবে। একই সঙ্গে চরকা কেটে সুতো ও বস্ত্র তৈরির কার্যক্রমও ঘোষিত হয়েছিল। গান্ধীর মত অনুসারে এই কার্যপদ্ধতি যথাযথ ভাবে পালিত হলে এক বছরের মধ্যে স্বরাজ লাভ হবে।

বাংলার অন্যান্য স্থানের মত বীরভূমেও অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৯২১-র প্রথম দিকে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে। ২২ জানুয়ারী হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ (জেলার একমাত্র কলেজ) এবং ২৪ জানুয়ারী জেলার সদর শহর সিউড়ির বেণীমাধব ইন্সটিটিউশনের কিছু ছাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কট করেছিল।[১] ৩ ফেব্রুয়ারী নাকড়াকোন্দা বিদ্যালয়েও একই ঘটনা ঘটেছিল।[২]

এই সময়েই মূলত সরকার কর্তৃক পরিচালিত কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী নামক মেলাকে বয়কটের সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস করা হয়েছিল। ১২ ফেব্রুয়ারী বীরভূম জেলা কংগ্রেস সমিতির সহ-সভাপতি শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সিউড়িতে এক সভায় এই মেলা বয়কটের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।[৩] তবে এই বয়কটের সপক্ষে প্রচার চালানোর কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

খুবই অস্বাভাবিক ভাবে এরপর কয়েক মাস অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে কোন প্রয়াস জেলাতে দেখা যায়নি। মে মাসে জেলা সভাপতি ও সম্পাদকের পরিবর্তনের পর এক্ষেত্রে জোয়ার সৃষ্টি হয়। তবে এই সময় থেকে আন্দোলন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে।

আগস্ট ১৯২১-র মধ্যে কংগ্রেস দলের উদ্যোগে জেলার ছয়টি স্থানে গড়ে উঠেছিল স্বরাজ আশ্রম (সিউড়ি, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, মাড়গ্রাম, বসোয়া, বিষ্ণুপুর)।[৪] এই সংগঠন প্রধানত বিলাতী দ্রব্য ও মদ্যপান বর্জন, চরকার ব্যবহার বৃদ্ধি, চরকায় সুতো কাটা ও খদ্দর ব্যবহার সম্পর্কে প্রচার চালাত। ডিসেম্বর ১৯২১ অবধি এই সংগঠনের উদ্যোগেই গঠনমূলক কাজগুলি পরিচালিত হয়েছিল।

স্বরাজ আশ্রমের সূত্র অনুসারে সিউড়ি, রামপুরহাট, পুরন্দরপুরে মদের দোকানগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[৫] এই সময়েই স্থানীয় কংগ্রেস সমিতির উদ্যোগে সাঁইথিয়াতে একটি 'শিক্ষা প্রচার বিভাগ' গড়ে উঠেছিল। এখানে সকালে ৩০ জন বালক এবং রাত্রিতে ৮০ জন অন্তজ শ্রেণীর (ডোম, মুচি, হাড়ি) বয়স্ককে পুঁথিগত শিক্ষা সহ চরকার প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। (৬) এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য আশ্রমের স্বেচ্ছাসেবকরা মুষ্টিভিক্ষা করত।[৭]

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে চিত্তরঞ্জন যথাক্রমে রামপুরহাট, সাঁইথিয়া ও সিউড়িতে এসেছিলেন এবং স্বরাজ লাভের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস করেছিলেন। চিত্তরঞ্জনের এই আগমন জেলায় কংগ্রেসের কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করেছিলো।

সাঁইথিয়ার স্বরাজ আশ্রমের সদস্যারা মদ ও বিদেশী দ্রব্য বিরোধী প্রচারে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিল। এর ফলে এখানকার মুটে-মজুর ও গাড়োয়ানরা মদ না খাবার এবং মাড়োয়ারী সহ বাঙালী ব্যবসায়ীরা বিলাতী কাপড় বিক্রি না করার আনুষ্ঠানিক প্রতিজ্ঞা করেছিল।[৮] মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন পালনের জন্য ৫ অক্টোবর সাঁইথিয়াতে বিলাতী বস্ত্র ও সিগারেট পোড়ানো হয়েছিল। জেলার অন্যত্র অবশ্য এই ধরণের জোয়ার দেখা যায়নি। এই সময়ে সিউড়িতে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল বলে জানা যায়।[৯] অবশ্য এই বিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না।

নভেম্বর থেকে সরকারী দমন নীতির প্রয়োগ কঠোরভাবে শুরু হলে জেলাতে আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পায়। ৩০ নভেম্বর সারা ভারত কংগ্রেস সমিতির সভ্য ও ভূমিপুত্র জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে রামপুরহাটে গ্রেপ্তার করা হয়।[১০] ১২ই ডিসেম্বর সিউড়ি, মাজিগ্রাম, নারায়ণপুর, রামপুরহাট প্রভৃতি স্থানের কংগ্রেস ও স্বরাজ আশ্রম দপ্তরে তল্লাশী করা হয়।[১১] জেলা সম্পাদক গোপিকাবিলাস সেনগুপ্ত সহ বেশ কিছু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর কংগ্রেস ও স্বরাজ আশ্রমের কর্মকাণ্ডের

কোন সংবাদ পাওয়া যায় না — কেবলমাত্র সভাসমিতি করা নিষিদ্ধ হলেও জানুয়ারী ১৯২২ রামপুরহাটে একটি সভা করার ব্যর্থ প্রয়াস হয়েছিল।[১২]

কিছু গবেষক দেখানোর প্রয়াস করেছেন যে স্থানীয় বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে অসহযোগকালে বীরভূমে ব্যাপক মাত্রায় জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল। সুমিত সরকার তাঁর *আধুনিক ভারত* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে জিতেন্দ্রলালের নেতৃত্বে রামপুরহাট মহকুমার কৃষকরা প্রজাবিলি কাজকর্মের বিরোধিতা করেছিল।[১৩] কিন্তু জেলাতে এই ধরণের কোন আন্দোলন হয়নি। ডঃ অমিয় ঘোষ দেখিয়েছেন জিতেন্দ্রলালের নেতৃত্বে বীরভূমে ইউনিয়ন বোর্ডের কর বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।[১৪]

একথা ঠিক যে এপ্রিল ১১২১ - মার্চ ১৯২২ সময়ে জেলাতে ইউনিয়ন বোর্ডের চৌকীদারী কর বিরোধী এক প্রবল প্রতিবাদ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এই আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক ছিল না। গোয়েন্দা প্রতিবেদনে এই আন্দোলনের সঙ্গে জিতেন্দ্রলালের নাম যুক্ত থাকলেও[১৫] *বীরভূম বাণী* পত্রিকার সংবাদ থেকে জানা যায় যে তিনি চৌকীদারী করবিরোধী প্রতিবাদকে অসহযোগের সঙ্গে মেশাতে নিষেধ করেছিলেন।[১৬]

তবে অন্য এক প্রতিবাদের সঙ্গে জিতেন্দ্রলাল যুক্ত ছিলেন — জমি-জরিপ বিরোধী আন্দোলন। যদিও গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে তার নেতৃত্বে রামপুরহাট থানার বিভিন্ন গ্রামে জমি-জরিপের কাজে বাধা দেওয়া হয়েছিল[১৭] তথাপি তিনি যে এই আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন বা সমস্ত গ্রামের এই প্রতিবাদে যুক্ত ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *গণদেবতা* উপন্যাসে দেখিয়েছেন জমি-জরিপের বিরুদ্ধে দেবনাথ ঘোষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ কিভাবে যুক্ত করা হয়েছিল জিতেন্দ্রলালের সঙ্গে।[১৮] এই উপন্যাস প্রমাণ করে যে জমি-জরিপ বিরোধী প্রতিবাদের ক্ষেত্রে জিতেন্দ্রলাল পরিণত হয়েছিলেন প্রবাদ পুরুষে এবং এই প্রতিবাদের সর্বত্র তাই সরকার খুঁজে পেয়েছিল তাঁর ভূমিকা। সব মিলিয়ে বলা যায় এই প্রতিবাদের ক্ষেত্রে জিতেন্দ্রলালের ভূমিকা ছিল অনুপ্রেরকের, সংগঠকের নয়।

সীমিত সময়ের জন্য শান্তিনিকেতনেও অসহযোগের প্রভাব পড়েছিল, তবে তার সঙ্গে জেলা কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে বিদেশে ছিলেন (মে ১৯২০ - জুলাই ১৯২১) সে সময়েই শান্তিনিকেতনে অসহযোগের প্রভাব ছিল বেশি। এখানকার অসহযোগ সমর্থকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কবির বড় ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত সি.এফ.এন্ড্রুজ, বিধুশেখর শাস্ত্রী, নেপাল চন্দ্র রায়, অনিল মিত্র, চিমন লাল।

এখানকার সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা অসহযোগীদের দাবীর ভিত্তিতে ও রবীন্দ্রনাথের সম্মতিতে আশ্রম বিদ্যালয়ের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক ছেদ। এখানকার

শিক্ষার্থীরা প্রাইভেট প্রার্থী হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিত এবং পরীক্ষা দেবার সময়ে ছাত্রদের ঘোষণা করতে হত যে তারা গত এক বছরে কোন বিদ্যালয়ে পড়াশোন করেনি। অসহযোগীরা যুক্তি দেখান যে এই মিথ্যা স্বীকারোক্তি নীতিবিগর্হিত - সুতরাং ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা বিদ্যালয় থেকে তুলে দেওয়াই উচিত। জগদানন্দ রায়, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রধানত এন্ড্রুজের জন্য রবীন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন।[১৯]

অন্যদিকে এই সময়ে সিল্পী ডাক্তার চিমনলালের উদ্যোগে আশ্রমের ছাত্র, অধ্যাপক, আবাসিক মহিলা এবং পাশ্ববর্তী সাঁওতাল বিদ্যালয়ের ছাত্ররা চরকায় সুতো তৈরি শুরু করেছিল।[২০]

মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তার ও তাঁর কারাদন্ডের ঘটনার প্রতিক্রিয়াও ঘটেছিল শান্তিনিকেতনে। গান্ধীর গ্রেপ্তারের সংবাদ ১২ মার্চ ১৯২২ শান্তিনিকেতনে পৌছালে তার পরের দিনের বসন্তোৎসব পরিত্যক্ত হয়েছিল। আর ১৮ মার্চ মহাত্মার কারাবাসের প্রথম দিনে পূর্ব ও উত্তর বিভাগের শিক্ষার্থীদের অনেকে দুপুরে উপবাস করেছিল।[২১]

এই সময়ে গান্ধীর আদর্শে গ্রাম সেবার প্রয়াসও ঘটেছিল। ১৯২১-র প্রথম দিকে এনড্রুজের ব্যবস্থাপনায় আশ্রমের প্রাক্তন শিক্ষক নেপাল চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে বাইরের কলেজের কিছু ছাত্র সুরুলের কুঠি বাড়িকে কেন্দ্র করে গ্রামের কাজ শুরু করেছিল। যদিও এই উদ্যোগ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, তথাপি পরে এই সুরুল কুঠিবাড়িকে কেন্দ্র করেই ৫/৬ জন অসহযোগের সমর্থক ছাত্রকে নিয়ে ফ্রেবুয়ারী ২২ থেকে এলমহার্স্ট গ্রামোদ্যোগে ব্রতী হয়েছিলেন।[২২]

সুতরাং বলা যায় অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীগুলি বীরভূমে সার্বিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। জেলা সমিতিতে একজন রায়সাহেব ও অন্তত ৬ জন উকিল ছিলেন তথাপি উপাধি, সরকারী পদ ও আদালত বর্জনের কোন ঘটনা ঘটেনি। জেলা ও আঞ্চলিক সমিতির অনেক পদাধিকারীই ছিলেন উকিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কটের তিনটি ঘটনা ঘটলেও তাও উল্লেখযোগ্য নয়। কারণ সরকারী পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় জুলাই ১৯২০ - জুলাই ১৯২১ - এর সময়ে বীরভূমে বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল (২৯৫৬ - ৩০০০) এবং কলেজে ছাত্র সংখ্যা কমেছিল মাত্র ৬ (৫৯-৫৩)।[২৩] অন্যদিকে সিউড়ির জাতীয় বিদ্যালয়ের ১০০ ছাত্রের কথা জানা যায় যেখানে পাশ্ববর্তী বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদে তা ছিল যথাক্রমে ৩৪৬ ও ১৪০।[২৪]

প্রকৃতপক্ষে অসহযোগকালে বীরভূমে কংগ্রেসের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল তথাকথিত গঠন মূলক ও অক্ষতিকর কার্যকলাপের মধ্যে চরকা ও খদ্দরের প্রচার, মদ ও বিলাতী বস্ত্র সম্পর্কে স্বল্পকালীন প্রচার এবং শিক্ষা বিস্তারের সীমিত প্রয়াস। সাংগঠনিক কাজকর্মের

ক্ষেত্রেও বীরভূম জেলা সমিতি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেনি। ৩০ জুন ১৯২১ মধ্যে ৩১ হাজার সদস্য ও অর্থ সংগ্রহ এবং ৬০০০ চরকা প্রবর্তনের লক্ষ্যমাত্রা[২৫] নির্দিষ্ট হলেও সংগৃহীত হয়েছিল মাত্র ১৫০০০ সদস্য ও ৮০০০ টাকা এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মাত্র চারটি স্থানীয় সমিতি।[২৬] অন্যদিকে ৭ এপ্রিল ১৯২২ কংগ্রেস প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় যে অসহযোগ সময়ে বীরভূমে ১ জাতীয় বিদ্যালয়, ৭ সহযোগী শিক্ষাপ্রচার সংঘ, ৭৩ সালিশী সমিতি ও ২০৭০ চরকা প্রবর্তিত হয়েছিল।[২৭]

অন্যদিকে চৌকীদারী করকে কেন্দ্রকরে দেখা দেওয়া জনবিক্ষোভকে মেদিনীপুরের ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলনের মত আন্দোলনে পরিণত করতে জেলা কংগ্রেস অগ্রসর হয়নি। উপরন্তু প্রভাবশালী নেতা জিতেন্দ্রলাল প্রকারান্তরে এই প্রতিবাদকে নিরুৎসাহ করেছিলেন। জমি-জরিপ বিরোধিতাকে জিতেন্দ্রলাল সমর্থন করলেও তিনি বা কংগ্রেস তাকে সংগঠিত রূপ দিতে অগ্রসর হননি।

আর যেহেতু ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বিরোধী না হলেও অসহযোগের মাধ্যমগুলিকে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি এবং জুলাই ১৯২১ শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছিলেন তাই অহসযোগ আন্দোলন শান্তিনিকেতনেও দানা বাঁধতে পারেনি।

বীরভূম জেলায় অসহযোগের এই শান্ত রূপের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অমিয় ঘোষ জোর দিয়েছেন দুটি দিকের উপর - (ক) জিতেন্দ্রলাল অসহযোগকে মেনে নিতে না পারায় জেলা কংগ্রেসে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। আর তার ফলে কংগ্রেসের কাজ বাধা পেয়েছিল, (খ) অসহযোগ কেবলমাত্র শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় তার ব্যাপকতা ছিল কম।[২৮]

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে জিতেন্দ্রলাল ছিলেন কঠোরভাবে গান্ধীপন্থী। সেকারণে (১) কলকাতা কংগ্রেসের সময় থেকেই তিনি চিত্তরঞ্জনের কাউন্সিল বর্জন না করার নীতির বিরোধিতা ও পূর্ণ অসহযোগের দাবী করেছিলেন, (২) মে ১৯২১ প্রাদেশিক সমিতির পদাধিকারীদের ওকালতি ত্যাগ না করার প্রতিবাদে প্রাদেশিক সভার সভ্যপদ ত্যাগ করলেও তিনি অসহযোগের প্রচারে যুক্ত থেকেছেন, (৩) অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন এবং চরকা - খদ্দরের প্রচারের ক্ষেত্রে সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে তিনি জুলাই ১৯২২ দেখা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে;[২৯] (৪) গ্রেপ্তারকালে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন বিদেশী বস্ত্র বর্জনের ও নিখিল ভারত কংগ্রেস সমিতির নির্দেশ পালনের।[৩০] সম্ভবত গান্ধীর প্রতি এই আনুগত্যের কারণেই তিনি চৌকীদারী কর বিরোধী স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ থেকে দূরে ছিলেন।

তবে একথা ঠিক যে জেলাতে অসহযোগের বিস্তারের ক্ষেত্রে জিতেন্দ্রলালের ভূমিকা ছিল অনুজ্জ্বল। সম্ভবত রাজনৈতিক উচ্চাশার কারণেই তিনি বেশিরভাগ সময়ে কলকাতাতে

অবস্থান করেছিলেন এবং জেলা অপেক্ষা প্রাদেশিক সমিতির প্রতিই বেশি মনোযোগী ছিলেন।

অন্যদিকে দেখা যায় জেলাতে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা কম হলেও তাদের সবাই এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। সাঁইথিয়ার উদাহরণ থেকে বোঝা যায় সব শ্রেণীর মানুষই আন্দোলনে যুক্ত হতে পারত যদি তাদের যুক্ত করার প্রয়াস করা হত। বীরভূম জেলায় তার অভাব ছিল। এখানে কংগ্রেস জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। জেলাতে ছিল চারটি আঞ্চলিক সমিতি, ছয়টি স্বরাজ আশ্রম এবং জেলা কমিটি। এই সমিতিগুলি অনেকাংশেই ছিল নিস্ক্রিয় এবং তাদের কাজকর্মও ছিল ঢিলেঢালা। তাই জেলা থেকে বারজন সদস্যকে নির্বাচিত করা হলেও প্রশাসনিক কারণে অনেকেই কলকাতা অধিবেশনে যোগ দিতে পারেনি এবং নাগপুর অধিবেশনে কাউকে পাঠানোই হয়নি। সমিতিগুলির বেশিরভাগ সদস্য ছিলেন উকিল, জমিদার, সম্পন্ন কৃষক ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। তারা পূর্ণ, সময় রাজনীতিতে ব্যয় করতেন না। এই সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে গ্রামগুলিকে অসহযোগের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের অন্যত্র অসহযোগের বিস্তারে বৈপ্লবিক দলগুলির সভ্যেরা বড় ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু অসহযোগের সময়ে বীরভূমে এই ধরণের দলের কোন প্রভাব না থাকায় তাদের সহযোগীতাও কংগ্রেস পায়নি। অন্যদিকে সাধারণ মানুষও অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে আকর্ষনীয় কিছু পায়নি। সে সময়ে কৃষি প্রধান ও দরিদ্র বীরভূমের বড় সমস্যা ছিল চৌকীদারী কর। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কংগ্রেস দল ও কোনো রাজনীতিক তাদের সাহায্যে অগ্রসর না হওয়ায় তারাও রাজনীতি থেকে দূরে ছিল। সম্ভবত বিকল্প কিছু না থাকায় শিক্ষা ও বস্ত্র বর্জনও তাদের আকর্ষণ করতে পারেনি। সর্বোপরি বীরভূমে অসহযোগ আন্দোলনের ম্রিয়মানতার জন্য দায়ী ছিল জিতেন্দ্রলাল সহ স্থানীয় নেতাদের রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতা। এরা কেউই মেদিনীপুরের বীরেন্দ্রনাথ শাসমল দ্বারা অনুপ্রাণিত হননি বা তার মত রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতা প্রদর্শন করেননি। এক্ষেত্রে জিতেন্দ্রলাল বা অন্য কোনো স্থানীয় নেতা অসহযোগের নির্দিষ্ট লক্ষণরেখা অতিক্রম করে যদি স্থানীয় মানুষের বিক্ষোভকে অসহযোগের সঙ্গে যুক্ত করতেন তবে অবশ্যই চিত্র অন্যরকম হত।

সূত্রনির্দেশ

১। বীরভূম *বাণী সাপ্তাহিক* সংবাদপত্র, ২৬/১/২১।

২। ঐ, ১৬/২/২১।

৩। ঐ ১৬/২/২১।

৪। অমিয় ঘোষ, *জাতীয় আন্দোলন ও জেলা বীরভূম,* বোলপুর, ২০০০, পৃঃ ৬৬।

৫। *বীরভূম বাণী*, ১৫/৫/২১ ও ২২/৫/২১।

৬। *ঐ*, ১০/৮/২১।

৭। *ঐ*, ১০/৮/২১।

৮। *ঐ*, ২৮/৯/২১।

৯। অমিয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭।

১০। *বীরভূম বাণী*, ৩০/১১/২১।

১১। *ঐ*, ১৪/১২/২১।

১২। *ঐ*, ২৫/১/২২।

১৩। সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত ঃ ১৮৮৫-১৯৪৭*, কলকাতা ১৯৯৩, পৃঃ ২২২।

১৪। অমিয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯-৭০।

১৫। I. B Report : Non Co-operation Movement in Bengal. 1921-22.

১৬। *বীরভূম বাণী*, ৭/১২/২১।

১৭। অমিয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০।

১৮। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *গণদেবতা*, কলকাতা ১৩৯৭, পৃঃ ১০৮-০৯।

১৯। প্রশান্ত কুমার পাল, *রবি জীবনী*, ৮ম খন্ড, কলকাতা ১৪০৭, পৃঃ ৮৪-৮৫, এবং প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র জীবনী*, ৩য় খন্ড, ১৩৯৭, পৃঃ ১০০।

২০। *শান্তিনিকেতন* মাসিক পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩২৭, পৃঃ ৪৮৮।

২১। ঐ, চৈত্র ১৩২৯, পৃঃ ৩৪।

২২। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৮।

২৩। *প্রবাসী* মাসিক পত্রিকা - কার্ত্তিক ১৩২৮, পৃঃ ১৫০।

২৪। ঐ, শ্রাবণ ১৩২৯, পৃঃ ৬১০-১১।

২৫। *বীরভূম বাণী*, ২৭/৪/২১।

২৬। I. B Report. The Non-Co-Operation Movement in Bengal, 1921.

২৭। *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯, পৃঃ ২৮৫।

২৮। অমিয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩-৬৮।

২৯। প্রশান্ত কুমার পাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৯-৩০।

৩০। *বীরভূম বাণী*, ৭/১২/২১

পুরুলিয়ার কুর্‌মী মাহাতোদের অর্থনৈতিক জীবনের বিবর্তন

দেবাশিস বক্‌সী

পুরুলিয়ার একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় হল কুর্‌মী - মাহাতো। এদের অর্থনীতি আগাগোড়া কৃষি নির্ভর। রিজলী এদের পুরোপুরি কৃষিজীবী সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করেছেন।[১] এছাড়া ডাল্টন, হান্টার, সহ দেশী-বিদেশী নৃতত্ত্ববিদ, ইতিবেত্তা, অর্থনীতিবিদ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন যে কৃষির সঙ্গে এদের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান। পুরুলিয়ার কুর্‌মী - মাহাতোদের অর্থনৈতিক জীবনের দুটি মূল ভিত্তি হল চাষবাস ও পশুপালন।

কৃষি ঃ চাষবাসের ক্ষেত্রে কুর্‌মী - মাহাতোদের প্রধান উৎপন্ন ফসল হল ধান। পুরুলিয়ার ধান চাষের জমি সাধারণভাবে তিন ভাগে বিভক্ত ঃ বাইদ (উঁচু জমি), কানালি (মাঝা-মাঝি জমি) ও বহাল (নীচু জমি)।[২] সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে, প্রায় অধিকাংশ কুর্‌মী - পরিবারের নিজস্ব জমি আছে।[৩]

ধান চাষ ঃ সারা বছর ধরে কুর্‌মী মাহাতোরা তিন প্রকার ধান চাষ করে - আমন, বোরো ও গড়া।

আমন ধান প্রধান কৃষিজাত ফসল। এই চাষের সূচনা হয় মাঘ মাসে। তারপর বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে গোবর ছাই সহ কম্পোষ্ট সার ক্ষেত্রগুলিতে দেওয়া হয়। এরপর জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বীজতলা তৈরি করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়। আবহাওয়া শুষ্ক থাকলে জ্যৈষ্ঠ মাসের '১৩' (তের) তারিখে বীজ বপন করা হয়, একে বলে রোহিনী বতর।[৪]

পরবর্তী ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে আমন-ধান ঘরে তোলা হয়। একই ভাবে বছরের অন্যান্য সময় বোরো ও গড়া ধান চাষ করা হয়। যদিও শেষোক্ত ধান চাষ দুটির ক্ষেত্রে কিছু কিছু ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়। ধান চাষে প্রায় প্রতিটি কুর্‌মী পরিবারের অধিকাংশ সদস্য অংশ নেয়।

ধান ঘরে তোলার পর কুর্‌মীরা সেগুলি ঝাড়াইয়ের ব্যবস্থা করে এবং ঝাড়াই করা ধান 'মরাই' ও 'কুচুড়ি' নামে দুটি শস্য গোলায় সংরক্ষণ করে।[৫] সারা বছরের নানা আনুষঙ্গিক ব্যয় যেমন, কাপড় - চোপড়, ঔষধ - পথ্য, আত্মীয়তা ইত্যাদির খরচ ধান

বেচেই সম্পন্ন হয়। এছাড়া ধান বেচেই তারা বলদ, গরুর গাড়ির উপাদান সমূহ প্রভৃতিও কেনে।[৬]

অন্যান্য দানা শস্য ও তৈলবীজ উপাদান ঃ ধান ছাড়াও কুর্‌মী - মাহাতোরা কোদো, গুঁন্দলু, সেঁওয়া (মাইলো জাতীয় দানা শস্য) ইত্যাদি খরা প্রবণ অঞ্চলের দানা শস্যও চাষ করে।[৭] পুরুলিয়ার রুক্ষ ও সেচবিহীন অঞ্চলে অনেক জায়গায় ধান চাষ সম্ভব না হওয়ায় ঐ শস্যগুলি খেয়ে তারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করে।

কুর্‌মীরা নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় ভোজ্য তেল এবং গায়ে মাখার তেল উপাদানের জন্য নিজেদের জমিতে ঐ সব তৈলবীজ চাষ করে। এগুলির মধ্যে সরষের তেল, গুঁজা তেল, খসলা তেল, মহুয়া তেল ও নিম তেল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৮] গায়ে মাখার তেল হিসাবে যে নিম তেল ব্যবহার করা হয়, তার কাঁচামাল নিম গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়।

সব্জী চাষ ঃ কুর্‌মী - মাহাতোদের যেহেতু নিজস্ব জমি থাকে তাই তারা ধান ও অন্যান্য শস্য ছাড়াও ব্যাপকভাবে নানা জাতীয় সব্জী উৎপাদন করে। যেমন, ঝিঙে, বেগুন, করলা, কুমড়ো, সীম, ট্যাঁড়স, প্রভৃতি। এগুলিও তাদের জীবিকায় কতকাংশে রসদ জোগায়।[৯]

অরণ্য সম্পদ সংগ্রহ ঃ পুরুলিযার কুর্‌মী - মাহাতোদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য অরণ্য ভূমির অবদান যথেষ্ট। কুর্‌মী - মাহাতোরা অরণ্য ভূমি থেকে নানা জাতীয় বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে। যেমন, জ্বালানি কাঠ, ঘর তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ এবং নানা জাতীয় বুনো সব্জী। সব্জীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঘিকাল্লা, বন কুমড়ো, বনকুন্দরী ইত্যাদি। আবার নানাজাতীয় ফল ও তারা আহরণ করে।[১০] এগুলির মধ্যে জাম, পিয়াল, হরিতকী, আমলকী, ভেলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তারা অরণ্য থেকে বর্ষাকালে নানা ধরণের মাশরুম সংগ্রহ করে। সর্বোপরি তারা বন থেকে তিতির, পাঁড়ুক প্রভৃতি পাখি এবং খরগোশ, বন্যবরাহ, শেয়াল, সজারু প্রভৃতি শিকার করে সেগুলির মাংস খায়।

অরণ্য থেকে প্রাপ্ত অপর দুটি দ্রব্য কুর্‌মী - মাহাতোদের জীবিকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেগুলি হল যথাক্রমে লাক্ষা এবং মহুয়া ফুল ও ফল। জঙ্গলগুলিতে অর্জুন, পলাশ, কুল প্রভৃতি গাছ জন্মে এবং সেগুলিতে ব্যাপক পরিমাণে লাক্ষা উৎপন্ন হয়। লাক্ষা বিক্রী করে অনেকে জীবিকা অর্জন করে থাকে।[১১] কুর্‌মী - মাহাতোদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় মহুয়া ফুল ও ফলও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মহুয়া ফুল শুকিয়ে নুন দিয়ে তারা খায় এবং ফলগুলি ভেজে বা তরকারী করে খায়। উত্তেজক পাণীয় হিসাবে মহুয়া ফুলের দ্বারা তৈরী মদ কুর্‌মী - মাহাতোদের অনেকে পান করে এবং এদের অনেকে উক্ত মদ বিক্রী করে জীবিকার রসদ অর্জন করে।

মৎস্য শিকার ঃ কুর্‌মী - মাহাতোদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় মাছেরও স্থান আছে তবে সে মাছ তারা কিনে খায় না। এগুলি তাবা সংগ্রহ করে খাল, বিল, ডোবা, পুকুর, ঝোরা ইত্যাদি থেকে।

পশুপালন ঃ এখানের কুর্‌মী - মাহাতোরা লাইভস্টক বা প্রাণী সম্পদের ব্যাপক চাষ করে।[১২] এগুলির মধ্যে গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী, পায়রা, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গণনা ও শস্য পরিমাপ পদ্ধতি ঃ কুর্‌মী - মাহাতোদের সংখ্যা গণনার নিজস্ব পদ্ধতি আছে। যেমন, এক সংখ্যাকে বলে এড়ি, দুইকে বলে দড়ি, তিনকে বলে জুরান, চারকে বলে চাল। তেমনি পাঁচ - চম্পা, ছয় - বোগ, সাত - সুঁথাল, আট - এন্টাল, নয় - নেমি, দশ - বানরী, এগার - এড়ি - এডি ইত্যাদি।[১৩]

শস্য পবিমাপের জন্যও কুব্‌মী মাহাতোদের নিজস্ব শব্দ আছে, যেমন কুড়ি সের — এক খন্ডি এবং চল্লিশ সের দড়ি খন্ডি।

সঞ্চয়ী মনোভাব ঃ কুর্‌মী - মাহাতোদের স্বভাবের একটি উল্লেখনীয় দিক হল মিতব্যয়ী দৃষ্টিভঙ্গী। এরা পয়সা খরচ করতে কাতর। বরঞ্চ সেই পয়সা জমিয়ে ধানী জমি কেনা এদের নিকট পরম উৎসাহের বিষয়। সেইজন্যেই সম্ভবত এদের সমাজে একটি প্রচলিত প্রবাদ হল — "কুর্‌মীরা আজ্জে (উৎপন্ন করে) চিনি, খায় পানী।"[১১]

অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঃ বিংশ শতকে কুর্‌মী - মাহাতোদের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। তাই দেখা যায় যে, এক সময় যারা ছিল পুরোপুরি কৃষি নির্ভর জাতি, তারাই এখন নানা ধরণের পেশাতে নিযুক্ত হচ্ছে।[১৫]

চাকুরী ও বুদ্ধিজীবী ব্যবসা বা পেশা ঃ পুরুলিয়া জেলায় ব্যাপকহারে প্রাইমারী, জুনিয়ার ও মাধ্যমিক স্কুলে কুর্‌মী - মাহাতোদের শিক্ষক পদে দেখা যায়। একই সঙ্গে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর পদেও তারা যথেষ্ট সংখ্যায় নিযুক্ত হচ্ছে। তাছাড়া আইন ব্যবসা, চিকিৎসা, কারিগরী এবং প্রথম শ্রেণীর আমলা প্রভৃতি কাজে কুর্‌মী - মাহাতোদের দেখা যায়।[১৬]

কৃষিতে পরিবর্তন ঃ কুর্‌মী - মাহাতোদের চাষ-আবাদের ক্ষেত্রেও ঘটে গেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এখন কৃষিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করতে এরা শিখেছে। যেমন, উন্নত ও শোধন করা বীজের ব্যবহার। প্রচুর পরিমানে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক দ্রব্যের ব্যবহার; মাটি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় উপাদানের প্রয়োগ, উন্নত প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শস্যের গুদামজাতকরণ, প্রভৃতি।[১৭]

পশুপালন পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঃ প্রাণী - সম্পদের প্রতিপালনে কুর্‌মী - মাহাতোরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে শুরু করেছে। যেমন, উন্নতজাতের গাভী, ছাগল,

ভেড়া, হাঁস ও মুরগীর পালন, উন্নত ও যান্ত্রিক উপায়ে প্রস্তুত পশুখাদ্য পশুপক্ষীদের খাওয়ানো প্রভৃতি।[১৮]

মৎস্যচাষ প্রকরনে পরিবর্তন ঃ মৎস্যচাষেও বৈজ্ঞানিক রীতি গ্রহণ শুরু হয়েছে। পুকুরগুলিতে সম্পূর্ণ আধুনিক উপায়ে নিবিড় মৎস্য চাষ করা হচ্ছে।

কৃষিজীবী কুর্‌মী - মাহাতোরা উনিশ ও বিশ শতকে শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ গ্রহণ করে সমাজ সচেতন হয়ে উঠেছিল। উচ্চশিক্ষা লাভের ফলে কুর্‌মী - মাহাতোরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আর কৃষি ও পশুপালনের উপর একক ভাবে নির্ভরশীল নয়।

লোকসংখ্যা ক্রমশ ঃ বৃদ্ধি হওয়ায় ফলে কৃষিযোগ্য জমির চাহিদা বাড়লেও জনসংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়েনি। তার ফলে অনেককে কৃষির উপর নির্ভরতা ত্যাগ করে ভিন্ন উপায়ে জীবিকার অনুসন্ধান করতে হয়েছে। আমরা দেখেছি যে অরণ্য সম্পদ কুর্‌মী - মাহাতোদের অর্থনৈতিক জীবনে যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু সভ্যতার এবং নগরায়নের অগ্রগতির ফলে জঙ্গল কেটে নূতন বসতি স্থাপনের প্রয়াস সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে করা হয়েছে। এর ফলে অরণ্য থেকে পূর্বে যে উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদ পাওয়া যেত তা ক্রমশ দুর্লভ হয়ে উঠেছে। কাজেই অরণ্য সম্পদের উপর নির্ভর করে ভরণ-পোষণ বা দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ চলেনা।[১৯] কাজেই একথা প্রায় নিসংশয়ে বলা যেতে পারে যে প্রধানত কৃষিযোগ্য জমির ঘাটতি এবং অরণ্যজাত সম্পদের অভাব তথা শিকার প্রসার কুর্‌মী - মাহাতোদের গ্রাম থেকে ক্রমশ নগরের দিকে আকর্ষণ করেছে নূতন নূতন জীবিকার সন্ধানে।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে কুর্‌মী - মাহাতোরা সমান শিক্ষার সুযোগ সবাই লাভ করতে পারেনি এবং তা লাভ করা সম্ভব ছিল না। তার ফলে এই গোষ্ঠীর একাংশ গ্রামে এবং অন্য একটি অংশ নগরে বাস করছেন এবং তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রেখেছেন, তার ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি রয়েছে অব্যাহত। এ বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই যে শহরে ও নগরে কুরমী - মাহাতোদের উচ্চতর পদে নিয়োগ যেমন আমাদের মুগ্ধ করে, তেমনি কৃষি - পশুপালন, মৎস্য চাষ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যাপক প্রয়াস সমগ্র দেশের অর্থনীতিতে প্রাবল্য সঞ্চার করেছে। কুর্‌মী - মাহাতোদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি একটি মাত্র গোষ্ঠীর মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই। তা সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

সূত্রনির্দেশ

১। রিজলী, এইচ, এইচ, *ট্রাইবস অ্যান্ড কাস্টম অফ বেঙ্গল*, ভল্যুম - এক, ফার্মা, কে.এল.এম. কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, পৃঃ ৫২৮।

২। সাক্ষাৎকার, শিবশংকর দাস।

৩। সাক্ষাৎকার, ভোলানাথ মাহাত।

৪। সাক্ষাৎকার, ক্ষুদিরাম মাহাত।

৫। সাক্ষাৎকার, শতদল মাহত।

৬। সাক্ষাৎকার, সুধীর মাহাত।

৭। সাক্ষাৎকার, ভোলানাথ মাহাত।

৮। সাক্ষাৎকার, শিবশংকর দাস।

৯। সাক্ষাৎকার, উত্তর মাহাত।

১০। সাক্ষাৎকার, ক্ষুদিরাম মাহাত।

১১। সাক্ষাৎকার, শতদল মাহাত।

১২। ভট্টাচার্য, তরুণদেব, *পুরুলিয়া,* ফার্মা, কে.এল.এম. মুখোপাধ্যায় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ২২৪।

১৩। ভূষণ, বিদ্যা (সম্পাদিত), *মেমোরেন্ডাম ডিমান্ডিং রিইনক্লুশান অফ কুড়মীজ ইনটু ট্রাইবাল লিস্টস,* জামশেদপুর, পৃঃ ৬।

১৪। সাক্ষাৎকার, শতদল মাহাত।

১৫। সেন, এন.এন (সম্পাদিত), *ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস*, পুরুলিয়া, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্টবেঙ্গল, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃঃ ১৪১।

১৬। ভট্টাচার্য, তরুণদেব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২২৪।

১৭। সাক্ষাৎকার, শিবশংকর দাস।

১৮। সাক্ষাৎকার, সুধীর মাহাত।

১৯। মাহাত, পার্বতীচরণ (সম্পাদিত), *মেমোরেন্ডাম সাবমিটেড বাই দ্য কুর্‌মী মহাসভা,* পুরুলিয়া, টু দ্য অনারেবল চেয়ারম্যান দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস, পৃঃ ৫।

সারাংশ

গোকুলপুর অঞ্চলের ইঁটভাটা শ্রমিকদের জীবনযাত্রা

পাপিয়া কারক

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত কলাইকুন্ডা ৪ নং অঞ্চলের যে সমস্ত ইঁট ভাঁটাগুলি রয়েছে তাতে কাজ করা শ্রমিকদের মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক, যারা এখানকার স্থানীয় শ্রমিক দুই, বাইরে থেকে আগত শ্রমিক। এই দুই প্রকার শ্রমিকদের জীবনযাত্রা কিন্তু একরকম নয়। তবে উভয় প্রকার শ্রমিকেরাই হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। উভয় প্রকার শ্রমিকদের নিজস্ব জমিজমা নেই বললেই চলে। আবার যাদের কিছু জমিজমা আছে তার পরিমাণ খুবই সামান্য। তবে বসবাস কবার জন্য উভয় প্রকার শ্রমিকদেরই যে যার অঞ্চলে বাস্তুভিটে আছে।

বাইরে থেকে আগত (গযা, মুঙ্গের, চক্রধরপুর, রাঁচী) শ্রমিকদের বসবাসের জন্য ইঁট ভাঁটার মালিকেরা নিজেদের জায়গাতে বসবাসের জন্য বাড়ি তৈরি করে দেয। তবে স্থানীয় শ্রমিকেরা যে যার বাড়ি থেকেই ভাঁটাতে কাজ করতে আসে। এখানকার শ্রমিকেরা গরীব হলেও তারা ছোটর উপর খোলামেলা বাড়িতে থাকতে বেশি পছন্দ করে। কিন্তু বাইরের শ্রমিকেবা ছোট বদ্ধ বাড়িতেই থাকতে বেশি পছন্দ করে। বাড়িগুলি পাঁচ ফুটের বেশি উঁচু হয় না। তাতে কোন জানালা থাকবে না, একটি মাত্র ছোট দরজা থাকবে। তারা ঐ ছোট বাড়ীটির মধ্যে রান্না, খাওয়া, ঘুমানো সব কাজ করে থাকে। তবে একটি বিষয়ে দুই প্রকার শ্রমিকদের মধ্যে মিল লক্ষ্য করা যায় তা হল তাদের প্রত্যেকেরই কমপক্ষে পাঁচ ছয়টি করে বাচ্চ আছে। এরা নিজেরা অপরিষ্কার হলেও এদের বাড়িগুলি খুব সুন্দর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন।

খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে দুই প্রকার শ্রমিকদের ধরণ অন্য রকম। এখানকার স্থানীয় শ্রমিকেরা ভাত বেশি পছন্দ করে। রুটি, মুড়ি খেলেও তার পরিমাণ কম কিন্তু বাইরের শ্রমিকেরা কেবল একবার মাত্র সকাল বেলায় ভাত খায়। বাকি সময় তারা রুটি খেয়ে থাকে। এরা রুটিটা তৈরি করে একটা অদ্ভুতভাবে। আটাটা প্রথমে একটু শক্তভাবে মাখিয়ে বড় বড় লেচির আকারে গোল করে দুই হাতে চাপ দিয়ে মোটা মোটা রুটি তৈরি করে ভাঁটার উঁপর যেখানে ইঁট পোড়ানোর জন্য গর্তগুলিতে আগুন দেওয়া হয়ে থাকে,

তার উপর একটা লোহার ড্রাম দেওয়া থাকে। ঐ ড্রামের উপর তারা রুটিটাকে দিয়ে নেড়ে চেড়ে তৈরি করে নেয়। ওদের ভাষায় এই রুটিটাকে লিট্টি বলে। এক একটা রুটির ওজন কমপক্ষে ১০০-১৫০ গ্রাম করে হবে। এরা শাকসব্জী পরিমাণে কম খায়, ,আলু ও মাংস এদের প্রিয় খাদ্য। প্রয়োজনের তুলনায় লবন একটু বেশি খেলেও জল কম খায়।

বাইরের শ্রমিকেরা এমনিতে সপ্তাহে দুদিনের বেশি স্নান করে না। তবে ঠান্ডা একটু বেশি পড়লে একদিনের বেশি আর স্নান করতে দেখা যায় না। এরা সারাদিন কাদা মাটিতে কাজ করলেও দিনান্তে কেবল হাত পা ধোওয়া ছাড়া আর বেশি কিছু করে না। এদের গা থেকে একটা বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোয় তার উপর আবার লেবুর তেল ব্যবহার করে। সেক্ষেত্রে এখানকার শ্রমিকেরা প্রতিদিন স্নান করে থাকে, আবার একটু বেশি গরম পড়লে দিনে দুবারও স্নান করে থাকে।

বাইরের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সারা সপ্তাহ কাজের পর রবিবার দিন এরা বেতন নেয়। এই দিন ভাঁটাতে কাজ বন্ধ থাকে। তারা ঐ দিন স্নান করে দুপুর বেলায় রান্না খাওয়া সেরে বিকেল বেলায় স্থানীয় বাজারে গিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা করে থাকে। সঙ্গে বউ বাচ্চা সবাইকে নিয়ে দল বেঁধে যায়। মদ সারা সপ্তাহ এরা কম বেশি খেলেও রবিবার দিন বেতন পাওয়ার পর চূড়ান্ত পরিমাণে খায়। অনেক মেয়েরাও আবার মদ খায়। এখানে কাছাকাছি বাজার বলতে গোকুলপুর রেল স্টেশন সংলগ্ন একটি ছোট বাজার আছে। প্রত্যেক ভাঁটার শ্রমিকেরা ঐ বাজারে রবিবার দিন যায় ও একে অপরকে বন্ধুত্বের প্রীতিস্বরূপ মদ খাওয়ায় ও নিজে খায়। পরে ভাঁটাতে ফিরে এসে বউ বাচ্চাদের মারধোর করে থাকে। সেই সময় বাচ্চাদের এক অসহায় অবস্থায় দেখা যায়। প্রত্যেক রবিবার সন্ধ্যেবেলায় প্রায় প্রত্যেক ভাঁটাতে গন্ডগোল হয়ে থাকে। তবে মালিকপক্ষ এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলে না। ঝগড়া বেশি হলে তবেই মালিক ওদের কাছে যায়। মদের নেশা কমে গেলে আবার নিজেদের মতো কাজ শুরু করে দেয়। তবে শ্রমিকদের মদ খাওয়ার প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলছে। ফলে মাঝে মাঝে কাজের ভীষণ অসুবিধা দেখা দেয়। মদ খাওয়ার ব্যাপারে উভয় প্রকার শ্রমিকেরাই পটু।

উভয় প্রকার শ্রমিকেরাই প্রায় অশিক্ষিত তবে স্থানীয় শ্রমিকেরা অনেকে সামান্য লেখাপড়া জানে। বাইরের শ্রমিকদের পড়াশুনা করতে অসুবিধা হয় এই কারণে যে তারা বছরের আট মাস বাইরে ও চার মাস নিজের দেশে থাকে. ফলে কোন স্কুলে ভর্তি হয়ে নিয়মিত পড়াশুনা করতে পারে না। তবে ইদানিংকালে কেউ কেউ পড়াশুনা করছে। বাবা-মা রাও এদের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী নয়।

স্থানীয় শ্রমিকদের মধ্যে পুরুষ শ্রমিকেরা বেশির ভাগই ভাঁটার কাজ করে থাকে, আর মহিলা শ্রমিকেরা ভাঁটার কাজ করলেও কৃষিকাজে বেশি নিযুক্ত থাকে। বাইরের শ্রমিকদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয়েই ভাঁটার কাজে লিপ্ত থাকে। তবে পুরুষেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মাটি কাটা ও ট্রাকে কাজ করে থাকে। মহিলারা ইঁট তৈরিতে নিযুক্ত থাকে, আপাত ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় মহিলারাই বেশি পরিশ্রম করে। প্রত্যেকটি মহিলা সারাদিন এত কাজে ব্যস্ত থাকে যে তাদের বাচ্চাদের খাওয়ানোর সময় ছাড়া অন্য ব্যাপারে বেশি সময় দিতে পারে না। প্রথমের ছেলে মেয়েরা পরের ভাই বোনদের কোলে পিঠে করে মানুষ করে দেয়। এই সমস্ত শ্রমিকদের সন্তানেরা ঠান্ডা-গরম প্রায় সব সময় খালি গায়ে থাকতে অভ্যস্ত। বাচ্চাদের বিশেষ কোন পোলিও টিকা দেয় না। তবে বর্তমানে মালিক কর্তৃপক্ষ বাচ্চাদের পাল্‌স পোলিও খাওয়ানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে। এই সমস্ত শ্রমিকদের সন্তানদের একটা অদ্ভুত রোগ হলো মাটি খাওয়া। প্রত্যেক ভাঁটাতে বছরে প্রায় তিন-চারটি শিশু প্রাণ হারায় মাটি খেয়ে। সেক্ষেত্রে এখানকার শ্রমিকেরা তাদের বাচ্চাদের ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন। গর্ভবতী মায়েদেরও বিশেষ চিকিৎসা করতে দেখা যায় না।

স্থানীয় শ্রমিকদের প্রধান উৎসব হলো পৌষ সংক্রান্তি, চড়ক সংক্রান্তি ও দুর্গাপূজা। মকর সংক্রান্তির দিন মহিলা পুরুষ দলবদ্ধভাবে টুসু নিয়ে গান করতে করতে এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। আবার ইঁট ভাঁটা হওয়ার ফলে এই অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থারও উন্নতি হয়েছে। বহুদিন অবধি এই এলাকায় সরু মাটির রাস্তা ছিল। বর্ষাকালে এত কাদা হয়ে যেত যে পায়ে হাঁটাও কষ্টকর হয়ে দেখা দিত। ভাঁটা হওয়ার ফলে মালিকেরা নিজেদের সুবিধার জন্য মালিক কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে নিজেদের খরচায় মোরাম দিয়ে চওড়া ও মজবুত রাস্তা তৈরি করে। তবে বর্তমানে সরকার কিছু অনুদান দেয় এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য। ভবিষ্যতে পীচের রাস্তা তৈরি করার পরিকল্পনাও আছে ভাঁটার মালিকদের। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে যেমন ভাঁটা ব্যবসায়ীদের ইঁট পরিবহনের সুবিধা হয়েছে, তেমনি এই এলাকার সাধারণ মানুষেরাও উপকৃত হয়েছে। এই অঞ্চলে খালের উপর দিয়ে যে সমস্ত পুল ছিল তা মূলত কাঠের বা বাঁশের দ্বারা নির্মিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইঁটভাঁটার মালিকেরা তাদের সুবিধার জন্য যে যার নিজের এলাকায় কাঠ ও বাঁশের পুলের পরিবর্তে সিমেন্টের বড় বড় পুল তৈরি করেছে। ফলে এ এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে।

এই অঞ্চলের শিক্ষিত বেকার যুবকেরা যাদের মোটামুটি মূলধন আছে তারাও একটি দুটি ট্রাক কিনে ইঁটভাঁটাগুলো থেকে ইঁট বাজারে নিয়ে গিয়ে কিছু টাকা রোজগার করে থাকে। তবে প্রত্যেক ভাঁটা ব্যবসায়ীদের নিজস্ব ট্রাকে করেও ইঁট বাজারে নিয়ে যাওয়া

হয়। আবার এই ট্রাক গুলোতেও কিছু শ্রমিক কাজ করে থাকে। তাছাড়া এই এলাকার কিছু ছেলে ভাঁটার মালিকদের কাছ থেকে ইঁট নিয়ে গিয়ে বাজারে বিক্রি করে থাকে। এর জন্য তারা মালিকদের কাছ থেকে কিছু কমিশন পেয়ে থাকে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মালিকেরা নিজেরাই ক্রেতাদের ইঁট বিক্রি করে থাকে।

এই অঞ্চলের যে কয়েকটি ভাঁটা আছে তা নিয়ে মালিক পক্ষের একটা ইউনিয়ন আছে, যেমন মালিক পক্ষের ইউনিয়ন আছে, তেমনি শ্রমিকদেরও নিজস্ব একটা ইউনিয়ন আছে। তারা তাদের অভাব অভিযোগের কথা তাদের ইউনিয়নের মাধ্যমে মালিক কর্তৃপক্ষকে জানায়। মালিক পক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের যে কখনো গন্ডোগোল বাঁধেনি তা নয়, তবে মালিক ও শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে তা আলাপ আলোচনা করে মিটিয়ে নেয়। শ্রমিকেরা মাঝে মাঝে ধর্মঘটও ডাকে ভাঁটাতে। প্রত্যেক বছর মে মাসের শেষের দিকে মালিকেরা শ্রমিকদের নিয়ে এই অঞ্চলের কোন একটি ভাঁটাতে বা অন্য কোথাও বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয় তাদের পরিশ্রমের মূল্যের অনুপাত কেমন হবে। তেমনি আবার এই অঞ্চলের ট্রাক ব্যবসায়ীদেরও ইউনিয়ন আছে। তবে এক কথায় বলা যায় মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সৌহার্দ্য সম্পর্ক বরাবরই বজায় আছে।

কলাইকুন্ডা ৪ নং অঞ্চলটি খড়গপুর ও মেদিনীপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় শহরের যত বাড়ি তৈরি হচ্ছে তার বেশির ভাগ ইঁট এই অঞ্চল থেকেই জোগান দেওয়া হয়ে থাকে। ফলে বাজারে ইঁটের চাহিদা থাকার কারণে এই ব্যবসা এখানে বেশ জমিয়ে উঠেছে। এই এলাকার দরিদ্র মানুষের একটা কাজের সংস্থান হওয়ায় তারাও বেশ খুশি হয়েছে। সবশেষে বলা যায় যে, এই অঞ্চলে ইঁট শিল্প গড়ে ওঠার কারণে সামগ্রিকভাবে এই অঞ্চলের উন্নতি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো বেশি হবে বলে আশা করা যেতে পারে।

মনোমোহন ঘোষ ও ঠাকুর পরিবার প্রসঙ্গে

কেকা দত্ত রায় (বসু)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে সব বঙ্গ সন্তান শাসক জাতির নির্যাতন, নিপীড়ন থেকে স্বদেশবাসীকে মুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, মনোমোহন ঘোষ (১৮৪৪-১৮৯৬) তাদের মধ্যে অন্যতম। কৃতী ব্যারিস্টার, স্বদেশ হিতৈষী, স্বদেশ কল্যাণের উৎসাহদাতা বলে তিনি সেই সময়কার জাতীয় ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই প্রবন্ধটি মনোমোহনের একটি বিশেষ সম্পর্কের প্রতি আলোকপাত করবে যার প্রভাব তাঁর জীবনকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে প্রভাবিত করেছিল।[১]

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বন্ধু রামলোচন ঘোষ কৃষ্ণনগরে জেলা জজ আদালতের সদর আমীন ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোমোহন ঘোষ ১৮৫৯ সালে কৃষ্ণনগর থেকে প্রবেশিক্ষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে আসেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ''আমার বাল্যকথা''য় স্মৃতিচারণ করে লিখেছিলেন ''মনোমোহনের সঙ্গে আমাদের পৈতৃক সম্বন্ধ। তাঁর পিতা, রামলোচন ঘোষ আমার পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরম বন্ধু ছিলেন; ঐ বন্ধুত্বসূত্রে মনোমোহনের সঙ্গে আমারও বন্ধুত্ব জন্মেছিল ....'' পৈতৃক বন্ধুত্ব সূত্রে এই ভাবে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে মনোমোহন ঠাকুর বাড়িতে থাকতে আসেন এবং সত্যেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে মনোমোহনের গভীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। মনোমোহন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে এমনি আসর জমিয়ে ছিলেন যে তিনি চলে যাওয়ার পরও অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর ঘরটিকে 'মনোমোহনের ঘর' বলা হত।[২]

মনোমোহনের ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের পান্ডিত্য অল্পকালের মধ্যে ঠাকুর বাড়ির সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন একজন ইংরাজ মাষ্টার আমাদের পড়াতে আসতেন। তিনি মনোমোহন সম্বন্ধে বলতেন — "an old head on young shoulder"। কলকাতায় জোড়াসাঁকের বাড়িতে থাকাকালীন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহায্যে মনোমোহন ১৮৬১ সালে Indian Mirror পত্রিকাটি প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন।[৩]

ওই বছর ১৮৬১ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে কৃষ্ণনগরে মনোমোহনের পৈতৃক বাড়িতে সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র সেন বেড়াতে আসেন। তাঁর স্নেহময় পিতা রামলোচন ঘোষ এর সরল ব্যবহার ও তাঁর গৃহে ঐ সময়ের সুখময় আতিথেয়তার স্মৃতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে স্মরণ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগর থেকে লিখিত

পত্রে উল্লেখ করেন ঃ "We are spending our days in the garden of Bengal"। কৃষ্ণনগর ছিল তখন বাংলার উদ্যান এবং মনোমোহন ঘোষের বাড়িতে (বর্তমানে কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুল) ছিল সুষম্য একটি উদ্যান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর "জীবন স্মৃতি" তে বাড়ির সংলগ্ন দীর্ঘ তরু বীথির বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন মনোমোহন ও সত্যেন্দ্রনাথ বিলেত যাবার সিদ্ধান্ত নেন। মনোমোহন ঘোষের বাড়িতে যে দীর্ঘ তরু বীথির ছায়ায় দুজনে পায়চারি করতে করতে বিলাতে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন - কালের পৃষ্ঠায় অনেক পরিবর্তন হলেও সে তরু বীথি এখনও অক্ষম আছে।[৪]

মনোমোহনের পরিকল্পনা সব কিছু উল্টে দিল। বিলাতে গিয়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার কথা তিনি ভাবছিলেন। এ বিষয়ে তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী) 'পুরাতনী'তে লেখেন "মনোমোহনের সঙ্গে ওঁর খুব ভাব ছিল. তিনিই ওঁকে প্রথমে পরামর্শ দিলেন যে ভিক্টোরিয়া তো আমাদের দেশের লোককে Civil Service এ ঢোকার অনুমতি দিয়ে গেছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ পরীক্ষা দিতে যায়নি। চল না. দেখি আমাদের সিভিল সার্ভিসে নেয় কিনা। তিনি ক্রমাগত এইভাবে বুঝিয়ে ওঁর বিলেত যাবার মত দিলেন। দুই তরুণের বিদেশ যাত্রায় মহর্ষি প্রথমে নিমরাজি ছিলেন। মহর্ষির ইচ্ছা ছিল যে সব ছেলেরাই বড় হয়ে জমিদারী দেখে। এছাড়া রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর উভয়েই পরপর বিলেতে দেহরক্ষা করায় ভারতবাসীদের মনে এই কুসংস্কার দাঁড়িয়েছিল যে বিলেত গেলে আর স্বদেশে ফিরে আসা যাবে না ঃ "The land from whose bourne no traveller returns"। মনোমোহনের পিতা রামলোচনই প্রথমে এই সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং মনোমোহনকে বিলেত পাঠিয়ে সিভিল সার্ভিস দেবার জন্য উদ্যোগী হন। এদিকে সত্যেন্দ্রনাথের প্রবল ইচ্ছা দেখে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও মত দিলেন. দুই বন্ধু এক সঙ্গে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্য বিলেত যাওয়া স্থির হল।[৫]

সত্যেন্দ্রনাথ 'আমার বাল্য কথায়' লিখেছেন "আমাদের বিলেত যাওয়া এক রকম ঠিক হয়েছে। এমন সময় আমরা একদিন Botanical Garden এ বেড়াতে যাই। নদী পার হবার সময় একটা Steamer এর ধাক্কায় আমাদের নৌকা উল্টে গেল। আমি সাঁতার জানতাম, নৌকায় একভাগ কোন রকম করে আঁকড়ে ধরে রইলুম। কিন্তু মনোমোহন নৌকার তলায় পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। তাঁর আর উদ্ধারের কোন উপায় ছিল না। শেষে অনেক ডাকাডাকির পর এক পানসীর মাঝি তাঁকে টেনে ওঠালে। আমরা কাউকে কিছু না বলে সেই ভিজে কাপড়ে আমাদের গম্যস্থানে চলে গেলুম — সেখানে কাপড় শুকিয়ে বেড়িয়ে - টেড়িয়ে যথা সময়ে বাড়ি ফিরলুম। এই বৃত্তান্ত বাবু মশাইয়ের (দেবেন্দ্রনাথের) কর্ণগোচর হওয়াতে আমার বিলাত যাওয়া বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল।[৬]

যাই হোক শেষ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ ও মনোমোহন ঘোষ ১৮৬২ সালে পি এ্যান্ড ও কোম্পানীর জাহাজে কলকাতার গার্ডেনরীচ থেকে বিলাত যাত্রা করেন। জাহাজ ঘাটে যাঁরা বিদায় জানাতে এসেছিলেন এদের মধ্যে দুজনেরই একান্ত সুহৃদ গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন। গণু বাবু (গণেন্দ্রনাথ) কে লেখা বহু চিঠি থেকে মনোমোহনের সমুদ্রযাত্রা, বিলেতে থাকাকালীন নানা ঘটনা এবং সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে জানা যায়। মনোমোহন গণু বাবুকে লিখলেন ঃ "On the whole our voyage has been a very adventurous one. You will read with interest when I describe all the difficulties under which we were placed . . . . ."[৭]

লন্ডনে মনোমোহন ও সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে উঠলেন। মনোমোহন গণু বাবুকে লিখলেন "We have been very courteously received by Mr. & Mrs. G.M. Tagore. We are very grateful to them for their kindness towards us."[৮]

এই জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার। এরপর মনোমোহন ও সত্যেন্দ্রনাথ 'কেনসাল গ্রীণ' সমাধি ক্ষেত্রে দ্বারকানাথের সমাধি দেখতে যান। তারা আশা করেছিলেন যে দ্বারকনাথের সমাধিও সুন্দর উদ্যানে সুসজ্জিত থাকবে কারণ দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পিতার সমাধি বেদী নির্মাণের জন্য বিদেশে প্রচুর অর্থ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সমাধি দেখতে এসে চার কোণে সাইপ্রেস গাছে ঘেরা একটি অতি সাধারণ ইটের কবর ও গ্র্যানাইটের স্মৃতি ফলক দেখে তাঁরা খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। ক্ষুব্ধ হয়ে মনোমোহন গণু বাবুকে লেখেন ঃ "The very sight of the tomb though it excited feelings of reverence for the dead man who lay underneath. at the same time made us uneasy not knowing how to reconcile the description we had heard at home with what we then saw. We were both disgusted to see the imposition that has been practiced by those who had hands in the matter."

দুজনেই গণেন্দ্রনাথকে সমাধি বেদী সংস্কারের ব্যাপারে লেখেন। পরবর্তী কালে এই সমাধির দৈন্যদশা কিছুটা ঘুচেছিল তা সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন।[৯]

বিলাতে ছাত্র অবস্থায় মনোমোহন ও সত্যেন্দ্রনাথ এক সঙ্গে থাকতেন। সত্যেন্দ্রনাথ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এবং তিনি প্রথম ভারতীয় আই.সি.এস. হয়ে দেশে ফিরলেন। মনোমোহন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে আবার পড়তে থাকলেন কিন্তু নিয়মের পরিবর্তনের জন্য আর সিভিল সার্ভিসে সফল হতে পারলেন না। বাধ্য হয়েই তিনি ব্যারিস্টারী পড়বার জন্য ইংল্যান্ডে থেকে গেলেন এবং ১৮৬৬ সালে ব্যারিস্টারী পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হন। তাঁর ইংল্যান্ডে বসবাসের ও লেখা পড়ার সমস্ত খরচ দেবেন্দ্রনাথই বহন করেন। মনোমোহন পরের বছরই কোলকাতায় আসেন এবং হাইকোর্টে

আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার হলেও তিনি কোনদিন ভারতে না ফেরায় মনোমোহনই প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার হিসাবে ব্যবসা শুরু করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই খ্যাতিমান ও বিত্তবান হলেন।[১০]

কোলকাতায় ফিরে আসার পর মনোমোহনের সঙ্গে কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের সুসম্পর্ক থেকেই গেল। ১৮৬৬ সালে সত্যেন্দ্রনাথ অসুস্থতার জন্য কোলকাতায় ছুটি নিয়ে হীরালাল শীলের কাশীপুরের বাগান বাড়িতে সস্ত্রীক বাস করেন তখন মনোমোহন কিছুদিন সত্যেন্দ্রনাথের কাছে কাশীপুরে থাকেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেখানে গিয়ে মনোমোহনের কাছে ফরাসি শিক্ষা করতে শুরু করেন।[১১]

পরবর্তীকালে আমরা দুই বন্ধুর অজস্র প্রীতির সম্পর্কের উদ্ধৃতি পাই। যেমন ১৮৮০ সালে সত্যেন্দ্রনাথ কোলকাতায় ছুটি কাটাতে এসেছিলেন তখন বিহারীলাল গুপ্তর Lower Circular Road এর বাড়িতে বিখ্যাত পন্ডিত রঙ্গ আচার্যকে কেন্দ্র করে একটি প্রদর্শনীমূলক উদ্যান সভায় মনোমোহন সহ দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ যোগদান করেছিলেন।[১২] আবার সত্যেন্দ্রনাথ ও মনোমোহনের বিশিষ্ট বন্ধু ডঃ আত্মারাম পান্ডুরাও যখন কলকাতায় আসেন তখন মনোমোহন বাড়িতে উঠেছিলেন এবং জোড়াসাঁকোতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ মনোমোহন ঘোষকে শ্রদ্ধা করতেন। ১৮৭৫ সালে সাবিত্রী লাইব্রেরীর সভায় 'হাতে কলমে' প্রবন্ধ পাঠে বলেন ঃ "আজকাল প্রতিদিন . . . . . ইংরাজ কর্তৃক, দেশীয়দের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী . . . . . শুনতে হয় . . . . . কতকগুলি স্বজাতি দুঃখকাতর লোক মিলিয়া একটি সভা স্থাপন করেছেন — আমাদের দেশীয় ব্যারিস্টার অনেকগুলি তাতে যোগ দিয়াছেন . . . . . উক্ত ব্যারিস্টারগুলির মধ্যে মনোমোহন ঘোষ ছাড়া এমন অল্প লোকই আছেন যারা বিদেশীয় অত্যাচারীর হস্ত হইতে স্বদেশীয় অসহায়কে মুক্তি দেবার জন্য প্রাণ ধরিয়া মায়া ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন . . . . ."[১৩]

এরপর ১৮৯০ সালে মনোমোহন সহ ১১ জন প্রতিনিধি যখন কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ইংল্যান্ডের জনসাধারণ ও সংবাদ পত্রাদিকে অবহিত করবার জন্য যাওয়া স্থির হল তখন তাদের বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে এগিয়ে এসেছিলেন কোলকাতার গণ্যমান্য নাগরিক। যাদের মধ্যে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গগণেন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুর পরিবারের অনেক সদস্যই।[১৪]

১৮৯০ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের সময় মনোমোহন স্বেচ্ছাসেবকদের একটি উদ্যান সম্মিলনীতে আপ্যায়িত করেন। রবীন্দ্রনাথ সেই অনুষ্ঠানে সত্যেন্দ্রনাথ রচিত 'গাও ভারতের জয়' গানটি গেয়ে শোনান এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হারমোনিয়াম সংযোগ দেন।[১৫]

মনোমোহনের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের একটি গভীর সৎসম্পর্ক শেষ দিন পর্যন্ত ছিল।

১৮৯৬ সালে মনোমোহন ঘোষ পরলোক গমন করলে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অভিভাষণে বলেছিলেন "We cannot sufficiently deplore the loss of his great learning and experience, his sound judgement and strong common sense and skilful guidance as a political leader. He was a man of many sided actively and liberal sympathies. He lead an exemplary life in his domestic circle. The helpless and indigent ever found in him a generous patron, the oppressed and downtrodden a ready champion of their cause. I shall not dwell our the personal friendship which makes his less more than a public grief to me."[১৬]

এইভাবে নানা ঘটনা, অভিজ্ঞতা ও সুসম্পর্কের মধ্য দিয়ে মনোমোহন ও ঠাকুর পরিবারের যে গভীর বন্ধন গড়ে উঠেছিল তার প্রভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

সূত্রনির্দেশ

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, কলকাতা, ১৯০৩, পৃঃ ৩৪৬।

২। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আমার বাল্যকথা*, বৈজ্ঞানিক প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ৫৫-৫৬।

৩। যোগেশ চন্দ্র বাগল, *ভারতের মুক্তি সন্ধানী*, কলকাতা, ১৯৫৮, পৃঃ ১০২-১০৪।

৪। বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, *জোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি* এবং মোহিত রায়, *নদীয়া উনিশ শতক*, কলকাতা, ১৩৯৫, পৃঃ ৯।

৫। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সংকলিত *পুরাতনী গ্রন্থে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর স্মৃতিকথা*, কলকাতা ১৮৭৯, এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর. *আমার বাল্য কথা*, পৃঃ ৫৫-৫৬।

৬। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আমার বাল্যকথা*, পৃঃ ৫৫-৫৬।

৭। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা মনোমোহনের পত্র ১৭ মে ১৮৬২ (রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতনে রক্ষিত)।

৮। *তদেব*।

৯। *তদেব*।

১০। কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *নদীয়ার মহাজীবন*, কলকাতা, ১৮৭৯, পৃঃ ৫৭ ও প্রশান্ত পাল, *রবিজীবনী*, প্রথম খন্ড, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃঃ ৫৫।

১১। প্রশান্ত পাল, *রবিজীবনী*, পৃঃ ৭১।

১২। *তদেব* পৃঃ ৩০।

১৩। *তদেব* পৃঃ ১২৩।

১৪। *তদেব* পৃঃ ১৩৪।

১৫। *তদেব* পৃঃ ১৬৪।

১৬। যোগেশ চন্দ্র বাগল, পৃঃ ১২১।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে শিক্ষিত বাঙালীর ভারতের ইতিহাস চর্চা ও চেতনা

ভবতোষ কুন্ডু

শিক্ষিত বাঙালী বলতে মূলত কলকাতা এবং তৎসন্নিহিত এলাকার শিক্ষিত, বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণীকে বোঝানো হয়েছে। তাঁদের সময়ে অনেক ইংরেজ লেখক তাঁদের রচনার মাধ্যমে ভারতের ইতিহাসের উপর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জেমস মিল যাঁর রচনা History of British India-এর প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৮ সালে। মিল ঐ গ্রন্থে ভারতের ইতিহাসকে তিনটি কালপর্বে ভাগ করেছেন। যথা হিন্দু, মুসলিম ও ব্রিটিশ। তিনি তাঁর গ্রন্থে হিন্দু ও মুসলিম সভ্যতাকে ব্রিটিশ সভ্যতার চেয়ে নিকৃষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে তিনি ভারতের স্বৈরাচারী ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করেছেন এবং উন্নতির উপায় হিসাবে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে আইন ও রাজনৈতিক সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[১] অন্যদিকে Colonel James Tod-এর Annalc and Antiquities of Rajasthan নামক রচনার সময় থেকে অনেক ব্রিটিশ লেখকের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছিল যে ব্রিটিশ শাসন ছিল মুসলিম অপশাসন থেকে হিন্দুদের রক্ষকস্বরূপ এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ। ইংরেজ লেখকদের ভারতের ইতিহাসের উপর রচনা বা ব্যাখ্যা যথাযথ বা তথ্য বা বস্তুনিষ্ঠ না হলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের Ideology গড়তে সাহায্য করেছিল।[২] প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষিত বাঙালীরা কি ইংরেজদের ভারতের ইতিহাসের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছিলেন অথবা বর্জন করেছিলেন।

উল্লেখ্য রামমোহন রায় সংবাদপত্রের উপর বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে তাঁর Appeal to the King in Council (1825) নামক রচনায় লিখেছিলেন যে কয়েক শত বছর যাবৎ হিন্দুস্থানের অধিকাংশ অংশ মুসলিম শাসনের অধীনস্থ ছিল এবং ঐ সময়ে এর আদি অধিবাসীদের ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার পদদলিত হয়েছিল।[৩] তিনি আরো লিখেছিলেন যে বঙ্গদেশের স্বদেশবাসীরা মুসলিম বিজয়ের পরে মুসলিম সরকারের প্রতি অনুগত ছিল অথচ তাদের সম্পত্তি হয়েছিল লুন্ঠিত। তাদের ধর্মের অবমাননা এবং অকারণে তাদের রক্তপাত ঘটেছিল। তিনি শুরুতে ব্রিটিশ সরকারকে এদেশবাসীর জীবন, সম্পত্তি ও ধর্মের ঈশ্বর প্রেরিত রক্ষক হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[৪]

ইয়ং বেঙ্গল, যাদেরকে অনেকে চরমপন্থী বলেছেন।[৫(ক)] হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের

বা শিক্ষিত শ্রেণীর বর্ধিত অংশ — সকলেই রামমোহনের ন্যায় মুসলিম শাসনকে স্বৈরাচারী শাসন এবং ঐ শাসন থেকে ইংরেজ শাসনকে হিন্দুদের ত্রাতা হিসাবে মনে করেছেন। উল্লেখ্য হিন্দু কলেজের ইংরেজী ও ইতিহাসের শিক্ষক এবং ইয়ং বেঙ্গলের গুরু এইচ. এল. ভি. ডিরোজিও এবং মানবপ্রেমিক ডেভিড হেয়ার, যাঁরা এদেশের ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের মানসিক গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁরা মুসলিম শাসন সম্পর্কে ব্রিটিশ লেখকদের পক্ষপাতমূলক রচনার উর্দ্ধে উঠতে পারেননি। ডিরোজিও তাঁর "The Enchantress of the Cave" এবং "The Golden Vase" কবিতা দুটিতে মুসলিমদেরকে আক্রমনকারী, লুণ্ঠনকারী এবং শান্তিভঙ্গকারী রূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি মুসলিম আক্রমনের বিরুদ্ধে হিন্দুদের রক্তাক্ত সংগ্রামের কল্পনা চিত্রিত করেছেন এবং "The Enchantress of the cave" নামক কবিতায় Epic Heroes-এর বন্দনা করেছেন।[৫] ডেভিড হেয়ার ১৮৩০ সালে মাধব চন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে অনুষ্ঠিত (ইংরেজী শিক্ষায় তাঁর অবদান হেতু) এক সম্বর্ধনা সভায় বলেছিলেন যে শত শত বৎসরের অত্যাচার এবং অপশাসনের দ্বারা ঘটিত মানুষের অজ্ঞতার কুয়াশা দূর করার জন্য প্রয়োজন ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা।[৬] ডিরোজিও ও ডেভিড হেয়ারের প্রভাবে ইয়ং বেঙ্গল বা এদেশের শিক্ষিত যুবকগণ মুসলিম শাসন সম্পর্কে একপেশে ও বিকৃত ধারণাই পোষণ করেছেন। কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় ১৮৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে *এনকোয়ারার* পত্রিকায় ''ব্রিটিশ এম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া'' নামক এক প্রবন্ধে মুসলিম শাসনকে স্বৈরাচারী নিষ্ঠুর "fanatic" এবং "barbarous" রূপে চিত্রিত করেছেন এবং ঐরূপ শাসন থেকে ব্রিটিশ শাসনকে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বা "Kind and Wise Dispensation of God" বলে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর মতে যুগ যুগ ধরে হিন্দুদের মনে যে মেঘ এবং কুয়াশা জমেছিল ব্রিটিশ শাসন তা দূর করতে শুরু করেছে।[৭]

উইলিয়াম এ্যাডাম ১৮৩৬ এবং ১৮৩৮ সালে বাংলার শিক্ষা, বিশেষকরে প্রাইমারী শিক্ষা নিয়ে এক বিস্তৃত রিপোর্ট লিখেছিলেন।[৮] অথচ ১৮৩৮ সালের নভেম্বর মাসে *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকা মন্তব্য করেছিল যে যতদিন "The wretched oppressive yavanas" এদেশ শাসন করেছে ততদিন প্রাথমিক শিক্ষার অস্তিত্ব বাস্তবে ছিল না এবং আনন্দের বিষয় যে ইংরেজ সরকার এদেশের জনগণকে শিক্ষা প্রদানের ও সভ্য করার জন্য সম্প্রতি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।[৮(ক)] উল্লেখ্য *জ্ঞানান্বেষণ* ব্যবহৃত ''যবন'' শব্দটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে *সমাচার চন্দ্রিকা* এক সংখ্যায় যবনদের ঔদ্ধত্যের নিন্দা করেছিল এবং আশা ব্যক্ত করেছিল যে মুসলিমরা চাকুরি থেকে বিতাড়িত হবে তখনই যখন পারসিক ভাষা দরবারী ভাষার মর্যাদা হারাবে।[৯]

উদয় চন্দ্র আঢ্য সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় ''এতদ্দেশীয় লোকদিগের বাংলাভাষা

উত্তমরূপে শিক্ষা করণের আবশ্যকতা বিষয়ক প্রস্তাব" নামক এক প্রবন্ধে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন রূপে প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু তিনি শুরুতে লিখেছিলেন —

> এই বঙ্গীয় বালকদিগের শিক্ষা সেই পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়াছে যদবধি হিন্দু রাজারা রাজচ্যুত হইয়াছেন। ইহার কারণ এমতই নির্ধারণীয় যে যখন যবন জাতি রাজা হয়েন তখন তাঁহাদিগের দাসত্ব করণার্থ বাঙ্গালীরা যাবনিক ভাষা শিখেন, এবং তৎপরে ইংরাজ রাজা হইলেও কেবল পূর্ব্ব কারণাৎ ঐ ভাষাই শেখেন।[১০]

বঙ্গীয় ভাষা চর্চার অবহেলা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন — 'পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল গ্রন্থকর্ত্তারা ছিলেন যথা কবি কঙ্গন চক্রবর্তী, কাশীরাম দাস, কীর্ত্তিবাস পন্ডিত এবং ভারতচন্দ্র রায় ইত্যাদি, এবং ঐ সকল কবিবরেরা যে সকল উত্তম ইতিহাস, কাব্য এবং অন্যান্য মত পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা কেবল লোকেরা সদা কদাচিৎ পাঠ করিয়া থাকেন মাত্র।[১১] অথচ তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন যে উপরিউক্ত প্রত্যেক কবি বেঁচেছিলেন এবং কাজ করেছিলেন তথাকথিত মুসলিম স্বৈরাচারী শাসনকালে।

চিত্তাকর্ষক বিষয় হচ্ছে যে ১৮৪৩ সালে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় পঠিত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের এক প্রবন্ধে ব্রিটিশ সরকার, পুলিশ ও বিচার সম্পর্কে ঝাঁঝালো সমালোচনার ফলে দক্ষিণারঞ্জনের সাথে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের দ্বন্দ্ব বেধে যায়। রিচার্ডসন দক্ষিণারঞ্জনের বক্তৃতা থামিয়ে সভায় সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে জানিয়েছিলেন যে মুসলিম আমলের তুলনায় ইংরেজ আমলে এদেশবাসী নিরাপত্তা ভোগ করছে। বক্তৃতা পুনরায় শুরু করে দক্ষিণারঞ্জন তৎপরতার সঙ্গে স্বীকার করেছিলেন যে কোম্পানীর শাসন দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও মুসলিম শাসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বিশেষকরে আইন সংক্রান্ত নীতি নির্ণয়ে এবং জীবন ও সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সাধনে।[১২] অথচ তিনি বক্তৃতা শুরু করেছিলেন ফরাসী বিপ্লবের প্রাকৃতিক অধিকার ও সাম্যের আদর্শের, ঔপনিবেশিক শাসনের শোষনের এবং উপনিবেশ মুক্ত হলে ভারতের সুখ ও সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে।[১৩]

জর্জ টমসন ১৮৪৩ সালে ফৌজদারী বলাখানায় এক বক্তৃতামালায় কলকাতার শিক্ষিত শ্রেণীকে লন্ডনের ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির আদলে বাংলায় ব্রিটিশ শাসন কাঠামোর মধ্যে সংস্কারের আন্দোলনের জন্য একটি রাজনৈতিক সংঘ স্থাপন করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন যার ফলস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (এপ্রিল ২৮, ১৮৪৩)। ইংরেজী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে গর্বিত টমসন মন্তব্য করেছিলেন যে ব্রিটিশ শাসনের ত্রুটি এবং স্বার্থপর নীতি সত্ত্বেও ঐ শাসন মুসলিম শাসন অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে ভাল এবং মুসলিম শাসন থেকে ভারতের জনগণের ত্রাতা।[১৪] ইয়ং বেঙ্গল এবং কলকাতার শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে মুসলিম শাসন সম্পর্কে যে বিরূপ ধারণা

ছিল টমসনের প্রভাবে তা বদ্ধমূল হয়েছিল। ১৮৪৩ সালে ২০শে এপ্রিল ফৌজদারী বলাখানায় এক সভায় রামগোপাল ঘোষ মন্তব্য করেছিলেন যে যদিও উচ্চপদে এদেশবাসীদের নিয়োগের ব্যাপারে মুসলিম সরকার ব্রিটিশ সরকারের তুলনায় উদার, তথাপি মুসলিম সরকারকে ইংরেজ সরকারের চেয়ে উৎকৃষ্ট বলা যায় না।[১৫]

II

স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৮২৮ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে মিলের অবজ্ঞাসূচক মনোভাব বর্জন করেছিলেন।[১৬] কাশীপ্রসাদ তাঁর Shair and other Poems নামক কবিতার গ্রন্থে (১৮৩০) প্রকাশিত "Veena on the Indian Lute" নামক কবিতায় প্রাচীন ভারতের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে তাঁর এই হিন্দু পুনরুজ্জীবনমূলক মনোভাব কি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে চালিত ছিল?

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় প্যারীচাঁদ মিত্র "স্টেট অফ হিন্দুস্থান আন্ডার দি হিন্ডুস" নামক বক্তৃতামালায় (১৮৩৯-১৮৪১) জেমস মিলের হিন্দু ইতিহাস ও সভ্যতার প্রতি ঘৃণাসূচক মনোভাবকে খন্ডন করেছেন। তিনি চিত্রিত করেছেন প্রাচীন ভারতের জাঁকজমক, আড়ম্বর বা শ্রেষ্ঠত্ব, বিশেষ করে এর প্রজাতন্ত্র, প্রজাহিতৈষী রাজা যাঁরা নিয়ন্ত্রিত হতেন ব্রাহ্মণদের প্রভাবের দ্বারা। দক্ষ পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থা উন্নত ব্যবসা, কৃষি, বহির্বাণিজ্য প্রভৃতির ফলে সমৃদ্ধি এবং জ্ঞানের বিভিন্ন দিকে এর গৌরবের দাবী। তাঁর এই বর্ণনা এক ধরণের পুনরুজ্জীবনবাদী চিন্তার উদ্রেক ঘটায়, যার যৌক্তিকতা অন্তর্নিহিত জাতীয় গর্ববোধের মধ্যে নিহিত বলে মনে হতে পারে।[১৭] কিন্তু এই বোধের edge টি দীর্ঘদিন থেকে পরিচালিত হয়েছিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয় এবং প্যারীচাঁদ বা ইয়ংবেঙ্গলের চিন্তাধারা এর ব্যতিক্রম ছিল না। মহেশ চন্দ্র দেব সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় পঠিত 'স্কেচ অফ দি কান্ডিশন অফ হিন্দু ওয়মেন' (জানুয়ারী ১৮৩৯) নামক প্রবন্ধে হিন্দু মহিলাদের অধঃপতনের জন্য হিন্দু শাস্ত্রের নির্দেশকে দায়ী করার পর লিখেছিলেন যে তাদের পর্দানোশীন ব্যবস্থা এবং ঘরে আবদ্ধ থাকার সূত্রপাত স্বৈরাচারী মুসলিম সম্রাটদের শাসনে ঘটেছিল।[১৮] আর প্যারীচাঁদ ১৮৪১ সালে তাঁর উপরিউক্ত বক্তৃতায় এক সময় মন্তব্য করেছিলেন —

The ancient Hindu spirit of enterprise, which the storm of Modern oppression has entirely extinguished .... will now be kindled and burnt in the bosoms of the rising generation who will .... open sources of employment in the intensive field of commerce.[১৯]

কিন্তু প্যারীচাঁদের আশা ছিল ভিত্তিহীন যেমন ছিল তাঁর ইতিহাসের ধারণা। সমসাময়িক

পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকার পতন সংক্রান্ত রিপোর্ট[২০] অথবা ব্রিটেনের cotton twist এবং cloth export-এর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি।[২১] উল্লেখ্য ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধির ফলে ব্রিটিশ যন্ত্রশিল্পের সাথে দেশীয় হস্তচালিত শিল্পের এক অসম প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। ফলে দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের নাভিশ্বাস ঘটেছিল যাকে Industrial devastation রূপে উইলসন দেওয়ান রামকমল সেনকে এক চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। প্যারীচাঁদ এবিষয়ে অবহিত ছিলেন, কেননা তিনি তাঁর *লাইফ অফ দেওয়ান রামকমল সেন* নামক রচনায় উইলসনের ঐ চিঠি উদ্ধৃত করেছেন।[২২] অথচ তিনি হিন্দুস্থানের অবস্থা সংক্রান্ত বক্তৃতামালায় উপরিউক্ত আশঙ্কা প্রকাশ করেন নি। হস্তচালিত শিল্পের অধঃপতন তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল যা রামমোহনের ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

III

ইংরেজ Free Traders-এর মিত্র এবং অশোক সেনের ভাষায় ম্যানচেষ্টারের পুঁজিপতিদের "unconscious agent"[২৩] জর্জ টমসন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের (জুলাই ৬, ১৮৩৯) ভাষণে[২৪] এবং বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ফৌজদারী বলাখানার বক্তৃতায় Theory of Natural Identity of Interests তুলে ধরেছিলেন যার মর্মার্থ ছিল ব্রিটিশ কাঠামোর মধ্যে আইনগত ও সাংবিধানিক সংস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে এদেশের জনগণের অবস্থা ও রুচির উন্নতি ঘটিয়ে ইংরেজদের দ্রব্যের জন্য চাহিদা ও বাজার বৃদ্ধি করা। অন্যভাবে বলতে গেলে কিছু সংস্কারের বিনিময়ে ইংরেজ সরকার ব্রিটিশ শিল্পের জন্য ভারতের কাঁচামাল ব্যবহার করবে এবং ভারতকে ইংরেজী দ্রব্যের বাজারে পরিণত করবে।[২৫] বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত "দি এফিসিয়েন্সি অফ নেটিভ এজেন্সি ইন গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়" নামক পুস্তিকায় টমসনের উপরোক্ত তত্ত্বটি গ্রহণ করেছিল।[২৬] কিন্তু ঐ সোসাইটির সদস্যগণ Deindustrialization বা অবশিল্পায়ন এবং দেশীয় বাণিজ্যের অধঃপতনের বিষয়টিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করেছেন। দেশীয় শিল্পকে ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের সাথে অসম প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন ছিল সংরক্ষণের। কিন্তু ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার নিজের দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের বাজারের স্বার্থে দেশীয় বাণিজ্যের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল যার বিরুদ্ধে ১৮৪৩ সালের *বেঙ্গল স্পেকটেটর* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল।[২৭] অন্যদিকে দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের দ্রুত অধঃপতন শুরু হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদের রেশম ও রেশমজাত দ্রব্যের পূর্বের তুলনায় উৎপাদনের অবনতির কথার উল্লেখ আছে ১৮৪৩ সালের ঐ পত্রিকায় যদিও পত্রিকার মতে মুর্শিদাবাদ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তখনও গুরুত্বপূর্ণ স্থান।[২৮] সুতরাং ইয়ং বেঙ্গল বা শিক্ষিত বাঙালী শ্রেণী দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের অবনতি সম্পর্কে অবহিত

ছিলেন। অথচ টমসনের Theory of Natural Identity of Interests তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, যার মূলে ছিল এদেশে ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা ও বাজার বৃদ্ধি করা এবং বাস্তবে এদেশের সম্পদ লুণ্ঠন করা নিজের দেশের স্বার্থে।

IV

উপসংহারে বলা যায় যে মিলের ভারতের ইতিহাসের কাল বিভাজন — হিন্দু, মুসলিম ও ব্রিটিশ - ভ্রান্ত ও তথ্যনিষ্ঠ না হলেও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এবং তার পরে দীর্ঘদিন ধরে ভারতের শিক্ষিত শ্রেণীর ধারণাকে প্রভাবিত করেছে। দ্বিতীয়ত, মূলত ইংরেজ লেখকদের প্রভাবে শিক্ষিত বাঙালীরা মুসলিম শাসন সম্পর্কে Sweeping. একপেশে ও পক্ষপাতমূলক মনোভাব গ্রহণ করেছেন এবং মুসলিম অপশাসন থেকে হিন্দুদের ত্রাতা হিসাবে স্বাগত জানিয়েছেন। এই ধরণের মনোভাবের মধ্যে খুঁজে পাওয়া দুরূহ লালন ফকিরের (১৭৫৫ অক্টোবর ১৭, ১৮৯০) বাউল গানের মধ্যে অন্তর্নিহিত হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বৈষ্ণবীয় ভাবধারা,[২১] যা ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যিক ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল Legacy। তৃতীয়ত, ঔপনিবেশিক শাসনের মূলগত শোষণমূলক দিকটি ও দেশীয় বাণিজ্যের অধঃপতনকে উপেক্ষা করে সাধারণভাবে শিক্ষিত বাঙালীগণ ব্রিটিশ শাসনকে ভারতের উন্নতির ও উত্থানের একটি শক্তি হিসাবে তুলে ধরেছেন। আসলে ইংরেজ শাসন কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তি উন্নতির পথ লক্ষ্যকারী বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণী ভারতের ইতিহাসের ঔপনিবেশিক ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারেননি এবং ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামী জাতীয় চেতনার সূত্রপাত ঘটাতে সক্ষম হননি।

সূত্রনির্দেশ

১। এরিক স্টোকস্, *দি ইংলিশ ইউটিলিট্যারিয়ানস এ্যান্ড ইন্ডিয়া*, অক্সফোর্ড, ১৯৫৯, পৃঃ ৫১-৫৭, ৬৭।

২। চার্লস, আর মেটকাফ, *ইডিওলজিস অফ দি রাজ*, নয়াদিল্লী, ১৯৯৪, এই গ্রন্থে তিনি এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

৩। *সোফিয়া ডবসন কলেট, দি লাইফ এ্যান্ড লেটারস অফ রাজা রামমোহন রায়*, দিলীপ কুমার বিশ্বাস ও প্রভাত চন্দ্র গাঙ্গুলী সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৮৮, এ্যাপেনডিক্স, পৃঃ ৩৯৪।

৪। ঐ পৃঃ ৩৯৩-৩৯৪।

৪ক। সুমিত সরকার মন্তব্য করেছেন "The Virtually obiqitous presence of the concept of Maslim tyranny (and of British rule as a deliverance from the same) is surely one of the most striking features of nineteenth century 'renaissance' thought, and the Derosian acceptance of these assumptions is a reminder that in certain crucial respects our 'radicals

were not all different from the 'Moderates' on even the 'conservatives.' সুমিত সরকার "দি কমপ্লেকসিটিস অফ ইয়ং বেঙ্গল," *নাইনটিন্থ সেনচুরি স্টাডিস*, নং ৪, অক্টোবর ১৯৭৩, পৃঃ ৫১৬-৫১৭।

৫। ডিরোজিও রচিত কবিতা, "The Golden Vase"-এর অংশ —

The Moslem is come down to spoil the land which every god hath blest! For such a soil so rich, so clad with beauty. who would not unlock his veins, and pour his Treasure forth? The Hindoo hath marched forward to repel the lawless plunderer of his holy shrines, the savage! rude disturber of his peace.

ডিরোজিওর কবিতা "The Enchantress of the cave" এর অংশ —

For Brainah's children must oppose their fall, invading Muslim foes, the Moslem brings turban'd band, to win the peaceful golden land, the crescent on his banner shines, the watchword's "Alla" in his lines, and on his blade the Koran verse Bspeaks for every foe a curse the Hindoo courts the bloody broil to fight on fall for his parent soil, o! for the heroic heants of old to fire the souls that now are cold.

৬। প্যারীচাঁদ মিত্র, *এ বায়োগ্রাফিক্যাল স্কেচ অফ ডেভিড হেয়ার*, কলিকাতা, ১৮৭৭, ৩৮-৩৯।

৭। *দি এনকোয়ারার* কোটেড ইন *দি ইন্ডিয়া গেজেট*, ফেব্রুয়ারী ১০, ১৮৩২।

৮। উইলিয়াম এ্যাডাম, *রিপোর্টস অন দি স্টেট অফ এডুকেশন ইন বেঙ্গল*, অনাথনাথ বসু সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯৪১, দ্বিতীয় রিপোর্ট, সেকসন ২।

৮ক। দি *জ্ঞানান্বেষণ* কোটেড ইন *দি সমাচার দর্পণ*, নভেম্বর ১৭, ১৮৩৮, কোটেড ইন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (বাংলা), দ্বিতীয় খন্ড, কলিকাতা, ১৩৪৬ সাল, পৃঃ ৭৬।

৯। *দি সমাচার দর্পণ* কোটেড ইন *দি ইন্ডিয়া গেজেট*, ডিসেম্বর ২৬, ১৮৩১, সাইটেড ইন এ এফ. সালাউদ্দীন আহমেদ, *সোসাল আইডিয়াল এ্যান্ড সোসাল চেঞ্জ ইন বেঙ্গল*, লাইডেন, ১৯৭৬, পৃঃ ১৪৯।

১০। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদিত *এ্যাওয়েকেনিং ইন বেঙ্গল ইন আর্লি নাইনটিন্থ সেনচুরি*, ভলিউম ১, কলিকাতা ১৯৬৫, এ্যাপেনডিক্স, ১, পৃঃ ১-২।

১১। ঐ, পৃঃ ২।

১২। *দি বেঙ্গল হরকারা*, ফেব্রুয়ারী ১৩, ১৮৪৩।

১৩। বি. বি. মজুমদার, *হিস্টরি অফ পলিটিক্যাল থট ঃ ফ্রম রামমোহন টু দয়ানন্দ*, কলিকাতা, ১৯৩৪, পৃঃ ১১৯-১২১। অরবিন্দ পোদ্দার, *রেনেশাঁ ইন বেঙ্গল, কোয়েস্টস এ্যান্ড কনফ্রন্টেশনস*, সিমলা, ১৯৭০, পৃঃ ১৩২।

১৪। জর্জ টমসন, *এ্যাড্রেসেস ডেলিভার্ড এ্যাট মিটিংস অফ দি নেটিভ কমিউনিটি অফ ক্যালকাটা এ্যান্ড অন আদার অকেশন্স*, কলিকাতা, ১৮৪৩, পৃঃ ৭৮-৮২।

১৫। ঐ, পৃঃ ১০৮-১০৯।

১৬। *দি ক্যালকাটা গেজেট*, জানুয়ারী ২৪, ১৮২৮।

১৭। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১-১৩২, ১৫৬-১৫৭, ১৬৬-১৮৯, ২৬১-২৬২, ৩১৫-৩১৮, ৩৩৫-৩৫১, ৩৬৬, ৩৬৮-৩৬৯।

১৮। ঐ, পৃঃ ৯৪।

১৯। ঐ, পৃঃ ৩৫০-৩৫১।

২০। *দি সমাচার দর্পণ*, মে ৭ ও আগষ্ট ২০, ১৮৩১, কোটেড ইন বি এন. বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩৬-৩৩৭।

২১। *দি ইন্ডিয়া গেজেট*, জুলাই ২৫, ১৮৩১।

২২। প্যারীচাঁদ মিত্র, *লাইফ অফ দেওয়ান রামকমল সেন*, কলিকাতা, ১৮৮০, বঙ্গানুবাদ জে. সি. বাগল কর্তৃক, কলিকাতা, ১৯৬৪, পৃঃ ১৮-১৯।

২৩। অশোক সেন, "দি বেঙ্গল ইকনমি এ্যান্ড রামমোহন রায়," ভি. সি. যোশী সম্পাদিত *রামমোহন এ্যান্ড দি প্রশেষ অফ মর্ডানাইজেশন ইন ইন্ডিয়া*, নিউ দিল্লী, ১৯৭৫, পৃঃ ১৩২।

২৪। এস. আর. মেহরোএা, *দি ইমারজেন্স অফ দি ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস*, দিল্লী, ১৯৭১, পৃঃ ১৫।

২৫। জর্জ টমসন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৪-৮৫, ১৩৫।

২৬। "দি এফিসিয়েন্সি অফ নেটিভ এজেন্সি ইন গভর্নমেন্ট এমপ্লয়," কলিকাতা ১৮৪৪, পৃঃ ৩।

২৭। *দি বেঙ্গল স্পেকটেটর*, জুন ১, ১৮৪৩, পৃঃ ১৫৮।

২৮। ঐ, জানুয়ারী ১, ১৮৪৩, পৃঃ ৩।

২৯। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান* (বাংলা), কলিকাতা, ১৩৭৮, পৃঃ ৫৯২-৫৯৩, ৬০৪, ৬০৭-৬০৮, ৬১৯-৬২০, ৬৪২।

বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার উদ্ভব ও খ্রিস্টান মিশনারীদের ভূমিকা

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুম

মুসলিম শাসনামলে বাংলায় শিক্ষার মাধ্যম ছিল ফার্সি এবং ফার্সি ছিল সরকারি ভাষা। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে আরবি ও উর্দু ভাষারও চর্চা করা হত। তবে নানা কারণে বাংলার মুসলমানদের নিকট ফার্সি ছিল প্রিয় বিষয়।[১]. মুসলিম আমলের শেষ পর্যায়ে ফার্সি শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় হিন্দুদের মধ্যেও এ শিক্ষা বিশেষ জনপ্রিয় ছিল।[২] তবে হিন্দু ছাত্রদের জন্য পাঠশালা, টোল বা চতুষ্পাটির ব্যবস্থা ছিল যেগুলোতে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হত।[৩] শিক্ষকদের অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ। ছাত্রদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য থাকলেও কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতিদেরও অধ্যয়নের অধিকার ছিল।

১৭৫৭ সালে পলাশীর পট পরিবর্তনের পর বাংলার এই শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং এদেশে ফার্সির পরিবর্তে পাশ্চাত্যের ইংরেজি ও সেই সাথে দেশীয় ভাষাও স্থান করে নিতে থাকে। তবে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসনভার হাতে নেয়ার পর সরকারিভাবে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল দেশবাসীর শিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন থাকে। বরং এ দেশের লোককে কোন রকম শিক্ষা দেয়া কোম্পানীর স্বার্থের পরিপন্থী ও তার সাম্রাজ্যের পক্ষে সমূহ বিপদ বলে মনে করে। কোম্পানির প্রশাসন মনে করেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করলে দেশীয় সমাজ ও প্রচলিত ধর্মে আঘাত লাগবে এবং জনগণ এতে ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে পড়বে। ফলে ব্রিটিশদের শাসন ক্ষমতা হারাতে হবে।[৪]

কিন্তু কোম্পানির কিছু প্রশাসক ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং দেশীয় সংস্কৃতি চর্চায় আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতার কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আবেদনক্রমে ১৭৮০ সালে আরবি ও ফার্সি শিক্ষার প্রসারকল্পে কোলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। কাশীর প্রশাসক জনাথন ডানকান ১৭৯২ সালে বারানসী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। স্যার উইলিয়াম জোন্স ১৭৮৪ সালে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ১৮০০ সালে লর্ড ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন।[৫]

তবে কোম্পানির প্রশাসক কিংবা কোম্পানির পক্ষ থেকে সরকারি ভাবে উদ্যোগ নেয়ার অনেক পূর্বেই বাংলায় বেসরকারিভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের কাজ শুরু হয়। জনসাধারণের মধ্যে ইউরোপীয় শিক্ষার প্রসার প্রধানত খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টায়

আরম্ভ হয়। বস্তুত বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে খ্রিস্টীয় ধর্ম প্রচারক বা মিশনারীদের অবদান ছিল ব্যাপক ও গভীর। ১৭১৯ সালে "The Society for Promoting Christian Knowledge নামে একটি মিশনারী সমিতি কলকাতায় আগমন করে। এ সমিতির উদ্যোগে ১৭৩১ সালে কলকাতায় একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বাংলায় এটিই হচ্ছে পাশ্চাত্য জাতীয় প্রথম স্কুল।[৬] ১৭৫৮ সালে Zacharich Kierhander নামে সুইডেনের এক পাদ্রী কলকাতায় আরেকটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। অল্পকালের মধ্যেই স্কুলটি জনপ্রিয় হয়েছিল এবং চার মাসের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা ৪০ জন বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৭] ১৭৮০ সালে মি. আর্চার শুধু বালকদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ইয়র্কশায়ারের এক কৃষক সন্তান মি. ব্রাউন কলকাতায় এই সময়ে একটি স্কুল স্থাপন করেন যেখানে হিন্দু ছাত্ররা বেশি সুযোগ পেত। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এদেশীয় জনগণের উপর পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার শুরু হয়।

কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শিক্ষা বিস্তারের দিকে এ সময়ে দৃষ্টি দেয়নি। বরং কোম্পানি খ্রিস্টান মিশনারীদের কাজে বাধার সৃষ্টি করে। মি. ব্রাউন ১৭৮৭ সালে কলকাতায় আসার পর Orphan Institute এর শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি ধর্মযাজক হিসেবে কাজ করছেন এ অভিযোগে অল্প দিনের মধ্যেই কর্তৃপক্ষ তাঁকে অপসারিত করেন।[৮] ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ চার্লস গ্রান্ট ধর্ম ও শিক্ষা প্রচারে সরকারের সহযোগিতা কামনা করলে সরকার তা প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর ১৭৯০ সালে তিনি ইংল্যান্ড গমন করেন। এছাড়া, এই সময়ে ঠমাস নামে এক চিকিৎসক শিক্ষা ও ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করলে কোম্পানি তাঁকে কলকাতা ত্যাগে বাধ্য করে। ফলে তিনিও ১৭৯২ সালে ইংল্যান্ড ফিরে আসেন এবং উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪), চার্লস গ্রান্ট প্রমুখকে নিয়ে ১৭৯৩ সালের অক্টোবরে ব্যাপ্টিস্ট মিশন সোসাইটি নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।[৯] কোম্পানির বিরোধিতা সত্ত্বেও মিশনারীদের মধ্যে কোন হতাশা আসেনি। তারা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য উইলভার ফোর্স ও চার্লস গ্রান্টের নেতৃত্বে ভারতে মিশনারীদের প্রবেশাধিকার এবং ধর্ম ও শিক্ষা প্রচারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। শিক্ষাবিদ মিশনারীগণ হিন্দু সম্প্রদায়ের সতীদাহ, শিশু সন্তান হত্যা প্রভৃতি কুসংস্কার দূর করতে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার ও খ্রিস্টধর্মের প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন।[১০] মিশনারীদের দাবি ১৭৯৩ সালের চার্টারে বাস্তবায়নের জন্য উইলভার ফোর্স পার্লামেন্টে আবেদন করলে তা কার্যকর হয়নি। কোম্পানির ডাইরেক্টরগণ তখন ইংরেজি শিক্ষা প্রচারের বিরুদ্ধাচরণ করেন।[১১]

পার্লামেন্টে সমর্থিত না হলেও উইলভার ও গ্রান্টের অদম্য প্রচেষ্টায় কেরি, জন ক্লার্ক ম্যার্শম্যান (১৭৯৪-১৮৭৭), উইলিয়াম ওয়ার্ড প্রমুখ মিশনারীগণ গোপনে অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে বাংলায় আগমন করেন এবং ১৮০০ সালে তাঁরা শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন

করেন।[১২] এই সময়ে গভর্নর ওয়েলসলিও তাঁদেরকে বিনা দ্বিধায় পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। যদিও তখন পর্যন্ত শিক্ষার ব্যাপারে কোন আইন তৈরি হয়নি। ওয়েলেসলি উইলিয়াম কেরিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন।[১৩] এ অবস্থায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টও ভারতবাসীর শিক্ষার ব্যাপাবে বেশিদিন উদাসীন থাকতে পারেনি। প্রধানত খ্রিস্টান মিশনারী ও তাদের সমর্থনে অন্যান্য মহলের পক্ষ থেকে দাবির মুখে শেষ পর্যন্ত ১৮১৩ সালের চার্টারে ভারতীয় শিক্ষাখাতে বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত হয় এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কোম্পানিকে মিশনারীদের কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার নির্দেশ দেন।[১৪]

১৮১৩ সালের পর মিশনারীদের তৎপরতা পুরোদমে শুরু হয় এবং সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিগণের সহায়তায় তাঁরা দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদ থেকে ১৮১৩ সাল পর্যন্ত খ্রিস্টান মিশনারী ও কিছু মানবতাবাদী ইউরেশিয়ান কর্তৃক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে বেশ কয়েকটি স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। এগুলোর ভেতর কলকাতার কবরখানার কাছে জর্জ ফার্লির স্কুল, কসাইটোলা স্ট্রীটে মি. হোমসের একাডেমি, মি. ড্রামন্তের ধর্মতলা একাডেমি, ক্যানিংহামের ক্যালকাটা একাডেমি, শোরবোর্নের স্কুল এবং পিট্রাস, ড্রেপার ও ডঃ ইয়েট্সের স্কুল ছিল উল্লেখযোগ্য।[১৫] তবে ১৮১৩ সালে কোম্পানির অনুমতি পাওয়ার পর থেকে শ্রীরামপুরসহ অন্যান্য মিশনারী সংগঠনগুলোর শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এক সূত্রে জানা যায় যে, লন্ডন মিশনারী, শ্রীরামপুর মিশন, চার্চ মিশন ও সোসাইটি ফর প্রমোটিং খ্রিস্টান নলেজ প্রভৃতি মিশনারী সমিতিগুলোর উদ্যোগে ১৮১৪ হতে ১৮১৮ সালের ভিতর কলকাতা, ঢাকা, বর্ধমান, যশোর, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, হুগলীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ১৮০টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং যেগুলোর ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৩,৩৪৭ জন।[১৬]

খ্রিস্টান মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রম দেশীয় জনগণের মধ্যে বিশেষত বাঙালি হিন্দু সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করে, যার ফলে এক পর্যায়ে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়ে উঠে। স্কটল্যান্ডের অধিবাসী ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২) নামক এক উদারচেতা ও বিচারপতি এডওয়ার্ড হাইডইস্ট এর উদ্যোগে ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের ক্ষেত্রে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে গণ্য করা হয়।[১৭]

১৮৩০ সালে স্কটিশ মিশনারী রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফ কলকাতায় আসার পর মিশনারীদের প্রচেষ্টায় ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের নতুন বেগ সঞ্চারিত হয়। ডাফ ১৮৩০ সালে কলকাতায় ফিরিঙ্গী কমল বোসের গৃহে জেনারেল এসেম্বলীজ ইনস্টিটিউশন

নামে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে ১৮৩৫ সালে এটি তাঁর নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে পরিণত হয়।[১৮] এছাড়া, এই সময়ে জেসুইট মিশনারীগণ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।[১৯] এর ফলে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার অনেক সহজতর হতে থাকে।

অন্যদিকে, ১৮২৩ সালে কোম্পানি সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য General Committee of Public Instruction গঠন করেন। ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট উক্ত কমিটিকে বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা শিক্ষাবাবদ খরচের নির্দেশ দেয়। এই টাকা কিভাবে ব্যয় হবে তা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। কারণ, কোম্পানি সরকার শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নিলেও কোন শিক্ষার মাধ্যমে এই টাকা ব্যয় হবে কিংবা শিক্ষার প্রকৃতিই কি ধরণের হবে - এ ব্যাপারে সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছিল না, যার ফলে সরকারিভাবে অর্থ বরাদ্দ হলেও পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে এতদিন তেমন কার্যক্রম হয় নি। কিন্তু ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট জেনারেল কমিটিকে দশ লক্ষ টাকা প্রদান করলে কোন শিক্ষার পিছনে এই টাকা ব্যয় হবে তা নিয়ে সদস্যদের মধ্যে মতভেদ শুরু হয়। কমিটির পাঁচজন সদস্য প্রাচ্যবিদ্যার পক্ষে এবং বাকি পাঁচজন পাশ্চাত্য শিক্ষা দেয়ার পক্ষে অভিমত পেশ করেন। এ মতভেদই ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে Anglicist Orientalist Controversy বলে খ্যাত। শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে কমিটিতে মতভেদ থাকলেও একটি বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল না। তাঁরা সবাই মনে করতেন যে, এ দেশে প্রথম শুধু উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং পরে তা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।[২০]

কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমর্থকদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। প্রাচ্য শিক্ষার সমর্থকগণ মনে করেন যে, ভারতীয়দের জন্য তাদের প্রাচীন শিক্ষা বজায় রাখা উচিত এবং এ শিক্ষার সাথে তাদের নিজেদের ভাষায় কিছুটা ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করলে তারা উপকৃত হবে। পাশ্চাত্যপন্থীগণ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।[২১] কোম্পানির কর্মকর্তাদের অধিকাংশই ও দেশীয় জনগণ তথা বাঙালি হিন্দু সমাজও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি জানান। হিন্দু সমাজের মধ্যে এ ব্যাপারে রামমোহন রায় অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেন।[২২] এ অবস্থায় খ্রিস্টান মিশনারীগণও ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম ও সরকারি ভাষা করার দাবি জানান। মিশনারীগণ মনে করেন যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান লাভ করলে হিন্দুগণ মূর্তি পূজার অসারতা বুঝতে পারবে ও তাদেরকে খ্রিস্ট ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করা যাবে। এ ব্যাপারে আলেকজান্ডার ডাফ প্রধান ভূমিকা পালন করেন।[২৩]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যপন্থীদের বিতর্কের এ পরিস্থিতিতে ১৮৩৪ সালে সুপ্রিম কাউন্সিলের

আইন উপদেষ্টা লর্ড টমাস ব্যবিংটন মেকলে (১৮০০-১৮৫৯) শিক্ষা পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ঘোর পাশ্চাত্যবাদী। ১৮৩৫ সালে ২ ফেব্রুয়ারি মেকলে প্রাচ্য শিক্ষার তীব্র বিরোধিতা করে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে অভিমত পেশ করে লর্ড বেন্টিংকের কাছে একটি Minute পেশ করেন।[২৪] বড়লাট বেন্টিংকও নিজে ইংরেজি শিক্ষাকে সরকারি শিক্ষানীতি হিসেবে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মেকলের Minute এর সাথে পুরোপুরি একমত হন এবং ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ এক রেজুলেশনে ঘোষণা করেন যে, এখন থেকে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থ ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যই ব্যয় করা হবে। এর দুই বৎসর পর ১৮৩৭ সালে ফার্সির স্থলে ইংরেজি রাজভাষা হিসেবে কার্যকর হয়[২৫] এবং ১৮৪৪ সালে সরকারি চাকরির যোগ্যতা হিসেবে ইংরেজি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়।[২৬] পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার শিক্ষার উন্নয়নের পদক্ষেপ হিসেবে ১৮৪২ সালে Council of Education গঠন এবং ১৮৫৪ সালে বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উডের শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন, যা Wood's Despatch নামে পরিচিত। উডের Despatch কে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের প্রধান সনদ বা Magna Carta-র সাথে তুলনা করা হয়।[২৭] এ ডেসপ্যাচের সুপারিশেই ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারত উপমহাদেশে সরকারি ও বেসরকারি উভয়ভাবেই পাশ্চাত্য শিক্ষার উৎপত্তি প্রথম বাংলাতেই ঘটে। তবে সরকারিভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার উদ্ভব বিলম্বিত হয় এবং বেসরকারিভাবে খ্রিস্টান মিশনারীদের দ্বারাই প্রথম ইংরেজি শিক্ষার কাজ শুরু হয়। কিন্তু মিশনারীদের পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের পিছনে প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল এদেশীয়দের খ্রিস্টধর্মের দিকে আকৃষ্ট করা এবং এ বিষয়ে ইংরেজ সরকারেব দৃষ্টিভঙ্গীও একই ছিল।[২৮] মিশনারীদের শিক্ষা কার্য্যক্রমের প্রভাব এদেশীয়দের মধ্যে বিশেষত বাঙালি হিন্দু সমাজের একাংশের উপর এতবেশি পড়েছিল যে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী, লালবিহারী দে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ প্রকাশ্যভাবে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। অনারা ধর্ম ত্যাগ না করলেও খ্রিস্টান ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন।[২৯] ১৮৫৪ সালের পর থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে সরকারি কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলে মিশনারীদের প্রচেষ্টার গুরুত্ব ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। তবুও বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা ও প্রসারের ক্ষেত্রে খ্রিস্টান মিশনারীদের অবদান চিরস্মরণীয়। প্রধানত মিশনারীদের আন্দোলনের ফলেই ব্রিটিশ সরকার বাংলায় ১৮১৩ সালে শিক্ষা বিস্তারের কাজ প্রথমবারের মত শুরু করেছিলেন এবং পরে ১৮৩৫ সালে ইংরেজির মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

সূত্রনির্দেশ

১। ফার্সির প্রতি অনুরুক্তির কারণগুলোর জন্য বিস্তারিত দেখুন, M. A. Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, Vol. I, Karachi, 1967, p. 149-160.

২। W. Adam, *Reports on the State of Education in Bengal*, Anath Nath Basu (ed.), Calcutta University, 1941, p. 156.

৩। সুশীল কুমার গুপ্ত, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ*, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃঃ ১৫৪।

৪। Syed Mahmood, *A History of English Education in India (1781-1893)*, Aligarh, 1895, p. 2.

৫। সুশীল কুমার গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৫।

৬। কাজী আব্দুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, প্রথম খন্ড, রাজশাহী, ১৯৬১, পৃঃ ৮।

৭। ঐ, পৃঃ ৯।

৮। J. C. Marshman, *Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, Vol-II, London, 1859, p. 27.

৯। Ibid., p. 16, 32.

১০। যোগেশ চন্দ্র বাগল, *ডিরোজিও*, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ১৪-১৫।

১১। Syed Mahmood, *op.cit.*, p.2.

১২। Mohammad Mohar Ali, *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities (1833-1857)*, Chittagong, 1965, p. 2.

১৩। মৌলানা নূর মোহাম্মদ আযমী, 'ইংরাজী শিক্ষার গোড়ার কথা,' *মোহাম্মদী*, ২২শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, পৃঃ ৪৫৮।

১৪। মোহাম্মদ আজিজুল হক, *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা*, অনুবাদ - মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ১০।

১৫। স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬)*, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ৯-১০।

১৬। সুনীল কুমার চ্যাটার্জী, *বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তার পরিজন*, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ১৯।

১৭। রাজ নারায়ণ বসু, *হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত*, কলিকাতা, ১৩৭৬, পৃঃ ২০।

১৮। Mohar Ali, *op.cit.*, p. 5.

১৯। স্বপন বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৬৯।

২০। A. R. Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal, 1757-1856*, Dacca, 1977. p. 225-231.

২১। *Ibid.*, p. 224-225.

২২। H. Sharp (ed.), *Selections from Educational Records (1771-1839)*, Part-I, Calcutta, 1920, p. 99-101.

২৩। Abdul Karim, *Muhammadan Education in Bengal*, Calcutta, 1900, p. 2-3, Mohar Ali, *op.cit* , p. 57-60.

২৪। দ্রষ্টব্য, Thomas Babington Macaulay, *Minutes on Education in India*, written in the year 1835, 1836 and 1837, by H. Woodrow, Calcutta, 1862.

২৫। H. Sharp, *op. cit.*

২৬। J. A. Richey (ed.), *Selection from Educational Records (1840-1859)*, Part-II, Calcutta, 1922, p. 90.

২৭। *Despatch from the Court of Direction of the East India Company to the Government General of India in Council on the subject of the Education of the people of India*. Simla, 19th July, 1854, ধারাগুলোর জন্য দেখুন, p. 1-4.

২৮। বিস্তারিত দেখুন, T. B. Macaulay, *Minutes on Education, op cit.*

২৯। দ্রষ্টব্য, রাজনারায়ণ বসু, *একাল আর সেকাল*, কলিকাতা, ১৯৫১।

সংরক্ষণ, সংহতি ও রাধাকমল

অশ্রুরঞ্জন পান্ডা

আলোচ্য নিবন্ধের পটভূমি হল ভারতবর্ষ। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরেও সংহতির সমস্যা সমান পীড়াদায়ক এবং সংহতির প্রতিবন্ধক হিসাবে যে সমস্ত উপাদান মদত যুগিয়েছে তার মধ্যে 'সংরক্ষণ' হল অন্যতম। এখানে সংরক্ষণ বিষয়টির ইতিবাচক, নেতিবাচক অর্থ আলোচিত হয়েছে এবং ভারতের যথার্থ সংহতি অর্জন কীভাবে সম্ভব তার একটি রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ, মানবতাবাদী রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯৬৮) তাঁর বিভিন্ন লেখায় এই সংহতির আদর্শটি কীভাবে তুলেধরেছেন তা আলোচনা করতে প্রয়াসী হয়েছি।

এক

সংরক্ষণ ঃ 'সংরক্ষণ' শব্দটির সাধারণ অর্থ হল কোন কিছুকে রক্ষা করা, যা পিছিয়ে আছে ও অবহেলিত তাকে উন্নতির পথে এগোতে সাহায্য করা। স্বাভাবিকভাবেই শব্দগত অর্থে 'সংরক্ষণ' শব্দটির মধ্যে দোষের কিছু নেই। কিন্তু এই সংরক্ষণ যখন অবৈজ্ঞানিকভাবে, অপাত্রে করা হয় তখন তা একদিকে যেমন অনৈতিক, অবাঞ্ছিত, তেমনি সমাজ তথা রাষ্ট্রের ক্ষতিকারক ও বিভেদকামী। সংরক্ষণের বিষয়টি ভারতের সমাজজীবনের বিভিন্ন দৃষ্টিকাল থেকে আলোচন করা যায়।

(ক) ভাষা - ভাষার ক্ষেত্রে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রত্যেকেই তার মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বোচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবে এবং নিজেকে বিকশিত করতে ও নিজ নিজ সংস্কৃতির উন্নতি সাধনে যত্নবান হবে এটাই কাম্য। কিন্তু ভাষাকে কেন্দ্র করে যখন সঙ্কীর্ণ রাজনীতি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তখন তা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। তেলেগু ভাষী অন্ধ্র রাজা পতি শ্রীমারুলুর আত্মাহুতির ফসল, বোম্বাই কে ভেঙ্গে ১৯৬০ সালে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট করা হয়েছে, ১৯৬৬ তে পাঞ্জাবকে ভেঙ্গে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা দুটি রাজ্যের সৃষ্টি ও চন্ডীগড়কে কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়েছে।[১] এরপর উত্তর পূর্বাঞ্চলেও নাগাল্যান্ড, মনিপুর, মিজোরাম, অরুণাচল প্রভৃতি ছোট ছোট রাজ্য গোষ্ঠীগত স্বার্থের ফসল। সম্প্রতি রাজনৈতিক ও গোষ্ঠীগত আন্দোলনের ফল হিসাবে ঝাড়খন্ড, ছত্রিশগড়, উত্তরাঞ্চল রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনগত প্রয়োজন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ন্যায্য দাবী কোন কোন ক্ষেত্রে যথার্থ সংরক্ষণের বিষয় হলেও যখন রাজনৈতিক ক্ষুদ্রস্বার্থে

ছোট ছোট রাজ্য তৈরি হয় তখন তা আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিকর তো বটেই, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশও সৃষ্টি করে।

(খ) ধর্ম ঃ ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, সংবিধানেও তা স্বীকৃত। এখানে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিরপেক্ষ আম্পায়ারের মত। দুর্ভাগ্যবশত এখানেও পরোক্ষভাবে ধর্মের নামে একধরণের রক্ষণশীলতা কদর্যভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। শাহবানু মামলায় আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায় শরীয়াতী আইনের নজির তুলে ধরে সঙ্ঘাত সৃষ্টি করেছে এবং অভিন্ন দেওয়ানী বিধি গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করেছে।[২] অনুরূপভাবে সুপ্রীমকোর্টের নির্দেশে অযোধ্যার বাবরি মসজিদ সংলগ্ন বিতর্ক এলাকার বাইরে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে মৌলবাদী বিশ্বহিন্দু পরিষদ বাধ্য হলেও শিলা অধিগ্রহণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ভারপ্রাপ্ত জনৈক অফিসারের অযোধ্যায় আসা এবং শিলা গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের বিরোধী।

আবার ধর্মান্তরিতকরণের ক্ষেত্রে 'সংরক্ষণ' একান্ত অনুচিত। তামিলনাড়ুতে জয়ললিতা সরকার এই সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আইনও পাশ করেছে। কেউ নিজ ধর্মের ক্ষেত্রে অত্যাচার ও অবিচারের সম্মুখীন হলে অন্য ধর্মমত গ্রহণ সে বিবেকের ইচ্ছানুয়ায়ী করতেই পারে। সাম্প্রতিক কালে মধ্যপ্রদেশে 'উচ্চবর্ণের' হিন্দুদের দ্বারা নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা লাঞ্ছিত হওয়ার ফলে অন্য ধর্মের প্রতি তারা আকৃষ্ট হয় এবং যা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তিসঙ্গত, যদিও ধর্মগত দিক থেকে যারা লাঞ্ছিত সরকারের তাদের রক্ষাকরার ব্যর্থতাও সমান দোষের। তবে চাকুরী পাইয়ে দেওয়া, সামাজিক পদমর্যাদার উন্নতি প্রভৃতি টোপ দেওয়া অন্যায়।

(গ) জাতপাত ঃ সংরক্ষণের সবচেয়ে বড় ত্রুটিপূর্ণ দিক হল জন্মের ভিত্তিতে জাতপাতের সংরক্ষণ। সংবিধানের ষোড়শ অধ্যায়ে তফসিলী জাতি, তফসিলী উপজাতি, ইঙ্গভারতীয় সম্প্রদায়ের সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। (৩৩০নং অনুচ্ছেদ — ৩৪২নং অনুচ্ছেদ)।[৩]

তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতিদের জন্যে লোকসভায় এবং রাজ্যবিধান সভাগুলিতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে লোকসভায় তফসিলী জাতির জন্য ৭৯ টি ও তফসিলী উপজাতির জন্য ৪০ টি আসন এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে এই সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা যথাক্রমে ৫৫৭ ও ৩০৩।

চাকরির ক্ষেত্রে তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণও সংবিধানে করা হয়েছে (৩৩৫ নং অনুচ্ছেদ)। ১৯৭৯ সালে জনতা সরকারের আমলে ১লা জানুয়ারী পশ্চাদপদ শ্রেণীগুলির জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। যেহেতু এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বি. পি. মন্ডল, তাই এই কমিশন মন্ডল কমিশন নামে

পরিচিত। এই কমিশন ১৯৮০ সালের ৩১ ডিসেম্বর রিপোর্ট পেশ করে। এরপর এই কমিশনের রিপোর্ট চাপা পড়ে যায়। পরে নবম সাধারণ নির্বাচনের পর ভি. পি. সিং এর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় ১৯৯০ সালের আগস্টে ভি. পি. সিং মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট রূপায়ণে সচেষ্ট হন এবং তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে অনগ্রর অন্যান্য শ্রেণীসমূহের জন্যও ২৭% চাকুরী সংরক্ষিত থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়। প্রসঙ্গত সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে ৫০% এর বেশী সংরক্ষণ করা যাবে না। প্রসঙ্গত কয়েকটি রাজ্য এর অনেক বেশী সংরক্ষণ করতে সচেষ্ট হয়েছিল।

আবার ও. বি. সি বা অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর মধ্যে কারা অন্তর্ভুক্ত হবে তা নিয়েও পন্ডিতদের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক বিতর্ক দেখা দেয়।[৪]

আবার এই সংরক্ষণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রেও গ্রহণ করা হয়েছে।

সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে জাতপাতের ভিত্তিতে যাদের সংরক্ষণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই আর্থিক দিক থেকে যথেষ্ট সঙ্গতিসম্পন্ন। তাদের সন্তান সন্ততিরা যোগ্যতামানের অনেক নীচে থেকেও এই সব সুযোগ লাভ করে। এর ফলে সমাজে বৈষম্য, অশান্তি দেখা দেয়, একসময়ে এই সংরক্ষণে বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং এমনকি আত্মাহুতিও ঘটে।

(ঘ) মহিলাদের সংরক্ষণ ঃ পঃবঙ্গে স্বায়ত্ত্ব শাসন ব্যবস্থায় মহিলাদের এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা কার্যকরী হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার পার্লামেন্টে ও রাজ্য আইন সভাগুলিতে মহিলাদের এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করার জন্য আহূত সর্বদলীয় বৈঠক শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। রাষ্ট্রীয় জনতাদল, সমাজবাদি পার্টি মহিলাদের মধ্যে আবার পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে আসন সংরক্ষণে অনড় থাকে।[৫]

ভারতে জনসংখ্যার পুরুষ নারীর অনুপাত প্রায় ৫৪-৪৬। সেই তুলনায় এক তৃতীয়াংশ বা ৩৩% সংরক্ষণ একদিক থেকে কাম্য, কারণ পুরুষ শাসিত সমাজে এতদিন মহিলাদের রাজনীতিতে আসার পথে বাধাই সৃষ্টি করা হয়েছে।

দুই

সংহতি ঃ 'সংহতি' শব্দের ভাবার্থ হল সমন্বয়, ঐক্য, সম্প্রীতি, প্রগতির মিলিত রূপ। কোন দেশের সংহতি বলতে সেই দেশের সামগ্রিক ঐক্য ও উন্নতিকে বোঝায়। ভারতের সংহতির ক্ষেত্রেও তা সমান প্রযোজ্য। কিন্তু ভারতের জাতীয় আয়ের, উৎপাদনের উন্নতি ঘটলেও তার প্রতিফলন সামগ্রিক ভাবে ঘটেনি।

অবৈজ্ঞানিক সংরক্ষণের ফলে সংহতির পথে যে প্রতিবন্ধকতা দেখা গিয়েছে তা দূর করে সংহতির পথ মসৃণ করা দরকার।

i) ভাষাভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন বর্জনীয়। পরিবর্তে প্রতিটি ভাষাভাষী নাগরিকের যাতে নিজ নিজ মাতৃভাষায় সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ ঘটে তার সংরক্ষণ প্রতিটি রাজ্যে থাকা দরকার।

কোন নাগরিক নিজের মাতৃভাষা, যে রাজ্যে বসবাস করছে সেই রাজ্যের প্রধান ভাষা যদি অন্য হয় তাহলে সেই প্রধান ভাষা ও ইংরাজীকে প্রথম শ্রেণী থেকেই শিখতে শুরু করবে। এইভাবে তার নিজের মাতৃভাধার বিকাশ ঘটবে। যে রাজ্যে বসবাস করছে সেই রাজ্যের সঙ্গে একাত্ম হবে এবং ইংরাজীর মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যোগসূত্রের সুবিধা হবে।

এই সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়স্তরে অভিন্ন সিলেবাস প্রথম শ্রেণী বা প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়স্তর পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে। নিজের মাতৃভাষায় পরীক্ষায় উত্তর লেখার সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত থাকবে। প্রয়োজনে উত্তরপত্র অন্যরাজ্যের ঐ ভাষার ও বিষয়ের যোগ্য পরীক্ষকদের দ্বারা মূল্যায়িত হবে। অবশ্য সিলেবাসের মধ্যে আঞ্চলিক বৈচিত্রগুলিও সংশ্লিষ্ট করা হবে।

ii) ধর্মের ক্ষেত্রে সংহতির স্বার্থে কঠোরভাবে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করতে হবে। কোন ফর্মে ধর্মের কলমটি বাদ দেওয়া দরকার। সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে অভিন্ন দেওয়ানী বিধি গ্রহণ করা হবে। এর ফলে উত্তরাধিকার, সম্মতির মালিকানা, হস্তান্তর, ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতির ক্ষেত্রে সমতা আসবে।

ধর্মান্তকরণের ব্যাপারটি হবে একান্ত ব্যক্তিগত। তবে কোন ধর্মের ক্ষেত্রে বৈষম্য, অত্যাচার, শোষণ, প্রলোভন যাতে না ঘটে ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির মধ্যেই তার সুযোগ সংবিধানে রয়েছে এবং এখানে রাষ্ট্রকে সেই সংরক্ষণের যথার্থ দায়িত্ব নিতে হবে।

ধর্মকে কোন ক্ষেত্রেই প্রশাসনের উপর অবাঞ্ছিত আধিপত্য বিস্তার করতে দেওয়া হবে না। ধর্ম শব্দটির মধ্যে অপবিত্র কিছু থাকতে পারে না। সমস্ত ধর্মের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার মানসিকতা গ্রহণ করতে হবে। 'যত মত তত পথ' শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণীই একান্তভাবে অনুসরণ করতে হবে।[৬]

iii) সংহতির অন্যতম একটি প্রতিবন্ধক হল জাতপাত ভিত্তিতে চাকুরী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ। তফসিলী জাতি, তফসিলী উপজাতি, ও. বি. সি. প্রভৃতি জন্মের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাজন অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। সব মানুষই সমান এই ধারণাকে মানসিক ও আইনগত ভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে।

এক্ষেত্রে দারিদ্র সীমার নীচে যারাই রয়েছে এবং যারা কায়িক ও মানসিক দিক থেকে প্রতিবন্ধী একমাত্র তাদেরই কেবল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বাস্তবপক্ষে যতদিন

না ভারতের সমস্ত জনগণকে ন্যূনতম সভ্যজীবন যাপনের সুযোগ না দেওয়া যাচ্ছে, ততদিন তথাকথিত উপরতলার বৈভব ও ঐশ্বর্যের পরাকাষ্ঠ আমানবিক, অকল্যাণকর। মুখে রক্তের আধিক্য হলে যেমন সুস্থ শরীর বোঝায় না, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠের উন্নতিকে ব্যাহত করে সংখ্যালঘুর আর্থিক উন্নতি যথার্থ সংহতির পথে প্রতিবন্ধকতারই নামান্তর।

iv) সাম্প্রতিক কালে বিশ্বায়ন, বেসরকারীকরণ ও উদারীকরণের প্রভাব ভারতেও পরিলক্ষিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতে শিল্প, কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ যাতে বিদেশী মালিকানার দ্বারা লুণ্ঠিত ও শোষিত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। আমরা এক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করতে পারি। ১৯৮২-র সংবিধানের ১৮নং অনুচ্ছেদে বিদেশী পুজি ও মূলধনকে স্বাগত জানানো হয়।[৮] কিন্তু তারা চীনের জাতীয় স্বার্থকে বজায় রেখে, যৌথ অংশীদারী কারবারের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এই বিদেশী পুঁজিকে স্বাগত জানিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের স্বার্থও সুরক্ষিত করা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি যাদের এক সময় 'এশিয়ার বাঘ' বলা হতো তাদের মতো ভারতের হাল যাতে না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। স্বদেশী জাগরণকে এইদিকে পরিচালিত করতে হবে যাতে দেশীয় উৎপাদিত দ্রব্য তার গুণগত মান বজায় রাখে এবং আরও বেশী করে তা লোকে কেনে।

সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমান্তরাল কালো টাকাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে হবে। ন্যায্য লাভে ব্যবসা তার মালিক যেই হোক তা একান্ত কাম্য; কিন্তু ব্যবসার নামে শোষণ, ভেজাল, দুর্নীতিকে আদৌ বরদাস্ত করা হবে না। এদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দরকার এবং এদের সামাজিক বয়কটকরতে হবে। সম্প্রতি বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি রাজনৈতিক দলগুলিকে অর্থ সাহায্য চেকের মাধ্যমে করবে বলে আলোচনা হচ্ছে। ধান্দাবাজ রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে ব্যবসায়ীদের এই আঁতাত পার্লামেন্টের গণতন্ত্রে অবস্থিত।

v) সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ যা ভারতের অভ্যন্তরে বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে লাগাতার অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছে এবং এর সঙ্গে জম্মু কাশ্মীরের সন্ত্রাস মূলক অভ্যন্তরীণ ঘটনাগুলি জাতীয় সংহতির যে প্রতিবন্ধক আমরা সবাই জানি। বিদেশী রাষ্ট্রগুলির উস্কানি, মদত এবং ষড়যন্ত্রকে মেনে নিয়েও, আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই সন্ত্রাসবাদীদের বিচ্ছিন্ন করতে হবে। দার্জিলিং এ গোর্খাপরিষদকে যেভাবে কাজ করার স্বাতন্ত্র দেওয়া হয়েছে অনুরূপভাবে এই সব অঞ্চলেও এর সম্প্রসারন ও সংরক্ষণ দরকার যাতে এই সন্ত্রাসবাদীরা দায়িত্ব বহন করে মূলস্রোতে ফিরে আসতে পারে।

vi) নারী-পুরুষের সমতা যাতে যথার্থভাবে অর্জন করা যায় তার জন্যে নারীদের জীবনের সর্বস্তরে সুযোগ বাস্তবে দিতে হবে। শুধু আইন করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের আসন সংরক্ষিত করাই বড় কথা নয় কারণ পুরুষ শাসিত রাজনৈতিক দলগুলি বকলমে

নিজেদের স্ত্রী, কন্যা, বোন ও অন্যান্য আত্মীয়দেরই প্রার্থী খাড়া করেছে এবং তা পঃবঙ্গে স্বায়ত্ব শাসনের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে। রাজনৈতিক দলের বাইরেও যাতে সাধারণ নাগরিক সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই পরিবেশ দরকার। হিংসার মাধ্যমে পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রকে বজায় রাখা যায় না। অ-রাজনৈতিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি যারা কল্যাণমূলক কাজে নিবেদিত তাদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

রাধাকমলের দৃষ্টিভঙ্গী ঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯৬৮) ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে এক অগ্রণী ব্যক্তিত্ব যিনি অর্থনীতি, রাজনীতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি জনসংখ্যাবিদ্যা, পরিবেশতত্ত্ব এবং সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রেখে গেছেন যা ভারতীয় সংহতি অর্জনের ক্ষেত্রে বর্তমানেও সমান উপযোগী।

(ক) রাধাকমল হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মেল বন্ধনের সুমধুর দিকটি তুলে ধরেছেন। গ্রাম বাংলার উৎসব অনুষ্ঠান - যেমন দুর্গাপূজা, মহরমে উভয় সম্প্রদায়ের আনন্দময় সমাবেশ, মানিকপীরের দরগায় উভয় সম্প্রদায়ের যোগদান, বিভিন্ন তরজা, কবির লড়াই, কৃষিজ উৎসব অনুষ্ঠান - পৌষ পার্বন, ভূমিপূজা প্রভৃতিতে সব সম্প্রদায়ের সানন্দ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এমনকি বিভিন্ন জাতপাতের মধ্যে তো বটেই বিভিন্ন ধর্মের অনুগামীদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলার মানসিকতা রাধাকমল দেখিয়েছেল।[৮]

খ) কৃষির উন্নতিতে তিনি সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করেছেন যা আধুনিক কৃষির বিকাশে সমান প্রযোজ্য। চাষীদের যথার্থ উন্নতির ক্ষেত্রে তাদের মালিকানা ভূমি বিতরণ ও বর্গাদার ব্যবস্থার মাধ্যমে সুনিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে চাষআবাদের কাজটি সমবায়ের মাধ্যমে করা দরকার — এতে চাষীর উদ্বেগ কমবে, আর্থিক প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করা যাবে এবং সর্বোপরি উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটবে।[৯]

কৃষিকে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাধাকমল ক্ষুদ্রশিল্প, বৃহৎশিল্প উভয়ের উপরই প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিশ্বায়ন, উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ রাধাকমলের সময়ে প্রাধান্য বিস্তার করেনি। কিন্তু তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের শুভ দিকগুলি সমবায়ের মাধ্যমে মিলন ঘটিয়েছেন এবং 'কমিউনিজম' বা 'সমবায়বাদে'র মাধ্যমে ভারতীয় সমাজজীবনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন।[১০]

বস্তুতঃপক্ষে রাধাকমল তাঁর জন্মস্থান বহরমপুরে এবং মুর্শিদাবাদের অন্যত্র অনেক সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন।

আঞ্চলিকতাতত্ত্বে রাধাকমল একজন পথিকৃৎ বলে সমাজবিজ্ঞানী রস (Ross) মনে করেন, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যগুলিকে জাতীয় সংহতির সঙ্গে সামঞ্জস্যমূলকভাবে তুলে ধরেছেন।

বাংলার অর্থনীতিতে নদীমাত্রিক অর্থনীতির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। রাধাকমলের গঙ্গানদীর উৎস, বিস্তারের উপর মৌলিক গবেষণা আজও নদীর দূষণরোধে সমান গুরুত্বপূর্ণ; সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশবিদ্যা, জনসংখ্যার বিষয়টি আন্তর্জাতিক পরিবেশবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করেছেন।[১১]

সমাজে পুরুষ ও নারীর সমান গুরুত্ব, পারস্পরিকতার বিষয়টি রাধাকমলের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে পিছিয়ে পড়া মানুষদের শিক্ষার বিষয়টি একান্ত জরুরী। তাই নন ফরম্যাল শিক্ষার দিকে তিনি জোর দিয়েছিলেন এবং সান্ধ্যকালীন শিক্ষা ও বয়স্কদের শিক্ষা প্রকল্প কলকাতার বিভিন্ন বস্তিতে রাধাকমল শুরু করেন। বস্তুতঃ পক্ষে প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন সময়েই তিনি এই প্রকল্পে যুক্ত হয়েছিলেন। 'শিক্ষাপ্রচাব' নামে একটি বইও তিনি লেখেন এবং বিনামূল্যে তা বিতরণ করেন।[১২]

বিশ শতকের গোড়ায় স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিঝরা দিনগুলিতে রাধাকমল মানসিকভাবে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ক্ষুদিরামের ফাঁসি সমাজজীবনে যে প্রভাব এনেছিল রাধাকমল তার উল্লেখ করেছেন। বিনয় সরকারের সঙ্গে একত্রে দেশের উন্নতির ক্ষেত্রে বহুবিধ আলোচনা করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে কিছুদিন কে. এন. কলেজে, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদালয়ে সমাজতত্ত্ববিভাগে ১৯২১ এ যোগ দেন এবং পরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে অবসর নেন।[১৩]

পরাধীন ভারতে দেশের উন্নতির জন্যে তিনি তাঁর অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা, পরিবেশবিদ্যা, রাজনীতি, পৌরবিদ্যা, গ্রামীণ পুনর্গঠন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে সব বই লেখেন সেগুলি তাঁর সযত্ন অভিজ্ঞতার ফসল এবং এগুলির মধ্যে জাতীয় উন্নয়ন ও সংহতির মূল সুরটি নিহিত ছিল।[১৪]

স্বাধীনতার পর ভারতের পরিকল্পনার যুগে রাধাকমল প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হন। সরকারের বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রকল্পে সদস্য হিসাবে তাঁর মূল্যবান মতামত তুলে ধরেন। উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন আর্থিক উন্নয়নে তাঁর অবদান পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া বিহার, লক্ষ্ণৌ, দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষণার কাজে তিনি বিভিন্নভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর 'Indian Working Class' বইটি (১৯৫১) শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অবদান।[১৫]

শুধুমাত্র আবার আর্থিক উন্নতিই নয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি যাতে দেশের জনগণের মধ্যে গড়ে ওঠে সেদিকেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাই নৈতিক মূল্যবোধের বিষয়টিও তাঁর 'Dynamics of Morals,' (১৯৫১) 'The Social Structure of Values' (১৯৪৯) প্রভৃতি বইয়ে আমরা লক্ষ্য করি। তাঁর 'The Indian Scheme of Life,'

(১৯৫১) বইয়ে বিভিন্ন উদ্বেগ, সামাজিক বিদ্বেষ প্রভৃতিকে কীভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে অতিক্রম করা যায় এবং একটি সার্বজনীন নৈতিকতা ও ধর্মবোধের দ্বারা ভারতীয় জীবনধারা কীভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত তাঁর হদিশ আমরা এখানে পাই। তাঁর 'The Philosophy of Social Science' (১৯৬০) 'Borderlands of Economics' (১৯২৫) প্রভৃতি বইগুলিতে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যে পারস্পরিকতা ও সম্পর্ক রয়েছে তার পরিচয় আমরা পাই। আবার নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পকলার দিক থেকেও রাধাকমলের জাতীয় সংহতি ও ভাবনা আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে। তাঁর 'The Social Function of Art' (১৯৪৮), 'The Flowering of Indian Art' (১৯৬৪), 'The Cosmic Art of India' (১৯৬৫) প্রভৃতি বইয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংহতির বহু বিচিত্ররূপ আমরা পাই।

এককথায় রাধাকমলের চিন্তাভাবনায় ব্যক্তি, সমাজ, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিকতার এক সমন্বয় দেখা গিয়েছিল যা আজকের যুগে একান্ত প্রয়োজনীয়।

সূত্রনির্দেশ

১। S. L. Sikri. *Indian Government & Politics* (1997) Chap XV, Language Politics in India. p-305.

২। S. L. Sikri. পূর্বোক্ত Chap. 'Communalism in India'. p-280.

৩। - *Constitution of India*, Govt. of India Publication New Delhi. Chapter on Minorities, Scheduled Castes of Tribes.

৪।(ক) দুর্গাদাস বসু, 'ভারতের সংবিধান পরিচয়' (১৯৯৪), ২৯ অধ্যায়, সংখ্যালঘু, তফসিলীজাতি ও উপজাতি, পৃঃ ৪৩১।

৪।(খ) অনাদি মহাপাত্র, *ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি (২০০০)*, অধ্যায় ২৯ - অনগ্রসর সংখ্যালঘু শ্রেণী সমূহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, পৃঃ ৯৫৩, ৯৫৮।

৫। অনাদি মহাপাত্র, পূর্বোক্ত অধ্যায় ৩৬, ভারতের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ পৃঃ ১৩৫৫-৫৬।

৬। *দা টেলিগ্রাফ*, ২৪.৬.০৩ - এটর্নি জেনারেল সোলি সোরাবজির গুজরাট ও তামিলনাড়ু সরকারের ধর্মান্তরিতকরণের আইনের বিরোধিতা।

৭। *Constitution of the People's Republic of China* (2nd Ed, 1990), Published by Foreign Language Press, Beijing, Article - 18

৮। *The Frontiers of Social Science*, In honour of Radhakamal Mukherjee (1955). Ed. by Baljit Singh. Article by Radhakamal - 'Paths & Influences' (Macmillan & Co Ltd, London)

৯। Radhakamal Mukherjee, *Regional Sociology* (1926). p-53. New York. London.

১০। Radhakamal Mukherjee. *The Foundations of Indian Economics* (1916). London. Long mans Green & Co. p- 391-393. 397. 399. 403. 404.

১১।(ক)Radhakamal Mukherjee. 'Regional Sociology (1926) p-15.

১১।(খ) Radhakamal Mukherjee. *Changing Face of Bengal a Study in the Riverian Economy (1938)*. p- 2. 12. 14. 17. 73. 195. (C. U. Publication)

১১।(গ) Radhakamal Mukherjee. *Regional Balance of Man (1938)* - Preface & Introduction (University of Madras).

১১।(ঘ) Radhakamal Mukherjee. *Social Ecology (1940)* (Longman Green & Co Calcutta. Chap- VIII. IX. p- 221.

১২। Frontiers of Social Science - article by Radhakamal 'Paths & Influences' Ed. by Baljit Singh.

১৩।(ক) Satyendranath Ganguli. *In Memoriam* (Published by Radhakamal Memorial Committee, Gorabazar. Berhampur)

১৩।(খ) *Economic & Political Weekly*. Aug 18, 1986. Bombay - Article on 'Founders of the Lucknow School & this Legacy - Radhakamal Mukherjee & D. P. Mukherjee' by P.C. Joshi.

১৪।(ক)Radhakamal Mukherjee. *Civics* (1926). Preface (Longman. Green & Co.. Calcutta.

১৪।(খ) Radhakamal Mukherjee. *The Philosophy of Social Science (1960)*. p-6. 11-12. 108 (London. Macmillan)

১৪।(গ) Radhakamal Mukherjee. *Principles of Comperative Economics*. Vol-2. (1923). p-198-200 (London P. S. King)

১৪।(ঘ) Radhakamal Mukherjee. *Rural Economy of India (1926)*. (London. Longman Green & Co.)

১৪।(ঙ) Radhakamal Mukherjee. *Economic Problems of Modern India* (2 Vols. 1939. 1941) London Macmillan.

১৫।(ক)Radhakamal Mukherjee. Preface to Economic Planning in the 2nd Vol. of Economic Problems of Modern India.

১৫।(খ) Radhakamal Mukherjee. Planning the Country Side (1964).

১৫।(গ) Radhakamal Mukherjee. Labour & Planning - "Social Sciences & Planning in India" (ed. by Radhakamal Mukherjee 1970).

রাধাকমল রচিত বাংলা বইগুলি এই প্রসঙ্গে যা উল্লেখযোগ্য তা হল ঃ-

(i) শিক্ষা সেবক, (ii) পল্লীসেবক, (iii) বর্তমান বাংলা সাহিত্য, (iv) মনোময় ভারত (১৩৩০ বঙ্গাব্দ), (v) তরুণের ভারত, (vi) দরিদ্রের ক্রন্দন (১৯১২), (vii) শাশ্বত ভিখারী (১৯১৬), (viii) বিশাল বাংলা (১৩৫২ বঙ্গাব্দ), (ix) বাঙলা ও বাঙালী (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ), (x) নিদ্রিত নারায়ণ (১৩২৭ বঙ্গাব্দ), (xi) মনিমেখলা।

বাংলার রাজনীতিতে পীর আউলিয়া ঃ ১৯০৫-৪৭

মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া

ইতিহাসে এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দশকে বাংলায় ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি ওরফে ইবনে বখতিয়ারের নেতৃত্বে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামের এতদঞ্চলে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা ও পীর আউলিয়ার আগমন মূলত তখন থেকেই।[১] পরে অবশ্য বাংলাদেশেও অনেক পীর আউলিয়া জন্ম গ্রহণ করে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[২]

পীর আউলিয়া সম্পর্কে এ যাবৎ যারা গবেষণা করেছেন ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। কিন্তু তিনি সুফীগণের ব্যক্তিগত জীবনের চাইতে সুফী তত্ত্ব এবং তাদের তরীকার উপরই বেশী আলোকপাত করেছেন। তবুও তিনি বাংলার বিখ্যাত সুফীগণের প্রায় সকলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এ সম্পর্কে পরবর্তী গবেষণার দিক নির্দেশনা দান করেছেন। তার গ্রন্থ *বঙ্গে সুফী প্রভাব* এবং *এ হিস্টোরি অফ সুফীইজম ইন বেঙ্গল* এ সম্পর্কে তথ্য নির্দেশ সম্বলিত গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এছাড়াও সৈয়দ মুর্তাজা আলীর *দি সেইন্টস অব ইস্ট পাকিস্তান*, ডঃ আব্দুর রহিমের *সোস্যাল এন্ড কালচারাল হিস্টোরী অব বেঙ্গল*, রিচার্ড এম ইটনের *দি রাইস অফ ইসলাম এন্ড দি বেঙ্গল ফ্রনটিয়ার*, শেখ আব্দুল লতিফের *দি মুসলিম মিস্টিক মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল* এবং আরো অনেক পুস্তকে পীর আউলিয়া, সুফী সাধকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়।[৩] তবে সম্প্রতি ঢাকা থেকে প্রকাশিত ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ এর ''রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা'' এবং জুলফিকার আহমেদ কিসমতী এর ''আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা'' শীর্ষক পুস্তক সমূহে উলামার কর্তৃক কয়েকটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার বিবরণ তুলে ধরেছেন। কিন্তু তাঁরা এখানে বাংলার খানকা ভিত্তিক পীর আউলিয়ার রাজনৈতিক ভূমিকা ও দর্শনের কোন আলোকপাত করেননি। তবুও এরা এ সমস্ত আউলিয়ার সাংগঠনিক তৎপরতার বিবরণ তুলে ধরে এ সম্পর্কে গবেষণার এক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। যাহোক, এ সমস্ত পীর আউলিয়ার আবির্ভাব ও ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁদের অবদান উদ্‌ঘাটন করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। ইসলামের প্রচার ছাড়াও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যে এদের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তাই এখানে বাংলার রাজনীতিতে বিশ শতকের তিনজন বিশিষ্ট আউলিয়া-শাহা সুফী আবু বকর সিদ্দিকী (১৮৪৬-১৯৩৯), শাহ্ সুফী মাওলানা নিসারুদ্দিন

আহম্মদ (১৮৭৩-১৯৫২) এবং হযরত মাওলানা রুহুল আমীন (১৮৮২-১৯৪৫) এর ভূমিকা আলোচিত হচ্ছে।

শাহ্ সুফী আবুবকর সিদ্দিকী (১৮৪৬-১৯৩৯)

বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলা ভাগ (১৯০৫) ও সর্ব ভারতীয় মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠার (১৯০৬) মধ্য দিয়ে বাংলার পীর আউলিয়াগণ সরাসরি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। আর এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিকী।[৪]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫ খ্রিঃ) সমর্থনের মাধ্যমে ফুরফুরা শায়খ আবুবকর সিদ্দিকী বাংলার রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তিনি বঙ্গ বিভাগের একজন অকুণ্ঠ সমর্থক ছিলেন। বঙ্গবিভাগ বিরোধীদের সন্ত্রাসমূলক অরাজকতাকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন এবং এর নিরসনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তাই কংগ্রেসী তরুণদের বঙ্গবিভাগ বিরোধী আন্দোলনে উদ্ভুত সন্ত্রাসী কার্যকলাপ রোধের উদ্দেশ্যে শাহ্ সুফী আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন।[৫] তাঁর বক্তব্যের সারবস্তু ছিল, যেকোন আন্দোলনে যথাসাধ্য সেই প্রকার কার্য অবলম্বন করবে, যাহা দ্বারা রক্তপাত বা শান্তিভঙ্গেব আশঙ্কা থাকবে না। কেননা, হিংসাত্মক কার্যকলাপ কখনো মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।[৬]

মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকীর রাজনৈতিক কর্মকান্ডের পরবর্তী পর্যায়ে উন্মোচিত হয়েছিল আঞ্জুমানে ওয়ায়েযীন গঠনের মাধ্যমে। তিনি বাংলার আলিমগণকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সংঘবদ্ধ করতে মনস্থ করেন। তার পরামর্শ ও প্রচেষ্টায় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ২২ জানুয়ারি রবিবার কলকাতার গ্রেট পার্কের এক সভায় আঞ্জুমানে ওয়ায়েযীন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৭] তিনি আজীবন এ সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। এ আঞ্জুমানের প্রধান উদ্দেশ্য আলীমগণের মাধ্যমে খাঁটি ইসলামী রীতি-নীতি শিক্ষা দেওয়া ও শরা-শরীয়ত প্রচার করা হলেও এর বিভিন্ন অধিবেশনে দেশ, জাতি ও সমাজ সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবাবলী হলো - (১) জাতি ও ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভাতে মুসলমান, খ্রিস্টান, হিন্দু প্রভৃতি জাতির সমাজবিধি ও ধর্ম নীতির বিরুদ্ধে যেন কোন আইন পাশ না করা হয় এবং বিভিন্ন জাতির সামাজিক ও ধর্মনীতির বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নপূর্বক সমাজ ও ধর্মে হস্তক্ষেপ করে জনসাধারণকে যেন বিচলিত না করা হয়। (২) প্রচলিত প্রজাসত্ত্ব আইন আদৌ প্রজার অনুকূলে না থাকায়, প্রজার প্রকৃত হিতকামীর জন্য অতি সত্ত্বর কাউন্সিলে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে প্রজাসত্ত্ব আইনের সংশোধন করার জন্য সরকারকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা। (৩) ফ্রি প্রাইমারী শিক্ষা বিল বাস্তবায়িত করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা। (৪) অতি সত্ত্বর রেলওয়ে ও সৈনিক বিভাগসহ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সকল চাকুরীতে শতকরা

৩৩ ভাগ এবং বঙ্গীয় সরকারের অধীন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিসহ সমস্ত চাকুরীতে শতকরা ৫৪ ভাগ চাকুরী মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণে সরকারকে অনুরোধ করা।[৮] লক্ষ্যণীয় যে এই প্রস্তাবসমূহ সম্মিলিতভাবে মাওলানা আবুবকর সিদ্দিকীর রাজনৈতিক চরিত্র পরিস্ফুট করে তোলে।

শাহ্ সুফী আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) নিখিল ভারত জমইয়তে উলামায়ে হিন্দের একজন প্রবীন সদস্য এবং প্রাদেশিক জমইয়তের সভাপতি হিসেবে তার স্বাধীন ও সুচিন্তিত মতামত অকুতভয়ে ব্যক্ত করেন। পরবর্তীকালে জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ কংগ্রেস পার্টির অন্ধ অনুসারী হয়ে পড়ায় এবং জমইয়তের কর্মকর্তাদের খামখেয়ালী ফতওয়া প্রদানের কারণে তিনি জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ এর প্রতি সহযোগিতা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রত্যাহার করে নেন। তিনি বাংলার আলেম সমাজকে রাজনৈতিক দিক থেকে সংঘবদ্ধ করার জন্য ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে "জমইয়তে উলামায়ে বাংলা ও আসাম" নামে একটি নতুন স্বতন্ত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।[৯] তিনি মুসলিম লীগের একজন সমর্থক হিসেবে ১৯৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করেন।[১০] এছাড়াও তিনি এদেশের বাঙালী মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে মুসলিম লীগকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তার মৃত্যুর এক বছর পরই ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[১১]

শাহ্ সুফী মাওলানা নিসারুদ্দীন আহম্মদ (১৮৭৩-১৯৫২)

ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) এর মৃত্যুর পর বাংলা আসামে তাঁর যেসব শিষ্য, অনুসারী ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ বিস্তারে ও মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে সংগ্রাম করেন, তাদের মধ্যে শর্ষীণার পীর হযবত মাওলানা নিসারুদ্দীন আহম্মদ[১২] ও বসিরহাটের মাওলানা রুহুল আমীন এর নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

মাওলানা শাহ্ সুফী নিসারুদ্দীন আহম্মদ (রঃ) দেশ ও জাতির কল্যাণে সরাসরি রাজনীতি না করলেও পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন রাজনীতিও ইসলামের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তবে তার এ রাজনীতি ক্ষমতা বা গদী দখলের উদ্দেশ্যে ছিল না। মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য সাধন, ইসলামের উন্নতি বিধান, শরীয়তের প্রচার ও প্রসারকল্পে জমইয়ত ও সমিতি প্রভৃতি গঠন করেন এবং এর মাধ্যমে মুসলমান জাতির সার্বিক খেদমতের প্রয়াস পান। এভাবে তিনি স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতাউত্তোর উভয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে শর্ষীণার পীর মাওলানা নিসারুদ্দীন আহম্মদ মুসলিম লীগ ও জমইয়তে উলামায়ে ইসলামের

মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠান আন্দোলনকে এদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য তৎপর ছিলেন।[১৩] সিলেটের গণভোটের প্রাক্কালে পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য মাওলানা নিসারুদ্দীন আহম্মদ তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ্সহ বহু ভক্তকে সিলেটে প্রেরণ করেছিলেন।[১৪] এছাড়াও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ কর্তৃক হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বাল্য বিবাহ বন্ধের এক আইন[১১] (৫-৭ মার্চ, ১৯৩০ খ্রিঃ) পাশ করা হলে, মাওলানা নিসারুদ্দীন আহম্মদের সভাপতিত্বে জমইয়তে উলামায়ে বাংলার পঞ্চম অধিবেশনে এই আইনের কঠোর সমালোচনা করা হয়। জমইয়তে উলামায়ে বাংলা ও আসাম মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষা, আদর্শ ও শরীয়তের ভিত্তিতে সংগঠিত করছিলেন। তিনি কোন জিঘাংসা ও ধ্বংসাত্মক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই এই জমইয়তে উলামায়ে বাংলা ও আসাম ছিল একটি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান।

স্বাধীনতা বিভাগ পূর্ব স্বাধীকার আন্দোলনে যেমন ছারছীনার শায়খ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তেমনি স্বাধীনতাউত্তোর দেশকে আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য তাঁর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।

হযরত মাওলানা রুহুল আমীন (১৮৮২-১৯৪৫)

বিশ শতকের অন্যতম আউলিয়া মাওলানা রুহুল আমীন[১৬] ছিলেন স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক। তিনি তাঁর মুরশিদ ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমান-ই-ওয়াজিন-ই-বাংলা এ যোগদানের মাধ্যমে বাংলার রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ২২ জানুয়ারি কলকাতার গ্রেটপার্কে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানের প্রতিষ্ঠা সভায় হযরত মাওলানা আবুবকর সিদ্দিকী সভাপতি ও মাওলানা রুহুল আমীন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[১৭] উক্ত সভায় গঠিত আঞ্জুমানের ব্যবস্থাপনা পরিষদ নিম্নরূপ ছিল।

সভাপতি	ঃ	মাওলানা শাহ্ সুফী আবু বকর সিদ্দিকী
সহ-সভাপতি	ঃ	১. হাজী এ কে গজনবী
		২. মাওলানা নাজির হুসাইন
		৩. হাফিজ রাহাত হুসাইন
		৪. মোল্লা এনামুল হক
সম্পাদক	ঃ	হযরত মাওলানা রুহুল আমীন
যুগ্ম-সম্পাদক	ঃ	১. মৌলভী মোঃ শহীদুল্লাহ্, এম. এ. বি. এল
		২. মৌলভী মোঃ আব্দুল হাকিম

সহ-সম্পাদক : ১. মৌলভী আলতাফ হুসাইন-বি.এ
২. মোঃ আব্দুল হালীম
কোষাধ্যক্ষ : মৌলভী আব্দুল যাওয়াদ বি.এ।[১৮]

তিনি তার মুরশিদ মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকীর পথ ধরে মুসলিম লীগের প্রতি অকুন্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন।[১৯] জনসাধারণের মধ্যে বিশেষত আলীম সমাজে মুসলিম লীগকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে আউলিয়াদের মধ্যে মাওলানা রুহুল আমীন এর অবদানই সর্বাধিক বলে মনে হয়।[২০] তিনি বাংলার সর্বত্র মুসলিম লীগকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করতে আগ্রহী ছিলেন এবং তিনি মনে করতেন এই মুসলিম লীগই পাকিস্তানের জন্ম দিবে। "সুন্নাত আল জামাত" নামের একটি পত্রিকায় তার লেখা একটি প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, "বাংলার মুসলমানদের রক্ষা করতে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাই একমাত্র উপায়।"[২১] তিনি দুই দফা বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। এক দফা ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে,[২২] দ্বিতীয় দফায় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে।[২৩] এছাড়াও তিনি জামইয়াত-ই-উলামার সভাপতি ও নিখিলবঙ্গ মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন।[২৪]

মাওলানা রুহুল আমীনের সম্পাদনায় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে *সাপ্তাহিক হানাফি* প্রকাশিত হয়। এছাড়াও ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *সুন্নাত আল-জামাত* ও তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হত। *সুন্নাত আল জামাত* তখনকার সময়ে জমিয়াত-ই-উলামা-ই বাংলা ও আসাম এর মুখপাত্র হিসেবে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। মাওলানা রুহুল আমীন এ সমস্ত পত্রিকায় মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সংবাদ তুলে ধরতেন।[২৫]

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, বাংলার এই পীর আউলিয়াগণ ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তবে এদের রাজনীতিতে প্রবেশের মূলে ছিল সাংগঠনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলার অবহেলিত এবং আত্মবিস্মৃত মুসলিম সমাজকে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। ধ্বংসাত্মক ও অসহযোগিতার রাজনীতি পরিহার করে গঠনমূলক ভূমিকার প্রবর্তন করা। তাই এদের এই আদর্শে অনুপ্রানিত হয়েছেন অসংখ্য মানুষ। এরা অনাগত প্রজন্মের জন্য চিরদিন প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

সূত্রনির্দেশ

১। Richard, M. Eaton. *The Rise of Islam and the Bengal Frontier (1204-1760)* Second impression. Oxford University Press. New Delhi, 2000. pp-71-72. মোশারফ হোসাইন ভূইয়া, "ঢাকা নগরীর সূফী সাধক ও তাদের মাজার (প্রবন্ধ), *বাংলাদেশ*

এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ত্রয়োদশ খন্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ঢাকা - ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৩৫, মোঃ আখতারুজ্জামান, "পূর্ব ভারতে মুসলিম বিজয়ঃ কিছু প্রাসঙ্গিক কথা" (প্রবন্ধ), *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, তেত্রিশ বর্ষ, প্রথম - তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা-১৪০৬ বাং, পৃঃ ৭২, এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, A.B.M. Habibullah. *The Foundation of Muslim Rule in India*, Allahabad 2nd revised edition, 1962

২। নওরোজ কিতাবিস্তান, ড. কাজী দ্বীন মুহাম্মদ প্রমুখ *সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ*, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ৩৩।

৩। Md. Akhtaruzzaman, "History of Sufism in Bengal: an Introduction," *Philosophy and Progress*, vol. XXVIII. (Dev Centre for Philosophical studies. University of Dhaka, 2000, p. 191

৪। শাহ্ সুফী আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত হুগলি জেলার জঙ্গীপাড়া থানাধীন ফুরফুরার ঐতিহ্যবাহী পীর পরিবারে ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সুফী সাধক, ইসলাম প্রচারক, শিক্ষানুরাগী, সমাজ সংস্কারক, জাতি গঠক, রাজনীতিক ও সাংবাদিকতার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার কর্মজীবন বিশেষ বৈচিত্রময়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক, *ফুরপুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী*, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (ই. ফা, বা) প্রথম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৮০।

৫। উবায়দুল্লাহ রওশনাবাদী, *নেদায়ে ইসলাম*, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৫০ বা ১৯৪৪ ইং, পৃষ্ঠা-৭৭১।

৬। *ইসলাম দর্শন*, প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩২৭ বা / ১৯২০, পৃঃ ২৮৯-২৯১।

৭। ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*, ই, ফা, বা, ঢাকা-১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৪০।

৮। তর্কবাগিশ, *হাকীকতে ইনসানিয়াত*, ২য় সংস্করণ, পাকশী খানকা শরীফ, পাবনা, ১৯৭৮, পৃঃ ৩০-৩২।

৯। জুলফিকার আহম্মেদ কিসমতী, *আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা*, আল-ফালাহ্ পাবলিকেশন্স, তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা-২০০০, পৃষ্ঠা-৬৯।

১০। *সুন্নাত-আল-জামাত*, চতুর্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৪৪ বা, পৃষ্ঠা-৫৬।

১১। ডঃ মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, প্রথম পুনর্মুদ্রন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ২১৫-১৮।

১২। মাওলানা নিসারুদ্দীন আহম্মদ বর্তমান বাংলাদেশে বৃহত্তর বাকেরগঞ্জ (বরিশাল) ও বর্তমান পিরোজপুর জেলার নিসারাবাদ (স্বরুপকাঠী) থানার অন্তর্গত ছারছীনা গ্রামের পীর পরিবারে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, রশীদ আহম্মদ, *তাযকেরাতুল আউলিয়া*, ১ম ও ২য় খন্ড, ২য় সংস্করণ, শিরীন পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৭৬, পৃষ্ঠা - ৩৬২-৭০।

১৩। জুলফিকার আহম্মেদ কিসমতী, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-১৯।

১৪। জুলফিকার আহম্মেদ কিসমতী, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৭০।

১৫। এই আইনে বলা হয়েছে যে, বালকদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর এবং বালিকাদের ক্ষেত্রে ১৪ বছরের কম বয়সে বিবাহ হলে সর্বোচ্চ ১০০০/- (এক হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাবে। এই আইন ১ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে কার্যকর হয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন D. F. Mullah. *Principles of Hindu Law*. Tenth Edition. Calcutta. 1946. pp-679-80.

১৬। মাওলানা রুহুল আমীন (রঃ) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমার অন্তর্গত টাকিনারায়ণপুর গ্রামে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ফুরফুরার পীর শাহ্ সুফী আবু বকর সিদ্দিকীর প্রধান খলিফা। এ আউলিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মুহাম্মদ আব্দুচছামাদ, *ফুরফুরা পীর সাহেব কিবলার প্রধান খলিফা জনাব মাওলানা রুহুল আলীন সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী*, জিনাত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ঢাকা-১৯৫১।

১৭। দেখুন, *ইসলাম দর্শন*, প্রথম বর্ষ, ১০ সংখ্যা, কলিকাতা, মাঘ ১৩২৭।

১৮। মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকীর উক্ত কমিটি ঘোষণা সম্বলিত বক্তব্য জনসাধারণের মধ্যে বিনামুল্যে বিতরণের জন্য বঙ্গ নূর প্রেস, ৫, কলিকাতা থেকে ছেপে ১ম লেন, ১৩ চাঁদনী চক থেকে মোঃ আলতাফ হোসাইন-বি.এ কর্তৃক প্রকাশিত।

১৯। ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৩০৬।

২০। ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৩০৬।

২১। *সুন্নাত-আল-জামাত*, ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩৪৮, পৃষ্ঠা-৮।

২২। A. M. Zaidi. *Evolution of Muslim Thought in India*. Vol-1. New Delhi. 1978. p-160

২৩। Muhammed Seraj Mannan. *The Muslim Political Parties in Bengal (1936-47)*. Dhaka. 14. ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৯।

২৪। *আল-আমীন*, প্রথম বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ঢাকা-১৯৬৭।

২৫। *সুন্নাত-আল-জামাত*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, রমজান, ১৩৫২, পৃঃ ৯।

উনিশ শতকে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের জাগরণে আবদুল লতিফের অবদান

এম শফিকুল আলম

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ওহাবী-ফরায়েজী-সিপাহী বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে বাংলার মুসলমানরা যখন বিপর্যস্ত এবং দিশেহারাবস্থায় ঠিক তখনই তাদের মধ্যে জাগরণ ঘটাতে বিশিষ্ঠ মুসলিম সমাজ সংস্কারক নবাব আবদুল লতিফের (১৮২৮-১৮৯৩) আর্বিভাব।[১] ওহাবী-ফরায়েজী-সিপাহী বিদ্রোহের কারণে মুসলমানদের সঙ্গে ইংরেজ শাসকের সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটে। শাসক ও প্রজাকূলের মধ্যে সন্দেহ প্রবল হয়ে উঠে। গড়ে উঠে উভয় পক্ষের মাঝে এক অবিশ্বাস্যের দেয়াল। আবদুল লতিফ এই দেয়াল ভাঙার কাজটিই হাতে নিয়েছিলেন। তিনি মুসলমান সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত থেকে মুসলিম সমাজের অবস্থার উন্নতি করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তিনি মুসলমানদের বুঝাতে চেষ্টা করে সক্ষম হন যে, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও স্বার্থরক্ষার জন্য ইংরেজ শাসকের সঙ্গে আপোষকামিতা অপরিহার্য। বলা বাহুল্য, তিনি রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন না এবং ধর্মীয় বিতর্ক থেকেও দূরে থাকতেন। আবদুল লতিফ মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য শিক্ষাকে মৌলিক উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেন। এসময় মুসলমানরা ছিল ইংরেজী ও পাশ্চত্য শিক্ষা বিমুখ। শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী মুসলিম শাসকশ্রেণী তাদের আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্তনকে নিছক রাজা পরিবর্তনরূপে গ্রহণ করতে পারেনি।[২] পাঁচশত বছরের গৌরবোজ্জল মুসলিম শাসনের অহংকার তারা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। রাজ্যহারা মুসলমানের পক্ষে আঘাতটা ছিল খুবই মারাত্মক। আরবী ও ফার্সীর মমত্ব ছাড়তে তাদের কষ্ট হচ্ছিল। তাই মুসলমানদেরকে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে আবদুল লতিফকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল।[৩] অবশ্য তিনি এই কাজে অনেকখানি সফল হন এবং মুসলিম সমাজের আধুনিক জাগরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সচেষ্ট হন।

উনিশ শতকে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের অবস্থা ছিল সত্যিই করুণ। ইংরেজ শাসকেরা অনেক আগে থেকেই মুসলমানকে প্রতিপক্ষরূপে কল্পনা করে। তাই মুসলমানদের ধ্বংস করার ব্যাপারে ইংরেজ শাসকেরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সর্বক্ষেত্রেই মুসলিম সমাজের ওপর আঘাতটা এসেছিল

প্রবলরূপে। ফলে মুসলমানের অস্তিত্ব রক্ষাই হয়ে পড়েছিল সুকঠিন। জ্ঞান সাধনা, জ্ঞান চর্চা ছিল সেই সময়ে সুদূরপরাহত। মুসলমান ইংরেজ শাসনকে যেমন স্বাগত জানাতে পারেনি, তেমনি গ্রহণ করতে পারেনি পাশ্চাত্যের শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে।[৪] আবদুল লতিফ জ্ঞান-চর্চার মধ্য দিয়েই অধঃপতিত মুসলমানের আত্মোন্নতি এবং চিত্তোত্থান ঘটবে বলে মনে করেন। তিনি মুসলমানদেরকে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আহবান জানান।[৫] মুসলমানরা তাঁর আহবানে সাড়া দেয়। এর ফলে মুসলিম সমাজের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার প্রসার লাভ করতে থাকে এবং উনিশ'শ সত্তর দশক নাগাদ ধীরে ধীরে একটি শিক্ষিত শ্রেণী সৃষ্টি হতে থাকে। শিক্ষা গ্রহণ ও সরকারি চাকুরী অর্জনের ফলে এই শ্রেণী স্বীয় সমাজে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জন করে। সমাজের নেতৃত্ব ক্রমশ অভিজাত শ্রেণীর হাত থেকে এঁদের হাতে চলে আসে। কালক্রমে এঁরাই বাঙালি মুসলিম সমাজে নব্য শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী হিসেবে পরিগণিত হয়। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর সৃষ্টি ও বিকাশের মূলে ছিল আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা।[৬]

উনিশ শতকে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের জাগরণে আধুনিকতার উদ্ভব ছিল ১৮৫৭ সালের মহা-বিদ্রোহের গৌণ ফল। তার পূর্বে মুসলমানরা নিজেদেরকে সমাজের অধিকতর উঁচুমানের মনে করত। ব্রিটিশেরা রাজ্য কেড়ে নেওয়ায় তাঁদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ইংরেজ শাসকদের প্রতি তাঁদের মনোভাব ছিল অসন্তোষ ও সংগ্রাম-মূলক। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি তাঁদের মনোভাব হয়ে উঠে নেতিবাচক। সময়ের দাবিকে তাঁরা করেন অগ্রাহ্য। এর ফলে ইংরেজীর মাধ্যমে যে পাশ্চাত্য উদার-ধারণা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এই উপমহাদেশে সঞ্চারিত হচ্ছিল তা থেকে তাঁরা নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখেন। নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারের জন্যে মুসলিম অভিজাতরা তখনও তাঁদের ষড়যন্ত্র এবং পুরানো কৌশলের কার্যকারিতায় বিশ্বাস করছিলেন। আর ধর্মীয়মনা ব্যক্তিদের মোটামুটি গভীর নির্ভর ছিল ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলন সমূহের ওপর। মুসলিম বাহুর পরাজয় এবং বিদ্রোহে অবলম্বিত তাঁদের রণকৌশলের ব্যর্থতা, অধিকন্তু মুসলমানদের ওপর ব্রিটিশের বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়া এই সকল আশা ভরসার আলো নিভিয়ে দেয়। ফলে মুসলিম সমাজে আধুনিকতার শিকড় গড়তে বিলম্বিত হয়।

বিদ্রোহের অবসানে তখনও জিহাদ আন্দোলন মুসলিম জনসাধারণের জীবন ও চিন্তার চক্রবালের ওপর ভূতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় বাংলার এবং অন্যান্য স্থানের আলোকপ্রাপ্ত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী জরুরী প্রয়োজন বুঝতে পারলেন যে, মুসলিম প্রজাদের তাদের বিদেশী শাসকদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে হবে এবং তাঁদের সামাজিক উন্নতির একটা নিয়মতান্ত্রিক নীতি বের করার জন্যে নিজেদের আধুনিক শিক্ষায় সজ্জিত করতে হবে। তাঁদের মনে এই উপলব্ধি হয় প্রধানত বাংলায় আবদুল লতিফ এবং উত্তরপ্রদেশে সৈয়দ আহমদের ওকালতি ও অনুরোধের ফলে। অবশ্য এক্ষেত্রে

স্যার সৈয়দ আহমদ খান, আবদুল লতিফ দ্বারা প্রভাবিত হন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিপাহী বিদ্রোহ মুসলমানদের জন্যে একটি হতাশাজনক অভিজ্ঞতা বহন করে। এই বিদ্রোহের পরবর্তীকালে উত্তরপ্রদেশে স্যার সৈয়দ মুসলমানদের শিক্ষা আন্দোলন শুরু করেন। বাংলার অল্প সংখ্যক নব্য শিক্ষিত মুসলমান ব্যক্তিগতভাবে অথবা সভা-সমিতি গঠনের মাধ্যমে শিক্ষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। এই সময় অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে-ই-ইসলামি' উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই সংগঠনটি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে গঠিত বলা হলেও শিক্ষা বিষয়ে কোনো প্রোগ্রাম এতে ছিল না। 'আঞ্জুমানে-ই-ইসলামি' মুসলমানদের সবচেয়ে পুরাতন সংগঠন হলেও প্রকৃত বিচারে সমাজের প্রয়োজনীয় কল্যাণ সাধনে এটা ব্যর্থ হয়। সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ কর্মকর্তার ইংরেজী শিক্ষা ছিল না এবং তাঁদের কর্মতৎপরতা সমাজে তেমন কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। অবশ্য আবদুল লতিফও এই সংগঠনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন।[৭]

উনিশ শতকে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের জাগরণের লক্ষ্যে আবদুল লতিফ সিপাহী বিদ্রোহের অনেক আগে থেকেই কর্মক্ষেত্রে নেমেছিলেন - তখনকার একজনের ভাষায় 'যদি হিন্দুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেঁচে থাকতে হয় তাহলে নিজের ছেলেদের যেন ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হয়। এই জন্য তিনি নিজের সহধর্মীদের নিকট অনুরোধ-উপরোধ, কাকুতি এবং আকুল আবেদন জানান।' স্যার ডব্লিও সি পেথেরাস বলেছেন ঃ "তিনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি আগে ভাগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিশেষ করে পৃথিবীর অন্যান্য অংশে সংবাদ আদান-প্রদান ও যোগাযোগ ব্যবস্থার যে উন্নতি হচ্ছে তার ফলে এই উপমহাদেশেও অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে এবং তার সাথে সাথে লোকের অভাব অভিযোগ এবং আকাঙ্ক্ষারও পরিবর্তন ঘটেছে।" পেথেরাস আরো বলেন ঃ "অন্য কথায় তিনি (আবদুল লতিফ) নিজেকে এবং তাঁর সমকালীন লোকদের একটা প্রগতিশীল দুনিয়ার মধ্যে দেখতে পান। তিনি বুঝতে পারেন যে, এই আধুনিক জগতে মানুষের জন্যে যে সকল সুযোগ সুবিধা সহজলভ্য হয়েছে সেগুলো পেতে হলে, এই মুক্তবিশ্বে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে এবং নিজের যোগ্যস্থান অধিকার করতে হলে, এই দেশের যুবকদের উপযোগী শিক্ষা পেতে হবে। তিনি সহধর্মাবলম্বীদেরকে আধুনিক শিক্ষায় পশ্চাদপদ দেখে খুবই দুঃখিত হন; তাই তাদের মন থেকে কুসংস্কার দূর করে তাদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্যে আজীবন প্রাণপণ চেষ্টা করেন।"[৮]

আবদুল লতিফ মুসলিম সমাজের জাগরণের জন্য যে আধুনিকতার প্রবর্তন করেন তার লক্ষ্য ছিল ঃ প্রথমত, মুসলমানদেরকে প্রাশ্চাত্য সাহিত্য-বিজ্ঞান শিক্ষাদান; কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের কৃষ্টির একটা গভীর বোধ বজায় রাখতে হবে। এর ফলে ব্রিটিশ প্রবর্তিত নূতন ব্যবস্থা থেকে মুসলমানগণ যথাযথ উপকৃত হতে পারবে। দ্বিতীয়ত,

ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্যের একটা নীতি প্রবর্তন করে নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা গ্রহণে তারা যাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তার ব্যবস্থা করা এবং সেই সঙ্গে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের সন্দেহের নিরসন করা। তৃতীয়ত, এদিক দিয়ে বাংলার হিন্দু সমাজ মুসলমান সমাজকে অনেক পিছনে ফেলে গিয়েছেন, এই দূরত্বের সংকোচ সাধন। চতুর্থত, ব্রিটিশ শাসক ও মুসলিম প্রজাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া সৃষ্টি করা। সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে এই লক্ষ্য বিশেষ পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ খান এবং তাঁর সমকালীন হিন্দু নেতাদের মত আবদুল লতিফেরও প্রতীতি হয় যে, ইংরেজ রাজত্ব এদেশে স্থায়ী হয়ে গিয়েছে। সুতরাং সময়ের দাবি হলো ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত হওয়া। তিনি এই আনুগত্যকে শক্ত করতে চাইলেন, তুর্কীর খলিফা এবং ব্রিটিশ রাজের মধ্যে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তার ওপর জোর দিয়ে। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের অবসান না হওয়া পর্যন্ত বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিকতার কোনই পথ আবদুল লতিফ করে নিতে পারেননি। ১৮৬০ দশকের প্রথমার্ধে তিনি মুসলমানদেরকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা চালান। শিক্ষা আন্দোলনকে কার্যকরী করে তোলার লক্ষ্যে তিনি কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' স্থাপন করেন। সমাজ সংস্কার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ সৃষ্টিতে এই সোসাইটি অত্যন্ত মূল্যবান অবদান রাখে। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আবদুল লতিফ বলেন ঃ "কুসংস্কার ও বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত করে মুসলিম সমাজকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত করা এবং ইংরেজ ও হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাদের মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে আমি মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করি।"[৯]

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রদেশ থেকে নামজাদা মুসলমান, স্বাদেশিক ভদ্রলোক ও প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ইংরেজ সদস্যের সমন্বয়ে উক্ত সোসাইটি গঠিত হয়। মুসলমানদের জন্য এটা ছিল একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান। নিজেদের স্বার্থ রক্ষাই ছিল সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য।[১০] সোসাইটি বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয়ে মাসিক সভার আয়োজন করত এবং আলোচনার মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায়ের উচ্চ ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশনের দ্বারা সদস্যদের সচেতন করে তুলতে প্রয়াস চালাত। উর্দু, ফার্সী, আরবী এবং ইংরেজী ভাষায় সোসাইটির কার্যক্রম পরিচালিত হত।[১১] আবদুল লতিফ ছিলেন সমিতির প্রাণশক্তি।[১২] অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফলে সোসাইটি মুসলমানদের জন্য একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়।[১৩] সংগঠন প্রতিষ্ঠার চার বছরের মধ্যে এর সদস্য সংখ্যা ৫০০ তে উন্নীত হয়। মুসলমানদেরকে ইংরেজী ও আধুনিক শিক্ষার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য সোসাইটির সভায়

উল্লেখযোগ্য মুসলিম ব্যক্তিত্ব যেমন, স্যার সৈয়দ আহমেদ খান, মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরীকে আমন্ত্রণ জানান হয়। তাঁদের বক্তৃতার পর মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা দেয়।[১৪] স্যার সৈয়দ এই সোসাইটি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন।

আবদুল লতিফ তাঁর মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করেন ঃ "এই সময় আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বন্ধু, সুপরিচিত মৌলভী সৈয়দ আহমদ খান বাহাদুর (তখন গাজীপুরের সদর আমীন) প্রথমবারের মত কলকাতায় বেড়াতে আসেন এবং আমার সম্মানিত অতিথি হন। সম্প্রতি স্থাপিত 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি'র ষান্মাষিক সভায় তাঁর যোগ দেবার সুযোগ হয়। এতে তিনি ফার্সী ভাষায় একটা বক্তৃতা করেন। তাঁর বিষয় ছিল 'স্বদেশপ্রেম এবং ভারতে জ্ঞান বিস্তারের প্রয়োজন'। কলকাতা থেকে ফিরে গিয়ে অল্প দিনের মধ্যেই আমার জ্ঞানী বন্ধু একটা সোসাইটি স্থাপনের এক গঠনতন্ত্র বের করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দী, উর্দু, ফার্সী ও আরবী ভাষায় লিখিত আমাদের গ্রন্থকারদের বই সস্তায় প্রকাশ এবং ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান গ্রন্থকারদেব অনুবাদ প্রকাশ করা।" এই সোসাইটির ডাইরেকটিভ কাউন্সিলে আবদুল লতিফকে সদস্য নিযুক্ত করা হয়। এই সময়কার প্রতিপত্তিশালী সংবাদ পত্র *হিন্দু প্যাট্রিয়ট* মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লতিফ ও স্যার সৈয়দের পথ প্রদর্শকের ভূমিকার প্রশংসা করে এবং গাজীপুর সোসাইটিকে তারা কলকাতার লিটারারী সোসাইটির পরিপূরক বলে আখ্যায়িত করে।

উনিশ শতকে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য আবদুল লতিফকে বাংলায় মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত বলা হয়ে থাকে।[১৫] দল-মত-বর্ণ নির্বিশেষে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন সমাদৃত।[১৬] ইংরেজী শিক্ষার প্রতি তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ভারতবর্ষের তদানীন্তন লেফটেনেন্ট জেনারেল তাঁকে এক সেট *Encyclopedia Britannica* উপহার দেন।[১৭] পেশকারী চিঠিতে বাংলা সরকারের সেক্রেটারী মোহামেডান লিটারারী সোসাইটিকে ঐ জাতীয় সোসাইটির আদর্শ এবং অনুপ্রেরণার উৎস বলে বর্ণনা করেন। তিনি আরো বলেন ঃ 'আবদুল লতিফের শিক্ষা বিষয়ক আন্দোলন এই উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে এক নূতন জীবনের সঞ্চার করেছে'। লতিফ সম্পর্কে জাহিদ হোসেনের বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'বহুদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে তিনি (নবাব আবদুল লতিফ) সেই নীতির পথ সকলের আগে চিন্তা করে বের করেন, যা উত্তর ভারতে তাঁর সমসাময়িক প্রসিদ্ধ স্যার সৈয়দ আহমদ খান উজ্জ্বলভাবে অনুসরণ করেন।'

সূত্রনির্দেশ

১। উনিশ শতকের ব্রিটিশ-বাংলার বরেণ্য মুসলিম মণীষা- বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক, আধুনিক শিক্ষা বিস্তার ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি সমকালীন পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজকে প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে উজ্জীবিত করার জন্য দূরদর্শী সমাজহিতৈষী কর্মী হিসাবে তিনি স্মরণীয়। তিনি কলকাতা মাদ্রাসা হতে ইংরেজী, আরবী ও ফারসীতে সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৪৬-এ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। এই সময়ে জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জন্য গঠিত তদন্ত কমিশনের প্রধান মি. স্যামুয়েলেস-এর কাজে সহযোগিতা করেন। কমিশনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর পরই কলকাতা মাদ্রাসায় ইঙ্গ-আরবী অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৮৪৯ সালে বাংলার তৎকালীন ডেপুটি গভর্ণর স্যার হার্বাট ম্যাডক কর্তৃক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫৩-তে লর্ড ডালহৌসি কতৃক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের উচ্চতর স্তরে প্রমোশন দিয়ে মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পদে এবং ১৮৬২-তে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের প্রথম স্তরে উন্নীত হন। তাঁর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় নীল চাষীদের প্রতি নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের বিষয়টির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের ফলে বাংলার তৎকালীন লেফটেনেন্ট গভর্ণর স্যার জন পিটার গ্রান্ট নীল কমিশন গঠন করেন। ১৮৬২-তে লর্ড ক্যানিংয়ের শাসন আমলে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সৃষ্টি হলে জন পিটার গ্রান্ট উক্ত সভার মৌলিক সদস্য মনোনীত হন। খান বাহাদুর আবদুল লতিফ ছিলেন প্রাদেশিক আইন সভায় ঐ সময়ে একমাত্র মুসলিম সদস্য। ১৮৬৩ সালে সিভিল ও মিলিটারি সার্ভিস সমূহের পরীক্ষক বোর্ডের অন্যতম সদস্য এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত হন। বাঙালি মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার ও মুসলমানদের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের উৎকর্ষ ও বিকাশের পথ প্রশস্ত করার জন্য ১৮৬৩-তে 'মহামেডান লিটারারী সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৩-তে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন গঠিত হলে এর 'জাস্টিস অব দি পিস' নিযুক্ত হন এবং ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত এ পদে বহাল থাকেন। ১৮৭৭ সালে 'খান বাহাদুর, ১৮৮০তে নবাব, ১৮৮৩তে সি. আই. ই. এবং ১৮৮৭তে মহারাণীর জুবিলী উপলক্ষে 'নবাব বাহাদুর খেতাবে ভুষিত হন।

২। আবু জাফর শামসুদ্দীন, "বাঙালীর আত্মপরিচয়," *বাঙালীর আত্মপরিচয়*, সফর আলী আখন্দ (সম্পাদিত), ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১, পৃঃ ১৭।

৩। দেখুন Shafiqul Alam, "Nawab Abdul Latif's Contribution to the Education of the Muslims," *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Dhaka, vol. 39, no. 1, June 1994, পৃঃ ৬৯-৮২।

৪। মাহফুজ উল্লাহ, *বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০), পৃঃ ৬১।

৫। দেখুন, Shafiqul Alam "Nawab Abdul Latif and his Utilitarian Social Reforms: An Evaluation." *Journal of the Pakistan Historical Society*, Karachi, vol. XIvii, No. 1, January-March 1999, পৃঃ ৩৫-৪৮।

৬। ইমরান হোসেন, *বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী ঃ চিন্তা ও কর্ম* (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃঃ ১৪।

৭। গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫) পৃঃ ৩৫।

৮। এতদসত্ত্বেও আবদুল লতিফ ছিলেন রক্ষণশীল; পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের পক্ষপাতী হলেও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার বিরোধী। তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। তিনি মুসলমান সমাজের অগ্রগতি চেয়েছিলেন ধর্মীয় অনুভূতি ঠিক রেখে। কাজেই তাঁর মধ্যে কিছুটা স্ববিরোধিতা লক্ষ্যণীয়।

৯। নবাব আবদুল লতিফ খান সি আই ই, *মুসলিম বাংলা আমার যুগে* (আবু জাফর শামসুদ্দীন অনুদিত), ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮, পৃঃ ৭০। আরো দেখুন পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭০।

১০। Pradip Kumar Lahiri. *Bengali Muslim Thought 1818-1947* (Kolkata K. P. Bagchi & Co.. 1991). পৃঃ ৫২-৫৩।

১১। Mahmud Shah Qureshi. *Etude Sur L'evolution Intellectualle chez Les Musulmans du Bengale 1857-1947 (Intellectural Evolution among the Bengali Muslims 1857-1947)*. Paris. Mouton La Haye. 1970. পৃঃ ৪৮।

১২। Rafiuddin Ahmed. "The Role of Associations and Anjumans in the Political Mobilization of the Bengali Muslims in the later Nineteenth Century," *Bangladesh Historical Studies*. Journal of the Bangladesh Itihas Samiti. Vol. I., 1979. পৃঃ ৩১-৩২।

১৩। Muin-ud-Din Ahmad Khan, *Muslim Struggle for Freedom in Bengal* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh. 2nd ed.. 1982). পৃঃ ৫৪-৫৮।

১৪। Enamul Hoque ed.. *Nawab Bahadur Abdul Latif. His Writings and Related Documents* (Dhaka. Samudra Prakashani. 1968). পৃঃ ৮২। আরো দেখুন Muslim Struggle For Freedom. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫২-৫৩।

১৫। Joyanti Moitra. *Muslim Politics in Bengal 1855-1905* (Kolkata: K. P Bagchi & Company, 1984). পৃঃ ১০১।

১৬। শফিকুল আলম, "উনিশ শতকের মুসলিম বাংলায় উপযোগবাদের প্রভাব ঃ একটি দার্শনিক সমীক্ষা," *জার্নাল অব দি ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ১৪০৮, ৯ জুন ২০০২, পৃঃ ২২।

১৭। *মুসলিম বাংলা আমার যুগে*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১। আরো দেখুন *Autobiography and Other Writings*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

ব্রিটিশ শাসনে মধ্যবিত্ত, সমসাময়িক মুসলিম সমাজ এবং তৎকালীন ভারত

অয়ন চট্টোপাধ্যায়

ব্রিটিশ পূর্ব শাসনকালে ভারতের অর্থনীতি ছিল গ্রামপ্রধান এবং এই গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে কৃষিব্যবস্থা ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ভারতীয় গ্রাম সমাজ এই সময়ে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী ছিল না। কিন্তু এই তথ্যও সঠিক যে ব্রিটিশ পূর্ব ভারতের গ্রাম সমাজে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব অনুর্ভূত হোত না। মোগল আমলে জগৎশেঠ, ভীরজী বোহরার মত বড় বণিকরা বণিকী মূলধনকে শিল্পমূলধনে রূপান্তরিত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তথাপি এই সময়কালে ভারতে শিল্প উৎপাদন এবং বণিকী অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে ঢাকা, লাহোর, আগ্রা, সুরাট, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে মধ্যযুগে ভারতে শ্রেণীবিন্যাস বা সামাজিক স্তরবিন্যাস সেভাবে সৃষ্টি হয়নি। সেইজন্য ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে বিত্তের দিক দিয়ে মাঝারি স্তরে অবস্থানকারী মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশ সেভাবে হয়নি। কিন্তু মোগল আমলের পর ব্রিটিশ শাসনে মধ্যবিত্ত এক নতুন শ্রেণী হিসাবে জন্মগ্রহণ করে।

এই সময়কালের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী ভূমিবন্দোবস্ত, মহলওয়ারী, ভাইয়াচারী ইত্যাদি বন্দোবস্তের মাধ্যমে ব্রিটিশরা নিজেদের আর্থিক শক্তিকে যেমন সংহত করেছিলো, তেমনি এই সকল ভূমি বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে মধ্যবিত্তের সৃষ্টি হয়। এই ভারতীয় মধ্যবিত্ত প্রথমে বৃটিশদের সহায়ক শ্রেণী হিসাবে তার ভূমিকা পালন করলেও পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে নিজের ভূমিকা স্পষ্ট করে। ভারতীয় মধ্যবিত্তের উদ্ভবের বিষয়টি ব্রিটিশ শাসনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ভারতীয় মধ্যবিত্তের সৃষ্টির পিছনে জাতিগত অবস্থান, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক বিষয়ের অবদান রয়েছে। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, কায়স্থ এই জাতিগুলি সামগ্রিকভাবে সমাজের উপরের দিকে অবস্থান করায় এবং পাঠান ও মোগল শাসনব্যবস্থার মতই ব্রিটিশ শাসনে ব্রিটিশদের আনুগত্য তারা নিয়ে নেওয়ায় এই উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেই মধ্যবিত্তের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা পাঠান এবং মোগল যুগের রাষ্ট্রভাষা ফার্সীকে ত্যাগ করে ব্রিটিশ যুগে ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করতে আগ্রহী হয় এবং

এই ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে ব্রিটিশ আমলে চাকুরী গ্রহণ করে। ১৮৩৭ সালে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে আইন বিভাগের কাজ আরম্ভ হয়। ১৮৬৪ সালে কেবলমাত্র ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষায় সফল হলে সরকারী চাকুরী পাওয়া সম্ভব হবে — এই ঘোষণার ফলে ভারতীয় উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করতে সচেষ্ট হয়, যদিও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা হিন্দু সমাজের অন্য সকল অংশ এবং মুসলিমদের তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিল। তাই দেখা যায় যে ১৯১২ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ব্রাহ্মণরা ছিলেন মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩.২ ভাগ। কিন্তু ঐ প্রেসিডেন্সীতে ঐ সময়ে ডেপুটি কালেকটর পদে মোট পদের শতকরা ৫৫ ভাগ ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। জেলার মুনসীফ পদগুলির শতকরা ৭২.৬ ভাগ ছিল ব্রাহ্মণদের করায়ত্ব। কেবলমাত্র মাদ্রাজেই নয় দক্ষিণভারতের মহীশূর রাজ্যেও ব্রাহ্মণরা শহরে বেশি বাস করতো এবং মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩.৮ ভাগ হলেও ১৯১৮ সালে ঐ অঞ্চলের মোট গেজেটেড পদের শতকরা ৬৫ ভাগ ছিল তাদের হাতে। দক্ষিণভারতে উচ্চবর্ণের এবং বিশেষত ব্রাহ্মণদের অর্থনৈতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভ থেকেই যে প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিলো সেকথা বলাই বাহুল্য।

ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার স্বকীয়তার পরিচয় দেয়। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে এবং প্রারম্ভে টোল ও মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে যেমন উচ্চশিক্ষা আবর্তিত হোত, তেমনি পাঠশালা ও মক্তবকে কেন্দ্র করে প্রাথমিক শিক্ষার পর্ব চলতো। ১৮৩৫ সালের পর থেকে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা প্রবর্তিত হলে লক্ষ্য করা যায় যে ভারতবর্ষে উনবিংশ শতকের আটের দশক থেকেই শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট দ্রুতগামী। ১৮৫৫ সালে ভারতে ২৮১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৮১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আর্টস কলেজের সংখ্যা ছিল ২১টি এবং বৃত্তিমূলক কলেজ ১৩টি ছিল। ঐ সময়ে ভারতে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ধীরে ধীরে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি যে আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে তা এই পরিসংখ্যানগুলি থেকে অনুভব করা গেলেও তখনও শিক্ষার বিকাশের প্রতি সরকারের উদ্যোগ এবং সাধারণ জনগণের প্রচেষ্টা কোনোটিই যথেষ্ট ছিল না। এরপর ধীরে ধীরে শিক্ষার প্রতি চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং ১৮৮১-৮২ সালে দেখা যায় যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে, ৩,৯১৬টি এবং ঐ স্তরে ঐ সময়ে ছাত্রসংখ্যা ছিলো ২,১৪,০৭৭ জন। ১৮৮২ সালে কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো ৭২ টিতে। ১৮৬৪ সাল থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতে স্নাতক হওয়া ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল ৫,১০৮ জন। ১৮৬৪ সাল থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতে এন্ট্রান্স পাশ করা ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৪৮,২৫১ জন। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে এই সংখ্যাগুলি অতি অল্প ছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই পরিসংখ্যানের পাশাপাশি এই তথ্য মনে রাখতে হবে ১৮৬৭

সালে ৭৫ টাকা বা তার বেশি মাসিক মাইনের পদের সংখ্যা ব্রিটিশ ভারতে ছিল ১৩,৪৩১ টি। এর মধ্যে ভারতীয়দের হাতে ছিল মোট পদের ৪৫ শতাংশ চাকুরী। এই পদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৮৭ সালে ২১,৪৬৬টি হলেও ভারতীয়দের অংশ এই সময়ে ৪৫ শতাংশ থেকে হল মাত্র ৪৮ শতাংশ। অর্থাৎ এই সংখ্যাতত্ত্ব থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে শিক্ষার বিকাশ হলেও ভারতীয়দের চাকুরী তখনও সহজলভ্য নয়।

ব্রিটিশরা যেহেতু ভারতের মধ্যে বাংলায় প্রথম উপনিবেশ তৈরি করেছিলো তাই স্বাভাবিকভাবে বাংলার সমাজ, অর্থনীতি এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন হয়েছিলো ব্রিটিশদের জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে। চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তের মাধ্যমে বাংলায় যেভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় তা সত্যই বিস্ময়ের। পরবর্তীকালে ভূমিবন্দোবস্তের ক্ষেত্রে পত্তনী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিধি আরো বিস্তৃত হয়। তাই দেখা যায় যে বিংশ শতকে বাংলায় বর্ধমান রাজ, কাশিমবাজার রাজ, কান্দী - পাইকপাড়া রাজ, ঠাকুর পরিবার প্রভৃতি ৯টি জমিদার পরিবার অবিভক্ত বাংলার মোট ভূমির তিন ভাগের এক অংশ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতেন।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এগিয়ে থাকার ফলে বাঙালী মধ্যবিত্ত শিক্ষার ক্ষেত্রেও দ্রুত এগিয়ে যায়। মধ্যবিত্তের শিক্ষা এবং চাকুরী ব্যতীত কোনো গতি ছিল না তা স্পষ্ট হয়ে যায় প্রখ্যাত আই.সি.এস অশোক মিত্রের আত্মজীবনীতে। অশোক মিত্র তাঁর স্মৃতিকথায় লেখেন, "উভয়কুলের পূর্বপুরুষরা ছিলেন যাকে বলা যায় গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। উভয়কুলেই জমিজমা ছিল অল্প। তার আয় থেকে সচ্ছলভাবে সংসার চলা শক্ত, অতএব হয় শিক্ষকতা না হয় চাকুরীর উপার্জনের উপর নির্ভর করতেই হতো। জাতিতে কায়স্থ, লেখাপড়াই পেশা, হাল ধরা ছিল বারণ, অতএব কৃষির উন্নতিতে মন ছিল না।" অশোক মিত্রের এই বক্তব্য থেকে এই বিষয়টি পরিষ্কার যে মধ্যবিত্ত কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি অপেক্ষা চাকুরী গ্রহণ করে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে চাইতো। তাই দেখা যায় যে এই জন্য বাংলায় আর্টস কলেজের সংখ্যা এবং ছাত্রের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮৮৭ সালে বাংলায় আর্টস কলেজের সংখ্যা ১৬টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিলো ৩৪টি এবং ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিলো পূর্বের তুলনায় প্রায় ৪ গুণ। ১৮৮২ সালের ২৩শে অক্টোবরের *হিন্দু প্যাট্রিয়ট* সংখ্যার হিসাব অনুযায়ী জানা যায় যে ১৮৫৮ সাল থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে বাংলা থেকে ১৭১২ জন স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেছেন কিন্তু চাকুরী সহজলভ্য নয় বলে স্নাতকদের মধ্যে অনেকেই আইন ব্যবসায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই দেখা যায় যে ১৮৫৮ সাল থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে বাংলায ৪৬৬ জন স্নাতক আইন ব্যবসাকে পেশা হিসাবে নিয়েছেন। এই রকম পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র বাঙালী মধ্যবিত্ত নয় ভারতে ইংরাজী শিক্ষাকে ভিত্তি করে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয়েছিলো তাদের মূল

লক্ষ্যই ছিলো সরকারী চাকুরীতে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং এই প্রেক্ষিতেই জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভবকে বিচার করতে হবে। ইন্ডিয়ান লীগ, ভাবতসভা প্রভৃতি সংগঠনের পথ ধরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব ভারতীয় মধ্যবিত্তের স্বপ্নকে চরিতার্থ করতে উদ্যোগী হয়।

সরকারী চাকুরীতে বিশেষত সবচেয়ে উচ্চস্তরের আই.সি.এস-এর চাকুরীতে ভারতীয়রা তাদের অংশ বৃদ্ধি করতে উদ্যোগী হয়। ১৮৭০ সাল থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে I.C.S এবং তার সমপর্যায়ের যে ২৭০টি পদ ফাঁকা হয়েছিলো তার মধ্যে ভারতীয়রা মাত্র ১৬টি পদ অধিকার করে এক অসম লড়াই করে। I.C.S পরীক্ষা লন্ডনে গিয়ে দিতে হোত এবং এই পরীক্ষার বয়সের সীমা ১৯ বছর করায় এক প্রতিবাদ উঠেছিলো ভারতীয়দের মধ্য থেকে। ১৮৯৩ সালে ব্রিটেনের আইনসভা ভারতে ও ব্রিটেনে একই সঙ্গে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের দাবী করে। ইসলিংটন কমিশন সুপারিশ করেন যে উচ্চতর সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে শতকরা ২৫ ভাগ ভারতীয়দের মধ্য থেকে নিয়োগ করার। কিন্তুএই প্রস্তাব সর্বাংশে কার্যকরী হয়নি। মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের পর থেকে উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগের হার বৃদ্ধি পেয়েছিলো। তাই দেখা যায় যে ১৯০০ সালে আই সি এস পদে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের পরিমাণ ছিল ৪.২৪ শতাংশ। ১৯১৯ সালে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিলো ৭.৬৪ শতাংশ। এইরকম পরিস্থিতিতে ভারতীয় মধ্যবিত্ত বুঝিয়ে দেয় যে উচ্চস্তরের সরকারী চাকুরীতে শ্রেণী হিসাবে তার এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ব্রিটিশ ভারতে বর্তমান। ১৯১২ সালে উচ্চপদস্থ চাকুরীর বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য যে কমিশন বসেছিলো সেই কমিশনের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ঐ সময়ে মাসিক ২০০ টাকার বেশি বেতনে যে ১১,০৬৪টি পদ ছিল তার মধ্যে ভারতীয়দের অংশ ছিল ৪২ শতাংশ। ঐ প্রতিবেদনে আরো জানা যায় যে মাসিক ৮০০ টাকার বেশি বেতনের যে পদগুলি ছিল তার মধ্যে ভারতীয়দের অংশ ছিল ১০ শতাংশ। এই রকম একটি পরিস্থিতির মধ্যে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ভারতীয় মধ্যবিত্ত তার অবস্থান পর্যালোচনা করছিলো একটি উল্লেখযোগ্য শ্রেণী হিসাবে। ব্রিটিশ যুগের ভারতীয় মধ্যবিত্তের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভূমিকা মুখ্য ছিল একথা সর্ব অংশে সত্য নয়। ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে হিন্দু মধ্যবিত্তের পাশাপাশি মুসলিম মধ্যবিত্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তবে লক্ষ্য করা যায় ভারতীয় জনজীবণ ব্রিটিশ যুগে হিন্দুদেরই প্রাধান্য ছিল। তাই দেখা যায় যে ভারতে ব্রিটিশ যুগে আর্থিক ক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায় যতটা এগিয়ে, মুসলিম সম্প্রদায় সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে। বিশেষত ঃ বাংলার মত তৎকালীন ভারতের সবচেয়ে জনবহুল প্রদেশে মুসলিমরা ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় হলেও তারা অর্থনৈতিক এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিলেন হিন্দুদের তুলনায় অনেক

পিছিয়ে। তাই ১৮৮২ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে বাংলায় সেই সময়ে কলেজ পড়ুয়াদের মধ্যে ৯২.৪১ শতাংশ ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। হাই এবং মিডল স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে ৮৬.৫৫ শতাংশ ছিলো হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি।

১৮৭২ সালের জনগণনা অনুযায়ী বাংলার মোট জনসংখ্যার ৪৮ শতাংশ ছিল মুসলিম। ঐ জনগণনায় দেখা যায় যে বর্ধমান বিভাগে মোট জনসংখ্যার ১২.৭ শতাংশ ছিলেন মুসলিম। প্রেসিডেন্সী বিভাগে মোট জনসংখ্যার ৪৮.২ শতাংশ ছিল মুসলিম। রাজসাহী বিভাগে ৬৬ শতাংশ মুসলিম, ঢাকা বিভাগে ৫৯.১ শতাংশ মুসলিম এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ৬৭.৪ শতাংশ ছিল মুসলিম। বাংলার মধ্য এবং পূর্ব অংশের জেলাগুলিতে মুসলিমরা সংখ্যায় বেশি বাস করতেন। কিন্তু বর্ধমান বিভাগে মুসলিম সম্প্রদায় সংখ্যায় যথেষ্ট পরিমাণে কম বাস করতেন। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ এবং বিংশ শতকের প্রথম ২০ বছর পর্যন্ত বাংলায় মুসলিমরা শিক্ষা, অর্থনৈতিক এবং অনেক ক্ষেত্রেই হিন্দুদের তুলনায় ছিলেন অনেক পিছিয়ে।

উনবিংশ শতকের সাতের দশকে লক্ষ্য করা গিয়েছিলো যে তৎকালীন ঢাকা বিভাগের জেলাগুলিতে মুসলিমরা সংখায় বেশি হলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় ছিলেন অনেক পিছিয়ে। ১৮৭০এর দশকে ঢাকার জমিদাররা মোট ভূমিরাজস্ব জমা দিতেন ৫৩,৬৭১ পাউন্ডের বেশী, সেখানে মুসলিম জমিদাররা ৫৬৩৭ পাউন্ডের বেশি ভূমিরাজস্ব জমা দিতেন। ঢাকার নবাবের মত সভ্রান্ত মুসলিম জমিদার যে জেলায় বাস করতেন সেই জেলায় মুসলিমরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যে কত পিছিয়ে ছিলেন তা এই তথ্যটি দেখলেই বোঝা যায়। ১৮৭২ সালে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ছিল ৬৯,২১২ জন, যাদের মধ্যে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৩৪,৪৩৩ জন এবং মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৩৪,২৭৫ জন। মুসলিমরা ঢাকা শহরে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ছিলেন, তথাপি ঢাকা শহরের শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং আর্থিক ক্ষেত্রে হিন্দুরা যত এগিয়ে ছিলেন মুসলিমরা ঐ সময় তত এগিয়ে ছিলেন না। সেই সময়ে ঢাকা জেলার অন্যতম সরকারী বিদ্যালয় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০ জন যেখানে ঐ সময়ে ২৬৬ জন হিন্দু ছাত্র ঐ বিদ্যালয়ে পড়তো। ১৮৭০-৭১ সালে ঢাকা কলেজে মাত্র ২ জন মুসলিম ছাত্র পড়তো, যেখানে ঐ সময়ে ঢাকা কলেজে মোট ১১২ জন ছাত্র পড়তো। এদের মধ্যে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১০৮ জন। ঢাকা জেলার ৩৯টি এডেড হাই ইংলিশ স্কুলের মোট ছাত্রের সংখ্যা ঐ সময়ে ছিল ২,০১০ জন, যাদের মধ্যে মাত্র ১৫৪ জন ছিলো মুসলিম ছাত্র। আজকের বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ১৮৭০ এর দশকে মুসলিমদের অবস্থা কেমন ছিল উপরের পরিসংখ্যানগুলি তার ইঙ্গিত দেয়।

ঢাকা জেলার পাশাপাশি ফরিদপুর জেলার প্রতি নজর দিলেও দেখা যায় যে ১৮৭০

এর দশকে ঐ জেলার জমিদাররা মোট ভূমিরাজস্ব জমা দিতো ২৭,২৬৩ পাউন্ডের বেশি। মুসলিম জমিদাররা যারা সংখ্যায় ঐ সময়ে ছিল ৬০৯ জন তারা জমা দিতো ১৮৮৫ পাউন্ডের ভূমিরাজস্ব। বাখরগঞ্জ জেলা ১৮৭০ এর দশকে মুসলিম প্রধান জেলা হলেও সেখানে হিন্দু জমিদারদের প্রাধান্য ছিল ব্যাপক। এমন কি সলিমাবাদ এবং ইদালপুর পরগণার মত সমৃদ্ধ পরগণাগুলির মালিক ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ঘোষাল পরিবার এবং ঠাকুর পরিবার। অবিভক্ত বাংলার সবচেয়ে বড় জেলা ময়মনসিং-এ বেশির ভাগ বড় জমিদারীগুলির মালিক ছিলেন মুক্তাগাছা, সন্তোষের মত বড় জমিদার পরিবারগুলি। এই জেলায় মুসলিমরা সংখাগরিষ্ঠ হলেও মাত্র ৮,৭৬০ পাউন্ড ভূমিরাজস্ব হিসাবে জমা দিতো।

১৮৭২ সালের জনগণনায় লক্ষ্য করা গিয়েছিলো যে মুসলিমরা তাদের সংখ্যার তুলনায় অতি অল্পসংখ্যায় শহরে বসবাস করতেন। পূর্ববঙ্গের বেশির ভাগ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মানুষ গ্রামে বসবাস করতেন। তাই লক্ষ্য করা যায় যে পূর্ববঙ্গে মোট মুসলিম জনসংখ্যার ৩.৮ শতাংশ ঐ অঞ্চলের শহরগুলিতে বসবাস করতেন। কিন্তু হিন্দু জনসংখ্যার ৬৭.১ শতাংশ পূর্ববঙ্গে শহরাঞ্চলে বসবাস করতো ঐ সময়ে। এই অসম বিভাজন বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে বজায় ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। তাই দেখা যায় যে বাখরগঞ্জ এবং ময়মনসিং এর মত মুসলিম প্রধান জেলায় ১৯০১ সালে মুসলিমরা ভূমিজ সম্পদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে শতকরা ১০ ভাগ এবং শতকরা ১৬ ভাগ রেখেছিলেন তাদের নিয়ন্ত্রণে।

কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গে নয় অবিভক্ত বাংলার মধ্য অংশের জেলাগুলিতেও মুসলিমরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বসবাস করতো উনবিংশ শতকে। কলিকাতা এবং ২৪ পরগণা জেলার অনেক অঞ্চলে মুসলিমদের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৮৭০ এর দশক থেকেই মুসলিমদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আর্থিক এবং শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিমদের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত। এই জেলার বেশিরভাগ জমিদার ছিলেন হিন্দু। মুর্শিদাবাদ জেলার জমিদাররা বাংলা তো বটেই বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের অনেক অঞ্চলের সমৃদ্ধ জমিদারীর মালিক ছিলেন। এই জেলার কৃষ্ণনাথ কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কাশিমবাজার রাজার অবদান ছিল ব্যাপক। এই জেলার সদর শহর বহরমপুরে ছিলো সম্রান্ত হিন্দুদের বাসস্থান। বিংশ শতকের প্রথম থেকেই মুর্শিদাবাদে মুসলিমরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯১১ সালের জনগণনায় মুসলিমরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু ঐ সময়ে সদর শহর বহরমপুরের জনসংখ্যা ছিল ২৬,১৪৩ জন। এদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ২১,৫২৪ জন এবং মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ৪,২৯৩ জন। ১৯১১ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় ৫৬,৩৪৩ জন হিন্দু ধর্মের মানুষ যেখানে সাক্ষর ছিলেন সেখানে মুসলিমদের

সংখ্যা ছিল মাত্র ২২,৩৯২ জন। মুর্শিদাবাদ জেলায় ঐ সময়ে প্রতি মাইলে ১০ জন হিন্দু যেখানে সাক্ষর ছিলেন সেখানে প্রতি মাইলে ৪ জন মুসলিম ছিলেন সাক্ষর। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঐ জেলার কৃষ্ণনাথ কলেজে ১৮৮৯ সাল থেকে ১৮৯৯ সালের মধ্যে ৭২ জন স্নাতক হন যাদের মধ্যে এক জনও মুসলিম স্নাতক হননি।

১৯১৯-২০ সালে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করে হর্ণেল সাহেব যে প্রতিবেদন পেশ করেন তাতে দেখা যায় যে ঐ সময়ে কলেজস্তরে যেখানে ১৮,৭৪৫ জন হিন্দু ছাত্র পড়তো সেখানে মাত্র ২,৩৩২ জন মুসলিম ছাত্র পড়তো। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং খিলাফত আন্দোলনের পর বাংলায় পাটের উৎপাদনকে কেন্দ্র করে মুসলিম কৃষকদের ভূমিকা বড় হয়ে উঠতে থাকে। জমি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে মুসলিমদের অবস্থার উন্নতি হয়। এছাড়া বাণিজ্য জগতে 'মুসলিম চেম্বার অব কমার্সের' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মুসলিমরা আস্তে আস্তে বাংলায় শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হতে থাকে।

বাংলার মুসলিমদের তুলনায় অনেক এগিয়েছিল উত্তরপ্রদেশের মুসলিমরা। উত্তরপ্রদেশ সহ উত্তর ভারতে মুসলিমরা শাসক হিসাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। উত্তর প্রদেশের শহরগুলিতে মুসলিমরা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বসবাস করতেন। উত্তরপ্রদেশের নাম ব্রিটিশ যুগের প্রথমে ছিল উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং আওধ। এই অঞ্চলে ১৮৫৭ সালে প্রশাসনিক এবং বিচার বিভাগের নিম্নস্তরের পদগুলিতে মুসলিমদের অংশ ছিল ৬৩.৯ শতাংশ। ১৮৮৬-৮৭ সালে মুসলিমরা ৪৫.১ শতাংশ পদ অধিকার করেছিলেন। ঐ সময়ে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং আওধে মুসলিমরা ছিলেন জনসংখ্যার ১৩.৪ শতাংশ। ১৯১৩ সালে প্রশাসনিক এবং বিচার বিভাগের মোট পদের ৩৪.৭ শতাংশ ছিল মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে। আসলে ১৮৫৭র পর থেকেই প্রশাসনিক এবং বিচার বিভাগের চাকুরী থেকে মুসলিমরা অপসৃত হতে থাকেন। এর পিছনে কারণ ফার্সী ভাষার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে প্রশাসনিক এবং বিচার বিভাগের কার্যকলাপ পরিচালিত হওয়া। অভিজাত মুসলিমরা প্রথম দিকে ইংরাজী ভাষা লিখতে অরাজী ছিল। কিন্তু স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং আলীগড় আন্দোলনের প্রভাবে মুসলিমরা ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে।. কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে হিন্দু জনগোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ চাকুরীগুলি অর্জন করে নেয়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেখা যায় উনবিংশ শতকের ৮০র দশকে ২৭২ জন তালুকদারের মধ্যে ৭৬ জন তালুকদার ছিলেন মুসলিম। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পূর্বের প্রাধান্য বজায় রাখতে না পেরে মুসলিম চেতনা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো। বাংলায় ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে মুসলিম অভিজাতদের ভূমিকা ছিল উল্লেখ করার মত। এই মুসলিম লীগ বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই উত্তরপ্রদেশে যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকে।

পাঞ্জাব প্রদেশও বাংলার মত মুসলিম প্রধান প্রদেশ। পাঞ্জাবে হিন্দু ও মুসলমানের পাশাপাশি শিখদেরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল। পাঞ্জাবে আগরওয়াল, ক্ষত্রী ইত্যাদি বণিকেরা যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিলেন তেমনি মুসলিমরা এই ক্ষেত্রে কম সক্রিয় ছিলেন না। গুজরানওয়ালা, লায়ালপুর, মন্টগোমারী ইত্যাদি সেচপূর্ণ অঞ্চলে মুসলিম জমিদারদের প্রাধান্য ছিল উল্লেখ করার মত। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রেও মুসলিমরা অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয় ছিলেন। মাঝারী মাইনের চাকুরীতে তাদের ভাগ হিন্দুদের থেকে বেশি ছিল। লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি এবং ফিরোজপুরের মত পুরসভাগুলিতে মুসলিমদের জনপ্রতিনিধি হিসাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় অংশগ্রহণ করতে দেখা যেতো। পাঞ্জাবে মুসলিমরা মুসলিম লীগের দ্বারা প্রথম দিকে প্রভাবিত হয়নি, কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের নিয়ন্ত্রণে তারা চলে যায়।

বাংলা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ছাড়া ব্রিটিশ ভারতের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রদেশ বিহারে মুসলিমরা বসবাস করতেন যথেষ্ট পরিমাণে। বিহারের উত্তর এবং মধ্য অংশে মুসলিম জমিদারদের সংখ্যা ছিল উল্লেখ করাব মত। তবে সামগ্রিকভাবে বিহারের মোট জনসংখ্যার ১৬ থেকে ১৭ শতাংশ ছিলেন মুসলিম। বিহার ব্যতীত তখনকার বোম্বে প্রদেশ, মাদ্রাজ প্রদেশে মুসলিমরা ছিলেন। সিন্ধু প্রদেশে মুসলিমরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ তবে ঐ প্রদেশের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তারা যে এগিয়ে ছিলেন এই দাবী করা সম্ভব নয়।

ব্রিটিশ ভারতে ওয়াহাবী, ফরাইজী আন্দোলন যেমন একদিকে মুসলিম চেতনাকে এক নতুন রূপ দিয়েছিলো তেমনি এ তথ্যও মনে রাখতে হবে যে জাতীয় কংগ্রেসে মুসলিমদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই নগণ্য। ১৮৮৫ সাল থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের মধ্যে শতকরা ১৩.৫ ভাগ ছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। ১৮৯৩ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত সময়কালে জাতীয় কংগ্রেসে মুসলিম প্রতিনিধিদের উপস্থিতিছিলো ৭.১ শতাংশ। তাই ১৯০৫ সালে স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের সময় মুসলিমদের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত।

মুসলিম অভিজাত এবং শিক্ষিত মুসলিমদের দ্বারা মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার পর থেকে মুসলিম চেতনার উৎস সন্ধান আরম্ভ হলেও এই তথ্যটি মনে রাখতে হবে যে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মুসলিম লীগের সদস্যসংখ্যা ছিল ৪০০ জন। সেই সময়ে মুসলিম লীগের সদস্য হতে হলে ৫০০ টাকা আয় থাকতে হোত। এছাড়া লীগের সদস্যদের বছরে ২৫ টাকা চাঁদা দিতে হোত। তাই স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম লীগের সদস্য হতে হলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হতে হোত।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে গান্ধী যুগ এক নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করে সমগ্র ভারতব্যাপী। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে অসহযোগ, আইন অমান্য এবং ভারত-ছাড় আন্দোলনের সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ব্যাপক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করতে থাকে। তবে এই সময়কালের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ১৯৩০এর দশকে মুসলিমদের মধ্যে পৃথক রাষ্ট্রের চেতনা বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন বিধি অনুসারে ১৯৩৭ সালে রাজ্য আইনসভাগুলির নির্বাচনে ১১ টি প্রদেশের মধ্যে ৭টি প্রদেশে জাতীয় কংগ্রেস জয়ী হয়। মোট ১৫৮৫টি আসনের মধ্যে ৭০৬ টি আসনে জাতীয় কংগ্রেস জয়ী হয়। অন্যদিকে ৪৮২টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১০৩টি আসন মুসলিম লীগ লাভ করে। এই নির্বাচনে দেশের সব জনগণের ভোটের অধিকার ছিল না। এই নির্বাচনে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে নির্বাচন ক্ষেত্রগুলি সাধারণ, তপসিলী, মুসলিম, শ্রমিক, জমিদার, মহিলা প্রভৃতি ভাগে সংরক্ষিত ছিল। অর্থাৎ নির্বাচন ক্ষেত্রগুলির ভোটার এবং প্রার্থীরা ছিলেন নির্দিষ্ট সম্প্রদায় এবং শ্রেণীতে বিভক্ত। এই নির্বাচনে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলিতে মুসলিম লীগ সফল হতে পারেনি। কিন্তু ১৯৪৫ সালের শেষদিকে যে নির্বাচন হয় তাতে লক্ষ্য করা যায় কেন্দ্রীয় আইনসভার সাধারণ আসনে জাতীয় কংগ্রেস মোট প্রদত্ত ভোটের ৯১.৩ শতাংশ ভোট পায়। অন্যদিকে মুসলিম আসনে মুসলিম লীগ মোট প্রদত্ত ভোটের ৮৬.৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিলো। আরও লক্ষ্য করা যায় যে প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস সর্বমোট ৯২৩টি আসনে জয়ী হয়। অন্যদিকে মুসলিম লীগ ৪২৫টি আসন লাভ করে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে সাধারণ আসনে জাতীয় কংগ্রেসের প্রাধান্য বর্তমান। অন্যদিকে এই বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় যে মুসলিম আসনে মুসলিম লীগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম রাজনীতি ক্রমশ সাম্প্রদায়িক চেতনার দিকে যেতে থাকে এবং পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে মুসলিম লীগের স্বপ্ন পরিপূর্ণ রূপ নেয়। ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে ভারতীয় মধ্যবিত্ত পরিপূর্ণ রূপে সাম্প্রদায়িক চিন্তার বাইরে অবস্থান করতে পারেনি।

ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় মধ্যবিত্তের বিকাশ যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তেমনি তৎকালীন হিন্দু ও মুসলিম সমাজের চেতনার স্তর গভীরভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। সেই সময়ের মধ্যবিত্ত বৈপ্লবিক, অহিংস, কমিউনিস্ট ইত্যাদি আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেও ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ভারত-বিভাগ রুখতে পারেনি। মধ্যবিত্তের দুর্বলতা এই ক্ষেত্রে পরিষ্কার বর্তমান। বর্ণভিত্তিক সমাজের বাইরে ব্রিটিশ যুগের মধ্যবিত্ততার চিন্তার পরিধি সম্প্রসারিত করতে অক্ষম হয়েছিলো। শ্রেণী হিসাবে

মধ্যবিত্তের যে একটি নির্দিষ্ট অবস্থান রয়েছে তা তখনকার মধ্যবিত্ত প্রমাণ করতে পারেনি। এই সময়ের ভারতীয় মধ্যবিত্ত তার চিন্তার সঙ্গে বাস্তব অবস্থানের সংমিশ্রণ সঠিকভাবে যে করতে পারেনি তা অনায়াসেই বলা যায়।

সূত্রনির্দেশ

১। W. W. Hunter. *A Statistical Account of Bengal* (Vol. 5).

২। L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers* (Murshidabad).

৩। Sumit Sarkar, *Modern India (1885-1947)*.

৪। Dr. B. B. Misra, *The Indian Middle Classes - their growth in modern times.*

৫। Krishnath College Centenary Commemoration Volume (1853-1953).

৬। Dr. R. Ahmed, *The Bengal Muslims (1871-1906) A quest for identity.*

৭। প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, *আধুনিক ভারত* (প্রথম খন্ড)।

৮। প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, *আধুনিক ভারত* (দ্বিতীয় খন্ড)।

৯। অমলেশ ত্রিপাঠী, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস (১৯০৮-১৯৪৭), ('*দেশ*' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)

১০। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*।

১১। অশোক মিত্র, *তিন কুড়ি দশ* (প্রথম চব্বিশ বছর ১৯১৭-৪০)।

১২। অমলেন্দু দে, *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*।

১৩। *দেশ* ঃ কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা (১৮৮৫-১৯৮৫)।

প্রবাসী পত্রিকায় বাংলার মুসলমান সমাজ

মোঃ শাহাদাত হোসেন সরকার

বাংলায় সংবাদপত্র উদ্ভবের ঐতিহাসিক পটভূমি

ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের ইতিহাসে বাংলার স্থান অতি উচ্চে।[১] উল্লেখ্য যে, বাংলা থেকে প্রথম ইংরেজী ও প্রথম স্বদেশী ভাষার সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।[২] ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের গোড়াপত্তন করেন কোলকাতায় বসবাসরত ইউরোপীয়গণ। জেম্‌স অগাস্টাস হিকি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র *বেঙ্গলগেজেট* প্রকাশ করার মাধ্যমে ভারতবর্ষে সাংবাদিকতার ইতিহাসের শুভসূচনা করেন।[৩] হিকির *বেঙ্গলগেজেট* ভারতীয় প্রথম সংবাদপত্র হিসাবে ঐতিহাসিক মহলে সুপরিচিত। ভারতবাসী ইংরেজদের স্বার্থে প্রকাশিত হিকির *বেঙ্গলগেজেটের* প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৭৮০ সালে ২৯ জানুয়ারী কলিকাতায়।[৪] হিকির সংবাদপত্র প্রকাশের সুত্র ধরেই *ইন্ডিয়া গেজেট, ক্যালকাটা গেজেট, হরকরা* প্রভৃতি ইংরেজী সংবাদপত্রের জন্মলাভ ঘটে। তবে এ সময় প্রকাশিত সব পত্র পত্রিকাগুলোই ইউরোপীয়দের দ্বারা সম্পাদিত হতো এবং ভারতবর্ষে ইউরোপীয় সমাজ ও সভ্যতার মর্যাদাকেই এসব পত্র পত্রিকায় বিশেষভাবে তুলে ধরা হতো।[৫] তবুও হিকির *বেঙ্গলগেজেট* প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে ১৭৮০ থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যেই কলিকাতা থেকে বেশ কয়েকখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজী সংবাদপত্রগুলি বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন ছিল বলে খ্রিস্টান মিশনারীগণ দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারে ব্রতী হন। এ কাজের বাহন হিসেবে তারা দেশীয় ভাষাকে গ্রহণ করায় ব্যাপক জাগরণের প্রথম সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়। মূলত বাংলা সংবাদপত্রের গোড়া পত্তন এদেরই হাতে হয়।[৬] শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীগণ শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নেই বিশেষ অবদান রাখেনি, বাংলাভাষার প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে এরাই ছিলেন অগ্রদূত।[৭] বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র কোনটি তা নির্ণয়ে অনেক তর্কের অবকাশ থাকলেও অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সংবাদপত্র জন্মলাভ করে, যার নাম *দিক্‌দর্শন*।[৮] *দিকদর্শন* প্রকাশের পর মিশনের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয় *সমাচার দর্পন* নামের আর

একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৮১৮ সালের ২৩শে মে, (১০ই জৈষ্ঠ্য, ১৩১৫) শনিবার *সমাচার দর্পনের* প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।[৯]

পরধর্মের হীনতা প্রতিপাদন বা খ্রিস্টধর্মের মহত্ব প্রচার *সমাচার দর্পনের* উদ্দেশ্য না হলেও প্রথম অবস্থায় এতে কতকগুলি 'প্রেরিত পত্র' প্রকাশিত হয়। এতে হিন্দু শাস্ত্রের যুক্তিহীনতা, কুলিনদের প্রতি কটাক্ষ প্রভৃতি থাকার কারণে বাঙালী পরিচালিত একখানা বাংলা সমাচারপত্রের অভাব অনেকেই অনুভব করছিলেন। এসময় কুলুটোলা নিবাসী দেওয়ান তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরন বন্দোপধ্যায় উভয়ে মিলে সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হন। তাদেরই প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয় হিন্দু সমাজের *প্রথম সংবাদপত্র সংবাদ কৌমুদী*।[১০] এর প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮২১ (২০শে অগ্রহায়ণ, ১২১৮)। এছাড়াও হিন্দু সমাজে প্রকাশিত সমসাময়িক অপরাপর পত্র-পত্রিকাগুলি ছিল *সংবাদ তিমিরনাশক, সংবাদ প্রভাকর, ভারতী, ভারতবর্ষ, শনিবারের চিঠি* ইত্যাদি।[১১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হিন্দু সমাজ সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করলেও মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষা ও চিন্তাচেতনার অনুপ্রবেশ আরও পরে ঘটায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুসলমান সমাজে সাংবাদিকতার আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পলাশীর বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গীয় মুসলমানদের আর্থিক বুনিয়াদ এবং রুজি রোজগারের ব্যবস্থা বিপর্যস্থ হওয়ার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনেও ব্যাপক অধঃপতন দেখা দেয়।[১২] স্বধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং অন্য ধর্মের বহুল প্রচার তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে শিথিল করে ফেলে। ধর্ম বহির্ভূত রীতিনীতি, পরধর্মের অনুকরণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মান্তর গ্রহণের সংবাদ সচেতন মুসলমানদের বিচলিত করে তোলে।[১৩] ঠিক এ সময় সমাজ সচেতন এবং ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবীত কিছু মহৎপ্রাণ ব্যক্তি সমাজকে জাগ্রত করতে এগিয়ে এসেছিলেন, যাদের হাতে বঙ্গীয় মুসলিম সাংবাদিকতার গোড়া পত্তন হয়।[১৪] মুসলমান সম্পাদিত প্রথম বাংলা সংখাদপত্র ছিল *সমাচার সভারাজেন্দ্র*। ১৮৩১ সালের ৭ মার্চ (১৩২৭ সালের ২৫শে ফাল্গুন) পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন কলিঙ্গ নিবাসী শেখ আলিমুল্লাহ্।[১৫] পত্রিকাটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে সমসাময়িক পত্রিকা *সমাচার দর্পন* উল্লেখ করেছিল যে, হিন্দু পাঠক মহলে *সমাচার সভারাজেন্দ্রের* বেশ জনপ্রিয়তা ছিল।[১৬] এছাড়াও মুসলমান সমাজে অপরাপর সংবাদপত্রগুলির মধ্যে *জগুদ্দীপক ভাস্কর, সাপ্তাহিক সুধাকর, মোসলেম সুহৃদ, বঙ্গনূর, সাম্যবাদী, মোহাম্মাদী, সওগাত* প্রভৃতি পত্রিকাও বহুল প্রচলিত ছিল।

প্রবাসী পত্রিকা ও মুসলমান সমাজ

ভারতবর্ষে সাংবাদিকতার উদ্ভব ও বিকাশের পর আমরা লক্ষ্য করি যে, হিন্দু সমাজের বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে এবং

তাদের পত্র-পত্রিকায় মুসলমান সমাজ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে মুসলমান সমাজের উন্নয়ন সাধনে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। হিন্দু তথা বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে বহুল প্রচলিত এরূপ একখানি মাসিক পত্রিকা হলো *প্রবাসী*।[১৭] মুসলমান সমাজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সমসাময়িক পত্র পত্রিকাগুলোর মধ্যে সম্ভবত *প্রবাসী* পত্রিকাতেই আমরা বেশী লক্ষ্য করে থাকি।

প্রবাসীর সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ চট্টপাধ্যায়[১৮] (১৮৬৫-১৯৪৩ খ্রিঃ)। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে ও বাহিরে তিনি *মডার্ন রিভিয়্যুর* সম্পাদক হিসাবে বেশী পরিচিতি থাকলেও বাংলা ভাষাভাষী লোকেরা তাঁকে সুবিখ্যাত মাসিক *প্রবাসী* পত্রিকার সম্পাদকরূপেই বেশী জানেন।[১৯] তবে শুধুমাত্র সম্পাদক বললেই রামানন্দ চট্টপাধ্যায়ের সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে না। তিনি ছিলেন একাধারে মানবদরদী, স্বদেশপ্রেমিক, দেশীয় শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি ঐতিহ্যের একান্ত অনুরক্ত, জাতীয় সর্বাঙ্গীন উন্নতিকামী লোক শিক্ষারত এবং সাহিত্য প্রতিভা সমন্বীত তেজীয়ান ব্যক্তি।[২০] প্রথম জীবনে তিনি অধ্যাপনা কাজে লিপ্ত থাকলেও পরবর্তী জীবনে পত্র-পত্রিকা সম্পাদনাকেই পেশা হিসাবে বেছে নেন। সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে থেকে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি পত্র-পত্রিকা সম্পাদনায় মনোনিবেশ করেন বলেই তাঁর প্রকাশিত পত্রিকায় মুসলমান সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে নিবন্ধ-প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হয়। কারণ রামানন্দ চট্টপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন যে, আমরা প্রথমে ভারতবাসী পরে বাঙালী। সুতরাং ভারতবাসীর পক্ষে যা কিছু কল্যাণকর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীর নিকট তা কল্যাণপ্রসু না হয়ে পারে না। *প্রবাসী* তাই ভারতবাসীর বিবিধ আলোচনার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।[২১] হিন্দু সমাজের বিভিন্ন অভাব অভিযোগের পাশাপাশি মুসলমান সমাজের বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়েও *প্রবাসীতে* আলোচনা করা হয়।

প্রবাসীতে 'দেশের কথা' নামের একটি বিভাগ খোলা হয়। জৈষ্ঠ্য ১৩২১ সালে এ বিভাগটি প্রথম চালু হয়। এ বিভাগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক প্রারম্ভেই লেখেন ঃ "বাংলাদেশের পল্লীগ্রাম ও মফঃস্বলের সাথে *প্রবাসীর* পাঠকদের কতকটা যোগ যাহাতে স্থাপিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে আমরা এ 'দেশের কথা' বিভাগে মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাদি হইতে তথাকার কার্যকলাপ, মতামত, অভাব-অভিযোগ, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ সংকলন করিয়া দিব"।[২২] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, *প্রবাসী* তার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই অগ্রসর হয়েছিল এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নিয়মিত প্রকাশনা অব্যাহত রেখে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশে সহায়তা করেছিল।

মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার আহ্বানে *প্রবাসী* পারস্য আর আব্বাসীয়

যুগের মুসলমানদের গৌরবাজ্জ্বল অধ্যায়ের কথা উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে উদ্যম আর সাহসিকতার সাথে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে শক্তিলাভের জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিল। *প্রবাসী* মনে করত পাশ্চাত্য শিক্ষার ও ধ্যান ধারণার ব্যপক বিস্তার ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের সর্বত্র যে সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছে সে ক্ষেত্রে মুসলমানগণ পিছিয়ে আছে শুধুমাত্র তাদের নিজেদের অজ্ঞানতা, অদূরদর্শিতা আর ধর্মীয় গোঁড়ামীর জন্য। *প্রবাসী* তাই পশ্চাদপদ মুসলমানদের সচেতন হবার আহবান জানিয়ে বলেছিল, "নিখিলের জাগরণ-ভেরী নিনাদিত হওয়ায় সমস্ত দেশের সমগ্র জাতি রাষ্ট্রীয় মুক্তিলাভের জন্য উন্মত্ত ও অধীর হইয়া উঠিয়াছে। সর্বত্রই সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু বাংলার মুসলমানগণ আজ নিজেদের অদূরদর্শীতা, গোঁড়ামী এবং অজ্ঞানতার ফলে বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে এবং ঘোর আলস্যে দিনাতিপাত করিয়া তাহাদের নিজেদের অতীত গৌরবকে মুছিয়া ফেলিতে বসিয়াছে"।[২৩]

বিভিন্ন দেশ তাদের জাতীয় গৌরবগাথা স্মরণপূর্বক নিজেদের জাগরণের জোয়ার পরিচালনা করলেও ভারতীয় মুসলমানগণ ছিল সে ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ অবস্থায় সমাসীন। তাই ভারতীয় মুসলমানদেরকেও জাতীয় জাগরণে শরিক হওয়ার আহবান জানিয়ে *প্রবাসী* বলেছিল, "পারস্য-আরবীয় যুগের বিজাতীয় গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগের জামশেদ, জোহাক, ফরিদুন, কায়কোবাদ, খসরু এবং রোস্তমের নামেই মাতিয়া উঠিতেছে। প্রাচীন জেন্দাবেস্তা ধর্ম বা আধুনিক কোরআনের ধর্ম এই জাতীয় গৌরবের আলোক পুঞ্জের পথে কোন ব্যবধানের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তুরস্কও তাহার বৌদ্ধপূর্ব পুরুষ চেঙ্গিশ খান, হালাকু, কুবলা ও মঙ্গু খা প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী বীরেন্দ্রবর্গের ছবি বা আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই জাগিয়া উঠিতেছে। মোস্তফা কামাল পাশা আরবীয় ঐতিহ্যকে লালন করিয়াই জাগিয়া উঠিতেছে। অথচ ভারতীয় মুসলমানগণ তাদের প্রাচীন গৌরবময় অধ্যায়কে ভুলিতে বসিয়াছে। আরবীয় বা আব্বাসীয় বংশের সেই অতীত ঐতিহ্যকে তারা আর লালন করিতেছে না।"[২৪]

ভারতবর্ষে শাসন প্রণালীর প্রবর্তন ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও মুসলমানদের একটা গৌরবময় ঐতিহ্য ছিল। বিশেষত মোঘল শাসনামলে বিভিন্ন প্রদেশে একই ভাষা, একই শাসন পদ্ধতি প্রবর্তন ছিল মুসলমানদের জন্য শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। *প্রবাসী* অনুধাবন করেছিল যে, মোঘল শাসকগণ তাদের সাম্রাজ্য সীমানায় এমন এক কার্যধারা নিয়ে শাসনদন্ড পরিচালনা করতেন যা ছিল জাতীয় একতার ক্ষেত্রে অমূল্য সম্পদ। *প্রবাসী বলেছিল*, "আকবর থেকে মুহম্মদ শাহ্ পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছর ভারতের সর্বদক্ষিণাংশ ভিন্ন এই মহা ভূখন্ড এক রাজার অধীনে ছিল। খন্ড রাজ্যের আহরন সংঘর্ষ, অভ্যন্তরীণ অশান্তি, ধন-জনক্ষয় এই কালের জন্য প্রায় তিরোধান করিয়াছিল।

প্রায় সমগ্র ভারত নিজ রাজনৈতিক একতা অনুভব করিয়াছিল। ইহার পূর্বে আর এইরূপ হয় নাই। মোগল সাম্রাজ্য কাশ্মীর থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া ২০টি প্রদেশ ঠিক একই শাসনপদ্ধতি, এক সরকারী ভাষা, এক শ্রেণীর মুদ্রা, একই প্রকার পথের ও ডাকের বন্দোবস্ত চলিত। এই রাজনৈতিক একতা যে মোগল সাম্রাজ্যের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল তাই নয়, পার্শ্ববর্তী হিন্দু সামন্ত রাজাগণও এমনকি স্বাধীন মারাঠাগণ মোগল শাসনপদ্ধতি ও আদব কায়দা অনেকটা অনুসরণ করিয়া চলিত। জাতীয় একতা সাধন করিবার পক্ষে এই উপাদানগুলি অমূল্য সম্পদ রূপে বিবেচিত হয়"।[২৫]

সাহিত্য ও শিল্পকলায় বাংলার মুসলমানদের বিভিন্নমূখী অবদানের কথাও *প্রবাসী* কৃতিত্বের সাথে উল্লেখ করেছিল। *প্রবাসী* গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল যে, এদেশে মুসলমানদের আগমন আর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনেও যেন একত্রে গৃহীত রয়েছে। কারণ হিসাবে অবশ্য *প্রবাসী* উল্লেখ করেছিল যে, মুসলমানগণ বাংলা ভাষাকে শুধুমাত্র মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং এর উৎকর্ষ সাধনও ব্যাপক মাত্রায় তাদের নিয়োজিত রেখেছে। ঐতিহাসিক সাহিত্য রচনায় মুসলমানদের অবস্থান উল্লেখ করতে গিয়ে *প্রবাসী* বলেছিল, "ঐতিহাসিক সাহিত্য ভারতে যে মুসলমানদের দান তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নেই এবং এই দান যে কত মূল্যবান তাহা যাহারা এ বিষয়ে চর্চা করিয়াছেন তাহারাই পূর্ণমাত্রায় বুঝিতে পারেন। মুসলমানগণ আসিবার পূর্বে হিন্দুগণ ইতিহাস লিখে নাই। অথচ প্রত্যেক দেশেই মুসলমানগণ বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। সেগুলি বাস্তব ঘটনার ভিত্তির উপর গঠিত। অতীত যুগের ঘটনা জানিবার পক্ষে এগুলি অমূল্য এবং একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য উপকরণ"।[২৬]

সাহিত্যের মাধ্যমে মুসলমানগণ বিশ্বব্যাপী মিলনের আদর্শ স্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন। সর্বজনীন সাহিত্য রচনার সামগ্রিক প্রয়াস অব্যাহত ছিল বলেই সমাজে পাঠকের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। পশ্চাদপদ মুসলমান সম্প্রদায়কে সাহিত্যের মাধ্যমে জ্ঞান বিস্তারের আহবান জানিয়ে *প্রবাসী* বলেছিল, "বর্তমান সময়ে বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় মাঝে মাঝে বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। মুসলমানদের রচনায় পান্ডিত্যের স্বাক্ষরের জন্য মুসলমান সমাজের পাঠকের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই মুসলমান সাহিত্যিকগণের নিকট আমরা অনুরোধ জানাই এই বলে যে, মুসলমান সভ্যতা মুসলমানদের বিশ্বব্যাপী মিলনের যে আদর্শ কার্যে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়াছে তাহা সাহিত্য চর্চায় অব্যাহত রাখুন এবং সাহিত্যের মাধ্যমে জ্ঞান বিস্তার করিয়া নব্যভাব জাগিয়ে তুলুন এবং উন্নয়নশীল জাতির মধ্যে গণ্য হউন।"।[২৭]

শিল্পকলায় বাংলার মুসলমানদের অবদান তুলে ধরেও *প্রবাসী* প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশ করে। বিশেষত স্থাপত্যশিল্পে মুসলমানদের গৌরবের গাথা ভারতবর্ষে আজো বিদ্যমান।

শুধু স্থাপত্য শিল্পেই নয় কুটির শিল্প ও নির্মান শিল্পেও মুসলমানদের অবস্থান ছিল সুদৃঢ়। *প্রবাসী* উল্লেখ করেছিল, "মোসলেম সভ্যতার উন্নতির গুণে ইসলাম জগতের সর্বত্রই শিল্প আবিষ্কারের পূর্ণভাব বিদ্যমান ছিল। ফলত যখন সমগ্র পৃথিবী শিল্পচর্চা ও ব্যবহারিক শিল্প বিজ্ঞান সম্বন্ধে ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল তখন মুসলমানগণই জগতের বিবিধ নতুন শিল্প দ্রব্যের আবিষ্কার ও প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন"।[২৮]

স্থাপত্যশিল্পে মোসলমানদের নির্মাণকলার ক্রমবিকাশ আলোচণ করতে গিয়ে অন্য এক প্রবন্ধে বলা হয়ঃ "স্থাপত্য বিদ্যায় মুসলমানগণ ভারতকে যাহা দিয়া গিয়াছে তাহার অনেকগুলিই আমাদের চোখের সম্মুখে বিদ্যমান। ভারতের মুসলমান অট্টালিকার নির্মাণকলার যুগে যুগে ক্রমবিকাশ এখনও অতি সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিতে পারা যায়"।[২৯]

শিল্পে মোসলমান সম্প্রদায়ের অগ্রগতিতে বাদশা ও সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল বেশী। মুলত তাদের উৎসাহ আর পৃষ্টপোষকতাই মুসলমানদের শিল্পন্নোয়নে সবিশেষ সহায়তা করেছিল। *প্রবাসী* উল্লেখ করেছিল, "মুসলমানগণই পৃথিবীতে সর্বাগ্রে চিনি প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। কেবল দেশের বাদশা ও বাণিজ্য বাবসায়ীগণই যে কেবল শিল্পানুরাগী ছিলেন তাহাই নয়, দেশের আমীর - ওমরাহ্ এবং ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে শিল্পন্নোতি সাধনের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। এক এক জন বড়লোক বহু শিল্প সংক্রান্ত কারখানার পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন"।[৩০]

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য ও দেশীয় ভাষার শিক্ষার সম্প্রসারণে *প্রবাসীর* ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গৌরবের। বিশেষত মুসলমান সমাজ ঘোর আলস্যে দিনাতিপাত করার ফলে সমাজে শিক্ষার ভাবধারা বিনষ্ট হচ্ছিল, কুসংস্কার আর গোড়ামীতে সমাজের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছিল সে সময় মুসলমান সমাজকে শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত করতে *প্রবাসী* অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসন বাংলায় প্রবর্তিত হবার পরেও মুসলমান সমাজ পাশচাত্যে শিক্ষা গ্রহণ করা থেকে বিরত হয়ে দেশীয় ভাষায় মক্তব মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার্জনের দিকেই বেশী মাত্রায় ঝুঁকে পড়েছিল। গুটিকয়েক আশরাফ শ্রেণীর মুসলমান পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করলেও অধিকাংশই ছিল এ শিক্ষা গ্রহণের বিপক্ষে। এত প্রতিকুলতার মাঝেও মুসলমান সমাজের ২/১ ছাত্র/ছাত্রী পরীক্ষায় তাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। যা ছিল সত্যিকার অর্থেই বিস্ময়কর। সমাজের নানাবিধ প্রতিকুলতা জটিলতার মাঝেও মুসলমান সমাজের ঐ সমস্ত ছাত্র/ছাত্রীর কৃতিত্ব প্রদর্শনকে তাই *প্রবাসী* অত্যন্ত আনন্দ সহকারে উল্লেখ করে বলেছিল - "কুমারী ফজিলাতুন্নেসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের পরীক্ষায় প্রথম

শ্রেণীতের প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। উহা অতিশয় আনন্দের বিষয়। মুসলমান ছাত্রী তো দূরে থাক কোন মুসলমান ছাত্র বঙ্গে এরূপ কৃতিত্ব ইতপূর্বে প্রদর্শন করিতে পারে নাই। এটা মুসলমান সমাজের জন্য অতিশয় কল্যাণকর"।[৩১]

বাংলায় মুসলমান শাসন প্রবর্তিত হবার পর মুসলমানগণ শিক্ষার সম্প্রসারণে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। মুসলমান শাসকগণ শিক্ষার সম্প্রসারণে উদার নৈতিক চিন্তাধারায় পরিচয় দেওয়ায় সবার মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছিল। মুসলমানদের জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত হবার একটা আগ্রহও যথার্থ পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু মুসলমান শাসনাবসানের পর শিক্ষায় মুসলমানদের দুর্গতি ইংরেজ কুটকৌশলেরই যেন বহিঃপ্রকাশ। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজে প্রচলিত সনাতন শিক্ষা পদ্ধতিও কম দায়ী ছিল না। *প্রবাসী* তাই মুসলমানদের যথার্থ শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করে চলার উপর গুরুত্বারোপ করেছিল। *প্রবাসী* লক্ষ্য করেছিল যে, শিক্ষার প্রতি মুসলমানগণ কিঞ্চিত আকৃষ্ট হলেও প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ, প্রয়োজনের তাড়না, সরকারী কুটনীতির চক্র প্রভৃতি নানারূপ অনুকূল ও প্রতিকূল আবর্তের মধ্যে পড়ে রাষ্ট্রনীতির ন্যায় শিক্ষা ক্ষেত্রেও মুসলমানেরা যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছে। *প্রবাসী* তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহবান জানিয়ে বলেছিল - "বর্তমান সময়ে শিক্ষার দিকে মুসলমানদের দৃষ্টি পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিত অধিক আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ, প্রয়োজনের তাড়না, সরকারী কুটনীতির চক্র প্রভৃতি নানারূপ অনুকূলও প্রতিকূল আবর্তের মধ্যে পড়িয়া রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষা বিষয়েও মুসলমানেরা যেন দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, ওল্ড স্কিম, নিউ স্কিম এগুলির মধ্যে কোনটি অবলম্বন করিলে সমাজের শিক্ষা সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইতে পারে - এখন হইতেই এ সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা পূর্বক কার্য না করলে সমাজের অনিষ্ট হইবার সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে"।[৩২]

মুসলমান সমাজের একাধিক দুরদর্শী ব্যক্তির সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলে যখন ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটাতে এগিয়ে এসেছিল তখনও মুসলমানদের মধ্যে থেকে আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া না দেখানোর জন্য *প্রবাসী* হতাশা প্রকাশ করেছিল। *প্রবাসী* এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছিল মুসলমানদের সনাতনী ভাবধারা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরাতন পদ্ধতির অনুসরণই তাদের আধুনিক শিক্ষায় অনগ্রসরতার একমাত্র কারণ। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, অথবা কি হওয়া উচিৎ এবং মুসলমান সমাজে প্রচলিত পদ্ধতির দ্বারা তা পূরণ হতে পারে কিনা সে বিষয়ে 'মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা' শিরোনামে বলা হয়েছিল - "আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার দুটি পদ্ধতি চালু করা হইয়াছে। একটি নিউ স্কিম অপরটি ওল্ড স্কিম। যাহারা শিক্ষায় পাণ্ডিত্য অর্জনপূর্বক চাকরি করিবার

ইচ্ছা প্রকাশ করেন, অবশ্যই তাহারা নিউ স্কিম চালু করিবার পক্ষপাতী। আর যাহারা দ্বীন-ই আলেম হইবার ইচ্ছা করেন তাহারা মাদ্রাসা শিক্ষার দিকে ধাবিত হইবেন ইহাই কাম্য"।[৩৩]

প্রবাসী মনে করতো ওল্ড স্কিম শিক্ষার সাথে বিজ্ঞান যুগের কোন মিল নেই। এমনকি এখানে ছাত্র/ছাত্রী ভালভাবে না শিখে মাতৃভাষা কিংবা ভালভাবে না শিখে কোরআন। সুতরাং এই জাতীয় শিক্ষার ফলে যে কি হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। *প্রবাসী* তাই এই জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি পরিহার করে নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানিয়েছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষায়ও *প্রবাসী* বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল। বিশেষত বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে যখন হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক উত্তেজনা ও তিক্ততার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল সে সময় *প্রবাসী* হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি স্থাপন আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। *প্রবাসীর* লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই ছিল দীর্ঘ দিন থেকে একই প্রাচ্যভূমিতে বসবাসরত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দের সেতু বন্ধন রচনা করা।

মুসলমান শাসনামলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ ও প্রীতির সম্পর্ক বজায় থাকলেও ব্রিটিশ শাসনামলে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে ছোট খাট বিষয় নিয়ে মত পার্থক্য সৃষ্টি হওয়ায় দীর্ঘ দিনের সম্পর্কের ভাটা পড়ে। ইংরেজও শাসন প্রণালীর ক্ষেত্রে এমন কিছু নীতি অবলম্বন করে দুই সম্প্রদায়ের পরস্পরকে দুরে সরিয়ে নিতে থাকে। এই অবস্থায় হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে *প্রবাসী* এগিয়ে আসে। *প্রবাসী* মনে করে যে, শতাব্দীকাল ধরে একত্রে বসবাসরত হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে গভীর মৈত্রীভাব জমে আসছে তা সভ্যতা দীপ্ত প্রতীচ্য ভূমিতে এক ধর্মাবলম্বী জাতিদ্বয়ের মধ্যেও আশা করা যায় না, *প্রবাসীর* মতে, এই ভাব ক্রমে ক্রমে পুষ্টতর হওয়ার একমাত্র কারণ উভয়ের আপদ বিপদে উভয়ে এগিয়ে আসা। "প্রায় শতাব্দীকাল ধরে একতাবস্থানের নিবন্ধনহেতু হিন্দু মুসলমানের ভিতর যে গভীর মৈত্রীভাব ক্রমেই জমিয়া আসিতেছে, তাহা সভ্যতা দীপ্ত প্রতীচ্যভূমিতে এক ধর্মাবলম্বী জাতিদ্বয়ের মধ্যেও আশা করা যায় না। সেই যখন মুসলমান নেতা হিন্দু বিজিত ছিল, তদবধি এই ভাব সঞ্জাত এবং প্রতিবেশী হিন্দু মুসলমান পরস্পরের আপদ-বিপদে পরস্পরের সাহায্য করায় ক্রমশ ইহা পুষ্টতর হইতেছে"।[৩৪]

হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের উপর তাই পরস্পরের আস্থা আর বিশ্বাস ক্রমেই ভারত ভূমিতে জমে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে শ্রী রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী 'ব্যাধি ও প্রতিকার শিরোনামে' *প্রবাসীতে* বলেছিলেন - "ধর্মগত ও আচরণগত উৎকট পার্থক্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে ক্ষমা ও শ্রদ্ধা করতে জানেন এবং সেই জন্য ভারতবর্ষে উভয়ের প্রীতি রক্ষা সম্ভবপর হইয়াছে"।[৩৫]

ব্রিটিশ রাজন্যবর্গ এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের সৃষ্টি করলে তাদের কঠোর সমালোচনা করে উক্ত প্রবন্ধে আরো বলা হয়েছিল, ‘ইংরেজ কথায় কথায় বড়াই করিয়া থাকেন, আমরা চলিয়া গেলেই ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের গলায় ছুরি চালাইবে। তাহাদের এই বড়াই আমাদের ভুলাইতে পারিবে না। দক্ষিণ দেশের হায়দ্রাবাদের নিজাম মুখ্যত হিন্দুদের উপর আর উত্তর দেশের কাশ্মিরের জম্মুপতি মুখ্যত মুসলমান সমাজের উপর আধিপত্য করিতেছেন; কিন্তু কোথাও হিন্দু মুসলমানের ছুরি চালা-চালির কথা শুনিতে পাইতেছি না। ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান উভয়ই যেভাবে পরকে আপন করিতে জানে তাহা পৃথিবীর আর কোন জাতি জানে না। অন্তত কোন খ্রিস্টান জাতি জানে না। হিন্দু মুসলমান এতকাল ধরিয়া এক গ্রামে এক ছাদের নিচে বসবাস করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এত দিন যাবত খ্রিস্টান কোথায় মুসলমানের সান্নিধ্য সহিয়াছেন, তাহা ইতিহাস লেখে না"।[৩৬]

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভ্রতৃত্ববোধকে সুদৃঢ় করতে *প্রবাসীতে* আহ্বান করা হয় যে, "ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান একই মাতার একটি গর্ভজাত অপরটি স্তন্য পালিত জাত সন্তান। এই দুই সন্তানের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ কি হয় না? অবশ্যই হয় - সকলের শাস্ত্র সম্মতভাবেই হয়। অতএব ভারতবাসিনী হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ জন্মিয়াছে। বিবাদ করিলে সে সম্বন্ধ উচ্ছেদ সাধন হয়"।[৩৭]

এছাড়াও মুসলমান সমাজের সংস্কারে *প্রবাসী* পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সমাজের সংস্কার সাধনের প্রয়াসে *প্রবাসীতে* লেখা হয়, "পরিবর্তন ও সংস্কার ব্যতিরেকে কোন সামাজিক ব্যবস্থা চিরকাল কল্যাণকর থাকতে পারে না। আগেকার দিনের কথা ছেড়ে দিলেও আমরা আধুনিক সময়ে দেখতে পাই বঙ্গের রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশব সেন প্রমুখ সংস্কারকের নাম উদ্ভব হয়েছে। হিন্দু সমাজের এমন সংস্কারকের ন্যায় মুসলমান সমাজে একমাত্র আলিগড়ের স্যার সৈয়দ আহমেদের নাম উল্লেখ করা যায়। কিন্তু সমাজে সংস্কারকের আবির্ভাব ভিন্ন মুসলমান সমাজের উন্নয়ন আশা করা যায় না।"।[৩৮]

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মুসলমান সমাজের উন্নয়ন ও বিকাশে *প্রবাসীর* ভূমিকাকে এই স্বল্প পরিসরে এবং দুএকটি প্রবন্ধের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন বিস্তৃত আলোচনার। তবে যেটুকু আলোচনা করা গেল তার দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, পত্রিকাটি উদারনৈতিক ভাবধারাকে বজায় রেখে তার প্রকাশনা প্রথম থেকে শেষ অবধি অব্যাহত রেখেছিল বলেই বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের একাধিক বিষয় নিয়ে পত্রিকাটি আলোচনা করেছিল। স্বল্প পরিসরে আমার এ প্রবন্ধের দ্বারা সে বিষয়টির প্রতিই আমি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি।

বিংশ শতাব্দীকে বলা চলে বাংলার সমসাময়িক পত্রের স্বর্ণযুগ। এ সময় সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে সাময়িক পত্রের চাহিদা ব্যাপকভাবে দেখা যায়। ফলে, অসংখ্য পত্র-পত্রিকা হিন্দু ও মুসলমান সমাজে আবির্ভূত হয়, সংবাদপত্রের মুদ্রণ সৌষ্ঠব সুচারু হয়। এর মধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের আগেকার ঐতিহ্যমন্ডিত পত্রিকা *প্রবাসীর* গৌরব ও প্রভাব ছিল অতুলনীয়। কারণ, সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য বিবিধ সম্ভারে সজ্জিত হয়ে যেসব পত্রিকা এসময়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল তার মধ্যে *প্রবাসী* ছিল সবচাইতে উল্লেখযোগ্য। এ পত্রিকায় বিভিন্নভাবে আলোচিত মুসলিম প্রসঙ্গগুলি বিবেচনা করলে আমাদের মন বিস্ময়ে অভিভূত হয়। হিন্দু পত্রিকায় মুসলমান সমাজের ব্যাপক আলোচনা সম্পাদক রামানন্দ চট্টপাধ্যায়ের উদারনৈতিক চিন্তা-ধারারই প্রতিফলন। শুধু তাই নয়, *প্রবাসীর* 'বিবিধ প্রসঙ্গ'[৩৯] শিরোনামে তৎকালীন নাতিদীর্ঘ আলোচনা, সে যুগের ইতিহাস রচনারও মূল্যবান দলিল।

সূত্রনির্দেশ

১। Smarajait Chakravarti, *The Bengali Press (1818-1868)*. Calcutta, Firma KLM Pvt. Ltd., 1976. p-1.

২। *Ibid,* p-2.

৩। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালী নবজাগরণ*, কলিকাতা, মন্ডল এন্ড সন্স, ১৯৮৮, পৃঃ-৬।

৪। সাখাওয়াত আলী খান, 'উন্মেষকালে বাংলা সাংবাদিকতা,' *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ৭ম ও ৮ম খন্ড, আষাঢ়, ১৩৮৫, পৃঃ ৫৪।

৫। নন্দলাল ভট্টাচার্য, *সংবাদ পত্রের ইতিবৃত্ত*, কলিকাতা, ১৪০৫, পৃঃ ২৬।

৬। মুল বেভারেজ জেমস্ লং, (অনুবাদ ঃ হাবিবুর রহমান) "বাংলা সাহিত্য ও সাংবাদিকতার আদিপর্ব," *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ২৪শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, শ্রাবণ-পৌষ-৩৮৬, পৃঃ ১।

৭। A. F. Salahuddin Ahmed, *Social Ideas and Social Change in Bengal (1818-1835)*, Leiden, E. J. Brill 1965, p-80.

৮। *Ibid*, p-81.

৯। *Ibid*, p-81.

১০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৮৬৮)*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩২২, পৃঃ ১৯।

১১। ঐ পৃঃ ১৭।

১২। আজিজুর রহমান মল্লিক (দিলয়ার হোসেন অনুদিত), *ব্রিটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃঃ ৪৭।

১৩। মুহম্মদ নুরুল কাইয়ুম, "বঙ্গীয় মুসলিম সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য ঃ একটি পর্যালোচনা," *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, চতুর্দশ খন্ড, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর-১৯৯৬ / পৌষ, ১৪০৩, পৃঃ ৮০।

১৪। ঐ পৃঃ ৮০।

১৫। A. F. Salahuddin Ahmed, *op.cit,* p-97.

১৬। *ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বাংলা সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭১, পৃঃ ১৮৬।

১৭। *প্রবাসী* বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। পত্রিকাটি বাংলা ১৩০৮ সনের বৈশাখ মাস মোতাবেক ১৯০১ ইংরেজী সালে থেকে প্রকাশিত হয়। বিবিধ বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে *প্রবাসী* তৎকালীন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। যতদূর জানা যায় সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩) প্রবাসে থাকাকালীন (এলাহাবাদ) পত্রিকাটি সম্পাদন করতেন বলে পত্রিকাটির নামকরণ হয় *প্রবাসী*। বিস্তারিত বিবরণের জন্য আরো দেখা যেতে পারে সাহিত্য সাধক রচিতমালা, (দশম খন্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩৭০।

১৮। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৫ সালের ২৮শে মে কলিকাতার বাকুড়া শহরের পাঠক পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম রামলোচন আর মাতা হরসুন্দরী দেবী। প্রথম জীবন থেকেই লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী ও সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি ছিলেন অনুরক্ত। প্রাথমিক জীবনে অধ্যাপনা কাজে নিয়োজিত থাকলেও পরবর্তী কালে তিনি পত্রিকা সম্পাদনাকেই নিজের জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। আজীবন তিনি সাহিত্য সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন এবং ১৯৪৩ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত *প্রবাসী* সম্পাদনা করেন।

১৯। শ্রীযুক্ত শান্তা দেবী, *ভারতমুক্তি সাধক রামানন্দ ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা*, কলিকাতা-১৯৪২, পৃঃ ৫।

২০। *সাহিত্য সাধক চরিতমালা* (দশম খন্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩৭০, পৃঃ ৫।

২১। গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক পত্রিকা পঞ্জি (১৯০০-১৯১৪)*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৯০০, পৃঃ ২।

২২। *প্রবাসী*, চতুর্দশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জৈষ্ঠ ১৩২১, পৃঃ ৬।

২৩। "মুসলমান বাঙ্গালীর অতীত গৌরব" *প্রবাসী*, ৩২শ ভাগ, ১ম খন্ড, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৩১, পৃঃ ১৪৯।

২৪। শ্রী রামপ্রাণ গুপ্ত, "ভারতীয় মুসলমান" *প্রবাসী*, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩১৪, পৃঃ ১৪১।

২৫। "বিবিধ প্রসঙ্গ" *প্রবাসী*, ৩২শ ভাগ, ২য় খন্ড, কার্ত্তিক ১৩৩৯, পৃঃ ১৫১।

২৬। শ্রী যদুনাথ সরকার, "মুসলমান যুগ হইতে কি পাইয়াছি", *প্রবাসী*, ২০শ ভাগ, ২য় খন্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪০, পৃঃ ৩৮।

২৭। "মুসলমান সাহিত্যিক," *প্রবাসী*, ১৮শ ভাগ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩২৫, পৃঃ ২২৪।

২৮। "শিল্পক্ষেত্রে মুসলমান," *প্রবাসী*, ১৪শ ভাগ, ১ম খন্ড, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩২২, পৃঃ ৬১৪।

২৯। *ঐ*, পৃঃ ৬১৫।

৩০। "স্থাপত্য শিল্পে মুসলমান," *প্রবাসী*, ১৫শ ভাগ, ১ম খন্ড, বৈশাখ ১৩৩৬, পৃঃ ১৭৪।

৩১। "মুসলমান মহিলা এম. এ", *প্রবাসী*, ২৭শ ভাগ, ২য় খন্ড, ১ম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩৩৪, পৃঃ ১৫০।

৩২। "বিবিধ প্রসঙ্গ", *প্রবাসী*, ৩০শ ভাগ, ২য় খন্ড, ৫ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৭, পৃঃ ৭৮০।

৩৩। মোঃ ওয়াজেদ আলী, "মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা" *প্রবাসী*, ২৮শ ভাগ, ২য় সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩৩৫, পৃঃ ৮৪৫।

৩৪। "বঙ্গে হিন্দু মুসলমান" প্রবাসী, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, *শ্রাবণ* ১৩১৪, পৃঃ ১৯৭।

৩৫। শ্রী রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, "ব্যাধি ও প্রতিকার", *প্রবাসী*, ৭ম ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১৪, পৃঃ ৩৪৪।

৩৬। ঐ, পৃঃ ৩৪৫।

৩৭। "হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক," প্রবাসী, ৪র্থ ভাগ, ১০ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩১১, পৃঃ ৫২৮।

৩৮। "মুসলমান সমাজে সংস্কারের চেষ্টা," *প্রবাসী*, ২৯শ ভাগ, ২য় সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩২, পৃঃ ৩১৬।

৩৯। *প্রবাসী* পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে একটি বিভাগ থাকত। এ বিভাগে মুসলমান সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থাকত। যা ছিল ইতিহাস রচনার প্রামাণ্য দলিল।

সাম্প্রদায়িকতা, শিক্ষা ও রাজনীতি - (১৯৩৭-৪২)

প্রগতি বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সর্বাধিক বৃহৎ পিছুটান হোল সাম্প্রদায়িক সমস্যা। স্বদেশীযুগে কিছু সংখ্যক জাতীয়তাবাদী মুসলমান জননেতার সাক্ষাৎ আমরা পাই। উদাহরণত, আব্দুল রসুল, আব্দুল হালিম গজনভী, লিয়াকৎ হোসেন এবং আক্রম খাঁ প্রমুখ। খিলাফৎ এবং অসহযোগ (১৯২১) আন্দোলনের সময় হিন্দু মুসলমান ঐক্য আবার বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯২০ দশকের মাঝামাঝি থেকে এই দুই সম্প্রদায়ের বোঝাপড়ার অভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে। পুনা চুক্তি (১৯৩২, সেপ্টেম্বর) ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (১৯৩২, আগষ্ট) কে কেন্দ্র করে পরিস্থিতির অবনতি দেখা দেয়। ১৯৩০-এর শেষ দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকী চিহ্ন পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে।[১]

হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের অন্যতম কারণ ছিল ইংরাজী শিক্ষা বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মনোভাবের পার্থক্য। একথা সকলেই জানেন যে ইংরাজী শিক্ষার ফলে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা কোম্পানীর আমলে দেখা দিয়েছিল বাঙালী হিন্দুরাই তার প্রথম সদ্ব্যবহার করে। উল্টো দিকে মুসলমানরা ক্ষমতা হারিয়ে অধিক সংকীর্ণতার আশ্রয় নেয়। শীলা সেন অবশ্য "The feeling of Hindu Dominance"-কে আধুনিক শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের অনাসক্তির কারণ হিসাবে দায়ী করেছেন।[২] মুসলমানদের মনে হয়েছিল তাদের বর্তমান দুর্দশার কারণ হল শরিয়তের নির্দেশ অমান্য করার পরিনাম। মুসলমান সমাজে এই কারণেই ওয়াহাবী (১৮৩১-১৮৩৮), ফরাজী আন্দোলন ধর্মীয় মৌলবাদের রূপ গ্রহণ করে যদিও গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগের কথাও তার মধ্যে দিয়েই ব্যক্ত হয়েছিল।

বাংলার মুসলমান সমাজকে আধুনিকতার পথে যাঁরা এগিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নবাব আমির আলি (১৮১২-১৮৭৯ খ্রিঃ), আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নবাব আমির আলি ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে 'ন্যাশানাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে তোলেন। ১৮৫২ ও ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে আবদুল লতিফ মুসলমান যুবকদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে আবদুল লতিফ 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটী অব্ ক্যালকাটা' প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদের

সংঘবদ্ধ করেন। কেরামত আলি ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আমির আলি ও "সেন্ট্রাল ন্যাশানাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালকাটা" গঠন করে মুসলমানদের অবস্থা উন্নয়নে অগ্রসর হন। প্রথম বাঙালী মুসলমান গ্রাজুয়েট দিলওয়ার হোসেন আহমদ মির্জা অনেক ইংরাজী প্রবন্ধের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে সংস্কার সাধন করে তার উন্নতির চেষ্টা করেন। তিনি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আমির আলি প্রতিষ্ঠিত সভার সহ-সভাপতিও হন। পরবর্তীকালে ঢাকা শহরের শিক্ষিত মুসলমানরা "ঢাকা মহামেডান ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশন" (১৮৮৩ খ্রিঃ) নামক একটা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা মৌলানা কেরামত আলি (১৮০০-১৮৭) তাঁর সহায় হন। কেরামত আলি মুসলমান ছাত্রদের ইউরোপীয় ভাষা আয়ত্ব করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের উপদেশ দেন। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালী মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

ফজলুল হকের মন্ত্রীসভায় বাংলার শিক্ষাবিদ প্রসঙ্গে যে বিতর্ক কয়েক বছর ধরে চলেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত কথাগুলি মনে রাখা প্রয়োজন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন জেলাস্তরে কার্যকর ছিল না, ফলে স্কুল বোর্ডের নির্বাচনে আগের মতই হিন্দু-মুসলমানরা একত্রে ভোট দিত। এইসব নির্বাচনে কেবল মাত্র যারা এক টাকা হারে চৌকিদারী খাজনা দিত কিংবা স্নাতক বা সমতুল্য ডিগ্রির অধিকারী ছিল তারাই ভোট দিতে পারত। এর ফলে হিন্দু সম্প্রদায় আঞ্চলিক স্তরে প্রাধান্য পেয়েছিল। জয়া চ্যাটার্জী বলেছেন "For Bhadralok Hindu denied an effective role in provincial politics by the provisions of the communal award, local and district institutions remained one area where they could continue to exercise influence.[৩]

বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা তখনও পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। প্রস্তাবিত বিলের দ্বারা এর পরিবর্তন দাবী করা হয়েছিল। ১৯৪০ সালের ২১শে আগষ্ট সংশোধিত মাধ্যমিক শিক্ষা বিল উত্থাপনের সময় বাংলার আইনসভায় ফজলুল হক তাঁর বক্তব্যে বলেন, স্যাডলার কমিশনের ২০ বছর আগের রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা-ই চালু করা প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের উদ্দেশ্য ছিল। পূর্ববর্তী মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটি ছিল 'inefficient'।[৪] প্রচলিত ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে শিক্ষা বিষয়ক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় সে বিষয়ে যত্নবান ছিল না।[৫] নিচুতলার শিক্ষার প্রসারে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। ফজলুল হক তার পত্রিকায় দাবী করেন প্রস্তাবিত বিলে উন্নয়নের সম্ভাবনা আছে।[৬]

প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বৈশিষ্টগুলি আলোচনা করলেই ফজলুল হকের দাবীর যথার্থতা উপলব্ধি করা যাবে। (ক) বিলের ৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে - শিক্ষা বোর্ডটি ৩৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।[৭] এই বোর্ডে ১৮/১৯ জন সদস্য ছিল মুসলমান

সম্প্রদায়ভুক্ত। রামানন্দ চ্যাটার্জী তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে, শিক্ষিত জনগণের ৩৩ শতাংশ মুসলমান ও ৩৪ শতাংশ হিন্দু এবং স্নাতকস্তরে মুসলমান হোল ১৭ শতাংশ ও অপর পক্ষে মোট স্নাতক জনগণের ৮৪ শতাংশ হলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত, হলে কেবল মাত্র মুসলমান সদস্যদের সংখ্যা ১৮/১৯ জন হতে পারে কোন হিসাবে?[৮] (খ) বিলের ৪ নং ধারার প্রথম উপধারায় বলা হয়েছে, বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আঞ্চলিক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন, অর্থাৎ শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে গঠিত বোর্ডের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব নিয়োগের অধিকার ছিল আঞ্চলিক সরকারের হাতে। (গ) বিলের অপর এক ধারা [4 (f) and 4 (g)] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেট থেকে যথাক্রমে যে চারজন ও দুজন সদস্য নিযুক্ত হবেন তারা অবশ্যই মুসলমান জাতিভুক্ত হবেন। এছাড়া আঞ্চলিক সরকার কর্তৃক মনোনীত ১০ জন সদস্যের মধ্যে আবশ্যিকভাবেই মুসলমান জাতিভুক্ত হবেন। (ঘ) বিলের ১৬ নং ধারায় পরিদর্শকদের নিয়োগ ও বেতনক্রমের কথা বলা হলেও মাধ্যমিক শিক্ষাকে 'Direct and Control'[৯] বিষয়ে বিলের ১৮ নং ধারায় বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। (ঙ) বিলের ১৮ (২) - বি ধারায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন ও বাতিলের অধিকার বোর্ডকে দান করা হয়েছে। এর ফলস্বরূপ বিশাল সংখ্যক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন বাতিল হওয়ায় মাধ্যমিক পাশ শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমতে লাগল। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সর্বভারতীয় শিক্ষক সভার আসন প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "There we must gird up our loins, take courage and see that this mischevious thing is not allowed to be created without our strongest protest. We must rise to a man and record our strongest protest against this sinister attempt and the political move behind it."[১০]

(চ) ১৮ (২) - (সি) ধারা অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের অনুমোদন দানের অধিকারও বোর্ড অর্জন করেছিল। (ছ) এছাড়াও ১৯ নং ধারায় ৩ নং উপধারায় বোর্ডকে মুসলমান শিক্ষার উদ্দেশ্যে কমিটি গঠনের বিশেষ অধিকার দান করা হয়েছিল। (জ) অর্থনৈতিক অনুমোদনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সরকারকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। (২৪ - (৩)।[১১] (ঝ) বিলের ৪০ নং ধারা অনুসারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে আর মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার ক্ষমতা ছিল না। এই বিল বোর্ডকে উচ্চ শিক্ষার সাথে ঐচ্ছিক ক্ষমতা প্রদান করেছিল, যে ক্ষমতার ব্যবহার নির্ভর করতো সেই বোর্ডের-ই ওপর। এই বিল থেকে মনে হয়েছিল 'The Board can do wrong.'[১২] (ঞ) বিলের ৪৩ নং ধারায় বলা হয়েছিল, "No suit, procesution or legal proceedings shall lie against any person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this Act."[১৩]

অর্থাৎ এই বিলে কোথাও আইনসভা কর্তৃক বোর্ডকে নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়নি।

এই বোর্ডের অধিকাংশ সদস্যই ছিল মুসলিম বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত, যদিও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার অধিকাংশ উদ্যোক্তাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু।[১৪] বিলের প্রস্তাবনা কোথাওই মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি বা বিস্তার বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি।[১৫] আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ১৯৩৭ সালে ডিসেম্বর মাসে অ্যালবার্ট হলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিলের গঠনমূলক শিক্ষাগত উদ্দেশ্যে অভাবের কথা বলেছেন।[১৬] সামগ্রিকভাবে বিলটি পর্যালোচনা করলে এই বিলের 'officialisation' এবং 'communalism' এর প্রভাব উপলব্ধি করা যায়।[১৭]

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে স্যাডলার কমিশন তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন ১৯১৯। এই কমিশনের উদ্দেশ্য হোল 'To examine the whole question of the reorganisation of the University and formulate a constructive policy in relation to the problems.[১৮]

স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষকদের শিক্ষনের কথা বলা হলেও উক্ত বিলে আর কোন ব্যবস্থা হয়নি।[১৯] স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে "The Board must be autonomous in so far as its administration was concerned, and it must be free from official influence and interference."[২০]

কিন্তু 'autonomous' হওয়ার পরিবর্তে লীগ মন্ত্রীসভা কর্তৃক রচিত বিলে গঠিত বোর্ড হল 'A tool in the hands of the Government and is wholly against the letter and spirit of the report of the Sadler Commission.'[২১]

স্যাডলার কমিশন যথার্থ মুসলিম প্রতিনিধিত্ব রক্ষার জন্য ৩টি আসন সংরক্ষণের কথা বললেও ১৯২৬ সালের বিলে সরকার ১৪ শতাংশ, ১৯২৮-এর বিলে ১৬ শতাংশ ১৯৩৭-এর প্রথম বিলে ১৭ শতাংশ এবং দ্বিতীয় বিলে ৪১ শতাংশ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করেছিল। এই সময় স্যাডলার কমিশনে সরকারকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশী ক্ষমতা এই বিলে সরকারকে দেওয়া হয়েছিল। তাই বিরোধীরা দাবী করেন - প্রথমত, বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা নিরপেক্ষ উন্নয়ন-এর নিরপেক্ষ পরিচালন ভিত্তি হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, সাধারণ শিক্ষা ব্যতিরেকে কারিগরী শিক্ষা, যান্ত্রিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি শিক্ষার প্রতি যত্নবান হওয়া। তৃতীয়ত, বোর্ডের উচিত সম্পূর্ণ স্বশাসিত ও সরকারী হস্তক্ষেপমুক্ত হওয়া। চতুর্থত, বোর্ডের প্রেসিডেন্ট অনোপসারণযোগ্য, শিক্ষা বিষয়ক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হবেন। পঞ্চমত, পরিদর্শনকারী অফিসাররা সম্পূর্ণভাবে বোর্ডের অধীনে থাকা উচিত। ষষ্ঠত, সামান্য নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে বোর্ডের নিয়মকানুন সম্পূর্ণভাবে বোর্ড কর্তৃক-ই রচিত হওয়া উচিত। সপ্তমত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুমোদনপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি যে নিয়মিত অনুমোদন পাবে - সে বিষয়ে যথেষ্ট নিশ্চয়তা প্রয়োজন। তাছাড়া বিরোধীরা বোর্ডের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতাও দাবী করেছিলেন।

বিরোধীদের উপরোক্ত মতামতের মধ্যে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক আধিপত্যের ('communal domination') ধারণা পাওয়া যায় না। জাস্টিস সি. সি. বিশ্বাস সিনেটের বক্তৃতা প্রসঙ্গে বোর্ডের উদ্দেশ্য বিষয়ে বলেন, "It will function as an instrument of true national progress initiating its own policy of education advance in an atmosphere of real freedom, unhampered as to represent and reflect all varieties of experience and command the unquestioning confidence and good will.....'[২২]

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় অ্যালবার্ট হলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাংলায় কংগ্রেসের 'unholy alliance' এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মতে মাধ্যমিক শিক্ষায় পাঠ্য বই-এর ক্ষেত্রে 'communal and non-academic considerations.'[২৩] এর উপর ভিত্তি করে যে পাঠ্যক্রম তৈরি হবে তা শিক্ষাব্যবস্থায় কতদুর পরিবর্তন করতে পারবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কারণ পাঠ্যবই কমিটির সভাপতির পদও মুসলমান সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল। তিনি আরও বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, যেসব স্থানে মুসলমানরা সম্প্রদায় হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে যেমন মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ট হিসাবে মনোনীত হবার সুযোগ লাভ করছে, তেমনই হাওড়া প্রভৃতি জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে 'protection of minority'[২৪] অজুহাতে মুসলমানরাও মনোনীত হচ্ছে। এই ধরণের সাম্প্রদায়িক মনোভাবে পরিচালিত কোন ব্যবস্থাই কি প্রকৃত অর্থে শিক্ষা সমস্যার যথার্থ সমাধানে সম্ভব হবে? তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেন, "The so-called Education Bill may destroy the very foundation of our Cultural Heritage".[২৫]

প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের গ্রহনযোগ্যতা বিষয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী জোরের সাথে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, এই বিল বাঙলোর মানুষ কর্তৃক কোন দিন গৃহীত হবে না। তিনি এই বিলের 'Disastrous effects of officialisation.'[২৬] সম্বন্ধে ভীত হয়ে উঠেছিলেন। সমসাময়িক সরকারকে দোষারোপ করে তিনি বলেন, 'Having polluted the administration by pursuing a sordid policy based on party politics and communalism.'[২৭]

তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্পষ্টতই ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, "Education will come to an end and there will be nothing but confusion and chaos in the whole province."[২৮] বিলটি তিনি 'fundamentally unacceptable'[২৯] বলে অভিহিত করেছেন।

অপর এক বিশিষ্ট বিরোধী নেতা শরৎ চন্দ্র বসু বিলের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন, বিলটির মূল ত্রুটি হল, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের অভাব, শিক্ষকদের সমস্যা বা বিদ্যালয়ের মানগত সমস্যা বিষয়ে বিলে কিছুই বলা হয়নি। তাঁর মতে, "the bill touches only the fringe of secondary education."[৩০] বিলটিকে 'national misfortune' হিসাবে

অভিহিত করে তিনি বলেন, 'The communal principal has been meticulously applied to every department and every branch of the work of the proposed board of education.'[৩১] বিরোধী নেতা চারুচন্দ্র রায়ের মতে এই বিলের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, "To control, to regulate and to develop secondary education in Bengal."[৩২] তাঁর মতে স্যাডলার কমিশন সরকারী কর্তৃত্বের বিরোধিতা করলেও এই বিলে তাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি এই বিলকে 'জাতীয়তা ধ্বংসকারী' বিল বলে চিহ্নিত করেছেন।

আইন সভার বিরোধী নেতা রামানন্দ চ্যাটার্জী ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন, প্রস্তাবিত বিল অনুসারে গঠিত বোর্ড 'autonomous body' হিসাবে কার্য্য সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে না। দ্বিতীয়ত, উক্ত বোর্ড সাম্প্রদায়িক নীতির ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল। তৃতীয়ত, এই বোর্ড প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়াদের অধীনস্থ একটি সংগঠন। পাঁচজন বিভাগীয় বিদ্যালয় পরিদর্শকের মধ্যে ৪ জন মুসলমান এবং বাকী এক জন হিন্দু ও অতি শীঘ্র অপসারিত করার সম্ভাবনাকে তিনি 'A Great Mischief' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি স্পষ্ট বলেন, 'No Government on earth could fight against ideals. They were neither weak nor lacking in ability.'[৩৩]

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আশুতোষ লাহিড়ী আইনসভায় বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল প্রণয়নের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেছেন। অ্যান্ডারসন-এর সময়েও মূলত তাঁর উদ্যোগে এই নীতি গৃহীত হয়েছিল। সেই সময়ে বাংলায় মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার যথেষ্ট পরিমানে হলেও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ব্রিটিশ প্রসাশনের ধারণা হয়েছিল, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি ছিল 'Breeding ground of anti-British and revolutionery ideas.'[৩৪] কারণ বাংলায় সেই সময় বৈপ্লবিক কার্যকলাপ বিস্তার লাভ করেছিল। তাই প্রশাসন মাধ্যমিক শিক্ষার বিনিময়েও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার প্রয়োজনীয় মনে করেছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হ্রাসের (১২০০-৪০০) নির্দেশদানে সমস্ত বাংলা শিক্ষা জগৎ স্তম্ভিত হয়ে গিয়ছিল। এর সাথে যুক্ত হলো লীগ মন্ত্রীসভার রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের প্রচেষ্টা। আশুতোষ লাহিড়ী স্পষ্ট ভাষায় এ বিষয়ে বলেন, ব্রিটিশ প্রশাসন ও মুসলিম লীগ - তাদের নিজ নিজ ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করার জন্য একত্রিত হয়েছে। বাংলার মন্ত্রীসভা হিন্দু মতামত জানা সত্ত্বেও, হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের টানাপোড়েনের সময় ব্রিটিশ প্রশাসনের সহায়তায় এই বিল প্রণয়নে সচেষ্ট হয়েছে। তাঁর মতে 'The Bill would plunge the whole country into turmoil.' তিনি আরও বলেন 'It is a question of life, and death for us. It is frankly invitation to civil war.'[৩৫] তবে তাঁর মতে, পরবর্তী পাকিস্তান

পরিকল্পনার জন্য এই বিল হোল 'corner stone' তবে মুসলিম লীগের মনে রাখা উচিত,প্রত্যেক হিন্দু এই বিলের বিরুদ্ধে লড়াইকে 'sacred mission of their life'[৩৬] বলে মনে করেছে।

আশুতোষ লাহিড়ীর মতে এতদিন পর্যন্ত হিন্দুরা যে ১৬০০টি উচ্চ মাধ্যমিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেছে সেখানে হিন্দুরা কোনরকম সাম্প্রদায়িক বিস্তারের চেষ্টা করেনি। কিন্তু বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল মূলত রাজনৈতিক চরিত্রের। এই বিলের মাধ্যমে সুদৃঢ় শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করা 'eye-wash'[৩৭] ছাড়া আর কিছুই নয়।.

হিন্দু স্বার্থে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন মুসলিম সম্প্রদায় যদি লীগ মন্ত্রীসভার মাধ্যমে ইসলামিক ঐতিহ্য বজায় রাখার স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থায় আধিপত্য বিস্তারের অধিকার লাভ করে, তবে হিন্দুদেরও নিজ ঐতিহ্য বজায় রায়ায় পূর্ণ অধিকার আছে। একজন হিন্দুরও সমর্থন নেই - এমন ব্যবস্থা হিন্দুদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার কোন অধিকারও নেই। তিনি বলেন যতদিন হিন্দু মুসলমান অবিশ্বাসের আবহাওয়া থাকবে, ততদিন দুই সম্প্রদায়েরই গ্রহণযোগ্য সাধারণ ভিত্তির ওপর কোন বোর্ড গঠিত হবার আশা নেই।

শিক্ষার গুণগত সংস্কার নয়, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বশতঃই হকমন্ত্রী সভায় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল উত্থাপিত হয়েছিল। নিখিলবঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতির মুখপত্র রূপে প্রকাশিত 'দৈনিক কৃষক' পত্রিকার সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ বিশ্বাস করতেন যে, এই বিলের উপযোগিতা আছে। কিন্তু কার্যত প্রধানত যার ওপর নির্ভর করে তিনি হলেন কলকাতা কমার্শিয়াল ব্যাংকের তখনকার ম্যানেজিং ডিরেকটার বিশিষ্ট শিল্পপতি হেমেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ছিলেন বিলের বিপক্ষে। উভয়ের মতপার্থক্যের ফলে আবুল মনসুর শেষ পর্যন্ত পত্রিকার সম্পাদকের পদে ইস্তফা দেন।[৩৮] মুসলিম লীগ সমর্থকরা বিলপাশ করতে চেয়েছিলেন। বিল প্রত্যাহার হওয়ায় তারা নিরাশ হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার ভাইস চ্যান্সেলার মহম্মদ আজিজুল হক ইতিপূর্বে বাংলার শিক্ষামন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (১৯৩৪-৩৭)। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে ১৯৩৮ সাল থেকে দুবার মনোনীত হবার পর তৃতীয় বারের জন্য এইবার তাকে আর মনোনীত করা হয়নি। লীগ সমর্থকরা শিক্ষা বিল প্রত্যাহার এবং আজিজুল হককে আরেক দফা উপাচার্য পদে নিয়োগ না করে হক মন্ত্রীসভা মুসলমানদের স্বার্থের বিরোধিতা করছে - এমন প্রচারের সুযোগ কাজে লাগায়। প্রোগেসিভ কোয়ালিশান সরকারের পতনের অন্যতম কারণ হিসাবে আবুল মন্সুর আহমদ এই ঘটনাকে চিহ্নিত করেছেন।

সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে প্রশমিত করতে বাংলায় এই সময়ে শিক্ষা সংস্কারের প্রকৃতই প্রয়োজন ছিল। প্রগতিশীল মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তার প্রমান পাওয়া যায়। কাজী মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, কাজী আনোয়ারুল কাদীর - প্রভৃতি

মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানে শিক্ষা ও সাহিত্যের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৩৯]

কিন্তু এই সদিচ্ছা কার্যে পরিনত হয়নি। ফলস্বরূপ স্কুল কমিটিকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের তিক্ততা বেড়ে চলে। ঢাকায় হিন্দু বিদ্যালয়ের অধিকৃত স্থানে মুসলমানরা 'কোরবানি' (গো-হত্যা)-র হুমকি দিয়েছিল - মুসলমান প্রভাবিত স্কুল-কমিটিগুলি স্বরসতী পূজা বন্ধ করে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করে পরিস্থিতি এত ভয়ংকর হয়ে ওঠে যে ১৯৪৩ সালে চট্টগ্রামের কমিশনার এক চিঠিতে লেখেন উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষই শিক্ষ প্রতিষ্ঠানে অগ্নি সংযোগের বিষয়টি চিন্তা করছিল।[৪০]

সূত্রনির্দেশ

১। দীনেশচন্দ্র সিন্‌হা, *প্রতীকী লড়াই*, শ্রী ও পদ্ম সমতট প্রকাশন।

২। Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal (1997-47)*, New Delhi.

৩। Jaya Chatterjee, *Bengal Divided* (Hindu Communalism and Partition, 1932-1947) Cambridge, 1995.

৪। *Indian Annual Register* - Vol-2, 1940, p-146.

৫। -do- ('Little attention was paid to either secondary or primary education.')

৬। -do-

৭। *Hindusthan Standard*, November 1937.

৮। -do- December 1937.

৯। -do-

১০। -do-

১১। *Modern Review*, December 1937.

১২। *Hindusthan Standard*, December 1947.

১৩। *Modern Review*, December 1937.

১৪। -do-

১৫। *Hindusthan Standard*, December 1937.

১৬। -do-

১৭। *Hindusthan Standard*, December 26. 1937.

১৮। *Bengal Legislative Assembly Proceedings*. 28th August 1940.

১৯। -do-

২০। -do-

২১। *Bengal Legislative Assembly Proceedings*, August 1940.

২২। *Hindusthan Standard*, December 1937.

২৩। *Bengal Legislative Assembly Proceedings*. August 1940.

২৪। -do-

২৫। -do-

২৬। -do-

২৭। -do-

২৮। -do-

২৯। -do-

৩০। -do-

৩১। -do-

৩২। *Bengal Legislative Assembly Proceedings*, Vol-67, May 1944.

৩৩। *Hindusthan Standard*, December 1937.

৩৪। *Bengal Legislative Assembly Proceedings*, Vol-67. May 1944.

৩৫। -do-

৩৬। -do-

৩৭। -do-

৩৮। আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির তিরিশ বছর* (ঢাকা), ২য় সংস্করণ, ১৯৭০।

৩৯। খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সমাজ ও সাহিত্য* (১৯৮৪)।

৪০। Report of the commissioner. Chittagong Division, LOFCR for the second fortnight of January 1943. GBHCPB, file no. 39/43.

মৌলবাদী ইতিহাসচর্চা ঃ সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার আলোকে

সুস্নাত দাশ

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের ইতিহাসের অন্যতম ভাষ্যকার ক্রিস্টোফার হিল তাঁর গ্রন্থ 'দি ওয়ার্ল্ড টানর্ড আপসাইড ডাউন' (বিশ্ব যখন উথাল পাথাল) গ্রন্থের সূচনা-মন্তব্যে বলেছিলেন যে "ইতিহাস লেখার থেকে সহজ কাজ খুব কমই আছে।"[১] আজ বেঁচে থাকলে বোধহয় হিল (মাত্র কয়েক মাস পূর্বেই তিনি প্রয়াত হয়েছেন) লিখতেন, দুনিয়ার সবথেকে সহজ কাজটি বোধকরি ইতিহাস লেখা। আমাদের দেশেও কবিবাক্যে সম্ভবত এর সমর্থন মেলে — "তাই সত্য যা রচিব আমি।" একসময় ছিল যখন পুরাণ - মহাকাব্যও ইতিহাস পদবাচ্য রূপে স্বীকৃত হত। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকদের কারো কারো কথা আমরা জানি যাঁরা 'আপন মনেব মাধুরী মিশায়ে' মনের সুখে ইতিহাস লিখতেন — কেউ এথেন্সের কোলে ঝোল টেনে, কেউবা স্পার্টার।

কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পরে মোটামুটিভাবে 'ইতিহাস' নামক বিষয়টি আধুনিক কালে (এমনকি উত্তর - আধুনিক) সমাজ-বিজ্ঞানের একটি মর্যাদাপূর্ণ শাখা রূপে এখনও পর্যন্ত স্বীকৃত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মেকলের কালে ইতিহাস ছিল সাহিত্যেরই অঙ্গ - রচনাশৈলী ও বর্ণনা প্রধান; ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ছিল তাতে যথেষ্ট। এর থেকে সৃষ্টি হত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে সুস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান পক্ষপাতিত্ব ও একদেশদর্শিতা। ইতিহাস রচিত হত অবরোহী বা 'Deductive' প্রক্রিয়ায়, আরোহী বা 'Inductive' পদ্ধতিতে নয়। ফলে ঐতিহাসিক তাঁর পূর্বধারণা বা পূর্বেই গড়ে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুসারে ঐতিহাসিক তথ্য-উপাদান সংগ্রহে লিপ্ত হতেন। যে তথ্য তাঁর বিশ্বাস বা ধারণার সঙ্গে মিলত না, গুরুত্বপূর্ণ হলেও সেই তথ্য সন্তর্পণে বর্জিত হত। তথ্যানুসন্ধান ও আকর হাতড়ে হাতড়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মানসিকতার অভাবেও এ ঘটনা ঘটতো; আবার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বিশেষ গোষ্ঠী বা শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার তাড়নাও এর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল থাকতো। যাহোক মেকলের জন্মের এক শতাব্দী পরে ঐতিহাসিক বিউরি বলেছিলেন, 'ইতিহাস হল একটি বিজ্ঞানঃ একচুল কম বা বেশি নয়" (History is a Science : nothing more, nothing less.)[২] ইতিহাস সাহিত্যের শাখামাত্র নয়, তা

যুক্তিগ্রাহ্য, তথ্যনির্ভর, বিজ্ঞান-মনস্ক, বস্তুবাদী এবং সর্বোপরি প্রমাণসাপেক্ষ জ্ঞানচর্চার একটি পরিবর্তনমুখী প্রবহমান ধারা। বলাবাহুল্য ঐতিহাসিকের মন কল্পনা - অনুমান - গালগল্পের রূপালী আকাশে ডানা মেলে না, তাঁর পা থাকে বাস্তবের শক্ত ভূমিতে — মন ঘুরে বেড়ায় সময়ের আনাচে কানাচে, মস্তিস্ক চালিত হয় কার্য-কারণ সম্পর্কের সরল অথচ গভীর অনুসন্ধানী কিন্তু বৌদ্ধিক প্রণালীতে। তাই বলে নিশ্চয় ঐতিহাসিক চেতনা কখনো যান্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন হয় না। যে হেতু তাঁর সৃষ্টিশীলতার কেন্দ্রস্থলে সদাসর্বদা বিরাজ করে মানুষ ও মানব সভ্যতা — তাই যা কিছু মানবিক তাই ক্রমান্বয়ে হয়ে ওঠে ইতিহাস রচনার মৌলিক উপাদান। বস্তুত মৌলবাদের সঙ্গে প্রকৃত ইতিহাস রচয়িতার কোনো সম্পর্কই চলতে পারেনা — একজন মৌলবাদী ও ইতিহাসবিদ অনিবার্যভাবেই দুই বিপরীত মেরুর অধিবাসী।

জ্ঞানচর্চার আধুনিক ধারায় ঐতিহাসিকের অবস্থান আজ এভাবেই স্থিরকৃত ও স্বীকৃত। কিন্তু একে অস্বীকার করে ভারতসহ বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই আজ মৌলবাদী ইতিহাস চর্চার সভ্যতা ও সত্যবিনাশী এক ঝোঁক বিপজ্জনকভাবে তার শাখা প্রশাখার বিস্তার ঘটাচ্ছে — যা ইতিহাস রচনা এবং পঠন-পাঠনের সঙ্গে যুক্ত যে কোনও সদাচারী ব্যক্তির সহনশীলতার সীমা অতিক্রম করেছে। এই কারণেই বর্তমান নিবন্ধে এ ধরণের মৌলবাদী ইতিহাস রচনার দু'চারটি উদাহরণ তুলে ধরা কর্তব্য বলে মনে করি।

একটি উদাহরণ রূপে উল্লেখ করা যেতে পারে গোলাম আহমদ মোর্তজা রচিত *চেপে রাখা ইতিহাস* গ্রন্থটিকে।[৫] গ্রন্থটির চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৬ থেকে ১৯৯১ মাত্র পাঁচবছরের মধ্যে। গত একদশকে নিশ্চয় আরো কয়েকটি মুদ্রণ ঘটে গিয়েছে — যা আমাদের জানা নেই। অর্থাৎ গ্রন্থটি বর্তমান বাজারে বেশ জনপ্রিয় বলা চলে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দুই চব্বিশ পরগণা অঞ্চলেই গ্রন্থটির বহুল প্রচার রয়েছে প্রধানত মুসলমান ধর্মাবলম্বী পাঠক সমাজের কাছে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা গ্রন্থটি সম্পর্কে সপ্রশংস (সীমাবদ্ধতা ও মতপার্থক্য ব্যক্ত করেও) অভিমত প্রকাশ করেছেন — যা গ্রন্থটির প্রারম্ভিক পর্বে সস্বাক্ষর মুদ্রিত। গ্রন্থটি অর্পণ করা হয়েছে, 'বর্তমান ও আগামী দিনের অনুসন্ধিৎসু, সত্যান্বেষী পাঠক-পাঠিকার করকমলে।' সুতরাং এহেন একটি গ্রন্থ সম্পর্কে আপত্তির হেতু কি?

এটা ঠিক যে লেখক গোলাম আহমদ মোর্তজার মূল বক্তব্যের প্রধান সুরটি অস্বীকার করা যায় না। তাঁর অভিযোগ ভারতের ইতিহাস রচনায় (প্রধানত সরকারী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রপাঠ্য বইগুলিতে) মুসলমান সমাজের ভূমিকা ও অবদানের প্রসঙ্গ এবং মুসলমান চরিত্রগুলিকে হয় উপেক্ষা করা হয়েছে, নয়তো চেপে দেওয়া (ছেঁটে দেওয়া!) হয়েছে; বিকৃত করা হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অবদান। অতি সত্য ভাষণ

এবং ঐতিহাসিকের কর্তব্য এর প্রতিবিধানে এগিয়ে আসা। কিন্তু তা কোন্ দৃষ্টিভঙ্গীতে হবে! এক সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিহত করতে কি আরেক সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে ইতিহাস রচনায়? লিখতে হবে যে 'আওরঙ্গজেব' কে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে 'ঔরঙ্গজীব' লেখা হয় — কারণ 'জীব' মানে 'জন্তু'![৪] প্রমাণ করতেই হবে যে আওরঙ্গজেব ছিলেন তুলনামূলক বিচারে আকবর অপেক্ষাও কীর্তিবান সুশাসক! হতে পারেন আলমগীর হয়তো তাই ছিলেন — কিন্তু প্রমাণ? কোনো মৌলিক তথ্য বা সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া এবং দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া আগাগোড়া দ্বিতীয় বা তৃতীয় মানের ঐতিহাসিক উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে এমন সব অনড় ও অটল সিদ্ধান্তে লেখক উপস্থিত হয়েছেন তাতে তাঁর সংখ্যালঘু অভিমানবোধের অবশ্যই প্রকাশ ঘটেছে — কিন্তু ইতিহাস বিচার বা চেতনার নয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা অপেক্ষা (যা লেখকের অভীসা বলে তিনি ভূমিকাংশে জানিয়েছেন) পরিস্থিতির অবনতি যথেষ্ট মাত্রায় ঘটানোর পক্ষে এই আবেগ চালিত প্ররোচণামূলক গ্রন্থটি একাই একশো ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতা রাখে। লেখক এজাতীয় আরো কয়েকটি গ্রন্থের প্রণেতা।

এবার আরেকটি গ্রন্থের প্রসঙ্গে আসি। 'শ্যামাপ্রসাদ ঃ বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ' গ্রন্থটির[৫] লেখক ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ পূর্বে আলোচিত গ্রন্থকারের মতন অত স্বল্প পরিচিত বা অপরিচিত নন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদা ডেপুটি রেজিস্টার রূপে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জ্ঞানচর্চার সরকারী কেন্দ্রের সঙ্গে নিবিড় সংযোগের কারণে তিনি সুপরিচিত। তাছাড়ী দীর্ঘ কয়েকদশক ধরে তিনি নানা পত্র পত্রিকায় লেখালেখি করেন এবং নানা বিষয়ে বেশ কয়েকটি গ্রন্থের প্রণেতা। প্রথাসিদ্ধ গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি অবহিত এবং আলোচ্যগ্রন্থে তার প্রয়োগও তিনি ঘটিয়েছেন। ফলে পূর্ব গ্রন্থের পপুলার আবেদনের সঙ্গে বাড়তি যুক্ত হয়েছে 'গবেষণাগ্রন্থে'র অভিধা। গ্রন্থটির প্রকাশক অবশ্য কোনও স্বীকৃত প্রকাশন সংস্থা নয়। 'অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি' নামে পরিচিত হিন্দুত্ববাদী একটি রাজনৈতিক প্রকাশনা থেকে তা বাজারে এসেছে। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বের আবেদন যেহেতু বাঙালী পাঠকসমাজে ভালমতনই বিদ্যমান ও তাঁর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে এই গ্রন্থ প্রকাশিত — অনুমিত হয় এই গ্রন্থও বহুল প্রচারিত।

গ্রন্থটির 'উৎসর্গ' অংশে গ্রন্থকার যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা এরূপঃ "ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের বিরোধিতার অপরাধে যে অগণিত নিরাপরাধ হিন্দু নরনারী ও নিষ্পাপ শিশু বিভেদপন্থী সাম্প্রদায়িক বর্বরদের ছুরিকাঘাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে প্রাণ হারিয়েছে .... ভারতমাতার সেসব অকাল মৃত সন্তানদের অতৃপ্ত আত্মার শান্তি ও সদ্‌গতি কামনায়।"

অর্থাৎ গ্রন্থকার যে গ্রন্থটি রচনা করেছেন (১) তাতে হিন্দু নরনারীর প্রতি অবিচার অত্যাচারের বিবরণই ভাষা পাবে এবং (২) বিভেদপন্থী সাম্প্রদায়িক বর্বরদের ছুরিকাঘাতে এবং ভারতবিভাগের বিরোধিতা করে কোনো মুসলমান অকালমৃত্যু বরণ করেনি — প্রথমেই এই দুটি সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেই লেখক ইতিহাস রচনা শুরু করেছেন। এরপর সমগ্র গ্রন্থজুড়ে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা থেকে দেশভাগ কাল পর্যন্ত দেশের (বিশেষত বাঙলায়) বিভিন্ন স্থানে কতরকম ভাবে বিধর্মীদের দ্বারা হিন্দুরা অত্যাচারিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত ও নিহত হয়েছেন তার একমুখী ও একদেশদর্শী বর্ণনা এবং তার সমর্থনে বাছাই করা সত্য-অর্ধসত্য তথ্যের উপস্থাপনা। এমনকি ১৯৪৬-৪৭ সালে যে শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন দেশবিভাগের (বঙ্গবিভাগই বলা ভাল) সর্বাপেক্ষা প্রধান প্রবক্তা[৬] - তিনি লেখকের কলমে রূপায়িত 'পরিত্রাতা'রূপে।[৭] সর্বপেক্ষা ক্ষতিকর উপস্থাপনা এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে সমসাময়িক বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত ২৩টি বাছাই করা ফোটোগ্রাফের মুদ্রণ। প্রতিটি ফোটোর নিম্নে চিত্র পরিচিতি বা ক্যাপশন যা লেখকের নিজস্ব ধারণা ও ভাষা পুষ্ট। কোনো চিত্রের ক্যাপশনঃ 'হিন্দু দোকান লুঠ হচ্ছে'; কোনোটার 'হিন্দু বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে'; কিংবা ঃ 'হিন্দু নরনারীর মৃতদেহ' ইত্যাদি ইত্যাদি। সবই ১৯৪৬ এর দাঙ্গার সংবাদচিত্র। মিথ্যা কোনোটাই নয়। কিন্তু পরিবেশিত হচ্ছে একেবারে বাছাই করা চিত্র ও বিবরণ — যেন প্রায় ষাট বছর পূর্বে ওই মর্মান্তিক দাঙ্গার শিকার শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি ধর্মেরই মানুষ — অন্য কেউ নয়। কোথাও উল্লেখমাত্র করা হল না কমিউনিস্ট পার্টির একদা সদস্য পরে কংগ্রেস কর্মী স্মৃতীশ ব্যানার্জী দাঙ্গা প্রতিরোধে কিভাবে নিজের জীবন বলি দিয়েছিলেন। উল্লেখিত হল না রাজবাজারের মুসলমান ট্রাম শ্রমিকরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে কিভাবে রক্ষা করেছিলেন ভিক্টোরিয়া কলেজে আটকা পরা ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের।[৮]

এমনতর তথাকথিত 'ইতিহাসচর্চা'র নজির বড় কম নেই। একধরণের রাজনৈতিক মতাবলম্বী ইতিহাস রচনার প্রচলন আছে যাতে কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর গুণকীর্তনই শুধু করা হয়েছে। ইতিহাসের বিকৃতি ঘটলেও তা একধরণের নার্সিসাস প্রবণতা বা আত্মপ্রশস্তির জাবর কাটা — তবু তা তুলনামূলকভাবে হয়তো সহনশীল কারণ অন্য কাউকে প্রতিপক্ষ সাজিয়ে অনৈতিহাসিক উপায়ে আক্রমণ করা হচ্ছে না। ইতিহাস বিকৃতির মাত্রা এক্ষেত্রে বিপদ সীমা অতিক্রম করেনি। কিন্তু এমনধরণের গ্রন্থও ইতিহাস বলে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে যা বিরুদ্ধবাদী রাজনৈতিক দর্শনকে এবং তার মতাদর্শবাহী রাজনৈতিক দলকে আক্রমণ করে রচিত।

সম্প্রতি অমলেন্দু ঘোষ রচিত *ভারতে কম্যুনিজম ঃ ১৯২০-৮৬*[৯] কিংবা জাবালি (ছদ্মনাম) রচিত *কমিউনিস্ট পার্টি ঃ মুখ ও মুখোশ*[১০] এ ধরণেরই দুটি গ্রন্থ যাতে ঐতিহাসিক

তথ্যকে বিকৃতভাবে পরিবেশন করে এবং কখনো বা অসত্য মনগড়া অনৈতিহাসিক তথ্যের বা উপাদানের সন্নিবেশ ঘটিয়ে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে কোনো বিশেষ একটি রাজনৈতিক দল কতটা মন্দ। অতি সম্প্রতি সর্বাপেক্ষা মারাত্মক প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে বিদ্যালয় স্তরের ইতিহাসের পাঠ্য বইতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বা প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে ইতিহাসকে বিকৃত করার ঝোঁক। এমনকি ভারত সরকারের দ্বারা পোষিত জাতীয় পাঠ্যক্রম রচনাকারী সংস্থাও এজাতীয় অপপ্রয়াসে শরিক হয়েছে। কেন্দ্রীয় শাসক দলের মৌলবাদী বা ধর্মান্ধ পশ্চাৎপদ ও সম্পূর্ণ কাল্পনিক - মনগড়া ধারণাকেও এরা ইতিহাস বলে চালিয়ে দিতে এবং শিশু ও কিশোর মনের যুক্তিবাদী ভিত্তিকে বিনষ্ট করতে এতুটকু কুণ্ঠিত নয়। ভারতে দ্রাবিড় সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতাকে অস্বীকার; সুলতানী ও মুঘল আমলকে অন্ধকার যুগ রূপে বর্ণনা করা এদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নবতম কীর্তি। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সংক্রামক ব্যাধি রাতারাতি গ্রাস করে নিতে বসেছে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। মুবারক আলি তাই যখন লেখেন ঃ "It is well understood that whenever history is written under the influence of an ideology, its objectivity is sacrificed."[১১] মনে রাখা প্রয়োজন মার্কসবাদ প্রসঙ্গে এই উক্তি প্রযোজ্য নয় (যা অনেকেই বলার চেষ্টা করেন) কারণ মার্কসবাদ নিছক কোন আদর্শবাদ নয়, তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও উপাদান আজ অন্তত বহুল স্বীকৃত — এটি একটি বিজ্ঞান - সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তার প্রয়োগ চলছে — এমনকি মার্কসবাদ বিরোধীরাও তা করেছেন। মুবারক আলির বক্তব্যের সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে এরিক হবস্‌বমের, যিনি মনে করেন, "Nationalist Historians have often been servants of ideology."[১২]

আশার কথা সম্প্রতি অ্যাকাডেমিক জ্ঞানচর্চার বাইরে ক্রমবিস্তার প্রাপ্ত এজাতীয় তথাকথিত 'ইতিহাসচর্চা'র গণপ্রভাব সম্পর্কে পেশাদার ইতিহাসবিদদের অনেকে সচেতন হয়ে উঠেছেন। এঁদের অন্যতম ড. পার্থ চ্যাটার্জী কিছুদিন পূর্বে এক নিবন্ধে[১৩] বিষয়টি গভীরভাবে আলোচন করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে ঐকমত্য হয়ে বলা যায় যে ভাবে দিনদিন একশ্রেণীর অপেশাদার লেখক 'ইতিহাস' নামক জনপ্রিয় গ্রন্থমালা রচনা করে চলেছেন — তা অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রবণতা সৃষ্টি করছে। ইতিহাসের নামে এরা এমন কিছু সৃষ্টি করছে যার আবেদন সাধারণ জনগণের কাছে প্রতিষ্ঠানিক ইতিহাস গ্রন্থ অপেক্ষাও দেখা যাচ্ছে অধিক। উপরন্তু এগুলি অধিকাংশই আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হচ্ছে বলে এর গ্রহণযোগ্যতাও যাচ্ছে বেড়ে। নিঃসন্দেহে এই প্রবণতা প্রতিষ্ঠানিক ইতিহাস চর্চার শ্রেষ্ঠত্ব যা নির্ভরশীল "Methodological rigour and intellectual discipline."[১৪]-এর উপর — তাকে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারে। সুতরাং সাধু সাবধান। এই চরম ক্ষতিকর

প্রবণতা প্রতিরোধে পেশাদার ও প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস্ চর্চায় নিযুক্ত বিদ্বানদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন পপুলার ইতিবৃত্ত রচনায় এবং বলা বাহুল্য তা হওয়া উচিত — শুধুমাত্র মাতৃ ভাষাতেই।

সূত্রনির্দেশ

১। ক্রিস্টোফার হিল, *বিশ্ব যখন উথাল পাথাল ঃ ইংরেজ বিপ্লব চলাকালীন র‍্যাডিকাল ভাবধারা প্রসঙ্গে*, (বঙ্গানুবাদ - অমলেন্দু সেনগুপ্ত), কেপিবি, কলকাতা, ১৯৯৫।

২। অমলেশ ত্রিপাঠী, *ইতিহাস* ও *ঐতিহাসিক*, পঃবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৬, পৃঃ ২১।

৩। গোলাম আহমাদ মোর্তজা, *চেপে রাখা ইতিহাস*, বর্ধমান; প্রথম মুদ্রণ ১৯৮৬, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৪৩।

৪। তদেব, পৃঃ ১৬৯।

৫। ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ, *শ্যামাপ্রসাদ ঃ বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ*, গ্রন্থরশ্মি, ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা - ৬, ১৪০৭, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭৬।

৬। Dr. R.C. Majumdar, *History of Modern Bengal,* Part-II; Calcutta, 1981, p-427.

৭। ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১৫।

৮। সাধন ব্যানার্জী, '১৬ই আগস্ট ১৯৪৬, দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ঃ দাঙ্গা প্রতিরোধে ট্রাম শ্রমিকদের অসামান্য বীরগাথা,' *উজানে*, সম্পাদক গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, সেপ্টেম্বর, ২০০২।

৯। অমলেন্দু ঘোষ, *ভারতে কম্যুনিজম ঃ ১৯২০-৮৬*, পূর্ণ প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৭, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭৫।

১০। জ্বাবালি, *কমিউনিস্ট পার্টি ঃ মুখ ও মুখোশ*, সোহম, কলকাতা, ২০০১, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৭।

১১। Mubarak Ali. *History, Ideology and Curriculum. EPW*, Nov 2-9, 2002, Vol. 37, No. 44-45.

১২। Eric Hobsbawm, *On History*; London, 1999, p-35.

১৩। Partha Chatterjee, 'History and the Domain of the Popular:' *Seminar*, No. 522, February 2003.

১৪। Ibid, p-33.

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে 'বিদ্যালয় ছুটের' উপরে একটি সমীক্ষা (দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা)

দীপক মন্ডল

১৯৫০ সালে ভারতে সংবিধান প্রচলনের সূচনাকালে সংবিধানে সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল এই রকম ঃ ১০ বছরের মধ্যে, ১৪ বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সমস্ত শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রকে অবশ্যই সচেষ্ট হতে হবে। সুখের কথা বিগত ৫৫ বছরেও আমরা সংবিধানের এই নির্দেশের কথা ভুলিনি।

বিগত ৫৫ বছরে বিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি, শিক্ষকের ব্যবস্থা, পঠন-পাঠনের উপযুক্ত পরিবেশ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবশ্যই যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে।[১] গ্রামীণ জনসংখ্যার ৯৪ শতাংশের জন্য এক কিমির মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা গেছে। কিন্তু এই সাফল্যের বিপরীত দিকে যে চিত্রটি রয়েছে তা যথেষ্ট ভয়াবহ। ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী ২২ কোটি শিশুর মধ্যে ৫ কোটি ৯০ লক্ষ (২৯.৫%) বিদ্যালয়ে যায় না। এদের মধ্যে বালিকার সংখ্যা ৩ কোটি ৫০ লক্ষ (১৭.৫%) এবং বালকের সংখ্যা ২ কোটি ৪০ লক্ষ (১২%)। দেশের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেও প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে কিছুটা ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে গেছে, যার ফলে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বিদ্যালয়ছুট বা Dropout এর মতো সমস্যা এখনও বর্তমান। তার কয়েকটি নমুনা নীচে দেওয়া হল[২] —

SOUTH 24 PARGANAS DROPOUT RATE - 1997-98

Class	Enrolment 1997	Enrolment 1998	Repeaters	Repetition Rate %	Promotion Rate%	Dropout Rate%	Remarks
I	5466	5067	1250	22 87	68.97	8.16	
II	3483	4354	584	16 77	81.69	1 (adjusted)	
III	2844	3379	255	8 97	90 33	0.7	
IV	NA	2824	-	-	-	-	

1998-99

Class	Enrolment 1998	Enrolment 1999	Repeaters	Repetition Rate %	Promotion Rate%	Dropout Rate%	Remarks
I	5067	4508	1128	22 26	70 24	7 5	
II	4354	3850	291	6 68	80.89	12 43	
III	3379	3763	241	7 13	77 31	15 56	
IV	2824	2867	255	9 3	-	-	

1999-2000

Class	Enrolment 1999	Enrolment 2000	Repeaters	Repetition Rate %	Promotion Rate%	Dropout Rate%	Remarks
I	4508	-	780	17 30	76 31	6 39	
II	3850	3624	184	4 78	89 58	5 64	
III	3763	3689	240	6 38	87 22	6 41	
IV	2867	3523	242	8 41	-	-	

Drop-out Rates (for 97-98, 98-99, 99-2000)

Classes	1997-98	1998-99	1999-2000
I to II	8 16	7 5	6 39
II to III	1	12 43	5 64
III to IV	7	15 56	6 41

Report on Dropouts in the District of South 24 Parganas - NIAS

৩

2000-2001
South 24 Parganas

Class	GE 00-01	GE 01-02	Rpts 01-02	Rpts %	Pro	Pro Rate	DO rate
I	339525	288715	85888	25 30%	172579	50 83%	23 87%
II	193014	189753	17174	8 90%	154596	80 10%	11 01%
III	184334	169864	15268	8 28%	145795	79 09%	12 62%
IV	167490	158238	12443	7 43%	0	0 00%	TOTAL 47 50%

Server D \Old_D\Dise Spl Reports\2002\SRC\class wise GE DO and Rep-01-02-Phase-II xls

2001-2002
South 24 Parganas

Class	GE 00-01	GE 01-02	Rpts 01-02	Rpts %	Pro	Pro Rate	DO rate
I	167111	142306	42104	25 20%	86469	51 74%	23 06%
II	95969	94922	8453	8 81%	77531	80 79%	10 40%
III	91416	84947	7416	8 11%	73177	80 05%	11 84%
IV	83093	79189	6012	7 24%	0.	0 00%	TOTAL

উপরোক্ত টেবিলগুলির মাধ্যমে বিদ্যালয় ছুট বা Dropout এর চিত্র তুলে ধরা হল।

এই বিদ্যালয় ছুটের কারণ নির্ণায়ক সমীক্ষাতে শতকরা ৭৩ জন অভিভাবকের মতামত আর্থিক অনাটনের পক্ষে। যদিও প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক, তা সত্ত্বেও ন্যূনতম কাগজ, পেনসিল, পেন, কালি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের কিছু পরিমানে খরচ হয়। দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দাদের মধ্যে শতকরা ১২ জন বাড়ির কাজে অংশ গ্রহণের জন্য বিদ্যালয় ছুট হয়। তাছাড়া মাঠের কাজ, নদীতে শিশুদের মিন বাগদা ধরা, দর্জির কাজ, কাঠের কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ বিদ্যালয় ছুটের কারণ।

প্রধান শিক্ষক / সহশিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গীতে পিতামাতার অশিক্ষাই হলো Dropout এর মূল কারণ। এছাড়া ছাত্রানুপাতে স্কুলে শিক্ষক কম, প্রাইভেট স্কুল গজিয়ে ওঠা, বিদ্যালয় থেকে বাড়ির দূরত্ব, স্কুলের আশপাশের পরিবেশ শিক্ষার অনুপোযোগী হওয়ার জন্য বিদ্যালয় ছুট দেখা দিচ্ছে।

বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে[৪] দক্ষিণ ২৪ পরগনার মানুষের জীবন-জীবিকা, শিক্ষা-সংস্কৃতি চলে। তবে আর্থিক অনটন, অপসংস্কৃতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কম বয়সে বিবাহ, পরিবারের কাজে সাহায্য, লিঙ্গ বৈষম্য, শিক্ষক / শিক্ষিকাদের একাংশের বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকা, শিক্ষকদের বেশীর ভাগ সময় অশিক্ষার কাজে ব্যয় করা, শিক্ষকদের ছাত্র / ছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্য সঠিক বুঝতে না পারা, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো সংক্রান্ত সমস্যা। বিদ্যালয় পরিচালনা ও পঠন পাঠনের দুর্বলতা, শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণে অসামর্থ্যতা, দুর্বল শিক্ষা মান, সর্বপোরি গ্রামীণ স্তরে সর্বসাধারণের মধ্যে সঠিকভাবে শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে না পারা ও তাদের প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার কাজে অংশগ্রহন সুনিশ্চিত করতে না পারার জন্য বিদ্যালয় ছুট সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই জেলার[৫] অধিকাংশ মানুষ তপশীল জাতির্ভুক্ত হওয়ায় বিদ্যালয় ছুটের বেশীর ভাগই তপশীলি জাতির্ভুক্ত। ছাত্রদের থেকে ছাত্রীরাই বেশী বিদ্যালয় ছুট হচ্ছে।[৬] ২০০০-২০০১ শিক্ষা বর্ষে মোট ৪৭.৫০% বিদ্যালয় ছুটের মধ্যে ২৭.৮১% ছাত্রী।

2000-2001

South 24 Parganas

Class	GE 99-00	GE 00-01	Rpts 00-01	Rpts %	Pro	Pro Rate	DO rate
I	152174	167111	37105	24 38%	92447	60 75%	14 87%
II	97077	95969	3522	3 63%	88457	91 12%	5 25%
III	90950	91416	2959	3 25%	80994	89.05%	7.69%
IV	74572	83093	2099	2 81%	0	0 00%	TOTAL 27 81%

Drop out rate for phase - I Districts

WETFINTY\OLD_D\Dise Spl Reports\2002\SRC\Drop Out\Girls-class wise GE DO and Rep-00-01 xls

প্রগতিশীল শিক্ষার যুগে দাঁড়িয়ে এই সমস্যার থেকে মুক্তি পেতে হলে উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত সকলকেই (সরকারী দপ্তর, সংস্থা) বিকেন্দ্রীকরণ ও জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা অর্পণের কথা ভাবতে হবে এবং জনসাধারণকে সক্ষম করে তোলার কৃৎকৌশল ও দক্ষতা অর্জন যা বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্ভব হতে পারে। সেই সঙ্গে জেলার-জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ, বিদ্যালয় সমূহের জেলা পরিদর্শক,পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, পৌরসভা ও গ্রামোন্নয়ণ দপ্তর, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা দ্বারা যদি এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন তাহলে সবটা না হলেও কিছুটা Dropout সমস্যা সমাধান হতে পারে।

সূত্রনির্দেশ

১। *শিক্ষা দর্পন*, ২০০১ সেপ্টেম্বর, পৃষ্ঠা নং-৫০।

২। Report on Dropouts in the District of South 24 Parganas, Netaji Institute for Asian Studies, 2001-2002.

৩। District Primary Education Programme Report, 2001-2002.

৪। পশ্চিমবঙ্গ — জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পৃষ্ঠা-৩০৬।

৫। কমল চৌধুরী, *দক্ষিণ ২৪ পরগনার ইতিবৃত্ত*, পৃষ্ঠা-৪।

৬। Study on School Efficency - July 2001, West Bengal District Primary Education Programme, Page No. - 15.

সারাংশ

T. S. Kuhn এবং Paul Feyerabend-এর অনুসরণে ইতিহাসের দার্শনিক বিশ্লেষণ ঃ-

তড়িৎময় ঘোষ

দার্শনিক Karl Popper তাঁর 'Conjecture and Refutation,' 'open Society' প্রভৃতি গ্রন্থে বলেন — সমাজবদ্ধ মানুষ দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। সেই সমস্ত সমস্যা থেকে নিজেকে তথা সমাজকে মুক্ত করতে নতুন নতুন সূত্র অনুসরণ করে এবং সেগুলি প্রয়োগ করে। দেখা যায় সেই প্রস্তাবিত সূত্র সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। পুরানো সমস্যা দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটে। সেগুলি দূর করার জন্য আবার উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা নতুন নতুন সূত্রে অনুমান করা হয় এবং তা প্রয়োগ করা হয়। এই নতুন সূত্র নতুন সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম। নতুন সূত্রের মধ্যে থাকে পুরানো সূত্রের যথার্থ অংশ যা নতুন সমস্যা সমাধানে কার্যকরী এবং অপর অংশটি হল প্রস্তাবিত বিষয় বা প্রকল্প। Popper এর মতে, — এইরূপেই আমাদের জ্ঞানের বুদ্ধির তথা সমাজ জীবনের উত্তরণ ঘটে। প্রকৃত বা চরম সত্যের পথে অগ্রসর হই।

সমাজ দার্শনিক কার্ল মার্কস এবং ঐতিহাসিকরণ Karl Popper এর এই নীতিতে বিশ্বাসী। মার্কস তাঁর 'Capital' গ্রন্থে বলেছেন বিবর্তনের ধারায় আদিম অরণ্যবাসী সাম্যবাদী মানুষ বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আজ পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় উপনীত হয়েছে। নিজেদের সমস্যা সমাধানে নতুন নতুন সূত্র ধরে একদিন মানুষ শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। ঐতিহাসিকগণ যখন প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন তখন তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে Karl Popper এর বক্তব্য প্রতিধ্বনিত হয় মাত্র। সময়ের সাথে সাথে জ্ঞান, বিজ্ঞান, চেতনার ঘটে এই উত্তরণ। সৃষ্টি হয় উন্নত থেকে উন্নততর ইতিহাস। আদিম, বর্বর, অরণ্যবাসী, গুহাবাসী মানুষ চেতনার ক্রমউন্নতি ঘটিয়ে সমস্ত রকমের বাধা, প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে আজ সভ্য, শিক্ষিত মার্জিত মানুষে পরিণত হয়েছে। এ যেন এক অনন্ত প্রবাহ। কোথাও কোন বিরাম নেই।

খনন কার্য চালিয়ে যে সমস্ত ঐতিহাসিক উপাদান বা তথ্য পাওয়া যায়, তার উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিকগণ একটা যুগের কথা উল্লেখ করেন এবং সে যুগের মানুষের জীবনযাত্রা, সামাজিক জীবন, ধর্মীয় জীবন, রাজনৈতিক অবস্থা, শিল্প কলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান

কিরূপ ছিল — সে সম্পর্কে একটা আভাস দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যুগের সঙ্গে তুলনা করে উক্ত যুগের সভ্যতার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধিতে প্রয়াসী হন। উদাহরণসরূপ হরপ্পা - মহেঞ্জোদরোতে খনন কার্য চালিয়ে প্রাপ্ত উপাদানের উপর ভিত্তি করে সিন্ধু সভ্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্যান্য যুগের সভ্যতার সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে উক্ত সভ্যতা ছিল যথেষ্ট উন্নত মানের। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে এর তুলনা করা হয়। এইরূপ বহু উদাহরণ আমরা ইতিহাসের আলোচনার মধ্যে পাই। কোন এক ব্যক্তির রাজত্বকালের সঙ্গে অপর কোন ব্যক্তির রাজত্ব কালের তুলনামূলক আলোচনা ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এইরূপ বস্তুবাদী ব্যাখা কি আদৌ গ্রহণ করা সম্ভব? আমরা কি নিরপেক্ষভাবে বিষয়বস্তুকে জানতে পারি? বিষয়বস্তুকে জানা এবং বিভিন্ন জ্ঞাত বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করার ক্ষেত্রে আমরা কি আদৌ নিরপেক্ষ থাকতে পারি? T.S. Kuhn এবং Paul Feyerabend কে অনুসরণ করে আমি এই সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে চেষ্টা করছি।

T. S. Kuhn এবং Paul Feyerabend এর মূল বক্তব্য হল ঃ- আমরা প্রত্যেকে কোন না কোন সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বা পরিকাঠামোর (Socio - cultural - frame-work) অবস্থান করি। প্রতিটি পরিকাঠামোর মধ্যে কোন না কোন সমস্যা দেখা দেয় এবং উক্ত পরিকাঠামোয় অবস্থানকারী মানুষ সেই সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়। এইরূপ সমস্যা ও তার সমাধান করতে করতে মানুষ তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবিকাশ ঘটিয়ে একটি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অপর একটি সামাজিক - সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর সদস্য হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এইরূপে একজন ছাত্র পড়াশুনা ও গবেষনার মধ্য দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবিকাশ ঘটিয়ে বিজ্ঞানী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে কিন্তু তখন ব্যক্তিটির সামাজিক - সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোটি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়। ছাত্র পরিকাঠামো পরিত্যাগ করে বিজ্ঞানী পরিকাঠামোর মধ্যে একজন সদস্য হিসাবে অবস্থান করে।

একজন ব্যক্তি যে সামাজিক - সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর মধ্যে অবস্থান করেন সেই পরিকাঠামোর প্রভাব ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। ব্যক্তির চিন্তাভাবনা, ক্রিয়া-কর্ম বিচার বিশ্লেষন সবর্ত্রই থাকে উক্ত পরিকাঠামোর প্রভাব। কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির বিপ্লবের মধ্য দিয়েই একজন ব্যক্তি একটি পরিকাঠামোর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে অপর পরিকাঠামোয় অবস্থান করতে পারেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি কোন একটি পরিকাঠামোয় অবস্থান করে অপর সামাজিক - সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর বিষয়গুলি নিরপেক্ষভাবে আলোচনা বা তুলনা করতে পারেন না। কারণ তিনি নিজে নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না।

এছাড়া তাঁর কাছে এমন কোন সাধারণ মাণদন্ড নেই - যার সাহায্যে তিনি বিভিন্ন সামাজিক - সাংস্কৃতিক - পরিকাঠামোর অন্তর্গত বিষয়গুলির মধ্যে তুলনা করতে পারেন। বিচার - বিশ্লেষণ, তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তি সামাজিক - সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর প্রভাব থেকে নিজকে মুক্ত করতে পারেন না।

ঐতিহাসিকগণও এই নিয়মের বহির্ভূত নন। তাঁরা প্রত্যেকে কোন না কোন সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর সদস্য। তাঁরা যখন বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর অন্তর্গত সদস্যদের জীবন, ব্যক্তিত্ব, রাজত্ব এবং তৎকালীন বিভিন্ন ঘটনাবলীর আলোচনা, পর্যালোচনা ও তুলনা করেন তখন তাঁরা নিজ নিজ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা করতে পারেন না। আমরা কেউ উক্ত প্রভাব থেকে মুক্ত নই। এই প্রসঙ্গে আমরা কবিগুরুর উক্তিটি স্মরণ করতে পারি।

'আমার-ই চেতনার রঙে
পান্না হল সবুজ,
চুনী হয়ে উঠল রাঙা।'

"ইসলামী প্রাচ্যতত্ত্বে (Orientalism) ভারতীয় মুসলমানদের অবদান"

আনম ওয়াহিদুর রহমান

আমি আমার এ প্রবন্ধে ইসলামী Orientalism এ ভারতীয় পন্ডিতদের কথা আলোচনা করবো, যারা ভারতীয় বংশদ্ভুত, তিনি পৃথিবীর যেখানেই অবস্থান করুন না কেন। আর ভারতীয় বলতে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশকেই বুঝাতে চাই যার অর্ভুক্ত পাকিস্তান ও বাংলাদেশ।

১৯ শতাব্দীর শুরু থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ অবধি ফ্রান্স ও ব্রিটেন প্রাচ্য ও প্রাচ্যতত্ত্বের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা ও প্রাচ্যতত্ত্বে প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। প্রাচ্যের প্রতি তাদের মনোভাবও ফরাসী ও ব্রিটিশদের মনোভাবের অনুরূপ। Orientalism অর্থই হলো একটি প্রকল্প যার পরিধি মসল্লার তেজারতী থেকে শুরু করে প্রাচ্যের জ্ঞান বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, দর্শন, ধর্ম সব কিছুতেই বিস্তৃত।

একথা অনেকেরই জানা আছে যে ইউরোপীয় ও আমেরিকার স্কলারশীপ ইসলাম শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অমূল্য অবদান রেখেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে। তাঁরা পান্ডুলিপির সম্পাদন করেছেন, বিরল বইগুলোর ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করেছেন, কোরআনেন অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন; গবেষণামূলক বই ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। লিখেছেন সাহিত্যের ভাষ্য এবং প্রকাশ করেছেন হাদীস ও ইসলামের ইতিহাসের সমালোচনামুলক গবেষণা। আসলে ইসলামী শিক্ষার এমন কোন দিক নেই যাতে তাঁরা অবদান রাখেননি। কিন্তু এসব অবদান সত্ত্বেও প্রাচ্যের প্রতি তাদের মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। দীর্ঘদিন তারা মনে করেছেন, প্রাচ্য হলো একটি অচল পদার্থ, যাকে শুধুমাত্র পাশ্চাত্যই গবেষণা করতে পারে। প্রাচ্য হলো গবেষণার বিষয়, আর পাশ্চাত্য হলো গবেষক। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে এ ক্ষেত্রে আর এখন প্রাচ্যেও ইসলামী পন্ডিতের অভাব নেই। তারাও অবদান রাখছেন পাশ্চাত্যের মত। আর এ বিষয়ে ভারতীয় স্কলাররাও পিছিয়ে নেই। Edward Said ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে পাশ্চাত্যের গবেষকদের মনোভাবের স্বরূপ উদঘাটিত করতে গিয়ে বলেন ঃ

The world wide hegemony of Orientalism and all it stands for can now be challenged, if we can benefit properly from general twentieth century rise to political and historical awareness of so many of the earth's peoples (Orientalism, P. 328)

সাঈদ এ উক্তিটি করেছেন ১৯৭৮ সালে। কিন্তু তাঁর Orientalism গ্রন্থে ভারতীয় স্কলারদের অবদানের কোন উল্লেখ নেই। আমি এই প্রবন্ধে দেখাতে চাই যে আসলে ইসলামের প্রতি পাশ্চাত্যের সমালোচনা কখনও চ্যালেঞ্জ ছাড়া যায়নি। আর এত অগ্রণী ভূমিকা রাখেন ভারতীয় পন্ডিতগণ। যেমন উইলিয়াম মুইর তাঁর ১৮৬১-৬৪ সালে ৪ খন্ডে প্রকাশিত Life of Mohammad বইতে ইসলামের অনেক বিষয়ের সমালোচনা করেন। তার এ সমালোচনার প্রথম জবাব লেখেন ভারতে ইসলামী আধুনিকতাবাদের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান।

১৮৬১ সালে মুইয়য়ের গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সময় স্যার সৈয়দ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কর্মরত ছিলেন। এর আগে ১৮৫৮ সালে ভারতে ঘটে গেছে অন্য এক বিশাল ঘটনা, সিপাহী বিদ্রোহ, যার পরিনামে ভারতে মুসলমানদের উপর নেমে আসে অনেক অত্যাচার ও নির্যাতন। যখন স্যার সৈয়দ মুসলমানদেরকে এসব নির্যাতন থেকে রক্ষা করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ব্রত, তখনই প্রকাশিত হয় মুইয়য়ের সেই বই Life of Mohammad। এ কথা উল্লেখ্য যে, এ দুটি ঘটনাই যথাক্রমে ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তার ইতিহাস নিরূপণ করে।

বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর স্যার সৈয়দ বইটিকে ভালো করে পড়েন। তিনি এ

ব্যাপারে একটি উত্তর লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং এর প্রতি মুসলমানদের উদাসীনতার ভাব দেখে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি এর উত্তর লেখার জন্য ১৮৬৯ সালে লন্ডনে গমন করেন। লন্ডনে লাইব্রেরীতে পড়া-শুনা করে ১৮৭১ সালে ফিরে এসে তাঁর *খুতবাতে আহমদীয়া* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এর ইংরেজী অনুবাদ A Series of Essays on the Life of Mohammad প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালে। আর ইহার উর্দু সংকলন প্রকাশিত ১৮৮৭ সালে। তিনি উক্ত বইতে মুইয়রের অনেকগুলি ভ্রান্ত ধারণার জবাব দেন এবং কিছু কিছু ধারণা মেনেও নেন।

এদিকে তাঁর লন্ডন সফর স্যার সৈয়দের মধ্যে কিছু হতাশার সঞ্চার করে। তিনি তাঁর সহকর্মী মহসিন উল মুলক্ এর নিকট লিখিত পত্রে কিছু দুঃখ জনক ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। ঐসব ঘটনায় মুসলমানদের প্রতি ইউরোপীয়ানদের বৈরী মনোভাবের চিত্র ফুটে ওঠে।

যাহোক ভারতীয় মুসলমানদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অধঃপতন দেখে এবং এ সব অধঃপতন থেকে রক্ষা কল্পে তিনি তাঁর আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, আলীগড় কলেজ একদিন জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠবে। হয়েছিলও তাই। তিনি *আলীগড় গেজেট* ও তাঁর *তাহজীবুল আখলাক* জার্নালের মাধ্যমে তার আধুনিক চিন্তা ধারা প্রকাশ করতে থাকেন। এ আন্দোলনে তাঁকে সক্রীয় সহযোগীতা করেন নওয়াব মহসিন উল মুল্ক, মওলভী চেরাগ আলী ও আলতাফ হোসাইন হালী প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। তাঁর আলীগড় আন্দোলনই তাঁকে ভারতে ইসলামী প্রাচ্যতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পরিচিত করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সারা মুসলিম বিশ্ব উপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে থাকে এবং তারাও উন্নত বিশ্বের সংস্পর্শে আসে এবং পরিচিত হতে থাকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে। এখন প্রাচ্যতত্ত্বে পাশ্চাত্যের একচেটিয়াবাদ নেই। তাহাদের ধ্যান ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন ডঃ ফজলুর রহমান। তিনি তাঁর *ইসলাম* বই লেখার জন্য পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হয়ে যুক্তরাষ্টে বাস এবং কাজ করেন জীবনের শেষ অবধি। তিনি তাঁর লেখাতে পাশ্চাত্যের অনেক ধ্যান ধারণার প্রখর সমলোচনা করেন। তাঁকে পাশ্চাত্যে ইসলামী আধুনিকতাবাদের একজন পথিকৃৎ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

আসলে, ইসলামের সমালোচনা মূলক আলোচনা ভারতে শুরু হয় শাহ ওয়ালী উল্লাহ থেকে। তিনি ইজতেহাদের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং অন্ধ অনুকরণ বা তাকলিদের সমালোচনা করে মধ্যযুগীয় বন্ধ্যাত্বের প্রাচীর ভঙ্গ করে স্বাধীন চিন্তার যে দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন তা তার অনুসারী ভারতীয় মুসলিম চিন্তাবিদরা অনুসরণ করতে থাকেন।

তাঁর চিন্তাধারাই ভারতীয় মুসলিমদের চিন্তা ধারায় একটি অনুকরণীয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। কিন্তু তাঁর পর তাঁর সুযোগ্য সন্তান শাহ আবদুল আজীজ, নাতি শাহ্ মোহাম্মদ ইসমাইল এবং সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলী তার চিন্তাধারা থেকে বহুদূর এগুতে পারেননি। এ স্থবিরতার কারণ হিসেবে ডঃ ফজলুর রহমান বলেন ঃ

"The historical belief hat Hadith genuinely contains the sunna of the Prophet, combined with the further belief that the sunna of the Prophet and Quaranic railings on social behaviour have to be more or less literally implemented in all ages, stood like a rock in the way of substantial rethinking of the social content of Islam" "Revival and Reform in Islam", Cambridge History of Islam, edited by P.M. Holt et. al. (Cambridge, 1970, p-2: 640).

উনবিংশ শতাব্দির শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দির শুরু থেকে এ চিন্তাধারার গতি পরিবর্তিত হতে থাকে। যারা এ পথে আরও মূল্যবান অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে আলীগড়ের বাহিরের স্কলারদের মধ্যে সৈয়দ আমীর আলী, স্যার মুহাম্মদ ইকবাল, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও ড. ফজলুর রহমান প্রমূখের নাম উল্লেখযোগ্য।

এশিয় সংস্কৃতির সন্ধানে ঃ প্রসঙ্গ দি এশিয়াটিক সোসাইটি

জাহানারা রায় চৌধুরী

'এশিয়া' — এই শব্দটি ইউরোপীয় চেতনায় দীর্ঘদিন এক অজানা, বিস্ময়ের জগৎ রূপে প্রতিভাত হয়েছে। নানা সূত্র থেকে বয়ে আসা টুকরো খবরের মধ্য দিয়ে এশিয়ার যে ছবি ইউরোপবাসীর মনে ছিল, আঠারো শতকে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা অন্য মাত্রা নিয়েছিল। এই শতকেরই দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতার দি এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা এ প্রসঙ্গে এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, তার কারণ পরবর্তী দীর্ঘ সময় প্রধানত এই একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানকে ঘিরেই দানা বাঁধে ভারতসহ এশিয় ভূখন্ডের বিভিন্ন অঞ্চল ও তার ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণার আগ্রহ।

সুপ্রীম কোর্টের জজ হিসাবে ভারতে পা রাখার আগে থেকেই এই রকম একটি সোসাইটি গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা স্যর উইলিয়াম জোনস। ১৭৮৪ খ্রিঃ এর ১৫ জানুযারি কলকাতার পুরোনো সুপ্রীম কোর্টের গ্র্যান্ড জুরি কক্ষে প্রধান বিচারপতি স্যর রবার্ট চেম্বারের সভাপতিত্বে মিস্টার জাস্টিস হাইড, জন কারনাক, হেনরী ভ্যানসিটার্ট, জন শোর, চার্লস উইলকিনস, ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন, জোনাথান ডানকান সহ তৎকালীন কলকাতার তিরিশ জন বিশিষ্ট ইউরোপীয় ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে জোনসের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। জোনস সোসাইটির প্রথম প্রেসিডেন্ট এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে তৎকালীন গভর্নার জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস প্রধান পৃষ্ঠপোষক নির্বাচিত হন।[১]

১৭৫৭ তে পলাশীর মাঠে বাংলার নবাবের পরাজয়ের ঘটনা এদেশে ইংরাজ শাসনের সূচনার এক প্রতীকি সূত্রপাত হিসাবে ধরা হলেও এটা সত্য যে প্রকৃত অর্থে এদেশের মাটিতে ইংরাজ ঔপনিবেশিক শাসনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইতিহাস একদিনের ঘটনা নয়। নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা রূপলাভ করেছিল। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনের পরও ছিল আরও নানা বাধা, অপরিচয়ের দূরত্ব। শাসিতের ভাষা, সমাজ, রীতিনীতি, প্রথা, ধর্মবিশ্বাসগুলিকে গভীরভাবে জানতে ও বুঝতে না পারলে যে কর্তৃত্ব বজায় রাখা কঠিন, তা বুঝেই প্রাথমিক অনভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ইংরাজ প্রশাসকরা ভারতীয় ভাষা, আইন ব্যবস্থা, সামাজিক রীতি নীতিগুলির দিকে আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছিলেন। অজ্ঞ

উনিশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত এই ধরণের প্রচেষ্টা ও এদেশের রীতিনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, আইনী পদ্ধতিকে টিকিয়ে রাখার দিকে ঝোঁক লক্ষণীয়ভাবে স্পষ্ট। আঠারো শতকের শেষপর্বে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি গড়ে ওঠার পিছনেও এই বাস্তব কারণটিকে অস্বীকার করা যায় না বলে অনেকে মনে করেছেন।[২] বিশেষত এশিয়াটিক সোসাইটির কার্যকলাপে গভর্নার জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতার পিছনে তৎকালীন ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির বিষয়টি খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।[৩] অবশ্য কোন কোন গবেষক মনে করেন ব্যক্তিগতভাবে হেস্টিংস এশিয় সমাজ-সংস্কৃতি জ্ঞানের প্রতি গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন, এ সত্য অস্বীকার করা যায় না।[৪] এ প্রসঙ্গে অ্যালেক্স অ্যারোনসন মন্তব্য করেছেন, হেস্টিংস দুটি দিকেই সচেতন ছিলেন। অবশ্য সার্বিক ভাবে তাঁর কাছে এশিয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের প্রশ্নটির গুরুত্ব নিহিত ছিল শাসিতের উপর আরও বিস্তৃতভাবে অধিকার প্রসারিত করতে এবং শাসন করার জন্য আরও নতুনতর দৃষ্টি প্রসারিত করায়[৫] অবশ্য কারো মতে, ভারতীয় আইনগুলির পঠন, বিশ্লেষণ ও লিপিবদ্ধকরণ, প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদির সংকলন ও অনুবাদে হেস্টিংসের সক্রিয় উৎসাহদান থেকে অনেকে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।[৬] ঐতিহাসিক ডেভিড কফ অবশ্য হেস্টিংসের ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক আগ্রহের বিষয়টি অস্বীকার করেননি, কিন্তু তাঁর মতে, এসব সত্ত্বেও এটা অনঃস্বীকার্য যে পরবর্তী আর কোন ইংরাজ প্রশাসকই ভারতীয় সংস্কৃতি তথা মানুষকে হেস্টিংসের মত এত সম্মান করেননি।[৭]

ঠিক কি লক্ষ্য নিয়ে ১৭৮৪ খ্রিঃ -এ স্যর উইলিয়াম জোনসের উদ্যোগে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হল, তার একটি রূপরেখা পাওয়া যায় জোনসের লেখা থেকে। ভারতবর্ষে আসার বহু আগেই একজন একনিষ্ঠ পাঠক ও গবেষক হিসাবে জোনস এশিয় সংস্কৃতি সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন। অনুভব করেছিলেন; কি বিশাল জ্ঞানের ক্ষেত্র তখনো পর্যন্ত অনুন্মোচিত। এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্র এশিয়াটিক রিসার্চেস-এর প্রারম্ভিক রচনায় তিনি নিজেই জানিয়েছেন সেই অনুভূতির কথা।[৮] ১৭৮৩ তে ভারত আসার পথে জাহাজে বসেই ঠিক কি কি বিষয় নিয়ে চর্চা করা হবে তার একটি তালিকা জোনস প্রস্তুত করেছিলেন।[৯] ষোলটি বিষয় সম্বলিত ঐ তালিকায় চীনা গাথা ও বিভিন্ন প্রাচ্য দেশের সংগীতের ধারার পর্যালোচনা ছাড়া বাকি সব আলোচ্য বিষয়েরই কেন্দ্র হিন্দুস্তান। তার মধ্যে যেমন ভারতের ইতিহাস, শাস্ত্র, রীতিনীতি, ঐতিহ্য ফিরে দেখার কথা ছিল, তেমনই ছিল আইন, ভৌগোলিক বিষয়, প্রাকৃতিক উৎপাদনের উৎসস্থল, প্রশাসনিক রীতি পদ্ধতির অনুধাবনের প্রসঙ্গ। সব মিলিয়ে তাঁর কথায়, আলোচনার প্রধান ভিত্তি হবে 'মানুষ' ও 'প্রকৃতি'। ভৌগোলিক দিক থেকে তার সীমা এশিয়া। এশিয়ার পাঁচটি বড় দেশের জ্ঞান ভান্ডার উন্মোচনই তাঁর আগামী লক্ষ্য। আলোচনার নানা উপাদানগুলির যে রূপ তিনি তুলে ধরেছেন তাতে ছিল সমাজ, রীতি-নীতি, শাস্ত্র, ভাষা, ধর্ম, সাংস্কৃতিক নানা রূপ -

সংগীত ও অন্যান্য উৎসব, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান, গণিত সবই।[১০] আলোচনা যাই হোক না কেন, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যতিক্রম ছাড়া তার কেন্দ্র হবে এশিয়া — এই দৃষ্টি ভঙ্গীটি সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল বলে অনেকে মনে করেন। কেননা এশিয়া সম্পর্কে ইউরোপের আগ্রহ ইতিমধ্যে প্রসারিত হলেও তখনো পর্যন্ত সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ ও মহৎ জ্ঞানের উৎস ইউরোপ বলেই ধরা হত। জোনসের মধ্যেই প্রথম এই ভাবনার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় বলে অনেকের মত।[১১] জোনসের উদ্যোগকে কেউ আলেকজান্ডারের বিজয়ের সঙ্গেও তুলনা করেছেন। তবে আলেকজান্ডারের সাফল্য ছিল ভৌগলিক জয় অন্যদিকে জোনসের উদ্যোগ জয়ী করেছিল বৌদ্ধিক অনুসন্ধানকে।[১২] মোটের উপর কেন এবং কবে থেকে এই পালাবদলের সূচনা তার বিশ্লেষণে সমসাময়িক তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটটি বিশেষ করে দেখার প্রয়োজন আছে।

সঠিক তথ্যের অভাব, তথ্য ব্যাখ্যার জটিলতা, তাছাড়া ভাষার অপরিচয়ের কারণের নানা সূত্র থেকে সবমিলিয়ে যে বিচিত্র ধারণা এশিয়া সম্পর্কে ইউরোপে গড়ে উঠেছিল আঠারো শতকে এসে তাতে পরিবর্তন ঘটে নানা কারণে। পঞ্চদশ শতক থেকেই শুরু, তারপর সপ্তদশ শতকে এশিয়া তথা ভারতীয় ভূখন্ডে ইউরোপীয় অভিযান, আসা যাওয়া যথেষ্ট বেড়েছিল। ভারত মহাসাগরে পর্তুগীজ আধিপত্য শেষ হওয়ার পর ক্রমে ডাচ-ইংরাজ ও ফরাসীরা পা রাখছিল এই ভূখন্ডে — কখনো ভ্রমণকারী, কখনো বণিক অথবা মিশনারীর দায়িত্ব নিয়ে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের টুকরো লেখা, স্মৃতিচারণের মধ্যদিয়ে আঠারো শতকে পৌঁছে এশিয়া এবং ভারতীয় উপমহাদেশ আর তত অজানা কোন অঞ্চল ছিল না। তবে আঠারো শতকের সূচনা পর্যন্ত এশিয় ভূখন্ডের মধ্যে আলোচনার বিষয় হিসাবে চীনই ছিল ইউরোপীয়দের কাছে বেশি আগ্রহের ক্ষেত্র কিন্তু পর্তুগীজ আধিপত্য শেষ হওয়ার পরবর্তী সময়ে এই সময়ে পরিবর্তন আসে। ভারত ভূমিও আলোচনার বিষয় হয়ে উঠতে শুরু করে। কিন্তু যে সমস্ত বর্ণনা ইউরোপে পৌঁছতো, তখনো পর্যন্ত তা সবসময় বাস্তবোচিত হত না। তবে তা সত্ত্বেও আঠারো শতকে ইউরোপের 'এজ অব রিজনের' আবহাওয়ায় পালাবদল ঘটেছিল, এশিয়া ও তার সমাজ সংস্কৃতি প্রথা রীতিনীতি নিয়ে আগ্রহ বাড়তে থাকে। আঠারো শতকের শেষ উনিশ শতকের প্রথমে পৌঁছে, অবশ্য আগ্রহের ধারাও এক থাকেনি। ভারত তথা এশিয় দর্শন ও তার আধ্যাত্মিকতার জগত হয়ে উঠছে আগ্রহের বিষয়। কেউ কেউ একে দেখেছেন, ইউরোপের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের মধ্যে — 'এজ অব রিজন' থেকে 'রোম্যান্টিসিজম' এর সুস্পষ্ট পট পরিবর্তনে।[১৩] ভারতবর্ষে এর ধারক ছিলেন একদল ইংরেজ রাজকর্মচারী যারা ছিলেন বার্ক ও রুশোর রোম্যান্টিক দর্শনের সমর্থক, পাশ্চাত্যকরণের বিরোধী। প্রাচ্যবাদীরা যারা এশিয়াটিক সোসাইটি ও এশিয় সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা চর্চায় আগ্রহী ছিলেন তাঁদের মানসিকতা বিশ্লেষণে এই তাত্ত্বিক পরিমন্ডলটি মনে রাখা প্রয়োজন। অন্য আরেক

দল ছিলেন যারা যুক্তিবাদী র‍্যাশনালিস্ট হিসাবে পরিচিত ও বেন্থাম, মিলের ধারায় বিশ্বাসী। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই প্রেক্ষাপটেই রূপ নেয় এশিয়াটিক সোসাইটি।

ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশদের এই প্রাচ্য জ্ঞান ভান্ডার নিয়ে আগ্রহই পরবর্তীকালে তথাকথিত ভারতীয় রেনেসাঁসের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল বলে অনেকে মনে করেন।[১৪] তাঁরা দেখেছেন আঠারো শতকে প্রাচ্য তথা ভারত তার যে অতীতকে বিস্মৃত হয়েছিল তাকে ফিরে দেখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত এই ইউরোপীয় জ্ঞানপিপাসী ব্যক্তিরাই।[১৫] সোসাইটির মুখপত্র প্রথমে এশিয়াটিক রিসার্চেস ও পরে জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি। মুদ্রিত অবস্থায় যে বিপুল পরিমাণ লেখাপত্র পাওয়া যায়, তার তালিকা ঘাঁটালে বোঝা যায় কত ধরণের বিষয়ে তাঁরা আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। পরবর্তী পর্বে শুধু গবেষণা প্রবন্ধ পঠন ও তার আলোচনাতেই সোসাইটির ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিল না। উত্তর কালে গড়ে ওঠা ভারতীয় জাতীয় মিউজিয়ামের যে বিপুল ভান্ডার তা সংগ্রহের সূচনা হয়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটিতেই। ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, মুদ্রা, সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্পকলা, ধর্ম, দর্শন, লোকসাহিত্য এবং বিজ্ঞান জ্ঞানচর্চার বহুধা ধারার গতিসঞ্চারে সোসাইটির ভূমিকা ছিল।

কিন্তু এই আগ্রহ কি শুধুই বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না তার গভীরে জড়িয়ে আছে আরও কোন গভীরতর ব্যঞ্জনা, ঔপনিবেশিক শাসনকাল নিয়ে আলোচনায় এই কথাটি ঐতিহাসিকদের কাছে বারে বারে ফিরে আসে। প্রসঙ্গক্রমে, এডওয়ার্ড সৈইদের 'ওরিয়েন্টালিসস' এর তত্ত্বটি বৌদ্ধিক মহলে সাড়া ফেলেছে। যদিও সৈইদের আলোচনার প্রেক্ষাপট ভারতীয় নয়, তা সত্ত্বেও তাঁর ব্যাখ্যার তাৎপর্য গভীর। তিনি দেখান 'প্রাচ্য' আসলে নির্মিত হয় ঔপনিবেশিক শাসক অর্থাৎ পাশ্চাত্য মননের দ্বারা। তাই পুরো প্রক্রিয়াটিকে তিনি দেখেছেন একটি ডিসকোর্স হিসাবে। তাঁর ব্যাখ্যায় প্রাচ্যবাদ প্রকাশিত হয় তীব্র বৈপরীত্য দিয়ে — পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য — ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীন, যুক্তিবাদ জ্ঞানালোক অন্যদিকে যুক্তিহীনতা এই ধারণাগুলির মধ্য দিয়ে। প্রাচ্যবাদ আমলে প্রাচ্যের উপর আধিপত্য করার গাশ্চত্য প্রক্রিয়া।[১৬] মিশেন ফুকোর 'নলেজ ইজ পাওয়ার' এর ধারণা বা সৈইদের 'প্রাচ্যবাদ' এর তত্ত্বের আগেই বার্নাড এস কোহনের বিভিন্ন লেখায় প্রাচ্য জ্ঞানচর্চা, সাংস্কৃতিক আধিপত্য ও ঔপনিবেশিক শাসনের সম্পর্কের বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল।[১৭] তবে এধরণের ব্যাখ্যায় যে সরলীকরণের বিপদ থাকে সে সম্পর্কে সচেতন করেছেন কোন কোন ঐতিহাসিক। 'আমরা' ও 'ওরা'র সম্পর্কের ধারণাটি যে সবসময় এমন তীব্র বৈপরীত্যের প্রতীক তা মেনে নিলে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি ও তার ভিতরের সম্পর্কগুলির স্বরূপ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে বলে মনে করেন তারা।[১৮] ডেভিড কফের মতে ঔপনিবেশিক শাসক ও শাসিতের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ছিল পারস্পরিক।[১৯]

এশিয়াটিক সোসাইটি তার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের জ্ঞানান্বেষণ, কর্মকান্ড কতটা আদান প্রদানের সমতাকে রক্ষা করেছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এটা ঠিক, প্রথম থেকেই দেশীয় ভাষা ঐতিহ্যের সুপন্ডিত দেশীয় ব্যক্তিদের সাহায্য তাঁরা নিয়েছিলেন। সোসাইটির লিপিবদ্ধ ইতিহাসে তার উল্লেখ থাকলেও এ সমস্ত প্রয়াসে তাঁদের ভূমিকাকে সঠিক ভাবে চিত্রিতকরা হয়েছে কিনা এবিষয়টিও গবেষণা সাপেক্ষ প্রশ্ন। যাঁদের গবেষণা নিবন্ধ এশিয়াটিক রিসার্চেসে প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের প্রেক্ষাপটটি বিশ্লেষণও জরুরি।[২০] স্যামুয়েল ট্যার্নার, স্যামুয়েল ডেভিসের মত বহু ব্যক্তিই ছিলেন ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে, সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত।[২১] আলোচনার সীমা হিসাবে ১৮৩২ অর্থাৎ এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম মুখপত্র এশিয়াটিক রিসার্চেস এর শেষ প্রকাশ কালকে ধরে নিয়েও যদি বিভিন্ন রচনা পত্র ও তার বিষয় বস্তুগুলির বিশ্লেষণ করা যায়, দেখা যাবে বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতি ধর্মাচরণ, রীতিনীতির পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক অনুপুঙ্খ বিবরণ, খনি ও তৈল সম্ভারের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলি।[২২]

এখনো পর্যন্ত সক্রিয় দুশো উনিশ বছরের পুরোনো এই প্রতিষ্ঠানটি তথা তাঁকে ঘিরে গড়ে ওঠা কর্মকান্ডের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে শুধু একটি ঐতিহ্যময় প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসই নয়। ভারত ইতিহাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ পর্বের সার্বিক বিশ্লেষণ সহজতর হবে। উত্তর আধুনিক ইতিহাসচর্চায় যে বহু বিচিত্র পথে ইতিহাস সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট - মননকে বিশ্লেষণ করছে তাতে এশিয়াটিক সোসাইটির ভূমিকা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ হবে।

সূত্রনির্দেশ

১। দ্রষ্টব্য, বাইসেন্টিনারি সুভেনির, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখিত নয়।

২। এস. এন. মুখার্জি, স্যর উইলিয়াম জোনস, এ স্টাডি ইন এইটিন্থ সেঞ্চুরি ব্রিটিশ অ্যাটিচিউড টু ইন্ডিয়া, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা - ৭৯।

৩। ফোরওয়ার্ড, প্রসিডিংস অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ভল্যুম-১, ১৭৮৪-১৮০০, (শিবদাস চৌধুরী সম্পাদিত), ১৯৮০ দ্রষ্টব্য।

৪। ও. পি. কেজারিওয়াল, দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল অ্যান্ড দি ডিসকভারি অব ইন্ডিয়াজ পাস্ট(১৭৮৪-১৮৩৮), অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লী, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-২২।

৫। অ্যালেক্স অ্যারোনসন, ইউরোপ লুকস অ্যাট ইন্ডিয়া, রিদ্ধি ইন্ডিয়া, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৫৩।

৬। ও. পি. কেজারিওয়াল, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-২৩।

৭। ডেভিড কফ, ব্রিটিশ ওরিয়েন্টালিজম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান রেনেসাঁস, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা-২১।

৮। স্যার উইলিয়াম জোনস, 'এ ডিসকোর্স অন দ্য ইন্সটিটিউশন অব আ সোসাইটি ফর এনকোয়ারিং ইনটু দ্য হিস্ট্রি, সিভিল অ্যান্ড ন্যাচারাল, দ্য অ্যান্টিকুইটিস, আর্টস, সাইন্সেস অ্যান্ড লিটারেচার অব এশিয়া,' এশিয়াটিক রিসার্চেস, ভল্যুম-১, পৃষ্ঠা - ix-x.

৯। ও. দি. কেজারিওয়াল, প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা-২৯।

১০। দি এশিয়াটিক সোসাইটি (এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত বুকলেট), কলকাতা, মার্চ ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৭।

১১। ও. পি. কেজারিওয়াল, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-২৭।

১২। এ. জে আরবেরী, এশিয়াটিক জোনস, লংম্যান গ্রীণ, লন্ডন, ১৯৪৬, পৃষ্ঠা - ২২-২৩।

১৩। এস. এন. মুখার্জি, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৭।

১৪। ভূমিকা, প্রসিডিংস অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ভল্যুম-১, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১।

১৫। ও. পি. কেজারিওয়াল, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৯।

১৬। এডওয়ার্ড সৈইদ, ওরিয়েন্টালিজম, নিউমারিক পাবলিশার্স, ১৯৭৮ দ্রষ্টব্য।

১৭। বার্নাড. এস. কোহন, কলোনিয়ালিজম অ্যান্ড ইট্স্ ফর্ম অব নলেজ; দ্য ব্রিটিশ ইন ইন্ডিয়া, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৭ দ্রষ্টব্য।

১৮। জন. এম. ম্যাকেঞ্জি, ওরিয়েন্টালিজম ঃ হিসট্রি, থিওরি অ্যান্ড দ্য আর্টস, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-২০।

১৯। ডেভিড কফ, ব্রিটিশ ওরিয়েন্টালিজম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান রেনেসাঁস, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা-৪, ৫।

২০। ভূমিকা, প্রসিডিংস অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১।

২১। মেজর ভি. সি. পি. হডসন, লিস্ট অব অফিসারস অব দ্য বেঙ্গল আর্মি ১৭৫৮-১৮৩৪, লন্ডন কনস্টেবল অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড, ১৯২৮ (৪ ভল্যুম) দ্রষ্টব্য।

২২। এশিয়াটিক রিসার্চেস, ভল্যুম - ১-২২, এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত, ১৯৮০ দ্রষ্টব্য।

ডিরোজিওর শিক্ষক ঃ ডেভিড ড্রামন্ড

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন 'নব্যবঙ্গের দীক্ষাগুরু'। কিন্তু নব্যবঙ্গের এই দীক্ষাগুরুর দীক্ষাগুরু কে? কে সেই আচার্য যিনি ডিরোজিওর মতো শিক্ষক তৈরি করেছিলেন? তিনি ডেভিড ড্রামন্ড (১৭৮৫ / ৮৭ - ১৮৪৩)। স্কটল্যান্ড থেকে অভাবিতভাবে কলকাতায় এসে পড়া একটি মানুষ। তাঁকে বলা যায় শিক্ষকের শিক্ষক। আকর্ষণীয় এক জীবন নাট্যের নায়ক। তাঁকে নিয়েই আমাদের আজকের এই নিবন্ধ।

ড্রামন্ডের জীবনের প্রথম পর্বের কাহিনী আমাদের গোচরে তেমন নেই। জন্মেছিলেন স্কটল্যান্ডের ফাইপশায়ারে। সেখানে দর্শন, সঙ্গীত আর কাব্যচর্চা করে কাটছিল তাঁর দিন। রূপোলী লীভেন নদীর ধারে পদচারণা করতে করতে গুণগুণ করে গান গাইতেন। ভাঙা গলায় খুব যে সুর ছিল তা নয়; কিন্তু হৃদয়ে তরঙ্গিত আবেগ ছিল, শাণিত সংবেদনশীল মনন ছিল, আগুন রঙের স্বপ্ন ছিল। জীবনকে নিবিড় করে ভালোবেসেছিলেন বলে সময়ে অসময়ে গান আর কবিতা তাঁর কণ্ঠে ও কলমে ভর করত। দর্শন পড়তেন, তর্ক করতেন; স্বপ্ন দেখতেন। স্বপ্ন দেখতেন নতুন ধরণের মানুষ ও সমাজের। স্বপ্ন দেখবেন না কেন? ড্রামন্ডের জন্মভূমি স্কটল্যান্ড তখন হয়ে উঠেছিল নতুন ভাবনা চিন্তা ও বৈপ্লবিক স্বপ্নের তীর্থস্থান। সংশয়, জিজ্ঞাসা, প্রতিবাদ, প্রকল্পনা তখন স্কটল্যান্ডের আকাশে-বাতাসে। দার্শনিক হিউমের সংশয়বাদ, রবার্টসনের নতুন ইতিহাস চেতনা, রিড আর স্টুয়ার্টের যুক্তিশাণিত আস্তিক্যবাদ, টমাস ক্যাম্পবেলের মুক্তিকামী কবিতা, রবার্ট বার্ণসের বিদ্রোহী কাব্য কথিকা, টমাস পেইনের যুক্তিবাদী দর্শন তখন যে কোনো সংবেদনশীল মানুষের চেতনার শিরায় শিরায় আগুন ছড়িয়ে দিত। হিউমের সংশয়, পেইনের 'এজ অব রিজন', ক্যাম্পবেলের 'প্লেজার্স অব হোপ', আর বার্ণসের আগুনে স্বপ্ন ড্রামন্ডের মস্তিস্ক আর হৃদয়কে দখল করে নিয়েছিল।

ড্রামন্ডের বাবা ছিলেন গীর্জার 'গোলমেলে' পাদ্রী। ভাইদের সঙ্গে মতান্তরের জেরে অভিমানাহত হৃদয়ে ড্রামন্ডএকদিন পোর্টসমাউথ থেকে ভারতমুখী নরদামবারল্যান্ড জাহাজে চড়ে বসলেন, to meet again no more. যাত্রা শুরুর তারিখটা ছিল ১৮১৩ সালের ২ জুন। দীর্ঘ ও উথাল পাতাল সমুদ্র যাত্রায় যে সুঃসহ অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। একদিকে বর্বর, অসভ্য সহযাত্রীদের নিষ্ঠুর দুর্ব্যবহার; অন্যদিকে

'the extremes of heat and cold, hunger and thirst.' কলকাতায় এসে নামলেন 'unknown and unnoticed অবস্থায়। কি করবেন, কোথায় যাবেন কিছুই ঠিক নেই। বন্ধু মিঃ ক্রিস্টির আতিথ্য গ্রহণ করে কলকাতা ছেড়ে গেলেন বহরমপুর। সেখানে ক্যান্টনমেন্টে এক মিলিটারী অফিসারের কবরখানায় বসে অস্তগামী সূর্যের ম্লান আলোয় লিখে ফেললেন ৪২ স্তবকে বিন্যস্ত ১৬৮ ছত্রের দীর্ঘ একটি 'এলিজি' কবিতা। কবিতাটিকে, বলা যেতে পারে ড্রামন্ডের ভরতীয় জীবন নাট্যের 'প্রোলোগ' স্বরূপ। এর থেকে যেন চেনা যায় কে এই ড্রামন্ড? কেন এসেছেন তিনি এখানে? কবিতায় তিনি লিখেছেন, ভারতবর্ষে এখন রাজত্ব করছে 'Grim superstition'.

Each gate of sweet society is closed,
And man immutably, estranged from man.

রাত্রির লৌহগরাদ যেন ঘিরে রেখেছে এই রৌদ্রোজ্জ্বল ভূভাগকে। তিনি প্রশ্ন করেছেন, অজ্ঞানতার শৃঙ্খলে আর কতদিন বাঁধা থাকবে মনুষত্ব। আশা প্রকাশ করেছেন অজ্ঞানতার অন্ধকার একদিন দূরীভূত হবে। মানুষ মানুষের দিকে তাকাবে ভাইয়ের চোখে। 'rousing reason's sacred tones be heard.' ডেভিড ড্রামন্ড যেন স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে আনা এক প্রমিথিউস। এই আগুন প্রতিস্থাপন করার পরিবেশ চাই - পাত্র চাই।

সুযোগ মিলে গেল। মি. মেজার্স ও মি. ওয়ালেস কলকাতায় ধর্মতলা স্ট্রীটে 'ধর্মতলা একাডেমি' নামে একটি স্কুল চালাচ্ছিলেন। সেখানে ইন্টারভিউ দিয়ে ১৫০ টাকা মাইনের শিক্ষকতার একটি চাকরি পেয়ে গেলেন (১৮১৪, ১৪ জানুয়ারি), এবং সেখানে যোগ দিতে না দিতে চমকপ্রদ প্রস্তাব। মি. ওয়ালেশ স্কুলের অংশীদারীত্ব বেচে দিতে চাইলেন। ড্রামন্ড লিখেছেন, I was astonished and knew not what to do. ঋণ কর্জ করে ড্রামন্ড হয়ে গেলেন স্কুলের 'co-proprietor' শুধু শিক্ষক নন, স্কুলেব প্রশাসক ও সহযোগী মালিক হয়ে তিনি ঢেলে সাজালেন স্কুলের পাঠক্রম, পাঠদান পদ্ধতি এবং পরীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠান। বছর খানেকের মধ্যে ধর্মতলা একাডেমি হয়ে উঠল কলকাতার অন্যতম সেরা স্কুল। অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য বিষয় তিনি প্রবর্তন করলেন।

এক, সাহিত্যের সঙ্গে গ্রামার পড়ানো চালু করলেন।

দুই, ভূগোল পড়াতে শুরু করলেন গ্লোব সহকারে।

তিন, ধর্মতলা একাডেমি আগে ছিল 'ক্ল্যাসিকাল' স্কুল। এখন জোর দেওয়া হল 'science of commerce' পড়ানোর দিকে।

চাব, বুক কিপিং শেখানোর পদ্ধতি আমূল বদলে দিলেন। খেলতে খেলতে ছেলেরা যাতে বুক কিপিং এর হিসাব আয়ত্ত করতে পারে তার ব্যবস্থা করলেন। 'He converted hours of relaxation into profit.'

পাঁচ, বিনোদন মূলক আনন্দানুষ্ঠানের অবকাশ সৃষ্টি করলেন। নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয় সব কিছুরই অবকাশ রাখলেন।

ছয়, বিদ্যালয়ের মধ্যে অনুদারতামুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করলেন। খ্রিস্টান ছাত্রদের সঙ্গে 'নেটিভ' ছাত্রদের যাতে কোনো বিভেদ না থাকে তার ব্যবস্থা করলেন।

সাত, যুক্তি, তর্ক এবং পর্যবেক্ষণের উপর জোর দিলেন। a latitude was given to the exercise of reason, discussion and investigation.

আট, বিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানকে সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত করে দিলেন। পরীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি ছাত্রদের বৃহত্তর সমাজের উন্মুক্ত পৃথিবীতে দাঁড় করিয়ে দিলেন। উৎসব মুখর সেই দিনটা ছিল ছাত্রদের পক্ষে 'soul-enlivening and soul-thrilling.'

নয়, ছাত্রদের নৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য রবিবারে রবিবারে ছাত্রদের চার্চে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। লিখেছেন, 'I will take them to church with me on Sundays, and assume every decency of demeanour.'

সত্যি কথা বলতে কি 'He omitted nothing by which he was enabled to benefit his pupils.' এইভাবে 'আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে' 'ধর্মতলা একাডেমি' রচনা যখন সম্পূর্ণ (১৮১৫) তখন ছ'বছরের একটি শিশু বাবা ফ্রান্সিস ও মা সোফিয়ার হাত ধরে প্রবেশ করলেন সেখানে। এই শিশুটিই ডিরোজিও।

সম্ভ্রান্ত পর্তুগীজ বণিক মাইকেল ডিরোজিওর মধ্যম পুত্র ফ্রান্সিস থাকতেন মৌলালি দরগার ঠিক দক্ষিণে সার্কুলার রোডের উপর অবস্থিত (১৫৫নং আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড) তাঁদের নিজস্ব বিশাল দোতলা বাড়িতে। ফ্রান্সিস চাকরি করতেন জেমস স্কট অ্যান্ড কোম্পানীর সিনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট পদে। তিনি শুনেছেন, ড্রামন্ডের একাডেমিতে 'The science of commerce in all its branches was given encouraged.' নামী ব্রিটিশ এজেন্সি হাউসের কর্মচারীর এমন স্কুল পছন্দ হওয়ারই কথা। ছেলেকে সদাগরী হাউসের সুযোগ্য কেরানি তৈরি করতে হলে এমন ইস্কুলেই ভর্তি করা দরকার। ডিরোজিওর জীবনী পাঠকরা নিশ্চয়ই জানেন স্কুলের পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজের কোম্পানীতে কেরানির চাকরিতে ডিরোজিওকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে চাকরি তার ধাতে সয়নি। স্কট কোম্পানীর হিসাবরক্ষক কি আর জানতেন তার ছেলে কেরানি হওয়ার জন্য জন্মায়নি, আর ডেভিড ড্রামন্ডের, স্কুলও নিছক কেরানি প্রস্তুত করার কল নয়। ডেভিড ড্রামন্ডও ছিলেন না কলকাতার তদানীন্তন সেমিনারীর যে কোনো মাস্টার। তিনি ছিলেন শিক্ষা-শিল্পী। ইতিহাস দেবতার অদৃশ্য ইঙ্গিতে এইভাবেই সোনার সঙ্গে সোহাগা এসে মেলে। সুদূর স্কটল্যান্ড থেকে নতুন ভাবনা আর বিপ্লবের সপ্তবর্ণ বিভা

হৃদয় আর মস্তিষ্কের প্রিজমে ভরে ডেভিড ড্রামন্ড ধর্মতলা একাডেমিতে যে ১৮১৫ সালের আগেই আসর সাজিয়ে বসলেন সে কার জন্য?

১৫৫নং সার্কুলার রোড থেকে ২৪নং ধর্মতলা স্ট্রীট খুব দূরেও নয়। ওয়েলিংটন স্কোয়ার পেরিয়ে ধর্মতলা স্ট্রীট ধরে একটু এগোলেই ডানদিকে। ১৮২৫ সালে আঁকা জে. এ. স্কাল্চের ম্যাপ অনুসারে ধর্মতলা একাডেমির অবস্থান ছিল দক্ষিণে ধর্মতলা স্ট্রীট, উত্তরে ইমামবাগ লেন, পশ্চিমে হসপিটাল লেন আর পুবে লায়ন্স রেঞ্জ। ঠিক মাঝখানে, হসপিটাল লেন আর ধর্মতলা স্ট্রীটের সংযোগস্থলে। বর্তমানে জ্যোতি সিনেমার উল্টো দিকে লেনিন সরণি থেকে যে রাস্তা সত্যপ্রিয় ভবনের (এ. বি. টি. এ. হল) দিকে চলে গেছে সেই রাস্তার পুব দিকে - লেনিন সরণি ঘেঁষে। বিদ্যালয় ভবনের উত্তর দক্ষিণে ছিল প্রশস্ত মাঠ। বেশ খোলা মেলা। দেখলেই ভালো লাগে।

১৮১৫ থেকে ১৮২৩ - দীর্ঘ আট-ন বছর। সুদূর স্কটল্যান্ড থেকে আগত (যা কিনা ঝড়ের গর্ভ গৃহ) আধুনিকতার আদি আচার্য ডেভিড ড্রামন্ড আর হিন্দু কলেজের ভাবী শিক্ষক, নব্য বঙ্গের দীক্ষাগুরু ও গুরু-শিষ্য সম্পর্কের মধ্যে নিবিড় বন্ধনে বাঁধা পড়ে রইলেন। ড্রামন্ড কি তাকে শুধু গ্রামার আর বুক কিপিং শেখালেন? রক্তকমল তো পাথরে ফোটে না তার জন্য শারদ সরোবর লাগে। বিকষমান একটি দেব-দুর্লভ শিশুর মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের খাঁজে খাঁজে তিনি বুলিয়ে চললেন সপ্তবর্ণ আলোর তুলি। হিউম, স্মিথ, রবার্টসন, রীড, স্টুয়ার্ট, বেকন, পেইন, ক্যাম্পবেল, বার্ণস - নানা রঙের বাটি সাজানো ছিল তার মস্তিষ্কের অলিন্দে, হৃদয়ের টেবিলে। তিনি শেখালেন কাকে বলে জ্ঞান? কি ভাবে সত্যে পৌছুতে হয় বিশ্লেষণাত্মক যুক্তির সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে - কেন জ্ঞান বিত্তের চেয়ে শ্রেয়তর — জ্ঞানের সঙ্গে মানব কল্যাণের সম্পর্কই বা কি? ন্যায় আর যুক্তি ছাড়া চেতনার মুক্তির অন্য পথ নেই। কবিতা পড়ো, দর্শন পড়ো, আবৃত্তি করো, নাট্যমোদী হও, স্বপ্ন দেখো, স্বপ্নকে ভাষা দাও। রিক্রিয়েশন দিয়ে মনের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা সুকুমার অনুভূতিগুলিকে জাগিয়ে তোলো। মানুষ আসলে ওল্টানো সেতার। তাকে ভেতর থেকে বাজিয়ে তুলতে হয়। সব মানুষ সমান। 'Intellect is universal.' পৃথিবীতে কোনো জাতি 'superior' নয়। চিত্তকে অনুদারতামুক্ত করো। ধর্মজনিত মতান্ধতা, অন্ধসংস্কার, অহেতুক জাতিগত উচ্চমন্যতা দেশের ও মানুষের দুর্গতির জন্য দায়ী। সন্দেহবাদই তার প্রধান প্রতিষেধক। প্রশ্ন করো, তর্ক করো - সব কিছুকে নিয়ে এসো 'at the bar of reason'। যুক্তির পথ ধরতে গিয়ে বিপরীত যুক্তির কথাও মাথায় রাখো। জ্ঞান ছাড়া সত্যকে অপাবৃত করার অন্য পথ নেই। সত্যের জন্য বাঁচো এবং মরো। স্বাধীনতা ও মুক্তি মানুষের চরম লক্ষ্য। তার জন্য লড়াই করো। মুক্তির পতাকা বও। জীবন সবুজ এবং সজীব। বিকাশই হচ্ছে তার ধর্ম। জীবনকে আস্বাদ করো। যে নিজে মনে মনে মরে থাকে সে কখনো জীবনকে

প্রাণবান করতে পারে না। শুধু নিজের জন্য নয় সকলের জন্য বাঁচো। জীবনের উপান্তে গিয়ে যেন বলতে পারে 'এ জীবনে বাঁচিনি বৃথাই।'

দীর্ঘ আট-ন বছর ধরে ডিরোজিও ড্রামন্ডের এই মানবতাবাদী শিক্ষায় দীক্ষিত হয়েছেন। চোখের সামনে দেখেছেন পরিপূর্ণ জীবনবাদী এক শিক্ষককে। 'আধপেটা খাই শালুক কোঁড়া / একলা কঠিন ভুঁয়ে / চাটাই পেতে শুয়ে'র দেশে ড্রামন্ড সম্পূর্ণ নতুন ধরণের মানুষ। নতুন জাতের শিক্ষক। অবস্থা ফিরতেই তিনি নিজের জীবনকে সুরম্য করে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। সুসজ্জিত রুচি সম্মত বাসগৃহ। অবসর যাপনের জন্য এন্টালিতে কিনেছিলেন একটি বাগান বাড়ি। সেখানে মাঝে মাঝেই বলনাচ আর খানাপিনার আসর বসতো। ড্রামন্ড বাদ্যযন্ত্র তুলে নিয়ে গান ধরতেন। দর্শন ও কাব্য নিয়ে মজলিসী আসর বসাতেন। হাজার তিনেক টাকা ব্যয় করে একটি নাট্যশালাও বানিয়ে ফেলেছিলেন। দিল দরাজ মানুষ। কোনো সাহায্য প্রার্থী তার কাছ থেকে খালি হাতে ফিরতো না। প্রাতরাশ করে সকালে বিদ্যালয়ে যেতেন। ফিরতেন বেলা দু'টোর পর। বিকেল পাঁচটায় সান্ধ্য আহার সারতেন। ভৃত্যের কমতি ছিল না। কেউ পোষাক পরতে সাহায্য করতো। কেউ বা খাবার পর হাত ধোবার জল ঢেলে দিতো। ড্রামন্ডের পোষাক পরিচ্ছদ ছিল খুবই সৌখিন। গায়ে থাকত সাদা ধবধবে সিল্কের পাঞ্জাবী। উপরে সাহেবী কোট, পরণে চোগা। আজকের জামা কাল পরতেন না। সন্ধ্যেয় কোথাও যেতে হলে চার বা ছয় বেহারার পালকিতে চেপে বসতেন। তিনি যে বেশ খোশ্ মেজাজেই ছিলেন এদেশে তার প্রমাণ মেলে তাঁর লেখা এক চিঠিতে — "এই উর্বর দেশে সব ইউরোপীয়ানই ভদ্রলোক - ভদ্রমহিলার মতো জীবন কাটায়। তারা তোমাদের থেকে বেশি খায়, পান করে, ঘুমোয়; অর্ধেক সময় কাটায় বিনোদন অবকাশে। এখানে 'We are attended and received like kings.'

নাটকের যেমন থাকে 'রাইজিং অ্যাকশন' তেমনি 'ফলিং অ্যাকশন'। ড্রামন্ডের জীবন নাট্যেও তা ছিল। অসুস্থতা ও দৈন্যের ছায়া দীর্ঘতর হতে থাকলো। ধর্মতলা একাডেমির পাট একদিন চুকলো। সুরম্য বাস গৃহ ছেড়ে উঠে এসেছিলেন ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের একটি প্রায়ান্ধকার একতলা বাড়িতে। একাকী থাকার জীবনই বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত দার্শনিকের মতোই দারিদ্র্য ও অসুস্থতা পীড়িত জীবনের জন্য তাঁর কোনো হাহুতাশ ছিল না। বন্ধুরা সাহায্য করতে এলেও তিনি হাসি মুখে তাদের নিরস্ত করতেন। বলতেন আমার কোনো অসুবিধা নেই। 'বেঙ্গল হরকরা' জাতীয় পত্র পত্রিকায় লিখে সামান্য যা উপার্জন করতেন তাতেই চলতো তার গ্রাসাচ্ছাদন। সম্পদ এবং দারিদ্র্য, সমাগম ও একাকীত্ব - দুইকেই তিনি হাসি মুখে বরণ করতে পারতেন। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের উল্টোদিকের একতলা বাড়িতে ড্রামন্ডের এক অনুরাগী দেখা করতে গেছেন। সঙ্গে বন্ধু, তাঁরা ঢুকে

দেখলেন স্যাঁৎসেঁতে ছোট্ট ঘর। একটা বইয়ের আলমারি, মাকড়সা বাসা বেঁধেছে। কতদিন খোলা হয়নি। চেয়ার টেনে বসতে বললেন। অনুরাগী তাকে একটা বই উপহার দিলেন। ড্রামন্ড পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ডুবে গেলেন তাতে। সাক্ষাৎপ্রার্থীরা বুঝতেই পারছিলেননা কি ভাবে কথা শুরু করবেন? কিছুক্ষণ পর ড্রামন্ড মাথা তুললেন এবং কথা বলতে শুরু করলেন। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যেতে থাকলেন কথা বলতে বলতে। থেকে থেকে তার নীল চোখ দুটি জ্বলে উঠছিল। "His blue eyes sparkled as he proceeded." শেষ পর্যন্ত মেটা ফিজিক্সের প্রসঙ্গে নোঙর করলেন। এটাই ছিল তার প্রিয় বিষয়। শারীরিক অসুস্থতার কথা ভুলেই গেছেন। দশটা থেকে একটা। অনুরাগী সাক্ষাৎ প্রার্থীরা ওঠবার উপক্রম করতেই ড্রামন্ড বলে উঠলেন, 'Why so early?'

ডেভিড ড্রামন্ড কোনো একরঙা টাইপ চরিত্র নন, প্রিজমের মতো এ চরিত্রের নানা তল। এন্টালির বাগান বাড়িতে যিনি প্রায় নবাব, বিতর্ক সভায় মহাতার্কিক, শ্রেণী কক্ষে তিনি অসামান্য শিক্ষক, প্রবন্ধে নিবন্ধে তিনি চুল চেরা বিশ্লেষক, দর্শনে সংশয়বাদী, কবিতায় স্বাপ্নিক। কণ্ঠ আর লেখনী দুয়ের উপর ভর করেই তিনি সারা জীবন কাটিয়েছেন। অজস্র বক্তৃতা করেছেন শ্রেণীকক্ষে ও সভায়। লিখেছেন যুক্তি নিষ্ঠ নিবন্ধ ও স্বপ্নময় কবিতা স্কুলে মাস্টারি করেছেন আর পত্র পত্রিকায় লিখেছেন গদ্য - পদ্য। ফ্রেনোলজিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক হয়েছেন আবার যখন বুঝেছেন আধুনিক বিজ্ঞান সত্যের সঙ্গে ফ্রেনোলজির বক্তব্য মিলছে না তখন তার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছেন। জীবনের শেষ দিকে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন (উইকলি একজামিনার)। সেও এক সময় বন্ধ হয়ে গেছে। ড্রামন্ডের ডানা ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল একটি ঘটনা। তার প্রিয়তম ছাত্র ডিরোজিওর অকাল মৃত্যু। পাখির মায়ের মতো ভালোবাসা দিয়ে রচনা করেছিলেন তাকে। ঝিনুকের খোসার মতো তিনি পড়ে রইলেন অশ্রুর মতো টলটলে মুক্তা বিন্দুটি চুরি করে নিয়ে গেল মৃত্যু। তিনিও প্রায় হারিয়ে গেলেন লোক চক্ষুর অন্তরালে। কারো কাছে তাঁর কোনো নালিশ নেই এমন কি ভাগ্যের কাছেও না। হঠাৎ তার নজরে পড়লো 'ক্যালকাটা ক্যুরিয়র' নামে একটি পত্রিকা তাঁর অকাল প্রয়াত প্রিয় ছাত্রের নামে কুৎসা শুরু করেছে। ছাত্ররা নাকি ডিরোজিওর খপ্পরে পড়ে ধর্মচ্যুত হয়েছে, 'They tampered Hindoo idols, discreeted their tamples.' ড্রামন্ড আর স্থির থাকতে পারলেন না। জীবন সায়াহ্নে তিনি কলম ধরলেন। লিখলেন, ডিরোজিও নতুন যুগের শিক্ষক, যুবকদের চোখের মণি। স্বাধীন চিন্তার প্রচারক। তার নামে অকারণ কুৎসা বন্ধ হোক। ছোট্ট একরত্তি জীবন তার 'ভালো করে সকাল হবার আগেই ঝরে গেছে তার জীবন কুসুম। কিন্তু যারা তাকে জানতো তাদের হৃদয়ে ছড়িয়ে গেছে ভালোবাসার বিষণ্ণ মধুর সৌরভ। 'He leaves behind him a fragrance in the hearts of all who knew him.' সে ছিল মুক্তির

পতাকাবাহী। সত্যের জন্য লড়াই করেছে আমৃত্যু। সে ছিল 'pride of his countrymen and the darling of all who knew him.' আগুন ঝরাবেন বলে কাঁপা কাঁপা হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন কিন্তু লেখনী দিয়ে গড়িয়ে পড়লো চোখের জল।

১৮৪৩ সাল ২৮ এপ্রিল। কলকাতার আদি আচার্য, ডিরোজিওর মহান শিক্ষক চির বিশ্রাম নিলেন। কলকাতায় কাটিয়ে গেলেন প্রায় ৩০টা বছর। তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে সার্কুলার রোড়ের পুব দিকের খ্রিস্টীয় গোরস্থানে। তাঁর কিছু বন্ধু ও অনুরাগী ছাত্র তাঁর সমাধির উপর একটি বৃত্তাকার স্মৃতি স্তম্ভ স্থাপন করে তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন তখন। এখন আর তাঁকে মনে রাখার মতো বিশেষ কেউ নেই। সেই স্মৃতি স্তম্ভের গায়েই লেখা আছে ড্রামন্ডের শিক্ষকতার শেষ অভিজ্ঞান পত্র —

> "Beneath lie the mortal remains of *DAVID DRUMMOND*, a native of Scotland, and for many years, a successful teacher of youth in this city, he departed this life the 28th April 1843, aged 56 years."......

তথ্যসূত্র ঃ

১। 'A Brief Memoir of the Late Mr. David Drummond,' **The Oriental Magazine**, June-1843. Vol-1. No.-6.

২। **Government Gazette,** Vol. 4. 31 Dec. 1818; 24 Dec. 1818

৩। **Calcutta Gazette,** Dec 25, 1817.

৪। **Calcutta Journal,** Dec. 25. 1818; Dec 23. 1820. Dec 24. 1821: January 1. 1822 Dec 24. 1822.

৫। **John Bull,** January 10. 1824. January 26. 1824

৬। **Bengal Hurkaru,** January 6. 1826; Dec 27. 1826: Dec 23, 1828

৭। **বঙ্গদূত,** ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮২৯।

৮। **Bengal Herald,** Dec 27, 1829.

৯। **Bengal Hurkaru,** 1840 – Feb 21, May 5. Dec 14. 1841 – January 12, January 18, Feb 1, March 16, April 5, April 12. May 24. June 1.

১০। The Bengal obituary, Holmes and Co, 1848. Punthi Pustak edition. Calcutta, 1991, introduction by P.T. Nair, p. 275.

সূত্রনির্দেশ

A Brief Life sketch

David Drummond

Born : 1785 / 87, Fifeshire, by the side of Leven river, Scotland.

Left : Portsmouth, 2nd June 1813 in the ship 'Northumberland,' for India, five months voyage.

Arrived : Calcutta, Dec 1813

Appointed : As Teacher in Durrumtollah Academy, 14 January 1814; and became its proprietor also.

Secretary : Phrenological Society, 1825

Columnist : *Bengal Hurkaru.*

Editor : *The Examiner and Literary Register (Weekly Examiner)*, March 1840 - July 1841.

Book : 'Objections to Phrenology.'

Poem : 'Elegy,' 'Lines to the Memory of Burns' etc.

Death : 28 April, 1843, Calcutta.

Buried : Circular Rd. Graveyard, a tomb errected

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও সোমপ্রকাশ

দেবশ্রী দাশ

মুখবন্ধ ঃ-

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিব ঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"[১]

"রাজা প্রজা হিতে রত থাকুন, শ্রুতিমহতী সরস্বতী যেন পরিত্যক্ত না হন।" *সোমপ্রকাশের* কণ্ঠে উৎকলিত হত কলিটি। 'সাধারণের হিত' ও 'জ্ঞান চর্চা' এই দুই আদর্শে নিবেদিত ছিল এই পত্রিকা। সম্পাদক দক্ষিণবঙ্গের এক কৃতি সন্তান, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯-৮৬) অধ্যাপকজীবনে অজস্র ছাত্রের একনিষ্ঠভাবে শিক্ষাদান করে শিক্ষার জগতে তিনি হয়ে উঠেছিলেন দিক নির্দেশক ধ্রুবতারা। *সোমপ্রকাশের* (১৮৫৮) সম্পাদক হিসাবে তিনি ছিলেন সংবাদপত্র জগতে নতুন পথের দিশারী। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর '*রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* গ্রন্থে লিখেছেন, "তিনি অধ্যাপকতাবাদে যে কিছু অবসরকাল পাইতেন, তাহা সমুদয় সোমপ্রকাশ সম্পাদনে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় কর্তব্যপরায়ণ মানুষ আমরা অল্পই দেখিয়াছি। তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন, তখন দেখিলে বোধ হইত না যে অধ্যাপকতা কার্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করা ভিন্ন তাঁহার পৃথিবীতে আর কোনও কাজ আছে। আবার যখন গৃহে সোমপ্রকাশের জন্য রাশীকৃত দেশী ও বিলাতী সংবাদ পত্র, গবর্নমেন্টের রিপোর্ট ও গ্রন্থাদিপাঠে নিমগ্ন থাকিতেন, তখন কোথা দিয়া ঘন্টার পর ঘন্টা যাইত তাঁহার জ্ঞান থাকিত না।"[২]

জন্ম ও পরিচয় ঃ- ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগণার অন্তর্ভুক্ত চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে দ্বারকানাথের জন্ম। পিতা স্মৃতি শাস্ত্রজ্ঞ ও বৈয়াকরণিক পন্ডিত হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। তিনি ছিলেন তেজস্বী ও উন্নতশির, পিতা ও পন্ডিত সর্ব্বানন্দ সার্বভৌমের কাছে শুরু হয় প্রাথমিক পড়াশোনা, ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে ক্রমান্বয়ে শিক্ষা করেন ব্যাকরণ, বেলিস লেটার, গণিত, তর্কশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, আইন ও ইংরাজী। কলেজের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম ও প্রধান বৃত্তি পেয়ে লাভ করেন বিদ্যাভূষণ উপাধি।[৩]

১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে কলেজে শিক্ষাজীবন শেষ করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা শিক্ষকের পদ দিয়ে কর্মজীবন শুরু। পরে সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ, ব্যাকরণ শিক্ষক ও সাহিত্য শাস্ত্র - অধ্যাপক পদে বৃত হন। সংস্কৃত কলেজে। কর্মজীবনের মোট সময়সীমা

ছিল ১৮ বৎসর ৭ মাস। সাহিত্য সৃষ্টিতেও দ্বারকানাথ ছিলেন বিশেষভাবে তৎপর। তাঁর প্রধান সাহিত্যকীর্তি *সোমপ্রকাশ* (১৮৫৮) *কল্পদ্রুম* (১৮৭৮) নামে উচ্চ-শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন। ছাত্রদের প্রয়োজনে লেখেন *রোমের ইতিহাস* (১৮৫৭), *গ্রীসের ইতিহাস* (১৮৫৭), *সুবুদ্ধি ব্যবহার* (১৮৬০), *ভূষণসার ব্যাকরণ* (১৮৬৫), *বিশ্বেশ্বর বিলাপ* (১৮৭৪), *উপদেশমালা* (১৮৮৩), *সাংখ্য দর্শন* (১৮৮৬), এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত হয় - *দেবগণের মর্ত্যে আগমন* (১৮৮৬)।[৫] সাধারণ মানুষের হিতসাধনায় উন্মুখ দ্বারকানাথ তাঁর হরিনাভি গ্রামে তৈরি করেছিলেন উচ্চতর ইংরাজী বিদ্যালয় (Higher English School)। বহু প্রতিভাবান ছাত্র এখানে পড়াশোনা করেন। তাঁর উদ্যোগ তৈরি হয় রাজপুর ডাকঘর, রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি (১৮৭৩), চাঙ্গড়িপোতা রেলওয়ে স্টেশন। দরিদ্র ও নিরন্ন মানুষদের বিভিন্ন চাকরিতে বহাল করতেন। বিভিন্ন মানবিকগুণে ভূষিত ছিলেন বিদ্যাভূষণ। মিতব্যয়িতা, অধ্যাবসায়, পরিশ্রম, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিল তাঁর সাফল্যের অন্যতম স্তম্ভ। স্বদেশের উন্নতিসাধন ও সমাজ সংস্কারে তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। এমনকি মৃত্যুর পূর্বে দেশের উন্নতির কথা প্রলাপ বকতে বকতে তাঁর মৃত্যু হয় (১৮৮৬)।

সোমপ্রকাশ ঃ- শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে সারদাপ্রসাদ নামে এক বধির ছাত্রের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় *সোমপ্রকাশ* প্রকাশনার উদ্যোগ নেন। সারদাপ্রসাদ বর্ধমান মহারাজার অধীনে বর্ধমানে চাকুরী পেলে সে উদ্যোগ স্তিমিত হয়। পরবর্তী সময়ে বাংলা সংবাদপত্র জগতে ভালো সংবাদপত্রের অভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও অন্যান্য পন্ডিতদের কাছে এই পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫) প্রথম প্রকাশিত হয় এই পত্রিকা। প্রথমে প্রতি সোমবার চাঁপাতলা আমহার্স্ট স্ট্রিট সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেনের ১নং বাড়ি থেকে শ্রী গোবিন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় প্রকাশ করতেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে দক্ষিণপূর্ব মাতলা রেলওয়ের সোনারপুর স্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের গৃহ থেকেই প্রকাশিত হত *সোমপ্রকাশ*। *সোমপ্রকাশের* মাসিক মূল্য ১ টাকা, বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫ টাকা। ছাত্রদের জন্য মূল্য নির্দ্ধারিত হয়েছিল ডাকমাসুল সহ বার্ষিক ৩ টাকা, অসমর্থ ব্যক্তিদের জন্য ৭ টাকা। ১৮৬৫ সালের ২রা জানুয়ারী থেকে কিছুদিনের জন্য দ্বারকানাথ সম্পাদকীয় পদ থেকে সরে আসেন। পত্রিকা সম্পাদনার ভার নেন মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ। আবার ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাভূষণ স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য কাশী গেলে পত্রিকা সম্পাদনার ভার পড়ে তাঁর ভাগিনেয় শিবনাথ শাস্ত্রীর উপরে। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের 'ভার্নাকুলার আইনে' এই পত্রিকার প্রকাশ কিছুদিন বন্ধ থাকে। এই আইন রদ হলে পুনরায় প্রকাশিত হয় এই পত্রিকা। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট বিদ্যাভূষণ লোকান্তরিত হবার পরেও এই পত্রিকা আরো কিছুদিন প্রকাশিত হয়েছিল।

সোমপ্রকাশের বিশেষত্ব ঃ- উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে জাতীয় জীবন আন্দোলিত হয়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনা পরিবর্তনশীল পটভূমিকার সৃষ্টি করে। এই পরিবর্তনশীল পটভূমিকায় *সোমপ্রকাশ* হয় দিক-দিশারী। শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষের ভাষায়, " 'সোমপ্রকাশ' উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষিত উদারপন্থী বাঙালী মধ্যবিত্তের অন্যতম মুখপাত্র হয়ে উঠেছিল।" তার কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন, "সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ে 'সোমপ্রকাশ' যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তার সুর ও ভাষা পূর্বেকার ধারা থেকে স্বতন্ত্র। রাজনৈতিক মতামত সেকালের তুলনায় অনেকটা নির্ভীক এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মতামত নিঃসন্দেহে উদার।"[৬]

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতি তর্পণ করেছিল ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *এডুকেশন গেজেট* (১৯ ভাদ্র ১২৯৩)। এই স্মৃতি তর্পণেই পরিস্ফুট হয় *সোমপ্রকাশের* বিশেষ বৈশিষ্ট্য। "বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাঙ্গলা সংবাদপত্রের প্রথম শিক্ষাগুরু। তাঁহা হইতেই বাঙ্গলা সংবাদপত্রের উন্নতি হয়। পূর্বে ভাস্কর, প্রভাকর, সমাচার চন্দ্রিকা প্রভৃতি বাঙ্গালা সংবাদপত্র ছিল বটে, কিন্তু সংবাদপত্রের উপযুক্ত বিষয় সমূহ এই সকল পত্রে লিখিত হইত না। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই সুপদ্ধতিতে বাঙ্গালা সংবাদপত্র পরিচালনের প্রকৃত পথ নিদর্শন করেন। রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের আন্দোলন কিরূপে করিতে হয়, তিনি প্রথম তাহা বাঙ্গলা সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে দেখাইয়া দেন। এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহের অনেক উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু সোমপ্রকাশ সংবাদপত্রই যে এ উন্নতির মূল, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।"[৭]

'*রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ*-এ শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর মতামত বিজ্ঞাপিত করেছেন, "যেমন ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, তেমন মতের উদারতা ও যুক্তিযুক্ততা, তেমন নীতির উৎকর্ষ। চিত্তের একাগ্রতাটাই *সোমপ্রকাশের* প্রভাবের মূলে ছিল।"[৮] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সাহিত্য সাধক চরিতমালাতে সোমপ্রকাশের সম্পাদকের কৃতিত্বের মূল্যায়নের সাথে সাথে *সোমপ্রকাশের* স্বাতন্ত্র্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। "ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে বাংলা দেশের সংবাদপত্র জগতে এক অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। ততদিন পর্য্যন্ত বাংলা সংবাদপত্রে নিষ্ঠা, শুচিতা ও প্রাঞ্জলতার অভাব ছিল। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ঐকান্তিক যত্ন, চেষ্টা ও সাধনায় মূলত এই সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। বাংলা সংবাদপত্রকে নির্ভরযোগ্য রাজনীতির ও সমাজ সংস্কারনীতির বাহন করিয়া তিনি বাংলাদেশের জনসাধারণের চেতনা ঐ সকল বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, অসাধারণ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তাঁহার ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ওজস্বিতার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। তিনি তৎকালীন সংবাদপত্রের অন্যতম প্রধান ধর্ম্ম, কুৎসিৎ দলাদলি ও

পরস্পর কর্দ্দম নিক্ষেপকে বিষবৎ বর্জন করিয়াছিলেন। শুভ্র শুচিতামন্ডিত হইয়া তাঁহার *'সোমপ্রকাশ'* পত্রিকা অচিরাৎ বাংলাদেশে আদর্শ সংবাদপত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ঐপত্রে সাহিত্য সমালোচনাগুলিরও বৈশিষ্ট্য ছিল। সোমপ্রকাশের নামের সহিত জড়িত হইয়া পন্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নাম বাংলাসাহিত্যে চিরস্থায়ী হইয়া আছে।''[৯] সুতরাং ভাষার প্রাঞ্জলতা, মতের উদারতা ও যুক্তিযুক্ততা, বিষয়-বৈচিত্র্য ও সংবাদ প্রকাশের নির্ভীকতা *সোমপ্রকাশকে* আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছিল।

সোমপ্রকাশে আলোচিত বিষয়বস্তু ঃ-

রাজনৈতিক ভাবনা ঃ- *সোমপ্রকাশে* সমকালীন রাজনৈতিক কার্যাবলী প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। নির্ভীকভাবে ব্রিটিশ নীতির সমালোচনা থাকত *সোমপ্রকাশের* প্রায় সকল সংখ্যাতেই। নিরস্ত্রকরণ ক্রিয়া, আগ্রার দরবার, প্রেস সংক্রান্ত আইন, মিউনিসিপাল সভা, ইলবার্ট বিল, দেশীয় ও ইউরোপীয় বিচারপতি, জমিদার সভা, বেঙ্গল ন্যাশনাল লীগ, ভারতসভা, জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছিল এই পত্রিকায়। অন্যদিকে আলোচিত হয়েছিল, 'ইংরেজ অধিকারে ভারত সুখী কি অসুখী,' 'ব্রিটীশ শাসন প্রণালীর মহাদোষ,' 'ভারতবর্ষকে হস্তে রাখিয়া ইংলন্ডের লাভ কি,' 'এদেশীয় দিগের রাজনীতি ঘটিত উন্নতি হইয়াছে কি না?' প্রভৃতি রচনা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরক্ষায় *সোমপ্রকাশ* ছিল অনলস। মুসলমান সমাজের নানা সমস্যা *সোমপ্রকাশে* প্রকাশিত হলেও মুসলমান বিদ্বেষ কখনো স্থান পায়নি। জাতীয় সংহতি ছিল এই পত্রিকার কাম্য। ১৮৮১ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে 'দেশীয় শান্তিভঙ্গ' (৯ কার্তিক ১২৮৮) নামে যে প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়েছিল তার অংশবিশেষ উৎকলিত হল, '.... মধ্যে মধ্যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দাক্ষিণাত্যে পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমান জাতির পরস্পর দারুণ বিবাদ ঘটিতেছে। এই উভয় জাতি বহুকাল অবধি ভারতবর্ষে বাস করিতেছে, তাহারা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বটে, কিন্তু একরাজার প্রজা ও একদেশ নিবাসী। অতএব তাহাদের এতাদৃশ বৈরভাবে উদয় হওয়া যারপরনাই আক্ষেপের বিষয়। কেবল হিন্দু ও মুসলমান বলিলেই ভারতবর্ষের সকল ধর্মালম্বীর নাম করা হইল না। হিন্দুগণও অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে একপ্রকার সম্প্রদায়ের মত অন্য সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। শাক্তের সঙ্গে বৈষ্ণবের মতের সামঞ্জস্য হয় না, বৌদ্ধের সঙ্গে সাধারণ হিন্দুসমাজের মতের মিল নাই। ব্রহ্মজ্ঞানীরা আবার আর এক সম্প্রদায়ের লোক, ইঁহারা সকলেই যদি বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হন, তবে ভারতের উৎসন্নে যাইতে একদিনও লাগে না। ধর্ম্ম - কর্ম্মে সকলে আপন আপন বিশ্বাস মত কাজ করুন। কিন্তু সামাজিক কাজে একতা চাই। নতুবা নিজ নিজ উন্নতিও হইবে না। স্বদেশেরও উন্নতি হইবে না।''[১০] ব্রিটীশ শাসনের স্বরূপ দর্শাইয়া *সোমপ্রকাশ* মন্তব্য করে, ইংরাজদিগের রাজ্যের শাসন প্রণালী দর্শন করিলেই হঠাৎ বোধ হইবে ইহাতে স্বেচ্ছাচারিতার নামগন্ধ

নাই। কেহ যে ইচ্ছামত কোন অন্যায় বা অত্যাচারের কার্য্য করিবে সে সম্ভাবনা নাই। গত মন্ত্রীসভা ও বর্তমান মন্ত্রীসভা ও অধীনস্থ প্রদেশ সকলের গত শাসনকর্তা ও বর্তমান শাসন কর্তাদিগের কার্য্য ও ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় ব্রিটিশ শাসন প্রণালীর মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা মূর্ত্তিমতি হইয়া যেন বিরাজ করিতেছে। কার্য্য দেখিলে বোধ হয় মুসলমান রাজাদিগের এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা ছিল কিনা সন্দেহ।'' (ব্রিটিশ শাসন প্রণালীর মহাদোষ, ৫ আশ্বিন ১২৮৭)। ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদানে ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে *সোমপ্রকাশ* নির্ভয়ে পেশ করেছিল, ''তাঁহাদের স্বার্থসাধনই মুখ্য উদ্দেশ্য, ভারতের শ্রীবৃদ্ধি আনুষঙ্গিক ফল। ভারতের শ্রীবৃদ্ধি মুখ্য উদ্দেশ্য হইলে কখন ঐ আইনের সৃষ্টি হইত না।'' (১ চৈত্র ১২৮৮)। ভারতবাসী প্রাচীন শিল্প ও বিজ্ঞান ক্রমে অবলুপ্ত হচ্ছে, ভারতবাসীর উন্নতি ব্যাহত হবার পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল ভারতের পরাধীনতা। 'স্বদেশী ও বিদেশীয় রাজার অধিকার' (২৮শে আশ্বিন ১২৯১) প্রবন্ধে *সোমপ্রকাশ* মন্তব্য করেছিল, ''পরাধীনতা যে উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক এবং পরাধীনতা হইতে পূর্ব্ব উন্নতির যে লোপ হয়, তাহা ইংরেজ অধিকারে বিলক্ষণ সম্প্রমান হইতেছে। ইংরেজেরা এদেশীয়দিগকে নানাবিষয়ে শিক্ষাদান করিতেছেন বটে, কিন্তু ইহাদিগেব উন্নতি লাভের পথ সুন্দররূপে পরিষ্কৃত করিয়া দিতেছেন না।'' বাঙালীর বিলাসী চরিত্র সমালোচিত হয়েছে *সোমপ্রকাশে*। ''বঙ্গদেশের এই স্ত্রৈণভাব দূরীভূত হইয়া যে কবে পুরুষভাব হইবে আমরা ভাবিয়া আকুল হইতেছি।'' সুতরাং রাজনৈতিক মতামত প্রকাশে *সোমপ্রকাশ* ছিল অকুতোভয়।

অর্থনৈতিক ভাবনা ঃ- তৎকালীন অর্থনৈতিক সমস্যার অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করে সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করে মতামত প্রকাশ করেছিল সোমপ্রকাশ। নীলচাষ, পাট ও রেশমচাষ, মজুরশ্রেণী, এদেশীয় জমিদারদের অত্যাচার, প্রজাদের দুরাবস্থা, পাবনাব প্রজাবিদ্রোহ, এদেশীয়দের চাকুরিপ্রিয়তা, ইংরাজী মুলধন বিনিয়োগে ভারতের উপকার। অপকার, দেশীয় শিল্পের অবনতি, বঙ্গে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিষয়ে অমূল্য রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রিটিশ অত্যাচারের সহযোগী ছিল এদেশীয় জমিদারগণও। ''জমিদারদিগের মধ্যে আর একটি দল আছে হইয়াছে, তাঁহারা বড় পাকা লোক। কুকার্য্য পরিপাক করিবার উদ্দেশ্যে বাহিরে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া থাকেন। আমাদিগের প্রাচীন দলের একটি সম্প্রদায় হইতে তাঁহাদিগের এই শিক্ষাটি হইয়াছে। ঐ সম্প্রদায় গোপনে না করেন এমন কুকর্ম্ম নাই, পরদারগমন উৎকোচগ্রহণ ও কৃতঘ্নতা করিয়া পরের সর্ব্বস্ব হরণ প্রভৃতি কিছুতেই পরাঙ্মুখ নহেন। তাঁহাদিগের এইসকল কুক্রিয়া জীর্ণ করিবার মহৌষধ আছে। সেই ঔষধ এই, গঙ্গাস্নান ও নামাবলী গ্রহণ।'' (অত্যাচার বিষয়ে এদেশীয় জমিদারেরাও বড় কম নন, ২০ শ্রাবণ ১২৬৯) ঐ অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্য *সোমপ্রকাশ* দেশের মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর ঐক্যের কথা বলেছিল। *সোমপ্রকাশে* প্রকাশিত নীলপ্রধান প্রদেশ,

১৬ চৈত্র ১২৭০ এবং আবদুল মতলেব মন্ডল লিখিত পত্রে নীলচাষীদের করুণ আর্তি পরিস্ফুট হয়েছিল। বাঙালীর বাণিজ্যে অংশগ্রহণের অনীহা যে তার চরিত্রে অন্তর্লীন তা *সোমপ্রকাশ* যুক্তি সহকারে বিশ্লেষণ করেছিল। (আমাদিগের বর্তমান বাণিজ্য ব্যবসায়, ১৪ শ্রাবণ ১২৮৫, ৩৬ সংখ্যা)। *সোমপ্রকাশ* এ তত্ত্বও প্রচার করতে ভোলেনি যে শিল্পবিস্তারে এদেশের কল্যাণ নিহিত, তবে সেই শিল্পবিস্তারে ভারতের মঙ্গলের জন্য ভারতীয় মূলধনের বিনিয়োগ অত্যন্ত জরুরী, ব্রিটিশ মূলধন নয়। "ভারতে রেলওয়ের সৃষ্টি হওয়াতে ভারতবাসীর কি কোন সারবৎ লাভ হইয়াছে? ইঁহারা কি কল প্রস্তুত করিতে শিখিলেন? ইঁহারা স্বাধীনভাবে কোনস্থানে রেলওয়ে করিতে পারিলেন? ব্যবসায়ে যে কিছু সুবিধা হইয়াছে সেটাও এদেশের পক্ষে সামান্য লাভ।" (ইংরাজী মূলধন বিনিয়োগে ভারতের উপকার কি? ১৮ বৈশাখ ১২৯০)। বিদেশী পণ্যের আগমনে বাঙ্গালার দেশীয় সমৃদ্ধ কুটির শিল্পের দুর্দশার এক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় *সোমপ্রকাশে* প্রকাশিত প্রবন্ধে। (ইউরোপীয় বাণিজ্য সংঘর্ষে দেশীয় শিল্পেরও বিষম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। ২৬ চৈত্র ১২৯০)। বাঙালীর সামাজিক ও চারিত্রিক ত্রুটি সুচারুরূপে বিশ্লেষিত হয়েছে সুদীর্ঘ 'বাঙ্গালীর দারিদ্র্য' প্রবন্ধে, (৯ ভাদ্র ১২৯২)।

সামাজিক ভাবনা ঃ- অত্যন্ত বিচারশীল ও মুক্ত মন নিয়ে সামাজিক সমস্যাগুলি আলোচিত হয়েছিল *সোমপ্রকাশে*। ব্রাহ্মসমাজ, খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উপায়, মুসলমান দিগের কুসংস্কার, বহুবিবাহ, স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা প্রদান, সন্তান বিক্রয়, বিহারে বাঙালীর একাধিপত্য, হিন্দুসমাজ ও ধর্মসংস্কার, বিধবা বিবাহ, ভারতবাসীর বিলাত যাত্রা, আর্যসমাজ, দুর্গাপূজা প্রভৃতি নানা সামাজিক বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত জানিয়েছিল *সোমপ্রকাশ*। তবে ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কিত প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক বেশী। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধগুলিতে ব্রাহ্মসমাজের সমালোচনাই বেশী। "সর্ব্বজাতীয় ও সকল সম্প্রদায়ের মনুষ্যগণ মধ্যে ভ্রাতৃভাব জন্মে, এই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজের পত্তন হইয়াছে। এমন মহাপুরুষদিগের স্বার্থপরতা দোষে নূতন নূতন মন উদ্ভাবিত হইয়া ব্রাহ্ম নামে একটি পৃথক সম্প্রদায় হয় এবং তাহা অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈরী স্বরূপ হয়, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কিছুই নাই।" (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১৪ জৈষ্ঠ্য ১২৮৫. ২৭ সংখ্যা)। সমাজের অগ্রগতির জন্য হিন্দু সমাজ ও ধর্মসংস্কারের কথা উক্ত হয়েছিল *সোমপ্রকাশে*। স্ত্রী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সোমপ্রকাশের বক্তব্য অত্যন্ত রক্ষণশীল। সমাজে স্বাধীনভাবে চলাফেরাকে অনিষ্টকর বলে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল *সোমপ্রকাশে*।

শিক্ষাভাবনা ঃ- স্ত্রী-শিক্ষা, শ্রমজীবী ও কৃষক প্রভৃতির বিদ্যাশিক্ষা, বিজ্ঞান ও বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের শিক্ষাসংক্রান্ত রাজনীতি, তার প্রতিবাদ, নিম্নশ্রেণীর বিদ্যাশিক্ষা, ভারতবর্ষ ও উচ্চশিক্ষা, সংস্কৃত কলেজের উপযোগিতা, মুসলমানদিগের

বিদ্যাশিক্ষা, শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি, ইংরাজী শিক্ষিত যুবসম্প্রদায় প্রভৃতি বিষয়কে অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন প্রবন্ধ। বিজ্ঞানের অগ্রগতি উচ্চশিক্ষার প্রসারের জন্য *সোমপ্রকাশ* সদা উন্মুখ ছিল। মিশনারীদের দ্বারা অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার তারা পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু তাদের শিক্ষা বিশেষ করে শিল্প-শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল *সোমপ্রকাশ।* "ভারতবর্ষের এখন যেরূপ দুরাবস্থা তাহাতে আর কিছুদিন পরে স্ত্রী পুরুষে অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারিলে উদরান্ন সংগ্রহ হইবে না। অতএব স্ত্রী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক।" (স্ত্রীশিক্ষা, ৩০ শ্রাবণ ১২৮৯, ৩৯ সংখ্যা)। সমাজের নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যাশিক্ষা প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তরায়গুলি আলোচিত হয়েছিল 'নিম্ন শ্রেণীর লোকের বিদ্যাশিক্ষা' নামক রচনায় (১৬ শ্রাবণ ১২৮৯, ৩৭ সংখ্যা)। মুসলমান ও ফিরিঙ্গিদের শিক্ষার অন্তরায়গুলি আলোচিত হয়েছিল একাধিক প্রতিবেদনে। শিক্ষকদের মানসম্ভ্রম রাখার জন্য বেতন বৃদ্ধির আবেদন *সোমপ্রকাশে* বহুবার প্রকাশিত হয়েছিল। "অন্য অন্য কর্মচারির সহিত শিক্ষকদিগের অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। ইঁহারা যে প্রকার পরিশ্রম করেন, তাহাতে ইঁহাদের শরীরের যেরূপ অপকার হইবার সম্ভাবনা আছে, অন্য অন্য কর্মচারীর সেরূপ নাই। অপর অনেক শিক্ষক ও পন্ডিত যেরূপ ১৫/২০/৩০ বেতন পাইয়া থাকেন, এক্ষণকার কালে তদ্দারা কি কোন ভদ্রলোকের চলিতে পারে?" (শিক্ষকগণের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব, ১৬ চৈত্র ১২৭০, ২০ সংখ্যা)।

বিবিধ প্রসঙ্গ ঃ- রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা ব্যতীত *সোমপ্রকাশের* আলোচনার বিষয় ছিল বিভিন্ন সংবাদপত্র বিষয়ক খবর, পুস্তক সমালোচনা, নাট্যাভিনয়, মেলা প্রদর্শনী এবং বিভিন্ন পন্ডিত ও স্মরণীয় ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ। এই বিষয়গুলি আলোচনায় *সোমপ্রকাশের* ভাষা অত্যন্ত সংযত। নাট্যাভিনয় ও মেলা প্রদর্শনীর মধ্যে যেগুলি রুচিকর সেগুলি উৎসাহিত হয়েছে। অনিষ্টকারী দিকগুলো হয়েছে সমালোচিত। "তিনি পূজার ন্যায় অঙ্গ ব্যতিরেকে জলকীর্ত্তন, খেমটা ও গোপাল উড়ের যাত্রাতে যত টাকা ব্যয় করিলেন, অথবা জলে ফেলিয়া দিলেন, অন্য কোন সৎকার্য্যে এই টাকা দিলে কি ইহা অপেক্ষা অধিকতর আমোদ, প্রশংসা ও পুণ্যলাভ করিতে পারিতেন না?" (রাসের মেলা, ২১ বৈশাখ, ২৫ সংখ্যা)। কেশবচন্দ্রের প্রয়াণে তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে *সোমপ্রকাশে* বলা হয়েছিল। "তাঁহারা কেশববাবুর শরণার্থ স্থানে স্থানে এক একটি শিল্প বিদ্যালয় খুলুন। তাহাতে দুটি মহৎ উদ্দেশ্যসাধিত হইবে এক, তাঁহার নাম চিরস্থায়ী হইবে। দ্বিতীয় দেশের মহোপকার সাধিত হইবে।" (যে কেশবচন্দ্র, ১ মাঘ ১২৯০)। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় সমালোচনায় *বঙ্গদর্শনের* ভাষাকে আক্রমণ করেছিল *সোমপ্রকাশ।* (*বঙ্গদর্শন* হইতে বঙ্গ সমাজের উপকার অথবা অপকার হইবার সম্ভাবনা? ২৪ ভাদ্র ১২৮০, ৪৩ সংখ্যা)। বঙ্কিমচন্দ্রের গোষ্ঠীকে এই পত্রিকা 'শব পোড়া' ও 'মড়াদাহের' দল বলে বিদ্রুপ করত।

সিপাহী বিদ্রোহের পর বাংলার সমাজজীবনে আসে নানা পরিবর্তন। ঈশ্বরচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র হন সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে শিক্ষার জগতে আসে নানা পরিবর্তন। রেলপথেব বিস্তার ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার, কলকারখানা স্থাপন আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে ঘটায় নানা পালা বদল। ভাঙাগড়ার এই স্পন্দন ধ্বনিত হয় সমসাময়িক সংবাদপত্রে। জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বাহক হয় তারা। এই পালাবদলের চিহ্ন শুধুমাত্র *সোমপ্রকাশেই* ধরা পড়েনি, ধরা পড়েছিল ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাদর্পণে (১৮৬৪ খ্রিঃ) *সাধারণী* (১৮৭৪ খিঃ) *বঙ্গদর্শন* (১৮৭৩ খ্রিঃ), *আর্যদর্শন* (১৮৭৪) *বামাবোধিনী* (১৮৬৩), *গ্রামবার্তা, ঢাকা প্রকাশ* (১৯৬১ খ্রিঃ) প্রভৃতি সমকালীন সংবাদপত্রে। তবে বক্তব্যের বিন্যাস ও পরিবেশনায় *সোমপ্রকাশ* অর্জন করেছিল স্বাতন্ত্র্য। এই স্বাতন্ত্র্যলাভে ভগীরথের ভূমিকা নিয়েছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। তিনি জনহিতকর কাজের দ্বারা স্বীয় অঞ্চলে, শিক্ষা দানের দ্বারা ছাত্রসমাজে এবং *সোমপ্রকাশের* সম্পাদক হিসাবে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। লাভ করেছিলেন সমাদর। রূপচাঁদ পক্ষীর গীত দিয়েই দ্বারকানাথ প্রসঙ্গ শেষ করি।

"সোমপ্রকাশ তাত ঃ
পন্ডিত দ্বারকানাথ
বিদ্যাভূষণ রতনমণি।"

সূত্রনির্দেশ

১। *অভিজ্ঞানম শকুন্তলম্* সপ্তম অঙ্কের এই ভরতবাক্যেব অন্য পাঠান্তর আছে।

প্রবর্ত্তনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ
সরস্বতী শ্রুতমহতাং মহীয়তাম্

মহাকবি কালিদাস কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, শ্রী সত্যনারায়ণ চক্রবর্ত্তী (সম্পাদনা), পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৬, সপ্তম অঙ্ক, ৩৫ নং শ্লোক, পৃঃ ৫৭৮।

২। শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, কলকাতা, ১৯৫৫, পৃ: ২৮৬-৮৭।

৩। তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। তবে ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দই এখন স্বীকৃত।

৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, সাহিত্য সাধক চরিতমালা* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১ম খন্ড, ১৩৮৩, পৃ: ৬।

৫। তদেব, পৃষ্ঠা: ১৪-১৮।

৬। বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত ও সংকলিত) *সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র*, চতুর্থ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃ: ২৫।

৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, সাহিত্য সাধক চরিতমালা*. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১ম খন্ড, ১৩৮৩, পৃ: ১২।

৮। শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, কলকাতা, ১৯৫৫, পৃ: ২৮৭।

৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সাহিত্যসাধক চরিতমালা*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১ম খণ্ড, ১৩৮৩, পৃ: ৫।

১০। বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত ও সংকলিত) *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা ১৯৬৬, পৃ: ৪০৩-৪০৪।

ভাষা ও ইতিহাস ঃ বিদ্যাসাগরের বাংলার গঠন প্রণালীতে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ

শমিতা সিন্‌হা

"বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন" - বিদ্যাসাগরের গদ্য আলোচনা করলে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হয়। তিনি বাংলা ভাষাকে বলিষ্ঠ করেছিলেন।[১] তার স্পর্শকাতয় হৃদয় দিয়ে তিনি এই ভাষাতে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। বাংলা গদ্যে তৎসম, তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করেও ভাষাকে অনেকখানি সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জল করেছিলেন। তাঁর পূর্বসূরীদের ভাষার আড়ষ্টতা তাঁর বাংলা ভাষার মধ্যে ছিল না। বাংলা গদ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিদ্যাসাগরের বড় একটা ভূমিকা ছিল।

তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) তে প্রবেশিয়া জিজ্ঞাসিলেন ইত্যাদি নাম ধাতুর তিনি সার্থক ব্যবহার করেছিলেন। ছেদচিহ্নের প্রয়োগ এবং যথার্থ প্রয়োগ তাঁর এই প্রথম রচনাতেই দেখা যায়।[২]

শকুন্তলা (১৮৫৪) গদ্যশিল্পে বিদ্যাসাগরের এক হৃদয়গ্রাহী রচনা। মূল রচনা অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ এর প্রভাব থাকলেও এ রচনা সম্পূর্ণ অনুবাদ নয়। কালিদাসের গল্পের কাঠামোই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের কোন অনুবাদই হুবহু পুরানুকরণ নয়।[৩]

১৮৩০ - এ প্রকাশিত 'সীতার বনবাস' ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' অবলম্বনে রচিত। এই গদ্যে তৎসম শব্দবহুল বাক্যের অভাব নেই ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে সহজবোধ্য সাধারণ শব্দের সরলবাক্যও ব্যবহৃত হয়েছে। সমাসবদ্ধ বড় বড় শব্দ ও সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার হলেও পাঠকের কাছে তা সহনীয় হয়েছে কারণ বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে তিনি ভারসাম্য রাখতে পেরেছিলেন। সংস্কৃতানুরাগী ভাষা যে কী অপূর্ব মহিমা ও রস সঞ্চার করতে পারে এই রচনার মধ্যে দিয়ে আজও তা উপলব্ধি করা যায়।

বিদ্যাসাগরের অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য 'মহাভারত'। মহাভারতে বিদ্যাসাগর ক্লাসিক সংস্কৃতের বাংলা অনুবাদের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। মূলভাব পরিবর্তন না করে ক্লাসিক গুণান্বিত, বাংলা ভাষায় এ গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেছিলেন। সদর্থে এ ভাষাকেই বলা যায় বিদ্যাসাগরী ভাষা যেখানে সংস্কৃত শব্দের যোগে বাংলাভাষায় ক্লাসিক ও রোমান্টিকভাব সঞ্চারিত হয়েছে। রচনার উদ্দেশ্যে ও বিষয় অনুযায়ী

বিদ্যাসাগরী ভাষায় বিচিত্ররূপ। যদিও আধুনিক বাংলার তুলনায় তার মধ্যে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশী।

অনেকের মতে গদ্যশিল্পী হিসাবে বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ রচনা 'বিদ্যাসাগর চরিত'। শকুন্তলা ইত্যাদির মত রসসম্পৃক্ত না হলেও এ রচনা সরস, স্বচ্ছন্দগতি ও প্রাঞ্জল।

যে সাধুগদ্যরীতি আজকাল ব্যবহার হয় তার পূর্ব সূচনা পাওয়া যায় বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৬৩) গ্রন্থে। আজও শিশুদের অবশ্যপাঠ্য বর্ণপরিচয়। ছোটরা বাংলার প্রথম পাঠ নেয় এই বই থেকে। মাতৃভাষাকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের গুরুত্বও কম নয়।

বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা গ্রন্থে মূল সংস্কৃত ও তার বাংলা অনুবাদের একটি উদাহরণের এখানে উল্লেখ করছি ঃ-

ভোঃ ভোঃ সন্নিহিতাস্তপোবনতরব

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু

না নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্

আদ্যে বঃ কুসুম প্রসূতি-সময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ

সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্

অনুবাদ - " এই বলিয়া তপোবনতরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি, তোমাদের জল সেচন না করিয়া কদাচ জলপান করিতেন না - যিনি ভূষণ প্রিয়া হইয়াও, স্নেহবশতঃ, কদাচ তোমাদের পল্লব ভঙ্গ করিতেন না; তোমাদের কুসুম প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে, যাহার আনন্দের সীমা থাকিত না, অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন। তোমরা সকলে অনুমোদন কর[৪]।

এর মধ্যে তপোবন তরু, সন্নিহিত তরু, সেচন, কদাচ, জলপান, ভূষণপ্রিয়া, স্নেহবশতঃ পল্লবভঙ্গ, কুসুম প্রসব উপস্থিত, আনন্দ সীমা পতিগৃহ ইত্যাদি তৎসম শব্দ। যিনি যাইতেছেন ইত্যাদি তদ্ভব শব্দ। তৎসম ও তদ্ভব শব্দ বহুল হলেও শকুন্তলার ভাষা প্রাঞ্জল।

উত্তরচরিত থেকে একটি শ্লোকের বিদ্যাসাগরকৃত অনুবাদের এখানে উল্লেখ করছি ঃ-

বিনিশ্চেতুং শক্যে ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা

প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।

তব স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো।

বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তী

বিদ্যাসাগর অনুবাদ করেছেন - "প্রিয়ে! তোমার বাহুলতার স্পর্শে, আমার সর্ব শরীর যেন অমৃত ধারার বর্ষণ হইতেছে, ইন্দ্রিয়সকল অভূতপূর্ব রসাবেশে অবশ হইয়া আসিতেছে, চেতনা বিলুপ্ত প্রায় হইতেছে অকস্মাৎ আমার নিদ্রাবেশ উপস্থিত হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।'

এখানেও বহু তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহার হলেও অনুবাদ সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল। মহাভারতের দ্রুত ঘটমান কাহিনী ও সহজ সরল বিবরণ বিদ্যাসাগর অনেক সময়েই ধরে রেখেছেন তাঁর অনুবাদ, পরস্পর কথোপকথনগুলি তিনি বাংলা সংলাপের ঢঙে সাজিয়েছেন তবে যেখানে ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম আছে সেখানে সাধুরীতি বজায় রেখেছেন।

যদাশ্রৌষং দ্রৌপদীমশ্রুকণ্ঠীং সভাং নীতাং দুঃখিতামেকবস্ত্রাম্

রজস্বলাং নাথবতীমনাথবৎ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।

বিদ্যাসাগর অনুবাদ করেছেন ঃ-

"যখন শুনিলাম, অশ্রুমুখী, অতিদুঃখিতা, একবস্ত্রা, রজস্বলা, সনাথা দৌপদীকে অনাথার ন্যায় সভায় লইয়া গিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই।[৬]

বাংলার Sanskritization সম্বন্ধে আপত্তি উনিশ শতকের শেষে নানা দিকেই ওঠে। ভাষাবিদ্ জর্জ গ্রিয়ারসন এ সম্বন্ধে আপত্তি তোলেন। মনে হয় বিদ্যাসাগরের মানসিক দৃঢ়তা এবং ব্যক্তিত্ব সব কিছু আপত্তি অগ্রাহ্য করে একটা নির্দিষ্ট পথ নেয়। এই পথটি ছিল Direct বা ঋজু। বাংলাগদ্যের ঋজুতা বিদ্যাসাগরেরই অবদান এবং পরবর্তীকালে Grierson দেখিয়েছেন যে কিভাবে এ ধরণের গদ্য সমগ্র বঙ্গভাষী অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।[৭] পরবর্তীকালে বিশেষ করে বিশ শতকের প্রথমে চলিত বাংলা ও সাধুবাংলা নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত চলিত এবং সাধু বাংলার সমন্বয় সম্ভব হয়েছে।

ইতিহাস চর্চায় ভাষার বিবর্তন এখনও ততখানি গুরুত্ব না পেলেও ভবিষ্যতে পাবে আশাকরি। আজ ইতিহাসে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক এমনকি বৈজ্ঞানিক বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এর ফলে একটা সামগ্রিক ঐতিহাসিক ধারণা আমাদের মনে তৈরি হতে পারে। সেই কথা মনে রেখে আমরা বিদ্যাসাগরকে সরাসরি ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

বাঙালির সাধারণ কথাবার্তায় 'বিদ্যাসাগরী বাংলা' কোন কোন সময়ে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা হত। সেই নেতিবাচক দিকটি সম্বন্ধে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে। পিতা যদি খারাপ হয় তাহলে তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি কিন্তু বিদ্যাসাগর কোন অংশেই বাংলাভাষার খারাপ পিতা ছিলেন না।

সূত্রনির্দেশ

১। ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা - ১৩৮

২। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৮২, পৃ: ২৪।

৩। ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, দ্বিতীয় পর্যায় কলকাতা, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা - ১৪৩।

৪। বিদ্যাসাগর রচনাবলী, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৯৬।

৫। বিদ্যাসাগর রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৪২।

৬। বিদ্যাসাগর রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৫।

৭। Grierson. The Linguistic Survey of India, Calcutta. 1st published 1899. Volume V. Part one. Reprint 1968.

বিনোদনের আড়ালে ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলা থিয়েটারের বাণিজ্যিকরণ

সুনেত্রা মিত্র

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে পশ্চিমী ঢঙে থিয়েটার নিয়ে কলকাতায় নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। প্রাথমিক পর্বে এটি ছিল ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলির আকর্ষণের বস্তু, যা সামাজিক কৌলিণ্য বজায় রাখার এক আন্তরিক প্রয়াসও বলা যেতে পারে। এই নাট্য-অভিনয়গুলি ছিল খুবই ব্যক্তিগত ব্যাপার, যেখানে জনগণের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ, যা কেবলমাত্র কিছু পারিবারিক সম্পর্কের এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এক্ষেত্রে থিয়েটার দেখতে হলে প্রয়োজন হত থিয়েটার বোঝবার মতো উর্বর মস্তিষ্ক এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা।

সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে জোরদার করার এই অভাবনীয় প্রয়াস সাধারণ মানুষের মধ্যে থিয়েটারের প্রতি কৌতুহল এবং আগ্রহের উদ্রেক করল। বিশেষ করে একদল তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে থিয়েটার বিশেষ উৎসাহ জাগাল—সামাজিক বিচারে এরা মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত। অর্থাৎ থিয়েটার বোঝবার ক্ষমতা থাকলেও তা স্থাপন করবার মতো আর্থিক সঙ্গতি এদের ছিল না। আর যাদের আর্থিক সঙ্গতি ছিল তারা এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের আন্তরিকতার যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারেনি। অবশেষে বহু টানাপোড়েনের পর ন্যাশনাল থিয়েটার বা জাতীয় নাট্যশালা উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রথম জনসাধারণের জন্য রঙ্গালয় স্থাপিত হল ১৮৭২ সালে।

বাণিজ্যিক অভিসন্ধি না থাকলেও ন্যাশনাল থিয়েটারই বাঙলা মঞ্চে বাণিজ্যিকরণের রাস্তা প্রশস্ত করে দেয়। ন্যাশনাল থিয়েটারের সাফল্য "থিয়েটারের দর্শক" তৈরি করল, আর 'থিয়েটার দেখা' বিনোদন উপভোগ করার অন্যতম পন্থা হয়ে দাঁড়াল। ন্যাশনাল থিয়েটারে টিকিট কেটে নাটক দেখতে হত। তবে তা থেকে যা টাকা-পয়সা আসত তা থিয়েটারের প্রয়োজনেই শেষ হয়ে যেত। প্রথম যুগের অভিনেতারা কেউই থিয়েটার থেকে অর্থোপার্জন করতেন না — নেহাৎ শখ মেটাতেই তারা থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্য "নাটক দেখা" কে একটি বিনোদন হিসাবে মানুষের কাছে ন্যাশনাল থিয়েটারের সাফল্য থেকে কলকাতা শহরে গড়ে উঠল বিভিন্ন থিয়েটার। ন্যাশনাল থিয়েটার যেভাবে জনজীবনে সাড়া ফেলে এবং যে ধরণের বিষয়

মঞ্চে উপস্থাপন করত তাতে করে অচিরেই ব্রিটিশ সরকার কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। ১৮৭৬ সালের Dramatic Performances Act. এবং ১৮৭৮ সালের Vernacular Press Act. নাটকের উপর খুব কড়া বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তন করল। যার ফলস্বরূপ এই সময়কার থিয়েটারগুলির অনেকগুলোই বাধ্য হল তাদের নাটক না প্রদর্শন করতে। একমাত্র ন্যাশনাল থিয়েটারই এই সময়ই চেষ্টা চালিয়ে যায় টিকে থাকবার কিন্তু বিষয়ের একঘেয়েমি, অর্থনৈতিক চাপ ইত্যাদির প্রকোপ ১৮৮০ সালে ভুবনমোহন নিয়োগী ন্যাশনাল থিয়েটার নিলামে বেচে দিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের মালিকানা হাত বদল করে চলে গেল প্রতাপ চাঁদ জহুরীর কাছে।

১৮৭১ ডিসেম্বর মাসে প্রতাপ চাঁদ জহুরী ন্যাশনাল থিয়েটারে দায়িত্বভার গ্রহণ করার সাথে শুরু হল বাংলা বাণিজ্যিক থিয়েটারের যুগ। প্রতাপ চাঁদ ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যবসায়ী। থিয়েটারের প্রতি অনুরাগ থেকে তিনি ন্যাশনাল থিয়েটার কেনেননি। তার এই কাজের পশ্চাতে ছিল একটি জটিল ব্যবসায়িক হিসাব-নিকাশ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কলকাতা শহরকে যে নতুন মনোরঞ্জন বিশেষ ভাবে মাতিয়ে তুলেছিল সেই থিয়েটারে অর্থ বিনিয়োগ করলে যে ক্ষতির থেকে লাভই বেশী হবে তা প্রতাপ চাঁদ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই সরকারী নিষেধাজ্ঞার কষাঘাতে থিয়েটারগুলি যখন মুখ থুবড়ে পড়ল, তখন চড়া দামে ন্যাশনাল থিয়েটার কিনে নিয়ে তা থেকে মুনাফা লুঠবার চেষ্টা করলেন। আর এতে তিনি যথেষ্ট সফলও হলেন। বাঙলা থিয়েটারের ইতিহাসে প্রতাপ চাঁদই প্রথম অবাঙালী ব্যবসায়ী যিনি থিয়েটারের বাণিজ্যিকরণে উৎসাহী হয়েছিলেন। তবে থিয়েটার কিনে নিলেই তাকে বাণিজ্যিক করা যায় না। প্রতাপ চাঁদ বুঝেছিলেন থিয়েটার থেকে মুনাফা লাভ করতে হলে সেটিকে সুদক্ষভাবে পরিচালনা করা অত্যন্ত জরুরী। এই উদ্দেশ্যে প্রতাপ চাঁদ একদল নাট্যানুরাগীকে তার ন্যাশনাল থিয়েটারে নিয়ে এলেন এবং নিয়োগ করলেন একজন ম্যানেজারও। ম্যানেজারের পদে গিরীশ ঘোষ অভিসিক্ত হলেন। আর তার সাথে অমৃতলাল বসু, ধর্মদাস সুর, প্রমুখ যোগ দিলেন প্রতাপ চাঁদের থিয়েটারে, বেতনভোগী কর্মী হিসাবে। ১৮৮০র দশকের বাঙলা থিয়েটার এবং প্রাক্ ১৮৮০র সময়ের থিয়েটারের মধ্যে এটিই হল সবচেয়ে বড় পার্থক্য। যে সব ব্যক্তিরা প্রতাপ চাঁদের থিয়েটারে যোগ দিলেন তারা তার আগে পর্যন্ত নিজেদেরকে amateur thespian হিসাবে ভাবতেই অভ্যস্ত ছিলেন। টিকিট বেচে থিয়েটার দেখালেও এদের মধ্যে কেউই থিয়েটার করে কোনো টাকা পয়সা নিতেন না। থিয়েটার তাদের কাছে ছিল 'নেশা'—সৃষ্টিশীলতাকে কাজে লাগানোই ছিল তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। টিকিট বিক্রির টাকা থেকে অনেকটা অংশ চলে যেত অভিনেত্রীদের খরচা মেটাতে এবং থিয়েটারের অন্যান্য খরচে ব্যয় করা হত। নাট্যকুশলীরা নিজেদেরকে "অ্যামেচার" বলতেই বেশী গর্ববোধ করতেন। অমৃতলাল বসু স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে বলেছেন গিরীশ

ঘোষ সরাসরি থিয়েটারকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করবার পূর্বে যখন অভিনয় করতেন সেই সময় তিনি সবসময় নজর রাখতেন থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিলে যেন তার নামের পূর্বে অ্যামেচার শব্দটি না বাদ পড়ে। কারণ তাহলে হয়তো এমন মনে করা হতে পারত যে তিনি থিয়েটার থেকে বাড়তি অর্থ উপার্জন করছেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল এই সময় গিরীশ ঘোষ পার্কার কোম্পানীতে বুক-কীপারের পদে চাকরি করতেন। বোঝা যাচ্ছে থিয়েটারকে রোজগারের পথ হিসাবে মেনে নিতে এইসব থিয়েটার প্রেমীদের বিশেষ আপত্তি ছিল কারণ থিয়েটার ছিল তাদের অবসর বিনোদনের এক অসাধারণ পন্থা যা তাদের ভিতরকার শিল্পী সত্তাকে জাগিয়ে তুলত।

গিরীশ ঘোষ, অমৃতলাল বসু, বিনোদিনী দাসী, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত বা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—এরা প্রত্যেকেই পরিণত হলেন থিয়েটারের বৈতনিকে। আর এই কারণেই থিয়েটার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আগের হারে চলল না। এই সমস্ত থিয়েটার অনুরাগীদের থিয়েটার করার উদ্দেশ্যেও বদলে গেল — এখন তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল দর্শক মনোরঞ্জন। ব্যবসায়ী থিয়েটার মালিকও এই উদ্দেশ্যেই চড়া দামে তাদেরকে তার থিয়েটার কোম্পানীতে নিয়োগ করেছেন। দর্শক আকর্ষণের অভিনব সব পন্থা তৈরি হলেও অনেক ক্ষেত্রেই নাটকের গুণগত মান সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যেত। নতুন কাহিনী বা চিত্রনাট্যের থেকে জোর বেশী দেওয়া হত পৌরাণিক বিষয়ে কারণ সেই সমস্ত বিষয়ের সাথে দর্শক পরিচিতি ছিল। আবার তা সরকার বাহাদুরের রক্তচক্ষু এড়াতেও বিশেষ সক্ষম। দর্শক মনোরঞ্জনের নিবৃত্তে নৃত্যগীতের মাধ্যমে নাটকগুলিকে আরো বেশী চিত্তাকর্ষক করে তোলা হল। ফলে দর্শক সংখ্যা পরিসংখ্যানের দিক থেকে বৃদ্ধি পেলে ও গুণগত উৎকর্ষতা হারাল। গিরীশ ঘোষ এ বিষয়ে গভীর খেদ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেন হয়তো মনোজ্ঞ. বিবেচক দর্শকের সাড়া পেলে সমগ্র দর্শকবৃন্দের রুচি বদলানো যেত। বদলে যেত বাঙলা নাটকের চেহারা।

বেতনভোগী কর্মচারীতে রূপান্তরের সাথে সাথে যে বিরাট পরিবর্তন নাট্যজগতে চোখে পড়ল তা হল থিয়েটারের চারিত্রিক পরিবর্তন। পরিবারকেন্দ্রিক 'অ্যামেচারিশ' অবয়ব একটা গাম্ভীর্য পেল, তার গঠনটা খানিকটা আপিসের আকার ধারণ করল। বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা থিয়েটার বিষয়ক কাজকর্মগুলো এক ছাদের নীচে গুছিয়ে আনা হল। অর্থাৎ থিয়েটার পেল একটা Formal Structure, যেখানে নিয়মানুবর্তিতার সাথে থিয়েটারের সব কাজ সংগঠিত হত। প্রাক ১৮৮০ এর সময়ের প্রায় পারিবারিক সম্পর্ক পরিবর্তিত হল চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কে।

দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য শুধু ব্যবসায়ী বুদ্ধি দ্বারা তাড়িত মালিকের উৎসাহকে দায়ী করা যায় না। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত বা নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় যারা নাটককে ভালোবেসে

থিয়েটারে এসেছিলেন তারাও কিন্তু এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারেননি। "আলিবাবা" নাটকের অভাবনীয় সাফল্য সত্ত্বেও অমরেন্দ্রনাথ কোনো নতুন বিষয়ের উপর নাটক নির্দেশনা করেননি। নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ম্যাকবেথ নাটকের সাফল্যের পরেও এই ধরণের বিষয়ে নাট্য মালিকদের একধরণের আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল। তাদের প্রদর্শিত নাটক জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হল কিনা। আসলে বাণিজ্যিক দিক থেকে সফল হতে হলে দর্শকই যে ভাগ্য নিয়ন্তা সে বিষয়টি কখনই বিস্মৃত হলে চলবে না। তাই দর্শকের পছন্দে গুরুত্ব আরোপ করতেই হতো। আর সেই কারণে নাটকগুলির বিষয় নির্বাচনে বা সেগুলো প্রদর্শনের সময় কোনো রকম ঝুকি না নেওয়াই শ্রেয় মনে করা হতো। আর সেই কারণেই হয়তো গিরীশ ঘোষ বারংবার পৌরাণিক বিষয় উপস্থাপন করেছেন মঞ্চে।

বাণিজ্যিকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যেহেতু প্রচার সেই কারণে বিজ্ঞাপন, হ্যাণ্ডবিল ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নাটকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হত। এই বিজ্ঞাপনগুলিতে যে নাটকটি প্রদর্শিত হতে চলেছে তার চমকপ্রদ দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হতো আবার অনেক সময় একই বিষয়ে দুটি প্রতিপক্ষ দল নাটক উপস্থাপন করার সময়ে দৈনিক পত্রে চলত তুমুল কাদা ছোঁড়াছুড়ি। আর এ সবই ছিল প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লড়াই — শ্রেষ্ঠত্বের আসন দখল করার অভাবনীয় প্রয়াস। দর্শক টানার আর একটি অভিনব পন্থা ছিল 'পাশ' (Pass) বিলি করা বা অভিনয়ের শেষে উপহার দেওয়া। এইভাবে যথাসম্ভব চেষ্টা চালিয়ে থিয়েটারকে মনোগ্রাহী করে তোলা হল।

যদিও বাঙলা থিয়েটারের পথিকৃতেরা থিয়েটারকে উপজীবিকা হিসাবে কখনই ভাবেননি, থিয়েটারের যে উপজীবিকা হয়ে উঠতে পারে বা তার মধ্যে যে সে সম্ভাবনা আছে, সেই ধারণাটি কিন্তু অনেকদিন আগে থেকেই গড়ে উঠেছিল। যেমন ১৮২৬ সালে সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশিত এই সম্পাদকীয়টি থেকে বোঝা যায় ঃ

"এই বিস্তীর্ণ নগরে নগরবাসীদিগের .... চিত্ত বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা হয় নাই এবং ইংরেজ সম্প্রদায়ের মতো তাহাদের আমোদ-প্রমোদের কোন সাধারণ স্থান নাই। .... ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাহাতে একত্র হইয়া ইংরেজদের মতো "শেয়ার" গ্রহণ করিয়া একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে একজন কর্ম্মাধ্যক্ষের অধীনে বেতনভোগী যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত করিয়া এতদর্থে বিরচিত গীতি ও কাব্যের মাসে একবার নতুন অভিনয় করেন, তাহা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়" ★১

এই উদ্ধৃতিটিতে একই সাথে যেমন জনসাধারণের বিনোদনের কথা বলা হয়েছে তেমনই থিয়েটারের উপযোগিতার কথাও বলা হয়েছে। আর এই উপযোগিতা নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় ছিল না। ঔপনিবেশিক যুগের সূচনায় নবাবী যুগে তথাকথিত

'Performing Arts' -এ পারদর্শী ব্যক্তিদের Patronization হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে গেল। অন্য কোনো বিষয়ে যোগ্যতার অভাবে এই সমস্ত গাইয়ে, বাজনাদার, কবি ইত্যাদি মানুষেরা হয়ে পড়ল কর্মহীন। তাদের উপযুক্ত চাকরি ও ঔপনিবেশিক আপিসে নেই। কলকাতা শহরে থিয়েটারের আগমণ আবার এই সমস্ত ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান করে দিল। আর প্রাক্-বাণিজ্যিকরণ যুগেও কিন্তু এরা বেতন পেতেন। বাণিজ্যিকরণের ফলে এরা অনেকটাই স্থায়ী হলেন। অর্থাৎ শুধু 'আমেচার' থিয়েটার প্রেমীরাই নন অনেক মানুষই কিন্তু থিয়েটার থেকে উপার্জন করতে সক্ষম হলো। এইভাবে থিয়েটারের ব্যাপক জনপ্রিয়তার সাথে গড়ে উঠল বেশ কয়েকটি 'Trade' যেমন থিয়েটার লেখা, মঞ্চ সজ্জা, মেক-আপ আর্টিস্ট, বাজনাদার, গাইয়ে এমনকি অনেক ক্ষেত্রে নৃত্য-গীত শিক্ষককে নিয়োগ করা হত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। থিয়েটারকে ঘিরে এইভাবে গড়ে উঠল এক কর্মময় জগত যেখানে নিয়োজিত মানুষ একদিকে যেমন সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মগ্ন, আবার অপর প্রান্তে দু'বেলা অন্নসংস্থানের জন্য নিজের স্বার্থরক্ষার্থেও ব্যস্ত। এই দুই বিপরীতধর্মী উদ্দেশ্যকে একই সাথে সঙ্গে নিয়ে বিনোদন রূপান্তরিত হল কাজে। আর এটিই বোধ হয় বাণিজ্যিকরণের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক।

সূত্রনির্দেশ

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, চতুর্থ সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ১৩৬৮।

২। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, The Indian stage, V-1, Calcutta. 1934 (Name of Publisher not given)

৩। প্রভু গুহঠাকুরতা, The Bengali Drama : Its Origin and Development. London. 1930.

৪। শঙ্কর ভট্টাচার্য, বাঙলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ১৯৮২।

৫। সুবীর রায়চৌধুরী সম্পাদিত বিলাতী যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ১৯৭২, পুনঃ ১৯৯৯।

৬। অরুণকুমার মিত্র, সম্পাদিত, অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি, কলকাতা, সাহিত্যলোক, ১৯৮২।

৭। Gulam Murshid, সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাঙলা নাটক, বাংলা একাদেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪।

উনিশশো এগারো — ফিরে দেখা ঃ সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে একটি ক্রীড়াবিজয়ের তাৎপর্যের পুনর্নির্মাণ

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

১৯১১ সালে ফুটবল খেলায় মোহনবাগানের শিল্ড বিজয়[১] ভারতীয় ক্রীড়া ইতিহাসে একটি বহুচর্চিত বিষয়। জনপ্রিয় সাহিত্য বা ঐতিহাসিক লেখনি - দুয়েতেই এই ক্রীড়া বিজয়কে শুধু ভারতীয় খেলাধূলোর ইতিহাসে নয়, জাতীয়তাবাদের ইতিহাসেও এক দিক নির্দেশক ঘটনারূপে দেখানো হয়েছে। ভারতীয় খেলাধূলোর প্রচলিত ইতিহাস চর্চা (historiography) যা প্রধানত একটি ইউরোপকেন্দ্রিক (Eurocentric) বা জাতীয়তাবাদী (Nationalist) দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ করে থাকে, ঘটনাটিকে জাতীয়তাবাদ, জাতিতত্ত্ব, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি — প্রভৃতি উপাদানের নিরিখে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। টনি ম্যাসন (Tony Mason)[২] বা পল ডিমিও (Paul Dimeo)[৩] র মতো ইউরোপীয় লেখকরা শিল্ড বিজয়ের জাতীয়তাবাদী ও জাতিগত তাৎপর্যকে মূলত 'Games Ethic'[৪] এর সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের প্রেক্ষিতে উপস্থাপনা করেন এবং একটি ভারতীয় দলের এই আপাত সাফল্যের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ইংরেজের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদেরই চূড়ান্ত সার্থকতা দেখতে পান।[৫] অন্যদিকে, সৌমেন মিত্র,[৬] কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়,[৭] বোরিয়া মজুমদার[৮] প্রমুখ ভারতীয় গবেষক এই জয়কে শারীরিক শক্তি তথা পৌরুষ প্রকাশের স্বদেশী ধারার প্রেক্ষাপটে এক 'দেশীয়' সাংস্কৃতিক জাতীয়বাদী প্রতিবাদরূপে দেখেছেন। তাঁদের মতে, শিল্ডজয়ের প্রভাব শুধু জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে নয়, সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতেও যথেষ্ট ছাপ ফেলেছিল।[৯] মোহনবাগানের শিল্ডজয়কে এরকম বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা হলেও এ সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন — শিল্ডজয়ের প্রেক্ষিতে উদ্বোধিত জাতীয়তাবোধের ধরণ-চরিত্র বা জাতীয়তাবাদী-ক্রীড়াসংস্কৃতির রূপ-প্রকরণ, ১৯১১-র অব্যবহিত পর থেকে ক্রীড়াক্ষেত্রে লক্ষিত জাতিদ্বেষ, বাঙালির সামাজিক মনস্তত্ত্বে ঘটনাটির নৈতিক প্রভাব কিংবা তাঁর আশু বা সুদূরপ্রসারী সাংস্কৃতিক তাৎপর্য, খেলায় সাফল্যের বাণিজ্যিক অর্থ — এখনও গবেষণার অপেক্ষায়। বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য হল, - মোহনবাগানের শিল্ড বিজয়ের অদ্যবহিত ইতিহাস চর্চার অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটির প্রতি

সংশোধনবাদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এবং সামাজিক ইতিহাসের নিরিখে ঐ ক্রীড়া বিজয়ের রাজনৈতিক সামাজিক - সাংস্কৃতিক - অর্থনীতিক তাৎপর্যের পুনর্নির্মাণ করার প্রয়াস করা।

দুই

মোহনবাগানের শিল্ডজয়কে সমসাময়িক রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে উপনিবেশ বিরোধী জাতীয়তাবাদের ধারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দেখার প্রয়াস ঐতিহাসিকদের মধ্যে নতুন নয়। বিশ শতকের প্রথম দশকেই বাঙালি ফুটবলকে শাসক শাসিতের মধ্যেকার সামাজিক আদান প্রদানের উপায় ছাড়াও এক পুনর্সংজ্ঞাত পৌরুষ প্রকাশের মাধ্যম রূপে দেখতে শুরু করেছিল। বুট পরা ইংরেজ সেনাদলের বিরুদ্ধে ফুটবলের মতো শারীরিক বা শক্তিক্রীড়ায় খালিপায়ে বাঙালি যুবকদের লড়াই ও সাফল্য ইংরেজ বিরোধী জাতীয় চেতনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। সে জন্যেই বোধ হয় স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইংরেজ খেলা ফুটবলকে বয়কটের ভাবনা বাঙালি প্রশয় দেয়নি। বরং বিদেশী বুটকে বর্জন করে খালি পায়ে ফুটবল চর্চার মধ্যে দিয়ে ফুটবল খেলার শৈলীতে এক অভিনব স্বাতন্ত্র্য তথা 'ভারতীয়ত্ব' আরোপ করে নিঃশব্দ প্রতিবাদ করেছিল যেন বাঙালি সমাজ। ১৯১১-র শিল্ডে খালি পায়ের মোহনবাগান (ডিফেন্ডার সুধীর চ্যাটার্জী একমাত্র বুট পায়ে খেলতেন) দলের বুট পরা বাঘা বাঘা সেনাদলকে হারানো ছিল যেন এই প্রতিবাদেরই সার্থক প্রতিফলন। বস্তুতপক্ষে, শিল্ডজয়ের প্রেক্ষাপটে আহত বাঙালি মানসিকতায় ফুটবলকে কেন্দ্র করে এক অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল। ফুটবল খেলা বাঙালি-র সামনে এমন এক সাংস্কৃতিক অস্ত্র তুলে ধরেছিল, যার মাধ্যমে একই নিয়ম-নীতির আধারে ইংরেজের সঙ্গে শারীরিক ও মানসিকভাবে সমানে সমানে লড়াই করা যায় এবং তাদের পরাজিত করা যায়। এই অর্থে ফুটবল ক্রমশ বাঙালিকে এক বিশিষ্ট ঐক্যমূলক সাংস্কৃতিক সত্তা দান করেছিল। বাঙালির এই ফুটবলীয় সত্তার মধ্যে জাত-পাত, ধর্ম-সম্প্রদায় বা শ্রেণী বিভেদ এর উর্ধ্বে এক জাতীয় চেতনার ধারক ও বাহক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল।

কিন্তু শিল্ডজয়ের প্রেক্ষাপটে উদ্বোধিত এই ক্রীড়াজাতীয়তাবাদ চরিত্রগতভাবে কেমন ছিল — 'বাঙালি' না 'ভারতীয়' — তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। ঐ সময়কার সংবাদপত্র পত্রিকায় 'বাঙালি' ও 'ভারতীয়' নেশনকে প্রায় সমার্থক রূপে দেখানো হয়েছিল।[১০] বস্তুত মোহনবাগানের শিল্ড ফাইনালে ওঠা যেন এক অভূতপূর্ব জনজাগরণের সৃষ্টি করে।[১১] শ্রেণী-জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ এ সব কিছুর উর্ধ্বে ইংরেজকে তাদেরই খেলায় হারাবার স্বপ্নে বিভোর বাঙালির জাতীয়তাবোধ ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। সুতরাং, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে এই ফুটবল বিজয়কে উপস্থাপনা করাটা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না। মোহনবাগান

শিল্ড ফাইনালে ওঠার পর বাঙালি হৃদয়ের একমাত্র আকুতি ছিল জাতিদর্পে গর্বিত সাদা ইংরেজকে খেলার মাঠে হারিয়ে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক জীবনে বাঙালি-র লুপ্ত আত্মসম্মান ও বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করা। জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতারা বা ইংরেজ ভারতীয় শাসনের ভারতীয় প্রতিনিধি-রা যে জাতীয় মর্যাদা রক্ষায় ক্রমাগত ব্যর্থ হচ্ছিলেন, মোহনবাগানের তরুণ ফুটবলার-রা যেন সেই মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। দেশের সার্বিক ব্যর্থতার মধ্যে আত্মাভিমানী হতাশাগ্রস্ত বাঙালি তথা দেশবাসীর কাছে তাই মোহনবাগানের জয় ছিল আশার আলোকবর্তিকা। অসংখ্য ফুটবল প্রেমী বাঙালির কাছে ফুটবল মাঠ ছিল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে ইংরেজের শাসন শোষণের উপযুক্ত জবাব দেবার রণক্ষেত্র। আর শিল্ড জয় করে মোহনবাগান যেন সেটাই করে দেখিয়েছিল।

স্বদেশী যুগে বাঙালি সমাজের একটা বড়ো অংশ ছিল শিক্ষিত, বুদ্ধিদীপ্ত ও স্বচ্ছল; কিন্তু প্রত্যক্ষ ইংরেজ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানে দ্বিধাগ্রস্ত। একইভাবে শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালি বিশেষত সরকারি চাকুরে বা কেরানি অথবা শ্রমিকদেরও প্রত্যক্ষ ইংরেজ-বিরোধিতা কর্মক্ষেত্রে সম্ভব ছিল না। অথচও এদের সংখ্যাগরিষ্ঠেরই জাতীয়তাবোধে কোনও খামতি ছিল না। স্বভাবতই ফুটবল মাঠে ইংরেজকে হারানোর মধ্যে দিয়ে তারা পেতেন যেন স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভের এক অনাস্বাদিত মানসিক তৃপ্তি। অসংখ্য বাঙালির এই অবরুদ্ধ ও অবচেতন জাতীয়তাবোধের স্বচ্ছন্দ স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটত ফুটবল মাঠের দর্শকাসনে কিংবা ক্লাব সংগঠনের কাজে। ইংরেজ দলের বিরুদ্ধে স্বদেশীয় দলের খেলায় স্বদেশী সমর্থন প্রায়শই এক জাতীয়তাবাদী সমর্থনের স্তরে উন্নীত হতো। আর ময়দানের দৈনন্দিন দর্শক সংস্কৃতি-র[১২] মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেত বাঙালির ইংরেজ বিদ্বেষ ও জাতীয়তাবাদী আবেগ উত্তাপ। ১৯১১-র শিল্ড ফাইনাল খেলার দিন ঠিক এধরণেরই এক উদ্বেলিত দর্শক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছিল।[১৩] ঐ দিন খেলা শেষের পর যে দৃশ্য দেখা গিয়েছিল, পরাধীন বাংলার ইতিহাসে তা প্রায় নজিরবিহীন। উন্মত্ত জনতা নিজেদের ছেঁড়া জামার টুকরো, টুপি, লাঠি, রুমাল, ছাতা শূন্যে ছুঁড়তে থাকে। মোহনবাগানের খেলায় বাঙালি দর্শকের জাতীয়তাবোধের আরও স্পষ্ট বর্ণনা পাই সাহিত্যিক অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের লেখায় ঃ "খেলার মাঠে ঢুকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে যে অবিচার অনুষ্ঠিত হতে দেখেছে দেশের লোক, তাতে রক্ত ও বাক্য দুই-ই তপ্ত হয়ে উঠেছে ইংরেজের বিরুদ্ধে। আর এই তপ্ত বাক্য আর রক্তই ঘরে বাইরে স্বাধীন হবার সংকল্পে ধার যুগিয়েছে।"[১৪] বস্তুতপক্ষে, খেলার মাঠে মোহনবাগান যেন রাজনীতিতে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের সমার্থক হয়ে উঠেছিল।

ফুটবল মাঠে এই জয়ের রাজনৈতিক তাৎপর্যও কিছু কম ছিল না। 'দ্য এম্পায়ার' সম্পূর্ণ বাঙালি একটি দলের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে লেখে, "All honours to Mohun

Bagan. Those eleven players are not only a glory to themselves and to their club, but to the great nation that they belong. The honour of Calcutta was at stake and it was they that went to the rescue."[১৫] বসুমতি পত্রিকা লেখে, — "কংগ্রেসের খেলাঘর যেখানে তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়েছে; সুরেন্দ্রনাথের মতো রাজনৈতিক নেতা এতদিন ধরে যে জাতীয় ঐক্য আনতে ব্যর্থ হয়েছেন; মোহনবাগানীরা খেলার মাধ্যমে সেই ঐক্যসূত্র তৈরি করেছে।"[১৬] আরও মোক্ষম যুক্তি দিয়ে প্রায় কামান দেগেছিল 'দ্য ইংলিশম্যান' "কংগ্রেস ও স্বদেশীওয়ালারা এত দিনের চেষ্টায় যা পারেনি, নেটিভদের চোখে ইংরেজদের সব ক্ষেত্রে অপরাজেয়তার সেই মিথ ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে মোহনবাগান।"[১৭]

তিন

অন্যদিকে মোহনবাগানের শিল্ডজয় বাঙালি জনসাধারণের কাছে এনেছিল ইংরেজের বর্ণবৈষম্য তথা বাঙালি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সবল প্রতিবাদের চরম আত্মতৃপ্তি। পরাধীন ভারতে ইংরেজরা প্রথম থেকেই বাঙালি জাতিকে দুর্বল অক্ষম পৌরুষহীন এক নিকৃষ্ট জন বলে অবজ্ঞা আর অপমান করত।[১৮] এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সমাজজীবনের প্রতি পদে বাঙালিদের প্রতি তীব্র জাতিদ্বেষ ও বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণ।[১৯] ট্রামগাড়ি থেকে আপিস সর্বত্র বাঙালি বাবু থেকে কেরানি সকলকেই নিয়মিত সহ্য করতে হত ইংরেজের হাতে লাঞ্ছনা — হয়ত সেটা অশ্লীল গালাগালি অথবা সবুট লাথি কিংবা হান্টারের আঘাত। কল্পনা প্রবণ বাঙালি ইংরেজের এই চূড়ান্ত অপমান আর সীমাহীন লাঞ্ছনার যোগ্য জবাব দেবার এক আদর্শ ক্ষেত্র হিসেব খুঁজে পায় ফুটবল মাঠকে। ঠিক এই সামাজিক প্রেক্ষিতেই ১৯১১-র জয় যেন ছিল ইংরেজ অপশাসনের প্রতি বাঙালির সমুচিত প্রত্যুত্তর, আর তথাকথিত 'ক্ষীণকায় দুর্বল বাঙালির পৌরুষ ও আত্মমর্যাদার এক সদর্প আত্মপ্রকাশ। আর এরপর থেকে ফুটবলকে বাঙালি দেখতে শুরু করে অত্যাচারী ইংরেজকে "পাল্টা মার' দেবার এক মোক্ষম উপায় হিসেবে।[২০]

আবার মোহনবাগানের এই জয় ছিল কলকাতার ফুটবলে ইংরেজের বর্ণবৈষম্যের[২১] বিরুদ্ধে যোগ্য জবাব। মোহনবাগানের সাফল্য শ্বেতাঙ্গদের জাতিদর্পে কতটা আঘাত করেছিল, তার প্রমাণ পাই -এর পরবর্তী দু'দশক ধরে মোহনবাগান সহ বাঙালি ক্লাবগুলোর প্রতি খেলার মাঠে ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে ইংরেজের চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক আচরণের মধ্যে।[২২] টনি ম্যাসন ও পল ডিমিও — উভয়েই দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে এই জয় আসলে ছিল ইংরেজের পাবলিক স্কুল চেতনারই সাফল্যের নামান্তরমাত্র। কিন্তু শিল্ড বিজয়ের মুহূর্তটিকে 'Game Ethic' প্রকল্পের প্রতি একটা 'threat' রূপে গণ্য করা যায় কেন না পশ্চিমের সাংস্কৃতিক জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বকে তাদেরই নির্ধারিত মাপকাঠিতে পরাভূত করা হয়েছিল।

বাংলা তথা ভারতে ফুটবল খেলার জনপ্রিয়করণে মোহনবাগানের শিল্ডজয় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। শিল্ডজয়ের তাৎক্ষণিক প্রভাব সামাজিক ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক একীকরণের মাধ্যম রূপে ফুটবলের গুরুত্বকে স্পষ্টতর করেছিল। এই প্রেক্ষিতে মোহনবাগান ক্লাব বাঙালির এক সাংস্কৃতিক ঐক্যমূলক প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হতে শুরু করে। বাঙালি সমাজে বিভিন্ন উপাদানিক বিভিন্নতার উর্ধ্বে এক সাধারণ ভাষারূপে ফুটবল ক্রমেই সাংস্কৃতিক সত্তা প্রকাশের এক অভিনব মাধ্যম (Unique means of cultural self expression) হয়ে উঠেছিল। ১৯১১-র শিল্ডে মোহনবাগানের খেলার দিনগুলোতে ব্যাপক জনসমাগম থেকে বোঝা যায় যে একটা ঐক্যের অনুভূতি; একটা আন্তরিক তাগিদ তাদেরকে মাঠে টেনে এনেছিল। একই সঙ্গে শিল্ড বিজয় ছিল বাঙালির সামাজিক ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক ঐক্যের এক বিশেষ মুহূর্ত। শিল্ডজয়ের পরবর্তীতে মুসলমান জনতাও বিজয়োৎসবে সামিল হয়েছিল। মুসলমান-পরিচালিত সংবাদপত্রেও এই জয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়।[২৩] পরবর্তীকালে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত খেলার মাঠের এই অসাম্প্রদায়িক চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "তখনো খেলার মাঠে সাম্প্রদায়িকতা ঢোকেনি, মোহনবাগন তখন হিন্দু-মুসলমানের সমান মোহনবাগান — তার মধ্যে নেবুবাগান কলাবাগান ছিল না। সেদিন যে 'ক্যালকাটা' মাঠের সবুজ গ্যালারি পুড়েছিল তাতে হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, একজন এনেছিল পেট্রল, আরেকজন এনেছিল দিয়াশলাই। সওয়ার পুলিশের উচ্ছৃংখল ঘোড়ার খুরে এক সঙ্গে জখম হয়েছিল দু'জনে।"[২৪]

বাঙালি সমাজে মোহনবাগানের জয়ের মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক প্রভাব সাধারণভাবে ক্রীড়া গবেষক বা ঐতিহাসিকদের লেখায় উপেক্ষিত হয়েছে। এটা স্বীকৃত যে, ১৯১১-র জয় 'জাতি'-রূপে ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্ব বা অপরাজেয়তার মিথকে ভেঙ্গে চুরমার করে 'নেটিভ' বাঙালির মনে আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করেছিল। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল, এই জয়ের ফলে বাঙালির সামাজিক মনস্তত্ত্বে ফুটবল খেলার একটি নতুনতর অবস্থান সূচিত হয়। জনতার চোখে ফুটবল খেলোয়াড়. ক্লাব সংগঠক সদস্য ও দর্শকদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত বাঙালিমাত্রেরই সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পায়। মোটকথা, অবসর বা বিনোদনের বাইরেও খেলাটার যে অন্যতম বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

চার

বাঙালির সংস্কৃতি জগৎকেও মোহনবাগানের শিল্ড জয় বেশ কিছুটা আন্দোলিত করেছিল বলা যায়। এই প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে। বলা যায় যে, ১৯১১-র ঐতিহাসিক জয় এক সম্পূর্ণ নতুন ধরণের সাংবাদিকতা প্রকল্পের বিকাশ ঘটিয়েছিল। বাংলার প্রায় সমস্ত পত্র পত্রিকা মোহনবাগানের এই সাফল্যের ধারাকে

নিয়মিত প্রতিবেদনে প্রকাশ করে।[২৫] এমনকি, অন্য প্রদেশে বা বিদেশেও পত্র-পত্রিকায় শিল্ড জয় নিয়ে প্রশস্তি প্রকাশিত হয়।[২৬] সবচেয়ে বড়ো কথা, এই জয় বাংলা ভাষায় ক্রীড়া সাংবাদিকতায় এক নতুন প্রাণের ও ধারার সূচনা করে। শিল্ড খেলা চলাকালীন প্রাত্যহিক প্রতিবেদন-ভিত্তিক খেলার গতি-প্রকৃতির ব্যাখ্যা ও সমাচার এই নতুন ধারারই পরিচায়ক ছিল। ১৯১১-র পর থেকে সংবাদপত্রে নিশ্চিতভাবেই 'খেলাধূলো' বিষয়ের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। তবে এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাঙালি দলের শিল্ডজয়ের প্রেক্ষাপটে দেশীয় ও ইউরোপীয় পরিচালনাধীন পত্র পত্রিকাগুলো যথাক্রমে জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী রেখায় ভাগ হয়ে যায়।[২৭] বিশেষত এই জয়ের জাতিগত তাৎপর্যের আলোচনায় দু'পক্ষের প্রতিবেদনের বৈপরীত্য এর প্রমাণ দেয়।

মোহনবাগানের ক্রীড়াবিজয় কিন্তু কলকাতার সাহিত্যমহলকে তেমনভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি; যদিও বিজয়োৎসবের ধারায় কিছু কিছু জাতীয়তাবাদী গান ও কবিতা[২৮] রচিত হয়েছিল। সমকালীন সাহিত্যিক লেখকরা বিস্ময়করভাবে তাদের সাহিত্য রচনায় এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্থান না দিলেও স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গে এই নিয়ে বেশ কিছু উৎকৃষ্ট ক্রীড়া সাহিত্য রচিত হয়েছে।[২৯]

শিল্ড বিজয় পরবর্তী কলকাতার দৈনন্দিন জন-সংস্কৃতিতে অবশ্য এই জয় উচ্ছ্বাসের প্লাবন এনেছিল বলা যায়। শিল্ড ফাইনালের দিন সন্ধ্যায় সারা কলকাতা জুড়ে উদ্বেলিত মিছিল, মহিলা গৃহবধূদের শঙ্খ নিনাদ, দীপ প্রজ্জ্বলন, পুষ্পবৃষ্টি, গান-বাজনা-ম্যাজিক-নাটকসহ বিচিত্রানুষ্ঠান বা বনভোজন হতে দেখা যায়।[৩০] কলকাতাসহ দেশের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিপুল অভ্যর্থনা, আমন্ত্রণ ও উপহার আসতে থাকে। যদিও মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষ থেকে বিনয়ের সঙ্গে এ সমস্তই প্রত্যাখ্যান করে ফুটবল মাঠের জয় নিয়ে এই অতিরঞ্জন হতে বিরত থাকতে সকলকে অনুরোধ জানানো হয়।[৩১]

পাঁচ

মোহনবাগানের শিল্ডজয়ের বাণিজ্যিক তাৎপর্যও কম আকর্ষণীয় ছিল না। ভারতে খেলাধূলোর ইতিহাসে টিকিট কালোবাজারির প্রথম নমুনা সম্ভবত ১৯১১-র শিল্ড ফাইনালেই পাওয়া যায়।[৩২] অন্যদিকে, কলকাতার তৎকালীন ব্যবসায়ী মহলেও মোহনবাগানকে পরিকল্পনা করে ঐ সময় বিক্রেতা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো হয়েছিল। দ্য স্ট্যান্ডার্ড মাইকেল কোম্পানি ফাইনাল খেলার দুদিন পরের অমৃত বাজার পত্রিকার সংস্করণের সাথে বিজয়ী মোহনবাগান দলের লক্ষাধিক ছবি বিতরণ করে। মেসার্স হ্যান্ড এন্ড চ্যাট্ এই উপলক্ষ্যে দু'মাসের জন্যে তাদের বিক্রীত হারমোনিয়ামের ওপর ১০% ছাড় ঘোষণা করে। আবার, মেসার্স এস রায় এন্ড কোং, কলকাতার প্রখ্যাত ক্রীড়া

সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক সংস্থা, সস্তা দরে ফুটবল বিক্রয়ের মাধ্যমে যুবকদের মোহনবাগান দলে স্থান করে নেবার জন্যে উৎসাহ প্রদান করে। সবচাইতে আকর্ষণীয় বিষয়, মঞ্চজগতে দ্য গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার তাদের সমকালীন প্রচলিত নাটক 'বাজীরাও' এর প্রচারে মোহনবাগানের নাম ব্যবহার করে। "Mohun Bagan has won the shield! It is a victory for Baji Rao."[৩৩]

'মোহনবাগান' নামের যাদু থেকে ব্যবসায়ী মহলের এই অর্থনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা থেকে বোঝা যায় যে, সে যুগে খেলাধূলোর সাফল্যের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা বোঝার মতো বুদ্ধি বাঙালির ছিল। আবার ১৯১২-৩৩ প্রায় দু'দশক ব্যাপী ফুটবলে বাঙালি দলের সাফল্যের অভাব দিয়ে ফুটবলের বাণিজ্যিক গুরুত্ব হ্রাসকে সহজেই বোঝা যায়। ১৯৩০ ও ৪০ এর দশকে যথাক্রমে মহামেডান স্পোর্টিং ও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের চূড়ান্ত সাফল্যের প্রেক্ষাপটে পুনরায় ইন্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যানসন্ বোর্ড ঐ দু'দলের খেলোয়াড়দের বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের মডেল রূপে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল।[৩৪] সুতরাং, গত দু'দশক ধরে ভারতবর্ষে খেলাধূলোর ক্ষেত্রে যে ব্যাপকতর বাণিজ্যয়ান শুরু হয়েছে, তার পূর্বসূরীতার কিছুটা দাবি ১৯১১ করতেই পারে।

ছয়

আলোচনার শেষে এসে বলা যায়, ১৯১১-র শিল্ড বিজয় ফুটবলকে বাঙালির জনসংস্কৃতির (Popular Culture) এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছিল। একদিকে এক বিশেষিত সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রতিভূ, অন্যদিকে এক অভিনব সামাজিক সত্তা বা আত্মপ্রকাশের মাধ্যম - ফুটবল খেলাধূলোর বিনোদন জগৎ ছাড়িয়ে বাঙালির জীবনে এক ভিন্নতর রূপ ও তাৎপর্য পরিগ্রহ করেছিল। অবশ্যই মোহনবাগানের জয়ের প্রেক্ষিতে বাঙালি জীবনে ফুটবলের এই নতুনতর তাৎপর্যকে অতিরঞ্জনের সম্ভাবনা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। তবে ১৯১১-র সাফল্যের বিভিন্নমুখী অর্থ ও গুরুত্বকে বুঝতে হলে ইউরোপীয় ও দেশীয় উভয় ধরণের উপাদান (বিশেষত পত্র-পত্রিকা) কে সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির বাস্তব প্রেক্ষাপটে সম্যকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। সুতরাং, অবসর বা বিনোদনের বাইরে একটা মৌলিক সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতারূপে, রাজনৈতিক উপায়রূপে, সামাজিক উপাদানরূপে এবং অর্থনৈতিক শক্তিরূপে খেলাধূলোর তাৎপর্য, যা কিনা প্রথাগত ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় উপেক্ষিত, আলোচ্য নিবন্ধের প্রয়াস থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠবে আশা করা যায়।

সূত্রনির্দেশ

১। প্রায় খালি পায়ের বাঙালি ফুটবল দল মোহনবাগান ১৯১১ সালে একের পর এক শক্তিশালি বুটপরা ইউরোপীয় সিভিল ও মিলিটারি দলকে পরাজিত করে আই এফ এ

শিল্ড প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে ইতিহাস তৈরি করেছিল। তারাই ছিল প্রথম বাঙালি তথা ভারতীয় দল, যারা এই কৃতিত্ব অর্জন করে। ২৯শে জুলাই শিল্ড ফাইনালে ইষ্ট ইয়র্কস্ রেজিমেন্টকে ২-১ গোলে পরাজিত করে মোহনবাগান এই শিরোপা লাভ করে।

২। Tony Mason, 'Football on the Maidan : Cultural Emperialism in Calcutta' (J. A. Mangan সম্পাদিত The Cultural Bond : Sport, Empire, Society, লন্ডন:১৯৯২, পৃ: ১৪২-১৫৩ এর অন্তর্গত)।

৩। Paul Dimeo, 'Football and politics in Bengal : Colonialism, Nationalism, Communalism' (Paul Dimeo এবং James.Mills সম্পাদিত Soccer in South Asia : Empire, Nation, Diaspora, লন্ডন: ২০০১, পৃ. ৫৭-৭৪ এর অন্তর্গত)। আরও দেখুন Paul Dimeo, 'colonial bodies, colpnial sport : "Martial" Punjabis, "Effeminate" Bengalis and the Development of Indian Football", the International Journal of the History of Sport, vol. 19, no 1, 2002, পৃ. ৭২-৯০।

৪। 'Games Ethic' বা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ক্রীড়া প্রকল্পের বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দেখুন J. A. Mangan, The Games Ethic and Emperialism : Aspects of the Differsion of on Ideal (লন্ডন : ১৯৯৮)।

৫। এ প্রসঙ্গে পল ডিমিও স্পষ্ট বক্রোক্তি, এই ক্রীড়া সাফল্যের উৎসব আসলে "the acceptance of the British moral system introduced through the Anglo - Indian colleges" এবং "a submission to the cultural imperialism of the British." Dimeo, 'Football and politics', পৃ: ৭১।

৬। সৌমেন মিত্র 'Babu at Play : Sporting Nationalism in Bengal . A study of Football in Bengal, 1880-1911' (নিশীথ রায় ও রণজিত রায় সম্পাদিত Bengal yesterday and Today, কলকাতা; ১৯৯১, পৃ. ৪৫-৬১ এর অন্তর্গত। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ সৌমেন মিত্রের অপ্রকাশিত M. Phil Dissertation 'Nationalism, Communalism and sub-regionalism : A study of Football in Bengal, 1880-1950' (Centre for Historical studies, Jawaharlal Nehru University, 1988).

৭। কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ফুটবল ও বাঙালি : ঔপনিবেশিক বাংলায় সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রকাশ' (গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ইতিহাস অনুসন্ধান - ১৬, কলকাতা : ২০০২ এর অন্তর্গত, পৃ. ৬৬৫-৬৭৫); 'বর্ণবৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা ও ক্রীড়াসত্তা ঔপনিবেশিক কলকাতায় ফুটবল সংস্কৃতির একটি চালচিত্র' (গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ইতিহাস অনুসন্ধান ১৭, কলকাতা : ২০০৩ এর অন্তর্গত, পৃ. ৫৫৪-৫৬৪); 'Sporting culture and cultural Nationalism; A study of football in late colonial Calcutta', Occasional paper, Depertment of History : North Bengal University, 2001.

৮। রোরিয়া মজুমদার 'The Vernacular in sports History'. Economic and political weekly. voi.XXXVII. No. 29. ২০ জুলাই, ২০০২, পৃ. ৩০৬৯-৩০৭৫।

৯। এ প্রসঙ্গে বোরিয়া মজুমদারের মতামত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে, রাষ্ট্র ও রাজনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে যে খেলার মাঠে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জয়ের উল্লেখযোগ্য প্রভাব থাকতে পারে, ম্যাসন বা ডিমিও-রা তা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। ঐ, পৃ. ৩০৭২।

১০। অমৃতবাজার পত্রিকা, নায়ক, বসুমতি, টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ইলাসট্রেটেড উইকলি প্রভৃতি পত্রিকা বাঙালি সত্তাকেই গুরুত্ব দিয়েছিল। অন্যদিকে, লন্ডন রয়টার, দ্য ইংলিশম্যান কিংবা দ্য মুসলমান মোহনবাগানের জয়কে 'ভারতীয়' সাফল্য রূপে তুলে ধরে।

১১। ১৯১১-র শিল্ড ফাইনালের প্রেক্ষাপটে উদ্বোধিত জনজাগরণের একটি রমনীয় ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দাস বিদ্রোহ', রবিবাসরীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ আগষ্ট, ২০০২।

১২। ময়দানের দর্শক সংস্কৃতি সে যুগে জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। এই সংস্কৃতির মূল রূপ প্রকরণগুলো হল মাঠের কথ্যভাষা, আচার-ব্যবহার, গল্প-গুজব-ঠাট্টা-তামাশা, গগনভেদি চিৎকার, অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি, মাঠে ইঁট ছোঁড়া, ছাতা-জামা-জুতো, চশমা শূন্যে ছোঁড়া, কাগজের মশাল জ্বালানো প্রভৃতি।

১৩। রয়টার সংবাদ সংস্থা তাদের ৩০.৭.১৯১১ এর ইংল্যান্ডে প্রেরিত তারবার্তায় মোহনবাগানের জয়লাভের পরবর্তী দর্শকোচ্ছ্বাস সম্পর্কে লেখে : "When it was known that the East Yorkshire Regiment had been defeated by two goals to one, the scene beggared description. the bengalees tearing off their shirts and waving them". মোহনবাগান প্লাটিনাম জুবিলি সুভেনির (কলকাতা; ১৯৬৪), পৃ. ১৭ - এ উল্লেখিত। ১৯১৩ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-র লেখা 'ফুটবল ফাইন্যাল' রচনায় এই ঘটনার এক জীবন্ত ছবি পাই।

১৪। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ (কলকাতা : ১৩৫৭ সন), পৃ. ৬৬।

১৫। সৌমেন মিত্র, 'Babu at Play' -ত উল্লেখিত। পৃ. ৫৩-৫৪।

১৬। বসুমতি, ৫ আগষ্ট, ১৯১১।

১৭। দ্য ইংলিশম্যান, ৩১ জুলাই, ১৯১১।

১৮। বাঙালির শারীরিক দুর্বলতা ও অলসতা নিয়ে ঔপনিবেশিক যুগে অসংখ্য ইংরেজ লেখনিতে যথেষ্ট কটাক্ষ করা হয়েছিল। এ জাতীয় নানারূপ মন্তব্য এবং ইংরেজের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিক্রিয়াজাত বাঙালির শারীরশিক্ষা আন্দোলনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনার জন্য দেখুন, John Rosselli, 'The self image of Effeteness : Physical Education and nationalism in nineteenth century Bengal'. Past and Present. 86 (ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০)।

১৯। দৈনন্দিন সমাজজীবনে ইংরেজদের বৈষম্যমূলক আচরণ অত্যাচারের বর্ণনা পাই নীরদ সি. চৌধুরী, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখের আত্মকথায়। নীরদ সি. চৌধুরী, The Hand. Great

Anarich! India : 1921-1952 (লন্ডন : ১৯৮৭); সুভাষচন্দ্র বসু, An Indian Pilgrim : An Unfinished Autobiography and collected Letters, 1897-1921 (লন্ডন : ১৯৬৫), পৃ. ২২-২৩, ৬৪-৬৬।

২০। ফুটবল মাঠে বাঙালির 'পাল্টামার' এর চরিত্র ও ধরণ সম্পর্কে আলোচনার জন্যে দেখুন কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বর্ণবৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা', পৃ. ৫৫৭।

২১। সমাজ-রাজনীতির অন্যান্য অঙ্গনের মতো ফুটবলেও বাঙালি দলগুলোকে সংগঠন, অংশগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইংরেজের পদ্ধতিগত বৈষম্য-নীতির শিকার হতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে দেখুন, ঐ, পৃ. ৫৫৪-৫৫৫।

২২। ঐ, পৃ. ৫৫৬-৫৫৭।

২৩। দ্য মুসলমান পত্রিকা লেখে : "It was a sense of universal joy which pervaded the feelings of the Hindus, the Mohammadans and the Christians alike. The members of the Muslim Sporting Club were almost mad and rolling on the ground with joyous excitement on the victory of their Hindu brothren." মৌলানা মহম্মদ আলি সম্পাদিত দ্য কমরেড লেখে: "We hereby join the chorus of praise and jubilation over the victory of Mohum Bagan." রিপোর্টগুলোর জন্য দেখুন মোহনবাগান ক্লাব প্লাটিনাম জুবিলি সুভেনির, পৃ. ২৫।

২৪। সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, পৃ. ৬৬-৬৭।

২৫। উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকাগুলো হল — অমৃতবাজার পত্রিকা, দ্য স্টেট্সম্যান, দ্য ইংলিশম্যান, দ্য টেলিগ্রাফ, নায়ক, হিতবাদী, বসুমতি, দ্য মুসলমান, কমরেড, দ্য এম্পায়ার, বেঙ্গলী, বন্দেমাতরম।

২৬। অন্য প্রদেশের সংবাদপত্রের মধ্যে এলাহাবাদের দ্য পাইওনীয়ার এবং বোম্বাই-এর দ্য টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া ইলাস্ট্রেটেড উইকলি উল্লেখ্য। বিদেশী সংবাদ প্রতিবেদনগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল — রয়টার্স সংবাদ সংস্থা, ডেইলি মেল, ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান, লন্ডন টাইমস্ ও সিঙ্গাপুর ফ্রি প্রেস।

২৭। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে খেলাধূলোর তাৎপর্য ছাপতে শুরু করে অমৃত বাজার পত্রিকা, বেঙ্গলি, বন্দেমাতরম, মানসী, হিতবাদী বা প্রবাসী-র মতো দেশীয় উদ্যোগে পরিচালিত পত্র-পত্রিকা। অন্যদিকে, দ্য ইংলিশম্যান, দ্য স্টেটস্ম্যান, নায়ক কিংবা বসুমতি-র মতো ইংরেজ নিয়ন্ত্রণাধীন পত্রিকা ক্রীড়া সাংবাদিকতার সাম্রাজ্যবাদী ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

২৮। এগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল বেঙ্গলি পত্রিকায় ৩১.৭.১৯১১ তারিখে প্রকাশিত একটি ইংরেজি কবিতা এবং মানসী পত্রিকায় আগষ্ট ১৯১১ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি জনপ্রিয় গান। দুটো রচনাই মোহনবাগানের ক্রীড়া বিজয়কে বন্দনা করে প্রসস্তিরূপে রচিত হয়েছিল।

২৯। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলো হল ঃ পরেশ নন্দী, মোহনবাগান ১৯১১ (কলকাতা : ১৩৮৩ সন); শিবরাম কুমার (সম্পা), মোহনবাগান অমনিবাস (কলকাতা : ১৩৯০ সন); শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্লাবের নাম মোহনবাগান (কলকাতা : ১৯৭৯); জয়ন্ত দত্ত, ভিক্টোরিয়াস মোহনবাগান (কলকাতা : ১৩৮৬ সন); রূপক সাহা (সম্পা), 'মোহনবাগান : প্রথম একশো বছর' আনন্দবাজার পত্রিকা, খেলা, ২৪ ও ২৮ নভেম্বর ১৯৯০।

৩০। পরেশ নন্দী, মোহনবাগান ১৯১১, পৃ. ১৪৯।

৩১। ক্লাবের সম্পাদক এস. এন. বোস স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন ঃ "............ ..... it is the decision of the Management of the club that it is not desirable to make fuss over last Saturday's success, as the club in general and the players in particular look upon it as the result of practice and study of the science of the game under the guidance and with the help of their numerous friends both European and Indian."

৩২। দ্য পাইওনীয়ার, ৩১.৭.১৯১১।

৩৩। মোহনবাগান ক্লাবের নথিপত্র হতে প্রাপ্ত। আরও দেখুন পরেশ নন্দী, মোহনবাগান ১৯১১, পৃ. ১৪৯-৫০।

৩৪। ঐ সংস্থা ১৯৩৯ সালে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুলব্যাক জুম্মা খানকে তাদের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করে; দ্য স্টেটস্‌ম্যান, ৩১শে জুলাই, ১৯৩৯। একইভাবে ১৯৪৮ সালে ইষ্টবেঙ্গলের পি. চক্রবর্তী ঐ বিজ্ঞাপনে মডেল হয়েছিলেন; সত্যকুমার রায় (সম্পা), I llustrated Olympic Number : Indian Footballers (১৯৪৮)।

চা, কয়লা ও পাটকল শ্রমিক এবং বাংলা সাহিত্য ১৮৭০-১৯৫০

শুভেন্দু শিকদার

সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের অবদানে ভারতে প্রাচীন অর্থনীতি ভেঙে পড়ার পাশাপাশি যেমন কয়লাখনি, চা-বাগিচা ও পাট শিল্প প্রভৃতির মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রসার লাভের সহজাত ফল ছিল ভারত তথা বাংলায় নবজাত শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব। সেইসঙ্গে শোষণ ও নির্যাতনের দৃশ্য। শশীপদ ব্যানার্জির মতো দুই একজন শ্রমিক কল্যাণে এগিয়ে এলেও অশ্বিনী ব্যানার্জী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো দুই/তিন জনকে বাদ দিলে জাতীয়তাবাদীরা প্রায় নিশ্চুপ ছিলেন।[১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের এই প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকানো যেতে পারে। কলকাতা কেন্দ্রিকসাহিত্য সেবীরা এইসময় মুষ্টিমেয়ের মনোরঞ্জনে ব্রতী জনসাধারণের সঙ্গে তাদের যোগাযোগও ছিল সামান্য।[২] তাই মার্কস যেমনটি ভেবেছিলেন—শ্রমিক কৃষকদের জন্য সচেতন শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি — এ সময় আশা করাটা ঠিক নয়। এমনকি ১৯৪৮ সালেও প্রগতি লেখক সংঘের পঞ্চম সম্মেলনে চিন্মোহন সেহানবিশকে এ ব্যাপারে আক্ষেপ করতে দেখা যায়।[৩] তবে শ্রমিক সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে সেই ঘাটতির অভাব কিছুটা মিটিয়েছিলেন বাংলা আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারকরা। চা-বাগিচার কুলিদের নিদারুণ অবস্থার বিবরণী 'সঞ্জীবনী'র মতো সমসাময়িক পত্রিকাগুলিতে তাঁরাই প্রকাশ করেছিলেন। এই নিপীড়নের বিবরণী পড়েই দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রথম সাহিত্যের অঙ্গনে চা-কুলিদের প্রবেশ করালেন 'চা-কর দর্পণ' নাটক লিখে। সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করলেন কল্লোল যুগের সাহিত্যিক সুধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁর 'জংলা' তে আসামের মোতিহারী চা বাগানের কুলি জীবনের ছবি তুলে ধরেন। আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বাংলা থেকে জমিদারী ও মহাজনী অত্যাচার ও শোষণে জর্জরিত ভূমিহীন সাঁওতাল নারী-পুরুষদের চা-বাগানের মালিক কর্তৃক নিযুক্ত আড়কাঠিদের প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে কুলি হওয়ার কাহিনী তাঁর 'নারীরমন' গল্পে গল্প বলার প্রসঙ্গে বলেছেন। চল্লিশের দশকেও এই অবস্থার যে পরিবর্তন হয়নি তা ১৯৩৫ এর শেষাশেষি কার্শিয়াং অঞ্চলের চা-বাগানে চাকরি নেওয়া কবি দিনেশ দাস তাঁর কবিতার ছত্রে জানান দিয়েছেন।[৪] আর এই চা-বাগানের জীবন যাত্রার উল্লেখ পাই

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দৃষ্টি প্রদীপ' (১৯৩৫) উপন্যাসে। আর সব জেনেও চা পানের ব্যগ্রতাকে ব্যঙ্গ করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'চা' কবিতায়।[৫] আবার তিনিই তেভাগা আন্দোলনের সময় চাষীদের সঙ্গে রেল শ্রমিকদের মতো চা-বাগানের কুলিদের হাত মেলানোর ইতিহাসকে অমর করেছেন তাঁর 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯) গল্পে।

নিপীড়িত কয়লা খাদের শ্রমিকের আকুল আর্তি শোনানোর ভার নিলেন সর্বপ্রথম কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত। তাঁর 'সাম্য-সাম' কবিতাটির কয়েকটি ছত্র অন্তত তারই ইঙ্গিত বহন করে।[৬] আর পুঁজিবাদী শোষণ কয়লা খনির শ্রমিকদের 'প্রেতলোক ফেরতা বীভৎস নর-কঙ্কাল' -এ পরিণত করেছে সেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হল ১৯২০ সালে প্রকাশিত নজরুলের 'ধর্মঘট' শীর্ষক প্রবন্ধে। তবে তাদের জীবনকে সর্বপ্রথম কথা সাহিত্যে রূপ দিলেন নজরুল মিতা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।[৭] তার একাধিক গল্পে অসহায় সাঁওতাল কুলি কামিনদের উপর সাহেবদের অত্যাচার দেখানো হয়েছে যা বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'কয়লাকুঠির দেশ' উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন কেমন করে চাষের জমি আর জঙ্গলের দেশ বণিক সাহেবদের কল্যাণে কয়লাকুঠির দেশ হয়ে উঠেছে। চা-বাগানের মতো এখানেও আড়কাঠির ভূমিকা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'বনবিহগী' গল্পে আড়কাঠিরা যে ধনতান্ত্রিক বণিক প্রভুদের তৈরি একথাটা তিনি জানিয়ে দিয়েছেন।

শত অত্যাচার সত্ত্বেও যাতে শ্রমিকরা চলে না যায়, সেজন্য খনি মালিকরা ধারে মদ সরবরাহের প্রলোভন দেখাতো। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নাটকে যক্ষপুরীর শ্রমিকদের দুর্বহ জীবন এবং সেই অবরুদ্ধ তার মধ্যে মদ্যপানের নেশা মোহ বোধহয় তারই ইঙ্গিতবাহী।[৮] কয়লাকুঠির ব্যভিচারী জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় শৈলজানন্দের 'মা' 'মরণ বরণ' প্রভৃতি, রাণী সুরুচিবালা চৌধুরাণীর 'কুলির প্রাণ' গল্পে। আর বিলাসপুর অঞ্চলের কয়লা খনিতে কুলি জীবনের অসুস্থ পরিবেশের কথা পাই সরলকুমার অধিকারীর 'চৈতী হাওয়া' তে।

শৈলজানন্দ যে সময় লিখেছিলেন সে সময় শ্রমিক আন্দোলনের একটা বাতাবরণ রচিত হয়েছিল। তাতে স্বরাজ ও স্বদেশীর রং লেগে থাকলেও তা ছিল বাইরে। তাই 'বন্দী' গল্পে বিলাতি বস্ত্র পরা নিয়ে সভা করতে আসা রাজনৈতিক দলের কথা থাকলেও তাকে ছাপিয়ে গেছে শ্রমিক পীড়ন ও পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিষয়টা।[৯]

আর যুদ্ধোত্তর স্বাধীন দেশের শ্রম অসন্তোষের বহ্নিশিখায় প্রদীপ্ত তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক' (১৯৪৮) নাটকে কয়লাখনির শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীবোধ জাগরণের কথা আছে।

যাইহোক 'চা-কুলি' বা কয়লা মজুরদের ক্ষেত্রে যেটা হয়নি চটকল শ্রমিকদের ক্ষেত্রে

হয়েছিল-অন্তত শ্রমিকদের সেবায় বেশ কিছু ব্যক্তি এগিয়ে এসেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে শশীপদ ব্যানার্জীর নাম — বরানগর চটকল শ্রমিকদের সেবায় আত্মনিয়োগকারী ও 'শ্রমজীবী সমিতি'র এই প্রতিষ্টাতার উদ্যোগে সর্ব প্রথম শ্রমিক শ্রেণীর পত্রিকা 'ভারত শ্রমজীবী' প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূল ঘটনার কঠিন আঘাত যতক্ষণ না বাঙালী সমাজে তীব্রতর হয়ে উঠল, সে পর্যন্ত বাংলার শ্রমজীবী সমাজের এই বিরাট অংশ বাংলা সাহিত্যকে স্পর্শ করতে পারেনি। বিদেশী রাজশক্তির শোষণের ফলে দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দৈন্য — বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্য ও কৃষিসম্পদ হানি রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অন্তত চোখে পড়েছে। তাই পুঁজিবাদী সমাজের 'দানবীয়' লোভের চাপে পড়ে কিভাবে গ্রামের নিরন্নচাষী 'টিটাগড়ের চটকলে মরতে' আসছে 'রক্তকরবী'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আর 'মহেশ' গল্পে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন ইংরেজ রাজত্বে দেশীয় তন্তুবায়দের চরম দুর্গতি গফুরের জুটেছিল, যার ফলে সে তাঁতী থেকে ভাগচাষী—জনমজুর—শেষ পর্যন্ত ফুলবেড়ের (উলুবেড়িয়া) চটকলের ভাবী শ্রমিক হয়েছে। এক্ষেত্রে বলা দরকার বাংলার মুসলমান গ্রাম্য জনসাধারণ নিরুপায় হয়েই চটকলে আসত, এই কাজকে তারা জাতপাত ও আত্মমর্যাদা বিসর্জনের নামান্তর মনে করত। 'মহেশ' গল্পে দেখা যায় চরম দুঃখের দিনেও গফুর চটকলের কাজের প্রতি ঘৃণ্য মনোভাব দেখিয়েছে।[১০] চটকলগুলিতে সর্দারদের দ্বারা শ্রমিকদের নিযুক্ত করা হত। রবীন্দ্রনাথের 'মাধো' কবিতার নায়ক মাধোকে পাটকলে সর্দারি করতে দেখা গিয়েছে।[১১]

পুঁজিবাদী শোষণ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালের পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মুনাফাকারী পাটকল মালিক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধিক্কার জানিয়েছিলেন।[১২] তাই বোধহয় ১৯৩৭ সালের ফ্রেব্রুয়ারীর শুরুতেই কলকাতা-হাওড়া এবং ভাগীরথীর দুই পাড়ের চটকল শ্রমিকদের যে ঐতিহাসিক ধর্মঘট শুরু হয়, কবি তাদেরকে অকাতরে সাহায্য করার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন রাখতে দ্বিধা করেন নি (২৯শে এপ্রিল, ১৯৩৭)। এমনকি 'ছড়ার ছবি' কবিতাগুচ্ছের 'মাধে' কবিতাটির মধ্যে চটকল ধর্মঘটী শ্রমিক মাধোর রূপদান করেছিলেন।[১৩]

এরপর বলা যেতে পারে মেটিয়াবুরুজের চটকল শ্রমিক গুরুদাস পালের কথা। চটকল ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১৯৩৯-৪০ সাল নাগাদ গণসঙ্গীত লিখতে শুরু করেন। শ্রমিক - মালিকের লড়াইয়ে যারা মালিকপক্ষের দালালি করে তাদেরকেই তিনি ব্যঙ্গ করেছেন।[১৪]

১৯৪৪ -এ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়ে সমরেশ বসু পার্টির নির্দেশে চটকলে ট্রেড ইউনিয়ন করতেন। 'বি. টি. রোডের ধারে' উপন্যাসটি তার প্রতিফলন।[১৫] আর জগদ্দলের

চটকলের দারোয়ান শ্রমিক হত্যা করলে, শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধ ও ঘৃণাজনিত সংগ্রামের প্রত্যক্ষ সাক্ষী সমরেশ বসু তাঁর সেই অভিজ্ঞতাকে 'যুগ যুগ জীয়ে', 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' উপন্যাসের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন।[১৬]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর এবং তার অব্যবহিত পরে বাংলা সাহিত্যে যাঁরা দেখা দিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী। তাঁর 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসে বলীরামপুর জুট মিলের ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শিউচন্দ্রিকার কথা আছে। যদিও উপন্যাসের কাঠামো রাজনৈতিক বা শ্রমিক মালিক সংঘাতের পটভূমি থেকে সরে গিয়েছে।

আর ১৯৫০ নাগাদ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কলুষিত স্বাধীন ভারতের পটভূমিতে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'মশাল' (১৯৫৪) নাটকে দেখিয়েছেন লোহার কারখানার মালিকের মতো চটকলের বিদেশী মালিকের এক হাতে সংখ্যালঘুদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া, অন্যহাতে গুন্ডা তোষণের অপকৌশল কিভাবে শ্রমিকরা প্রতিরোধ করেছে।

যাই হোক বাংলার প্রধান তিনটি শিল্পের বিকাশ ও বাংলা সাহিত্যের দর্পণে সেখানকার শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিবিম্ব দর্শন যদি সময়কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হয় তাহলে প্রথমেই বলতে হবে শেষেরটি ঘটেছে আগেরটার অনেক পরে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। কেননা এর জন্য দরকার ছিল পথে ঘাটে, গ্রামে গঞ্জে, শিল্পাঞ্চলের সব ঘটনা ও বহিঃপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করা এবং নিজের ঐতিহাসিক বিচারবোধ, পর্যবেক্ষণের সহজ প্রতিভা দিয়ে সহজ সরলভাবে তা উপস্থাপিত করা। বর্ধমানের সোনাপলাশী গ্রামের রেভারেন্ড লালবিহারী দে তা করতে পেরেছিলেন বলে ইংরাজীতে লিখিত তাঁর 'গোবিন্দ সামন্ত' (১৮৭১) উপন্যাসে কৃষকের মজুর (কুলি) হওয়ার ঘটনাটা লক্ষ্য করি। আর যদি বিশুদ্ধ বাংলা সাহিত্যের কথা বলতে হয় তাহলে বলা দরকার চা-বাগানের কুলিরাই তাকে প্রথম প্রভাবিত করে, যদিও এর পেছনে কোন সাহিত্যিকের অনুসন্ধিৎসা ছিল না, তা ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। পরে তা সাহিত্যের রূপ পায়। আর চটকল শ্রমিক কল্যাণে নিয়োজিত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমিক শ্রেণীর পত্রিকা বের করলে, শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তিত্ব, যিনি আগামী দিনে শ্রমিক শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উপলব্ধি করে ছিলেন,[১৭] ওতে লিখলেও, কয়লা খনির শ্রমিকরা তখনও অধরা। অন্তত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কলম চলার আগে তো নয়, তা আবার সেই বিংশ শতাব্দীর শুরুতে।

আসলে যে বুদ্ধিজীবীরা উনিশ শতকের আশা আকাঙ্ক্ষাকে কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, ইতিহাসে রূপ দিয়েছেন তাঁরা সকলেই সরকারী চাকুরে বা ইংরেজ প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে জড়িত। আন্দোলনগুলি ছিল শ্রেণীগত সুযোগ সুবিধা আদায়ের। এদের সঙ্গে জনসাধারণের যোগ ছিল অতি সামান্যই।[১৮] বাংলা সাহিত্য তখন মুষ্টিমেয় শহরকেন্দ্রিক

মানুষ জনের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত। যেখানে শ্রেণী সংঘাতের সম্ভাবনা সেখানেই তার থেমে যাওয়ার প্রবণতা। অথচ সমকালের কৃষক শ্রমিক জাগরণ ও শ্রেণী বিরোধের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ সারা দেশ যখন বিপ্লবী অভ্যুত্থানের দ্বারপ্রান্তে এসেছে অথচ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ রূপটা তখন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে স্পষ্ট হয়নি। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে সওয়ালের উপযোগী রক্ষণশীল হিন্দুর-ধর্ম-সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধ, মুসলমান বিদ্বেষী সংকীর্ণ মনোভাব পোষণের প্রবণতা হয়ে উঠেছে স্পষ্ট। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' যে সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিল তা হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী ও সাম্প্রদায়িক 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম', 'দেবী চৌধুরাণীর' দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে। আবার সম্পদ নির্গমন তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাসে আশ্চর্যজনক ভাবে শ্রমিকশ্রেণী হয়েছে উপেক্ষিত।

অন্তত প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল পর্যন্ত মরুভূমিতে মরুদ্যানের বিস্তার হয়নি যে পর্যন্ত না বাংলা সাহিত্য বঙ্কিমের উচ্চশ্রেণী সমকীর্ণ দশা থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের হাত ধরে, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্রমান্বিত প্রয়াসে সাধারণ মানুষের কোঠায় গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু তাদের বিচিত্র জীবন-যন্ত্রণার বেদগান তখনও রচিত হয় নি।[১৯] রাজনৈতিক পরিবেশ বা সমাজের মধ্যেকার দ্বন্দ্বে ব্যক্তি মানসে যে সব মোচড় লাগে, তার দরুন সৎ, স্পর্শকাতর ও সমাজসচেতন লেখক-শিল্পীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পর্দাও একটা একটা সরতে থাকে।[২০] যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক অভিঘাত, রুশ বিপ্লব পাশ্চাত্যের মতো বাঙালী সমাজ তথা যুব মানসে যে প্রভাব ফেলে, তার সঙ্গে রুশ, স্ক্যান্ডিনেভীয় ইত্যাদি সাহিত্যের প্রভাব সম্পৃক্ত হয়ে একদল বাঙালী যুব লেখকদের সমাজের উপেক্ষিত শ্রেণীর জীবনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে দেয়। আলোচ্য তিন শিল্প শ্রমিকের দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ই কয়লা খনির শ্রমিকদের ব্যাপকভাবে সাহিত্যের আঙিনায় নিয়ে আসেন যা অভূতপূর্ব। কিন্তু তেমনটি পাটকল শ্রমিকরা চা-কুলিদের ক্ষেত্রে হয়নি। যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় বিরাট পরিবর্তন এল রবীন্দ্রচেতনায়, শরৎচন্দ্র কংগ্রেসী গান্ধীবাদের পথে নেমেও তার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন।[২১] কিন্তু শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় 'সমাজ সংস্কার করতে যেয়ে যাতে সমাজের সংহার না করি সেদিকে তার তীব্র দৃষ্টি ছিল।'[২২] সমসাময়িক এই মধ্যবিত্ত সুলভ মানসিকতাই গফুরের পাটকল শ্রমিকের জীবন গ্রামের অনাহারী জীবনের চেয়ে শ্রেয় হতে পারে তা শরৎচন্দ্রকে দেখাতে দেয়নি। আর রবীন্দ্রনাথ তো মার্কসবাদী ছিলেন না, তাই তার সাহিত্যকে শ্রমিক সাহিত্য বলা যাবে না। আসলে তাঁদের সাহিত্য যেমন শ্রেণী সীমাবদ্ধতার বাইরে পা বাড়ানো তেমনি আবার সীমাবদ্ধতার মধ্যে প্রতিক্রিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ। আবার শৈলজানন্দের মতো তরুণ লেখকদের আর যাই হোক

মার্কসবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জনজীবনবাদের অবতারণা করার মতো গভীর সমাজবোধ ছিল না।[২৩] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শৈলজানন্দদের এই সীমাবদ্ধতার দিকে 'দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ঃ 'শৈলজানন্দের গ্রাম্য জীবন ও কয়লা খনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ — কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এই বাস্তব সংঘাতে আসে নি।'

মোটকথা তিরিশের দশকের শেষের দিকে বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদের প্রভাব স্বভাবতই শ্রমিক শ্রেণীর প্রভাব বাড়িয়ে দেয়। অবশ্য এই সময়কার সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।[২৪] তা বলে মার্কসবাদের প্রভাবে চা-পাটকল-কয়লা শ্রমিকদের নিয়ে বেশি করে সাহিত্য লেখা শুরু হল তা ভাবা অবান্তর। উপরন্তু ফ্যাসিবাদের উদ্ভব সাহিত্যিকদের মন তার মোকাবিলার দিকে ঘুরিয়ে দেয়। যেখানে ১৯৩৯-৪০ সালে মেটিয়াবুরুজের চটকল শ্রমিক গুরুদাস পাল শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিয়ে গান লিখছেন, ১৯৪১ এ যুদ্ধ পরিস্থিতির পরিবর্তন কমিউনিস্ট পার্টির লাইন পরিবর্তন করে দেয়। যার দরুন সাহিতিকরা শ্রমিক-মালিক বিরোধ উহ্য রেখে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মেলানোর ব্যাপারটাকে গৌরবান্বিত করতে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে সুধাংশু ঘোষ যে গান রচনা করেন[২৫] তা এবং সমরেশ বসুর 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' উপন্যাসের কথা বলা যায়। শেষোক্ত রচনায় দেখা যায় আট ঘন্টা কাজের দাবিতে শ্রমিকদের ধর্মঘটের চেয়ে শ্রমিক মালিক বিরোধ মিটিয়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উৎপাদন অব্যাহত রাখার ব্যাপারটাই বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।

ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পর ১৯৪৫-৪৬ এর মহান গণ সংগ্রামের অংশীদার হিসাবেই শ্রমিক শ্রেণীকে চিহ্নিত করার ব্যাপারটা বাংলা সাহিত্যে বেশি করে দেখা যায়। আলাদাভাবে চা-পাটকল-কয়লাখনি শ্রমিকদের জীবন সংগ্রামের কথা চোখে পড়ে না। এরপর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা থেকে স্বাধীনতার আঘাত — এতটাই পড়ে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত ছিন্ন মূল মধ্যবিত্ত সমাজের আবেগময় সমর্থন থেকে শ্রমজীবী সমাজ বঞ্চিত হয়ে পড়ে।[২৬] অন্যদিকে প্রগতি লেখক সংঘ, ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক সংঘ ও গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যে গণমুখী প্রগতিশীল ভাবনার প্রবাহমানতা অবিচ্ছিন্ন গতিতে বয়ে চলছিল, সরকারী হস্তক্ষেপ ও কমিউনিস্টদের অস্তিত্ব রক্ষার দায়ের ফলে এই ধারা স্থিমিত হয়ে যায়।[২৭] এইসব কারণে তৎকালীন পাঠক সমাজের বৃহৎ কল্পনাকে সমকালীন শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনগুলি স্পর্শ করতে পারেনি।

সূত্রনির্দেশ

১। গৌতম চট্টোপাধ্যায় 'ভারতের জাতীয় সংগ্রামে শ্রমিক আন্দোলনের ধারার গুরুত্ব' — গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পা ঃ— ইতিহাস চর্চা ঃ জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা। ১৯৮৫। পৃ: ৭৩।

২। নীলরতন সেন, প্রসঙ্গঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্য। ১৯৮৭। পৃ: ১৯৮।

৩। চিন্মোহন সেহানবিশ, 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম'।

৪। 'কোন পাথুরে চা বাগানের / ফাগ্ মাখানো গেরুয়া মাটির গুঁড়ো,' এবং 'ভেসে ওঠে অগুন্তি পাহাড়ী মেয়ের রোদে পোড়া তামাটে মুখ'।

৫। 'লন্ডনকে ঘুষ দিয়ে আমরা চা পান করি।'

৬। 'খনির তিমিরে কারা কি কহিছে, ওগো শোন পাতি কান, অনেক নিম্নে পড়ি আছে যারা শোন তাহাদেরো গান।'

৭। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, 'গল্প লেখার গল্প'।

৮। বাসুদেব মোশেল, 'শ্রমজীবী মানুষ ও শৈলজানন্দের ছোট গল্প'—পশ্চিমবঙ্গ, বর্ষ ৩৪, সংখ্যা ৩১-৩৫, ২০০১। পৃ: ৮৬।

৯। দেবকুমার ঘোষ, ''শৈলজানন্দের' 'দিনমজুর' শোষণ-পীড়ণ প্রতিবাদ-পরিণাম— 'পশ্চিমবঙ্গ, বর্ষ ৩৪, সংখ্যা ৩১-৩৫, ২০০১। পৃ: ১০২।

১০। অমল দত্ত 'হাওড়ার চটকল ও তার শ্রমিক (১৮৭০-১৯১৪) — ঐতিহাসিক, এপ্রিল, ১৯৮৮। পৃ: ৩২।

১১। 'ছেলে মেয়ে চলল বেড়ে, হল সে সংসারী;
কোনখানে এক পাটকলে সে করতেছে সর্দারি।'

১২। Modern Review. Jan 1930. p p. 1-3

১৩। নেপাল মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঃ কয়েকটি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। ১৯৮৭। পৃ: ৩৯-৪১।

১৪। সুধীর চক্রবর্তী, 'বাংলা গণসংগীতের ধারা' — ধনঞ্জয় দাশ সম্পা ঃ বাঙলা সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা। ১৯৯২। পৃ:৫৪৮।

১৫। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, 'বাংলা উপন্যাসে কমিউনিস্ট চরিত্র' — ধনঞ্জয় দাশ সম্পা, প্রাগুক্ত। পৃ: ১৪১।

১৬। অশ্রুকুমার সিকদার, 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস'। ১৯৮৮। পৃ: ৩২২।

১৭। নরহরি কবিরাজ, 'শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনা ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ' — পশ্চিমবঙ্গ বর্ষ ৩১, সংখ্যা ২৮-৩৩, ১৯৯৭-৯৮। পৃ: ৩০।

১৮। নাজমা জেসমিন চৌধুরী, বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি। ৩য় সং ১৯৯১। পৃ: ৩৫।

১৯। জীবেন্দ্র সিংহ রায়, 'কল্লোলের কাল; কল্লোল, কালি - কলম, প্রগতির দিন। পরিমার্জিত সং ১৯৮৭। পৃ: ১৪৫।

২০। মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্য সংস্কৃতির নানা দিক। প্রকাশনার সাল অনুল্লিখিত। পৃ: ৩৪।

২১। তদেব। পৃ: ৩৪

২২। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে। ১৩৬৯। পৃ: ৩২২

২৩। জীবেন্দ্র সিংহ রায়, প্রাগুক্ত। পৃ: ১৪৬।

২৪। সত্যপ্রিয় ঘোষ, 'বাংলা সাহিত্যে গোর্কির প্রভাব ও নতুন চেতনার সূচনা' — ধনঞ্জয় দাশ সম্পা, প্রাগুক্ত। পৃ: ৬৬-৬৭।

২৫। 'হামরা - কোদাল চালাই পাতি উঠাই
চা ঘরে কাম করি
দেশ বাঁচাবার ডাক এলো আজ
চুপে রইতে নারি।' (দ্রঃ হেমাঙ্গ বিশ্বাস, উজান গাঙ বাইয়া। ১৯৯০। পৃ: ১৩৮।)

২৬। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পরিবর্ধিত সং ১৯৮০। পৃ: ৩৩৮।

২৭। ডঃ মানসী জামান, বাংলা নাটক (১৯৪০-৬০) ঃ আর্থ সামাজিক দৃশ্যপট। ১৯৯২। পৃ: ৫৬-৫৭।

বিবর্তনের ধারায় বৈচিত্রধর্মী বোলান দল

অসীম কুমার পাল

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য তার লোকসংস্কৃতি। বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি, উপজাতির নিজস্ব এই লোকসংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতিকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছে। একইভাবে বাঙালীর সংস্কৃতি সাধনাতেও লোকসংস্কৃতির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। বাঙালী জাতির একান্ত নিজস্ব সম্পদ তার এই লোকসংস্কৃতি। ইতিহাসের নানা বিবর্তনের ও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই সম্পদকে সে বহন করে নিয়ে চলেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পরিবেশ ও প্রতিবেশের মধ্যে নানান ধরণের লোকসংস্কৃতির জন্ম ও পরিপুষ্টি। আদিম সংস্কৃতি ধারা, নানান ধর্মীয় প্রথা ও রীতি নীতি, সংস্কার ও সর্বোপরি নানান প্রকারের নৃত্যগীত ও আমোদ প্রমোদ বাংলার লোকসংস্কৃতিতে স্থান করে নিয়েছে।

রাঢ় অঞ্চলের বোলান হল এমনই এক বিশেষ ধরণের লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির অনান্য ধারার মত বোলান এক শ্রেণীর লোকসঙ্গীত হলেও লোকসঙ্গীতের অনান্য অজস্র আঙ্গিকের মত একটি সঙ্গীত আঙ্গিকই শুধু নয়, উপরন্তু গানের সঙ্গে নৃত্য ও অভিনয় সমন্বিত হয়ে এটি একটি মিশ্র প্রকরণে পরিণত হয়েছে। আবার প্রকরণ হিসেবে এটি অত্যন্ত নমনীয় ও অভিযোজনক্ষম। এর বৈচিত্র্যও বিস্ময়কর। তাই বোলান লোকসংস্কৃতির যে আঙ্গিকই হোক না কেন, অথবা গোঁড়াতে তার যে রূপই থাকুক না কেন, এর মধ্যে যত বৈচিত্র্য আছে, আবার কোন গ্রামীণ অনুষ্ঠানে নেই।

চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উপলক্ষে মূলত বোলান অনুষ্ঠিত হলেও বর্তমানে ধর্মীয় উপলক্ষ ছেড়ে সামাজিক-বিনোদনে পরিণত হয়েছে। লোকসংস্কৃতির অনান্য শাখা যখন আজ প্রায় মৃতপ্রায় তখন বোলান সেগুলিকে আত্মসাৎ করে নিয়ে এগিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। এতে তার লক্ষ্য গেছে বদলে, নিজস্ব রূপের ঘটেছে পরিবর্তন, তবুও বিবর্তনের পথেই হেঁটে চলেছে বোলান।

বোলানের এই বিবর্তনের ক্ষেত্রে বোলান অধ্যুষিত অঞ্চলটির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হতে পারে। লোকসংস্কৃতির পশ্চিমাঞ্চল যথা - নদীয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম প্রভৃতি রাঢ় অঞ্চলের কয়েকটি জেলার কতিপয় অঞ্চলে বোলান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিশদভাবে বলা যায় নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ, তেহট্ট থানার

গ্রামাঞ্চলে, সংলগ্ন বর্ধমান জেলার কাটোয়া ও কেতুগ্রাম থানার গ্রামাঞ্চল সংলগ্ন বীরভূম জেলার লাভপুর, নানুর প্রভৃতি থানার গ্রামাঞ্চলে এবং সংলগ্ন মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণাংশের কান্দী, খড়গ্রাম, বড়এঞা, ভরতপুর, সালার থানার গ্রামাঞ্চলে বোলান অতিমাত্রায় জনপ্রিয়।[১]

ভৌগলিক বিচারে এই অঞ্চলকে রাঢ় বাংলা উত্তরাংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বঙ্গদেশের এই অঞ্চলটি সুপ্রাচীনকাল থেকেই সাংস্কৃতিক ইতিহাসে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এসেছে। এর জন্য শুধু ভৌগলিক কারণই নয়, ঐতিহাসিক কারণও অনেকাংশে দায়ী।[২]

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এদেশের সভ্যতার আদিকাল থেকেই বহু উত্থান পতনের ধারা চলে এসেছে বহমান স্রোতের মতই। এক শাসকগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভাবধারায় শাসনকার্য চালাবার পর বিভিন্ন কারণে সেই শাসনভার হস্তান্তরিত হয়ে গেছে অন্য নতুন শাসকগোষ্ঠীর হাতে। বদলে গেছে শাসনসংস্কৃতি, সমাজসংস্কৃতি এমনকি যুগেরও পরিবর্তন ঘটে গেছে অনিবার্য ভাবেই। এভাবে এদেশে এসেছে এবং পেরিয়ে গেছে মৌর্য যুগ, কুষাণযুগ, গুপ্তযুগ, সুলতানী যুগ ও মুঘলযুগ। প্রত্যেক শাসকগোষ্ঠী নিজেদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে গেলেও যুগ পরিবর্তনের ফাঁকে ফাঁকে রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গা এদেশে ঘটে গেছে সংস্কৃতির সমন্বয়। আর এই সংস্কৃতি সমন্বয়ের ধারা অব্যাহত আছে আমাদের লোকসংস্কৃতি তথা বোলানে।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার আদি অধিবাসীরা আর্য ভাষাভাষী ছিল না। বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও মগধের সঙ্গে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের সূত্রে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি বাংলায় প্রবেশ করেছিল। এছাড়া বাংলার অংশ বিশেষ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবার পর ব্রাহ্মণরা বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলে বৃহত্তর আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতিক যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ফলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার স্থানীয় লোকাচার দৃঢ়মূল হতে থাকে এবং আরো পরে পরে এই ব্রাহ্মণ্য মধ্যস্থতায় ও সুলতানী পৃষ্ঠপোষকতায় এই স্থানীয় রীতি, রেওয়াজ ও তার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি নানান বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট আঞ্চলিক সংস্কৃতিতে উত্তীর্ণ হয়।

এই আঞ্চলিক সংস্কৃতির নিরিখে রাঢ় বঙ্গের উত্তরাংশ হল এমনই একটি বিশিষ্ট অঞ্চল, যেখানে প্রশাসনিক পরিবর্তনের একের পর এক ধারা এই অঞ্চলের জনজীবনে এক স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্কৃতির আশ্রয়ে এ অঞ্চলে তৈরি হয়েছে এক বিচিত্র সমন্বয়ী সংস্কৃতির। বিবর্তনের পথে তার বৈচিত্র্য আরো বিকশিত হয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর মাধ্যমে যখন যে সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে রাঢ়ের উর্বর পলিমাটিতে

তার একটি বীজ থেকে গিয়েছে এবং যথাসময়ে তা বৃক্ষরূপে বিকশিত হয়েছে। এই কারণে সহজ সরল ভাবের লোকনৃত্য, ভয়াল বীভৎস রসের লোকনৃত্য সবই এ অঞ্চলে দেখা গেছে। এদের প্রতিটির পিছনেই রয়েছে এক একটি চিন্তাভাবনার পটভূমি যা বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠীর শাসনকালে দীর্ঘকাল ধরে শিকড় বিস্তার করেছে।[৩]

ফলে বহুযুগের বহু সংস্কৃতির ধারা বোলানে এসে মিশেছে ও তাকে নবনব রূপে বিকশিত করেছে। তাই বোলান হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্য শুধু গায়নরীতি, নৃত্যরীতি ও উপস্থাপনরীতিতেই নয়, এই বৈচিত্র্য তার সমগ্র রূপের ও কাঠামোর।

এই কারণেই হয়তো বোলানের নির্দিষ্ট কোন চরিত্র নেই। নমনীয়তা, ঔদার্য এমনকি চরিত্রহীনতাই বোলানের বড় বৈশিষ্ট। কোন বিশেষ অঞ্চলের বোলান সেই অঞ্চলের স্থানীয় সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করে নেওয়ার চেষ্টা করে এর ফলে বোলানের রূপের ঘন ঘন রূপান্তর ঘটে এবং বোলান দলগুলিও ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হয়। তাই নদীয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বীবভূম জেলার বোলানপ্রিয় গ্রামগুলিতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট নিয়ে বিচিত্র ধরণের বোলানের আত্মপ্রকাশ ঘটে চলেছে।

মোটের উপর বোলানের মধ্যে যত বৈচিত্র্য আছে অপর কোন গ্রামীণ অনুষ্টানে তাই নেই। নৃত্য, অভিনয়, গানই শুধু নয় তার সঙ্গে লম্ফ ঝম্ফ, চটকদারী সুর, সংসাজা প্রভৃতি নানা উপকরণ। যেহেতু বোলানের আছে অপর সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করে নেওয়ার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তাই বোলান কখনই অবিবর্তিত অবস্থায় থাকতে পারে না। বিবর্তনের পথ ধরেই হাঁটতে থাকে ও বৃহত্তর সংখ্যার গ্রামীণ জনসাধারণের প্রীতিভাজন হয়ে ওঠে।

লোকসংস্কৃতির কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে বিবর্তনধর্মী বোলানের শ্রেণীবিন্যাস করা সম্ভব নয়। সুবন্ধু মন্ডল 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ' - গ্রন্থে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের বিচারে বোলানকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন যথা - শশ্মান বোলান, দাঁড়া বোলান, সাঁওতেলে বোলান, পালা বোলান ও ছল বা রউ পাঁচালী।[৪] কিন্তু বোলানপ্রিয় গ্রামগুলিতে প্রায় প্রতি বৎসরই নিত্য নুতন নামে ও ভঙ্গিমায় বোলান অনুষ্ঠিত হয় বলে এই বিন্যাস যথেষ্ট নয়। আসলে কোন বিশেষ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট সমন্বিত হয়ে উঠলেই বোলানের ভিন্ন নামে পরিচিত হতে বাধা থাকে না। আবার ক্ষেত্র সমীক্ষায় এটাও দেখা গেছে যে একই ধরণের বোলান বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামেও অভিহিত হয়।[৫]

তাই বোলানকে আমরা সাধারণত তিনটে শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি যথা পোড়োধর্মী বোলান বা শশ্মান বোলান, দাঁড়া বোলান বা ডাক বোলান এবং পালাধর্মী বা অভিনয়ধর্মী বোলান। বিষয়বস্তু অনুসারে ডাক ও পালাধর্মী বোলানকে চারটে ভাগ করা যায় যেমন রাজনৈতিক, সামাজিক, পৌরাণিক ও প্রহসনধর্মী, আর আছে নানা বৈচিত্র্যধর্মী বোলান দল। বোলানের দলগুলি নিজেরাই নিজেদের ভিন্ন নামে চিহ্নিত করে।

আমাদের আলোচনা এখন এমনই কয়েকটি বৈচিত্র্যধর্মী বোলান দল সম্পর্কে ঃ—

বাবাজীর দলের বোলান ঃ

রাঢ়বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে যে সব বিচিত্রধর্মী বোলান দলের পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে 'বাবাজীর দল' অন্যতম। এই দলের সকলেই গেরুয়া বা তালিমারা আলখাল্লা পোষাক পরিধান করে বৈষ্ণব বৈষ্ণবী সাজে ও পালাবন্দী বোলান পান করে। বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে যারা নানা অনাচার করে থাকে তাদের নিয়ে এখানে গীত ও অভিনয় সহযোগে ব্যাপক কৌতুক করা হয়। বর্ধমানের কেতুগ্রাম, মুর্শিদাবাদের ভরতপুর ও সালার থানা অঞ্চলে বিশেষ করে মালিহাট, টেঁয়া, কাঞ্চনগড়িয়া প্রভৃতি গ্রামে এই গানের খুব চল রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ''মুর্শিদাবাদে এক সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হয়। মালিহাটি, টেঁয়া, বৈদ্যপুর এবং কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের শ্রীপাট এককালে বিখ্যাত ছিল। মালিহাটি গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর রাধামোহন ঠাকুর (১৬৯৭-১৭৭৮) জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জমিদারগণ এই ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ঠিকই, তবুও তৃণমূল স্তরে এ ধর্ম তেমন কিছু জনপ্রিয় ছিল না।[৬]

তাছাড়া শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর পর বৈষ্ণব ধর্মের ভিতর নানারকম বিচ্ছিন্নতা ও তত্ত্বগত বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে বাংলার বৈষ্ণব সমাজ নানা দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বৈষ্ণব ধর্মের একটি অংশ মননশীল শাস্ত্রের চর্চ্চার ফলে মূল জনজীবন থেকে উচ্চমার্গে চলে যায়, আর অপর যে বিপুল সংখ্যক সাধারণ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী, তারাও গ্রামের সাধারণ মানুষের মনে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি, বরং তাদের অনেকের বিকৃত আচরণ ও জীবন পদ্ধতি সাধারণ মানুষের মনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করেছিল। তাই হয়তো 'বাবাজীর দল' নামে পরিচিত বোলান দল বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের জীবন যাপন ও আচার আচরণ পদ্ধতি নিয়ে পালা বেঁধে ব্যঙ্গাত্মক গান করে। এই গানের নমুনা ঃ

প্রথম বাবাজী - গণ্ডাকতক মাতাজী, নিয়ে হল বাবাজী

দ্বিতীয় বাবাজী - তারা বাধ্য হয়ে হল রাজী,
না নিয়ে ভাই পারলাম না।

প্রথম বাবাজী - তারা দিনে হয় চাষীবাসী,
রাতে গিয়ে হরিদাসী।

দ্বিতীয় বাবাজী - সে যে মধুর কণ্ঠী ফাঁসির মালা,
তাকে ছাড়া যে গুরুভজা চলে না।

প্রথম বাবাজী - পিঁয়াজ রসুন ছোঁয় না তারা,
মদ মাংসে ভক্তি ভরা।

দ্বিতীয় বাবাজী - সে অমৃত না খেয়ে ভাই
বৃন্দাবন যেতে পারলাম না।[৭]

সাঁওতাল বোলান দল ঃ

নৃত্যধর্মিতা সাঁওতেলে বোলানের প্রধান বৈশিষ্ট। এই নৃত্য হয় যৌথভাবে, আর তাতে উদ্দামতা প্রকট। সাঁওতেলে বোলান নাম হলেও এর নৃত্য ভঙ্গিতে সাঁওতালী প্রভাব বস্তুত কম, আর যে ভাষায় তারা গান করে তাও মূল সাঁওতালী ভাষা নয়। কিন্তু মাদল করতাল ও জয়ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে উন্মত্ত নৃত্য ও বিচিত্র ভাষা বা শব্দ সহযোগে যা পরিবেশিত হয় গ্রামবাসী তাকেই সাঁওতেলে বোলান বলে মনে করেন। এর মূল যে সাঁওতালী নৃত্যগীত তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বাঙালী ও সাঁওতাল সমাজ পাশাপাশি বসবাস করার ফলে উভয়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটেছে। আর বোলানের যেহেতু নির্দিষ্ট কোন রূপ নেই, সেহেতু সাঁওতালদের নৃত্য গীতে আকৃষ্ট হয়ে খুবই স্বাভাবিকভাবে তাকে অনুকরণ করেছে বোলান। সাঁওতেলে বোলানের আদি উৎস হিসেবে এই অনুকরণকেই চিহ্নিত করতে হবে। এছাড়া সাঁওতেলে বোলানের আদিমতাযুক্ত সাজপোষাক, যেমন পালকের মুকুট, তীর-ধনুক লাঠি প্রভৃতিও সাঁওতালদেরই অনুকরণ।

বস্তুত বাঙালী সমাজের সঙ্গে সাঁওতাল সমাজের লেনদেনের ব্যাপারটা আজকের নয়, বহুদিনের। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতাল সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতি বিবর্তিত হয়েছে। কোথাও কোথাও অনেকটা অন্যরূপ নিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। বহুক্ষেত্রে তা হিন্দুধর্মীয় প্রথা রীতি ও সংস্কারের নিকটবর্তী হয়েছে। অন্যদিকে সাঁওতালী গীতি ও নৃত্য প্রবেশ করেছে বাঙালী সংস্কৃতিতে।

কৃষি নির্ভর সাঁওতাল সমাজে নাচ গানের প্রচলন বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এই নাচ গান মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সৌখিনতা বা পেশাদারী সংস্কৃতির অংশ নয়, বরং বলা চলে এগুলি তাদের সমগ্র সমাজের সংস্কৃতি প্রবণতার প্রকাশ। কৃষিকাজে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন ধরণের নাচ গানের আশ্রয় নিত এবং সে সমস্ত নাচগানের মধ্যে তাদের জীবনচর্যা ও সংস্কৃতিকে জীবন্তভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করত।[৮]

ক্রমে ক্রমে বাঙালী সমাজের সঙ্গে সাঁওতাল সমাজ ঘনিষ্ঠ হওয়ায় বাঙালী হিন্দু অনুষ্ঠানে তারা নাচ গানের আসরে অংশ নেয়। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, প্রভৃতি জেলায় বিজয়া দশমীর দিন তারা তাদের নৃত্যগীত পরিবেশন করে। আর বাঙালী সমাজও আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে সাঁওতালদের এই নৃত্যগীত।[৯]

যে বোলানদাররা সাঁওতালী নৃত্যগীতে আকৃষ্ট হয়ে সাঁওতালী সাজ ও নৃত্যাকে অনুকরণ করে, তাকে 'সাঁওতালী বোলান' বলে আখ্যায়িত করা হয়। সুধীর চক্রবর্তী তাঁর 'অবসরের

গান বোলান' প্রবন্ধে এর বর্ণনা দিয়েছেন 'খাটো নীল গেঞ্জি আর খাটো হাফ প্যান্ট পরে মাথায় ফেট্টি বেঁধে লাঠি হাতে হুই হুই করে ছুটে আসছে সাঁওতেলে বোলানের দল'।

এই ধরণের বোলানের চল রয়েছে নদীয়ার জলঙ্গীর তীরবর্তী গ্রামগুলিতে এবং বর্ধমানের কাটোয়া, মৌগ্রাম, কাগ্রাম, কাঠগুঁড়ি ও তার আশেপাশের গ্রামগুলিতে।[১০]

শ্রী হর্ষমল্লিকের 'বোলান কথা' গ্রন্থ থেকে সাঁওতেলে বোলানের কিঞ্চিৎ নমুনা এখানে পরিবেশিত হল ঃ

"দয়া ভি করকে হিয়া আয়া দেবী অভয়া।।
তুঁ হাঁ ছারা, এ সাঁইহী কুছ নেহী জান।।
হাঁসার এ আসর সে করগো করুণা।।
লেড়কা মেরা ডাকি তেরা প্রণাম লে তু থো,
— জী হা ম্যাঁয়।
সীলামু লে, মাইজী তুই থামজরা
ডাকি ডাকি, তুমসে সেরা"[১১]

সাঁওতেলে বোলান দলের সদস্যসংখ্যা ৩০/৪০ জন, কখনও কখনও এর থেকেও বেশি হয়, সদস্যরা সকলেই বাঙালী এবং অধিকাংশই অল্পবয়সী, কেননা অল্পবয়সীদের নৃত্যের প্রতি ঝোঁক থাকে বেশি। সাঁওতেলে বোলানের সঙ্গে সাঁওতাল সমাজের সাধারণত কোন সম্পর্ক না থাকলেও বোলান দলের যুবক সদস্যরা সাঁওতালী আদিবাসী সংস্কৃতির উদ্দাম আনন্দের উজ্জীবন ঘটায় নিজেদের সাধ্য ও এইভাবেই নিজেদের প্রকাশ করে আনন্দ পায়, আর অগণিত গ্রামবাসীও তা দেখে মুগ্ধ হয়। সাঁওতেলে বোলানের এটাই তাৎপর্য।

রণপা - নৃত্য বোলান ঃ

রণপা-নৃত্য বোলান বোলানের কোন একটি প্রকরণ না হলেও এটি বোলানের অঙ্গ হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকে। বাংলার নানা লোকনৃত্যের অন্যতম হল রণপা নৃত্য। কিন্তু বর্তমানে যেহেতু বোলান এই বিশেষ লোকনৃত্যটিকে আত্মসাৎ করে নিয়েছে এবং বোলানের দিনেই এটি উপস্থাপিত হয়ে চলেছে, তাই এটিকে বোলানের অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করলে খুব ভুল হবে না।

আসলে, স্থানীয় মানুষের ধারণায় চৈত্র সংক্রান্তির গাজনের সময় যা কিছু হয় তাই বোলান। রণ-পা-নৃত্য বোলানের দিনে অনুষ্ঠিত হয় বলেই স্থানীয় বোলানপ্রিয় গ্রামবাসী এটিকে রণ-পা-নৃত্য বোলান বলে অভিহিত করেন।

বোলানের অনান্য প্রকরণের সঙ্গে এর বিরাট পার্থক্য হল এতে কোন গান থাকে না, থাকে বাদ্যযন্ত্র এবং সেই বাদ্যের তালে তালে রণপায়ে অর্থাৎ পাদানিযুক্ত বাঁশের

লাঠিতে ভর করে এক ছন্দোময় নৃত্য। এই রণপা নৃত্যকারীদের শারীরিক কসরৎ ও শিল্পবোধ বোলানের দিনে অগণ্য বোলান শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে রাখে।

'রণ' অর্থে যুদ্ধ, 'পা' অর্থে পদ। তাই রণপা এই নামটির সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক রয়েছে। সেজন্য একে যুদ্ধ নৃত্য বলেও অভিহিত করা হয়। এটিকে আদিম যুদ্ধ পদ্ধতিরও একটি নিদর্শন বলা হয়ে থাকে।

একদা বঙ্গদেশের বিভিন্ন রাজ্যের সৈন্যদলকে দূরবর্তীস্থানে যাত্রার জন্য রণ-পা এর সাহায্য নিতে হত। প্রাচীনকালে উত্তরপূর্ব ভারতবর্ষের বঙ্গদেশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল আর সেই সব রাজ্যের রাজারা স্থানীয় শক্তিশালী যুবকদের নিয়ে সেনাদল গঠন করত। এদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল ডোমশ্রেণীভুক্ত। নানাশ্রেণীর সৈন্যদলের মধ্যে রণ-পা ধারী লাঠিয়ালরা ছিল অন্যতম। এরা সকলেই রণপায়ের সাহায্যে দ্রুত হাঁটা ও লাঠি চালনায় পারদর্শী ছিল।[১২]

এই বিশেষ ধরণের সেনাদলের প্রয়োজন অনেককাল আগেই শেষ হয়েছে, কিন্তু কালক্রমে তা বঙ্গীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে সেই সংস্কৃতিকে বহন করে চলেছে। ইদানিংকালে তাই দেখা যায় রাঢ় বঙ্গের বোলান অঞ্চলে বোলানেরই অঙ্গ হিসেবে এই নৃত্যটির ব্যাপক প্রসার ও জনপ্রিয়তা।

রণ-পা-নৃত্য ও রায়বেঁশে নৃত্য যেহেতু শক্তিচর্চা ও অঙ্গচালনার কৌশলযুক্ত রণ-নৃত্যের অঙ্গীভূত সেহেতু এর জন্য কঠোর অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। তাই এই ধরণের নৃত্যে অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যাও কম থাকে। আর সব অঞ্চলে রণ-পা-নৃত্য থাকে না। অবশ্য বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমার আদিবাসী সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই রণ-পা-নৃত্য। তাই কাটোয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে বিশেষ করে সুদপুর, বিজনাগরা, নারায়ণপুর, শ্রীখণ্ড গ্রামে এই ধরণের নৃত্য সীমায়িত।

কাটোয়া থানার সুদপুর গ্রামের প্রবীন গ্রাম্য বোলান শিল্পী শ্রী সুধানন্দ বৈরাগ্য ও অনান্য কয়েকজন বিশিষ্ট লোকশিল্পী চৈত্রমাসের গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে বোলান গানের দলে বাজনার তালে তালে একপ্রকার পরিশীলিত রণ-পা-নৃত্যের প্রচলন করে গিয়েছেন। আগাগোড়া রঙ দিয়ে চিত্রিত একজোড়া রণ-পা-এ চেপে নৃত্য শিল্পীরা সারিবদ্ধ হয়ে বা বৃত্তাকারে ঢোলের বাজনা, বাঁশীর সুরে এবং গানের তালে তালে নৃত্য করে। এদের মাথায় থাকে রঙিন ফেট্টি, গায়ে রঙিন জামা এবং রঙিন ধুতি।[১৩]

এই নৃত্য হয় সাধারণত দল বেঁধে ও কখনও সারিবদ্ধভাবে। সারিবদ্ধ নৃত্যের অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা সমান্তরালভাবে দুটি লাইনে নাচতে নাচতে একবার এগিয়ে যায় এবং একবার পিছিয়ে যায়। কখনও বৃত্তাকারে দ্রুত কিংবা ধীর পায়ে ঘুরতে থাকে বাজনার তালে তালে। এই সময় তাদের রণ-পায়ে বাঁধা ঘুঙুরের ধ্বনি ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে।

সাধারণত ১৮ থেকে ২০-২৫ বৎসরের যুবকরাই এই দলের সদস্য হয়। কোন কোন দলে এর থেকে বেশী বয়সের লোকও থাকে। প্রতিটি দলে ২৫-৩০ জন থেকে ৩৫-৪০ জন অবধি সদস্য হয়।

উল্লেখ্য যে, রণ-পা-নৃত্য বোলান কেবল কাটোয়া ও তৎসংলগ্ন গ্রামাঞ্চলেই দেখা যায়। নদীয়া বীরভূম বা মুর্শিদাবাদের গ্রামে এর কোন প্রসার নেই বললেই চলে। এ ব্যাপারে বলা যায় যে, কাটোয়া অঞ্চলে রণ-পা-নৃত্যের ঐতিহ্য দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছিল, সেইজন্য কালক্রমে তা বোলানের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়ত রণ পায়ে দীর্ঘক্ষণ ছন্দোময় নৃত্য অবশ্যই শারীরিক সক্ষমতার ব্যাপার এবং এর জন্য প্রয়োজন হয় দীর্ঘদিনের অনুশীলন। তাই হয়তো অন্যান্য অঞ্চলে ঐতিহ্যের অভাবে এটি তেমন প্রসারলাভ করেনি।

হিজড়া বোলান দল ঃ

রাঢ়বঙ্গের বোলান প্রিয় গ্রামগুলিতে বিচিত্রধর্মী বোলানের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বর্ধমানের কাটোয়া সংলগ্ন গঙ্গটিকুরি. ঝামটকুর, ও মুর্শিদাবাদের সালার থানা সংলগ্ন বহরান, টেঁয়া, বৈদ্যপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ১৯৯৮ সাল থেকে এক নতুন ধরণের বোলান দল দেখা যায় 'হিজড়া বোলান দল'। নামশুনে মনে হবে হিজড়ারা হয়তো বোলান দল গঠন করেছে, কিন্তু এই দলে একটিও হিজড়া সদস্য নেই। দলের সকল সদসই হিজড়াদের মত সাজগোজ করেছে বলেই হিজড়াদের বোলান দল নামে পরিচিত হয়েছে। এরা সকলেই পরে সালোয়ার কামিজ, হাতে চুড়ি, কানে দুল, গলায় ঢোলক। দলের সকলেই ঢোলক বাজায়, হাতে তালি দেয় আর সেই সঙ্গে থাকে এক অদ্ভুত ধরণের নৃত্য যা হিজড়াদের নাচের সঙ্গেই তুলনীয়। এই বোলানে গান কম, নাচের প্রাধান্যই বেশী।[১৪]

বোলানের মরশুমে নিত্য নুতনভাবে সাজিয়ে নিজেদের তুলে ধরাই বোলান দলগুলির উদ্দেশ্য। তাই বোলান অঞ্চলের কোন কোন দল সমাজের অবহেলিত ও ঘৃণিত শ্রেণীর হিজড়াদের সাজতে ও সেই নামে পরিচিত হতে দ্বিধাবোধ করেনি। এভাবে তারা বোলান অঞ্চলের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে।

সূত্রনির্দেশ

১। অসীম পাল *পেলান লোকসংস্কৃতির আধুনিকীকরণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত*, *সমাজ জিজ্ঞাসা* পৃ:৫৩ ৩য় বর্ষ ১মখণ্ড ২য় সংখ্যা ১৯৯৮। বিদ্যাসাগর সেন্টার ফর সোস্যাল স্টাডিজ। মোদনীপুর।

২। শ্রী শ্রী হর্ষ মল্লিক *বোলান কথা* পৃ: ২ পুস্তক বিপণি ১৯৮৭।

৩। দিলীপ মুখোপাধ্যায় উত্তর রায়ের লোকসঙ্গীত পৃ: ২-৩।

৪। সুবন্ধু মন্ডল, প্রবন্ধ ঃ বোলান বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি শেষ গ্রন্থ বরুণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত পৃ: ৫০৩।

৫। ক্ষেত্র সমীক্ষা ১৯৯৬ — ২০০৩ নদীয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ (বোলান অধ্যুষিত অঞ্চল)।

৬। রমাকান্ত চক্রবর্তী, বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম, আনন্দ পাবলিশার্স ১৯৯৬ পৃ: ১১৫-১১৬।

৭। রচয়িতা শালিন্দা, ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ ১৯৯৬।

৮। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে - যাত্রা সাঁওতালী, পত্রিকা লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ১৪০১ পৃ:২০৭।

৯। ঐ পত্রিকা পৃ: ২০৭-২০৮।

১০। সাক্ষাৎকার উদয় কবিরাজ (দলপতি) কাগ্রাম, সালার মুর্শিদাবাদ ১৯৯৭।

১১। শ্রী শ্রী হর্ষ মল্লিক বোলান কথা, পৃ: ১১৬।

১২। মহম্মদ আয়ুব হোসেন বোলান গান, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি শেষ গ্রন্থ পৃ: ৩৫৯।

১৩। ঐ পৃ: ৩৬০।

১৪। সমীক্ষা ১৯৯৮। মুর্শিদাবাদের সালার থানার অন্তর্গত টৈঁয়া, বৈদ্যপুর কাগ্রাম প্রভৃতি।

একুশ শতকে বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে বিজ্ঞান জ্ঞাপন এর পরিপ্রেক্ষিত ঃ প্রসঙ্গ ৯০ দশক

অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের যুগটাই হল তথ্য ও সংবাদের। গণমাধ্যমের কাজ হল সংবাদ সংগ্রহ, পরিবেশন ও তার বিশ্লেষণ। গণমাধ্যমের অঙ্গ হিসাবে সংবাদপত্রের দায়িত্ব অপরিসীম। অজানা সাম্প্রতিক বিবিধ বিষয় সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করাই এদের প্রধান কাজ। তবে জানা জিনিসও বারবার প্রচার করে সচেতনতা বৃদ্ধি করা সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কয়েকশো বছরের ইতিহাসে সংবাদপত্র, পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। আর্থ সামাজিক ও প্রযুক্তিগত যে অভাবনীয় পরিবর্তন সমাজজীবনের রূপান্তর ঘটিয়েছে তা অনিবার্যভাবে স্পর্শ করেছে সংবাদপত্রকেও। বাংলা সংবাদপত্রও এর ব্যতিক্রম নয়।

বাংলা ভাষায় সংবাদপত্রের সূচনা হয়েছিল ''বঙ্গাল গেজেটের'' (মে ১৮১৮,) হাত ধরে। ১৮১৮ সালের গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও হরচন্দ্র রায়ের সম্পাদনায় ''বঙ্গাল গেজেট'' প্রকাশিত হওয়ার পরই শ্রীরামপুরে খ্রিস্টান মিশনারীরা বের করলেন ''সমাচার দর্পণ'' (১৮২৮)। তবে বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র বঙ্গাল গেজেট না সমাচার দর্পণ তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। রামমোহন প্রকাশ করলেন 'সংবাদ কৌমুদী' (৪ ডিসেম্বর সাল)? ঈশ্বর গুপ্ত প্রকাশ করলেন 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১)। এদেরই হাত ধরে বাংলা সংবাদপত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

দিন যত এগিয়েছে বিশ্ব তত মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে; প্রতি সেকেণ্ডে সংবাদ হয়ে যাচ্ছে পুরানো; হয়ে উঠেছে ইতিহাস। মানুষ সেই খবর জানছে নতুন করে, নতুন ভঙ্গীতে। মানুষের আগ্রহ শুধু রাজনীতি, সিনেমা বা খেলাধূলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। মানুষ জানতে চাইছে বিজ্ঞানের নিত্যনূতন আবিষ্কারের কথা। বুঝতে চাইছে আধুনিক পদ্ধতিকে। বিজ্ঞানের এই নিত্যনূতন খবর জানার জন্য তারা সাহায্য নিচ্ছে বিভিন্ন গণমাধ্যমের।

আজকের জ্ঞাপন ব্যবস্থা শুধুমাত্র সংবাদপত্রের মতো গণমাধ্যমে আটকে নেই। ক্রমশ তাতে এসেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। সংবাদমাধ্যম বেরিয়ে এসেছে ছাপাখানার বাইরে। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রকে অনুসরণ করেছিল বেতার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাড়া জাগিয়ে এল টেলিভিশন - অডিও ভিস্যুয়াল মাধ্যম। ভারতবর্ষে তার আগমন ১৯৫৯ সালে।

কলকাতা দূরদর্শনের জন্ম ১৯৭৫ সালে। তারও অনেক পরে এল কেবল টেলিভিশন ওয়ালাদের যুগ। এখন তাদের রমরমা বাজার। এই কেবল টিভির যুগে বিজ্ঞানের অনুষ্ঠানও মানুষের মনকে জয় করেছে। জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি, অ্যানিমাল প্লানেট, ডিসকভারির মতো বিজ্ঞান বিষয়ক চ্যানেল যারা আজ বিজ্ঞানের পত্রপত্রিকার কাছে নয়া চ্যালেঞ্জ।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস এক আধ বছরের নয়। প্রায় দুশো বছর আগে ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা "দিগ্ দর্শন" পত্রিকায় প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা প্রকাশ করেন। কলকাতা বুক সোসাইটির উদ্যোগে পরিপূর্ণ বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে ১৮২২ সালে। ১৮৩২ সালে মাসিক পত্রিকা "বিজ্ঞান সেবধী" প্রকাশিত হয়। "দি হিন্দু ম্যানুয়াল অব্ লিটারেচার অ্যান্ড সাইন্সেস" ১৮৩৩ সালে প্রকাশ করে — পাক্ষিক পত্রিকা "বিজ্ঞান সার সংগ্রহ"। এরকম পশ্বাবলী, বিদ্যাহারাবলী, বিদ্যাদর্শন, তত্ত্ববোধিনী, বিবিধার্থ সংগ্রহ, রহস্য সন্দর্ভ, বঙ্গদর্শন, বিজ্ঞানমিহিরোদয় প্রভৃতি রাশি রাশি বিজ্ঞানের পত্রপত্রিকা হতে থাকে। এদের মধ্যে কোনটিতে সব লেখার পাশাপাশি বিজ্ঞানের লেখা প্রকাশিত হত। আবার কোন কোনটি ছিল পুরোপুরি বিজ্ঞানের পত্রিকা।

স্বাধীনতার পরে দেখা গেল দুটি ধারা; সাধারণ পত্রিকায় বিজ্ঞানের লেখা প্রকাশ এবং বিজ্ঞানের বিশেষ পত্র পত্রিকা। সংবাদপত্রের জন্য আলাদা বিজ্ঞান বিভাগ একেবারে হাল আমলের বৈশিষ্ট্য। তবে ইংরেজী সংবাদপত্রের মতো আলাদা বিজ্ঞান বিভাগ চালানোর ক্ষেত্রে বাংলা সংবাদপত্র অনেকটাই পিছিয়েই রয়েছে। বিজ্ঞান প্রচারের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র প্রায়ই উভমুখী নীতি নিয়েছে। আজও আমরা দেখতে পাই বাংলা সংবাদপত্র গুলোতে বিজ্ঞানের খবর প্রকাশের পাশাপাশি দৈনিক সাপ্তাহিক রাশিফল প্রকাশের ঘটনা। জ্যোতির্বিজ্ঞানের গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা ও প্রতিবেদন সংবাদপত্রগুলোতে স্থান পাচ্ছে। সংবাদপত্রের পাতা ওল্টালেই জ্যোতিষ আচার্য, তন্ত্র যোগাচার্য, বিশ্বের বিস্ময়কর অলৌকিক মাতা অমুক দেবী সন্ন্যাসিনী প্রভৃতি বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। আর এই বিজ্ঞাপনের অর্থেই সংবাদপত্রগুলোর রমরমা; সুতরাং সংবাদপত্রকে আদর্শ ধরে রাখতে গেলে তার ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্ষুন্ন করতে হবে।

মানব সভ্যতার এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল যোগাযোগ বিপ্লব (কমিউনিকেশন রেভোলিউশন)। কমিউনিকেশন বা জ্ঞাপনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে দেশ ও জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি - এই দুটির সমন্বয়ে মানুষের জীবনযাত্রার মান হয়ে উঠেছে অনেক সাবলীল ও সুন্দর। কয়েক শতক পেরিয়ে আমরা যখন বিংশ শতাব্দীতে পড়লাম তখন দেখলাম যে মানব সমাজের সভ্যতার ইতিহাসে এই শতাব্দীটি সবথেকে ঘটনাবহুল শতাব্দী। এই শতাব্দীতে ঘটে গেছে দুটো বড়ো বড়ো বিশ্বযুদ্ধ। একদিকে যেমন

মহাকাশে মানুষের বিজয় পতাকা স্থাপন, চাঁদের মাটিতে মানুষের পদচারণা, কম্পিউটারের তথ্যভাণ্ডারে বিপ্লব, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভাবনীয় সাফল্য, অনাদিকে আবার দেখেছি মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে সমাজের আমূল পরিবর্তন; পরমাণু লীলার ধ্বংস ও অবক্ষয়ের সাক্ষী জাপানের হিরোশিমা ও নাগাস্যাকি।

এবার বিশ্বের মানচিত্র থেকে ভারতের মাটিতে প্রবেশ করা যাক। স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞান জ্ঞাপনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনার আগে পরাধীন ভারতের বিজ্ঞান জ্ঞাপন প্রসঙ্গে একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক। ব্রিটিশরা তাদের শাসন শোষণগত অর্থে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শিক্ষা ও প্রয়োগ সীমাবদ্ধভাবে করেছিল। ১৮৩৫ থেকে ১৯৪০ -এই একশো বছরে এ ব্যাপারটা কখনোও দিক্‌ভ্রান্ত হয়নি। ১৮৭৬ সালে মহেন্দ্রলাল সরকার স্বদেশী ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে "ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব্ সায়েন্স" প্রতিষ্ঠা করলেও তা দীর্ঘকাল গবেষণা পরিষেবা চালু করতে পারেনি। পরবর্তী কালে সি. ভি. রমন এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় প্রতিষ্ঠানটিতে বিজ্ঞান চর্চার কাজ গুরুত্ব পেল। ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে যতটুকু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ব্যবহারিক তথ্য দেওয়া হত তা সবকারের স্বার্থেই দেওয়া হত — সাম্রাজ্যবাদের চাহিদার বাইরে কিছু দেওয়া হত না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে বিজ্ঞান চর্চার প্রসার হয়। এই সময় জাতীয়তাবাদী বিজ্ঞানী দল আত্মপ্রকাশ করল। সরকার অপেক্ষা বেসরকারী উদ্যোগই বিজ্ঞান আন্দোলনে প্রধান হয়ে উঠল। এক্ষেত্রে, বিশেষত অবিভক্ত বঙ্গে পত্র পত্রিকা এবং বিজ্ঞান সংগঠনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। ১৯৪৭ -এর আগে বাংলা সাহিত্যে এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞানের আলোচনাকে স্থান দিতে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে রামমোহন রায়, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বাংলার বিশিষ্ট বিজ্ঞানীগণও বিজ্ঞানকে সহজ সরল ভাষায় মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে প্রয়াসী হয়ে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা প্রমুখের নাম করা যায়। এর মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা দুজনেই ১৯৪৭ সালের পরেও জীবিত ছিলেন এবং বিজ্ঞান প্রচারে বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বিজ্ঞান প্রচারে ব্যক্তির ভূমিকা ব্যক্তির আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মেঘনাদ সাহার (১৮৮৩-১৯৫৬) কথা বলা যেতে পারে। তিনি ভারতবর্ষ, বসুমতী, নব্যভারত প্রভৃতি পত্রিকায় জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞান, পারমাণবিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে লেখালেখি করেন। ছোটদের উপযোগী বিজ্ঞান লেখার জন্য তিনি কলম ধরেন শিশু ভারতী পত্রিকায়। মেঘনাদ সাহা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা পুনর্গঠনের জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। তিনি বিজ্ঞানের মাধ্যমে জনকল্যাণে আগ্রহী ছিলেন। সেই ভাবনা প্রকাশিত তাঁর প্রবর্তিত "সায়েন্স এন্ড্ কালচার" পত্রিকায় প্রকাশিত

প্রবন্ধে। ভারতের বিজ্ঞান চর্চা পিছিয়ে পড়েছে এই কথা মনে করতেন মেঘনাদ সাহা। তেমন ভাবনা ছিল আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়েরও। মেঘনাদ সাহার আর একটা বড় কাজ ছিল বিজ্ঞান কর্মীদের সংগঠিত করা। ১৯৪৭ সালের ৭ জানুয়ারী তাঁর উদ্যোগে গড়ে ওঠে ভারতীয় বিজ্ঞান কর্মীদের সংগঠন "এ্যাসোসিয়েশন্ অব্ সায়েনটিফিক্ ওয়ার্কার্স্ অব্ ইন্ডিয়া"। আর এক সংগঠন "বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ" প্রতিষ্ঠার পিছনেও ছিলেন আর এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪)। প্রতিষ্ঠার বছর থেকেই নানা দুরূহ বিষয়কে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে বিজ্ঞান পরিষদ থেকে বের হয় বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকা জ্ঞান ও বিজ্ঞান। প্রথমে সম্পাদক ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র; পরে সম্পাদনার দায়িত্বভার নেন স্বভাব বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য। বর্তমানে এই পত্রিকার সম্পাদনা সচিব রতন মোহন খাঁ। এই পত্রিকা ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে সাধারণ মানুষের কাছে নানান ধরণের বিজ্ঞানের প্রবন্ধ প্রকাশ করে চলেছে। এর মধ্যে পিগমীদের কথা (অক্টোবর, ১৯৫১), ঋকবেদ বিজ্ঞান (জানুয়ারী, ১৯৬৫), পরমাণু বিজ্ঞানী অটোহান (মার্চ, ১৯৭৯), বোস আইনস্টাইন তত্ত্বের ৭৭ বছর (জানুয়ারী ১৯৯৭), ইতিহাসে রঙ (ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই মানুষের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে আগ্রহ সঞ্চারিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের মহাকাশ অভিযানের খবর জেনে। ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর কক্ষপথে উপস্থাপিত হয় কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক -১। এর একমাস পরে লাইকা নামের কুকুর নিয়ে স্পুটনিক মহাকাশে যায়। জীবিত প্রাণীর মহাকাশ যাত্রায় সাধারণ মানুষের আগ্রহ চূড়ান্ত রূপ নেয়। এই সময়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বৈজ্ঞানিক জয়যাত্রার কাহিনী প্রচারে স্লাইড শো, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, আকাশ পর্যবেক্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষকে আরও বিজ্ঞান সচেতন করে তোলার চেষ্টা চলে। এই উদ্যোগকে প্রাধান্য দিতে সেই সময়ের বিজ্ঞান পত্র পত্রিকাগুলো ভূমিকা নিয়েছিল। ১৯৫৭-৫৮ সাল থেকে স্কটিশ চার্চ স্কুলে বিজ্ঞানের শিক্ষক রাধিকা বাগচীর উৎসাহে ছাত্ররা হাতে কলমে বিজ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত হয়। বিজ্ঞানের এই ব্যবহারিক চর্চার নাম ছিল 'ল্যাবরেটরি'। স্কটিশ চার্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'সায়েন্স ফর্ চিলড্রেন' সংস্থা। দিকে দিকে গড়ে উঠতে থাকে বিষয় ভিত্তিক বিজ্ঞান ক্লাব। ১৯৫৯ সালে বিড়লা মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার পর তার সঙ্গে বেসরকারী সায়েন্স ক্লাবের যে যোগাযোগ শুরু হয়, তা আজও অব্যাহত। ১৯৬৭ সাল থেকে বিড়লা মিউজিয়ামের ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনী মিউজিও-বাস চালু হয়। এই প্রয়াস মফঃস্বলের বহু মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। ফলে এইসব এলাকার বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী মানুষজন উপলব্ধি করেন এরকম হাতে কলমে বিজ্ঞান শেখা আর তার প্রয়োগ করার "ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী" যদি এত সাড়া জাগাতে পারে তবে স্থায়ী বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে

তুললে ব্যাপারটা আরও ভালো হবে। এই প্রসঙ্গে হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদ (১৯৬১), অন্তরাল বিজ্ঞান গোষ্ঠী (১৯৬৯), যাদবপুর সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশন (১৯৭১), অশোকনগর বিজ্ঞান সংস্থা (১৯৭৪), চন্দননগর সায়েন্স ক্লাব (১৯৭১), দ্যা সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশন অব্ বেঙ্গল (১৯৭৭) প্রভৃতির নাম করা যায়।

এই বিজ্ঞান ক্লাবের লক্ষ্য ছিল নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞানমুখী করে তোলা। আর এর মাধ্যম হিসেবে তারা মডেল নির্মাণ, আকাশ পর্যবেক্ষণ, প্রদর্শনী, প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা প্রভৃতির আয়োজন করে। পরে যত সময় এগিয়েছে বিজ্ঞান ক্লাবের চরিত্রও পাল্টেছে। বিজ্ঞানকর্মীরা অনুভব করলেন মানুষের চেতনা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞান মনস্কতার আন্দোলন। বিজ্ঞান ক্লাবগুলোর সমন্বয়ের প্রথম প্রয়াস নেয় জওহর শিশুভবন (১৯৭৪)। এরা বিভিন্ন ক্লাবকে নিয়ে এন.সি.ই.আর.টি. -এর সহায়তায় হিন্দী হাইস্কুলে একটি বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করেন।

এই বিজ্ঞান ক্লাব ও সংগঠনগুলোর উদ্যোগেই বিজ্ঞানের পত্র পত্রিকাগুলো জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পর ১৯৬১ তে 'মানবমন' এবং ১৯৬৩তে 'স্বাস্থ্যদীপিকা' বিজ্ঞান প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। এর পর প্রকাশিত হল 'অঙ্কুরে শুরু', 'বীক্ষণ' প্রভৃতি। কোনটাই স্থায়ী হয়নি। ১৯৭৪ -এ বেরলো হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদের মাসিক 'লোকবিজ্ঞান'। ১৯৭৫-এ আত্মপ্রকাশ করল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান কর্মী সংস্থার মুখপত্র 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'। ১৯৮০ -এর দশকে বেশ কয়েকটি বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যেমন 'বিজ্ঞান' (১৯৮০), 'বিজ্ঞান প্রদীপ' (১৯৮০), 'বিজ্ঞানমেলা' (১৯৮১) 'কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান' (১৯৮১), 'অন্বেষক' (১৯৮১), 'বিজ্ঞান ভাগ্য' (১৯৮২), 'পরিবেশ ও প্রকৃতি' (১৯৮২), 'অন্বেষা' (১৯৮৩), 'অণুবীক্ষণ' (১৯৮৩), 'চেতনা' (১৯৮৪), 'বিজ্ঞান মানস' (১৯৮৭) প্রভৃতি। এর মধ্যে 'বিজ্ঞানমেলা' এবং 'কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান পত্রিকা' কোন বিজ্ঞান সংগঠনের পত্রিকা ছিল না। অমিত চক্রবর্তীর সম্পাদনায় ১৯৮১তে আত্মপ্রকাশ করে ছোটদের পত্রিকা 'বিজ্ঞানমেলা'। আর ঐ বছরই শৈব্যা প্রকাশন থেকে রবীন বলের সম্পাদনায় বের হয় কিশোর পাঠ্য -'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' যা এখনো নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। 'বিজ্ঞানমেলা', সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর '৯০ এর দশকে 'দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল' — এর প্রকাশনার ভার গ্রহণ করেছে। তবে এটা এখন শুধু আর ছোটদের পত্রিকা নয়। বিজ্ঞান মেলায় বিজ্ঞানের গুরু গম্ভীর বিষয় থেকে কল্পবিজ্ঞান পর্যন্ত সবকিছুই প্রকাশিত হচ্ছে। সাংগঠনিক পত্রিকা '৯০ এর দশকে যারা সাড়া জাগিয়েছে তাদের মধ্যে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'উৎস মানুষ' (১৯৮০), তৃপ্তি চৌধুরীর সম্পাদনায় মাসিক 'মুখপত্র গণদর্পণ' (১৯৮৮), 'স্বাস্থ্য ও পরিবেশ' (১৯৮৮), 'মানবমন' (১৯৬১), 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' (১৯৪৮) প্রভৃতি

উল্লেখ্য। বিভিন্ন জেলা থেকে বিজ্ঞানের পত্র পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে 'টপকোয়ার্ক', 'গণবিজ্ঞান চেতনা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র প্রকাশ করে 'গণবিজ্ঞান বার্তা'। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পত্রিকা 'এ যুগের কিশোর বিজ্ঞানী', ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির পত্রিকা 'প্রকৃতি' প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বাজারের চাহিদা মেটাতে স্বাস্থ্যবিষয়ক এবং কম্পিউটার ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত পত্রিকা এই '৯০ এর দশক থেকে প্রকাশিত হয়ে আজ ২১ শতকেও সমানভাবে বিরাজ করছে। এদের মধ্যে 'কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক্স জগৎ', 'কম্পিউটার - তথ্যপ্রযুক্তি' (১৯৯৫), 'প্রযুক্তি' (১৯৯৬) প্রভৃতি প্রযুক্তিসংক্রান্ত পত্রিকা এবং 'স্বাস্থ্য বিজ্ঞান', 'সুস্বাস্থ্য', 'সুস্থ' প্রভৃতি স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা উল্লেখযোগ্য।

জনমানসে বিজ্ঞান প্রচারে বিজ্ঞানের পত্র পত্রিকার পাশাপাশি সংবাদপত্র যে একটা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে তা আমরা বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দেখেছি। ১৯৫০-এ বুজরুকির ভগীরথ 'নেপাল বাবার' বিরোধিতা করে আনন্দবাজার পত্রিকা। তারপর বিভিন্ন সময়ে যুগান্তর, বর্তমান, গণশক্তি, কালান্তর, সংবাদ প্রতিদিন প্রভৃতি সংবাদপত্র বিজ্ঞান প্রচারে এবং কুসংস্কার দূর করতে মাঝেমধ্যে তাদের অবদান রেখেছে। তবে যুগান্তরের মত পত্রিকা ধর্মকর্ম পাতায় অলৌকিকতা প্রকাশ করে বিজ্ঞান বিরোধী কাজও করেছে। আবার পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়ে বিভিন্ন সংবাদপত্র মানুষকে বিজ্ঞানসচেতন করে তুলে গ্রহণ দেখতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

আজ ২১ শতকে বাংলা সংবাদপত্র গুলোর মধ্যে বিজ্ঞানের পাতা প্রকাশ করার প্রবণতা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। 'আজকাল' তার কাগজে বিজ্ঞানের বিশেষপাতা 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' বন্ধ করে দিয়েছে। সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা পত্রিকা, 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' বিজ্ঞানের কোন বিশেষ পাতা নেই। মাঝে মধ্যে রবিবারে আনন্দমেলা বা রবিবাসরীয়তে বিজ্ঞানের খবর বা বিজ্ঞান ফিচার চোখে পড়ে। তবে সেই সংখ্যাও ক্রমশ কমে আসছে। সংবাদ প্রতিদিন প্রতি শনিবার 'অনুসন্ধান' নামে বিশেষ বিজ্ঞানের পাতা প্রকাশ করে। কিন্তু তার পরিসর এত কমে আসছে যে তাতে কতটা বিজ্ঞানের খবর থাকছে তা অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণশক্তি পত্রিকা প্রতি সোমবার 'বিজ্ঞানের খবর' নামে, বর্তমান পত্রিকা প্রতি মঙ্গলবার 'বিজ্ঞান বিচিত্রা' নামে এবং কালান্তর পত্রিকা প্রতি সোমবার 'প্রকৃতি ও মানুষ' নামে বিশেষ বিজ্ঞানের পাতা প্রকাশ করে চলেছে। এদের মধ্যে বর্তমান পত্রিকায় বিজ্ঞান অপেক্ষা বোধ হয় বিজ্ঞাপনকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনের জন্য মাঝে মাঝে বিজ্ঞানের এই বিশেষ পাতাটি প্রকাশিত হয় না। সেদিক থেকে গণশক্তি এবং কালান্তর পত্রিকা বিজ্ঞানের পাতা প্রকাশের ব্যাপারে অনেকটাই কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। তবে

বিজ্ঞাপনের হাত থেকে এরাও যে নিজেদের রক্ষা করতে পারেননি, তা এদের বিশেষ বিজ্ঞানের পাতায় বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ স্থান দেখে বোঝা যায়। বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে বিজ্ঞান জ্ঞাপনের ইতিহাস যে বহু প্রাচীন তা এতক্ষণের আলোচনায় হয়তো কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে। পরিবর্তিত হয়েছে বিজ্ঞান জ্ঞাপনের চরিত্র। শুধু বিজ্ঞানের পাতাই নয় গোটা সংবাদপত্রের চরিত্রই ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। প্রথম যুগের সংবাদপত্রের উত্তরসূরীরা সাপ্তাহিক থেকে দৈনিক, মাসিক থেকে পাক্ষিক, খবরের ডালি সাজিয়ে যেমন আমাদের সামনে হাজির তেমনি তাদের ইন্টারনেট সংস্করণও, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নতির পক্ষেই কথা বলে। এদের মূল কাজ হচ্ছে সংবাদ জ্ঞাপন করা, তা সে যতই চরিত্র বদল হোক। এই জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে তথ্য প্রদান, শিক্ষাদান, সামাজিকীকরণ, বিনোদন, প্রণোদন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সংহতি, বিতর্ক- আলোচনা প্রভৃতি ঘটে চলেছে। সংবাদপত্র মানে শুধু দৈনিক বা সাপ্তাহিক নয়। পাক্ষিক এমনকি মাসিকও হতে পারে। দ্বিতীয় প্রেস কমিশন (১৯৭৮-১৯৮২) বিষয়টিকে বাস্তবসম্মত ও সুস্পষ্ট করতে বলেছিলেন। কমিশনের সুপারিশ ছিল এই আইনে নিউজপেপার নামের আওতায় সব ধরণের প্রকাশনাকে না এনে তিনটি বিভাগ করা হোক — দৈনিক সংবাদপত্র, সংবাদ ম্যাগাজিন ও সাময়িকী।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই যুগে বিজ্ঞানের আলোচনা ছাড়া কারোর পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। মানুষ নিজের অজান্তেই বিজ্ঞানের অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। সে হতে পারে স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা, হতে পারে আবহাওয়া সংক্রান্ত খবর, কৃষি কিম্বা নদীর কথা, অথবা আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত খবর (ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, তথ্যসুপার হাইওয়ে)। কোন্‌টা বিজ্ঞান, কোন্‌টা কুসংস্কার বা অবিজ্ঞান তা নিয়েও মানুষের জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। লোকে বলে যুগটা নাকি তথ্য প্রযুক্তির। হাতের মুঠোয় রয়েছে জ্ঞান বিজ্ঞানের তথ্য; আসলে গাল ভরে যতই বলি সস্তা, 'ইন্টারনেট' ঘরে আনা গড়পরতা বাঙালীর আর্থিক সামর্থে কুলোয় না। তাই সংবাদ পত্র বা সাময়িক পত্রকে আগে যেমন বিজ্ঞান জ্ঞাপন নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে হয়েছে, এখন ২১ শতকেও সেই ভাবনা কোন অংশে কমেনি, বদলেছে ভাবনার রকমফের।

২১ শতকের বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের বিজ্ঞান জ্ঞাপনের প্রেক্ষাপট হচ্ছে স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ের বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রয়াস। এই প্রয়াস ক্রমশ বাড়তে বাড়তে ৮০ এবং ৯০ এর দশকে চূড়ান্ত রূপ নেয়। এদের মধ্যে বিজ্ঞান ক্লাব (৫০-৬০ এর দশকে) আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ১৯৮৭ সালে 'ভারত জনবিজ্ঞান জাঠা', ১৯৮৮ সালে 'সারাভারত জনবিজ্ঞান নেটওয়ার্ক' নামে জাতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর এই সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

হয়েছে। ১৯৯২ সাল থেকে এক বছর অন্তর এই সম্মেলন হচ্ছে সকলের জন্য স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানীয় জল, কুসংস্কার মুক্ত দুনিয়া প্রভৃতি এই সম্মেলন গুলোর উদ্দেশ্য। ১৯৯৩ সালে নারী দিবসের দিন (৮ মার্চ) মহিলাদের 'জ্ঞান বিজ্ঞান জাঠা' বা 'সমতা জাঠা' তৈরি হয়। ১৯৯৪ সালে 'ঐক্য ও অগ্রগতি জাঠা' তথা 'সাইকেল জাঠা' অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া চিপকো আন্দোলন, সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন প্রভৃতি মানুষের মধ্যে সচেতনতা বোধ জাগ্রত করে; মানুষ সবকিছুই যুক্তির কষ্ঠিপাথরে যাচাই করে তবেই তা গ্রহণ করে — যা বিজ্ঞান সচেতনতার অন্যতম লক্ষণ।

গত ৩-৪ দশকে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে বিজ্ঞান তত্ত্ব বা তথ্যাদির পাশাপাশি পরিবেশ বা মানবজগতে বা জীবজগতে তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিষয়ের মূল্যায়ন থাকছে। শরীর - স্বাস্থ্য - ওষুধ - অসুখ বিসুখ নিয়ে একধরণের পত্রিকা বেরোচ্ছে যা সাধারণভাবে শিক্ষিত যে কেউ পড়তে পারে; প্রচার বা আন্দোলনমূলক কাজে ব্যবহার করতে পারে। সাক্ষরতার পাশাপাশি বিজ্ঞান সাক্ষরতার কথাও উঠে এসেছে। জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারমূলক পত্রিকাগুলোতে - কৃষি, কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প, পরিবেশ সংরক্ষণশীল উন্নয়ন ভাবনা, জীববৈচিত্র্য রক্ষা, নদী জলাশয় বাঁচানো, মাছের ও জলজ প্রাণীর জীবন ধারণ, বড় বাঁধের পরিবেশ ক্ষয় ও উচ্ছেদ, শব্দ-বায়ু-জল-মাটি দূষণ রোধ, কারখানার বর্জ্য পদার্থের পরিবেশ দূষণ, বিপুল জনসংখ্যার ভার, নিষিদ্ধ ওষুধ ব্যবহার, বিশ্বায়নের ও ভোগবাদের সর্বনাশা বিপর্যয়, সবুজায়নের স্বপ্ন, ভূগর্ভের জলসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদের যথার্থ ব্যবহার (পুনর্নবীকরণ ভাবনা), জঞ্জাল থেকে সার, সমুদ্র দূষণ, পরিবেশের উষ্ণতা বৃদ্ধি, মেরু প্রদেশে মানুষের আগ্রাসন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে পরমাণু অস্ত্র ধ্বংস; এমন হাজারো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সামাজিক ভাবনা ও বৃহত্তর মানব সমাজ তথা পৃথিবীকে জীব বসবাসের লক্ষ্যে চিরস্থায়ী করতে অশুভ সব কিছুর বিরুদ্ধে জনমত জাগরণের লক্ষ্যেই বিজ্ঞানের পত্রপত্রিকা কাজ করে চলেছে। কয়েকটি সংবাদ পত্রও এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে; কিন্তু দায়িত্ব কারো একার নয়; মানুষকে বিজ্ঞান সচেতন করতে, বিজ্ঞান তথ্য সমৃদ্ধ করে তুলতে প্রতিটি গণমাধ্যমের অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া উচিত। আর তার একটা বড় অংশীদার সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের ভূমিকা কম নয়; যতই কেব্‌ল চ্যানেল আসুক, যতই ইন্টারনেটের দাপট শুরু হোক সাধারণ বাঙালী পাঠক আজও কিন্তু নিজের দৈনিক সংবাদপত্রে বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান খবরটি আশা করেন। তাই বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা কুসংস্কার বিরোধী বিজ্ঞান আলোচনা থেকে পাঠককে বঞ্চিত ক'রে, সংবাদপত্র তার দায় এড়িয়ে যেতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, "একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হইবে দুইজনে" সংবাদপত্র-সাময়িক পত্র এবং পাঠকের মিলিত চেষ্টায় বিজ্ঞান জ্ঞাপন আরও প্রসারিত হতে পারে।

সূত্রনির্দেশ

১। ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ সংস্করণ, কলকাতা, মে, ১৯৮১।

২। প্রদীপ বসু (সম্পাদিত), সাময়িকী - পুরনো সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ সংকলন, প্রথম খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, মে, ১৯৯৮।

৩। রতন মোহন খাঁ (সম্পাদিত), সেরা জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলকাতা, কলকাতা পুস্তক মেলা, ২০০২।

৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (সংকলন ও সম্পাদিত) সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খন্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, চৈত্র ১৩৭৭।

৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (সংকলন ও সম্পাদিত) সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খন্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, আষাঢ়, ১৩৮৪।

৬। অঞ্জন বেরা, সংবাদ থেকে সংবাদপত্র, ক্যালকাটা জার্নালিস্ট ক্লাব, কলকাতা, কলকাতা পুস্তক মেলা, ১৯৯৮।

৭। সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান আন্দোলন ঃ অতীত - বর্তমান - ভবিষ্যৎ, রাহুল রায় (সম্পাদিত), 'পশ্চিমবঙ্গ ফিরে দেখা' প্রতীতি, হুগলী, জানুয়ারি, ২০০৩।

৮। দিলীপ বসু, স্বাধীনতা - উত্তর ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণা এবং ভারতীয় প্রযুক্তির গতিপথ, পশ্চিমবঙ্গ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ - পঃ সঃ, কলকাতা, এপ্রিল, ১৯৯৯।

৯। অপরাজিত বসু, সম্পাদিত, ভারতের ইতিহাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলকাতা, সাল ?

১০। আনন্দবাজার পত্রিকা (৪,১০,১৫ ও ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৫০)।

১১। উৎস মানুষ, জানুয়ারি, ১৯৮৫।

১২। যুবমানস, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংখ্যা যুবকল্যাণ দপ্তর - পঃ সঃ, কলকাতা, মে-জুন, ২০০০।

১৩। সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞান আন্দোলন বিষয়ক ইতিহাস ও তথ্য পর্যালোচনা, ধারাবাহিক পর্ব ১-৮, উৎস মানুষ, জানুয়ারি, ২০০০ থেকে আগষ্ট, ২০০১।

১৪। দীপক ভট্টাচার্য, বাংলা সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৯৫।

১৫। রবীন বল, বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৯৬।

১৬। তপন চক্রবর্তী, শতবর্ষে বাঙালির বিজ্ঞান চর্চা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, মার্চ, ২০০১।

১৭। বিনয়ভূষণ রায়, উনিশ শতকের বাংলায় বিজ্ঞান সাধনা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৮৭।

১৮। জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বিজ্ঞান সাহিত্য সংখ্যা, কলকাতা, এপ্রিল - মে, ১৯৮৫।

১৯। জন বিজ্ঞান পরিচয়, প্রথম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ, বীরভূম, ডিসেম্বর, ১৯৯৪।

২০। জনবিজ্ঞান পরিচয়, দ্বিতীয় খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ, বীরভূম, নভেম্বর, ১৯৯৫।

২১। নন্দন, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান আন্দোলন, ডিসেম্বর, ২০০০।

২২। প্রগতিবার্তা, বিশেষ জনবিজ্ঞান সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৮৩।

২৩। জ্ঞান বিচিত্রা (উৎসব সংখ্যা ১৯৯৭, জানুয়ারি - ২০০০), ত্রিপুরা।

২৪। শ্যামল চক্রবর্তী, সীমানা পেরিয়ে, এন. ই. পাবলিশার্স, ২০০০।

২৫। পিনাকী ভাদুড়ী, সম্পাদিত, দুই শতকের নির্বাচিত বিজ্ঞান চিন্তা, বুক ট্রাষ্ট, কলকাতা, ১৯৯৭।

২৬। তপন চক্রবর্তী (বাংলাদেশ) ও ভবানী প্রসাদ সাহু (পশ্চিমবঙ্গ), (সম্পাদিত ও সংকলিত) দুই বাংলার কুসংস্কার বিরোধী বিজ্ঞান চিন্তা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৩।

২৭। দিলীপ কুমার সিংহ, বিজ্ঞান ঃ শিক্ষা ও চর্চা সাম্প্রতিক ভাবনা চিন্তা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, অক্‌টোবর, ২০০০।

২৮। রতন ভট্টাচার্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য ভাবনা এবং বিজ্ঞান মনস্কতা, ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৯৯।

২৯। শ্যামল চক্রবর্তী, বিজ্ঞান এভাবেই এগোয়, দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০১।

৩০। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞান, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯৯।

বাঙালীর চলচ্চিত্র চর্চার ইতিহাস (১৯২৯ - ২০০০)

মানবেন্দ্রনাথ সাহা

বাঙালির চলচ্চিত্র চর্চার যথার্থ আরম্ভ পঞ্চাশের দশকে হলেও এর প্রাথমিক উদ্ভব সম্ভাবিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের অনুভূত সত্যে। রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্র বোধ যে কত গভীর ছিল, তা জানা যায় তাঁর একটি চিঠি থেকে। শিশির কুমার ভাদুড়ীর ছোট ভাই মুরারী ভাদুড়ী ১৯২৯ সালে তাঁর কাছে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে মতামত জানতে চান, তাঁর উত্তরে রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি। যাকে প্রবন্ধও বলা যেতে পারে। যেখানে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"উপকরণের বিশেষত্ব অনুসারে কলারূপেরও বিশেষত্ব ঘটে। আমার বিশ্বাস ছায়াচিত্রকে অবলম্বন করে যে নূতন কলারূপের আবির্ভাব প্রত্যাশা করা যায় এখনো তা দেখা দেয়নি।" চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি জানালেন— 'ছায়াচিত্রের প্রধান জিনিষটা হচ্ছে দৃশ্যের গতিপ্রবাহ। এই চলমান রূপের সৌন্দর্য্য বা মহিমা এমন করে পরিস্ফুট করা উচিত যা কোন বাক্যের সাহায্য ব্যতীত আপনাকে সম্পূর্ণ সার্থক করতে পারে।

"সুরের চলমান ধারায় সঙ্গীত যেমন বিনা বাক্যেই আপন মাহাত্ম্য লাভ করতে পারে তেমনি রূপের চলৎ প্রবাহ কেন একটি স্বতন্ত্র রসসৃষ্টি রূপে উন্মেষিত হবে না?"

রবীন্দ্রনাথ যখন কথাগুলি জানাচ্ছেন তখন বিশ্ব চলচ্চিত্রে শ্রেষ্ঠ নির্বাক ছবিগুলি নির্মিত হয়ে গেছে। আইজেনস্টাইন বানিয়েছেন 'ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন', গ্রিফিথ, চ্যাপলিন (গোল্ডরাস ১৯২৫) অসাধারণ সব ছবি বানিয়েছেন (১৯২৫)। কিন্তু ভারতবর্ষে (বার্থ অফ এ নেশন - ১৯১৫) নির্বাক ছবির করুণ অবস্থা। নির্বাক ছবি নির্মিত হ'চ্ছে শুধু সাহিত্যের চিত্ররূপ হিসেবে। চলচ্চিত্রের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ আমাদের ভাবিত করে, অবাক করে দেয়, রবীন্দ্রনাথ কি আয়াস অনুভূত সত্যে চলচ্চিত্রের প্রধান কথাগুলি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। সূত্রকারে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা হ'লো - ১. কলাতন্ত্রে স্বাতন্ত্র্যের সাধনা, ২. ছায়াচিত্র সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলেছে, ৩. ছায়াচিত্রের আয়োজন আর্থিক মূলধনের অপেক্ষা রাখে, ৪. চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা দরকার, ৫. সৃষ্টিকার এবং জনসাধারণ উভয়েই যোগ্য চলচ্চিত্র সৃষ্টি না হওয়ার জন্য দায়ী। নির্বাক ও সবাক ভারতীয় চলচ্চিত্রের দুর্বল নির্মাণের সময়ে (১৯২৫-১৯৫০) বাংলা চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ বা সমালোচনার কোন ক্রম বা ঘরানা তৈরি হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে এ সময়ের চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন নীতিন বসু, ডি. জি. গাঙ্গুলী, নরেশচন্দ্র মিত্র, শিশির কুমার ভাদুড়ী, মধু বসু, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, দেবকী কুমার

বসু চলচ্চিত্র বিষয়ে কিছু রচনা লিখেছেন। যার ঐতিহাসিক মূল্য থাকলেও রচনার দিক থেকে সেগুলি উল্লেখ নয়।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে মূলত সমকালীন বিখ্যাত সাহিত্যিকেরা চলচ্চিত্র চর্চায় অগ্রণী হয়ে বাংলা চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধের একটা নিটোলতা সৃষ্টির প্রয়াস করেন। যদিও তাঁরা কেউই খাঁটি চলচ্চিত্র সমালোচক ছিলেন না। তবু তাঁদের আলোচনা একটা ঘরানা তৈরি করতে পেরেছিল। যেমন - অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'সিনেমা সাহিত্য' (চিত্রপঞ্জী/১৯৩৩), নরেন্দ্রদেবের 'ছায়ানাটিক' (বাতায়ন/১৯৩৪) গজেন্দ্রকুমার মিত্রর 'চিত্রনাট্য রচনা' (বাতায়ন/১৯৩৪)। এর বছর দশ-বারো পর আমরা পাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ছবির গল্প আর গল্পের ছবি' (চিত্রবাণী/১৯৫৪), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বারোয়ারী শিল্প' (১৯৪৩), কমলকুমার মজুমদারের 'চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার' (১৯৫১) প্রভৃতি। এছাড়া এই সময়ে বাংলায় সিনেমার দুটি পত্রিকা 'উল্টোরথ' ও 'প্রসাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে চলচ্চিত্র বিষয়ে নানা নিবন্ধ, সমালোচনা ও প্রবন্ধ। সবগুলি সিরিয়াস না হ'লেও চলচ্চিত্র চর্চায় এদের ভূমিকা ও অবদান উপেক্ষিত নয়।

চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় সত্যজিৎ রায়

বাংলা চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় সত্যজিৎ রায় একটি উল্লেখ্য নাম। তাঁর রচিত বাংলা চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধগুলি মূলত আছে 'বিষয় চলচ্চিত্র' গ্রন্থে। মোট আঠারোটি প্রবন্ধে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। বিষয়গত দিকের সঙ্গে আঙ্গিকের আলোচনাকেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। চলচ্চিত্রকার রূপে তাঁর নিজস্ব দর্শনও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর এই সব প্রবন্ধে। রচনারীতির দিক থেকে এই রচনাগুলি অসাধারণ। যার একমাত্র তুলনা তাঁর রচিত ইংরেজি প্রবন্ধ গ্রন্থ - 'Our Films Their Films'। বিষয় চলচ্চিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হ'লো—'চলচ্চিত্রের ভাষা ঃ সেকাল ও একাল', সোভিয়েত চলচ্চিত্র, প্রবন্ধ গ্রন্থের চলচ্চিত্র রচনা ঃ আঙ্গিক, ভাষা ও ভঙ্গি, ডিটেল সম্পর্কে দু'চার কথা পরিচালকের দৃষ্টিতে সমালোচক, অপুর সংসার প্রসঙ্গে, চারুলতা প্রসঙ্গে প্রভৃতি। প্রবন্ধগুলি ষাট ও সত্তর দশকের রচনা। প্রকাশিত হয়েছে দেশ, আনন্দবাজার, শারদীয় আনন্দলোক, মধ্যবিত্ত, পরিচয়, চলচ্চিত্র বেতার জগৎ, পত্রিকায়।

চলচ্চিত্রের শিল্পস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন — 'চলচ্চিত্রে যে অন্য শিল্প সাহিত্যের লক্ষণ আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নাটকের দ্বন্দ্ব, উপন্যাসের কাহিনী ও পরিবেশ বর্ণনা, সংগীতের গতি ও ছন্দ, পেইন্টিং সুলভ আলোছায়ার ব্যঞ্জনা, এ-সবই চলচ্চিত্রে স্থান পেয়েছে। কিন্তু ইমেজ ও ধ্বনির যে ভাষা, দেখানো ও শোনানোর বাইরে যার প্রকারণ নেই, সে একেবারে স্বতন্ত্র ভাষা। এভঙ্গি চলচ্চিত্রের বিশেষ ভঙ্গি। তাই অন্য শিল্প-সাহিত্যের লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও চলচ্চিত্র অনন্য' (চলচ্চিত্র রচনা ঃ আঙ্গিক ভাষা ও

ভঙ্গি)। এ 'চলচ্চিত্রের ভাষা ঃ সেকাল ও একাল' প্রবন্ধে সত্যজিৎ ইউরোপ ও আমেরিকার চলচ্চিত্রের ভাষা, ইমেজ, আঙ্গিক নিয়ে আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছেন গ্রিফিথ, পুদোভকিন, জাঁ রেনোয়া, গদার, চ্যাপলিন, ওজু ও ক্রফোকে। এঁদের ছবির মূল দর্শন ও কৌশলটিকে সরলভাবে পরিচিত করে দেবার চেষ্টা তিনি করেছেন। সত্যজিতের 'চারুলতা' ছবির সমালোচনা 'পরিচয়' পত্রিকায় (১৯৬৪) করেছিলেন অশোক রুদ্র। তারই জবাবী প্রবন্ধ 'চারুলতা প্রসঙ্গে'। এখানে সত্যজিৎ 'চারুলতা' সম্পর্কে বলছেন— 'সিনেমার আঙ্গিকের খাতিরে এই সব অবশ্য পরিবর্তন ও পরিবর্জনের ফলে যা দাঁড়াল তার সঙ্গে মূলের মিল বা বেমিল কতখানি সেটাই বিবেচ্য।' সত্যজিৎ এখানে যথার্থ যুক্তি দিয়ে অশোক রুদ্রের অভিযোগ খন্ডন করে দেখিয়েছেন চলচ্চিত্রের ভাষার স্বাতন্ত্র্য। দেখিয়েছেন 'নষ্টনীড়' থেকে কাহিনী নিয়ে, তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেও নিজস্ব অবস্থান সুনির্দিষ্ট করেছেন। 'অপুর সংসার' প্রসঙ্গে তিনি জানান 'সাহিত্যিকের কল্পনা লিখিত ভাষায় ব্যক্ত; পরিচালকের কল্পনা মূলত গতিশীল ছবির মাধ্যমে পরিস্ফুট। দুই-এ যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য সমালোচক কি সেটি বোঝেন না? উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে আজ অবধি এমন কোন সার্থক চলচ্চিত্র রচিত হয়নি, যেখানে পরিচালককে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি।' এর বাইরে সত্যজিৎ ইংরেজি ও বাংলায় চলচ্চিত্র বিষয় অনেক রচনা ও নিবন্ধ লিখেছেন। সত্যজিৎরায়ের সিনেমার প্রধান দর্শন মানবতাবাদ যা নয়া বাস্তবতাবাদের ভারতীয়ানার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে সত্যজিৎ সেই দৃষ্টিকোণকে প্রধান করেছেন। সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্ককে তিনি গ্রহণ করেছেন সংঘাতে নয়, সামঞ্জস্যের মধ্যে দিয়ে।

বাংলা চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় একটা প্রধান ধারা যেখানে চলচ্চিত্র পরিচালকেরা প্রবন্ধ রচনা করেছেন - যার দ্বারা তাঁদের সৃষ্টির মানসিকতা বোঝা যায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, অপর্ণা সেন, এই ধারার উল্লেখযোগ্য লেখক। ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম 'চলচ্চিত্র, মানুষ এবং আরো কিছু' (১৩৮২)। তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধগুলি হলো - শিল্প ও সততা, নাজারিন ও লুই বুনুয়েল (১৯৬৪), ভারতবর্ষে ছবি করার তাৎপর্য চলচ্চিত্রের স্বরূপ কি? আমার ছবি, একমাত্র সত্যজিৎ রায়, শিল্প, ছবি ও ভবিষ্যৎ, চলচ্চিত্র, সাহিত্য ও আমার ছবি। ইংরেজিতেও তিনি লিখেছেন, যেমন -Bengali Cinema; Literary influence, The Film and I প্রভৃতি। 'আমার ছবি প্রবন্ধে তাঁর শিল্পের দর্শন প্রকাশ পায়—'আমরা এক লক্ষ্মী ছাড়া জীর্ণ' বাংলাকে আঁকড়ে ধরে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলাম। এ কোন্ বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য আর নীতিহীনতা আমাদের নিত্যসঙ্গী; যেখানে কালোবাজারী আর অসৎ রাজনৈতিকের রাজত্ব, যেখানে বিভীষিকা আর দুঃখ মানুষে

নিয়তি। আমি যে কটি ছবিই শেষের দিকে করেছি, কল্পনা ও ভাবে এই বিষয় থেকে মুক্ত হতে পারিনি। আমার সবচেয়ে যেটা জরুরী বলে বোধ হয়েছে সেটা বাঙালীকে নিজের অস্তিত্ব নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা। শিল্পী হিসাবে সর্বদাই সৎ থাকতে চেষ্টা করেছি।'

সিনেমার ভবিষ্যৎ' মৃণাল সেনের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। তপন সিংহ লিখেছেন - 'চলচ্চিত্রের চালচিত্র' তরুণ-মজুমদার' কেমন ছবি করতে চাই' অপর্ণা সেনের নির্জন দ্বীপের ছবিকে' ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বলা যেতে পারে। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর উল্লেখযোগ্য তিনটি প্রবন্ধ হ'লো - ছবি কেন করি, সাহিত্য, সিনেমা ও চিত্রনাট্যের ভাষা সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে একটি লেখার খসড়া। বুদ্ধদেব তাঁর চলচ্চিত্র ভাবনার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন - 'সিনেমার কোন দায় নেই আদুরে ছেলে বা নাতির মত সাহিত্যের কাঁধে চেপে ঘুরে বেড়ানোর।' 'ছবি কেন করি'তে তিনি বললেন - 'অনেককেই ইদানীং বলতে ও লিখতে দেখেছি কবিতার সঙ্গে আমার সিনেমার কোথাও মিল খুঁজে পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে। আমার নিজের কাছেও ছবির নির্মাণের কারিগরী দিকটিতে ছবির মূল কেন্দ্রে কবিতার সংকেতগুলো জানান না দিয়ে ঢুকে পড়ুক এমন দাবি আমার থাকে। যদিও সিনেমাকে এসব ছাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত সিনেমা হয়ে উঠতেই হয় এবং কবিতাকে কবিতা।'

সাহিত্য, সিনেমা ও চিত্রনাট্যের ভাষা' প্রবন্ধে তিনি পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরতে গিয়ে বললেন — 'চিত্রনাট্য লেখার জন্য জানতে হয় সিনেমার ভাষা, সাহিত্যের ভাষা থেকে যা বহু যোজন দূরে। শুধু শব্দ দিয়ে চিত্রনাট্য লেখা যায় না। চিত্রনাট্য মূলত লিখতে হয় ইমেজ বা দৃশ্য দিয়ে।' ঋতুপর্ণ ঘোষের প্রবন্ধ 'বাংলা সিনেমায় এখনও নিরুপায় মধ্যবিত্ত জীবনের গল্প' উল্লেখের দাবী রাখে।

বাংলা চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিকদের মধ্যে আছেন অনেকেই। পঞ্চাশের দশক থেকে যাঁরা লিখছেন তাঁরা হলেন চিদানন্দ দাশগুপ্ত, সেবাব্রত গুপ্ত, পূর্ণেন্দু পত্রী, নির্মাল্য আচার্য্য, শঙ্করী প্রসাদ বসু, হরিসাধন দাশগুপ্ত প্রমুখ, ষাট ও সত্তর দশকে লিখছেন ধীমান দাশগুপ্ত, বীরেশ ঘোষ, দিলীপ রায়, প্রলয় শূর, নির্মল ধর, ধ্রুবগুপ্ত, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, গাঁস্ত রোবের্জ, রজত রায়, শতদ্রু চাকী, সুধীর চক্রবর্তী, পার্থ রাহা প্রমুখ। আশি ও নব্বইয়ের দশক থেকে যাঁরা নিয়মিত চলচ্চিত্র সমালোচনা করছেন এবং প্রবন্ধ লিখছেন, গ্রন্থ প্রকাশ করছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য — অনিরুদ্ধ ধর, অতনু চক্রবর্তী, নন্দন মিত্র, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ রায়, সত্যজিৎ চৌধুরী, বিভাস চক্রবর্তী, সোমেশ্বর ভৌমিক, দিব্যেন্দু পালিত, মিহির ভট্টাচার্য, মৈনাক বিশ্বাস, মৃগাঙ্কশেখর রায়, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমা চট্টোপাধ্যায়, সোমেন ঘোষ, সুমন্ত বন্দোপাধ্যায়, শতরূপা সান্যাল, সুনেত্রা ঘটক, সতীনাথ চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র বিষয়ে যথার্থ প্রবন্ধ রচনা করে তাকে শিল্পিত

করে তুলেছেন এই সব লেখক সমালোচকেরা। চলচ্চিত্র চর্চা যে বাঙালীর সংস্কৃতি চর্চাকে অনেকখানি পরিণত করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাঙালীর মননচর্চার অন্যতম সঙ্গী যে আজ চলচ্চিত্র, তার কৃতিত্ব এই সব প্রাবন্ধিকদের। যাঁরা দেখিয়েছেন চলচ্চিত্র শুধুমাত্র প্রমোদ উপকরণ নয়, বুদ্ধিবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উদ্বোধনের উজ্জীবনী উপকরণে ব্যাপ্ত এক শিল্পমাধ্যম। চলচ্চিত্রকে বিভিন্ন ধারায়, বৈচিত্র্যে, দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন তাঁরা। আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতির সমস্ত বোধে জারিত এক শিল্প চলচ্চিত্র।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত গোটা দুয়েক চলচ্চিত্র পরিচালনা (বিলেত ফেরত, আমোদিনী) করলেও মূলত তাঁর পরিচয় চলচ্চিত্র সমালোচকরূপে। চলচ্চিত্রের বিভিন্নদিক নিয়ে তিনি লিখেছেন। তার মধ্যে আছে সমালোচনার দায় ও দায়িত্ব, চলচ্চিত্রের শতবর্ষ প্রভৃতি। পূর্ণেন্দু পত্রী লিখেছেন সত্যজিতের চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে। চলচ্চিত্র চর্চায় আবশ্যিক উল্লিখিত নাম - আশীষ বর্মন এখনো লিখছেন। গাঁস্ত রোবের্জ আরেকটি উল্লেখ্য নাম। লিখেছেন - সিনেমা ও টেলিভিসন, আইভান দ্য টেরিবল্ ঃ নন্দন তত্ত্ব প্রভৃতি। ধ্রুব গুপ্ত লিখেছেন - সত্যজিৎ চলচ্চিত্রে নারী, সৃষ্টি, ব্যক্তিত্ব, আইজেনস্টাইন নিয়ে। লাতিন আমেরিকার চলচ্চিত্র ভাবনা নিয়ে ধ্রুব গুপ্ত বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। সত্যজিতের নারী সম্পর্কে ধ্রুব গুপ্ত বলেন — 'এই নব মানবতাবাদ থেকে সত্যজিতের নারী ধারণা বোধ হয় খুব একটা দূরে নয়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে নারীমুক্তির যে আদর্শ বাংলার নবজাগরণ থেকে সত্যজিৎ রায় উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন তার ভেতরে অনেক অসম্পূর্ণতা ছিল।' পার্থ রাহার উল্লেখযোগ্য দু'টি প্রবন্ধ 'চলচ্চিত্রের কবিতায় সত্যজিৎ', 'সত্যজিতের চোখে রবীন্দ্রনাথ'। পার্থ রাহা বলেন - 'পথের পাঁচালী থেকে 'অপুর সংসার' এই দারিদ্র আছড়ানো বাংলার প্রতিচ্ছবি। বিভূতিভূষণের নিশ্চিন্দিপুর এখানে আরও ধূসর, আরও নির্মম, তবু জেগে থাকে কাশফুল ভরা মাঠ, জীবনের যুদ্ধে পরাজিত না হবার অদম্য অভীপ্সা। রাধাপ্রসাদ গুপ্তের চলচ্চিত্র প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য 'বায়োস্কোপ! বায়োস্কোপ!' সত্যজিৎ চৌধুরীর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ - 'চলচ্চিত্রবিদ্যা ঃ এদেশে এবং বিদেশে' দেশে বিদেশে চলচ্চিত্র বিদ্যার প্রসার ও চর্চা নিয়ে খুবই গবেষণামূলক রচনা এটি। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় সত্যজিৎ এর চলচ্চিত্র চর্চার একজন গবেষক। লিখেছেন - চলচ্চিত্র, সমাজ, সত্যজিৎ, চিত্রনাট্যে স্বাধীনতা ঃ সত্যজিৎ রায় প্রভৃতি প্রবন্ধ। ধীমান দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে আছে — চলচ্চিত্র বোধ বা ফিল্ম সেন্স, সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্র শৈলী, আইজেনস্টাইনের আপেক্ষিকতা, নবপ্রজন্মের বাঙালি পরিচালক ও বাংলা ছবি প্রভৃতি। প্রলয় সুরের প্রবন্ধ - কালের কণ্ঠস্বর ঃ উৎপলেন্দু চক্রবর্তী ও সুনেত্রা ঘটক লিখেছেন 'সত্যজিৎ রায় ঃ তথ্যচিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র'।

সংগীতের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্কের কথা সর্বজনবিদিত। রবীন্দ্রনাথও তাঁর রচনায় সেকথা বলেছেন। চলচ্চিত্র চর্চায় গান নিয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অন্যতম সুধীর

চক্রবর্তী তার প্রবন্ধ 'সত্যজিৎ রায় - সঙ্গীতবীক্ষা ও সোমেন ঘোষ লিখেছেন - ভারতীয় সিনেমায় নৃত্য-গীত, বনরাজ ভাটিয়া লিখেছেন - সত্যজিতের সংগীত ভাবনা, চারুলতা। অতনু চক্রবর্তী সিনেমা ও গান নিয়ে গবেষণাধর্মী কাজে লিপ্ত আছেন।

চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় অর্থনীতিক দৃষ্টিতে বিচার করেছেন - সোমেশ্বর ভৌমিক। এ বিষয়ে তাঁর উল্লেখ যোগ্য রচনা - সিনেমার আশ্চর্য বাজার। ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন রাম হালদার। চলচ্চিত্রে ভক্তিমূলক ও ধর্মীয় বিষয় নিয়ে লিখেছেন পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয় ছবিতে নারীর স্বতন্ত্র ইমেজ সম্পর্কে লিখেছেন সোমা চট্টোপাধ্যায়। বাংলা ক্লাসিকের চলচ্চিত্র রূপ নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। লুই বুনুয়েলের চলচ্চিত্র দর্শন নিয়ে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ - 'বুনুয়েল বুনে দেন সর্বনাশের বীজ' এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় লেখেন - 'বুনুয়েল মোটেই যৌনদানব নন, পরাবাস্তব রূপক তাকে বরং রিপু সংহারেই প্ররোচিত করে। তাঁর যুক্তি সিনেমার আলোয় আলোয়। পর্দার আকাশে শুধুই রাষ্ট্রের বিধান থেকেই নয়, গির্জার শাসন থেকেই নয়, শরীরের বন্ধন থেকেও।'

চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ ঃ সংরূপ সমালোচনা

এই ধারায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রয়েছে, যেখানে চলচ্চিত্রের সঙ্গে থিয়েটার, সাহিত্য, চিত্রকলা, কবিতা ও মহাকাব্যের আলোচনা করা হয়েছে। এক শিল্প (art) সম্পর্কের নিরিখে। পবিত্র সরকারের 'সাহিত্য ও চলচ্চিত্র' এখানে তিনি সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্কের চিরন্তনতাকে অস্বীকার না করে বলেছেন - 'শেষ পর্যন্ত এই কথাটা হয়ত স্বীকার করে নিতে হবে যে. চলচ্চিত্র আর সাহিত্যের মধ্যে একটা 'অনুবাদ সম্পর্ক' চিরকাল থাকবেই। অনুবাদ বলতে আক্ষরিক অনুবাদ বোঝাচ্ছি না, বোঝাচ্ছি এক ধবণের জন্মান্তর। এর ফলে সাহিত্যের এক সংরূপ অন্য সংরূপের উপাদান আত্মসাৎ করে। তেমনই উপন্যাস, গল্প, কবিতা বা নাটক থেকেও চলচ্চিত্র হতেই থাকবে।'' থিয়েটারের সঙ্গে সিনেমার সম্পর্ক দেখিয়েছেন বিভাস চক্রবর্তী তাঁর 'থিয়েটার ও সিনেমা' প্রবন্ধে। তাঁর অভিমত - 'চলচ্চিত্রে বাস্তবতা বা স্বাভাবিকতার মায়া তৈরি করতে হয় বড় বেশি। তাই ছবির অন্য সব কিছুর মতো সংলাপকেও করে তুলতে হয় অতি স্বাভাবিক। থিয়েটার বাস্তবধর্মী হলেও তার সংলাপে থাকে এক অভিজাত বাস্তবতা বা স্বাভাবিকতা। শব্দ বা বাক্য সেখানে ছবি তৈরি করে। 'নাটক যেখানে কথাবহুল।'

চলচ্চিত্র ও চিত্রকলা প্রবন্ধে মৃণাল ঘোষ প্রতিপাদ্য করলেন দুয়ের পারস্পরিক নির্ভরতা। তিনি বললেন - 'চিত্রকলা যে ইমেজ বা চিত্রকল্পের সৃষ্টি করে, তা অনেক সময়ই সরাসরি ব্যবহৃত হয় সিনেমায়'। আবার তিনি জানালেন - 'সুররিয়ালিজমের মধ্যে দিয়ে চলচ্চিত্র ও চিত্রকলার মেলবন্ধনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লুই বুনুয়েল ও সালভাদোর দালির বন্ধুত্ব।' চলচ্চিত্রের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ককে উজ্জ্বল করলেন কবি শঙ্খ ঘোষ -

'শব্দ দিয়ে ছবি তৈরি করে কবিতা। ছবি দিয়ে শব্দ তৈরি করে ফিল্ম। ছবির আদলকে পুরোপুরি ভেঙে দিয়ে তার মধ্যে অবচেতনকে ধরবার কবিতাস্পৃষ্ট আয়োজন নিয়ে আসা, সেসব চর্চায় পৌঁছতে বাংলা ফিল্মের হয়তো আরো অনেকটা সময় লেগে যাবে বলে মনে হয়।' (তদেব)। অমিতাভ রায় মহাকাব্যের চলচ্চিত্রায়ণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তার গ্রন্থ 'মহাকাব্যের চলচ্চিত্র চলচ্চিত্রের মহাকাব্য' তে। আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক সংরূপ ধারায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। বিনীতভাবে সেগুলির শুধুমাত্র নাম উল্লেখ থাকল - চলচ্চিত্রের দাবী ঃ মেঘনাদবধ কাব্য, সাহিত্য ও চলচ্চিত্র, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা ঃ দৃষ্টি চলচ্চিত্র এবং সুরারিয়ালিজম ঃ বুনুয়েল ঃ জীবনানন্দ।

বাংলা চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ

সত্যজিৎ রায়ের 'বিষয় চলচ্চিত্র' (১৯৮২) প্রথমেই উল্লেখ করি। চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে ১৮টি প্রবন্ধের সংকলন। ধীমান দাশগুপ্তর 'চিত্রনাট্য রচনা ও বিশ্লেষণ, নতুন বাংলা সিনেমা (১৯৮৪), বুনুয়েল! বুনুয়েল! (২০০০), চলচ্চিত্রের অভিধান (১৯৮৬) উল্লেখযোগ্য। প্রলয় শূর লিখেছেন 'বার্গম্যান' (১৯৮৮) গ্রন্থ, গাস্তঁ রোবের্জে এর 'সিনেমার কথা' এ প্রসঙ্গে বলা যায়। দিলীপ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আইজেনস্টাইন' বাংলায় একটি দরকারী গ্রন্থ। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের 'চলচ্চিত্র, সমাজ ও সত্যজিৎ রায়' গ্রন্থটি রাষ্ট্রপতির রজতকমল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রথম চলচ্চিত্র গ্রন্থ (১৯৮০)। এখানে তিনি মার্কসীয় আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণে সত্যজিতের প্রথম পর্যায়ের সিনেমাগুলির বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর আরেকটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'চলচ্চিত্র ভাবনা' (১৯৯৬)। এখানে চলচ্চিত্র ঃ মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের আলোকে, চলচ্চিত্রে অপসংস্কৃতি, ঋত্বিকের নৈরাশ্য, আশাবাদ, শিশুপ্রতিমা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। আনন্দ পাবলিসার্স প্রকাশিত ও দিব্যেন্দু পালিত এবং নির্মাল্য আচার্য্য সম্পাদিত 'শতবর্ষে চলচ্চিত্র' (১৯৯৬) একটি জরুরী চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। আলোচ্য রচনায় অনেকগুলি প্রবন্ধ আলোচিত হয়েছে। মানসী দাশগুপ্তের 'ছবির নাম সত্যজিৎ' অদ্রীশ বিশ্বাসের 'আন্দ্রেই তারকোভস্কি', অরুণকুমার রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র', পার্থ রাহার 'সিনেমার ইতিবৃত্তান্ত দিব্যেন্দু পালিতের সিনেমা থিয়েটার' সুরমা ঘটকের 'ঋত্বিক' রজত রায় সম্পাদিত 'ঋত্বিকের ছবি' বীরেশ ঘোষের 'চলচ্চিত্র নির্মাণ, ধ্রুবগুপ্তর 'আফ্রিকার চলচ্চিত্র' বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর 'স্বপ্ন, সময় ও সিনেমা' পূর্ণেন্দু পত্রীর 'সিনেমা সংক্রান্ত' চিত্ত মণ্ডলের 'লাতিন আমেরিকার চলচ্চিত্র' আন্দোলন' খুবই প্রয়োজনীয় ও মননশীল বই।

আরো কিছু বই বাঙালীর চলচ্চিত্র চর্চাকে ব্যাপ্তি দিয়েছে যেমন ধীমান দাশগুপ্তর 'সিনেমার অ আ ক খ', সিনেমায় ইমেজ, অমিয় রায় চৌধুরীর 'শতবর্ষের সিনেমা ও চার্লি চ্যাপলিন' সৌমেন গুহর 'সের্গেই আইজেনস্টাইন ঃ জীবন ও চলচ্চিত্র', পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতীয় চলচ্চিত্রের রূপরেখা'।

ভারতে সিকিমভুক্তির পরবর্তী পর্বের সিকিমের সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকা (সংবাদ বিষয়ক) গুলির ভূমিকা — দ্বিতীয় পর্ব

কাজলকুমার রায়

১৯৭৫ সালের ১৬ এপ্রিল সিকিমরাজ্য ৩৮তম সংশোধনের মধ্য দিয়ে সংবিধানের ৩৭১ এক অনুচ্ছেদ অনুসারে ভারতের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য হিসাবে ভারতের মানচিত্রে স্থায়ী আসন লাভ করল। এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় গণভোটের মধ্য দিয়ে। ফলে ৩০০ বছরের একক রাজতন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে গণতন্ত্রের পথ সুগম করে দেয়। সে সময় গণতন্ত্রের পক্ষে ও বিপক্ষে যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে সিকিমের যে সব সংবাদপত্রগুলি মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সেগুলি হোল 'কাঞ্চনজংঘা, সিকিম হেরাল্ড, সিকিম এক্সপ্রেস, ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিকিম, হিমালয়ান অবজারভার, প্রগতি পত্রিকা। এই পত্রিকাগুলিতে মুখ্যত রাজনীতি অর্থনীতি সমাজতত্ত্ব বিষয়ক বিশ্লেষক মূলক প্রবন্ধ থাকত। এছাড়া প্রাক্ সংযুক্তি পূর্বপবে নরবাহাদুর ভাণ্ডারী পরিচালিত "হাম্রোপুকার", *পিরমী* শেরপার 'মুক্তস্বর' ফর্ণ বাসনেট পরিচালিত 'নবজ্যোতি,' "হিমালয়ান সন্দেশ, 'নবপল্লব' ইত্যাদি পত্রিকার কথা আমরা 'শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে পারি।

১৯৭৫ সাল ছিল ভারতীয় রাজনীতির উপর এক গুরুত্বপূর্ণ যুগ। জয়প্রকাশ নারায়ণের সারা ভারত জুড়ে আন্দোলন শুরু হয় ১৯৭৪ সালে। এই আন্দোলনের মোকাবিলায় ইন্দিরা গান্ধী প্রেস সেন্সরশিপ চালু করেন। সিকিমও এর প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। সিকিম ভারতে অন্তর্ভুক্তির পর চোগিয়ালের স্ত্রী গ্যায়লমো তার পুত্র সন্তান সহ আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আমেরিকা নেপাল ও চীনের বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই অন্তর্ভুক্তি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করা হয়।

১৯৭৫ সালে সিকিম কংগ্রেস রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করে। ১১৭৭ সালে সারা ভারতে কংগ্রেস দল ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হয় এবং জনতা সরকার ক্ষমতায় আসে। এল. ডি. কাজি পরিচালিত কংগ্রেস দল তার দলগত অবস্থান পরিবর্তন করে সিকিম জনতা দলে পরিবর্তিত হয়। দলীয় দুনীর্তি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও স্বজনপোষণ খুব অল্পদিনের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এবং এই কারণেই ১৯৭৯ সালের রাজ্য নির্বাচনে শ্রী নরবাহাদুর ভাণ্ডারীর নেতৃত্বে পরিচালিত সিকিম সংগ্রাম পরিষদ ক্ষমতা দখল করে।

১৯৯১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী সিকিমের মোট জনসংখ্যা চারলক্ষ পঁচিশ হাজারের মতো, এটা বহুভাষী রাজ্য। এখানে স্কুল, মহাবিদ্যালয়ে ইংরাজী, লেবচা, নেপালী, তিব্বতি ভাষায় পড়াশুনা হয়। মোট জনসংখ্যার আটান্ন শতাংশই নেপালীভাষী। তবু প্রায় চল্লিশ শতাংশ পত্রিকাই ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়। নেপালী ভাষী পত্রিকার সংখ্যা এখন ক্রমাগত বৃদ্ধির পথে। বিশেষত ১৯৭৭ সালে জনতা সরকার আসার পর প্রেস সেন্সরশিপ উঠে গেলে বহু নূতন নতূন পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। ১৯৭৭ সালের পর 'নেপালী পত্রিকার বৃদ্ধির কারণ হলো নেপালী ভাষার প্রতি সংবিধানের স্বীকৃতি দান।

নেপালী পত্র পত্রিকা

১৯৭৭ সালে যে সব নেপালী পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তা ছিল বেশীর ভাগই যৌথ প্রকাশনায়, পত্রিকাগুলি হলো

- প্রতিবিম্ব (১৯৭৭) সম্পাদকদ্বয় গিরসি শেরপা ও সন্তোষ বরদেওয়া, গ্যাংটক।
- পাখেরা (১৯৭৮) সম্পাদকদ্বয় কে বি রিজল ও শান্তা প্রধান, নামচি থেকে প্রকাশিত।
- ঝিলিক (১৯৭৮) সাপ্তাহিকি, সম্পাদক ধমবাসনেট ও বিজয় বান্তোয়া, গ্যাংটক।
- সুধা (১৯৭৮) সম্পাদক বিনোদ আগরওয়াল ও জীবন ধীং

একক সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলি হলো

- লালুপাতে (১৯৭৮) সম্পাদক চুনীলাল ধিমির, রঙালি পূর্ব সিকিম থেকে প্রকাশিত
- দর্পণ (১৯৭৮) সম্পাদক গঙ্গাবাহাদুর রাই, রাজনীতি বিষয়ক পত্রিকা এবং বর্তমানেও এটি বহুল প্রচারিত।
- হিময়লী বেলা (১৯৭৭) প্রথমে সম্পাদক ছিলেন সি ডি রাই ও বর্তমানে সি বে শ্রেষ্ঠ। বর্তমানে তা বহুল প্রচারিত সংবাদ ম্যাগাজিন।
- গান্তোক (১৯৭৮) গ্যাংটক থেকে প্রকাশিত সম্পাদক শিবপ্রধান।
- আজোকে সিকিম (১৯৭৮) সম্পাদক নমগিয়াল শিরিং।
- আওয়াজ (১৯৭৯) সাপ্তাহিক
- স্রস্টা (দ্বৈমাসিক পত্রিকা) সম্পাদক কেদার গুরুং,
- অভিযান (১৯৭৯) মালিক সম্পাদক এল ডি. রাই

  আশির দশকে অনেকগুলি সংবাদ পত্র ও সমসাময়িক পত্রপত্রিকার পরিচয় পাই। সেগুলি হলো

- নবপথ (১৯৮০) সম্প্াদক খেমবাহাদুর ক্ষেত্রী
- নয়াপরিপাটি সাপ্তাহিক সম্পাদক জি আর ইয়াটা
- নয়াদিশা (১৯৮০) সংযুক্ত প্রকাশন

- বিচার (১৯৮০) প্রথম পর্যায়ে সাপ্তাহিক ও বর্তমানে অর্ধসাপ্তাহিক, সম্পাদনায় সুভাষ দীপক।

এছাড়াও আরো পত্র পত্রিকার পরিচয় পাই তা হলো

গ্যাংটক দর্পন, ফ্রন্টিয়ার সমাচার, জনপক্ষ, সিকিম সমাচার, লোকমত, জনপুকার, আজ হিমগিরী, তিস্তারঙ্গিত, পূর্বসন্দেশ, সিকিম আওয়াজ — ইত্যাদি পত্রিকা

ইংরাজী পত্রপত্রিকা

ইংরাজী পত্রপত্রিকার কথা বলতে গেলে প্রাক সংযুক্তি পূর্বসংবাদপত্রগুলির কথা চলে আসে তা হলো Sikkim Herald, Independent Sikkim. প্রথমটি চোগিয়েল ও দ্বিতীয়টির সম্পাদক ছিলেন কাইজার বাহাদুর থাপা। এগুলি Pro Chogial পত্রপত্রিকা গুলি প্রকাশ সময় ছিল ১৯৬৬ ও ১৯৭০।

১৯৭৭ সালে যে ইংরাজী পত্রিকা সিকিমে স্থায়ী আসন লাভকরে সেটি হলো Sikkim Express। প্রথমে এর সম্পাদক ছিলেন আর কে সিংহাল, এটি বহুল প্রচারিত পত্রিকা(সাপ্তাহিক) বর্তমানে এর সম্পাদনায় রয়েছেন রামপাত্র।

The Broader News and views (১৯৭৭) সম্পাদিকা শ্রীমতি সন্তোষ নিরাশ। The Nation (1978) প্রথমে সাপ্তাহিক ও বর্তমানে অর্ধসাপ্তাহিক, সম্পাদনায় রয়েছেন বিনোদ কুমার আগরওয়াল।

এছাড়াও ১৯৭৭ এরপর যে সব পত্রিকা সিকিমে দেখা যায় সেগুলি হলো

- Eastern Express (1981) সম্পাদক সুরেশ কুমার প্রামার পাক্ষিক পত্রিকা
- Voice of Sikkim (1981) সাপ্তাহিক নবীনচন্দ্র গুরুং
- Sikkim Times (1982) আর এস প্রধান সম্পাদিত
- Spot light of Sikkim (1990) জিগমী এন কাজী
- The truth
- The Encounter
- The Bullet
- The Echo of Hills
- Himalayan Mirror.
- The voice.

হিন্দি, লেপচা পত্রিকা

এছাড়া ও সিকিমে ১৯৮৫ সালে একটি বহুল প্রচারিত হিন্দি পত্রিকার নাম জানতে পারি। নাম 'জমানা' — সম্পাদনায় রয়েছেন সন্তোষ নিরাশ। এছাড়া 'উষা' নামে

নেপালী ও হিন্দি ভাষায় এই পত্রিকার সম্পাদনা করেন শোভা কান্তি। লেপচা ভাষায় পত্রিকা রয়েছে নাম "ময়লে লিয়া" এর বাংলা অর্থ পবিত্র ভূমি।

সময়ের প্রেক্ষাপটে পত্র ও পত্রিকাগুলির আলোচনা

১৯৭৭ সাল থেকে এখানে সংবাদপত্র ও সম্পাদনায় সংবাদ পত্র-পত্রিকায় বন্যা নেমে আসে। বিশেষত এটা লক্ষ্য করি প্রেস সেন্সারশিপ উঠার পরবর্তী পর্বে। এখানে প্রথম থেকেই আন্দোলনের মধ্যে এক জাতিসত্তার তীব্র আকুতি লক্ষ্য করি। গণতন্ত্র বিকাশের জন্য প্রাক সংযুক্তি পর্বে যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে নেপালী জাতিসত্তার, তীব্র আকুতি লক্ষ্য করা যায়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর এই জাতিসত্তা বিকাশের পথ খুঁজে পায়। এরই ফল স্বরূপ বহু নেপালী পত্র পত্রিকা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বহু শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত মানুষরা সাংবাদিকতা ও প্রকাশনা সংস্থাকে জীবিকা ও পেশা রূপে গ্রহণ করে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে, নেপাল থেকে এখানে এল জড়ো হল। বর্তমানে তার শিক্ষা প্রশাসন, কারিগরি, শিল্পে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অন্যদিকে লেপচা, লিম্বু, তিব্বতী ভাষায় সরকারী অনুদান থাকলেও জাতি ও জনগোষ্ঠী হিসাবে ততটা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। পত্র পত্রিকার প্রকাশনায় তারা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়েছে। পরবর্তী পর্বে ভারতের সংবিধানে নেপালী ভাষা স্বীকৃতি পাওয়া এই ভাষার বিকাশ এই রাজ্যে ক্রমবর্ধমান। বর্তমানে এই ভাষা লিঙ্গুংয়া ফ্রাঙ্কা হিসাবে সারা রাজ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৯৭৭ সালে নরবাহাদুর ভান্ডারী ক্ষমতায় আসেন এবং ১৯৯৪ সাল অবধি তিনি ১৭ বছর ছিলেন। তার এই ক্ষমতা পরবর্তী পর্বে একনায়কতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তী পর্বে তার এই ক্ষমতা ব্যবহারের বিরুদ্ধে কিছু সংবাদপত্র এগিয়ে আসে। একদল সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সংবাদপত্র নির্ভিকভাবে এগিয়ে এসেছিল তার নাম "আন্দোলন"। পেলিং থেকে প্রকাশিত সম্পাদক ছিলেন কে গুরুং। অপর পত্রিকা 'অধিবক্তা' সম্পাদনায় ছিলেন বি বি শুক্লা।

ভাণ্ডারীর সময় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেটা হলো Eastern Express Group দ্বারা প্রকাশিত পত্রিকা সমূহ ও তাদের প্রকাশন সংস্থা। এই প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'লর্নিথুগ' নারদেন গ্যালপেয় সম্পাদিত, Encounter নারদেন গ্যালপেয়, Spot light of Sikkim জিগমী এন কাজী কৃত পত্রিকা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত জনপথ সমাচার পত্রিকার সম্পাদক রাজেন্দ্র বৈদ্যকে গ্রেপ্তার করে অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। এর পর হেবিয়াস করপাস দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মুক্তি পান, ভাণ্ডারী ক্ষমতার শেষ পর্বে চরম একনায়কতন্ত্রের পরিচয় দেন এবং তা সংবাদপত্র বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে উঠে।

এরপর পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতায় আসেন পবন কুমার চামলিং, তিনি প্রেসের ক্ষেত্রে

ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করেন। এই সময় জাতিগত সমস্যা অনেকটা প্রশমিত হয় এবং প্রেসও অনেকটা সংযমতা রক্ষা করে। বর্তমানে OBC ও জাতিগত সমস্যা থাকলেও সংবাদপত্রগুলি অনেকটা ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করে।

সিকিমের সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র পত্রিকা গুলির বৈশিষ্ট

১) নেপালী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে তাদের নিজস্ব জাতিসত্তা বিকাশের তীব্র আকুতি লক্ষ্য করি। এই রাজ্যে অন্য Ethnic group এর প্রতি তাদের অসহিষ্ণুতার ভাব এই পত্র পত্রিকাতে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে বেশ কিছু পত্রিকা বেশ উঁচুমানের ও বিশ্লেষণ মূলক ও যক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণে পূর্ণ।

২) ইংরাজী পত্রিকাগুলি স্বভাবতই উঁচু মানের। সম্পাদনায় জড়িত লোকেরা প্রায় সকলেই উচ্চশিক্ষিত ফলে যুক্তিযুক্তের ধারা বিশ্লেষণ মূলক চিন্তার পরিচয় সহজেই লক্ষ্য করা যায়। রাজ্যে নেপালী ছাড়া অন্য জাতি গোষ্ঠীর বিকাশের জন্য তারা গভীর ভাবে চেষ্টা করে চলেছেন।

৩) এখন থেকে ইংরাজী ও নেপালী ভাষা পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হলেও কোন দৈনিক সংবাদপত্র বের হতে পারেনি।

৪) রাজ্যের চারটি জেলা থেকেই সংবাদ পত্র ও পত্রিকা বের হবার খবর আমরা পেয়েছি।

৫) এই পত্রিকার পাঠক দার্জিলিং, জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স, আসাম, মেঘালয়, উত্তরপূর্ব ভারতের দেরাদুন ও হিমাচল প্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রয়েছে। সিকিমের জনসংখ্যার সত্তর শতাংশ নেপালী ভাষা বুঝতে পারেন। সেজন্য নেপালী পত্র পত্রিকার পাঠক সংখ্যা সিকিমের সবচেয়ে বেশী।

৬) সরকার রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত পত্রিকাগুলি DAVP ও সরকারী অ্যাড পেয়ে থাকেন।

সূত্রনির্দেশ

1. Nani Rustomji	Sikkim A Himalayan Tragedes Page 173.	Allied Publisher Pvt. Ltd. Calcutta/Bombay
2. B. S. Das	The Sikkim Saga Page 166	Vikas Publishing House Pvt. Ltd Delhi -14
3. Amal Dutta	Sikkim Since Independence Page 249	Mittal Publication New Delhi 59
4. Pranab Kr. Bhattacharjee	Aspect of Cultural History of sikkim Paqe 86	K. P. Bagchi and Co. Calcutta.
5. Ed. K. S. Singh	People of India Sikkim Page 249	Anthropological Surves of India Seagull Books, Calcutta

6	Jigme N. Kazi	Inside Sikkim Against the tide	Hill Media Publication Gangtok, Sikkim.
7	Aparna Bhattacharjee	Sikkim Page 158	National Book Trust New Delhi
8	Manas Das Gupta	Sikkim Problem and Prospect fo Development. Page 167	Indus Publishing Co. New Delhi.
9	Awadhesh Coomar Sinha	Politics of Sikkim Page 205	Thomsan Press (India) Ltd. Faridabad, Haryana.
10	Hire Chattri.	Bharateli Nepali Patra Patrikako Shatabdi 1887-1986	Sibani Prakasan Rampho East Sikkim.
11.	Pahalman Subba	Sikkim who Ruined it Page 140	The print Shoppe 1-2, D.D.A Market South Extension part I New Delhi 110049
12.	Sunanda Dutta Roy (Ex Editor of The Statesman)	Smashed and Grabs.	
13	Nilotpal Sharma	Plainshan in the Hill a Sociological study in Sikkim Page 300	PHD paper North Bengal Univercity
14	OP Singh	Strategic Sikkim Page 240	BR. Publishing Corporation 461, Vivekananda Nagar Delhi 52
15	P R Rao	India and Sikkim (1814-1970) Page 227	Sterling Publisher (p) ltd. New Delhi 16.

সারাংশ

শিশু এবং দূরদর্শনে ঃ দূরদর্শনের আলোকেই শিশুদের গড়ে ওঠা

প্রার্থিতা বিশ্বাস

বর্তমানে দূরদর্শন এমন একটি মনোরঞ্জনের বিষয়, যা অসংখ্য মানুষকে আকর্ষণ করে। একুশ শতকে উন্নত বিজ্ঞানের মাধ্যমে দূরদর্শন আরো মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে। শুধু সর্বভারতের খবর নয়, জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য এটি একটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানলিপি গড়ে তুলেছে।

দূরদর্শনে যদিও শিশুরা ব্যাপকভাবে প্রদর্শিত হয়, অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুদের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের কোন আয়োজন করা হয় না। বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থা শিশুদের নানাভাবে কাজে লাগায়, কিন্তু সমাজের সব স্তরের শিশু সেগুলি সমানভাবে গ্রহণ করে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে সার্ফ বা উজালা সাবানের বিজ্ঞাপন বিভিন্ন শ্রেণীর শিশুদের মধ্যে ভিন্ন প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি করে। গবেষণার আলোকে দেখা গিয়েছে যে দূরদর্শনে প্রদর্শিত বিভিন্ন বিজ্ঞাপন শিশুদের পক্ষে সার্বিকভাবে ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছে। এর ফলে সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি সম্পর্কে তাদের ধারণার মধ্যে নানা বিভ্রান্তি দেখা দিচ্ছে।

"বাঙালী ভদ্রলোকের মুখ ঃ সাহিত্যের দর্পণে"

অমলশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৫০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে 'বাঙালী ভদ্রলোক'দেরই নিয়ে একটি বৃহত্তর গবেষণার অংশ হিসাবে বর্তমান নিবন্ধটি প্রস্তুত করা হয়েছে। ঐ কালসীমার মধ্যে আলোচনাধীন গোষ্ঠীটিকে ঘিরে অনেক গবেষণাই হয়েছে। তবে ঐ আলোচনা সমূহের মূল উপজীব্য কিন্তু গোষ্ঠীগতভাবে ভদ্রলোকরা ছিলেন না। ছিল বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রসঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কার্যকলাপ, কর্মপন্থা, অবদান সমূহের মূল্যায়ন ও তাৎপর্য সন্ধান। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে ভদ্রলোকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত গবেষণা কি গোষ্ঠীগত ভাবে শুধুমাত্র তাদের নিয়ে গবেষণার থেকে খুব পৃথক কিছু?

প্রসঙ্গত নির্দেশ করা সম্ভব যে ঐ সমস্ত মূল্যায়নের কাজে এমন কিছু পদ্ধতি,

বৈশিষ্টসূচক নির্ধারণের মাত্রা বেছে নেওয়া হয়েছে যার ফলে ভদ্রলোকদের কাজকর্ম ও স্থায়ী অবদানের মধ্যে সীমাবদ্ধতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্দেশিত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে ভদ্রলোকরা ঔপনিবেশিক প্রভুদের স্তাবক, দালাল হিসাবে সমগ্র জনগোষ্ঠীর অতি ক্ষুদ্রাংশ হয়ে আনুপাতিক ভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদের উপভোক্ত হওয়ায় ঐ অন্যায্য আত্মসাৎকে প্রথাসিদ্ধ করার জন্য অশোভন ভাবে তৎপর গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত। ঔপনিবেশিক প্রভুদের কাছ থেকে যথা সময়ে যথাযথ সুবিধা আদায়ে অক্ষম হয়ে নিম্নবর্গীয়দের মুখপাত্র সেজে স্থীতাবস্থা ইচ্ছামত ভাঙে আবার তলায় সমঝোতা করেই চলে — এ অভিযোগও বহুশ্রুত।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে পূর্বতন উপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী ও আধুনিক বিদেশী গবেষকগণ ব্যতীত ভদ্রলোকদের সমালোচনা মূলত আত্মসমালোচনা। এ জাতীয় আত্ম অবমূল্যায়নের উৎস কি? আত্মপক্ষ সমর্থনে ভদ্রলোকদের বলার কি কিছুই নেই? তার চেয়েও বড় কথা অন্যদেশে ভদ্রলোকদের সমান্তরাল গোষ্ঠী সমূহের মধ্যেও কি পূর্ব কথিত লক্ষণগুলির উপস্থিতি নির্দেশ করা সম্ভব। বিশ্বায়নের দাপটে আজ যখন ভদ্রলোকদের জগৎ ও জীবনবোধ ইতিহাসের পাতায় স্থান লাভ করছে তখন তাদের নিয়ে নির্মোহ পর্যালোচনার ক্ষেত্র কি উপস্থাপিত হয়নি?

এসব দেখার অনেক পদ্ধতির মধ্যে একটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষ্য। অর্থাৎ ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাদের জীবনী আত্মজীবনী বা ঐ জাতীয় রচনা সমূহের মধ্যে দিয়ে তাদের জগৎ ও জীবন বোধকে প্রস্ফুটিত করা। এই প্রস্ফুটনের কার্যকরী পথ নির্দেশের জন্য ইতিহাস সংসদের দুটি পূর্ববর্তী অধিবেশনে আমরা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাটের ব্যবসায়ী রজনীকান্ত মৈত্রর আত্মজীবনী দুটিকে অবলম্বন করেছিলাম এবার চির প্রবাসীনি মহিলা সাহিত্যিক পূর্ণশশী মুখোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী "মনে পড়ে" কে ব্যবহার করেছি।

মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে অনালোচিত রাণী ভবানী

অনামিকা অধিকারী (মুখার্জী)

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে রাণী ভবানী এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। নাটোরের জমিদারগৃহিনী হিসাবে তিনি সমগ্র বাংলাদেশে সুপরিচিত। তিনি ছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত বগুড়া জেলার ছাতিমগ্রামের আত্মারাম চৌধুরীর[১] কন্যা, তাঁর মায়ের নাম ছিল জয়দুর্গা[২]। তাঁর আরও একটি পরিচয় হল তিনি রাজশাহী জেলার নাটোরের জমিদার রাজা রামকান্ত রায়ের পত্নী[৩]। ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামকান্তরায়ের মৃত্যু হলে এই সুবিশাল জমিদারী পরিচালনার দায়িত্বভার এসে পড়ে ৩২ বৎসর বয়স্কা মহারাণী ভবানীদেবীর উপর।

বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ মহকুমার পশ্চিমাংশে আজিমগঞ্জ সিটি রেলস্টেশনের উত্তরে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত বড়নগর পূর্বে রাজশাহী জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জনপদ ছিল। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে উদয়নারায়ণের আমলে বড়নগরের সমৃদ্ধি ঘটে। রাজা উদয়নারায়ণ ছিলেন রাজশাহীর জমিদার। সেই সময় রাজশাহী জমিদারী আয়তনের দিক থেকে বাংলার সর্বপ্রধান জমিদারী ছিল। জনৈক ইংরেজ লেখকের বক্তব্য অনুসরণে বলা যায় যে, রাজশাহীর মত এত বড় জমিদারী ভারতে ছিল কিনা সন্দেহ।[৪] বর্তমান মুর্শিদাবাদের উত্তর পশ্চিম অংশ, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, ফরিদপুরের প্রায় সমগ্রভাগ, রংপুর, যশোহরের প্রায় অর্ধেক অংশ, নদীয়া, বীরভূম ও বর্ধমানের অধিকাংশ জনপদ এই জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সুবিস্তৃত জমিদারীর আয়তন ছিল প্রায় ১২৯০৯ বর্গমাইল।[৫] মুর্শিদকুলী খাঁর সঙ্গে বিরোধের ফলে উদয়নারায়ণ জমিদারীচ্যুত হন। জমিদারী হারিয়ে উদয়নারায়ণ বন্দী হন নাটোর রাজবংশের আদিপুরুষ রঘুনন্দনের[৬] হাতে। রঘুনন্দন উদয়নারায়ণকে বন্দী করে পাঠিয়ে দেন মুর্শিদকুলী খাঁর কাছে এবং সেখানেই উদয়নারায়ণের মৃত্যু হয়। পুরস্কার স্বরূপ রাজশাহীর সুবিস্তৃত জমিদারী নাটোর রাজবংশের সঙ্গে যুক্ত হয়। রঘুনন্দন ছিলেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নায়েব কানুনগো। তিনি তাঁর ভাই রামজীবনের[৭] নামে রাজশাহীর জমিদারী নিয়েছিলেন। রাজশাহীর জমিদারী লাভ করার পর বড়নগরে রঘুনন্দন ও রামজীবন বসবাস করতে থাকেন। রাজা রামজীবনের ছেলের নাম কুমার কালিকাপ্রসাদ[৮] (কালু কোঙর)। কুমার কালিকাপ্রসাদের পোষ্যপুত্র হলেন কুমার রামকান্ত এবং এই রামকান্তের স্ত্রী হলেন মহারাণী ভবানী।

রাজশাহী জমিদারী থেকে প্রতি বৎসর এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কর হিসাবে আদায় করা হত। তা থেকে প্রতি বৎসর ৭০ লক্ষ টাকা নবাব সরকারকে রাজস্ব দিতে হত।[৯] এছাড়া নাটোর রাজবংশের নিজেদের বিশাল সম্পত্তি ছিল। ফলে দেখা যায় যে, নাটোরের রাণী হিসাবে রাণী ভবানী উত্তরাধিকারসূত্রে এক বিশাল জমিদারী ও সম্পত্তির মালিক হন। বড়নগর ছিল 'অর্ধবঙ্গেশ্বরী' রাণী ভবানীর গঙ্গাবাসের স্থান। তাঁর প্রাসাদ, কাছারী এবং অসংখ্য দেবমন্দির থাকার জন্যে সেসময়ের লোকেরা বড়নগরকে 'মুর্শিদাবাদের বারাণসী'[১০] বলতো। কথিত আছে, বড়নগরে একসময় ১০৭ টি শিবমন্দির ছিল। রাণী ভবানী তাঁর জমিদারীর প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিকটি নিজেই দেখাশোনা করতেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তিনি যেমন পারিষদের সঙ্গে আলোচনা করতেন, তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেওয়ানকে প্রয়োজনে আদেশ উপদেশ দিতেন। এব্যাপারে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ দয়ারাম[১১] রাণী ভবানীর বিশ্বস্ত ছিলেন। রাণী ভবানী প্রায় অর্ধশতক জুড়ে এই সুবিশাল জমিদারী পরিচালনা করেছিলেন।

বিশাল জমিদারীর অধিকারিণী হয়েও রাণী ভবানীর ব্যক্তিগত জীবন ছিল আড়ম্বরহীন। তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেছিলেন। দান, ধর্ম ও জনকল্যাণমূলক কাজে তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করতেন। তিনি বহু ব্রাহ্মণ পন্ডিতকে ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি প্রদান করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে — রাধাকান্তদেব ঠাকুরকে ১০০০ বিঘা, গোপীনাথদেব ঠাকুরকে ১৭৫০ বিঘা, কানাইয়ালালদেব ঠাকুরকে ২০০০ বিঘা জমি দান[১২] করেন।

সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তিনি মাসে দশ হাজার টাকা[১৩] দান করতেন। তিনি টোলের বহু পন্ডিতকে বৃত্তি দিতেন। এই টোলগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'ন্যায় চতুষ্পাঠী'[১৪]। তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর সম্পত্তির আয় থেকে টোলের পন্ডিতদের বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। টোলের পড়ুয়াদেরও আধসের চাল[১৫] প্রতিদিন বৃত্তি হিসাবে দেওয়া হত। প্রতিদিন তাঁর রাজবাড়িতে অনেকেই মধ্যাহ্নকালীন আহার লাভ করতেন। তিনি বেশ কয়েকজন বৈদ্য নিয়োগ করেছিলেন, যারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করে অসুস্থদের ওষুধ দিতেন[১৬]। যার পুরো ব্যয়ভার বহন করতেন রাণী ভবানী। বিধবাদের ভরণপোষণের জন্য তিনি অনুদানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

তাঁর সময়ে রাজশাহীতে কার্পাস, পাটবস্ত্রের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। যেসমস্ত তন্তুবায়দের মূলধন ছিল না তাদেরকে তিনি 'দাদন' বা অগ্রিম অর্থ প্রদান করতেন। এতে তাদের বস্ত্র ব্যবসায়ে যথেষ্ট সুবিধা হত। বর্তমান সরকার রাণী ভবানী অনুসৃত বিধবাদের ভাতা এবং তন্তুবায়দের সুবিধার্থে সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ সাহায্য করে থাকেন, পাদ্রী লঙ সাহেবের[১৭] মত অনুসারে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যেসমস্ত

বড় বড় আড়ং ছিল, বড়নগর ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম। এখানে দেশী এবং বিদেশী বণিকরা যাতায়াত করত।

রাণী ভবানীর কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁর একমাত্র কন্যা ছিলেন তারা দেবী। তিনি খুব অল্প বয়সেই বিধবা হন। এইকারণে রাণী ভবানী দত্তকপুত্র নেন। তাঁর পোষ্যপুত্রের নাম ছিল রাজা রামকৃষ্ণ[১৮]। তিনি ছিলেন রাজসন্ন্যাসী। পুত্র ও কন্যাসহ বড়নগরে বাস করা সময়েই তিনি 'টেরাকোটা' শিল্পসমৃদ্ধ মুর্শিদাবাদের নিজস্ব শৈলীতে বিভিন্ন মন্দির স্থাপন করেন। ১৭৫৫ সালে তৌরি ১৮ মিটার উচ্চতার অষ্টকোণাকৃতি 'ভবানীশ্বর' মন্দির[১৯]। বাংলার অন্যতম উচ্চ এই মন্দিরের শিখর সুউচ্চ গম্বুজাকৃতির। যার উপরে রয়েছে ওলটানো পদ্মফুল। ১৭৬০ সালে তিনি তৈরি করেন 'চারবাংলা মন্দির'। এখানে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ মহাদেব। বাংলার নিজস্ব রীতিতে তৈরি চারটি মন্দিরের সমষ্টি এই 'চারবাংলা মন্দির'। মন্দিরগুলির মাপ ও গড়ন একই। একই চতুষ্কোণ জমির চারিদিকে চারটি মন্দির নির্মিত হয়েছে। এছাড়া 'রাজরাজেশ্বরী'[২০] মন্দিরটিও রাণী ভবানী প্রতিষ্ঠিত। সেকালে মুর্শিদাবাদের কোথাও বড়নগরের মতো অসংখ্য দেবমন্দির ছিল না। বহু কাঁসারী পরিবার বড়নগরে বসবাস করত। এখানকার কাঁসা পিতলের কাজের সুনাম ছিল।

রাণী ভবানী কন্যাসহ যখন বড়নগরে বাস করতে থাকেন তখন একসময় সিরাজ-উদ-দোল্লা তাঁর রূপবতী কন্যা তারাদেবীকে হরণ করার জন্য বড়নগরে লোকজন পাঠান। সেই সময় রাণী ভবানীর অনুরোধে ভাগীরথীর অপরপারে সাধকবাগে বসবাসকারী অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত মহাযোগী মস্তরামজী[২১] সেই বিপদ থেকে রাণী ভবানী ও তাঁর কন্যাকে উদ্ধার করেন। এরপরেই রাণী ভবানী বড়নগর পরিত্যাগ করেন এবং কাশী চলে যান।

সেইসময় কাশীতে থাকাকালীন নিজের তহবিলের অর্থব্যয় করে কাশীর পান্ডা হাবেলী ও পর্বতকোশীতে কালী, অন্নপূর্ণা, তারা, গোপাল, দুর্গা ও শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরগুলির মধ্যে কাশীর 'ভবানীশ্বর' মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাশীর সুবিখ্যাত 'দুর্গাকুন্ড' ও 'কুরুক্ষেত্রতালাও[২২] নামে দুটি বিশাল জলাশয় ইনিই তৈরি করেন। এসবের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি প্রায় দেড় লক্ষ টাকার একটি তহবিল তৈরি করেন।

কাশী থেকে তিনি পুনরায় বড়নগরে ফিরে আসেন। এইসময় ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গর্ভনর জেনারেল হয়ে আসেন। হেস্টিংস বাঙালী জমিদারদের শাসকের পরিবর্তে কর সংগ্রহের যন্ত্রমাত্র বলেই মনে করতেন। অধিক রাজকর প্রদানের মাধ্যমে নিজের জমিদারীকে অক্ষুন্ন রাখার প্রস্তাবে রাজি হয়েও রাণী ভবানী নিজ জমিদারীকে

অক্ষত রাখতে পারলেন না। কোম্পানী বাহাদুরের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল। এতে রাণীর রাজকোষ ফাঁকা হতে শুরু করে। রাজকর প্রদানের অসামর্থ্যের জন্য জমিদারীর বিভিন্ন অংশ রাণীর হস্তচ্যুত হতে শুরু করে[২৩]। এইসময় ১৭৭০ সালের মন্বন্তর হয়। মন্বন্তরে বহু লোক তাঁর কৃপায় অন্নজল লাভ করেছিলেন। দুর্ভিক্ষাবসানে রাণীর রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে যায়। রাণী ভবানী অবসর জীবন যাপনের জন্য তাঁর পালিতপুত্র রাজা রামকৃষ্ণের উপর জমিদারীর দায়িত্ব অর্পণ করেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ তাঁর বিচক্ষণতার অভাবে সেই জমিদারী আর টিকিয়ে রাখতে পারলেন না। শেষপর্যন্ত রাণী ভবানীকে কোম্পানী বাহাদুরের বৃত্তির উপর নির্ভর করতে হয়েছে। প্রথমদিকে তিনি মাসিক ৮০০০ টাকা বৃত্তি পেতেন, কিন্তু পরে তা কমতে কমতে মাসিক ১০০০[২৪] টাকায় পরিণত হয়। অবসর জীবনযাপনের মাঝেই ১৭৯৫ সালে ৭৯ বৎসর[২৫] বয়সে বড়নগরেই দেহত্যাগ করেন। বর্তমানে বড়নগর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হলেও মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে রাণী ভবানী ও তাঁর বড়নগরের গুরুত্ব অপরিসীম।

সূত্রনির্দেশ

১। ভারতকোষ (পঞ্চম খন্ড), মঞ্জু বন্দোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২০৬

২। মুর্শিদাবাদ কাহিনী - বড়নগর, নিখিলনাথ রায়, পৃষ্ঠা - ১৭৮
পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী, ১৯৯৬

৩। ভারতকোষ (পঞ্চম খন্ড), মঞ্জু বন্দোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা - ২০৬
মুর্শিদাবাদ কাহিনী - বড়নগর, নিখিলনাথ রায়, পৃষ্ঠা - ১৭৮

৪। "বঙ্গদেশে — এমন কি সমুদয় ভারতবর্ষে রাজশাহীর মত এত বড় জমিদারী আর কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ" —
রাণী ভবানী — অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় — পৃষ্ঠা-৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০

৫। "ইংরাজ শাসনের আরম্ভ সময়ে রাজশাহীর আয়তন ১২৯০৯ বর্গমাইল স্থিরীকৃত হইয়াছে"।
— রাণী ভবানী - অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পৃষ্ঠা-৩ প্রথম প্রকাশ ১৮৯০
"সেকালে রাজশাহী জমিদারী আয়তনে বঙ্গের সর্বপ্রধান জমিদারী। এর তদানীন্তন পরিমান ১২ হাজার বর্গমাইলের অধিক।" — বাংলার ইতিহাস, কালিপ্রসন্ন শর্মা, রাজসাহী রঘুনন্দন, পৃষ্ঠা - ৯৬

৬। "রাজশাহীবাসী রামজীবন ও রঘুনন্দন নামে বারেন্দ্রশ্রেণীর কাশ্যপগোত্রীয় দুই ব্রাহ্মণ নবাব সরকারে কার্য্য করিতেন। রঘুনন্দন নবাব সরকারে রাজস্বসচিব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহারাই পরবর্ত্তীযুগে নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।" — অতীতের স্মৃতি তারাপীঠ - তাপসকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-৮৪, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪ (বাংলা)

৭। "রঘুনন্দন স্বীয় বুদ্ধিমত্তায় ক্রমে নায়েব কানুনগো পদ প্রাপ্ত হন এবং মুর্শিদকুলী খাঁর প্রিয়পাত্র হইয়া, তাঁহার অনুগ্রহে অনেক জমিদারী লাভ করেন। এই সমস্ত জমিদারী তাঁহার ভ্রাতা রামজীবনের নামে গৃহীত হইয়াছিল।" — মুর্শিদাবাদ কাহিনী, নিখিলনাথ রায়, পৃষ্ঠা-১৭৭, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৬

৮। "রামজীবনের পুত্র কুমার কালিকা প্রসাদ রামকান্তকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করে। এই রামকান্তের পত্নীই ভারতবিখ্যাতা প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী" — মুর্শিদাবাদ কাহিনী, নিখিলনাথ রায়, পৃষ্ঠা ১৭৭-১৭৮

৯। "তাঁহার সমস্ত জমিদারী হইতে প্রায় দেড় কোটি টাকা কর আদায় হইত; তন্মধ্যে ৭০ লক্ষ সরকারের রাজস্ব দেওয়া হত"—মুর্শিদাবাদ কাহিনী, নিখিলনাথ রায়।

"The revenue paid by her to Naxim was seventy Lacks and the rent collected by was more than a crore and half"–Musnud of Murshidabad. P. C. Majumdar page-274-275

১০। "সেকালের লোকে বড়নগরকে মুর্শিদাবাদের বারাণসী বলতো। একটা চলতি কথা ছিল গঙ্গার পশ্চিমকুল, বারাণসী সমতুল", পৃষ্ঠা-৫৪- মুর্শিদাবাদ থেকে বলছি, কমল বন্দোপাধ্যায় (৩য় খন্ড)

১১। রাণী ভবানী - অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, প্রথম প্রকাশ বক্তা ঃ- বিভূতি দত্ত, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, বড়নগর. জি.এস.এফ.পি.স্কুল

১২। "রাজশাহীর কালেক্টরীতে যেসকল অনুলিপি রক্ষিত হইয়াছে তন্মধ্যে এগুলি প্রধান—

১১৬২। ২৫ কার্তিক রাধাকান্তদেবঠাকুর ১০০০ বিঘা

১১৬৫। ১ শ্রাবণ কানাইয়ালাল দেব ঠাকুর ২০০০ বিঘা

১১৬৮। ২৪ আশ্বিন গোপীনাথ দেব ঠাকুর ১৭৫০ বিঘা।"

রাণী ভবানী — অক্ষয়কুমার মৈত্রয়, পৃষ্ঠা - ১০৪

১৩। রাণী ভবানী সংস্কৃত শিক্ষার জন্যে মাসে দশহাজার টাকা দান করতেন।" — মুর্শিদাবাদ চর্চা — প্রতিভারঞ্জন মৈত্র।

১৪। বক্তা ঃ- বরদেশ্বরী প্রসাদ ভট্টাচার্য্য, প্রাক্তন শিক্ষক, জিয়াগঞ্জ রাজা বিজয়সিংহ বিদ্যামন্দির।

১৫। বক্তা ঃ- ডঃ পঙ্কজকুমার সাহা, প্রধান শিক্ষক, বাগিচাপাড়া প্রাইমারী স্কুল, লালবাগ।

১৬। "Her physicians distributed medicine from door to door"– A SHORT HISTORY OF NATORE RAJ – A. K. MOITRA. Page - 186.

১৭। "পাদ্রী লঙ সাহেব লিখেছেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে সমস্ত বড় আড়ং ছিল, বড়নগর তার মধ্যে অন্যতম।" মুরশিদবাদ থেকে বলছি, কমল বন্দোপাধ্যায়। (৩য় খন্ড) পৃষ্ঠা ৫৪

১৮। "রাণী ভবানীর পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি রাজা রামকৃষ্ণকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন"— অতীতে স্মৃতি — তারাপীঠ, তাপসকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৪, পৃষ্ঠা-৮৮

১৯। সানন্দা পত্রিকা, ১লা জুলাই, ২০০২ পৃষ্ঠা - ১৮

Terracotta Temples of Bengal - S. S. Biswas

২০। Bengal District Gazetteers - Murshidabad - L. S. S. O' Malley page-205-206.

২১। মুর্শিদাবাদ কাহিনী - নিখিলনাথ রায়, পৃষ্ঠা ১৭৯, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৬

মুর্শিদাবাদ থেকে বলছি (৩য় খন্ড), কমল বন্দোপাধ্যায়।

২২। রাণী ভবানী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, প্রাসঙ্গিক তথ্য, পৃষ্ঠা - ১০৬

ভারতকোষ (পঞ্চম খন্ড) মঞ্জু বন্দোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২০৬

২৩। "রাণী ভবানী রাজ্যচ্যুতির গতিরোধ করিবার আশায় হেস্টিংসের প্রস্তাবেই সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও রাজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না।" — রাণী ভবানী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পৃষ্ঠা-১৬১।

২৪। "...................... অবশেষে তাঁহাকে গভর্নমেন্টের বৃত্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রথমত তিনি মাসিক ৮০০০ টাকা বৃত্তি পাইতেন; পরে উহা কমিতে কমিতে ১০০০ টাকায় পরিণত হয়" — মুর্শিদাবাদ কাহিনী, নিখিলনাথ রায়, পৃষ্ঠা-১৮১

২৫। সানন্দা পত্রিকা ১লা জুলাই ২০০২ সংখ্যা।

সাহায্যকারী পুস্তকপঞ্জী ও পত্রিকা

১. Musnud of Murshidabad - Sri P. C. Mazumder

২. বাঙ্গলার ইতিহাস — কালিপ্রসন্ন শর্মা

৩. মুর্শিদাবাদ কাহিনী — নিখিলনাথ রায়, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৬

৪. রাণী ভবানী — অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০

৫. মুর্শিদাবাদ চর্চা — প্রতিভারঞ্জন মৈত্র

৬. Bengal District Gazetteers - Murshidabad L. S. S. O'Malley.

৭. মুরশিদাবাদ থেকে বলছি (তৃতীয় খন্ড) কমল বন্দোপাধ্যায়

৮. A Short History of Natore Raj – A. K. Moitra.

৯. অতীতের স্মৃতি - তারাপীঠ — তাপসকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ, ১৩৮৪ (বাংলা)

১০. Terracotta Temples of Bengal - S. S. Biswas

১১. সানন্দা পত্রিকা, ১লা জুলাই ২০০২ সংখ্যা, পৃষ্ঠা - ১৮

১২. ভারতকোষ (পঞ্চম খন্ড), মঞ্জু বন্দোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা - ২০৬

১৩. মনোরমা ইয়ার বুক, ২০০২, জেলার খবর-মুর্শিদাবাদ, পৃষ্ঠা - ১০৬

১৪. প্রচারপত্র ঃ World Heritage week. Nov 19-25. 1996. Hazarduari Palace. Published by Archaeological Survey of India. Calcutta Circle.

সাহায্যকারী ব্যক্তি

১. ডঃ পঙ্কজকুমার সাহা, প্রধান শিক্ষক, বাগিচাপাড়া প্রাইমারী স্কুল
২. জ্যোতির্ময় অধিকারী, শিক্ষক, দয়ানগর প্রাইমারী স্কুল, ভগবানগোলা
৩. এ. আর. মোল্লা, লাইব্রেরীয়ান, হাজারদুয়ারী প্যালেস লাইব্রেরী
৪. অরুণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক, শ্রীপৎ সিং কলেজ
৫. প্রশান্ত মুখার্জী, ভাকুড়ী, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
৬. রাধারাণী অধিকারী, জিয়াগঞ্জ, সদরঘাট, মুর্শিদাবাদ
৭. তরুণ সরকার, নাট্যকর্মী, আবৃত্তিপ্রেমী, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
৮. বরদেশ্বরী প্রসাদ ভট্টাচার্য্য, প্রাক্তন শিক্ষক, জিয়াগঞ্জ রাজা বিজয়সিংহ বিদ্যামন্দির।
৯. বিভূতি দত্ত, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, বড়নগর, জি. এস. এফ. পি. স্কুল
১০. মৃণালকান্তি সরকার, শিক্ষক, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ।

বাঙালি মেয়ের বিজ্ঞান ভাবনা-প্রাক স্বাধীনতা পর্ব

সোমা বসু

পৃথিবী আজ একবিংশ শতাব্দীতে উপনীত। পুরুষের পাশাপাশি সর্বত্রই আজ নারীও পা মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে। শতাব্দীর পাতা উল্টে যদি আমরা অতীতের দিকে ফিরে চাই, তবে দেখা যাবে অতীতের নারী ছিল অবহেলিতা, শোষিতা। যদিও আদিম সাম্যবাদী সমাজে নারীর স্থান ছিল পুরুষের সমান। নারী, পুরুষের মতোই একসঙ্গে সমানভাবে বিভিন্ন সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণ করত। কিন্তু পরবর্তীকালে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে নারীর অবস্থানও বদলে যায় — সমাজে নারীর স্থান হয় পুরুষের নীচে। সমগ্র ভারতবর্ষের মতোই বাংলাদেশেও নারীর এমত অবস্থানের কোন ব্যতিক্রম ছিল না। সময়ের সঙ্গে - সঙ্গে সমাজের বিকাশ ঘটেছে, আর একই সঙ্গে নারীর অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটেছে। আর্থ-সামাজিক পালাবদলে নারীর পরিবর্তিত এই অবস্থানের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ খুবই প্রয়োজনীয়। তাই, দেশ স্বাধীন (১৯৪৭ সাল) হতেই বিষয়টি অন্যমাত্রা পেল। এই কারণে স্বাধীনতার পর থেকেই বৃহৎ শিল্প-প্রকল্প, কল-কারখানা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার তৈরি হল। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্তৃতির জন্য নানা চেষ্টা, উদ্যোগ চলল।

যদিও একথা সহজেই বলা যায়, আধুনিক বিজ্ঞান এদেশে এসেছে ইউরোপীয়দের হাত ধরে। এদেশে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা দিয়ে। যদিও ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষীণ কিন্তু ধারাবাহিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির একটা ধারা ছিল। বিশেষকরে, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞানের চর্চা ভালোই হত।[১] উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে ইউরোপীয়দের চেষ্টাতেই বিজ্ঞানের নানা বই, পুস্তিকা — এদেশীয়দের মতো করে লেখা হয়েছিল।[২] বিদ্যাসাগরই শুরু করেছিলেন কলকাতায় বিজ্ঞানচর্চা।[৩] শ্রীরামপুর মিশন, স্কুল-বুক সোসাইটি ইত্যাদির অবদান কম নয়। উইলিয়াম কেরি, তাঁর পুত্র ফেলিক্স কেরির লেখা 'বিদ্যাহারাবলী' থেকে অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় - এঁরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে সহজ সরল বাংলায় এদেশে প্রচার করেছিলেন। প্রায় একই ধারায় লিখেছেন রামেন্দ্রসুন্দর, জগদানন্দ, জগদীশচন্দ্র

প্রমুখ। ১৮৭৬ সালে স্থাপিত হয় স্যর মহেন্দ্রলাল সরকারের গবেষণাগার — ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব্ সায়েন্স, বৌবাজার স্ট্রীটের ২১০ নম্বর বাড়িটিতে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে নবজাগরণের সূচনা হয় — তার প্রভাব পড়েছিল বাংলার চেতনার আকাশে। পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা এবং শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এই প্রয়াসে বাদ যায়নি নারীও। বাঙালি মনীষীদের চেষ্টায় মেয়েরা পড়তে আর লিখতে শিখল। ১৮৪৯ সালে তৈরি হল বেথুন স্কুল। বাংলার সে এক দুঃসময় এবং দমবন্ধ অবস্থা। সুসময়ও বটে, কেননা বিদ্যাসাগর, বেথুন, বিবেকানন্দ এবং শিবনাথ শাস্ত্রীদের মতো ব্যক্তিত্বরা অনেক কষ্ট, পরিশ্রম করে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করেছিলেন, উৎসাহ দিয়েছিলেন। এগিয়ে এলেন নিবেদিতাও। তাঁর উৎসাহ এবং ব্যক্তিগত প্রয়াসে বাংলার নারী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার জোরদার হল। ১৮৮৪ সালে চন্দ্রমুখী বসু, প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাশ করেন।[৪] অবশ্য সরকারীভাবে বা ঐতিহাসিক সাল, তারিখের এই হিসেব ছাড়াও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রাচীন ধারা মেনেই, বাঙালি মেয়েরা শুধু পড়তেই পারতেন তা নয় — নিজেদের ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করার জন্য কলমও ধরেছিলেন। তবে উদাহরণ সীমিত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বেথুন স্কুল আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা 'মেয়েস্কুল' — বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এক বিপুল পরিবর্তন নিয়ে এল। শিবনাথ শাস্ত্রী সহ বেশ কিছু ব্যক্তিত্ব মেয়েদের লেখাপড়ার পাঠ্যসূচী বদলে বিজ্ঞানমুখী করতে চাইলেন। এল জ্যামিতি, গণিত ইত্যাদি। স্বাস্থ্য ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের কিছু কিছু চর্চা হতে লাগল। ১৮৩৫ সালে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। পরে এখানে মেডিক্যাল পড়ার সুযোগ পেয়ে মেয়েরাও ডাক্তার হলেন। শিক্ষা বাঙালি মেয়ের মনের অন্দর মহলে যে বিশাল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল তারই প্রকাশ দেখা দিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে। বাঙালি মেয়ের মনের ভাবনা পাখা মেলল গল্পে, কবিতায়, প্রবন্ধে। নতুনতর শিক্ষায় শিক্ষিত, নবভাবনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালি মেয়েরা কি শুধুই কবিতা, গল্প লিখেছিলেন? সুতপা ভট্টাচার্য তাঁর "বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য" বইটিতে দেখিয়েছেন — কিভাবে তৎকালীন বাঙালি মেয়েরা সমাজের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে, রাজনৈতিক মতাদর্শে নিজের নিজের স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ ভাবনার ছাপ রেখেছেন, চিন্তা করেছেন এবং তা লিখেছেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়।[৫] অন্যান্য অনেক 'গভীর এবং কঠিন' বিষয়ের মতোই মেয়েরা বিজ্ঞান নিয়েও কম লেখেননি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক আগেই মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় বিশেষ জোর দিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ১৯৩১ সালে একটি 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' তৈরি হয়। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ সুনীলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, এই পরিষদ

থেকে মাসিক একটি পত্রিকা বেরোত। নাম 'পথ'।[৬] বিভিন্ন মনীষীদের একান্ত প্রচেষ্টায় সমাজের নানাস্তরে বিজ্ঞান আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এরই প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল মেয়েদের লেখনীও।

এই বিজ্ঞান চেতনার আলোয় মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত নানান কুসংস্কার, খাদ্য নিয়ে নানাধরণের নিয়মনীতির বালাই, আস্তে-আস্তে দূর হতে লাগল। কিন্তু, এই সংক্রান্ত তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাসের বড়োই অভাব। 'মেয়েরা বিজ্ঞান বোঝে না' — এই ধারণাকে সম্পূর্ণ নসাৎ করেই বাঙালি মেয়ের লেখনী জ্বলে উঠেছে। এই গবেষণা নিবন্ধে সেই দিকটির খোঁজের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

১৮৫০-৭০ সালের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মহিলা লেখিকার দেখা মেলে, এঁদের রচনা ছিল একেবারে প্রাথমিক স্তরের। সবে নারী শিক্ষা শুরু হয়েছে। অনেক বাধার পাহাড় সরিয়ে মেয়েরা লিখছে। এ সময়েও যুক্তিবাদী, বিজ্ঞাননির্ভর লেখা, মেয়েদেরই মনের কথা-লেখায় ফুটে উঠেছে। লিখছেন পাবনার (অধুনা বাংলাদেশ) বামাসুন্দরী-দেবী, 'কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে' — সাল ১৮৬১।[৭] গল্প, কবিতার পাশাপাশিই চলেছে বাঙালি মেয়ের বিজ্ঞান ভাবনার নানান প্রকাশ — নানান প্রবন্ধে।

তৎকালীন বাংলায় মেয়েরা যে রীতিমতো বিজ্ঞান নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতেন, লেখালেখি করতেন তার বহু প্রমাণ রয়েছে। এই চিন্তার পেছনে ছিল তাঁদের অদম্য বিজ্ঞান পিপাসা। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, লর্ড কার্জনের চেষ্টায় 'ইউনিভার্সিটি কারিকুলাম অ্যাক্ট' চালু হয়। শুরু হল বিশ্ববিদ্যালয়ে / কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষা। অবশ্য এর অনেক আগেই ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের ঐকান্তিক চেষ্টায় ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স - এর বাড়িতে (বৌবাজার স্ট্রীট) নিয়মিত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানের এক একটি বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করেন। আসতেন ফাদার লাফোঁ, জগদীশচন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। শুনতে আসতেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা (তখনও এরাঁ বিজ্ঞানী হননি) সহ অনেকেই।

কিন্তু, মেয়েরা নৈব নৈব চ! এই রকমই এক সময়ে এক দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিলেন সরলা দেবী। তিনি পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করবেন। এই বিষয়ে তাঁর স্মৃতিকথা 'জীবনের ঝরাপাতা'তে তিনি লিখেছেন, ''আমার সময়ে ছেলেমেয়েদের একই বিদ্যামন্দিরে কো-এডুকেশন ছিল না। যখন আমি এফ-এ ক্লাসে উঠলুম, সুধী দাদাদের মত আমারও সায়েন্স একটা পাঠ্য বিষয় করবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। বেথুন কলেজে তার সুযোগ নেই। আমি এডুকেশন বিভাগে অনেক নিস্ফল আবেদন - নিবেদন করলুম — কোন বন্দোবস্ত হল না। অবশেষে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের সান্ধ্য

লেকচারে যোগদানের আয়োজন হল আমার জন্য। ভিন্ন - ভিন্ন কলেজের এফ - এ ক্লাসের ছাত্রতে ভরা থাকত লেকচার হল। আমি একমাত্র ছাত্রী হলুম।"[৮]

এইভাবে অসম সাহসী সরলার ফিজিক্স শিক্ষা হয়েছিল। তিনি এই বিষয়ে পাস করে 'সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন' থেকে একটি রৌপ্য পদকও পেয়েছিলেন।[৯] মেয়েদের লেখাপড়া রামমোহন, বিদ্যাসাগরের আন্দোলনে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা পেলেও[১০] বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়ে মেয়েদের অংশগ্রহণের কথা গভীরভাবে ভাবা হত না। মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রচেষ্টা সফল হয়। লা মার্টিনিয়ার, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও বেথুন কলেজের অনেক ছাত্রীরাই এই বিজ্ঞান আলোচনা শুনতে আসতেন। চন্দ্রমুখী বসু, কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, বিধুমুখী বসু, অবলা দাস প্রায় নিয়মিত আসতেন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সরাসরি ফাদার লাফোঁর কাছে বিজ্ঞান পড়েছেন। লরেটো কনভেন্টে পড়তেন ইন্দিরা দেবী। সেখানে ফাদার লাফোঁ বিজ্ঞান পড়াতে যেতেন।[১১]

বিজ্ঞান নিয়ে ভাবছেন, লিখছেন — এরকম মহিলাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় স্বর্ণকুমারী দেবীর। তিনি ১২৯১ থেকে ১৩০১ অবধি ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। 'পৃথিবী' তাঁর বিখ্যাত গবেষণামূলক বিজ্ঞান প্রবন্ধ-পুস্তক। এই দীর্ঘ প্রবন্ধে লেখিকা যে পান্ডিত্যের পরিচয় রেখেছেন, তা প্রশংসার দাবী রাখে। সৌর পরিবারবর্তী পৃথিবী, পৃথিবীর গতি প্রণালী, পৃথিবীর উৎপত্তি, ভূ-পঞ্জরে কয়েকটি অবস্থা, ভূগর্ভ, পৃথিবীর পরিমাণ তৎসহ চারটি প্রস্তাবের বিশদ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে লেখিকা তাঁর জ্ঞান ভান্ডারের প্রবেশ ঘটিয়েছেন। এই পৃথিবীর একটি লেখা 'বিজ্ঞানশিক্ষা' (প্রকাশকাল ১২৮৯)[১২] — যেখানে স্বর্ণকুমারী দেবী খুব সুন্দর করে বিজ্ঞানের যুক্তিবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

"বিজ্ঞান একমাত্র আরোহী প্রণালী অনুসারে নূতন সত্যে উপনীত হয়, এবং অবরোহী প্রণালী অনুসারে একটি বিশেষ সত্য জানিতে পারিয়া আরোহী প্রণালীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সকলের সত্যতা সপ্রমাণ করে। আরোহী প্রণালী অনুসারে রীতিমতো অনুসন্ধান দ্বারাই বিজ্ঞান জগতের যুদ্ধ আরম্ভ হয়।" এরই পাশাপাশি বাংলায় বিজ্ঞানের বেশ কিছু পরিভাষা তৈরি করেছিলেন। বিজ্ঞানের মতো বিষয়কে সহজ করার জন্য কৌতুকের মাধ্যমে তা পরিবেশন করেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখালেখির কিছু পরের দিকে পাওয়া যায় আরেক মহিলা লেখিকার সন্ধান। ইনি কুমুদিনী বসু। বিজ্ঞানের প্রবন্ধ বেশ কয়েকটি লিখেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৩১৭ বঙ্গাব্দ লেখা 'ছায়াপথ' প্রবন্ধটি। প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারত - মহিলা' পত্রিকায়।

"অনন্ত নীল আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ — মরি মরি! কী অপরূপ শোভা! হাজার হাজার হীরার ঝাড় যেন ঝক্‌ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে! ....নক্ষত্রপুঞ্জের আকৃতি, গতি, দূরত্ব

প্রভৃতি নির্ধারণের নিমিত্ত যুগে যুগে মনীষীগণ গভীর গবেষণায় রত রহিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই নক্ষত্রপুঞ্জের বিষয় অতি অল্পই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। নীরদমুক্ত নির্মল আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে, সুদূর ব্যোমপথে নক্ষত্র - বিরচিত এক কিরণময় মন্ডল নয়নগোচর হয়। ....তাহার নাম ছায়াপথ।.....

ছায়াপথ স্তবকে স্তবকে নক্ষত্র অথবা সূত্রগ্রথিত মুক্তাসমূহের ন্যায় নক্ষত্রের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে।" (প্রকাশকাল ১৩১৭)[১৩]

বিজ্ঞানের তথ্য খুব সুন্দর শব্দের ঝংকারে এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে। নক্ষত্র, ছায়াপথ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লেখিকা শুধুই বিজ্ঞানের নীরস তথ্য পরিবেশন করেননি। নক্ষত্র, ছায়াপথ যুগে যুগে মানুষের কাছে এক অসীম বিস্ময়ের! তাকে ঘিরে রয়েছে কত লোককাহিনী উপকথা - লেখিকা সে পৃথিবী ব্যাপী লোকগাথার সম্ভারও টুকরো টুকরো করে সাজিয়েছেন তাঁর লেখায় — যা সমগ্র লেখাটিতে নক্ষত্রের মতোই জ্বলজ্বল করছে। 'খনা' — সম্বন্ধে লিখেছেন মোসাম্মাৎ রাহাতুন্নেছা — 'ভারত মহিলা' - তে (সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ১৩১৯)। লেখাটিতে শুধু খনার জীবনীই নয় - রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় জ্যোর্তিবিদ্যার ওপর যথেষ্ট তথ্য।[১৪] আজকাল আমরা সাইকোলজি, কাউন্সেলিং নিয়ে কথা বলি, লেখা লিখি। চলছে বৈজ্ঞানিক গবেষণাও — এই ধরণের চিন্তাভাবনা উনিশ শতকের বাঙালি মেয়ের লেখার মাধ্যমেও বেরিয়েছে। লেখাগুলো বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। শিশুকে মানুষ করার বৈজ্ঞানিক প্রণালী. পরিবার ও শিশুর সম্পর্ক — সবই লিখেছেন কৃষ্ণভাবিনী দাস। 'সংসারে শিশু' — প্রকাশিত হয়েছে 'সাহিত্য' পত্রিকায়, সংখ্যা - আষাঢ়, ১২৯৯। তিনি লিখছেন। "শিশুকে সুখী করিতে পিতামাতার অসীম জ্ঞান চাই, শিক্ষা চাই, স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের ন্যায় বুদ্ধিপূর্ণ মস্তিষ্ক চাই। সন্তানের শারীরিক যত্নের ন্যায় নৈতিক ও মানসিক শিক্ষা চাই।" মন এবং মনের বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে লিখেছেন প্রিয়ম্বদা দেবী। 'ভারতী' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যাটি (১৩২৬বং) - তে মনের সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক নিয়ে লেখা 'মানসিক' প্রবন্ধটি খুবই উল্লেখযোগ্য।[১৫] বর্তমানে, 'মিউজিক থেরাপি' নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে। বলা হচ্ছে 'মিউজিক অ্যাক্টস্ লাইক আ মেডিসিন'। কিন্তু, উনিশ শতকে যখন সবে মাত্র শিক্ষার আলো আমাদের মহিলাদের মধ্যে পড়ছে, সেই সময়টায় আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই 'কুলরমনীগণের সংগীতবাদ্য শিক্ষার' বিরোধী। সেইসময়ই বামাবোধিনী পত্রিকায় একজন মহিলা লেখিকা, নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী লিখছেন 'সংগীতবাদ্য স্ত্রীলোকের পক্ষে আবশ্যক'— সংখ্যা ভাদ্র, ১৩০১। লেখাটিতে মিউজিকের প্রভাব সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন।

"আমাদের দেশে অধিকাংশ ব্যক্তিই সংগীতবাদ্য শিক্ষায় বিদ্বেষী। তাঁহারা জানেন না যে এই দুটি রমনীকুলের কত উপকারক। প্রথমত, গীতবাদ্য দ্বারা আপনার মন

প্রফুল্ল রাখা যায় ....। দ্বিতীয়ত, সংগীত বাদ্যে মনের প্রফুল্লতাবশত স্বাস্থ্য ভালো থাকে।''[১৬]

অমিতাকুমারী বসু ও এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইনি লিখতেন 'শিশু-সাথী', 'প্রবাসী', 'মহিলা-মহল' ইত্যাদিতে। শিশু-সাথীতে তাঁর লেখা 'পশুপক্ষীর হালচাল' এক অসাধারণ প্রবন্ধ। এ'ছাড়াও, বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক পুণ্যলতা চক্রবর্তী, ১৯২০-৩০-এর দশকে বেশ কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ লেখেন - 'জয়শ্রী', 'ভারতী' ও মহিলামহলে'। এদের মধ্যে 'গাছপালার কথা'—প্রবন্ধটিতে লেখিকার এক অসাধারণ মরমী মনের পরিচয় রয়েছে। রয়েছে সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্যও।[১৭] এরা ছাড়াও রয়েছেন বেগম রোকেয়া ও সরলাবালা সরকার। এঁদের বিজ্ঞান নিয়ে লেখাগুলো খুবই গভীর। বাঙালি মেয়ের বিজ্ঞান ভাবনা যাদের মাধ্যমে জোরদার হয়েছিল, নিঃসন্দেহে তারা হলেন মহিলা ডাক্তাররা। অবলাদেবী (পরে বসু) ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতার ক্লাসে যেমন হাজির থাকতেন, ঠিক তেমনই প্রথম বাংলার বাইরে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন। অনেক কষ্ট, পরিশ্রম করে মহিলারা শুধু ডাক্তারই হননি, এঁরা বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধও লিখতেন। তখন মফস্বল থেকে বেশ কিছু পত্রিকা বের হত।

এখানে চিকিৎসা বিষয়ক, স্বাস্থ্য নিয়ে প্রচুর লেখালেখি মেয়েরা করেছেন। লিখেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়েও। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের নতুন করে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মূল্যায়নে তখন অনেক মহিলা ডাক্তারই প্রভাবিত হন। বিশেষ করে শিশুদের চিকিৎসার ব্যাপারে এরা হোমিওপ্যাথি পদ্ধতিকে খুবই ভরসা করতেন। ''এ ব্যাপারে মহিলাদের আগ্রহ ও জ্ঞান কত গভীর ছিল তা বোঝা যায় হ্যানিম্যান পত্রিকার পাতা ওলটালে। সেখানে রংপুরের এম এম খাতুন লিখেছেন রোগীতত্ত্ব, অ্যান্টিন টার্টারের অদ্ভুত ক্রিয়া, অ্যানাকার্ডিয়ায় ওরিয়েন্টালিষ্ট, টাইফয়েড রোগীর বিবরণ, কান্দির চারুশিলা ঘোষ লিখছেন ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা, পুরুলিয়ার অনুরাধাদেবী লিখছেন বোরক্স ভেনেটা, ব্রোমিন, হোমিওপ্যাথিতে সরিষার তেল''।[১৮] এরা চিকিৎসার পাশাপাশি গবেষণালব্ধ ফলাফলও লিখেছেন। সাধারণ মানুষের কথা ভেবে সহজ করে, সবাই যাতে সহজে বুঝতে পারে — তারজন্য ১৯২১ সালে হিরন্ময়ী সেন লিখেছেন— 'সরল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা'। পাশাপাশি তাঁরা চাইছিলেন লোকের মনের কুসংস্কার, বিভিন্ন বিশ্বাস দূরে থাক—তারা যুক্তিবাদী আর বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠুক[১৯]। ডাক্তার সুজাতা চৌধুরী — ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম চিকিৎসার পাশাপাশি 'ব্লাড হেমাটোলজি' নিয়ে গবেষণা করেন। এই গবেষণাপত্রটি তিনি যেমন ইন্ডিয়ান জার্নালে লেখেন, তেমনই অন্যান্য - ডাক্তাররাও যাতে প্লাজমা দিয়ে চিকিৎসা করতে পারেন - তারও লক্ষ্যে এই পদ্ধতিটিকে জনপ্রিয় করতে কলম ধরেছিলেন। মহিলা

ডাক্তারদের পাশাপাশি বেশ কিছু মহিলা, যাঁদের স্বামীরা চিকিৎসক — তাঁরা বাংলার মেয়েদের মধ্যে বিজ্ঞান ভাবনার বীজ রোপনে সাহায্য করেছিলেন। যদিও এঁরা মূলত কুসংস্কার বিরোধী এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জনসচেতনার কাজ করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুচরিতা পাল। কালনায় তিনি মেয়েদের মধ্যে চিকিৎসাবিষয়ক কাজের সঙ্গে সঙ্গেই এইসব বিষয়ে প্রবন্ধও লেখেন।

বাঙালির চিন্তা-চেতনার জগতে বিজ্ঞানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলার তৎকালীন বিজ্ঞান আন্দোলনের ফলে বাঙালির মনন পরিণত ও যুক্তিমনস্ক হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রসারিত করেছিল। বাংলার ও বাঙালির সেই নবজাগরণে পুরুষদের মতোই বাংলার মেয়েরাও সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন। সমাজ এবং নিজেদের অবস্থার পালাবদলে সামিল হয়েছিলেন, 'কঠিন এবং গভীর' বিষয় বলে বিজ্ঞানকে দূরে ঠেলেননি। বিজ্ঞান শিখেছেন, বিজ্ঞান নিয়ে ভেবেছেন এবং তা নিয়ে লিখেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতা উত্তর বাংলা তথা ভারতে বাঙালি মেয়েরা বিজ্ঞানে জায়গা করে নিয়েছেন।

সূত্রনির্দেশ

১। Arun Kumar Biswas. : Glearings of the past and the science movement. The Asiatic Society. Kolkata. 2000.

২। রণতোষ চক্রবর্তী ঃ বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞান চেতনা ঃ এদেশে, জ্ঞানবিচিত্রা, নবম সংখ্যা, ২০০০, পৃ: ৩৭-৩৮।

৩। গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ ও বিদ্যাসাগর, পশ্চিমবঙ্গ, বিদ্যাসাগর সংখ্যা (১২-১৫), বর্ষ ২৮, ১৪০১।

৪। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (সম্পাদিত) ঃ সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, তৃতীয় সংস্করণ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৪।

৫। সুতপা ভট্টাচার্য ঃ বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য — উনিশ শতক, সাহিত্য আকাদেমী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ৩।

৬। রণতোষ চক্রবর্তী; বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞান চেতনা ঃ এদেশে, জ্ঞানবিচিত্রা, নবমসংখ্যা, ২০০০, পৃঃ ৩৭-৩৮।

৭। সুমনা ঘোষাল ঃ ঔপনিবেশিক বাংলার মহিলা সাহিত্যিকদের রচনায় সামাজিক প্রভাব ও প্রতিফলন (১৮৪৯-১৯২০), শারদীয় নক্ষত্র, (xxxii) বর্ষ, সংখ্যা ১৫৭, ১৪০৯, পৃঃ ৯৬।

৮। এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ও শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়; ভারতীয় বিজ্ঞান উত্তরণের কাল, কেমব্রিজ ইন্ডিয়া, কলকাতা, ২০০৩।

৯। Arun Kumar Biswas : Father Eugene Lafant and the contemporary science

movement The Asiatic Society. Kolkata, 2001. pp. 62.

১০। রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ সংস্কৃত পন্ডিত ও বাংলার নবজাগরণ, শতবর্ষ স্মরণিকা বিদ্যাসাগর কলেজ (রমাকান্ত চক্রবর্তী সম্পাদিত), বিদ্যাসাগর কলেজ স্মারক গ্রন্থ সমিতি, কলকাতা, ১৯৭২, পৃঃ ২৭৩।

১১। শ্যামল চক্রবর্তী ঃ বাংলাদেশে বিজ্ঞানচর্চার দুই পথিকৃৎ ঃ ফাদার লাফোঁ ও মহেন্দ্রলাল, বিজ্ঞানমেলা, উৎসব সংখ্যা, ২০০২, পৃঃ ৫০।

১২। সুতপা ভট্টাচার্য ঃ বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য - উনিশ শতক, সাহিত্য আকাদেমী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ২৬০

১৩। ঐ, পৃঃ ২৬১।

১৪। ঐ, পৃঃ ২৭৩-২৭৫।

১৫। ঐ, পৃঃ ২৮৪-২৮৬।

১৬। ঐ, পৃঃ ১৫৮-১৫৯।

১৭। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (সম্পাদিত) ঃ বাঙালি চরিতাভিধান, তৃতীয় সংস্করণ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৪।

১৮। চিত্রা দেব ঃ মহিলা ডাক্তার ভিনগ্রহের বাসিন্দা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ১৬১।

১৯। Borthwick. Meridith : The changing role of women in Bengal. 1849-1905. ঐ

উনবিংশ শতকের নারীজাগরণের প্রেক্ষাপটে বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চ

রণবীর নাথ

আমাদের আলোচনায় নারীজাগরণ শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে একটি বিশেষ অর্থে। তা হল কেবল নারীসমাজের জাগরণ নয়, নারী সম্পর্কিত এতদিনকার চেতনার পরিবর্তন। নারী সম্পর্কে আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধারণা ছিল একান্তই একপেশে—নারী কেবল নরকের দ্বার, কেবলমাত্র যৌন জীবনের সঙ্গিনী। সে হয় দেবী নতুবা দাসী। কিন্তু নারীর মানবী সত্তাটি প্রায়শই অস্বীকৃত ছিল। নারীরও যে পুরুষের মতই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে, থাকতে পারে চিন্তাশক্তি ও অভিমত একথা আমরা ভাবতে পারিনি। রামায়ণ মহাভারত, পুরাণ ও কালিদাসের মত ক্লাসিক সাহিত্যে কোথাও কোথাও নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীকারের নিদর্শন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মুসলিম আগমনের পর নারী একান্ত ভাবেই পর্দানসীন। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীর স্বতন্ত্র মূল্য ও চেতনার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটেছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চেতনার স্পর্শে আমাদের ঘটে নবজাগরণ। দীর্ঘ কয়েকশত বছরের অন্ধ তমসা দূর হয় মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই। কয়েকজন মনীষীর প্রাণান্তকর চেষ্টায় বাঙালী তার চিত্তের এতদিনকার অর্গলগুলি কিছু কিছু খুলতে সক্ষম হয়, অন্তত এটুকু বুঝতে পারে যে সে এতদিন শিকলদেবীর পূজাবেদীকে আগলে ধরে ঘোর অন্ধকারে ছিল। এই বোধ, এই চেতনাই তার চিত্তের জাগরণ ঘটাতে সাহায্য করল। এতদিনকার অন্ধতাকে বিদায় দিয়ে নতুন যুগের ভোরে বাঙালির আত্মসম্বিত উপলব্ধিকেই উনিশশতকের নবজাগরণ বলতে পারি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, চেতনার জাগরণ ও মুক্তদৃষ্টির চর্চার ফলেই সম্ভব হয়েছে নারী সম্পর্কিত ধারণার পরিবর্তন; নারীকেও মানুষরূপে স্বীকৃতিদানের প্রয়াস।

১) সতীদাহ নিরোধ আন্দোলন :

মৃত স্বামীর চিতায় স্ত্রীর সহমরণ, অনুসরণ, সহসমাধি ইত্যাদি নারকীয় প্রথাকে অতি প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে মুসলমান সুলতান ও নবাবরা এই বর্বর প্রথার বিরোধিতা করলেও ধর্মীয় কারণেই তারা কঠোর হতে পারেননি। উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে এই প্রথার বিরোধিতা শুরু হয়। ইংরেজ মিশনারী থেকে

শুরু করে বিভিন্ন দেশীয় ব্যক্তি এই নারকীয় প্রথার বিরুদ্ধতায় অগ্রসর হন। তৎকালীন সংবাদপত্রে এর পক্ষে বিপক্ষে অজস্র আলোচনা হয়। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে রামমোহনকে সতীদাহের বিরোধিতায় অগ্রসর হতে দেখি। যার ফলশ্রুতি লর্ড বেন্টিঙ্কের সাহায্যে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহ রদ আইন পাস।[১]

বাংলা নাটকের ধারায় সতীদাহ রদ আন্দোলনের তেমন কোন প্রভাব দেখা যায় না। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে লেবেডফের চেষ্টায় বাংলা নাটক ও নাট্যশালার শুভসূচনা হলেও নানা কারণে তা স্থায়ী হয়নি। সখের নাট্যশালার যাত্রা শুরু ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারের মাধ্যমে। তবে এখানে কেবল ইংরাজি নাটকেরই অভিনয় হয়েছে। বাঙালির থিয়েটারে সার্থক বাংলা নাটকের অভিনয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আগে তেমন হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই সতীদাহ কেন্দ্রিক আন্দোলন বাংলা নাটক রচনায় কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সতীদাহ আইনগত ভাবে নিষিদ্ধ হলে এর সমর্থকরা জনসমর্থনের অভাবে আর আন্দোলন করতে পারেননি। ফলে সতীদাহ ব্যাপারটি অচিরেই ইতিহাস হয়ে পড়ে। এবিষয়ে নাটক রচনায় নাট্যকারেরা আর উৎসাহ পাননি।[১]

২) বিধবা বিবাহ আন্দোলনও বাংলা নাটক ঃ

সতীদাহ রদ আইন পাসের পরই বিধবার পুনর্বিবাহকে কেন্দ্র করে সামাজিক আন্দোলন শুরু হয়। রামমোহন স্বযং এই আন্দোলনের সূচনা করেন বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। ২৯.৪.১৮৩৭ এর 'জ্ঞানান্বেষণে' প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে দেখা যায় মতিলাল শীল, হলধর মল্লিক কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্টব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহের উৎসাহ দেবার জন্য একটি সভা স্থাপনের মনস্থ করেছেন। এই সময়ের বেঙ্গল হরকরা, ক্যালকাটা ক্যুরিয়ার, ইংলিশম্যান, ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়া, সমাচার দর্পণ, জ্ঞানান্বেষণ ইত্যাদি পত্রিকা বিধবাবিবাহ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। সমাজের নানা স্তরে বিধবা বিবাহের পক্ষে এবং বিপক্ষে আলোচনা শুরু হয়। অবশেষে বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ হয় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬-এ জুলাই। বিদ্যাসাগর ও তাঁর সহযোগীদের চেষ্টায় বাংলাদেশে ইতস্তত কিছু বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হলেও সতী আন্দোলনের মত তা সার্বিক জনসমর্থন পায়নি।

বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছিল বেশ কিছু নাটক ও নক্শা। এর বেশ কিছুতেই যেমন এই আন্দোলনে সমর্থন রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিরোধিতা। বিধবা বিবাহ সমর্থনকারী নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে ঃ

ক) বিধবাবিবাহ নাটক (১৮৫৬) ঃ উমেশচন্দ্র মিত্র

খ) বিধবোদ্ধাহ নাটক (১৮৫৬) ঃ উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়

গ) বিধবা বিরহ নাটক (১৮৬০) ঃ শিমুয়েল পীরবক্স

ঘ) চপলাচিত্তচাপল্য (১৮৮৭) ঃ যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়

ঙ) দলভঞ্জন (১৮৬১) ঃ হারান চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি।

নাটক হিসাবে এগুলির যোগ্যতা খুব একটা উচ্চমানের নয়। কিন্তু নাট্যকারেরা বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেছেন কাহিনী ও চরিত্রের মাধ্যমে, বোঝাতে চেয়েছেন বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকায় সমাজে কত অমঙ্গল ঘটছে।

উনিশ শতকে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ কেন্দ্রিক নব্যহিন্দুবাদের পুনরুত্থান জাতীয় জীবনে অনেক স্বর্ণ কমল ফুটিয়েছে সত্য, কিন্তু এটা অস্বীকার করা যায় না যে এই আন্দোলন আমাদের কুসংস্কার মুক্তির পথে কিছুটা প্রতিবন্ধকতাও করেছে। বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করে নাটক লিখেছেন গিরিশ, অমৃতলাল ইত্যাদি রামকৃষ্ণ ভক্তেরা। গিরিশচন্দ্রের 'শাস্তি কি শান্তি', মায়াবসান, অমৃতলাল বসুর বাবু, খাসদখল, তরুবালা ইত্যাদি এই শ্রেণীর নাটক। প্রসঙ্গতঃ 'বাবু' নাটকের বঙ্গ মহিলাদের একটি গানের কয়েকছত্র উদ্ধার করতে পারি,

পতি ম'লে হাতের বালা
খুলবো না লো খুলবো না,
বিচ্ছেদ আগুনে প্রাণ-আর তো
জ্বালবো না লো জ্বালবো না।।
আমরা সবাই বিদ্যাবতী;
আসলে প'রে দোস্‌রা পতি,
টানলে প্রাণ তার পানে সই
কেন ঢালবো না লো ঢালবো না।।[২]

৩) কৌলিন্যপ্রথা ও বাংলা নাটক ঃ

দ্বাদশ শতকে বাংলার রাজা বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক রূপে পরিচিত। প্রথমদিকে তা কেবলমাত্র বংশগত উৎকর্ষের ভিত্তিতে নির্ধারিত হলেও ক্রমে তা বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়ায়। সমগ্র মধ্যযুগে এই প্রথার বিশেষ প্রাধান্য ছিল, যার অজস্র নিদর্শন রয়েছে সাহিত্যে। উনিশ শতকের শুরু থেকেই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে 'প্রবর্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ' - এ রামমোহন এই প্রথার বিরোধিতা করেন। ১৮৫৫ - তে বিদ্যাসাগরকে দেখা যায় এই প্রথার বিরুদ্ধতায় অবতীর্ণ হতে। 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' নামক পুস্তিকায় তিনি অজস্র উদাহরণের সাহায্যে কৌলিন্যপ্রথার অমানবিকতার দিকটি তুলে ধরেন। ১৮৫৫ এর ২৭ ডিসেম্বর এই প্রথা রদকল্পে আইন প্রণয়ণের জন্য ভারত সরকারের

কাছে আবেদন করেন। কেবল বিদ্যাসাগর নন, বাংলার নানাস্থান থেকে অজস্র আবেদন প্রেরিত হয়। কিন্তু এই সময়ে সিপাহি যুদ্ধের কারণে সরকার এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে এইসব সামাজিক সমস্যায় মনোযোগ দেবার সময় তাদের ছিল না। কিন্তু আইনগত ভাবে না হলেও জনমতের চাপেই এই প্রথা উঠে যায়। তাছাড়া অর্থনৈতিক কারণ তো ছিলই।

কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধতা ক'রে লেখা নাটকের সংখ্যাই বেশি। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত রামনারায়ণ তর্করত্নের লেখা 'কুলীনকুল সর্বস্ব নাটক'। এছাড়া রয়েছে,

ক) বল্লাল সেন নাটক (১৩২১ বঙ্গাব্দ) ঃ যোগীন্দ্রনাথ দাস।

খ) কলি কৌতুক নাটক (১৮৫৮) ঃ নারায়ণ চট্টোরাজ।

গ) সপত্নী নাটক ১ম ভাগ (১৮৫৮) তারক চন্দ্র চূড়ামণি।

ঘ) কুলীন কায়স্থ নাটক (১৮৬১) অম্বিকাচরণ বসু।

ঙ) কাদম্বিনী নাটক (১৮৬১) ঃ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়

চ) প্রণয় পরীক্ষা নাটক (১৮৬১) ঃ মনোমোহন বসু ইত্যাদি।

তবে কৌলিন্যপ্রথার সমর্থকের সংখ্যাও কম ছিল না। এই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী নানাভাবে চেষ্টা করেছেন তাদের এতদিনকার প্রথাকে টিকিয়ে রাখতে। কিন্তু এই প্রথার সপক্ষে লেখা নাটক একটি বাদে আর পাওয়া যায় না। নাটকগুলির নাম চরিত্রবান, কুলীন ঃ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এক কুলীনকুমার তার চৌদুলি স্ত্রী নিয়ে কিভাবে তারা ঘেরা চন্দ্রের ন্যায় জ্ঞানচর্চা ও শাস্ত্র আলোচনার দ্বারা সুখী হয়েছে তার হাস্যকর আখ্যান এতে বর্ণিত।[৩]

৪) বাল্যবিবাহ প্রথা ও বাংলা নাটক ঃ

বাল্যবিবাহের অপকারিতা সম্পর্কে উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই সচেতনতা দেখা যায়। ১৮৩৯ খ্রি: জানুয়ারী মাসে সংস্কৃত কলেজের অনুষ্ঠিত 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র একটি অধিবেশনে মহেশচন্দ্র দেব তাঁর A sketch of the condition of the Hindoo women প্রবন্ধে বাঙালি মেয়েদের বাল্যবিবাহের যে করুণ অবস্থার সৃষ্টি হয় তা বর্ণনা করেছেন। ১৮৪৭ সালে ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামী ও ছাত্ররা বাল্যবিবাহের দোষ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আহ্বান করেন। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' এর ফলাফল বের হয়। গুপ্ত কবির ধারাবাহিক নানা রচনা ছাড়া 'সোমপ্রকাশ', 'মিত্রপ্রকাশ' 'বামাবোধিনী' 'ভারত সংস্কারক' 'জ্ঞানাঙ্কুর' 'নবপ্রবন্ধ' 'বঙ্গমহিলা' ইত্যাদি পত্রিকা এই বাল্যবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে সরব হয়। ঢাকায় 'বাল্যবিবাহ নিবারণী' নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। 'সর্বশুভকরী পত্রিকা'য় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেন।

এই অনিষ্টকারী প্রথার বিরুদ্ধে লিখিত নাটকের সংখ্যা কম নয়। এজাতীয় কিছু নাটক হল ঃ

ক) বাল্যবিবাহ (১৮৮১) ঃ রমেশচন্দ্র দত্ত।

খ) বাল্যোদ্বাহ নাটক (১৮৬০) ঃ শ্যামাচরণ শ্রীমাণি

এই প্রথার সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে সহবাস কেন্দ্রিক আন্দোলন; যার ফলশ্রুতি 'সহবাস সম্মতি আইন' (১৮৯১)। অনেক শিক্ষিত হিন্দুও এই আইনের বিরোধিতা করেছেন, সমর্থন করেছেন বাল্যবিবাহকে। এদের মানসিকতা ধরা পড়ে নিম্নোক্ত নাটকগুলিতে,

ক) সম্মতি সংকলন ঃ অমৃতলাল বসু

খ) সহবাস বিভ্রাট ঃ হরিকুমার চৌধুরী

গ) কনের মা কাঁদছে ঃ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

ঘ) বিয়ে পাগলা বুড়ো ঃ দীনবন্ধু মিত্র ইত্যাদি।[৪]

৫) পণপ্রথা ও বাংলা নাটক ঃ

পণপ্রথা হিন্দু সমাজের এক চিরকালীন দুষ্টক্ষতা। আর্যসমাজে 'বরপণ' ও 'কন্যাপণ' দুয়ের প্রচলন থাকলেও ক্রমে বরপণ মুখ্য হয়ে ওঠে। উনিশ শতকে পণপ্রথার নৃশংসতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়তে থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই নাট্যকারেরা পণপ্রথাকে তাদের নাট্যভাবনা থেকে দূরে রাখতে পারেননি। বরপণই সেখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। এই ধরণের নাটকের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান'। বাঙালি কন্যার বিবাহ যে 'বলিদান' ছাড়া কিছু নয় এই নাটকে তাই তুলে ধরেছেন গিরিশচন্দ্র। এজাতীয় আর কয়েকটি নাটক হল ঃ

ক) বিবাহ বিভ্রাট (১৮৮৪) ঃ অমৃতলাল বসু

খ) ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি (১৮৮৫) রাধামাধব হালদার।

গ) পাশ করা জামাই (১৮৮০) রাধাবিনোদ হালদার

ঘ) লোভেন্দ্র গবেন্দ্র (১৮৯০) রাজকৃষ্ণ রায়

ঙ) কন্যাদায় (১৮৯৩) যতীন্দ্রশর্মা। ইত্যাদি।[৫]

এইভাবে একের পর এক সামাজিক কুপ্রথার উপর আঘাত করে নাট্যকারেরা যেমন সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় রেখেছেন তেমনি মেয়েদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করেছেন। নারী কল্যাণের সচেতন উদ্দেশ্য অনেক ক্ষেত্রেই এগুলির হানি ঘটিয়েছে, উদ্দেশ্য মূলকতাই প্রকট হয়ে উঠেছে, তবু এর দ্বারা যে নারীসম্পর্কিত চেতনার নবায়ণ ঘটেছে, অন্তত ঘটানোর চেষ্টা হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও নারীর ব্যক্তিত্ব, তার হৃদয়ের আলোড়ন বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। মধুসূদনের কাব্যে

নাটক, বঙ্কিম রমেশের উপন্যাসে এর উজ্জ্বল উদাহরণ। কিন্তু কর্মের জগতে নারীর আত্মপ্রকাশ অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। ধর্মের দোহাই, ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে নারীকে অন্তঃপুরে রাখার অনেক চেষ্টা হয়েছে। তবু উনিশ শতকেই দেখি মহিলা গ্রাজুয়েটের আবির্ভাব, সাহিত্য শিল্পে-কর্মে তাদের আগমন।

বাংলা রঙ্গমঞ্চে মেয়েদের আগমন হয়েছে অনেক বিলম্বে। প্রথম বাংলা নাটক ও মঞ্চের পথিকৃত লেবেডফ তাঁর বেঙ্গলী থিয়েটারে (১৭৯৫) মেয়েদের অভিনেত্রী হিসাবে নিয়েছিলেন। কিন্তু তা একেবারেই বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। স্ত্রীচরিত্রে দীর্ঘকাল পুরুষ অভিনেতারাই অভিনয় করে গেছেন। শ্যামবাজারের জমিদার নবীনচন্দ্র বসু তার বাড়ির থিয়েটারে প্রথম অভিনেত্রীদের গ্রহণ করেছিলেন সম্ভবত বারাঙ্গনা পল্লী থেকে। 'হিন্দু পাইয়োনীয়ার' (২২.১০.১৮৩৫) এর খবরে এই অভিনেত্রী গ্রহণকে সাধুবাদ জানান হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই প্রথাকে গ্রহণ করার সাহস দীর্ঘদিন আর কেউ দেখাতে পারেননি।[৬]

১৮৭২ খিস্টাব্দে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় 'ন্যাশানাল থিয়েটার' এর যাত্রা শুরু হয় পুরুষ অভিনেত্রী নিয়েই। মাইকেল বিভিন্ন চিঠিপত্রে স্ত্রীচরিত্রে অভিনেত্রী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে আসছিলেন। অবশেষে তাঁর পরামর্শেই বেঙ্গল থিয়েটার বারাঙ্গনা পল্লীর চারটি মেয়েকে নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এরা হলেন জগত্তারিণী, গোলাপসুন্দরী (পরবর্তীকালে সুকুমারী দত্ত নামে পরিচিত) এলোকেশী, শ্যামাসুন্দরী। মৌচাকে ঢিল পড়ার মত এই ঘটনায় তৎকালীন সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সমাজ নষ্ট, যুবক সম্প্রদায়ের অধোগতি ইত্যাদির আশঙ্কায় সমকালীন পত্রপত্রিকা গুলি নাট্যশালার উপর বিষোদগার শুরু করে। নাট্যশালার সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করেন বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, শিবনাথ শাস্ত্রীর মত আরো অনেকে। তবু তাদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও ব্যবসার কারণেই ক্রমে অন্যান্য থিয়েটারেও অভিনেত্রীরা গৃহীত হন। কিন্তু যেহেতু ভদ্রঘরের মেয়েদের অভিনয়ের আসরে পাওয়া সম্ভব ছিল না, তাই উনিশ শতকের সাধারণ রঙ্গালয়ের সব অভিনেত্রীই ছিলেন পিতৃপরিচয়হীন এবং বারাঙ্গনা পল্লী থেকে আগত।[৭]

অভিনেত্রী গ্রহণকে কেন্দ্র করে বাংলা রঙ্গমঞ্চে যে বিপুল প্রতিক্রিয়া দেখা গেছিল উনিশ শতকের পত্রপত্রিকায়, বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচনায় তার সাক্ষ্য রয়ে গেছে। শিক্ষিত ভদ্রসমাজ নানা প্রগতিশীল আন্দোলন, নারী কল্যাণমূলক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মঞ্চে নাটকের আসরে অভিনেত্রীদের আগমনকে সমর্থন করতে পারেননি। কেবল যে অভিনেত্রীরা বারাঙ্গনা এটাই তাদের বিরোধিতার একমাত্র কারণ নয়। এটা বুঝতে পারি যখন জোড়াসাঁকোয় থিয়েটারে ঠাকুর বাড়ির মেয়েরা অংশ গ্রহণ করছেন তখন এইসব নীতি বাগীশরা কটূক্তি করতে ছাড়েন নি। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর টাউন হলে যে প্রকাশ্য সভার আয়োজন হয়েছিল তাতে কোন অভিনেত্রীকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি,

শোক প্রকাশ তো দূরের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের রঙ্গমঞ্চে আগমন ও বিনোদিনীকে আশীর্বাদ (৩১.০৯.১৮৮৪) রঙ্গ মঞ্চের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। এরপর আরো অনেক সাধু-মহাত্মার পদধূলি পড়েছে রঙ্গমঞ্চে। তা সত্ত্বেও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে মঞ্চ ছিল অপাংক্তেয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর মত মানুষ রামকৃষ্ণ মঞ্চেও আসার পর তার সংশ্রব ছিন্ন করেন।[৮]

ঊনিশশতকের নবজাগরণ প্রধানত মধ্যবিত্ত জীবন কেন্দ্রিক। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই নানা স্ববিরোধিতায় আর্কীণ। পুরুষের দ্বারা নারী জাগরণের প্রচেষ্টাও তাই নানা স্ববিরোধিতায় ভরা তেমনি একটি বিশেষ পরিধি পর্যন্তই তার বিস্তার। নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতা, ইত্যাদিও চিন্তা একটি নির্দিষ্ট গন্ডী পর্যন্তই, তার বাইরে নয়। সেজন্য যে বাংলা নাটক ও মঞ্চে মেয়েদের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে, সেখানেই অভিনেত্রীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। আজ পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে এসব প্রসঙ্গ হাস্যকর মনে হলেও, এসবই ছিল এক সময়কার বাস্তব।

সূত্রনির্দেশ

১) স্বপন বসু ঃ বাংলার নবচেতনার ইতিহাস, ২০০০, পৃঃ ১১১-১৩১।

২) আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন, ১৯৬৪, পৃ ৯৫-১৫০। এবং স্বপন বসু ঃ বাংলার নবচেতনার ইতিহাস, পৃ ১৩১-১৪৭।

৩) অশোক কুমার মিত্র ঃ বাংলা প্রহসনের ইতিহাস, ১৯৮৮, পৃ ১৮-২৯। এবং স্বপন বসু ঃ বাংলার নবচেতনার ইতিহাস, পৃ ১৪৭-১৬১।

৪) অজিত কুমার ঘোষ ঃ বাংলা নাটকের ইতিহাস, ১৯৮৫, পৃ ৯৬-৯৭, ২০৪-২০৫। এবং স্বপন বসু ঃ বাংলার নবচেতনার ইতিহাস, পৃ ১৬১-১৬৩।

৫) রণবীর নাথ ঃ ঊনবিংশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক (প্রবন্ধ) পৃ ৪৯৫-৪৯৭, ইতিহাস অনুসন্ধান-৭

৬) অজিত কুমার ঘোষ ঃ বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস ১৯৮৫, পৃ ২৩-২৫।

৭) দর্শন চৌধুরী ঃ ঊনিশ শতকের নাট্যবিষয়, ১৯৮৫, পৃঃ ৭১-৭৭,

৮) হেমেন্দ্র প্রসাদ দাসগুপ্ত ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র, ১৯৫৩, পৃ-৩২। এবং হেমলতা দেবী ঃ পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত, ১৩৯০, পৃ-৪৭।

আধুনিকতার নিরিখে রাণী রাসমণি ও তাঁর ধর্মচিন্তা

অনিন্দিতা ঘোষাল

রাসমণির জন্মসাল ১২০০ বঙ্গাব্দ, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ। যুগ ও সমাজের প্রেক্ষাপটে, মূলত যে সময়ে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেরও পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল—সেই যুগসন্ধিক্ষণের সময়েই আবির্ভাব ঘটে এই মহিয়সী নারীর। তাঁর অন্তর বাহির নিরন্তন সবার কল্যাণ কামনায় সর্বজনের হিতসাধনায় প্রবৃত্ত থেকেছে। তাই তিনি অহংবোধকে ত্যাগ করে নিজেকে একটি বিশেষ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, প্রখর অনুভূতি, গভীর দূরদৃষ্টি তাঁকে অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, রাণী রাসমণি আসলে 'অষ্টসখী'-র একজন। কিন্তু সেটা তাঁর ভাবরাজ্যের কথা — তাঁর গূঢ় উপলব্ধির কথা। আমরা সাধারণ মানুষ তাঁকে দেখতে পারি শুধু ইতিহাসের আলোকে। তখনই মনে হবে — দানে, দয়ায়, ব্যক্তিত্বে, সাহসে, বুদ্ধিমত্তায় ও ভক্তিসাধনায় তিনি এক অনন্যা নারী। ইতিহাসের পাতা থেকে এমন মহিমময়ী, বর্ণময়ী অন্য নারীকে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীগ্রন্থে তাঁকে বলা হয়েছে — ' a rich widow of great piety', ধার্মিকতা অবশ্যই তাঁর চরিত্রের একটা বড় দিক ছিল। কিন্তু এখানে যে অর্থে rich কথাটিকে ব্যবহার করা হয়েছে, তা সর্বঅর্থেই সার্থক। তিনি শুধু আর্থিক দিক থেকেই ধনী ছিলেন না, ধনী ছিলেন মনে - প্রাণে - কর্মে-ও আত্মায়। ডঃ নীরদবরণ হাজরা যথার্থই মন্তব্য করেছেন— "তীক্ষ্ণ বিষয় বুদ্ধি, জনহিতকর কর্ম্ম এবং ধর্মচর্চ্চার প্রতি আকর্ষণে রাণী এক অসাধারণ চরিত্র' (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত অভিধান) তিনি সর্বঅর্থেই ছিলেন রাণী। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে তাৎপর্যের বিষয় হল — তাঁর জীবন ছিল এক নিরন্তর সংগ্রাম! তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে অজস্র প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। সেই সংগ্রামের পেছনে কখনও ছিল আত্মমর্যাদা রক্ষার কঠিন প্রতিজ্ঞা, আবার কখনো ছিল লোকহিতৈষণার প্রেরণা। কঠোরে কোমলে সত্যই তিনি ছিলেন অনন্যা।

রাণী রাসমণির দানধ্যান ও পুণ্যকর্মের কোন তুলনা হয় না। জনহিতকর কর্ম সম্পাদন করা তাঁর জীবনের অঙ্গ ছিল। এমনকি তিনি যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির আয়োজন করতেন; তাতে সাধারণ দরিদ্র মানুষ অনেকটাই পেশাগতভাবে উপকৃত হতো। তিনি গঙ্গাবক্ষে

প্রচুর ঘাট নির্মাণ করেন। এছাড়া কালীঘাটে বাগানবাড়ী পুকুর ও আদি গঙ্গার পাকা ঘাট তৈরি করান। তিনি টোনার খাল খনন করিয়ে একে মধুমতী নদীর সঙ্গে যুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। এতে কৃষকদের চাষের এতো সুবিধা হয়েছিল যে কৃষকরা তাঁকে মাতৃসমা বলে শ্রদ্ধা জানাতে শুরু করেন। পরাধীন ভারতে ইংরেজ বিরোধিতা করার মধ্যে দিয়ে তিনি একদিকে তেজস্বীতার পরিচয় দিয়েছেন; তেমনই অন্যদিকে বারবার এই সাহসিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁর প্রজাবাৎসল্যের প্রমাণ দিয়েছেন। এই দ্বৈত মূর্তিতে তাঁকে দেখা গেছে বারবার।

কিন্তু তৎকালীন সময়ের প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ্য যে — তিনি তথাকথিত জমিদার পত্নীদের মতো অসূর্যম্পশ্যা ছিলেন না। জমিদারী পরিচালনা করতেন তিনি নিজের হাতে। এরজন্য তাঁকে প্রস্তুতিও নিতে হয়েছিল। তিনি শাস্ত্রপাঠ করেছিলেন, জামাতাদের সঙ্গে বিষয়কর্ম নিয়ে তাঁর যেমন কথা হতো, আবার ধর্মীয় আলোচনাও বাদ যেত না। এমনকি দ্বারকানাথ ঠাকুরের সামনেও চাতুর্যের সঙ্গে বিষয় আলোচনা করতে তিনি কোন দ্বিধাবোধ করেননি। একদিকে দেবেন্দ্রনাথের তন্নিষ্ঠ ব্রহ্মসাধনা, কেশব সেনের ধর্মপ্রচার, অন্যদিকে রাধাকান্ত দেব প্রমুখের সামাজিক প্রতিষ্ঠার দাপট — রাসমণি এ সবের মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছিলেন। তাঁর পরিণত জীবনে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব ঘটেছিল। যে নারী শিক্ষার জন্য, নারী সমাজের মুক্তি ও প্রগতির জন্য বিদ্যাসাগরের প্রয়াসের অন্ত ছিল না — রাসমণিকে সেই সমাজের অগ্রবর্তিনী বললে বোধকরি ভুল বলা হবে না।

রাসমণির শিক্ষা তাঁকে ক্রমশ নিয়ে গিয়েছিল সংযম ও ত্যাগের পথে। ধর্মকে অবলম্বন করে তাঁর অধ্যাত্ম চেতনা বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধর্মান্ধতার আনুগত্য মেনে নেননি। সহজভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাসের মতোই ধর্মীয় আচরণ ছিল তাঁর সহজাত। জোর করে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়; এ ছিল তাঁর অন্তরের বিশ্বাস। যাকে আশৈশব তিনি লালন করেছিলেন এবং পরিণত জীবনে প্রকৃত পরিবেশে পল্লবিত হয়ে তা মহীরূহ হয়ে উঠেছিল।

রাণীর জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্তি ১৮৫৫ সালে দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা। এর স্থান নির্বাচনও পেছনেও এক অদ্ভুত তাৎপর্যপূর্ণ। ওই জমির একদিকে ছিল সুপ্রীম কোর্টের অ্যার্টনি জেমস হেষ্টির কুঠী। অন্যদিকে ছিল মুসলমানদের কবর ও গাজিসাহেবের থান (স্থান)। মাঝখানে হলো হিন্দু মন্দির। এটি যেন ভবিষ্যতের এক অলৌকিক ইঙ্গিত বয়ে এনেছে। এখানেই রাণীর পুরোহিত, যুগাবতার রামকৃষ্ণদেবের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে সর্বকালের মহত্তম বাণী — 'যত মত, তত পথ'। দক্ষিণেশ্বরে নির্মিত মন্দিরগুলি সম্পর্কে একটি জিনিস লক্ষ্যণীয় যে এখানকার বৃহত্তম মন্দিরটি অবশ্যই ভবতারিণী

কালীর। কিন্তু একদিকে আছে রাধাকান্তের মন্দির, বিপরীত দিকে দ্বাদশ শিবমন্দির। অর্থাৎ শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব - সব মতেরই যেন সমন্বয় ঘটেছে এখানে। ইতিহাসবিদ ডঃ নিমাই সাধন বসু তাই মন্তব্য করেছেন যে — রাণীর প্রাঙ্গনে ঘটেছে এক মহামিলন " .... Thus symbolising the harmony of the Sakta, Vaishnava and Saiva doctrines" (The Indian Awakening and Bengal)।

কিন্তু এই সময়ে আবার প্রতিকূলতা দেখা দেয় মা-কালীর অন্নভোগ দেওয়ার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। প্রতিকূলতার সামনে নতি স্বীকার করার মানসিকতা তাঁর কোনদিনই ছিল না। এক্ষেত্রে ইতিহাস নিজেই বুনে চলে নিজ গতিপথ। রাম কুমার চট্টোপাধ্যায় ও গদাধর মন্দিরের পুরোহিতের পদে নিযুক্ত হন। নির্মল কুমার রায় তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্পর্শে', গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে—রাসমণির সস্নেহ সমর্থনই তাঁকে গদাধর থেকে ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণে পরিণত করেছিল।

তাই বলা যায় যে — রাণী যে যুগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েছিলেন, তাতে তিনি এক ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি অগাধ সম্পদের অধিকারিণী হয়েও বিলাস-ব্যসনে মন দেননি, বরং অজস্র ব্যয় করেছেন দান-ধ্যানে, ধর্ম-কর্মে। বিশাল জমিদারী নিয়ে তিনি নিষ্ঠুর শাসিকা হননি। হয়েছেন প্রজা মাতৃকা। যেকালে অনেক জমিদারই ইংরেজ কর্তৃপক্ষের তোষামোদ করেছেন, তিনি তার সঙ্গে বার বার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে মানুষের মনে উসকে দিয়েছেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অস্পষ্ট চেতনাকে। সেইসঙ্গে তিনি নানাভাবে ভেঙেছেন সামাজিক গোঁড়ামি আর ক্ষুদ্রতাকে। পুজোর ব্যাপারে বিভিন্ন মত ও পথকে উদার স্বীকৃতি দিয়েও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন ধর্ম সমন্বয়ের ভিত্তিভূমি।

সবচেয়ে বড় কথা — সেই সময়ে যে হিন্দু ধর্মের এক নবজাগরণ ঘটেছিল, তিনি ছিলেন তারও এক বিনম্র স্থপতি। ইংরেজ শাসনে অধীন প্রজাদের মধ্যে হীনমন্যতা ও মিশনারীদের ধর্মপ্রচার দেশে যে একটা প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, সেই প্রতিকূলতাকে রোধ করে জাতির নব জাগরণ ঘটানোর ক্ষেত্রে তিনিও ছিলেন অন্যতম যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে রাণী রাসমণির একটা গৌরবময় ভূমিকা ছিল।

সূত্রনির্দেশ

১) গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ — রাজেশ্বরী রাসমণি, যোগমায়া প্রকাশনী, ১৯৮৮, কোলকাতা।

২) প্রণবেশ চক্রবর্তী — "রাণী রাসমণির আবির্ভাবের দুশো বছর", সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩।

৩) পবিত্র কুমার ঘোষ — "অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি", সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩।

৪) প্রেমতোষ দে — "অন্তরের ঐশ্বর্যেই মহিয়ষী রাণী রাসমণি", সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩।

৫) পূর্বা সেনগুপ্ত — "ঠাকুর পুজো করতেন গান গেয়ে", সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৯ অক্টোবর, ১৯৯৪।

৬) তারক ঘোষ — "দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী মন্দিরে পূজা", সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৯ অক্টোবর, ১৯৯৪।

৭) পবিত্রকুমার ঘোষ — "শ্রীরামকৃষ্ণের কালীপূজা" সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৯ অক্টোবর, ১৯৯৪।

৮) নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত — "লোকমাতা রাণী রাসমণি", সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬।

৯) শিবসৌম্য বিশ্বাস — "ঈশ্বর ও তাঁর পিসীমা" সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬।

১০) পবিত্রকুমার ঘোষ — "শ্রীরামকৃষ্ণ চিনেছিলেন রাণী রাসমণিকে", সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬।

হিন্দু দায়াধিকার - স্বত্ব আইনে নারীর সম্পত্তির অধিকার

অনুরাধা ঘোষ

বিগত শতকের — শেষ ৩০ বছর ধরে বিশ্বব্যাপী নারীবাদী চেতনার বিকাশ ঘটায় পুরুষ শাসন যে কোনো ঈশ্বর দত্ত বিধান নয় বা প্রকৃতির বিধান নয় সেই সত্যটি আজ সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত। প্রগতিবাদী চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসার ফলে নারী সমাজ আত্ম অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে সবরকমের শোষণ বৈষম্য থেকে মুক্তি লাভের আশায় লড়াই শুরু করে। নারীদের অবদান নিয়ে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। সেই সঙ্গে নারী অধিকার সংক্রান্ত ধ্যান ধারণার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষিত হয়।

এ পর্যন্ত ভারত ইতিহাসের চর্চায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মতাদর্শগত প্রাধান্য লক্ষণীয়। প্রাচীন ভারতের সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থান ও নারীর বিভিন্ন অধিকার নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় কর্তব্যটির প্রতি ইতিহাস বিদ্‌দের উপযুক্ত দৃষ্টি পড়েনি। ভারতের নারী বিষয়ে অনৈতিহাসিক ও তথ্যনির্ভর নয় এমন কিছু এলোমেলো আলোচনা দ্বারা তৎকালীন নারীর স্থান ও অধিকার বিষয়ে সত্যের অপলাপ ঘটানো হয়েছে।[১]

বর্তমান নিবন্ধে প্রাচীন দায়াধিকার - স্বত্ব আইনে নারীর সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত বিধিবিধানগুলি আলোচনা করার চেষ্টা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের সূত্র সাহিত্য, স্মৃতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থগুলিতে এবং পরবর্তীকালে বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরা আইনগ্রন্থে ও জীমূতবাহনের দায়ভাগ আইনে নারীর সম্পত্তির অধিকার কতখানি স্বীকৃত ছিল তা দেখানোর চেষ্টা করেছি।

ঋগ্বৈদিক সাহিত্যে দায়াধিকার - স্বত্ব আইনে নারীর অধিকার সম্পর্কে বিশেষ আলোচনার অবকাশ নেই। সেইযুগে শকট, ভারবাহী পশু, যৌতুক এবং দানসামগ্রীর মধ্যে নারীকেও গণ্য করা হত। অর্থাৎ নারীর কোনো সম্পত্তির ওপর মালিকানাস্বত্ব তো ছিলই না, উপরন্তু নারীই সম্পত্তি রূপে বিবেচিত হত। প্রাচীন শাস্ত্রে 'বধূ বা নবপরিণীতা স্ত্রী 'বিবাহ' কথাটি বারংবার উল্লিখিত হয়েছে। 'বিবাহ' শব্দটির উৎপত্তি 'বাহ' শব্দ থেকে যার অর্থ বহন করে আনা। নবপরিণীতা স্ত্রী বা বধূকে তার পিত্রালয় থেকে বহন করে আনা হত পতিগৃহে।[২] বেদোত্তর যুগের স্মৃতি ও সূত্র সাহিত্যে নারীর মালিকানাস্বত্ব সম্পর্কে উল্লেখ আছে। যেমন মনুস্মৃতিতে বিশ্বস্ত বিধবা পত্নী, বন্ধ্যা ও রুগ্না স্ত্রীলোকের সম্পত্তির

মালিকানাস্বত্ব স্বীকৃত হয়েছে। (মনু ৮ম অধ্যায়)। ভ্রাতাদের সম্পত্তির অধিকারে অবিবাহিত ভগ্নীর একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রাপ্য। (মনু ৯ম অধ্যায়) মৃত ব্যক্তির পুত্র না থাকলে বিধবা পত্নীর প্রাপ্য হবে তাঁর সম্পত্তি (যাজ্ঞবল্ক্য ২য়) এবং স্ত্রীলোকের বিশেষ সম্পত্তি 'স্ত্রীধন' (টাকাকড়ি, মণিমুক্তা, বস্ত্র, বাসনপত্র) ভোগ করার ও উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত করার অধিকার গৃহীত হয়েছে।[৩] অবশ্য মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়েই বিধান দিয়েছেন যে অন্য কোনও উত্তরাধিকারী না থাকলে পুনর্বিবাহিতা রমনীর পুত্র পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। স্মৃতিশাস্ত্রে বিবাহবিচ্ছেদ বা বিধবার পুনর্বিবাহের অধিকার স্বীকৃত না হলেও মনু বা যাজ্ঞবল্ক্য পুনর্বিবাহিতা রমনীর পুত্রকে সম্পত্তির অধিকার দান করেছেন।

বেদোত্তর যুগের যাসু, বৌধায়ন, আপস্তম্ব ও গৌতম প্রমুখ আইন প্রণেতাগণের সকলেই ছিলেন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদের সমর্থক। গৌতম বলেছেন কোনো ব্যক্তি অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তাঁর স্ত্রী সম্পত্তির মালিকানা পাবেন এবং সেই সঙ্গে গৌতম বিধবা পত্নীকে তাঁর স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা দেবরের ঔরসে পুত্রলাভ করার অধিকারও দিয়েছেন।[৪]

অর্থশাস্ত্রে দীর্ঘকাল প্রবাসী অথবা সন্ন্যাসী ব্যক্তির স্ত্রীকে পুনর্বিবাহের অধিকার দেওয়া হয়েছে তবে শ্বশুরের অনুমতিক্রমে। কারণ শ্বশুরের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করলে সে 'স্ত্রীধন' থেকে বঞ্চিত হত। বিধবা বিবাহ খুব ভাল চোখে দেখা হত না তার প্রমাণ স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রবতী হওয়া সত্ত্বেও বিধবা তার পুনর্বিবাহের পর সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হত।

দ্বাদশ শতকে আবির্ভূত হলেন বিখ্যাত আইনপ্রণেতা বিজ্ঞানেশ্বর। ইনি দক্ষিণ ভারতের চালুকা রাজ বংশের আইন মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর মিতাক্ষরা গ্রন্থে দুই প্রকার সম্পত্তির কথা বলা হয়েছে - যৌথ সম্পত্তি ও পৃথক সম্পত্তি। যৌথ সম্পত্তিতে নারীর তেমন কোন বিশেষ অধিকার ছিল বলে মনে হয় না তবে বিবাহিতা স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব ছিল তার স্বামীর ওপর। অবিবাহিতা কন্যার প্রতিপালনের ভার ছিল তার পিতার ওপর। বিবাহে প্রাপ্ত যৌতুকের ওপর কন্যার অধিকার ছিল। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থে পুত্রহীন ব্যক্তির বংশরক্ষার কথা বিবেচনা করে 'পুত্রিকাপুত্র' অথবা কন্যার গর্ভজাত সন্তানকে সম্পত্তির অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পৃথক সম্পত্তিতে পুত্রহীনা বিধবা নারীকে সম্পত্তির আজীবন মালিকানাস্বত্ব দান করা হয়েছে যদি সে পবিত্র, শুদ্ধভাবে জীবনযাপন করে।

নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দান ব্যতীত কোনোভাবেই এই সম্পত্তি সে দান, বিক্রয় বা বন্ধক রাখতে পারত না।

জীমূতবাহনের দায়ভাগ আইনে অবশ্য বিধবা নারীকে এবং তার মৃত্যুর পর তার কন্যাদের সম্পত্তির মালিকানাস্বত্ব স্বীকার করা হয়েছে। বাংলায় প্রচলিত এই আইনে

পৈতৃক ও স্ব উপার্জিত উভয় প্রকার সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ও স্ত্রীধনের উপর নারীর পূর্ণ অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। তবে মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ উভয় আইনেই 'স্ত্রীধন' বলতে শুধুমাত্র টাকাকড়ি অলঙ্কারাদির কথা বলা হয়েছে কিন্তু গৃহ বা জমির কথা বলা হয় নি। অর্থাৎ শুধুমাত্র অস্থাবর সম্পত্তির ওপরই নারীর অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। এই স্ত্রীধন বলতে বিবাহের পূর্বে তার পিত্রালয় থেকে এবং বিবাহেরপর তার স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত অস্থাবর সম্পত্তি বোঝায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্ত্রীধনের ওপরও তার অধিকার সংকুচিত হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম হিসাবে দেখা যায় মহারাষ্ট্র অঞ্চলকে যেখানে স্ত্রীধনের ওপর নারীর অধিকারকে খর্ব করা হয়নি। "The Bombay subschool .... held that Property which a women inherited from a male of the family .... or inherited from a female became her stridhan and her absolute estate." [৫]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই শাস্ত্রীয় বিধানগুলি শুধুমাত্র উচ্চশ্রেণীর ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য ছিল, নিম্নশ্রেণীর মানুষরা এগুলির ওপর কম গুরুত্ব দিত এবং উপজাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রগুলির বিধান প্রচলিত ছিল না।

বিংশশতকের প্রথমদিকে বিভিন্ন নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে স্ত্রী পুরুষের বৈষম্য দূর করে লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হয়। নারীর বিবাহ বিচ্ছেদ, পুনর্বিবাহ এবং স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকারের দাবী রাখেন এই মহিলা সংগঠনগলি। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান তৎকালীন বিধানসভার রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী ভারতীয় সদস্যগণ। ১৯৩৭ খ্রি: প্রবর্তিত বিলটি মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ আইনশাসিত অঞ্চলগুলিতে হিন্দু বিধবার সম্পত্তি অধিকার স্বীকার করেছে তবে শুধুমাত্র তার জীবদ্দশায় সে এই অধিকার ভোগ করবে।

মেয়েদের প্রতি এই আইনগত বৈষম্য ঘোচানোর জন্য ১৯৪১ খ্রি: সরকারের তরফ থেকে রাও কমিটি গঠন করা হয়। এই কামাটি নারীর উত্তরাধিকার, বিবাহ ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত প্রস্তাবিত আইনগুলির খসড়া রচনা করে ১৯৪৪ খ্রি:।

১৯৪৭ খ্রি: প্রবর্তিত আইনে মিতাক্ষরায় প্রদত্ত জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অধিকার যোগ করা ও সম্পত্তিতে পুত্রদের সমান অংশবিভাজন এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অর্ধাংশ স্ত্রী ও বাকি অংশ তার পুত্র ও কন্যা - উভয়ের মধ্যেই সমবন্টনের কথা বলা হয়। এছাড়া বিধবা পত্নীর সম্পত্তিতে পূর্ণ মালিকানা স্বত্ব (সীমিত মালিকানাস্বত্বের পরিবর্তে) স্বীকৃত হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় পাঁচটি শহরে এবং এই শহরগুলিতে কালো পতাকা সহ বিক্ষোভ দেখানো হয়। মেয়েদের পক্ষ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট হয়। NCWI, AIWC সমর্থন করে কিন্তু All India Hindu Women's Conference এর মত রক্ষণশীল সংগঠন এর বিরোধিতা করে।[৬]

শেষ পর্যন্ত বিরোধিতা উপেক্ষা করে ১৯৪৭ খ্রি: রাও কমিটি একটি সংশোধিত বিল পেশ করে যার নাম Hindu Code Bill। এক বছর পর স্বাধীন ভারতের পার্লামেন্টে বিলটি পুনরায় সংশোধিত রূপে পেশ করা হয় এবং এটিকে ঘিরে তুমুল বিতর্কের সূচনা হয়। বাংলার বিধানসভার জনৈক কংগ্রেস সদস্য এটিকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করে বলেন "Only Women of lavender, lipstick and Vanity bag Variety' were interested in the Bill।

তিনি প্রশ্ন তোলেন "Are you going to enact code which will facilitate the breaking up of our households? (GOI, 1949 : 1011) If the daughter inherits ultimately the family will break up[৭]।

বিস্ময়ের ব্যাপার রাজেন্দ্র প্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেলের মত কংগ্রেস নেতারাও এর বিপক্ষে ছিলেন। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের চাপের মুখে পড়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরু এই বিলের কিছু অংশ সংশোধন করেন। ১৯৫১ খ্রি: বি. আর. আম্বেদকর এর প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ করেন।

শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তিতে নারীর আইনগত অধিকার অনেকাংশে স্বীকৃত হয়। এইভাবে লিঙ্গ বিষম্য ঘোচানোর প্রচেষ্টা চলেছে প্রাক্ স্বাধীনতা যুগ থেকে। কিন্তু আইনী সমতা মেয়েদের বৈষম্য ঘোচাতে পারেনি। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় পুরুষের তুলনায় সম্পত্তিতে নারীর অধিকার আজও সীমিত, কখনোও বা সে বঞ্চিত। সেজন্য আজ প্রয়োজন তৃণমূলস্তর থেকে সমাজ মানসের সামগ্রিক পরিবর্তন।

সূত্রনির্দেশ

১) ভারতীয় ইতিহাসে নারী, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা।

২) Women in Early India - Delhi University Forum For Democracy-2001, Delhi.

৩) ভারতের আর্থ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা — ডঃ ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৪) Hindu Law of Inheritance. Dr. B. N. Datta, Navabharat Publishers. 1957.

৫) Gender and Legal Rights in Landed Property in India. Bina Agarwal - Kalifor women, New Delhi, 1999.

৬) Ibid.

৭) Ibid.

নারী শিক্ষা প্রসারে মুর্শিদাবাদ

সুষমা সিংহ, পুষ্পময়ী বসু এবং প্রীতি গুপ্ত ঃ তিন অনন্য নারী

সুলগ্না গুপ্ত

'নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, কেউ কেউ নারী হয়ে ওঠে। আজ থেকে বেশ কিছুদিন আগে একথা বলেন জনৈক দার্শনিক ও চিন্তাবিদ। আজও এই কথাটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। জীবনের প্রাত্যহিকতায় একটি শিশু নারী হয়ে ওঠে। নারীর ইতিহাসই হল অত্যাচারিত হওয়ার ইতিহাস। এব্যাপারে পশ্চিমী সভ্যতার সাথে এদেশের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই।

তবে নারীর কিছু আলোকিত দিকও রয়েছে। কি ভারত, কি বিশ্ব, সর্বত্রই নারী আজ পথে বেড়িয়েছে। সর্বত্র রয়েছে তার অবাধ পদসঞ্চার। সর্বত্রই নারী তার অধিকার জয় করে নিতে চাইছে। নারী সর্বক্ষেত্রে তার যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছে এবং নতুন দিকে তার কর্মক্ষেত্রে প্রসারিত করেছে। পূর্বে যা নারীর কাছে ছিল নিষিদ্ধ, আজ সেখানেও ঘটেছে তার অবাধ পদসঞ্চার।

আমার আলোচ্য বিষয়বস্তু হল বিংশশতকে মুর্শিদাবাদ জেলার নারী শিক্ষার বিস্তারে তিন অনন্য নারী। এরা হলেন সুষমা সিংহ, পুষ্পময়ী বসু এবং প্রীতি গুপ্ত।

নারী আজ কতটা উন্নত রূপ লাভ করেছে তার মাপকাঠি হল শিক্ষা। শিক্ষাই মানুষকে আলোকপ্রাপ্ত করে। মুর্শিদাবাদ জেলায় নারী শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কে জানতে গেলে সামগ্রিকভাবে এই জেলার জনবিন্যাস ও শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে জানা দরকার।

সমসাময়িক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় সমগ্র বিংশ শতক ব্যাপী মুসলিম সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম ও হিন্দু জন সংখ্যার শতকরা হিসাব ছিল ৫৫—৪৫। পরবর্তীকালে জেলায় মুসলিম জনসংখ্যার হার ক্রমবর্ধমান। এই পরিসংখ্যানের প্রেক্ষাপটে বিচার করতে হবে মুর্শিদাবাদ জেলায় উভয় সম্প্রদায় শিক্ষিতের হার, বিশেষ করে নারী শিক্ষার হার। মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা ছিল ১২,০০০। পরবর্তী দশ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৩,০০০ এ দাঁড়ায়। ঐ সময় মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৯৮১।

১৯১২—১৩ খ্রিস্টাব্দে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর প্রদত্ত রিপোর্টে জানা যাচ্ছে

যে, ঐ সময় মুর্শিদাবাদ জেলায় স্কুল পড়ুয়া (৫—১৫ বছর বয়স) ছাত্রদের সংখ্যা জেলার সমগ্র পুরুষদের ৩৪%। পাশাপাশি মহিলা পড়ুয়াদের সংখ্যা জেলার সমগ্র মহিলাদের মাত্র ৪%। ১৮৭২ থেকে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে জেলার শিক্ষিত মানুষের হার ৩% থেকে ১২.৬৮% এর মধ্যে ওঠানামা করেছিল।

১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুসারে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে মুর্শিদাবাদ জেলায় মহিলা উচ্চ বিদ্যালয় ছিল মাত্র একটি (কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়, বহরমপুর)। ১৯৪৬ সালে শ্রীমতী অমিয়া রাওয়ের নেতৃত্বে বহরমপুর গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মাত্র ২৬ জন ছাত্রকে নিয়ে। সুতরাং সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে যে, অন্যান্য অগ্রগামী জেলাগুলির তুলনায় মুর্শিদাবাদ জেলা ছিল একটি পিছিয়ে পড়া জেলা। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে এই জেলায় নারী শিক্ষা আদৌ বিস্তার লাভ করেনি। নারী শিক্ষার হার ছিল ১২ জন শিক্ষিত পুরুষ : ১ জন শিক্ষিত নারী। জেলার ১০,৫৬৫ জন মানুষের মধ্যে ১০,২৯১ জন পুরুষ এবং ২৭৪ জন নারী লিখতে এবং পড়তে জানতো। নারী শিক্ষিতের অনুপাত হল ১৫ : ৪ এই হল মুর্শিদাবাদ জেলায় নারী শিক্ষার অবস্থা। অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ জেলায় নারীগণ ছিলেন 'A symbol of tradition' বা 'ঐতিহ্যের প্রতীক'। তারা ছিলেন গৃহকোণে বন্দী। তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো সেভাবে পৌঁছায়নি।[১]

এইরূপ পরিস্থিতিতে নারীদের শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাদের আলোকপ্রাপ্ত এবং স্বনির্ভর করতে মুর্শিদাবাদ জেলায় এগিয়ে এলেন তিন মহীয়সী নারী। এরা হলেন সুষমা সিংহ, পুষ্পময়ী বসু এবং প্রীতি গুপ্ত। এই তিন নারী এবং তাদের অবদানকে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যার কথা বলা দরকার তিনি হলেন শ্রীমতী সুষমা সিংহ। বলা যেতে পারে যে, তিনিই জেলার নারী শিক্ষার পথিকৃৎ।

প্রসঙ্গত কাশিমবাজারের বিদ্যোৎসাহী রাজা কৃষ্ণনাথের বিধবা পত্নী স্বর্ণময়ী দেবীর কথা উল্লেখ করা দরকার। পর্দানসীন এই মহারাণী বাড়ির বাইরে বেড়িয়ে নারীদের শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেননি। কিন্তু তিনি ছিলেন শিক্ষার বিশেষ করে নারী শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক। শিক্ষাকে তিনি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। নারীরা শিক্ষিত বা উচ্চশিক্ষিত হোক এটা ছিল তার স্বপ্ন। এজন্য শিক্ষাক্ষেত্রে যখনই অর্থের প্রয়োজন হয়েছে তখনই তিনি অর্থ দিয়েছেন দু-হাতে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এব্যাপারে যখনই মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীর দ্বারস্থ হয়েছেন, তখনই সাহায্য পেয়েছেন। জেলার আরেক অনন্য নারী হলেন সাহিত্যিক নিরুপমা দেবী। পথে না নেমেও তিনি মুর্শিদাবাদ জেলায় নারী শিক্ষার প্রসারের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রখ্যাত প্রকাশ চন্দ্র বসু ও মৃণালিনী বসুর প্রথম কন্যা সুষমা সিংহ। ১৮৯৯ সালে সুষমা দেবীর জন্ম। ১৫ বছর বয়সে সুষমা দেবী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ

হন পাশ্চাত্য শিক্ষিত উদ্ভিদবিদ্যার বিশিষ্ট অধ্যাপক সত্যশরণ সিংহের সাথে। কিশোরী নববধূর সুমিষ্ট ব্যবহার ও বুদ্ধির প্রখরতা সকলকে আকৃষ্ট করে তুলত।

সত্যশরণ নববধূকে নিয়ে ১৯১৫ সালে বহরমপুরে আসেন। বিবাহের পূর্বে যুবক সত্যশরণ উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক রূপে কৃষ্ণনাথ কলেজে যোগদান করেন। গিরিডিতে উন্মুক্ত মাঠে-প্রান্তরে, শিমুল-পলাশ-শাল-মহুয়া গাছের পরিবেশে যার শৈশব-বাল্য কাটে, কৈশোরের সদ্য সমাপ্তিতে তাকে সে সময়ের গোঁড়া, সনাতনপন্থী পুরুষশাসিত বহরমপুরে এসে জীবনের এক নতুন পর্যায়ের সূচনা করতে হয়। অন্যান্য মফঃস্বল শহরের মত বহরমপুরেও সেই সময় মেয়েদের পায়ে হেঁটে রাস্তায় বেড়োনো নিন্দনীয় ছিল। কিন্তু সুষমা সিংহ ছিলেন এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। সত্যশরণ সিংহ ছিলেন এক প্রগতিশীল পুরুষ। তিনি ছিলেন উদারচেতা এবং পশ্চিমী শিক্ষার আলোকে আলোকিত। স্বামীর উৎসাহ সুষমা দেবীকে উৎসাহিত করে। তাছাড়া ব্রাহ্ম ধর্মের প্রগতিশীলতা তাকে আরো সাহসী করে তোলে। গৃহে পড়াশোনা করে ১৯১৮ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় বসেন। সেই সময় সুষমাদেবী কৃষ্ণনাথ কলেজের কিছুটা দক্ষিণে কাপুড়িয়া পট্টিতে থাকতেন। কলেজ থেকে সামান্য হাঁটাপথ। কিন্তু তৎকালীন রক্ষণশীল আদব কায়দার জন্য সুষমা দেবীকে এইটুকুপথ ঘোড়ার গাড়ির সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করে যেতে হত। এইভাবে পরীক্ষা দিয়েও সুষমা দেবী সসম্মানে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

রক্ষণশীলতা, সংস্কারের একটি মাত্র প্রাচীর ভেঙেই তিনি থেমে যাননি। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদ জেলায় নারী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এই নারীর অবদান অবিস্মরণীয়। তৎকালীন রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সুষমা সিংহ মুর্শিদাবাদ জেলার মেয়েদের প্রাক্-কলেজীয় পঠন-পাঠনের বীজ বপন করেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের পরাধীন ভারতের হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় মানসিকতার সঙ্গে স্বাধীন ভারতে পঞ্চাশের চিন্তা-ভাবনা ও মানসিকতার অনেক ব্যবধান রচিত হয়েছে। প্রথম যুগে জাত-পাত, ধর্ম, সামাজিক অনুশাসন, স্ত্রীজাতি সম্পর্কে পুরুষতন্ত্রের পদে পদে নানা পর্যায়ে কঠোরতা, রক্ষণশীলতার প্রভাব তিন দশকের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অনেকাংশে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সেই নিরিখে ১৯২০-২৮ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার মত পিছিয়ে থাকা জেলার গৃহের চৌহদ্দিতে আটকে রাখা মেয়েদের বাইরে নিয়ে আসাটা চিন্তা করাও যেত না। সুষমা সিংহ সেই অসাধ্য সাধন করেছিলেন।

ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সুষমা সিংহ অন্তঃপুরের পর্দা অপসারিত করে বহরমপুর শহরে নারী শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হলেন। বহু পরিশ্রম করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের নারী শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন।

১৯৩০ এর পূর্বে গোরাবাজার এলাকায় খ্রিস্টান মিশনারী পরিচালিত দু-একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় ছিল। সেখানেই গোরাবাজারের মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করত। এই সময় কিছু বিদ্যোৎসাহী মহিলা মুর্শিদাবাদ তথা বহরমপুর শহরের মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে এলেন। এদের মধ্যে অগ্রগণ্যা হলেন সুষমা সিংহ। এব্যপারে তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হলেন রমলা সিংহ এবং নিরুপমা দেবী।

কিছুদিনের মধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলার মহারাজা শ্রী মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় 'বহরমপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। পরে এই বিদ্যালয় মহারাজের মায়ের নামে 'মহারাণী কাশীশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে' রূপান্তরিত হয়। উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য গোরাবাজারে মেয়েদের এখানে পড়তে যেতে হত। অনেক পথ হেঁটে মেয়েদের পক্ষে বিদ্যালয়ে যাওয়া কষ্টকর ছিল। এই ঘটনা সুষমা সিংহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গোরাবাজারে তখন শ্রী সত্যশরণ সিংহের পরিবার শিক্ষায় এবং আভিজাত্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তারা গোরাবাজারে একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তারা সকলের বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের সহযোগিতা ও সমর্থন লাভ করে ১৯৩৪ সালে গোরাবাজার শিল্প-মন্দির বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৩]

প্রথমে সুষমা দেবী নিজের বাড়িতেই বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করেন। পরে তা ভাড়া বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। সুষমা সিংহ এই বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষিকা। অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তিনি এই বিদ্যালয়টি গড়ে তোলেন। বিদ্যালয়টি প্রথমদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে তার জয়যাত্রা শুরু করে। এখানে পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রীদের স্বনির্ভর করে তুলতে বিভিন্ন ছুঁচের কাজ এবং অন্যান্য নানা ধরণের কাজ শেখানো হত। শিল্পের প্রাধান্য থাকায় এই বিদ্যালয়ের নাম হয় শিল্প মন্দির। অধ্যাপক সিংহ এবং সুষমা সিংহ ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রতি উৎসর্গীকৃত প্রাণ। সুষমা সিংহ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সুকুমার মনে শিক্ষার নৈতিক মূল্য সম্পর্কে অবহিত করতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। বিদ্যালয়ের কাজে সুষমা সিংহকে এলাকার বিভিন্ন প্রগতিশীল পুরুষ এবং মহিলা ভীষণভাবে সাহায্য করেছিলেন। সমকালীন রক্ষণশীল সমাজ সুষমা সিংহের প্রগতিশীল কর্মসূচীর তীব্র বিরোধীতা করলেও তার অদম্য জেদ এবং সাহসের কাছে তারা পরাজিত হয়েছেন।

যদিও সমকালীন নারীদের শিক্ষার শোচনীয় হাল সম্পর্কে জেলার আরো অনেকেই ওয়াকিবহাল ছিলেন, কিন্তু এইভাবে কেউ এগিয়ে আসেননি। তবে একথা ঠিক যে, তিনি সর্বদা তার পাশে স্বামী সত্যশরণ সিংহকে পেয়েছিলেন। তবুও নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে কোনভাবেই তার অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। মুর্শিদাবাদ জেলায় নারীশিক্ষা

বিস্তারের ক্ষেত্রে তার নামটি আগে উচ্চারিত হয়। কারণ তাকে প্রথম থেকে শুরু করতে হয়। তিনি কোন তৈরি জমি পাননি।

মুর্শিদাবাদ জেলায় নারী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আরেক অনন্য নারী হলেন পুষ্পময়ী বসু। মাধ্যমিক শিক্ষাবিস্তারে তার অবদান অপরিসীম। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই সময় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ছিল না। ব্যতিক্রম মহারাণী কাশীশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। পুষ্পময়ী বসুর সমস্ত কার্যকলাপ এই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। কাশীশ্বরীকে তিনি Model বিদ্যালয় হিসাবে গড়ে তোলেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় নারী শিক্ষা বিস্তারে London Missonary Society র ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৩ সালে মহারাণী কাশীশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পুষ্পময়ী বসু সক্রিয়ভাবে কোনদিনই রাজনীতি করেননি। কিন্তু মতাদর্শগত দিক থেকে তিনি বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নারী সুরক্ষা সমিতির একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে কাশীশ্বরী বিদ্যালয়ে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চাও হত। ভারতীয় গণনাট্য সংঘকে আহবান জানিয়ে তিনি বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে 'শহীদের ডাক' নাটকটি মঞ্চস্থ করান। পুষ্পময়ী বসু অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিদ্যালয়টি গড়ে তোলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এদেশের মহিলারা ভগ্ন স্বাস্থের জন্য তাদের পড়াশোনা চালাতে পারে না। বিদ্যালয়ের মেয়েদের যাতে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় সেজন্য বিদ্যালয়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তারই উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায় এই বিদ্যালয়ের অনেক সদস্য Junior Red cross এর সদস্য হন। নানা ধরণের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় রাখে। এই সবকিছুই হয়েছিল পুষ্পময়ী বসুর উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায়।[৪]

সুষমা সিংহ এবং পুষ্পময়ী বসুর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় নারী শিক্ষা বিস্তারে উভয়ের ভূমিকা অসামান্য। কিন্তু কিছুটা হলেও সুষমা সিংহের স্থান পুষ্পময়ী বসু অপেক্ষা উচ্চে। কারণ সুষমা সিংহকে নারী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে কাজ করতে হয়েছিল। একথার অর্থ এই নয় যে, পুষ্পময়ী বসুর অবদান গৌণ। কারণ সেই সময় নারীদের অবস্থা আজকের মত ছিল না। যেখানে নারীদের রাস্তায় বেড়োনো নিষিদ্ধ ছিল, সেখানে তাদের বিদ্যালয়ে যাওয়া বা শিক্ষিত হওয়া ছিল কল্পনার বাইরে। পুষ্পময়ী বসু সেই অসাধ্য সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। তাছাড়া সেই সময়কার নারীদের এই অবস্থা সম্পর্কে অনেকেই অবহিত ছিলেন। কিন্তু পুষ্পময়ী বসুর মত কেউ এগিয়ে আসেননি। যদি প্রকৃতই পুষ্পময়ী বসুর নারী শিক্ষা বিস্তারের ভূমিকা গৌণ হত, তবে আজ এতদিন পর তার নাম উচ্চারণের প্রয়োজন হত না। এই সময় একটা ধারণা ছিল যে, নারীর কাজ হল

সন্তানের জন্ম দেওয়া এবং পুরুষের সেবা করা। সুষমা সিংহ ও পুষ্পময়ী বসুরা এই মানসিকতায় বিরাট আঘাত হেনেছিলেন। তাছাড়া পুষ্পময়ী বসু মুর্শিদাবাদ জেলায় শিক্ষাবিস্তরে এই ভূমিকা না নিলে সুষমা সিংহের কার্যকলাপও এত গুরুত্ব পেত না। কারণ তিনি এই জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অসামান্য ভূমিকা নেন এবং পুষ্পময়ী বসু সেই ধারাকে বজায় রাখেন পরবর্তী মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তার ভূমিকার দ্বারা।

মুর্শিদাবাদ জেলায় উচ্চশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আরেক অনন্য নারী হলেন শ্রীমতী অমিয়া রাও। তিনি ছিলেন বহরমপুর গার্লস কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং অধ্যক্ষা। মুর্শিদাবাদ জেলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে এই নারীর ভূমিকা অসামান্য। তার স্বামী বি. জি. রাও ১৯৪৪ সালে মুর্শিদাবাদ জেলাশাসক হিসেবে তার কাজ শুরু করেন। এই সময় সারা ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্দীপ্ত। সেই বিশেষ মুহূর্তে জেলাশাসকের মানসিকতা তার সরকারের পক্ষে থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অন্য ধাতুতে গড়া রাও দম্পত্তি দেশের সঙ্গে এই জেলার মানষকে আপন করে নিয়েছিলেন। অমিয়া রাও তার বাংলোয় বসে দেখেন যে, ভোররাতে মেয়েরা লণ্ঠন নিয়ে পড়তে যাচ্ছে। এই ঘটনা তাকে বিচলিত করে এবং তিনি উপলব্ধি করেন যে, এই জেলায় মেয়েদের জন্য মহাবিদ্যালয় বা কলেজের প্রয়োজন আছে। সিভিলিয়ান পত্নীর বেড়াজাল কেটে বেড়িয়ে এলেন অমিয়া রাও। I. C. S. স্বামীর পূর্ণ সহযোগিতা তিনি পেলেন। জেলার বিশিষ্ট মানুষ, ভূ-স্বামীদের কাছে আবেদন জানালেন। সকলের সহযোগিতা তিনি পেলেন।১৯৪৬ সালের 24th January প্রতিষ্ঠিত হল বহরমপুর গার্লস কলেজ। অধ্যক্ষা হলেন অমিয়া রাও। তিনিই তার পরিচিতা প্রীতি গুপ্তকে বিশ্বভারতী থেকে আহবান করে প্রথমে অধ্যাপিকা এবং পরে অধ্যক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেন। পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস এক অন্য কাহিনী।

প্রীতি গুপ্ত ছিলেন এক দক্ষ প্রশাসক। তিনি যে সময় দায়িত্ব গ্রহণ করেন সেই সময় বা পরিস্থিতি নারী শিক্ষার অনুকূল ছিল না। দেশভাগের ফলে অগণিত নর-নারী এদেশে চলে আসেন। সেই সমস্ত নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েদের তিনি অল্প পয়সায় থাকার এবং পড়াশোনা করার সুযোগ দেন। পরবর্তীকালে ১৯৭০ এর দশকে যখন সারা পশ্চিমবঙ্গে এক উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, চারিদিকে আগুন জ্বলছে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখন প্রীতি গুপ্তের সুযোগ্য নেতৃত্বে একদিনও কলেজ বন্ধ হয়নি।

তিনি ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যে সুপন্ডিত এবং প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বাইরে

থেকে দেখলে তাকে কঠোর বলে মনে হলেও তার ভিতরটা ছিল কোমল। তার চরিত্র ছিল কঠোর ও কোমলতার সংমিশ্রণ। বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তার প্রতিফলন ঘটেছিল। তিনি গার্লস কলেজকে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। ছাত্রীদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়নের ক্ষেত্রে তার অবদান অপরিসীম। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে দরকার শৃঙ্খলা। তিনি তার কার্যকলাপের দ্বারা একথা প্রমাণ করেছিলেন।

প্রীতি গুপ্ত ছিলেন সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তিত্ব। প্রতি বছর কলেজের বাৎসরিক উৎসবে যে সব অনুষ্ঠানের আয়োজন হত তা বিভিন্ন মহলের যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছিল। এই সবই ছিল প্রীতি গুপ্তের সুযোগ্য নেতৃত্বের ফসল। মুর্শিদাবাদ জেলায় আজ যে 'রবীন্দ্রমেলা' সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা প্রীতি গুপ্তের মস্তিষ্ক প্রসূত। অমিয় রাও যে বীজ বপন করে গিয়েছিলেন, প্রীতি গুপ্ত তাকেই ফুলে ফলে পল্লবিত করে মহীরুহে পরিণত করেন। সুতরাং নারী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এই জেলায় তার অবদান অবশ্যই উল্লেখের দাবী রাখে।

সুষমা দেবীকে আমরা কখনই নারীবাদের সমর্থক বলতে পারি না। তিনি শিক্ষিত নারীর কথা বলেছেন। কিন্তু কখনই নারী অধিকারের কথা বলেননি। সুষমা সিংহ এই জেলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে বিশিষ্ট ভূমিকা নিলেও, তিনি সর্বদা তার স্বামী সত্যশরণ সিংহকে পাশে পেয়েছিলেন। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনার ব্যাপারে তিনি স্থানীয় কিছু বিদ্যোৎসাহী মহিলা এবং পুরুষের সাহায্য পেয়েছিলেন। তবে তিনি সমকালীন রক্ষণশীল আদব কায়দাকে অস্বীকার করেননি। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, তিনি সেগুলির সাথে সমঝোতা করেন। যখন তাকে বলা হয় যে, তাকে ঘোড়ার গাড়ির সমস্ত দরজা বন্ধ করে পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশ করতে হবে, তিনি তা মেনে নেন।

অন্যদিকে প্রীতি গুপ্ত বা পুষ্পময়ী বসু কঠোরভাবে নারী অধিকারের বিরোধী ছিলেন না। কারণ পুষ্পময়ী বসু নারী সুরক্ষা সমিতির সমর্থক ছিলেন। তবে সেই সময় যখন নারীর গৃহের বাইরে বেরোনো অকল্পনীয় ছিল সেই সময় নারী অধিকার ছিল অপ্রাসঙ্গিক। এই দুই নারী কখনই গৃহের বাইরে বেরিয়ে নারীর আন্দোলন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। অর্থাৎ তারা নারীকে অধিকার দিয়েছিলেন নিজের পায়ে দাঁড়ানোর। তবে সেটা গৃহের মধ্যে থেকে। কাজেই এদের প্রকৃত নারীবাদের সমর্থক বলা যায় না। কারণ নারীবাদীরা যেখানে নারী বিপন্ন, সেখানেই আন্দোলনের কথা বলেছেন। তবে পুষ্পময়ী বসু বা প্রীতি গুপ্তরা সেকথা বলেননি। এরা আগে নারীকে শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। তারা রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না।

সূত্রনির্দেশ

১) Mitra Asoke (ed): Census. 1951– West Bengal: District Handbooks: Murshidabad; 1951.

২) O'Malley L. S. S.: Bengal District Gazetteers: Murshidabad. Calcutta: 1914.

৩) গোরাবাজার শিল্পমন্দির উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়; সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক পত্রিকা; বহরমপুর

৪) কাশিশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়; সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক পত্রিকা; বহরমপুর

৫) জনমত; সাপ্তাহিক সংবাদপত্র; ৩৫ তম বর্ষ; ২৬, ২৭ এবং ৩৭ তম সংখ্যা; বহরমপুর

রাজনৈতিক নারীর আত্মকথন : পরিবার ও পরিবেশ

গোপা মুখার্জী

বাঙালী নারীর আত্মকথা লেখার সূচনা ঊনবিংশ শতকে রাসসুন্দরী দেবীর 'আমার জীবন' কে দিয়ে। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে নারীর কর্মজগতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার ভান্ডারও বাড়তে থাকে। সাহিত্যের আঙিনায় মেয়েদের নিয়মিত বিচরণ আত্মজৈবনিক লেখার সংখ্যাই শুধু বৃদ্ধি করে না—অভিজ্ঞতা বিষয়ের বৈচিত্র্যে ঋদ্ধ হতে থাকে বাঙালী মেয়ের আত্মকথা।

স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী চৌধুরাণীর আত্মকথা 'জীবনের ঝরাপাতা' বাঙালী মেয়ের রাজনৈতিক ভাবনা আর সক্রিয়তার প্রথম দলিল বলা যেতে পারে। রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মহিলারা চল্লিশের দশক থেকে আত্মকথামূলক রচনা প্রকাশ করতে শুরু করেন। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত হয়, বীণা দাশের 'শৃঙ্খলঝঙ্কার'। আত্মকথা হলেও এই লেখার সিংহভাগ জুড়ে আছে রাজনৈতিক সত্তার বিচ্ছুরণ। কারণ পরিবার ও বাজনীতি, এই দুইয়ের আন্তঃসম্পর্কই এর মূল বিষয়। এরপর এইধরণের আত্মজীবনী আরো প্রকাশিত হয়। আশালতা সেনের 'সেকালের কথা' কমলা দাশগুপ্তের 'রক্তের অক্ষরে', মণিকুন্তলা সেনের 'সেদিনের কথা', শান্তিসুধা ঘোষের 'জীবনের রঙ্গমঞ্চে', শান্তি ঘোষের 'অরুণবহ্নি', ফুলরেণু গুহর 'এলোমেলো মনে এলো', উষা দত্ত ভার্মার 'দিনগুলি মোর', কল্যাণী ভট্টাচার্যের 'জীবন অধ্যয়ন', রেবা রায়চৌধুরীর 'জীবনের টানে শিল্পের টানে' শোভা সেনের 'স্মরণে বিস্মরণে : নবান্ন থেকে লালদুর্গ' - রাজনৈতিক নারীর আত্মপ্রকাশের এই ধারাবাহিকতা আমাদের ইতিহাস চেতনাকেও সমৃদ্ধ করেছে।

এই আত্মকথাগুলির প্রধান দুটি উপজীব্য হল পরিবার ও রাজনীতি। পরিবারের চিত্রায়ণে মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে বাল্য ও কৈশোরের অভিজ্ঞতা। পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনের অর্থবহ প্রস্তাবনা হিসাবেই এই অধ্যায়গুলি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, আত্মকাহিনীর পৃষ্ঠায়। তাই প্রাক্-রাজনৈতিকপর্ব চিত্রায়ণের প্রাথমিক উদ্দেশ্যও রাজনৈতিক। কিন্তু এই নিবন্ধের বিষয় রাজনীতি নয়। আত্মকাহিনীগুলির রাজনৈতিক

আবহ, পরিবার ও পরিবেশের চিত্রায়ণ যে সামাজিক ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে, তাঁর সন্ধান করাই বর্তমান নিবন্ধের উপজীব্য।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবেশে নির্মীয়মান নূতন পারিবারিক সংগঠন ও চেতনার পরিচয় মেলে রাজনৈতিক নারীদের প্রাক্-রাজনৈতিক জীবন কথায়।

উনবিংশ শতকের বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার গুলিতে শিশুসদস্যদের সাথে পরিবার প্রধানের যোগাযোগ ছিল অনিয়মিত। স্বেচ্ছাচারী শাসক অথবা উদাসীন ভিক্টোরীয় জ্ঞানপিপাসু পিতা — এই দুই ক্ষেত্রেই শিশুদের সাথে পিতার দূরত্ব বেড়েই চলতো। গৃহকর্মের ব্যস্ততা মায়ের সাথে সন্তানের যোগাযোগের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতো। বিংশ শতকের গোড়ার দিকের কয়েকটি দশকেও অধিকাংশ বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের পারিবারিক আবহ ছিল এই রকম। প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক লেখক কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় গোপাল হালদারের বাল্যস্মৃতিতে 'মা রাঁধে গোপাল কাঁদে'—শৈশবের প্রথম ছড়া।[১] হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের শৈশব ঘিরে আছেন ঠাকুর্দা আর ঠাকুমা। বাবা এবং মা-য়ের সান্নিধ্যের অভাবে ঠাকুর্দা ঠাকুমার প্রত্যক্ষ সাহচার্যে বড় হয়ে উঠত শিশুরা।[২]

রাজনৈতিক নারীদের পূর্বকথনে আমরা পাই এক অন্যতর চিত্র। নানা সামাজিক অভিঘাতে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারগুলির বন্ধন একদিকে শিথিল হতে থাকে অন্যদিকে তা পরিবারের অভ্যন্তরীণ সংগঠনকে প্রভাবিত করে। বীণা দাশ, কল্যাণী ভট্টাচার্য শান্তিসুধা ঘোষ, শান্তি দাশ, কল্পনা দত্ত বা নিবেদিতা নাগের পরিবার চিত্রে সিংহভাগ অধিকার করে আছে মা-বাবার সাথে নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা। মা-য়ের কাছে অজস্র গল্প আর বাবার কাছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক শোনার স্মৃতিময় শৈশব শৃঙ্খল ঝঙ্কার-এর পরিণত লেখিকা বীণা দাশকে উজ্জীবিত করে।[৩] জীবনের রঙ্গমঞ্চে'র লেখিকা শান্তিসুধা বাগানের পরিচর্যা থেকে মাছ ধরা — সব কাজেই বাবার উৎসাহী সঙ্গী। ফেলে আসা শৈশবে ফিরে গিয়ে শান্তিসুধা লেখেন "বাবা কথা কমই বলেন, রাগ করেন না কারো ওপর। বাবাকে আমরা ভয় করি না মোটেই, বড়ো ভালোবাসি।[৪] কল্পনা দত্ত অকপটে বলেন— "বাবা কাকা জেঠা সব আমাদের বন্ধু।"[৫]

এই আত্মকাহিনীগুলিতে মায়ের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মা এখানে শুধুই মমতাময়ী গৃহকর্ত্রী নন, সন্তানের বড় হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় এক সক্রিয় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটছে মায়ের সান্নিধ্য ও সহযোগিতায়। বীণা দাশের লেখায় "বড়ো হয়ে ছুটুদি (শ্রীযুক্তা কল্যাণী ভট্টাচার্য) আর আমি দেশের কাজে নিজেদের যখন জড়ালাম, বাবা বলতেন "এসব বাপু তোমরা মা-র কাছ থেকে শিখছ। আমি হচ্ছি ভীতু মানুষ, এত সব বড়ো কাজের কথা আমি ভাবতেও পারি না।"[৬] শান্তিসুধা

ঘোষের শৈশবের অনেকখানি জুড়ে তাঁর মা — "...... আমরা জন্মাবধি তখনকার সমাজে মা-র 'বিদুষী' আখ্যাই শুনে এসেছিলাম। সুতরাং আমাদের ভাইবোনদের প্রাথমিক পড়াশুনোর ভার মা অনায়াসেই নিজের হাতে নিয়েছিলেন, আমাদের আস্থাও ছিল অটুট। ..... আমার মা অনেক বিষয়েই ঠিক অন্যান্য মেয়েদের বা মায়েদের মতো নন। সহজে ভয় পাওয়া সহজে গলে পড়া তাঁর আদৌ কখনো দেখিনি। .... তাঁর প্রকৃতি অনেকটা পুরুষের মতো শক্ত।"[৭] চারিত্রিক দৃঢ়তাকে বোঝাতে পুরুষের উপমার প্রয়োজন হলেও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এই ঋজু কাঠিন্যকে শান্তিসুধা প্রত্যক্ষ করেন মায়ের চরিত্রেই। মায়ের ইচ্ছাতেই ঠাকুমার ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে ফুলরেণু গুহ, উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি দেন। ঠাকুমার উদার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী আর মায়ের সক্রিয় সহযোগিতায় হেলেনা দত্ত পড়াশুনা চালিয়ে যান। জামাইবাবুর আশ্রমে সন্ন্যাসিনী হবার প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে মণিকুন্তলা কলকাতায় চলে আসতে পারেন শুধু মায়ের সমর্থন ও সহযোগিতায়। নিবেদিতা নাগের শৈশব স্মৃতিতে উজ্জ্বল উপস্থিতি মা এবং ঠাকুমার। কাকার গোপন বিপ্লবী সংগঠনের কাজে বিভিন্নভাবে এরা সাহায্য করতেন।

১৯৩০-৪০এর দশকের অধিকাংশ নারী নেত্রীরাই এসেছিলেন এক পরিবর্তিত বা পরিবর্তনশীল পারিবারিক আবহ থেকে। মা-বাবার সাথে ঘনিষ্ঠতা, মা-য়ের সক্রিয় এবং শক্তিশালী উপস্থিতি, দৃঢ় সংবদ্ধ, অপেক্ষাকৃত ছোট পরিবারের নৈকট্য আত্মকথাগুলির শৈশবস্মৃতিকে বিশিষ্ট করে তুলছে। পেশাগত প্রয়োজনে (বীণা দাশের পরিবার) বা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের কারণে (শান্তিসুধা ঘোষের পরিবার) অনেক পরিবারই মূল পরিবারবৃত্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তো আর এই বিচ্ছিন্ন পারিবারিক আবহেই তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক নারীর মনন ও চিন্তন। আত্মীয়পরিজন পরিবৃত বৃহত্তর সংসার থেকে বিযুক্তি কখনো নারীর জীবনে বৃহত্তর কর্মের প্রতিশ্রুতি বহন করে এনেছে। বরিশালের প্রত্যন্ত গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবারের' মেয়ে মনোরমা বসু বিয়ের পর সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এবং স্বপ্রচেষ্টায় নিজেকে যুক্ত করেন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে।

উষা দত্ত, রেবা রায় চৌধুরীর মত কমিউনিস্ট নেত্রীদের লড়াই আবার শৈশবের পারিবারিক ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। বস্তুত ৪০ এর দশকের কমিউনিস্ট নেত্রীদের অনেকে পরিবর্তনশীল পারিবারিক আবহ থেকে আসেননি। প্রাচীন রক্ষণশীল পরিবারের কঠিন শাসন সেখানে পরিবার বিরুদ্ধতার জন্ম দিয়েছে, যা ভবিষ্যতে রাজনৈতিক বিরুদ্ধতাকে বিকশিত করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও পরিবারের অভ্যন্তরীণ সংগঠন ও তার চিত্রায়ণে ভিন্নতার সন্ধান পাই। উষা দত্তের প্রাচীনপন্থী জমিদারগৃহিনী ঠাকুমার উৎসাহেই তাঁর ইংরেজী স্কুলে শিক্ষার সূচনা যদিও ঠাকুমার অত্যাচারের বিরোধিতা করতেই স্কুলের পড়া অসমাপ্ত রেখে উষা গৃহত্যাগ করে কমিউনিস্ট পার্টিতে নাম লেখান। উষা দত্ত বা ফুলরেণু গুহর লেখায় আর একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। শৈশব বা কৈশোরের লড়াই এখানে মা-বাবার থেকে অনেক বেশী প্রাচীনপন্থী ঠাকুমার বিরুদ্ধে। উষা দত্ত বা ফুলরেণু গুহর

লেখায় ঠাকুমার অত্যাচারের প্রতিবাদ না করতে পারায় মা-বাবার প্রতি ক্ষোভ যেমন স্পষ্ট, তেমন একই ভাবে অত্যাচারিত হওয়ার জন্য বাবা-মা-য়ের প্রতি একধরণের সহমর্মিতাও খুঁজে পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক নারীর আত্মকথনে পরিবর্তনশীল সামাজিক চালচিত্রকে চিহ্নিত করাই ছিল বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। স্বল্প পরিসরে এই বিষয়ের ব্যাপ্তিকে বাঁধার চেষ্টায় একটি খন্ডচিত্র ফুটে উঠল মাত্র। এই আত্মকাহিনীগুলি শুধু বিষয় নয়, বিষয়কে উপস্থাপিত করার বিশেষ ধরণের জন্যেও বিশিষ্ট হয়ে আছে। কিন্তু এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। রাজনৈতিক নারীর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে বাল্য ও কৈশোরের পারিবারিক অভিজ্ঞতাগুলি অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করেছিল। কয়েকটি আত্মকাহিনীর সূত্র ধরে প্রাক-রাজনৈতিক জীবনের বিশিষ্টতা ও পরিবারচিত্রায়ণের প্রকৃতিকে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা অকিঞ্চিৎকর হলেও বোধ হয় অপ্রয়োজনীয় বলা যাবে না।

সূত্রনির্দেশ

১) গোপাল হালদার - *রূপনারানের কূলে*, কলকাতা, ১৯৬৯, প্রথম খন্ড, পৃ:৩৬।

২) হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় - *তরী হতে তীর*, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ: ৩৯।

৩) বীণা দাশ - *শৃঙ্খল ঝঙ্কার*, কলকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৩।

৪) শান্তিসুধা ঘোষ - *জীবনের রঙ্গমঞ্চে*, কলকাতা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, পৃ:৭।

৫) কল্পনা দত্ত - সাক্ষাৎকার (এবং প্রতর্ক-এ প্রকাশিত) নভেম্বর ৯৮-জানুয়ারী ৯৯

৬) বীণা দাশ - *শৃঙ্খল ঝঙ্কার* পৃ:৬।

৭) শান্তি সুধা ঘোষ - *জীবনের রঙ্গমঞ্চে*, পৃ:৭

'আমি শুধু চাই
মানুষের অধিকার'
ভারতবর্ষের দলিত মেয়েরা কথা বলছে

মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়

'ঐতিহ্য যেখানে মেয়েদের শুকিয়ে দেয়, একটা খর্বুটে গাছের মত যেখানে তাকে সারা জীবন কাটাতে হয়, অন্য কারো আলোর ছায়ার মত যেখানে সে থাকে, সে দেশে মেয়েরা এখনো দাসী।......

মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই এক দোষ
মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই এক দোষ।'[১]

(হীরা বানসোডে)[১]

দলিত। নামটাই যেন এদের অবস্থা বুঝিয়ে দেয়। দলিতদের মধ্যেও দলিততম হচ্ছে মেয়েরা। দলিতদের মধ্যে মেয়েরা মেয়ে হিসেবেই আরও এক পেষণের শিকার। দলিতদের সমবেত বেঁচে থাকার অধিকারের মধ্যে মেয়েদের মেয়ে হয়ে বেঁচে থাকার আলাদা যন্ত্রণার কথা মেয়েরাই সবে বলতে শুরু করেছেন। খান্ডোবা, ইয়েলাম্মা, শান্তাদুর্গা—এই সব দেবীর কাছে কন্যা সন্তানকে উৎসর্গ করা হয়, যার পরিণতিতে দলিত কন্যা বেশ্যাবৃত্তিতে প্রবেশাধিকার পায়।

তরুণ নারী দলিত কবি লিখছেন ঃ

''ভগবান খান্ডোবার কাছে আমরা আমাদের বাচ্চাদের দিয়েছি,
ইয়েলাম্মা, শান্তাদুর্গা এঁদের আমরা আমাদের
মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খল করেছি—
আমরা নিজেদেরই ইচ্ছেয়।
আমরা আমাদের মেয়েদের পুরুষের নীচে শোয়াই।
ওঃ এই জোড় হাতে তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাইছি—
আমাদের হয়ে তোমরা কণা মাত্র দুঃখ পেয়োনা।
আমাদের জীবনের ছেঁড়া কাঁথাগুলো
সম্বৎসরে একবার ধোয়াধুয়ি কোর না।

আমরা এমনিতেই ন্যাংটো

দুনিয়ার সামনে আমাদের আর ন্যাংটো কোর না।''[২]

সমাজে উচ্চনীচ ভেদাভেদ মুখ্যত শ্রেণীভেদ প্রথা। আর শ্রেণীর ভিত্তিতে সমাজের অগ্রগতি এক বিশ্বব্যাপী ব্যাপার। ধর্ম ও রাষ্ট্র হাত মিলিয়ে নিম্নতম শ্রেণী অর্থ্যাৎ শূদ্রদের প্রথমে মানসিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দাসত্বে বন্দী করল, পরে তারা বাঁধা পড়লেন অস্পৃশ্যতার নাগপাশে।

এই অস্পৃশ্যদের জীবনযাপন ছিল লজ্জাজনক। তাদের চাষের জমিও ছিল না, কোন নির্দিষ্ট পেশাও ছিল না। ঝড়, জলে, রোদে তারা উপর তলার মানুষের হুকুম তামিল করতেন। অন্তহীন পরিশ্রমের বদলে তাঁরা পেতেন পশুর মতো ব্যবহার। তারা বাস করতেন গ্রামের বাইরে — কারণ তাদের ছোঁয়াও অশুচি। ভাল পোষাক পরিচ্ছদ, অলঙ্কার এমনকি জুতো পরাও তাঁদের নিষেধ ছিল। পানীয় জলও তাদের কাছে সহজ লভ্য ছিল না। ''অস্পৃশ্যদের একসময়ে গলায় মাটির পাত্র বাঁধতে বাধ্য করা হত যাতে তাঁদের থুতু মাটিতে পড়ে দূষণ সৃষ্টি না করে। আরেকটি বাধ্যবাধকতা ছিল পিছন দিকে ঝাড়ু বেঁধে রাখা যাতে অন্যদের চোখে পড়ার আগে তাঁদের পায়ের ছাপ মুছে যায়।''[৩]

দলিত মেয়ে আর মুসলমান মেয়েদের উপর তিন রকমের অত্যাচারের বোঝা চেপে আছে—জাত ও সম্প্রদায়, শ্রেণী এবং লিঙ্গ। অর্থাৎ এরা শুধু উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা অত্যাচারিত নয়, তাদের নিজেদের সমাজের পুরুষের কাছেও অত্যাচারিত, অবহেলিত। কাজের জায়গায় দৈহিক নিপীড়ন—ধর্ষণ এতো প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। কৃষিক্ষেত্রে জমিদার বা তার লোকজনেরা, বাড়িঘর কি রাস্তা ঘাট নির্মাণে কনট্রাক্টর বা দালালরা, বাড়িতে বাড়ির পুরুষরা এদের মানুষ মনে করে না। এদের উপর অত্যাচার অন্যায় বলেও গণ্য হয় না। যতরকম নোংরা কষ্টকর কাজ করানো হয় মেয়েদের দিয়ে, তুলনায় মজুরী সামান্য। দারিদ্র, কুসংস্কার অশিক্ষা এদের নিত্যসঙ্গী — যা অনেক সময় এদের পতিতাবৃত্তির দিকে ঠেলে দেয়।

সারা ভারতের জনসংখ্যার মধ্যে ২০কোটি দলিত, আর তার শতকরা ৪৯.৯৬ (অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেক) হচ্ছে মেয়ে। ভারতবর্ষে যত নারী তার ১৬.৩ শতাংশ দলিত নারী। ভারতের গ্রামগুলোতে সমস্ত মেয়েদের মধ্যে শতকরা ১৮ ভাগই দলিত মেয়ে, আর শহরে সমস্ত মেয়েদের শতকরা ১২ ভাগ দলিত মেয়ে।

অথচ দলিত মেয়েরা দলিত আন্দোলনে এবং মহিলা আন্দোলনে সর্বত্রই উপেক্ষিত। দলিত সম্প্রদায়ের দাবী দাওয়ার মধ্যে যে দলিত মেয়েদেরও আলাদা কোন দাবী থাকতে পারে এটা পুরুষরা গ্রাহ্যই করেনি। দলিত মেয়েদের উপর যে অমানবিক অত্যাচার আজও হয়ে চলছে তার প্রতিকারের জন্য যতখানি প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া দরকার বিভিন্ন সম্প্রদায় বা গণসংগঠন এমনকি মহিলা সংগঠনও কি সেভাবে সোচ্চার হয়েছে?

১৯৯৫'র ১৫ ডিসেম্বর রাজস্থানের জেলা জজ তাই অনায়াসে রায় দিতে পেরেছেন যে উচ্চবর্ণের মানুষ বিশেষ করে একজন ব্রাহ্মণ একজন নিম্নবর্গের মেয়েকে ধর্ষণ করলে তা অপরাধ নয়— এ রায় দেওয়া হয়েছিল বহু পরিচিত ভানওয়ারী দেবীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

ভানওয়ারী দেবী সাহস করে লড়েছিলেন বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে, তিনি একজন সমাজসেবী। দলিত মহিলার এতবড় দুঃসাহস। একজন বয়স্ক মহিলাকে গণধর্ষণ করতে কারুর বিবেক বিদ্ধ হল না— বিচলিত বোধ করল না রাজস্থানের বিচার ব্যবস্থা। ভানওয়ারী দেবী এবং স্বামীকেই অপরাধী সাব্যস্ত করে কাঠগড়ায় দাঁড় করাল রাজস্থানের বিচারকরা।

দৈহিক অত্যাচার, ধর্ষণ স্বাভাবিক ভাবেই মানুষকে শক্তিহীন করে দেয় আমাদের এই সমাজব্যবস্থায়, কারণ এখানে অপরাধী হয় ধর্ষিতা ধর্ষণকারী নয়। জাস্টিস পি.এন.ভগবতী বলছেন 'Rape and molestation are new dimension of a caste war, used as weapons of reprisal and to crush the morale of a section of the people.'[৪]

ষাটের দশকের মধ্যভাগে একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ রাজনীতিবিদ ননী পালকিওয়ালা স্পষ্টই বললেন 'তামিলনাড়ুতে দলিত মেয়েদের মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ নিষেধ করার ধর্মীয় স্বাধীনতা সংবিধানের ২৫নং ধারা অনুযায়ী বর্ণ-হিন্দুদের আছে।' স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকদের নাকি সমানাধিকার সংবিধান স্বীকার করে নিয়েছে।

কাগজে একটি ছোট খবর দেখে চমকে উঠেছিলাম যদিও অবিশ্বাস করিনি — মন্দিরের মধ্যে একটি দলিত মেয়েকে (দেবদাসী) ধর্ষণ করেছে মন্দিরের পুরোহিত। পুরোহিত জানে দেবদাসী তারই ভোগ্যবস্তু—যদিও দেবদাসী জানে সে দেবতার জন্য উৎসর্গীকৃত। পুরোহিতের এ আচরণ নিন্দনীয় নয়—তার এ অধিকার স্বীকৃত অধিকার। খবরটা পড়ে বহুদিন আগে লেখা অনুরূপা দেবীর একটি ছোটগল্পের (দেবদাসী) কথা মনে হল।[৫] ধার্মিকরা ধর্মের নামে একটি মেয়েকে ধর্ষণ করে ধর্ম রক্ষা করছে।

দলিত মেয়েরা আজ সচেতন হয়েছেন তাঁরা কথা বলছেন—সমাজে নিজেদের একটা জায়গা করে নিতে চাইছেন।

"আমরা আসছি
আমরা আসছি
যুগ যুগ ধরে তোমরা যাদের দাবিয়ে রেখেছ
সেই সব মানুষের আওয়াজ আমরা"।[৬]

মীনাক্ষী মুনে মারাঠি ভাষায় একটি তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করেন 'Amihi Itihas Ghadavla (we too have made history)'[৭]। বইটির মুখবন্ধটি ইংরেজীতে লেখা।

বইটিতে লেখিকা দেখিয়েছেন বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই দলিত সমাজ ও আদিবাসী সমাজ, বিশেষ করে মেয়েরা লড়াই করছে অধিকার অর্জনের জন্য, মানুষের মত বাঁচার জন্য। সমস্যা মেয়েদের ঘরে বাইরে সর্বত্রই। দলিত ছেলেমেয়েরা আজকাল লেখাপড়া শিখছেন এবং সংরক্ষিত আসনে দলিত বলে চাকরিও পাচ্ছেন। কিন্তু মেয়েরা চাকরি পেলে দলিত পুরুষরা মনে করছে মেয়েরা তাদের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে—ফলে মেয়েদের উপর অত্যাচার বাড়ছে। মেয়েরা আজ প্রকাশ্যেই সাহস করে বলছেন 'তারা এমন ধর্মই মানতে চান যে ধর্ম তাদের স্বাধীনতা দেবে, সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে দেবে এবং সমাজে মেয়ে পুরুষের সমানাধিকার দেবে'।[৮]

১৯৯৪ সালের জানুয়ারীতে অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতিতে একটি মহিলা সম্মেলনে ১০০০ জন দলিত এবং আদিবাসী মহিলা উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। এই সম্মেলনে একটি পোস্টার সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পোষ্টারটি ছিল এইরকম ঃ

'The Rights and Responsibilities of Dalit women'

To own bodies - and be Controlled by state 'upper' Castes and men (দলিত মেয়েদের শরীরটা তার নিজের কিন্তু তার উপর অধিকার রাষ্ট্রের উপরতলার মানুষ এবং পুরুষ মানুষের)

To be untouchable by day – and touchable by night.

(এরা দিনে অস্পৃশ্য, কিন্তু রাতে নয়)

To be cultivators – and Starve unto dealth.

(এরা চাষ করে, কিন্তু আমৃত্যু উপোষ থাকে)

To work, labour — and profit others.

(এরা কাজ করে এরা শ্রমিক, কিন্তু লাভ অন্যের)

To Cast our votes — and seat others.

(আমরা ভোট দিই — তবে প্রার্থী হয় অন্যরা)[৯]

১১ আগষ্ট, ১৯৯৫ এ বিভিন্ন অঞ্চলের দলিত মহিলা সংগঠন গুলো সমন্বিত হয়ে তৈরি হল National Federation of Dalit women (N FDW)। দলিত মেয়েরা কথা বলার একটা জায়গা পেলেন। মাদুরাই এর পেন্নুরিমাই ইয়াক্কাম'র সভানেত্রী গাব্রিয়েল ডিয়াট্রিচ বলেছেন 'দলিত আন্দোলনকে আরও মহিলাদের কথা ভাবতে হবে এবং মহিলা আন্দোলনকেও দলিতদের কথা মাথায় রাখতে হবে — তবেই দলিত মেয়েদের আন্দোলন একটা জায়গা (Space) পাবে। মহিলা আন্দোলন এমনকি বামপন্থী আন্দোলনও সাম্প্রদায়িক সমস্যা জড়িত বলে মুসলিম সমাজ এবং মুসলিম মেয়েদের

কথা কিছুটা ভাবে, কিন্তু জাতপাত সমস্যা জর্জরিত দলিত ও আদিবাসী মেয়েদের সমস্যা তাদের ছুঁয়ে যায় কিন্তু গভীরে প্রবেশ করে না।

৪০ বছরেরও বেশী দলিত আন্দোলন হচ্ছে কিন্তু মেয়েদের অবস্থা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? হামারা ভাগ্যদারি কাহান হ্যায়? — আমাদের (মেয়েদের) ভাগ কোথায়? সংখ্যায় কম হলেও দুই প্রজন্ম ধরে দলিত পুরুষ এবং মেয়ে লেখাপড়া শিখছেন। স্কুলে, কলেজে', সরকারী অফিসে তারা চাকরি পাচ্ছেন, রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করছেন। অন্যে কা কথা দলিত পুরুষরাও মেয়েদের এতটা অগ্রগতি সহ্য করতে পারছেন না। কোন গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে মেয়েদের জায়গা হয় না। পারিবারিক অত্যাচার, যৌন লাঞ্ছনা, লিঙ্গবৈষম্য সব কিছুরই শিকার হন মেয়েরা। তবে আজ তারা প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদ করেন, শেষ পর্যন্ত লড়াই করেন, তারপর চুনি কোটাল হন!

মেয়েদের জন্য পঞ্চায়েতে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হন দলিত মেয়েরা। তাদের শুধু অপমান নয়, তাদের উপর অত্যাচারও করা হয়। কেন? হরিয়ানার সোনিপাতের একজন দলিত মহিলা সরপঞ্চহিসাবে নির্বাচিত হয়েও পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকতে পারলেন না ছোট জাত বলে। বড় জাতের মানুষের বক্তব্য এই মহিলা পঞ্চায়েত অফিসে প্রবেশ করলে অফিস অপবিত্র হবে। দলিতদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা অন্যান্য নেতৃত্ব লড়াই করা তো দূরস্থান, এটা যে অন্যায় এবং বেআইনি এ প্রশ্নও কেউ তুললেন না।

গুজরাটে একজন মহিলা সরপঞ্চকে ১৫ আগষ্ট জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে দেওয়া হল না তিনি দলিত মহিলা বলে। এ কোন ধরণের জাতীয়তাবাদ? মধ্যপ্রদেশে তো একজন দলিত মহিলা সরপঞ্চ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার অপরাধ তাঁকে 'শিক্ষিত, সভ্য ভদ্রলোকেরা' উলঙ্গ করে শহরে ঘুরিয়েছে[১০] কোথায় ছিল তখন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর! কোন, পাল্টা মিছিলও তো নারীর সম্মান রক্ষার্থে রাস্তায় বেরোলো না। ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা এবং মানবাধিকার রক্ষা সংগঠন গুলোর তরফ থেকে জোরালো প্রতিবাদ হয়েছিল, আর তো কেউ কোন কথা বলেনি! মহিলা আসন সংরক্ষণ তবে কি একটা প্রহসনে পরিণত হল। শুধু মাত্র দলিত কেন আজ কেন্দ্রে মহিলা আসন সংরক্ষণ বিল নিয়ে যে তামাশা চলছে তাতে তো পুরুষ মানুষের নগ্ন চেহারাটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠল।

দলিত সমাজের পুরুষরা (যারা মোটামুটি শিক্ষিত ও অধিকার প্রাপ্ত) বছর বছর ঘটা করে আম্বেদকর জয়ন্তী করেন, কিন্তু তারা নিজের বাড়ির বা তাদের সমাজের মেয়েদের অধিকার দিতে রাজি নয়। সমাজের পুরুষ প্রাধান্য যা ঐতিহ্য বলে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে সেই ঐতিহ্যের শিকার মেয়েরা।

গুরগাঁওয়ে শীলা দিদি একজন দলিত মহিলা, পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হয়ে সরপঞ্চ পদে নির্বাচিত হয়েছেন। এই অপরাধের মূল্য তিনি দিয়েছেন তার দুই ছেলের মৃত্যুর

মধ্য দিয়ে। ২০০০ সালে এক ছেলেকে উপর তলার মানুষ অপহরণ করেছে আজও যার খোঁজ নেই। আর অন্য ছেলেটিকে ২০০১ সালে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছে। সবটাই ঘটেছে দিল্লী থেকে কয়েক মাইল দূরে গুরগাঁওয়ে।

২০০১ সালের মে মাসে যে দলিত মেয়েরা নোংরা কুড়োয় (garbage picker) এরকম কয়েকজনকে কান কেটে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের অপরাধ তাঁরা কানে ছোট্ট ছোট্ট সোনার দুল পরেছিল। এ ধরণের অত্যাচারের তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই।

শেষ করব কুমুদ পাওড়ের মারাঠী ভাষায় লেখা আত্মজীবনীর কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে। লেখাটির নাম 'আমার সংস্কৃত পড়ার গল্প'। লেখাটি প্রকশিত হয়েছে 'দলিত' গ্রন্থে। "আমার মত একটি নীচাতিনীচ জাতির স্ত্রীলোক সংস্কৃত যে কেবল শিখতেই পারে তাই নয় শেখাতেও পারে, এ যেন গতানুগতিক মানুষের অনভ্যস্ত দৃষ্টিতে একটি ভয়ঙ্কর খাপছাড়া ব্যতিক্রম হয়ে দেখা দিল।

......আমি একদিন বাবাকে জিজ্ঞেস করেই ফেললুম। আচ্ছা বাবা, বৈদিক মন্ত্রগুলো কোন ভাষায় লেখা? বাবা বললেন, 'সংস্কৃত ভাষায়।' সংস্কৃত কি খুব শক্ত ভাষা, বাবা, আমি শিখতে পারিনে? কেন পারবিনে? আগের দিনতো আর নেই, দেশ এখন স্বাধীন। তুই শেখ সংস্কৃত।"[১১]

কুমুদ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেড়া ডিঙিয়ে সংস্কৃতে ভালভাবেই এম.এ পাশ করলেন। কিন্তু কোথায়ও কোন চাকরি হলনা। এরপর তিনি ইংরেজীতেও এম.এ. পাশ করলেন ১৯৬০ সালে। এ বছর বিয়ে হল অন্য সম্প্রদায়ের ছেলের সঙ্গে। "অবাক কাণ্ড! বিয়ের দুমাসের মধ্যেই সরকারী একটি কলেজে অ্যাসিস্টান্ট লেকচারের চাকরি জুটে গেল।...... যে কলেজে আমি এককালে ছাত্রী হিসেবে অধ্যয়ন করেছি ....সেই বিখ্যাত কলেজে আমি আজ অধ্যাপনা করি। কিন্তু এ সত্ত্বেও একটা সত্য আমাকে সব সময় পীড়া দেয় — এ চাকরি কুমুদ সোমকুয়ারের বরাতে জোটেনি — জুটেছে কুমুদ পাওড়ের ভাগ্যে। বিয়ের পর আমি কুমুদ পাওড়ে হয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপিকা হলাম। কুমারী কুমুদ সোমকুয়ার কিন্তু রয়ে গেল সেই নীচু জাতেরই — বঞ্চিত ও অবহেলিত।"[১২] শরৎকুমার লিম্বালের একটি কবিতা 'সাদা পাতা' ঃ

"চাই না আমি
তোমাদের আকাশ থেকে সূর্য আর চাঁদ,
তোমাদের জমিজমা, খেত খামার,
তোমাদের প্রাসাদগুলি
আমি চাই না ঈশ্বর বা উৎসব,
বর্ণ বা জাতের অভিমান

বা এমনকি, যে ভালবাসা তোমরা পাও মা-বোন-মেয়ের কাছ থেকে
চাই না তাও,
আমি শুধু চাই মানুষের অধিকার।"[১৫]

সূত্রনির্দেশ

১) দলিত - সংকলন ও সম্পাদনা ঃ দেবেশ রায়; সাহিত্য অকাদেমি - ১৯৯৭, পৃ:২০

২) ঐ পৃষ্ঠা-২১

৩) অর্জুন ডাঙলে ঃ *দলিত সাহিত্য ঃ অতীত বর্তমান* ও *ভবিষ্যৎ*; *দলিত* ঃ সম্পাদনা দেবেশ রায়। পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮

৪) Teesta Setalbad . 'Thrice oppressed'. *Communalism Combat*. May 2001. year 8. No. 69 Mumbai.

৫) অনুরূপা দেবী ঃ 'দেবদাসী' ঃ বাংলা গল্প সংকলন(১) সংকলন ও সম্পাদনা অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, অজিত কুমার ঘোষ, সাহিত্য একাডেমী; ১৯৯১ পৃ:১৪৩-৫২

৬) কে রাময়্যা ঃ 'আসছি আমরা' ঃ *দলিত* সম্পাদনা দেবেশ রায় পৃষ্ঠা ঃ ২০৮

৭) Communalism Combat : May 2001. year 8 No. 69 page 14-16.

৮) 'We too have made history' - *Communalism Combat*. may 2001. year 8. No 69 page 16 (বইটি মারাঠি ভাষায় লেখেন Meenakshi Moon. কয়েক দশক আগে। বইটি প্রকাশিত হয় মুম্বাই থেকে। এর ইংরেজী মুখবন্ধ থেকে কিছুটা এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে)।

৯) *Communalism Combat* : page 9

১০) Vimal Thorat : 'Dalit women have been left behind by the Dalit movement & the women's movement'- *Communalism Combat*.

১১) *দলিত* ঃ কুমুদ পাওড়ে ঃ 'আমার সস্কৃত পড়ার গল্প'-পৃ:২৩৭-৪২

১২) ঐ পৃ: ২৪৮

১৩) *'দলিত'* ঃ শরৎকুমার লিম্বালে ঃ 'সাদাপাতা' পৃ: ১৯২।

পাবনা অঞ্চলের জমিদার বাড়ি

আয়শা বেগম

সমগ্র বাংলায় যেসব জমিদার বংশের উদ্ভব হয় তার মধ্যে পাবনা অঞ্চলের জমিদারেরা ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। পাবনা অঞ্চলের[১] জমিদারদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন তাড়াশ জমিদার বংশ। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য জমিদার যাঁদের নাম তাঁদের স্থাপত্য অবদানে বিধৃত হয়ে আছে তাঁরা হলেন শীতলাই জমিদার বংশ, তাঁতিবন্দের জমিদার বংশ, দুলাই জমিদার বংশ, পার্শ্বডাঙার জমিদার বংশ, পোরজনার ভাদুড়ী জমিদার বংশ, বেলকুচির চৌধুরী বংশ, সলপের জমিদার বংশ ও স্থলের পাকড়াশী জমিদার বংশ। এ জমিদার বংশ ছাড়াও অবিভক্ত পাবনার বিভিন্ন স্থানে আরো অনেক ছোট-বড় জমিদার ছিলেন বলে জানা যায়। এঁদের জমিদারি যেসব জায়গায় ছিল তার মধ্যে রয়েছে বাঘাবাড়ি, জামিরতা, উমরপুর, সাঁড়া, করঞ্জা, ভুলবাড়িয়া, খিদিরপুর, মারিফা, রায় দৌলতপুর, গড়গড়ি, কামালপুর, কাজীপুর, নাটুয়াবাড়ি, মেছরা, শ্রীপুর, খোকশাবাড়ি ইত্যাদি।[২] ইতোমধ্যে পাবনা অঞ্চলের অনেক জমিদারবাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, এখনো উল্লেখযোগ্যসংখ্যক জমিদারবাড়ি ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় টিকে আছে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি জমিদারবাড়ির পরিচয় সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

তাঁতিবন্দের জমিদারবাড়ি, সুজানগর

পাবনা শহর থেকে বার মাইল পূর্বে সুজানগর থান্নার উত্তর পূর্ব-দিকে তাঁতিবন্দের জমিদারবাড়ি অবস্থিত। তাঁতিবন্দের জমিদারদের আদি বাসস্থান ছিল চাটমোহরের বোথর গ্রাম। উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তাঁতিবন্দের জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত। তাঁর পরিবারের লোকেরা কালক্রমে তাঁতিবন্দের ভবানীপুরের নন্দী ও হেমরাজপুরের সরকার উপাধিধারী কায়স্থ জমিদারদের সকল সম্পত্তি ক্রয় করে নেন। সে-সময় থেকে হেমরাজপুরের সরকারবাড়ির শিবমূর্তি দুটি তাঁতিবন্দের জমিদারবাড়ির প্রবেশদ্বারে স্থাপন করা হয়।[৩] এ মূর্তি দুটি নিঃসন্দেহে প্রবেশদ্বারের শোভাবর্ধন করেছিল।

একদিকে যুগ-যুগ ধরে রচিত বাংলা স্থাপত্যের প্রভাব অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসকদের স্থাপত্যের অনুকরণে তাঁতিবন্দের জমিদারবাড়ি[৪] ঔপনিবেশিক আমলে নির্মিত অন্যান্য জমিদারবাড়ির ন্যায় অঙ্গনকেন্দ্রিক অর্থাৎ একটি বর্গাকৃতির অঙ্গনের চারপাশে খিলানবেষ্টিত বারান্দাযুক্ত ভবন। এ ভবনের কক্ষসমূহ টানা বারান্দার, পেছনে

সারিবদ্ধভাবে নির্মিত। প্রায় পঁচিশ বিঘা জমির উপর পরিকল্পিত তাঁতিবন্দের জমিদারবাড়িটি দুইভাগে বিভক্ত; কাছারিবাড়ি এবং ভেতরবাড়ি বা অন্দরমহল। কাছারিবাড়ির মূল ভবনটি ছিল তিনতলবিশিষ্ট এবং এর প্রধান প্রবেশপথ ছিল পূর্বদিকে। কাছারিবাড়ির সম্মুখে দুটি বর্গাকার শিবমন্দির একই আকৃতিবিশিষ্ট ও স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত।

তাঁতিবন্দের জমিদারবাড়ির সম্পূর্ণ এলাকাটি মোট চারটি সম অংশে বিভক্ত। উপরে ও নিচে চারটি করে মোট আটটি কক্ষসহযোগে প্রতিটি চত্বর গঠিত। দ্বিতলে ওঠার উদ্দেশ্যে সবকটি চত্বরে একটি করে সিঁড়িপথ যুক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রে বর্গাকার উন্মুক্ত অঙ্গন এবং অঙ্গনকে ঘিরে সারিবদ্ধ খিলানে সৃষ্ট বারান্দা এবং বারান্দার পেছনে পরিকল্পিতভাবে কক্ষগুলি সুবিন্যস্ত।

তাঁতিবন্দের জমিদার বাড়িতে দোলমঞ্চ দুটির গাত্রে খোদিত লিপিতে লেখা ছিল বড় মন্দিরটি গুরুগোবিন্দ চৌধুরী ১২৫০ বঙ্গাব্দে ও ছোটটি বরদাগোবিন্দ চৌধুরী ১২৪৮ বঙ্গাব্দে নির্মাণ করেন।[৫] তাঁতিবন্দের জমিদার বিজয়গোবিন্দ চৌধুরীর সময়ে তাঁতিবন্দে শারদীয় দুর্গোৎসবে ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি লর্ড মেয়ো এসেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁতিবন্দের জমিদারেরা প্রজাদের ভালোবাসতেন এবং পরধর্মের প্রতি উদার ছিলেন। এদেশে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হওয়া পর্যন্ত তাঁতিবন্দ একটি সমৃদ্ধ জনপদ হিসেবে বিবেচিত হত।

তাড়াশ জমিদারভবন, পাবনা সদর

পাবনা শহরের প্রাণকেন্দ্রে (ঢাকা রোডে) বনমালী রায় বাহাদুরের তাড়াশ বিল্ডিং এখন পর্যন্ত প্রায় অক্ষত অবস্থায় আছে। পাবনার জমিদারদের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা এবং পুরাতন বলে পরিচিত এই তাড়াশের জমিদার বগুড়া জেলার চান্দাইকোণার কাছে 'কোদলা' গ্রামে একঘর কায়স্থ জমিদার ছিলেন; এই জমিদারই তাড়াশের রায়বংশের পূর্বপুরুষ বাসুদেব যিনি নবাব মুর্শিদকুলি খানের রাজস্ব বিভাগে চাকরি করে প্রতিষ্ঠা করেন রাজবাড়ি। নবাব মুর্শিদকুলি খান বাসুদেবকে 'রায়চৌধুরী' খেতাবে ভূষিত করেন। তার জমিদারি ছিল প্রায় ২০০ মৌজা নিয়ে। আদিতে বনওয়ারীলাল ফরিদপুর থানার ডেমরাতে বসতি স্থাপন করেন এবং কালক্রমে এই স্থানের নাম হয় বনওয়ারীনগর। জানা যায়, ১৯৪২ সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধের আতঙ্কে এ জমিদার পরিবার তাদের পাবনা শহরে নির্মিত ঐতিহাসিক তাড়াশ ভবনে চলে আসেন।

ভবনটি আয়তাকৃতির এবং এর আয়তন দৈর্ঘ্যে ৩০.৪০ মিটার (১০০ ফুট) এবং প্রস্থে ১৮.২৮ মিটার (৬০ ফুট)। চারটি কোরিনথিয়ান স্তম্ভের উপরে আকর্ষণীয় দ্বিতল গাড়িবারান্দা সহজেই পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাড়াশ জমিদার ভবনের দুই পার্শ্বে দুটি বর্ধিত অঙ্গ সংযুক্ত রয়েছে এবং সর্বত্র অর্ধ বৃত্তাকৃতির খিলান সুষমভাবে সন্নিবেশিত

করা হয়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমলে ইউরোপীয় রেনেসাঁরীতির প্রভাবে নির্মিত তাড়াশ ভবনটির সম্মুখ ''ফাসাদ'' দ্বিতলবিশিষ্ট এবং চারটি সুডৌল বৃত্তাকার স্তম্ভ সহযোগে ''ফাসাদের'' দ্বিতলের কক্ষটি নির্মিত। প্রাসাদের সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের শেষপ্রান্তে প্রবেশ ফটকটি দুপার্শ্বে দুটি করে চারটি স্তম্ভ এবং মাঝখানে বিশাল আকৃতির অর্ধবৃত্তাকার খিলানে প্রবেশপথটি সৃষ্ট।[৬]

উল্লেখ্য তাড়াশের জমিদার রায়বাহাদুর বনমালী রায়ের অর্থানুকূল্যের স্মৃতি নিয়ে জেগে আছে 'টমসন টাউন হল' বনমালী ইনষ্টিটিউট' (১৯২৪ খ্রি.) ও এডওয়ার্ড কলেজ। পাবনা অঞ্চলের সর্ববৃহৎ জমিদারকর্তৃক নির্মিত তাঁদের অমরকীর্তি পাবনা শহরের তাড়াশ ভবন আজও তাঁদের স্মৃতি বহন করে দাঁড়িয়ে আছে।

শীতলাই হাউজ, পাবনা সদর

পাবনা শহরে রাঘবপুর নামক স্থানে শীতলাই হাউজ অবস্থিত। চাটমোহরের শীতলাই জমিদারদের পাবনা শহরে নির্মিত সুরম্য ভবনই শীতলাই হাউজ[৭] নামে অভিহিত। শীতলাই গ্রাম চাটমোহরের কাছে সমাজ গ্রামের এক মাইল উত্তরে অবস্থিত। জমিদার লোকনাথ মৈত্র শীতলাই গ্রামের সন্তান।

এ বংশের যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র শীতলাই গ্রাম পরিত্যাগ করেন এবং পাবনা শহরে পদ্মা তীরে ১৯০০ সনে পাবনা শীতলাই হাউজ নির্মাণ করেন।

''শীতলাই হাউজ'' অনায়াসে সমসাময়িককালে গড়ে ওঠা দৃষ্টিনন্দন কলকাতা (ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল) ও ঢাকা (কার্জন হল ও হাইকোর্ট বিল্ডিং)-এর সাথে তুলনীয়।[৮] বৃহৎ আকৃতির বিস্তৃত অঙ্গনজুড়ে নির্মিত ''শীতলাই হাউজ''—বিশাল দ্বিতল ভবনটির পূর্বদিকে সম্মুখ ''ফাসাদ'' ভবনের কেন্দ্রকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে ''শীতলাই হাউজকে'' দক্ষিণ ও উত্তরদিকে প্রসারিত করা হয়েছে। বস্তুত কেন্দ্রকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে সামনের দিকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। ভবনটির বাকি তিন দিকেও একইভাবে অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতাবিশিষ্ট স্থাপত্যরীতি অনুসৃত হয়েছে। ''ফাসাদের'' কেন্দ্র ক্রমশ উঁচু হয়ে সবশেষে পাখির নকশা ধারণ করেছে। ছাদে বেষ্টনীর ''প্যারাপেটে'' গোল ছিদ্র ও ছোট ছোট বুরুজ স্থাপন করা হয়েছে। এ ভবনের উত্তর পশ্চিম কোণে একটিমাত্র গম্বুজ রয়েছে এবং ছোট কলস আকারের শীর্ষ বুরুজের ব্যবহারে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। উল্লেখ্য, শীতলাই ভবনের পূর্বমুখী ''পোর্টিকো'' অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলানে নির্মিত এবং কোরিনথিয়ান স্তম্ভ দ্বারা সমর্থিত। ''পোর্টিকোর'' উপরে ৯.১৪ মি.×৬.১০মি. (৩০ ফুট×২০ ফুট) আকৃতির হল ঘরটি স্থাপিত। ভবনের কেন্দ্রস্থলে অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলানে সৃষ্ট আকর্ষণীয় প্রবেশ পথের দুই ধারে নির্মিত হয়েছে বিস্তৃত টানা বারান্দা। বিশাল গম্বুজের একেকটি শিরে একটি করে সাপের নকশা রয়েছে। সুবিন্যস্ত সাপগুলো উপর থেকে নিচে নেমে এসেছে এবং সবশেষে রয়েছে সাপের ফণা। দক্ষিণ দিকে

ভবনের কেন্দ্রীয় অংশ সম্মুখে সম্প্রসারিত এবং নিচতলায় অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলানের সাথে দ্বিতলের কোরিনথিয়ান স্তম্ভের সমন্বয় সাধন ও "ফাসাদ" শীর্ষে ত্রিভুজাকৃতির "পেডিমেন্টের" উপস্থিতিতে অতীব আকর্ষণীয় রূপলাভ করেছে। পাবনা জেলা সদরে শীতলাইয়ের জমিদার কর্তৃক নির্মিত অপূর্ব স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন এ প্রাসাদ নিশ্চিতভাবে তাঁদের উন্নত সাংস্কৃতিক মান ও আর্থিক সচ্ছলতা প্রমাণ করে।

শীতলাই জমিদারবাড়ি, চাটমোহর

শীতলাই জমিদারদের আদি বাসস্থান শীতলাই গ্রামটি জেলার চাটমোহর থানার অন্তর্গত সমাজ গ্রাম থেকে প্রায় এক মাইল উত্তরে অবস্থিত। জানা যায়, শীতল খাঁ নামে জনৈক সৈনিক এর প্রতিষ্ঠাতা; তিনি কোনো আফগান সেনাবাহিনীর কর্মচারী ছিলেন। অবসর গ্রহণ করে তিনি এখানে বসবাস আরম্ভ করেন। কালক্রমে গ্রামটি সমৃদ্ধ জনপদে রূপ নেয়। ভিন্নমতে শীতলা দেবীর নামানুসারে এ গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে শীতলাই। শীতলাই গ্রামের চণ্ডীপ্রসাদ মৈত্র রাণী ভবানীর আমলে বিস্তৃত ব্রহ্মত্র সম্পত্তি লাভ করেছিলেন এবং এখানে জমিদারবাড়ি গড়ে তুলেছিলেন। শীতলাই জমিদার যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র ১৯০০ সনে পাবনা সদরে "শীতলাই হাউজ" নির্মাণ করেন। শীতলাই জমিদারদের প্রজামঙ্গলে অবদান থাকায় ইংরেজ সরকার 'রায়বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেছিলেন।

দুলাই চৌধুরী (জমিদার) বাড়ি, সুজানগর

পাবনা জেলায় সুজানগরের অন্তর্গত দুলাই গ্রামে দুলাই চৌধুরী (জমিদার) বাড়িটি অবস্থিত। এ জমিদারবাড়ি চারদিকে পরিখা দ্বারা বেষ্টিত এবং এতে একটি জীর্ণ দশাগ্রস্ত জাঁকালো প্রবেশপথের অংশ বিশেষ এখনো বিদ্যমান। অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলান সহযোগে ছয়টি স্তম্ভের উপরে প্রবেশপথটি নির্মিত। খিলানপথে প্রবেশ করে প্রাঙ্গণের দক্ষিণে আছে একটি পুষ্করিণী এবং পশ্চিমে আছে মসজিদ। জমিদারবাড়ি প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে অবস্থিত বেষ্টনী দেয়াল পরিবৃত জমিদারবাড়িটি দু-অংশে বিভক্ত যার সম্মুখ ভবনটি কাছারি ও পশ্চাৎভাগে অন্দর মহলের ভবন; দুটি ইমারতই দোতলা বাড়ির দ্বিতীয় অংশে জলাধার সংবলিত একটি হাম্মাম ছিল।

জমিদারবাড়ির জামে মসজিদের শিলালিপি ১২১৭ হিজরি (১৮০২ খ্রি.) অনুযায়ী এ জমিদারবাড়ির নির্মাণকাল উনিশ শতকের প্রারম্ভে বলে প্রতীয়মান হয়।

সাদুল্লাহপুর বড় জমিদারবাড়ি, সাদুল্লাহপুর, সুজানগর

সাদুল্লাহপুর বড় জমিদারবাড়িটি পাবনা সদর থানায় পাবনা থেকে ১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে সুজানগরগামী প্রধান সড়কের উত্তর দিকে অবস্থিত। জমিদারবাড়িটি একটি অঙ্গনকে কেন্দ্র করে গঠিত যার পেছন দিকে অন্দরমহল এবং সামনের দিকে কাছারি অবস্থিত। এর দালানও দ্বিতলবিশিষ্ট এবং উপর তলায় চারদিকে খিলান সারি এবং বারান্দা রয়েছে। উল্লেখ্য, দ্বিতলে উঠার জন্য রয়েছে দুটি সিঁড়িপথ। কাছারি ও অন্দরমহলের

ভবনে "স্ট্যাকো" পদ্ধতিতে ফুল, লতাপাতার অলঙ্করণ ও জ্যামিতিক নকশা পরিলক্ষিত হয়। এ জমিদারবাড়ির দোতলা ভবন, দ্বিতল অবধি সিঁড়িপথ, স্তম্ভসারি, বারান্দা, খিলান "স্ট্যাকো" নকশা সবই ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতির প্রভাবে ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাংলায় গড়েওঠা স্থাপত্যের নমুনা। এছাড়া সুজানগরে রয়েছে সাদুল্লাহপুর ছোট জমিদারবাড়ি, কুন্ডু জমিদারবাড়ি, মথুরাপুর জমিদারবাড়ি ও সাগরকান্দি জমিদারবাড়ি।

বোথর বিশ্বাসবাড়ি, চাটমোহর

পাবনা জেলার অন্তর্গত চাটমোহরের বড়াল নদীর উত্তরপাড়ে অবস্থিত বোথর গ্রামের ভবনগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এখানে উঁচু মাটির ঢিবি, ইটের নির্মিত দেয়ালের ভগ্ন অংশবিশেষ এদিকে-ওদিকে পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে বিশ্বাসবাড়ির বেষ্টনী প্রাচীর আবাসিক ভবনগুলো ধ্বংসের পথে দ্রুত ধাবমান।

পার্শ্বডাঙা জমিদারবাড়ি, চাটমোহর

পাবনা জেলায় চাটমোহর উপজেলার পার্শ্বডাঙা ইউনিয়নের অন্তর্গত পার্শ্বডাঙা নামক গ্রামে পার্শ্বডাঙা জমিদারবাড়ি অবস্থিত। উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৮ কি.মি. পূর্বে বাজারের সন্নিকটে এ জমিদারবাড়ির ভবন অবস্থিত। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রবর্তনের সময়ে এ অঞ্চলের জনৈক গোবিন্দ চৌধুরী এ জমিদার বংশ প্রতিষ্ঠা করেন এ জমিদারবাড়ির পেছন দিকের দুই অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও প্রথম তলার সম্মুখভাগ এখনো সর্বশেষ অস্তিত্ব নিয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতের অবশিষ্টাংশে বর্তমানে পার্শ্বডাঙা হাইস্কুল স্থাপিত হয়েছে। এ জমিদার ভবনের সম্মুখ ও পিছন দিকে পুষ্করিণী দুটিতে শানবাঁধানো ঘাট বিদ্যমান রয়েছে। পুষ্করিণীর উত্তর-পূর্ব কোণে একটি ছোট মন্দির পরিলক্ষিত হয়। পার্শ্বডাঙার জমিদারবাড়ি সংস্কার ও সংরক্ষণের অভাবে অনিবার্য ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে।

ফরিদপুর জমিদারবাড়ি (রাজবাড়ি), ফরিদপুর

পাবনা জেলার অন্তর্গত ফরিদপুর উপজেলার ঠিক মাঝামাঝি স্থানে ফরিদপুর জমিদারবাড়িটি (রাজবাড়িটি)[১] অবস্থিত। তাড়াশ জমিদার বংশের খ্যাতনামা পুরুষ বাসুদেব রায়ের পুত্র বলরাম রায়। বলরাম রায়ের অধস্তন বংশধর বনওয়ারীলাল রায় উনিশ শতকের মধ্যভাগে এ অঞ্চলে পশুপাখি শিকার উপলক্ষে আসেন। ফরিদপুরের প্রাকৃতিক পরিবেশ তার মনকে আকৃষ্ট করায় এখানে একটি কাছারিবাড়ি নির্মাণ করেন। এ কাছারিবাড়ির চারিদিকে পরিখা খনন করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করেন বনওয়ারীলালের নামানুসারে ফরিদপুরের নামকরণ করা হয় বনওয়ারীনগর। জমিদারবাড়ির প্রধান ভবনটি (দ্বিতল) এবং এর সাথে আরো দুটি একতলা ভবন নিয়ে গড়ে উঠেছে বর্তমান উপজেলা পরিষদের কার্যালয়।

তলট জমিদারবাড়ি, সাঁথিয়া

পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলায় করুণা ইউনিয়নে তলট গণেশ মন্দির থেকে প্রায় ৯২.৬০ মিটার পশ্চিমে তলট জমিদারবাড়ি অবস্থিত। বর্তমানে এখানে কেবল একটি পুরাতন ইমারতের ধ্বংসস্তূপ পরিলক্ষিত হয়। তলটের জমিদারদের বসতবাড়িটির যে ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে বিদ্যমান আছে তা থেকে বোঝা যায় যে, জমিদার ভবনটি ছিল দ্বিতল বিশিষ্ট। জমিদার হিমাংশুধর রায় মন্দির ও জমিদারবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

করঞ্জা চৌধুরীবাড়ি, তলট, সাঁথিয়া

করঞ্জা চৌধুরীবাড়ি পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৪.৮০ কিলোমিটার পূর্ব দিকে করঞ্জা ইউনিয়নে করঞ্জা গ্রামে অবস্থিত। বর্তমানে এখানে করঞ্জা চৌধুরীবাড়ির পুরাতন ভগ্ন ভবনটি বিদ্যমান আছে। করঞ্জা অঞ্চলের চৌধুরীবংশের দুজন জমিদার রাজেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও তারিণীনাথ চৌধুরীর নাম জানতে পারা যায়। জমিদারবাড়ির অট্টালিকাটি দক্ষিণমুখী. দ্বিতল বিশিষ্ট ভবনটি সমান দুই ভাগে বিভক্ত।

মৈত্রীবাড়ি, তলট, সাঁথিয়া

মৈত্রীবাড়ি সাঁথিয়া উপজেলায় তলট গ্রামে করঞ্জা চৌধুরীবাড়ি থেকে আনুমানিক ৯২ মিটার দূরে পূর্ব দিকে অবস্থিত। মৈত্রীবাড়িটি একটি একতলা অট্টালিকা। এ অট্টালিকাটি নির্মাণ করেন অতীন্দ্রনাথ মৈত্র। নির্মাতার নামানুসারে স্থানীয় জনসাধারণ এ বাড়িটিকে মৈত্রীবাড়ি বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

বাগচীবাড়ি, তলট, সাঁথিয়া

বাগচীবাড়িটি পাবনার সাঁথিয়া উপজেলায় তলট গ্রামে চৌধুরীবাড়ি থেকে প্রায় ২০০ মিটার দক্ষিণে অবস্থিত। বাগচীবাড়ি একটি দ্বিতল অট্টালিকা। তলটের বাগচী বংশীয় ব্যক্তিবর্গ ছিলেন করঞ্জার চৌধুরীদের প্রতিদ্বন্দ্বী। উপেন্দ্রনাথ বাগচী আলোচ্য বাগচীবাড়ি নির্মাণ করেন।

হরিপুর জমিদারবাড়ি, চাটমোহর

চাটমোহর থানার পশ্চিম দিকে প্রায় ৯ মাইল দূরে হরিপুর জমিদারবাড়ি অবস্থিত। এ জমিদারি ছিল চৌধুরী বংশের জমিদারদের। সাতোটার মৈত্র ও অম্বর ওঝার বংশধর ছিলেন এ জমিদারেরা। হৃষিকেশ মৈত্র ছিলেন রঘুনন্দন মৈত্রের পুত্র; রঘুনন্দন মৈত্র আফগান শাসকদের অধীনে সেরাস্তাদার ছিলেন এবং মজুমদার উপাধি পান। হৃষিকেশ মৈত্রের আর্থিক অবস্থা উন্নত হলে চক্রবর্তী উপাধিধারণ করেন। হৃষিকেশের দুই পুত্রের নাম হরি ও যাদব। যাদবের ছেলে কাশীনাথ নিজ পিতৃব্য হরি মৈত্রের নামানুসারে গ্রামটির নাম রাখলেন হরিপুর। জে. এন. চৌধুরী এ জমিদারদের অধস্তন বংশধর।

পয়দা জমিদারবাড়ি, গয়েশপুর, পাবনা সদর

পয়দা জমিদারবাড়ি পাবনা সদর থানার অন্তর্গত থানা অফিস থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে গয়েশপুরের পয়দা গ্রামে অবস্থিত। জমিদারবাড়ির প্রাসাদভবন, পঞ্চরত্ন মন্দির ও দোচালা আহ্নিক মন্দির ক্রমশ বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। এ জমিদারির অধীনে পাঁচশত বিঘা পরিমাণ জমিজমা, বাগান, বিশাল আকৃতির পাঁচটি পুকুর, দুটি প্রাসাদ, নাচঘর, দোলমঞ্চ, শিবমন্দির ইত্যাদি ছিল। এ দ্বিতল দোলমঞ্চ মন্দিরে[১৩] এখনো পাঁচটি শিখর রয়েছে; কিরণচন্দ্রের পুত্র বৃন্দাবন রায়চৌধুরী পয়দা জমিদারদের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এ ছাড়া পাবনা সদরে একাধিক জমিদারবাড়ির মধ্যে সিংগা রায়বাড়ি উল্লেখ্যযোগ্য। উল্লিখিত জমিদারবাড়ি ছাড়াও পাবনা অঞ্চলে আরো কিছুসংখ্যক জমিদারবাড়ির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের প্রভাবে স্থানীয় জমিদারদের দ্বারা নির্মিত বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে যেসব বাড়িঘর শতাধিক বছর পূর্বে গড়ে উঠেছিল জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির (১৯৫২ সন) পর জমিদারদের পক্ষে তাঁদের নির্মিত এসব জমিদারবাড়ি, প্রাসাদ, মন্দির ইত্যাদি তাঁদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না। এসব ঐতিহাসিক নিদর্শন কখনো মালিকের অসচ্ছলতার কারণে, কখনো মালিকের অনুপস্থিতিতে ক্রমে অনিবার্য ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়ে চলে। প্রয়োজনীয় সংস্কার ও যথাযথ পরিচর্যার অভাবে বাংলার অন্যান্য স্থানে গড়ে ওঠা জমিদারদের কীর্তির ন্যায় পাবনার জমিদারদের স্থাপত্য অবদান অনিবার্য ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়।

পাবনা অঞ্চলের জমিদার বাড়ি



তাড়াশ জমিদার ভবন, পাবনা সদর



শীতলাই হাউজ, পাবনা সদর



ফরিদপুর জমিদার বাড়ি (রাজবাড়ি), ফরিদপুর, পাবনা

সূত্রনির্দেশ

১। LSSO' Malley. *Bengal District Gazetteers Pabna*. Calcutta. 1923. P 11
২। রাধারমন সাহা, *পাবনা জেলার ইতিহাস*, ১ম খন্ড, পাবনা, ১৩৩০, পৃ: ৪৭-৫৫
৩। *শতবর্ষ স্মরণিকা* ১৯৯০, অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী, পাবনা, ১৯৯১, পৃ: ৫-৭
৪। *বাস্তব পর্যবেক্ষণমূলক জরিপ*, ১৬-৩ ১৯৯৭, চিত্র:১
৫। *শতবর্ষ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ:৬, নির্মাণকাল ১৮৯০ খ্রি:
৬। চিত্র:২
৭। চিত্র:৩
৮। আয়শা বেগম, "ঔপনিবেশিক শাসনকাল ঃ বাংলা স্থাপত্যে ধারাবাহিকতার সঙ্কট" শিল্প কলা, ঢাকা বা. শি. এ. ১৪০৩, পৃ. ৫০-৫১।
৯। চিত্র:৪
১০। চিত্র:৫

বি. দ্র সব আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত

পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনে (১৯৪৮-'৫২) সাপ্তাহিক "নও-বেলাল" এর ভূমিকা

মুহাম্মদ জমালুল আকবর চৌধুরী

ভাষা আন্দোলনকে বাঙালীর স্বাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভাষা আন্দোলনই সর্বপ্রথম পূর্ব বাংলার অধিবাসীদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। পাকিস্তানের সৃষ্টির পর পূর্ব-বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জোর দাবি উঠে। এই দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে সরকার ও বুদ্ধিজীবী মহলে দ্বন্দ্বের সুযোগে সংবাদপত্রগুলোও পক্ষ-বিপক্ষে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে জাতীয় ও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাভাষার স্বীকৃতি আদায়ে সাপ্তাহিক 'নও বেলাল'-এর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। আলোচ্য প্রবন্ধে সাপ্তাহিক 'নও-বেলাল' -এর উদ্ভব ও ভাষা আন্দোলনকে সুসংগঠিত করতে সংবাদ প্রচারনায় এ পত্রিকার ভূমিকা মূল্যায়নের চেষ্টা করা হবে।

সিলেটের সারদা প্রেস থেকে তৎকালে প্রকাশিত হতো সাপ্তাহিক 'নও-বেলাল'। ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারি প্রকাশিত পত্রিকার শিরোনাম ছিল-'পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল সাপ্তাহিক-নও বেলাল'। ৬ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট এ পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মুল্য দুই আনা এবং বার্ষিক ৬ টাকা। পত্রিকার পরিচালক হিসাবে মোহাম্মদ মাহমুদ আলী ও প্রধান সম্পাদক হিসাবে মোহাম্মদ আজরফ (দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ) -এর নাম উল্লেখ করা হয়। 'নও-বেলাল'-তাঁর প্রকাশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেন—

> "ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার যুগ যুগান্তরের অত্যাচার, অনাচার, অবিচার-সহ্য করার ফলে ভারতীয় মনে যে প্রতিক্রিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল—তাহারই অভিব্যক্তি নানাভাবে প্রকাশিত হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে। ...সেই জুলুমের ইতিহাস আজ সর্ব্বজন বিদিত। ...দীর্ঘদিনের সেই সাধনার ফলস্বরূপ আমরা সদ্য স্বাধীন হইয়াছি। ...কিন্তু যে স্বাধীনতার জন্য লক্ষ লক্ষ যুবক আত্মাহুতি দিয়াছে ... যে স্বাধীনতার জন্য কত নারী অম্লান বদনে অকাল বৈধব্য বরণ করিয়াছে—যে স্বাধীনতার জন্য পুত্র হারা জননী আজীবন চোখের জলে বুক ভাসাইয়াছে—সেই স্বাধীনতা লাভে

আমরা সর্ব্বতোভাবে সুখী হইতে পারি নাই। ... যে দিকে তাকাই ... কেবল অত্যাচার অবিচার জমা হইয়া রহিয়াছে। ... মানুষের ন্যায়সঙ্গত দাবী, নর-নারীর প্রকৃত মর্যাদা, আজ শাসন ব্যবস্থায় স্বীকৃত হইতেছে না ... পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতার স্বরূপ কি হইবে সে সম্বন্ধে ভারত বিভাগের পূর্ব্বে কায়েদে আজম, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ অথবা পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু আমাদিগকে যে আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন, যে সাম্যবাদ-মূলক রাষ্ট্রীয় আদর্শের তাহারা পরিকল্পনা করিয়াছিলেন আজ স্বাধীনতা লাভ করিবার পরে সেই রাষ্ট্রীয় আদর্শকে রূপায়িত করিয়া তুলিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে অত্যাচারিত ও অবহেলিত জনসাধারণের আভ্যন্তরীন শোষনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন সংঘবদ্ধ চেষ্টা তাহাদের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠে নাই। ... আমাদের বর্ত্তমান নিঃসহায় অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার বাসনায় পূর্ব্ব পাকিস্তানের নানা অভাব অভিযোগের প্রতিকার কল্পে অনাচার দুর্নীতি প্রভৃতি চিরতরে দূরীকরণের উদ্দেশ্যে 'নও-বেলাল' নবযুগের আদর্শ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। ... ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের মহান দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াই 'নও-বেলাল' আত্মপ্রকাশ করিল। ... বিংশ শতাব্দীর 'নও-বেলাল' তাই আহ্বান জানাইতেছে এ যুগের যত সব পাপ যতসব অনাচার আমাদের মনকে কালিমাময় করিয়া রাখিয়াছে ... যত সব ভেদাভেদ আমাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, আসুন সকলে মিলিয়া একত্রিত হইয়া সেইসব পরিহার করি- নবযুগের উষার আলোকে স্নাত হইয়া আবার নবজীবনের পথে সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার গান করিয়া যাত্রা আরম্ভ করি।"[১]

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির অব্যবহিত পূর্বে ও পরে যখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কীয় তর্কবিতর্ক চলছিল তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাসেম (১৯২০-'৯১) এর নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস'। এই সংগঠনের উদ্যোগে প্রকাশিত 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা - বাংলা না উর্দু?' —শীর্ষক গ্রন্থে বিভিন্ন লেখক বাংলাভাষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন।

'নও-বেলাল'-এ প্রকাশিত 'ঢাকার চিঠি' -তে নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত খবরের উদ্ধৃতি দিয়ে 'তমদ্দুন মজলিস' -এর কর্মতৎপরতার উচ্চ প্রশংসা করে বলা হয়—

"পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাজধানী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রদেশের মুসলমানদের তামুদ্দুনিক কেন্দ্র হিসাবেও তার দায়িত্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এই গুরু দায়িত্ব পালনের

ভার নিয়াছে ঢাকার 'তমদ্দুন মজলিস'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাসেম (এম.এস.সি) এই মজলিসের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা .. উর্দ্দুকে পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে চাপাইয়া দিবার বিরুদ্ধে সমগ্র প্রদেশ জুড়িয়া সম্প্রতি যে প্রবল গণ-বিক্ষোভ দেখা দেয়, তার মূলে রহিয়াছে 'তমদ্দুন মজলিসের' কর্মতৎপরতা...।[২]

এভাবে যখন রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে জনমত সংগঠিত হচ্ছিল ঠিক তখন ১৯৪৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত 'পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে' উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণের সুপারিশ করা হলে পূর্ব বাংলায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য ১৯৪৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের সমন্বয়ে গঠিত 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ২রা মার্চ, ১৯৪৮ তারিখে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ব্যানারে পুনর্গঠিত হলে বাংলা ভাষা আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে।

সিলেটের আলেম সম্প্রদায়ের মধ্যে বাংলা ভাষার পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। সিলেটের মিনার প্রেস থেকে প্রচারিতব্য আলেমদের একটি ফতোয়ায় বলা হয়-'আপনার দীনি ফরজ-সর্ব্বত্র সভা সমিতি করিয়া উর্দ্দুর সমর্থনে জনমত গঠন করা ও উর্দ্দু বিরোধীদের ফেরেববাজি হইতে মুসলিম জনসাধারণকে রক্ষা করা।'[৩] কিন্তু তাজপুরের মোহাম্মদ খলিলুর রহমান তারিখ শূন্য ঐ উর্দ্দু বা বাংলা শীর্ষক ফতোয়ার বিরুদ্ধে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন-

'যদি বাংলা নাপাক হয় তবে ঐ প্রচারপত্রও নাপাক। নাপাকির ভিতর দিয়া কোন মহৎ কাজের চেষ্টাও নাপাক বা না দুরুস্ত একথা আলেম সমাজই বলিয়া থাকেন। বাংলায় যাহাদের অস্থি, মজ্জা গঠিত খোদা রসুলের হুকুম আহকাম যে দেশে বাংলা কথা ছাড়া বলিলে বুঝা যায় না-হঠাৎ তাহাদের চির অজানা একটা ভাষা বাধ্যতামূলক করিয়া দেওয়া বা সমাজকে পিছু হঠাইয়া রাখা কি একই কথা নহে? এদেশের মাদরী জবান বাংলা, কোন কিছুকে সহজ ও বোধগম্য করিতে হইলে সেটা বঙ্গভাষায় হওয়া উচিৎ তবে ২য় ভাষা উর্দ্দু হওয়া আবশ্যক?''[৪]

এদিকে সিলেট মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুস সামাদের নেতৃত্বে ছাত্রদের একটি প্রতিনিধিদল পাকিস্তানের যোগাযোগ ও যান-বাহন বিভাগের উজির জনাব আব্দুর রব নিশতারের সঙ্গে সাক্ষাত করে-'বাংলা ভাষাকে পূর্ব্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন এবং অফিস আদালতের ভাষা হিসাবে ব্যবহার করার দাবি জানান।'[৫]

১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে পূর্ব্ব বঙ্গের প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকেও পরিষদের সরকারি

ভাষা হিসাবে ব্যবহারের দাবি জানান। কিন্তু পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজামুদ্দিন ও গণপরিষদ নেতা লিয়াকত আলী খানের বিরোধিতায় প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান প্রস্তাবটি সম্পর্কে গণ পরিষদে প্রদত্ত এক বক্তব্যে বলেন—

"প্রথমে এই প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য নির্দোষ বলে আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু বর্তমানে মনে হয় পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা এবং একটি সাধারণ ভাষার দ্বারা ঐক্যসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।"[৬]

গণপরিষদের ভাষা হিসাবে 'বাংলা'র দাবি অগ্রাহ্য হওয়ার সংবাদ ঢাকায় পৌঁছামাত্র ছাত্র, রাজনীতিক ও শিক্ষিত মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা ভাষার সমর্থনে রমনা এলাকায় মিছিলের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি সভায় মিলিত হয়। আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দিন আহমদ ও ফজলুল হক হল ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ তোয়াহা বক্তৃতা করেন।"[৭]

"রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" পাকিস্তান গণপরিষদের সরকারি ভাষার তালিকা থেকে 'বাংলা' ভাষাকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে-১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ সমগ্র পূর্ব্ব পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট আহবান করে।[৮] বিভিন্ন স্থানে ধর্মঘট পালন সম্পর্কে নও-বেলালে বলা হয়-ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে ছাত্ররা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে ধর্মঘটের কর্মসূচী পালন করে। ঢাকায় ছাত্রদের পুলিশ কর্তৃক নানাভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হয়। বাংলার ভূত-পূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক সাহেব পুলিশের আঘাতে আহত হন। তাছাড়া পূর্ব বাংলার জননেতা ও ছাত্রনেতাদের প্রতি পুলিশের দুর্ব্যবহার এবং বাংলার জনমতকে উপেক্ষা করে ছাত্রনেতাদের কারাগারে প্রেরণ ইত্যাদি সরকারের স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদকল্পে ১৩ই মার্চ পর্যন্ত যশোহর, খুলনা, সারোয়ালতলী (চাটগাঁ) নরাইল (ত্রিপুরা) প্রভৃতি স্থানে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় বক্তারা পূর্ব বাংলার বর্তমান ফ্যাসিস্ট শাসন পদ্ধতির নিন্দা করেন এবং অবিলম্বে পূর্ব্ব পাকিস্তানের শিক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা ও কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের অন্যতম ভাষা হিসেবে বাংলা চালুর দাবী জানান।[৯]

১লা জুলাই, ১৯৪৮ তারিখে "দৈনিক আনন্দবাজার" পত্রিকার সম্পাদক 'বাংলা ভাষা' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেন-"দেবনাগরীতে লিখিতে আরম্ভ করিলে বাংলা ভাষা শিক্ষা করা সহজসাধ্য হইবে এবং তার ফলে এই ভাষা বিস্তৃতি লাভ করবে।" কিন্তু এই বক্তব্যে 'নও-বেলাল' এর সম্পাদকীয়তে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলা হয়—

"... ইহাদেরই অনুদার দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে জগতের অন্যতম বিশিষ্ট ভাষা আজ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িবে। ইহাদের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বিষে অখণ্ড বাংলা খণ্ডিত হইয়াছে। ইহাদেরই স্বার্থান্ধ বৃদ্ধির ফলে এই উপমহাদেশে প্রাদেশিকতা বিস্তার লাভ করিয়াছে। ... ইহাদেরই অদূরদর্শিতায় বাঙালী আজ ভারতের সর্ব্বত্র লাঞ্ছিত। তবু ইহারা ইহাদের জন্মগত সংস্কারকে কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না।[১০]

১৯৫১ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খা, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনসহ বিধান-পরিষদ ও গণপরিষদের সদস্য, অধ্যাপক, সাংবাদিক, সরকারী কর্মচারি, লেখক, শিল্পী ও ছাত্রদের স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনকে দেওয়া হয়।[১১] এই স্মারকলিপির মূল ভাষ্য ছিল—

"পূর্ব বাংলার জনসাধারণের শতকরা একশ ভাগই বাংলা ভাষাভাষী এবং এ ভাষা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। ... পূর্ব বঙ্গ সরকার যদি এতদিন একে সরকারি ভাষারূপে গ্রহণ করতেন ত'হলে ইতিমধ্যে এর আরো উন্নতি হতো। ১৯৪৮ সালে খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী থাক'কালে পূর্ববঙ্গ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাকে সরকারী ভাষারূপে প্রবর্তন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। তিন বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু তা কার্যকর হয়নি।"

তাই দেশবাসীর পক্ষ থেকে পূর্ববাংলার শিক্ষাবিদগণ স্মরকলিপিতে সরকারকে ১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল থেকে সমস্ত সরকারি কার্যাদি বংলায় সম্পন্ন করার আহ্বান জানান। তারা এতে দেশবাসীর মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

১০ই মে, ১৯৫১ সালের 'নও-বেলাল'-এর সম্পাদকীয়তে বলা হয়-"বাংলাভাষার দাবী অবহেলা করা যায় না। পাকিস্তানের জনসংখ্যার অধিকাংশই পূর্ব্ব-পাকিস্তানের অধিবাসী। তাছাড়া বাংলা ভাষার নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাহিত্য রহিয়াছে। ... অতএব আমরা মনে করি যে, বাংলা এবং উর্দ্দু উভয় ভাষাকেই পাকিস্তানের সরকারী ভাষারূপে স্বীকার করা উচিত। দুইটি সরকারী ভাষা প্রথম দিকে কার্য্যতঃ কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে এবং ব্যয়ভার বর্দ্ধিত করিয়া দিতে পারে। কিন্তু দুইটি ভাষার অবাধ সংমিশ্রণের ফলে জাতির ভিতর এক স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হইতে বাধ্য।"

১৯৫২ সালের ২৫শে জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা নাজিমুদ্দিন ২৭শে জানুয়ারি, ১৯৫২ সালে পল্টন ময়দানের জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি ভাষা প্রসঙ্গে বলেন-"পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। একাধিক রাষ্ট্রভাষা থাকলে কোন রাষ্ট্র শক্তিশালী হতে পারে না।" ভাষা প্রসঙ্গে তাঁর এরকম মন্তব্যে পূর্ব বাংলার জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বাংলা ভাষা বিরোধী বক্তব্যের প্রতিবাদে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' (Dacca University State Language Committee of Action) ৩০শে জানুয়ারি ১৯৫২ সালে ছাত্র ধর্মঘট ও প্রতিবাদ সভা আহবান করে।

১৯৫২ সালের ৩১শে জানুয়ারি'র 'নও-বেলাল' এ 'খাওয়াজা নজেমউদ্দীন ও রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে নাজিমুদ্দিনের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের নিন্দা ও সমালোচনা করা হয়।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে ৩১শে জানুয়ারি, ১৯৫২ সালে ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে মওলানা ভাসানীর (আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সভায় কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে চল্লিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক ঢাকা শহরে যে ছাত্র ধর্মঘট, ছাত্রসভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠানের কর্মসূচী ঘোষণা করে তাঁর প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করে এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ তারিখে সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে সাধারণ হরতাল, সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ তারিখ ভাষার দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করে।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি সভা ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ তারিখে বিকেল ৫টার দিকে আওয়ামী মুসলিম লীগের অফিসে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ই মাইক ও রেডিওতে সরকারি এক ঘোষণায় বলা হয় যে, ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ২০শে ফেব্রুয়ারি থেকেই পরবর্তী ৩০ দিনের জন্য ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। অকস্মাৎ সরকারের গৃহীত এরূপ পদক্ষেপে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ঐ বৈঠকেই ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তারিখে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে কি হবে না তা নিয়ে কমিটির সদস্যদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়। কিন্তু 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারপরও ২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলা হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ তারিখে সকাল ৯টা থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র জমায়েত শুরু হয় এবং গাজীউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের দৃঢ় মনোভাবের দরুন সভাপতি গাজীউল হক ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বিশৃঙ্খলা এড়াতে প্রতি দশ জন করে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে রাস্তায় বের হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ছাত্র-

ছাত্রীরা '১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে' 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'—ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে তৎকালে ব্যবস্থাপক সভা ভবনের কাছাকাছি মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের দিকে এগিয়ে গেলে সেখানে সমবেত পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অতঃপর বেলা প্রায় ৩টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ক্ষিপ্ত হয়ে ছাত্রদের দিকে লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়লে সালাম, বরকত, রফিক ও জব্বার নিহত হয়। এভাবেই বাহান্ন'র একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত ঘটনার সৃষ্টি হয়।

'নও-বেলাল' ২১শে ফেব্রুয়ারি রক্তাক্ত ঘটনার স্মরণে ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তারিখে 'বুলেটের মুখে গেয়ে গেলো যারা-'শীর্ষক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেন—

> ''জুমেরাত আর জুমা পরে পরে দুইদিন মাশরেকী পাকিস্তানের পাক মাটি পাকিস্তানী শিশু আর তরুণের মা'সুম রক্তে রঞ্জিত হইল। শহীদানের স্মৃতির প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি। যাঁহারা আহত হইয়া হাসপাতালে আশ্রয় গহণ করিয়াছেন এবং যে সকল পরিবার হারাইয়াছে তাহাদের নয়নমণি আমরা তাহাদের প্রতি আমাদের সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।
>
> ঢাকার বুকে যাহারা জালিয়ানওয়ালাবাগের পুনরাভিনয় করিল তাহাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের ভাষা আমাদের নাই। সমগ্র জাতির সহিত আমরাও এই রক্তখেকো নরদানবদের কুকর্মের প্রতিবাদ করিতেছি।
>
> যাহারা শক্তির অধিকারী হইয়া আজ ধরাকে সরাজ্ঞান করিতেছেন ইহাদের অনেকেই নিজেকে জনপ্রতিনিধি বলিয়া দাবী করেন। জনমতের এই স্পষ্ট অভিব্যক্তির পরেও ইহাদের অনেকেই বেহায়ার মত গদী আঁকড়াইয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু ইহারও ব্যতিক্রম আছে. পাকিস্তানের আদর্শে যাঁহারা জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন আজাদ সম্পাদক জনাব আবুল কালাম তাঁহাদের অন্যতম। জালেমের জুলুমের প্রতিবাদে তিনি পূর্ব্ব পাক পরিষদ হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার এই বীরোচিত কাজের জন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাই। আমরা জানি যে রক্ত আজ পাকিস্তানের পাক মাটি সিক্ত করিল—তাহা ব্যর্থ হইবার নহে। জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তক্ষরণ একদিন সাম্রাজ্যবাদীর আসনকে টলাইয়া দিয়াছিল। মাশরেকী পাকিস্তানের এই নব্য-জালিয়ানওয়ালাবাগ এই পাকিস্তানের নররাক্ষসদের রাজত্বের অবসান ঘনাইয়া আনিবে।
>
> বুলেটের মুখে যাঁরা জীবনের জয়গান গাহিয়া গেলেন তাঁদের আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক — সমগ্র জাতির সহিত অশ্রুসিক্ত নয়নে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।''

আবার দেশের বাইরের বিভিন্ন সংগঠনও ভাষা আন্দোলনের প্রশংসা করে অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করে। এগুলো 'নও-বেলাল' এ প্রকাশিত হলে ভাষা আন্দোলন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। এ রকম চীনের ছাত্র ফেডারেশনের একটি টেলিগ্রাম ১২ই মার্চ (১৯৫২) তারিখে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের নিকট পৌছে। উক্ত তারবার্তায় বলা হয়—

> "চীনের ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তারিখে পুলিশের গুলিতে শহীদ কিংবা আহত এবং গ্রেফতার কৃত ছাত্রদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়। বিশ্বের ছাত্রসমাজ বিশেষত এশিয়ার ছাত্ররা আপনাদের এই গণতান্ত্রিক ও জাতীয় সংগ্রামকে পূর্ণ সমর্থন করছে।[১২]

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের অধিকার বঞ্চিত গণমানুষের চেতনার প্রথম বহিঃপ্রকাশ। বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায়ের নেপথ্যে জনমত সৃষ্টিতে পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে সাপ্তাহিক 'নও-বেলাল' এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এভাবে সাপ্তাহিক 'নও-বেলাল' এর উদ্দীপ্ত সংবাদ প্রতিবেদন ও পূর্ব বাংলার ছাত্র-শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ গণমানুষের তীব্র বিরোধিতা ও অসহযোগিতার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বাংলা ভাষা বিরোধী ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি গণপরিষদে গৃহীত পাকিস্তান ইসলামিক রিপাবলিকের প্রথম সংবিধানে (২১৪ নং অনুচ্ছেদের ১নং ধারা) উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দানে বাধ্য হয়।

সূত্রনির্দেশ

১। সাপ্তাহিক 'নও-বেলাল' ১লা জানুয়ারি, ১৯৪৮।
২। তদেব, ২৯শে জানুয়ারি, ১৯৪৮।
৩। তদেব, ৮ই জানুয়ারি, ১৯৪৮।
৪। তদেব।
৫। তদেব, ২২শে জানুয়ারি, ১৯৪৮।
৬। তদেব, ৪ঠা মার্চ, ১৯৪৮।
৭। তদেব।
৮। তদেব।
৯। তদেব, ১৯শে মার্চ, ১৯৪৮।
১০। তদেব, ৮ই জুলাই, ১৯৪৮।
১১। তদেব, ১লা মার্চ, ১৯৫১।
১২। তদেব, ২৭শে মার্চ, ১৯৫২।

১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান এবং পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্র

মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম

একথা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে বাঙালী জাতীয়তাবাদ বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভাষাগত ভিন্নতা এবং ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুদৃঢ় করতে ব্যর্থ হয়। স্বাভাবিক কারণেই বাঙালীরা মনে করত ব্রিটিশদের কাছ থেকে পাকিস্তান অর্জিত হলেও তারা পাকিস্তান নামক ঔপনিবেশিক শোষণের শিকারে পরিণত হতে চলেছে। সম্ভবত এ কারণেই পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন কায়েমের সংগ্রাম বা আন্দোলনের সূচনা করে। এ লক্ষ্যেই ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় যে তিনটি প্রধান দফার কথা ঘোষণা করেন সেখানে এই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কথা উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ (১) পূর্ণ গণতন্ত্র (২) পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং (৩) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি। এই ধারার মধ্যেই বাঙালীদের মুসলিম লীগ রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়া ঘটায়। তবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রকট ধারণা বা মুক্তিসংগ্রামের অব্যাহত ধারণাটার প্রারম্ভকাল ভাষা আন্দোলন থেকে। স্বাধিকারের লক্ষ্যে তখন থেকেই যে সংগ্রামের শুরু, ইতিহাসের নানা ধাপে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে তার ফল প্রকাশ পায়। ওই সময়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখতে ব্যস্ত মুসলিম লীগের দুর্নীতি ও দুঃশাসন এবং স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বঞ্চিত পূর্ব বাংলার প্রতি শোষণ, বৈষম্য আর নির্যাতন বাঙালীদেরকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ইতোমধ্যে বাঙালীরা পাকিস্তান সৃষ্টির মূলে যে ইসলামী বা মুসলিম চেতনা কাজ করেছিল তা বর্জন করে। অতঃপর ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। যার ফলশ্রুতিতে পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। জনগণের মধ্যে এ আন্দোলনে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং এই চেতনার মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে ছাত্র-জনতা যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা করে, তা ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬-দফা আন্দোলন ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল জয়লাভের মধ্যে দিয়ে ১৯৭১ সালের

মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ প্রেরণা যোগায়। আর এরই মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথকে উজ্জীবিত করে তোলে।

যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংবাদপত্রের একটা ভূমিকা থাকে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। এ সময় পত্র-পত্রিকায় আন্দোলনের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং ওই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনার উপর ভিত্তি করে সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় এবং বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তবে আন্দোলন চলাকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদ পত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েকটি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *দৈনিক আজাদ, মর্নিং নিউজ, পাকিস্তান অবজারভার, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ* ও *দৈনিক পাকিস্তান*। তবে এ সকল পত্রিকাগুলোর মধ্যে সবটাই যে আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল তা নয়। কারণ পত্রিকাগুলো যতটা না সাংবাদিক নীতি নিষ্ঠা ও সততার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি চালিত হয়েছে তাদের রাজনৈতিক নীতি ও উদ্দেশ্যের প্রভাবে। এজন্য কতিপয় পত্রিকাকে সরকারের রোষানলেও পড়তে হয়েছে। সংবাদপত্রগুলির মধ্যে শুধুমাত্র মুসলিম লীগ সরকার সমর্থক পত্রিকা *মর্নিং নিউজ* ট্রাস্টভুক্ত সরকারি পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তান কে* বাদ দিলে বলা যায়, সবগুলো পত্রিকার একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানে পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

১৯৬৯ সালে গণ অভ্যুত্থানের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ১৯৬৮ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখের হরতাল পালনের মাধ্যমে। জনসমর্থিত এই হরতালে গুলিবর্ষণ করা হলে তা সর্বদলীয় আন্দোলনে পরিণত হয়। গণ-অভ্যুত্থান চরম আকার ধারণ করে ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারী পুলিশের গুলিবর্ষণে। ওই দিন পূর্ব নির্ধারিত ছাত্রগণ যথারীতি তাদের উপর পুলিশ এবং ই. পি. আর. জুলুমের প্রতিবাদে এবং ঐতিহাসিক ১১ দফার দাবিতে ঢাকা সহ প্রদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। অন্যদিকে সংগ্রামী ছাত্র সমাজের কর্মসূচীকে বানচাল করার লক্ষ্যে সশস্ত্র পুলিশ ও ই. পি. আর. বাহিনী ধর্মঘটী ছাত্র-ছাত্রীদের বাধা দেয় এবং ফলে উভয়ের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অনুষ্ঠিত হয়। সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ বাহিনী নির্বিচারে গুলি করে। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র আসাদুজ্জামান (২৫) নিহত হন এবং *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার ফটোগ্রাফার মোজাম্মেল হোসেনও আহত হন। পরদিন এই ঘটনা ছবির মাধ্যমে ফলাও করে তুলে ধরা হয় *আজাদ, সংবাদ, পাকিস্তান অবজারভার* এমনকি ট্রাস্ট ব্যবস্থাধীন *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকাতেও। জানুয়ারী *সংবাদ* এর প্রথম পৃষ্ঠার সমস্তটি জুড়েই ছিলো আন্দোলনের খবর ও ছবি এবং ডানদিকে উপরেও বক্স করে ছাপানো

হলো হরতালের কর্মসূচী। আন্দোলনের খবর ও ছবি এবং ডানদিকে উপরে বক্স করে ছাপানো হলো হরতালের কর্মসূচী। আন্দোলনের উপর সেদিনও লেখা হলো সম্পাদকীয় সংগ্রামের নিশানা। *সংবাদ* এর সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়েছিল:

> সামগ্রিক ভাবে অগণতান্ত্রিক নির্যাতনমূলক ব্যবস্থাকে সরকার আজও আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিয়া শান্তিরক্ষার দোহাই দিয়া এই ধরণের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটাইয়া চলিয়াছেন, তাহা কোন সভ্য দেশে চলিতে পারে না। বন্ধ করো এই গুলি গালাজ ও হত্যানীতি।[১]

এতে শুধু আন্দোলনের প্রতি *সংবাদের* সমর্থনই ছিলো না, সে আন্দোলনের পর্যায় বিশ্লেষণ করে তাকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে সঠিক খাতে নিয়ে যাওয়ার পথনির্দেশও ছিলো এই সম্পাদকীয়তে। সেই সাথে সাবধান করে দেওয়া হলো : প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি প্রতিশ্রুতিশীল আংশিক সংগ্রামী আন্দোলনের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য নানা ধরণের প্রচেষ্টা চালাইবে।[২] উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে পত্রিকাগুলোর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে জোরালো ভূমিকা পালন করে *দৈনিক আজাদ* আসাদের মৃত্যুর পর ২২ জানুয়ারী তারিখে *দৈনিক আজাদের* প্রথম পৃষ্ঠার পাঁচ কলামব্যাপী সংবাদ শিরোনাম ছিল :

> মৃত্যুর জানাজা মোরা কিছুতেই করিব না পাঠ
> কবরের ঘুম ভাঙে জীবনের দাবি আজ এতই বিরাট।[৩]

এ রিপোর্ট সাংবাদিকের আবেগ জাত অনেক উপস্থিতি থাকলেও পরিস্থিতিকে অনুধাবনের জন্য তা খুবই সহায়ক হবে। রিপোর্টটিতে আরো উল্লেখ করা হয়েছিল:

> শহীদ আসাদের মৃত্যুর খবর দাবানলের মত সমগ্র শহরে ছড়িয়ে পড়ায় সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হলের সামনে একদল ছাত্রের গুঞ্জরণ থেকে উপরের ঐ শব্দগুলি আমার কানে নয় বুকে এসে বাজল। ছেলেটি আবৃত্তি করছিল না, যেন চোখ মুখ কণ্ঠ এক করে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উচ্চারণ করছিল। বাকি যে কয়জন শুনছে তাদের চোখেও যেন আগুন জ্বলছে। কাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি শোকাহত মনোভাব দেখিনি, দেখেছি সাথীর মৃত্যুতে সমগ্র ছাত্র সমাজের গত এক দশকের সঞ্চিত বিক্ষোভ যেন ফেটে পড়িয়াছে। জালেমের জিঞ্জির ভাঙবার শপথে তাহারা অটল।[৪]

শহরের বিবরণ দিতে গিয়ে রিপোর্টার উল্লেখ করেছিল:

> দেখে মনে হল, সরকারি নির্যাতন আর বেত, বুলেট বেয়নেট সমগ্র জনতাকে আজ প্রতিবাদ মুখর আর বিক্ষুব্ধ করে তুলিয়াছে। মুক্তি পিয়াসী মানুষ আজ আন্দোলনে নামিতে কিছু দ্বিধা করিতেছে না। প্রিয় নওয়াবগঞ্জ এলাকার

> পানওয়ালা বলিয়াছেন, শুধু ছাত্র-ছাত্রী দিয়া আন্দোলন অইত না। ইবার হক্কলের এক হওন লাইগ।[৫]

এই বিবরণে পাওয়া যায় সাধারণ জনগণ কতকটা বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের ২৩ জানুয়ারী *দৈনিক আজাদ* এর ব্যানার শিরোনাম ছিল ঃ আঘাত হেনেছে নিত্য, অত্যাচার যত লক্ষ চিত্ত, দীপ্ত ক্রোধে এবার বারুদ, আসাদ সহস্র মন এখানে জাগ্রত সারাদেশ আজ যেন রক্তের বুদ্বুদ।[৬] এভাবে আন্দোলন ক্রমশ আরো তীব্র হয়ে উঠছিল। ১৯৬৯ সালের ২৩ জানুয়ারী সন্ধ্যায় এক বিস্ময়কর মশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এ দিন শুধু যে ছাত্ররাই মিছিল বের করে তা নয়, ডাক এর পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ (মস্কোপন্থী) এর নেতৃত্বে একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রা বের হয়, এতে কম করে হলেও ২ হাজার ব্যক্তি অংশগ্রহণ করে। সন্ধ্যার সময় যখন ছাত্র-ছাত্রীদের মশাল মিছিল বের হয় তখন বোঝা যায় গণ জাগরণ কোন পর্যায়ে অবস্থান করছে। এ মশাল মিছিলের বিবরণ দিতে গিয়ে *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তার শিরোণামে লেখা হয়, ঢাকার বুকে স্মরণকালের বৃহত্তর মশাল মিছিল: ত্রিশ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণ।[৭] মশাল মিছিল সম্পর্কে ২৫ জানুয়ারী তারিখে *আজাদ* এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রকাশিত নিবন্ধের শিরোনাম ছিল ঃ সেদিনের বৃহত্তর মশাল মিছিলে যা দেখেছি। যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে।[৮] নিবন্ধে আজাদ উল্লেখ করেছিল ঃ

> যে আলোর পথযাত্রী মুক্তির সংগ্রামী পথে শুরু করিয়াছে তাহার যাত্রা, গত বৃহস্পতিবারের মিছিলে তাঁহার হাতে মশাল ছিল। সে এক অনন্য বৃহস্পতিবার। বাহান্নর একুশের অনেক চড়াই উৎরাই ডিঙিয়ে আবার আসিয়াছিল উনসত্তরের জানুয়ারীতে আবেক আলোক দীপ্ত বৃহস্পতিবার। ঢাকায় সেদিন মিছিল ছিল। ওরা ডাক দিয়াছিল মশাল মিছিলের। একুশের উত্তরসূরীর ছাত্র সমাজের ডাকে দিকে দিকে বেজে উঠিয়াছে অগ্নিবীণার তার। এমন মিছিলে শরীক হইয়াছে কারখানার শ্রমিক, পথের রিক্সাওয়ালা, গঞ্জের মহাজন, ষ্টেশনের কুলি, ঘরের গৃহিনী অফিসের কেরানী, নৌকার মাঝি-এক এক কথায় সব স্তরের মানুষ-তাদের বুলন্দ আওয়াজ করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে রাজধানীর লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে মুখে ফিরিয়াছে। সর্বত্র এখন এক আওয়াজ আসাদ ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে দেব না।[৯]

মর্নিংনিউজ পত্রিকাতে গণ-অভ্যুত্থানের খবর নিয়মিত ছাপা হলেও খুবই কম গুরুত্বের সাথে তা ছাপা হত। যা অতি সহজেই অন্যান্য পত্রিকা থেকে পৃথক করা যেত। যেমন ডাক গঠনের পর থেকেই ব্যাপকভাবে আওয়ামী লীগ সক্রিয় হয়ে ওঠে।[১০] কিন্তু বিষয়টিকে সরকার সমর্থক পত্রিকা *মর্নিং নিউজ* সুনজরে দেখেনি। এজন্য পত্রিকা তার এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে ঃ

Supposing President Ayub were to take his detractors at their words and administrative and step down tomorrow what will happen? A political and administrative vacuum for the simple reason that jointly the Opposition (DAC) has no policy and individually one opposition party, would not let the other make any move. In fact the decision to boycott the elections sprung from the main fact that the parties were unable to agree on a single candidate.

পত্রিকাটির গণবিরোধীর প্রমাণ মেলে গণঅভ্যুত্থান চলাকালীন সময়ে আসাদ নিহত হলে সরকার সমর্থক *মর্নিং নিউজ* পত্রিকাতে কোন সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়নি। ট্রাস্টের অপর একটি পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তানের* বেলায়ও এ ধরণের অভিযোগ করা যায়। অন্যান্য পত্রিকাগুলো যেখানে আন্দোলনের পক্ষে সোচ্চার ছিল। সেখানে *দৈনিক পাকিস্তান* সরকারের প্রতি অত্যন্ত নমনীয় ছিল। *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার এই গণ-বিরোধী এবং আন্দোলন বিরোধী ভূমিকার অভিযোগে বিক্ষুব্ধ জনতা ২৪ জানুয়ারী তারিখে ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট ভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়।[১২] একারণেই *মর্নিং নিউজ* এবং *দৈনিক পাকিস্তান* ২৫ এবং ২৬ জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত হয়নি।

পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন, ছাত্রদের ওপর পুলিশ বাহিনীর নির্মম হামলা, গুলিবর্ষণ ও হত্যা ইত্যাদির প্রতিবাদে পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ ১৭ দফা ভিত্তিক জোরালো আন্দোলন করে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফাকে সমর্থন জানায়। করাচীতেও সরকার বিরোধী আন্দোলন এমন এক তীব্র রূপ ধারণ করে যে, তা প্রতিরোধের জন্য সরকারকে ২৯ জানুয়ারী থেকে পরবর্তী ৪৮ ঘন্টা বিরতিহীন সান্ধ্য আইন জারি করতে হয়।[১৩] পূর্ব পাকিস্তানে ক্রমাগত কয়েকদিন ধরে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে দেশের সর্বত্র শোক ও মশাল মিছিল এবং গণ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। গণ বিক্ষোভকে নিস্তেজ করার জন্য শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনী তলব করা হলেও অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। এ সময়ে শত-বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সংগ্রামী জনতার উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে আইয়ুব সরকার ভীত হয়ে পড়েন। তিনি ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৬ তারিখে ঢাকায় পরিস্থিতি অবলোকন করার জন্য আসেন। পরদিন ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি দেশ রক্ষা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৬৬ সাল থেকে *ইত্তেফাকের* ছাপাখানা বন্ধ থাকার বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। সেই থেকে দৈনিক *ইত্তেফাক* পুনরায় ফেব্রুয়ারী মাসের ৮ তারিখ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। দীর্ঘ দিন *ইত্তেফাক* বন্ধ থাকার পর ১৯৬৯ সালে পুনঃপ্রকাশিত হবার প্রাক্কালে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গন ছিল খুবই উত্তপ্ত। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে তখন *ইত্তেফাক* সক্রিয় হয়ে ওঠে। বস্তুত এই সময়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির চাপে পড়ে সরকার এক ঘোষণায় ফেব্রুয়ারী মাসের ২২ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল রাজবন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি এবং

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তির সংবাদ ফেব্রুয়ারি মাসের ২৩ তারিখের সকল পত্রিকায় আবেগমন্ডিত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। *দৈনিক ইত্তেফাক* তার বিশেষ সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেছিল ঃ

> পূর্ব বাংলার মাটিতে অবশেষে বাস্তিলের কারাগার ধ্বসিয়া পড়িয়াছে জনতার জয় হইয়াছে। গণদাবির নিকট নতি স্বীকার করিয়া দোর্দন্ড প্রতাপ সরকার তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করিয়া পূর্ব বাংলার অগ্নিসন্তান, দেশ গৌরব, আওয়ামী লীগ প্রধান-শেখ মুজিবুর রহমানসহ এই মামলায় অভিযুক্ত সকলকে কুর্মিটোলার সামরিক ছাউনির বন্দীনিবাস হইতে ... বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হইয়াছেন।[১৪]

দৈনিক আজাদ পত্রিকাতে পুরো প্রথম পাতাতে আট কলাম ব্যাপী খবরের শিরোনামে ছিল মুক্তমানব শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহৃত এসো সমিতির সাম্যে ও ঐ কো, এসো জনতার মুখরিত সখ্যে।[১৫] ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আগরতলার মামলা প্রত্যাহার ও আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের মুক্তি সম্পর্কে *দৈনিক ইত্তেফাক* যে সম্পাদকীয় লিখেছিলেন তাতে বাঙালীর বিজয়ের আদায়ের কথাই ব্যক্ত হয়েছিল:

> জয় নিপীড়িত জনগণের জয়, জয় নব উত্থান-আজ উৎসবের দিন নয়, বিজয়ের দিন। আজ আনন্দের দিন নয়, স্মরণের দিন। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। দুঃশাসনের কারাকক্ষ হইতে দেশের প্রিয় সন্তান শেখ মুজিব অন্যান্য বন্দীর সঙ্গে মুক্ত হইয়া আবার তার প্রিয় দেশবাসীর মাঝে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শহীদী ঈদে আমাদের অভিযান সফল হইয়াছে। গণ জাগরণের প্রবল প্লাবনের পলিমাটিতে রক্তাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। নূতন এক ঊষার স্বর্ণদুয়ার উন্মুক্ত করার অবিস্মরণীয় কাহিনী। এ কাহিনী অসংখ্য শহীদের অত্মদানের, অসংখ্য বীবমাতা ও বীরজায়ার অশ্রু ও হাহাকার সংবরণের কাহিনী।[১৬]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পাবার পর ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে গণ সম্বর্ধনা দেয়া হয়। এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভুষিত করা হয়।[১৭] দশ লক্ষাধিক বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিবুর রহমান যে আবেগ মন্ডিত ভাষণ দান করেন তা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জয়মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া বজ্র নির্ঘোষে তিনি ঘোষণা করেন যে, সংগ্রাম করিয়া আমি আবার কারাগারে যাইব, কিন্তু মানুষের প্রেম-ভালোবাসার ডালি মাথায় নিয়া দেশবাসীর সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করিতে পারিব না। বঞ্চিত বাঙালী, সিন্ধি, পাঞ্জাবী, পাঠান আর বেলুচের মধ্যে কোন তফাৎ নাই-কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণ হইতে দেশের উভয় অংশের জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ হইল আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসন ও অর্থনৈতিক আজাদী।[১৮]

১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানে পূর্ব বাংলার সংবাদপত্রগুলো সাংবাদিকতার মাধ্যমে বাঙালীর রাজনৈতিক জীবনে নতুন দিগদর্শন দিতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষত *দৈনিক আজাদ*, ও *দৈনিক ইত্তেফাক* যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে তা বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায়। সত্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সংবাদপত্র নিপীড়ণের অন্যতম প্রধান অস্ত্র ছিল ১৯৬০ সালে আইয়ুব সরকারের প্রণীত প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স। তা সত্ত্বেও পত্রিকাগুলো ভীত ছিল না। যদিও আইয়ুব সরকার *দৈনিক ইত্তেফাক* এর প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছিল- কিন্তু আন্দোলনের গতিধারা কি স্তিমিত হয়েছিল? অবশ্যই নয়। বরং ১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানে সাহসী সংবাদপত্রগুলো প্রমাণ করেছে-আপোষ নয় সংগ্রামই হলো গণ আন্দোলনের হৃদস্পন্দন।

সূত্রনির্দেশ

১। সংবাদ, ২১ জানুয়ারী ১৯৬৯
২। ঐ।
৩। *দৈনিক আজাদ*, ২২ জানুয়ারী, ১৯৬৯।
৪। ঐ।
৫। ঐ।
৬। *দৈনিক আজাদ*, ২৩ জানুয়ারী, ১৯৬৯।
৭। *দৈনিক আজাদ*, ২৩ জানুয়ারী, ১৯৬৯।
৮। *দৈনিক আজাদ*, ২৫ জানুয়ারী, ১৯৬৯।
৯। *দৈনিক আজাদ*, ২৯ জানুয়ারী, ১৯৬৯।
১০। এ ছাড়াও আওয়ামীলীগ দলকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ১৯৬৭ সালে বহিষ্কৃত সকল সদস্যদের ওপর আদেশ প্রত্যাহার করে নেয় এবং তাদের প্রতি পুনরায় দলে যোগদানের আহবান জানানো হয়।
১১। *মর্নিং নিউজ*, ১১ জানুয়ারী, ১৯৬৯।
১২। সুব্রত শংকর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ পৃ:৯০।
১৩। লেনিন আজাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮৬।
১৪। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।
১৫। *দৈনিক আজাদ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।
১৬। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।
১৭। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি তোফায়েল আহমেদের সভাপতিত্বে ঢাকার রেস কোর্স দশ লক্ষাধিক জনতার উপস্থিতিতে শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়।
১৮। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।

আঞ্চলিক ইতিহাসের নিরিখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

মালতীলতা বাড়ই

ভূমিকা - ১৯৪৭ এর ১৪ আগষ্ট। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে বিভক্ত হল ভারতবর্ষ। জন্ম হল ভারত পাকিস্তান নামক দুটি নতুন রাষ্ট্রের। কিন্তু একমাত্র ধর্ম ছাড়া রাষ্ট্রগঠনের আর কোন উপাদান পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র কাঠামোয় উপস্থিত ছিল না। এ প্রসঙ্গে শহীদ বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক আনোয়ার পাশা তাঁর ''রাইফেল রোটি আওরাত'' উপন্যাসে যে মন্তব্য করেন তা হল, ''একটা পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল বটে উনিশ শো সাতচল্লিশের চৌদ্দই আগষ্ট। সেটা পাকিস্তানের রাজনৈতিক সত্ত্বা, সেটা দেহ। রাষ্ট্রের প্রাণ হচ্ছে তার অর্থনীতি এবং তার চিন্ময় সত্ত্বার অভিব্যক্তি সাংস্কৃতিক বিকাশের মধ্যে। ঐখানেই ছিল গণ্ডগোল। হাজার মাইলের ব্যবধানে বিরাজিত দুটো অংশের মধ্যে একটা অর্থনীতি গড়ে উঠলে তাতে একটা অংশের দ্বারা শোষিত হবার সম্ভাবনা থাকবেই - অর্থনীতির ক্ষেত্রে একাংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে অন্য অংশের উপর। মুসলিমলীগ প্রাণপনে সেই অর্থনৈতিক প্রাধান্য দেশের পশ্চিমাংশে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল''।[১]

অর্থনৈতিক শোষণ ছাড়া সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও দুটি অংশ ছিল পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন। সুতরাং হাজার মাইলের ব্যবধানে বিরাজিত দুটি অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য সাধন ছিল অত্যন্ত জটিল এবং দুরূহ। কিন্তু পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বাস্তবতার নিরিখে তা বিচার না করে শুধুমাত্র ধর্মীয় ভাবাবেগে আপ্লুত হলেন। সাংস্কৃতিক ঐক্য সাধনে তারা প্রথমেই ভাষাব উপর তাদের আগ্রাসন চালালেন। পরিণামে শাসকগোষ্ঠীর কিছুটা হলেও বোধোদয় হল যে, পূর্ববাংলার অধিকাংশ জনগণ মুসলমান হলেও তারা মনে প্রাণে বাঙালী, বাংলা তাদের মাতৃভাষা। তাই মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে তারা প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে নাই।

সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম না হলেও পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে ইসলামী আদর্শ ও দ্বিজাতি তত্ত্বের দোহাই দিয়ে ফায়দা লোটার অপপ্রয়াস চালায়। বাঙালীরাও সেদিন শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই প্রতিরোধ করেনি; একে একে বাষট্টি, উনসত্তর এবং পরিশেষে একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ।[২]

যুদ্ধের কারণ—উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে গুলি চালিয়ে ছাত্র শিক্ষক ও সাধারণ মানুষকে দমন করতে ব্যর্থ হয়ে জেনারেল আইউব খান তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র

মামলা প্রত্যাহার করেন এবং আওয়ামীলীগ প্রধানসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন এবং সামরিক প্রধানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এ সময় প্রেসিডেন্ট পরিষদের সদস্য এয়ার ভাইস মার্শাল নূর খান বলেন, "পার্লামেন্টারী ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়াই সরকারের লক্ষ্য"। রাজনৈতিক দলের উপর বিধিনিষেধ শিথিল করা হয়। ২৬ আগষ্ট ১৯৬৯ বিচারপতি আবদুস সাত্তার ঘোষণা করেন যে, ৭০ এর শেষের দিকে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়। ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০ জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামীলীগ পায় ১৬৭টি এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামীলীগ পায় ২৮৮টি।[৩]

সাধারণ নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন এবং এক সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সরকার গঠনের আশ্বাস দেন। ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ ইয়াহিয়া করাচি ফিরে যান। ২৭ ফেব্রুয়ারী ভুট্টো ঢাকায় এসে শেখ মুজিবের সাথে আলোচনায় বসেন। উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ নিলেও আলোচনা সম্পর্কে কেউ মুখ খোলেনি। এতে স্পষ্টত প্রমাণিত, আলোচনায় কোন অগ্রগতি হয়নি। ১৩ ফেব্রুয়ারী এক সরকারী ঘোষণায় বলা হয়, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছেন। ২২ ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সকল প্রদেশের গভর্নর ও সামরিক প্রশাসকদের একদিনের সম্মেলনে ডাকেন। আলোচনায় কি হয়েছে তা প্রকাশ করা হয়নি। পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতির এই ইঙ্গিত সেদিন আর কেউ বুঝতে না পারলেও শেখ মুজিব সতর্ক হয়ে যান। চক্রান্তের গভীরতা সম্পর্কে তাঁর মনে আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না। ২৮ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানে ডেকে পাঠানো হল। তাঁকে আগাম জানিয়ে দেয়া হল, প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঐদিন শেখ মুজিব রাওয়ালপিন্ডিতে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। অবশ্য ২৭ ফেব্রুয়ারী থেকে ১ মার্চ ঢাকায় সৈন্য প্রেরণ অব্যাহত থাকে।[৪]

যুদ্ধের প্রস্তুতি—এদিকে বঙ্গবন্ধু বাংলার সকল ছাত্র নেতাদের ডেকে "ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" গঠনের নির্দেশ দেন এবং ২ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত অর্ধদিবস হরতাল পালনের নির্দেশ দেন। ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় এক ভাষণে তিনি বলেন "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম"। পরের দিন ৮ মার্চ জনগণ, বিশেষ করে বেতার কর্মীদের চাপের মুখে সরকার বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ বেতার টেলিভিশনে প্রচার করতে বাধ্য হন। ১০ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারী গ্রুপের নেতাদের এক বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান। বঙ্গবন্ধু এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "পশ্চিমাদের এ আমন্ত্রণ নিছক তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়" ১ মার্চ বঙ্গবন্ধু যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে দিয়েছিলেন ২৫ মার্চ ছিল তার ২৪তম দিন। ঐদিন দুপুরে ইয়াহিয়া ভুট্টো বৈঠকের পর ভুট্টো এক

সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "পরিস্থিতি সংকট জনক"। ঐদিন ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন।[৫]

যুদ্ধ শুরু—২৫মার্চ বাঙালীর ইতিহাসে "কালোরাত্রি" বলে চিহ্নিত। রাত সাড়ে এগারটা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাকিস্তানী সৈন্য ও ট্যাংক বহর বেরিয়ে এল এবং ফার্মগেটের ব্যারিকেড ভেঙ্গে তারা ছড়িয়ে পড়ল অপারেশন সার্চ লাইট অনুযায়ী ঢাকা শহরের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। ঘুমন্ত নগরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হানাদার বাহিনী। বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত ছাত্রকে হত্যা করল। নিহত হলেন ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা সহ অনেকে। ২৬মার্চ শেখ মুজিবকে বন্দী করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৭মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবের পক্ষে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র পাঠ করেন। ১০ এপ্রিল ৭১, স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠনের প্রস্তাব দেয়া হয়। ১৭এপ্রিল ৭১, শনিবার তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথ তলার ভবের পাড়ার আম বাগানে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিনকে প্রধান মন্ত্রী করে বিপ্লবী বাংলাদেশের সরকার গঠন করা হয়।

পাক বাহিনীর আক্রমণের মুখে বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য ছাত্র জনতা ভারতে যেতে শুরু করে। এপ্রিল মাস থেকে শুরু হয় সামরিক প্রশিক্ষণ। ১৪ এপ্রিল কলকাতায় ৮নং থিয়েটার রোডে মোঃ আতাউল গনি ওসমানী, এম, এন সহ চৌদ্দজন সামরিক অফিসারদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কর্নেল ওসমানীকে সামরিক প্রধান করা হয়।[৬] মুক্তিবাহিনীকে সংগঠিত করা এবং সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশকে এগারটি সেক্টরে ভাগ করা হয়। খুলনা ছিল ৯ নম্বর সেক্টরের অধীন। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন আবদুল জলিল।

তেরখাদার অবস্থান—বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চলের জেলাগুলোর মধ্যে খুলনা অন্যতম। বর্তমানে নয়টি উপজেলা নিয়ে খুলনা জেলা গঠিত। এর উত্তরের উপজেলা তেরখাদা। খুলনা শহর থেকে ২৪কিঃমিঃ দুরে অবস্থিত। ছয়টি ইউনিয়ন নিয়ে তেরখাদা উপজেলা গঠিত। ১। আজগড়া ২। বারাসাত ৩। ছাগলাদহ ৪। সাচিয়াদহ ৫। তেরখাদা ৬। মধুপুর। তেরখাদার পূর্বদিকে আঠারবাকী নদী বাগের হাট থেকে, উত্তরে চিত্রা ও নবগঙ্গা এবং পশ্চিমে আঁতাই নদী নড়াইল থেকে তেরখাদাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। প্রাকৃতিক বৈচিত্রের সাথে এখানকার মানুষের এক নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। স্বাধীনতার উত্তাল দিনগুলিতে তাই এ অঞ্চলের মানুষ ঘরে বসে থাকেনি। অস্ত্র হাতে বেরিয়ে পড়েছে। দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। ইতিহাস খুঁজলে এর প্রমাণ মিলবে।

তেরখাদার মুক্তি যুদ্ধের প্রস্তুতি—বঙ্গবন্ধু—সকল ছাত্র নেতাদের ডেকে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠনের নির্দেশ দেন তখন তেরখাদার ছাত্র নেতারা বিভিন্ন এলাকায় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে যোগাযোগ রেখে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে।[৭] এ সময় প্রাদেশিক পরিষদে খুলনা ৪ আসনে নির্বাচিত প্রতিনিধি ডাঃ মুনসুর আলী, ক্যাপ্টেন ফহম উদ্দিন এবং শিক্ষক বোরহান উদ্দিন স্থানীয় ছাত্র যুবকদের নিয়ে 'নর্থ খুলনা মুক্তি বাহিনী' নামে মুক্তিবাহিনীর একটা ক্ষুদ্র সংগঠন গড়ে তোলে। ডাঃ মুনসুর আলী খুলনার তৎকালীন এস, পি, মোঃ আবদুল রকীবের নিকট ৭০টি রাইফেল এবং প্রায় ৪০ হাজার গুলি তেরখাদা থানার ওসি নিরঞ্জণ সেনকে দেন। ওসি নিরঞ্জন সেন এবং পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের চাকুরীচ্যুত সৈনিক নুর মোহাম্মদ শিকদার কাটেঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিতেন। এসময় তেরখাদার মহিলারাও ঘরে বসে থাকেনি। যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে তারাও সক্রিয় ছিল। পুরুষদের সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ওসি নিরঞ্জন সেনের বাসায় মহিলাদের First Aid প্রশিক্ষণ দেয়া হত। দেশাত্মবোধক গান গেয়ে তাদের সংগ্রামী চেতনাকে জাগিয়ে তোলা হত। এবং তারা বিভিন্ন মিছিল মিটিংয়েও অংশ গ্রহণ করতেন। সময়টা ছিল ফেব্রুয়ারী মাস। ডাঃ মুনসুর আলীর সভাপতিত্বে ফ্রাটেংগা মাঠে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশ ঐ জনসভায় অতর্কিত আক্রমণ চালালে জনতা ছত্র ভঙ্গ হয়ে যায়। কিছু উগ্র জনতা পুলিশের উপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ডাক বাংলার পিছন দিয়ে বেরিয়ে আসে। ১৩৮ জনের হুলিয়া জারি হয়।[৮]

মুক্তি বাহিনীর প্রতিরোধ—বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভায়ণের পূর্বে তেরখাদার কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা জেলা আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগ নেতাদের সাথে মুসলিমলীগ নেতা সবুর খানের বাড়ি পুড়িয়ে দেয় এবং ৩/৪ টা বন্দুকের দোকান লুট করে। ২৩ মার্চ তেরখাদা ছাত্রলীগের নেতারা ডাঃ মুনসুর আলীকে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের অনুরোধ জানান। মুনসুর আলী শেখ মুজিবের নির্দেশ ব্যতীত পতাকা উত্তোলনে অস্বীকৃতি জানালে ছাত্র নেতারা কাটেঙ্গা মাঠে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ২৪ মার্চ ক্যাপ্টেন ফহম উদ্দিন, দাউদ আলী রতন, নূর মোহাম্মদ শিকদারের নেতৃত্বে থানা থেকে অস্ত্র লুট করে মুক্তি যোদ্ধাদের কাছে বিলি করা হয়। অবশ্য উপরিপর্যায়ের নেতাদের নির্দেশে সেই অস্ত্রগুলি পুনরায় থানায় জমা দেয়া হয়। এবার মুক্তি বাহিনীরা অস্ত্র সঙ্কটে পড়ে। তারা বিভিন্ন উপায়ে অস্ত্র সংগ্রহের কাজে লিপ্ত থাকেন। ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার পরে যে সমস্ত পুলিশ, ইপি, আর অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে এসেছিল মুক্তিবাহিনীরা জোর করে তাদের অস্ত্রগুলো কেড়ে নিয়েছিল। এ সময় তেরখাদার দশভাইয়া গ্রামের রবীন দাস ভারত থেকে একটা রিভলভার এনে ক্যাপ্টেন ফহম উদ্দিনকে দেয়। এই রিভলভারটিই মুক্তিবাহিনীদের কাজে গতি সঞ্চার করে।[৯]

২৬ মার্চ আকাশবাণীর খবর শোনার পর মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন সদস্য নেবুদিয়া গ্রামে গিয়ে ১৫/২০টি খেজুর গাছ কেটে চিত্রানদীতে ফেলে দিয়ে বেরিকেড সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। কিন্তু নদীর স্রোত এত বেশি ছিল যে, বেরিকেড সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই। ২৯ মার্চ তেরখাদা থেকে মুক্তিবাহিনীর দলটি লঞ্চযোগে খুলনা যায়। সেনের বাজার পৌঁছলে পাকসেনারা লঞ্চের উপর গুলি চালালে মুক্তিবাহিনীরাও পাল্টা গুলি চালায়। কিন্তু পাকসেনাদের প্রচন্ড চাপের মুখে মুক্তিবাহিনীরা টিকতে না পেরে পিছনদিকে চলে আসে। বিকাল ৩টায় লঞ্চটি তেরখাদা ফিরে আসে। এসময় স্বাধীনতা বিরোধীরা একটা খাদ্যের বার্জ লুট করছিল। মুক্তিবাহিনীরা তাদের হটিয়ে লঞ্চেব সাথে করে বার্জটি টেনে নিয়ে আসে। পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং পাকসেনাদের হাতে সর্বস্ব হারিয়ে যে সমস্ত শরণার্থী খুলনা থেকে তেরখাদা এসেছিল তাদের ত্রাণের কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল।[১০]

মুক্তিবাহিনীর শপথ—৫এপ্রিল ওসি নিরঞ্জন সেনের বাসায় মুক্তিবাহিনীর ক্ষুদ্র দলটি শপথ গ্রহন করে। শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ওসি নিরঞ্জন সেন, ফহম উদ্দিন, বোরহান উদ্দিন, নুর মোহাম্মদ শিকদার। শপথ গ্রহণের পর মুক্তিবাহিনীর দলটি তেরখাদা থেকে ১০ কিঃ মিঃ দুরে সাচিয়াদহ, পাতলা, মাটিয়ার কুল, কামারোল প্রভৃতি এলাকায় আত্মগোপন করে থাকে। এই এলাকার জনগণ মুক্তিবাহিনীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন।[১১]

রাজাকার বাহিনী গঠন ও তাদের কার্যকলাপ—দেশের প্রগতিশীল অংশ যে সময় দেশকে স্বাধীন করার সংকল্পে বদ্ধ পরিকর, ঠিক সেই সময় প্রতিক্রিয়াশীল চক্র মহান মুক্তিযুদ্ধকে নস্যাৎ করার জন্য পাকিস্তানীদের সাথে হাত মিলায়। ১২ এপ্রিল স্থানীয় খুলনা বেতার কেন্দ্র থেকে মুসলিমলীগ নেতা খান এ সবুরের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী এক বক্তৃতা প্রচারের পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে থাকে। শুরু হয় রাজাকার, আলবদর, শান্তিকমিটি গঠনের কাজ।[১২] মে মাসের প্রথম দিকে জামাত নেতা আবুল কালাম মোঃ ইউসুফের নেতৃত্বে খুলনা প্রথম রাজাকার বাহিনী গড়ে উঠে। তেরখাদা রাজাকার বাহিনীর সভাপতি ছিলেন আদিল মোল্লা এবং সেক্রেটারী ছিলেন মুহসিন মৌলভী। কমান্ডার ছিলেন রশীদ মোল্লা। রশীদ মোল্লা ৩০০ রাজাকার নিয়ে খুলনার ভূতের পল্লীতে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ চলে এক সপ্তাহ ধরে এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন খান পাঠান সেনারা। প্রশিক্ষণ শেষে রাজাকার বাহিনী কাটেঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাদের ক্যাম্প স্থাপন করেন।[১৩]

পাকসেনাদের অগ্নিসংযোগ ও লুট—রাজাকার বাহিনীর সেক্রেটারী মুহসিন মৌলভীর সহযোগিতায় ১৫ মে পাকসেনারা তেরখাদা ও তার আশেপাশের ৩/৪টি গ্রামে

অগ্নিসংযোগ করে। তারা হিন্দু এবং চিহ্নিত মুক্তিবাহিনীর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। এতে ৩০০ ঘর-বাড়ি ভস্মীভূত হয় এবং ৩ জন লোক গুলি বিদ্ধ হয়ে মারা যায়। তেরখাদা পোড়ানোর ৫ দিন পর অর্থাৎ ২০মে সকাল ১০টায় গোপালগঞ্জ থেকে পাকসেনাদের একটি দল সাচিয়াদহ গ্রাম পুড়িয়ে দেয় এবং সাধারণ লোককে দেখামাত্র গুলি করে। এতে ১৮ জন লোক নিহত হয়। ঐ সময়ে বাঞ্ছারাম নামে এক ব্যক্তি নিহত হয় এবং তার ১৪ বছরের ছেলে মুকুলকে পাকসেনারা ধরে নিয়ে যায়। পথিমধ্যে তারা মুকুলকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেয়। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সেদিন মুকুল বেঁচে যায়।[১৪]

মুক্তিবাহিনীর অপারেশন—এসকল ঘটনার অব্যবহিত পরে মুক্তিবাহিনী মনে করল যে, স্বাধীনতা বিরোধী দুষ্কৃতিকারীদের শেষ করতে না পারলে স্বাধীনতা অর্জন থাকুক দূরের কথা, সাধারণ মানুষকেও রক্ষা করা যাবে না। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অরবিন্দ, বারীণ প্রমুখ যেমন ব্রিটিশের উপর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ শুরু করেছিল, তেরখাদার মুক্তিবাহিনীও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করে। তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের প্রথম শিকার সোহরাব নামে একজন রাজাকার গোয়েন্দা। মুক্তিবাহিনীরা তাকে গুলি করে হত্যা করে। এ ঘটনার কিছুদিন পর সেই কুখ্যাত জমাত নেতা মুহসিন মৌলভীকে ক্যাপ্টেন ফহম উদ্দিন কমান্ডার দাউদ আলী রতন, এস, এম, মোস্তফা পাতলা নাচুনিয়া সড়কের উপর গুলি করে হত্যা করে দ্রুত পাতলা চলে আসেন। এ ভাবে তারা আরও কয়েকজন সমাজবিরোধী চোর ডাকাত গুন্ডাদের গুলি করে হত্যা করে।

মুক্তিবাহিনীর সম্মুখযুদ্ধ—৩ আগষ্ট মুক্তিবাহিনী সর্বপ্রথম রাজাকার বাহিনীর উপর তাদের আক্রমণ পরিচালনা করেন। ক্যাপ্টেন ফহম উদ্দিনের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর দলটি মাটিয়ারকুল হতে রওনা হয়ে পানতিতা বোর্ড স্কুলের মধ্যে দিয়ে ভোর ৪টায় রাজাকার ঘাঁটির উপর অতর্কিত আক্রমণ করে। এতে বেশ কিছু রাজাকার আহত হয়। ১২ আগষ্ট তারা কালিয়া যুদ্ধে অংশ নেন। এই যুদ্ধে আবু বকর নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

ছাত্রনেতা সরফরাজ নিহত—১৪আগষ্ট তেরখাদা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি মর্মান্তিক ঘটনার জন্ম দেয়। নর্থ খুলনায় কলেজের ছাত্রলীগ নেতা সরফরাজকে রাজাকাররা ধরে নিয়ে পাকসেনাদের হাতে দেয়। হানাদাররা তাকে দুইদিন জিম্মি করে রাখে। এসময়ে তারা সরফরাজকে বলে, 'বল, পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। উত্তরে সরফরাজ বলে, 'জয় বাংলা', কয়েকবার চেষ্টার পরও যখন সরফরাজ 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলেনি, তখন পাকসেনারা তাকে গুলি করে চিত্রানদীতে ফেলে দেয়। মুক্তিবাহিনীরা ভাসমান সরফরাজকে উদ্ধার করে বা ঐ সেনা গ্রামে নিয়ে যায়। এর দুদিন পর বাংলার এই অকুতোভয় বীর সন্তান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।[১৫]

তেরখাদার দ্বিতীয়যুদ্ধ—আগষ্টের শেষের দিকে পাতলা গ্রামে রাজবিহারী বসুর দালান বাড়িতে মুক্তিবাহিনীর স্থায়ী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয়। এসময় ভারত থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অনেক মুক্তিযোদ্ধারা পাতলা ক্যাম্পে যোগ দেয়। পাতলা গ্রামকে মুক্তিবাহিনীরা তাদের জন্য 'অভায়ারণ্য' মনে করত। এসময় মুক্তিবাহিনীর খাবারের ব্যবস্থা করতেন তৎকালীন সাচিয়াদহ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বাবু নলিনীরঞ্জন বিশ্বাস। ভারতে আশ্রিত শরণার্থীদের পরিত্যক্ত জমির ফসল দিয়ে মুক্তিবাহিনীর খাবারের ব্যবস্থা হত। প্রথম থেকেই মুক্তিবাহিনীর সকল আর্থিক ব্যয়-ভার বহন করতেন কাটেঙ্গা আওয়ামীলীগ নেতা এস, এম আবদুল্লাহ। ২৮ আগষ্ট মুক্তিবাহিনীর দলটি দ্বিতীয়বার পাক রাজাকার ঘাঁটি আক্রমণ করেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রফুল্ল ঢালী ক্রলিং করে রাজাকার ক্যাম্পের উপর গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায়। এই যুদ্ধে কিছু রাজাকার আহত হয় এবং দুজন মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে।

চরকুলিয়ার যুদ্ধ—৬ সেপ্টেম্বর মুক্তিবাহিনী চরকুলিয়া যুদ্ধে অংশ নেয়। চরকুলিয়ার ব্রীজের পাশে মুক্তিবাহিনী মাটি খুড়ে বাংকার করে লুকিয়ে থাকে। ঠিক সন্ধায় যখন মুয়াজ্জিন আযান দিচ্ছিলেন, সেই মুহূর্তে ক্যাপ্টেন সেলিম ৫০/৬০ জনের একটি দল নিয়ে ব্রীজ পার হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাংকার থেকে প্রফুল্ল ঢালী মেশিন গানে ব্রাশ ফায়ার করে। ক্যাপ্টেন সেলিমসহ সকলেই গুলিবিদ্ধ হয়ে ব্রীজের উপর মারা যায়। ১৯ নভেম্বর মুক্তিবাহিনী বড়দিয়া যুদ্ধে অংশ নেয়।[১৬]

আনন্দবাজার পত্রিকা সংবাদ—৬ অক্টোবর, ১৯৭১ ভারতের বহুল প্রচলিত আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে জানা গেল, খুলনা সেক্টরের বিভিন্ন যুদ্ধে গত দুমাসে ৫০০ খান সেনা নিহত এবং ২০০ রাজাকার নিহত হয়েছে। তাছাড়া ৬০০ পাক রাইফেল দখল করা হয়েছে এবং ৬০ জন রাজাকার মুক্তিবাহিনীতে যোগদিয়েছে।[১৭]

তেরখাদার শেষ যুদ্ধ—তেরখাদার মুক্তিবাহিনী তাদের সর্বশেষ যুদ্ধ পরিচালনা করেন ২ ডিসেম্বর। এখানে মুক্তিবাহিনীর দলটিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। একভাগ নুরুলহকের নেতৃত্বে হাড়িখালি নেবুদিয়া হয়ে রাজাকার ক্যাম্পের দক্ষিণ পাশে অবস্থান নেয়। অপরভাগ ক্যাপ্টেন ফহম উদ্দিনের নেতৃত্বে তেরখাদা হয়ে পূর্বদিক ঘিরে ফেলে। আর একভাগ আবদুল জলিলের নেতৃত্বে বারাসাত হয়ে পশ্চিমদিকে অবস্থান নেয়।[১৮] রাজাকার কমান্ডার আবদুর রশীদ মোল্লার কাছ থেকে জানা গেল, ঐসময় বিভিন্ন থানার মুক্তিবাহিনী এসে তেরখাদার মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগ দেয়। তাছাড়া ভারত থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অনেক মুক্তিবাহিনী এসে পাতলা ক্যাম্পে যোগ দেয়। এতে করে মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১০ হাজারের মত।[১৯] কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা এস, এম, মোস্তফার কাছ থেকে জানা গেল, পাতলা ক্যাম্পে মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা ছিল ৬০০ এর মত। যাই হোক, ধারণা করা

হয় যে, মুক্তিবাহিনীর একটা বড়দল এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।[২০] অপরদিকে রাজাকারের সংখ্যা ক্রমেই কমতে থাকে। তিন দিন ধরে যুদ্ধ চলে। উভয় পক্ষে প্রচন্ড গুলি বিনিময় হয়। অবস্থা খারাপ দেখে পাকসেনারা গানবোটে খুলনা পালিয়ে যায়। এ সময় রাজাকার ক্যাম্পে খাদ্য মজুত থাকলেও রান্না করার মত পরিস্থিতি ছিল না। রশীদ মোল্লা পাকবাহিনীর কাছে ওয়ারলেশ করেন, যাতে অনতিবিলম্বে তাদের কাছে সৈন্য পাঠানো হয়। কিন্তু পাকবাহিনী তার এ আবেদনে সাড়া দেয় নাই। তিনদিন অনাহারে থাকার পর রাজাকারদের আত্মীয় স্বজন ক্যাম্পের পিছন দিয়ে চোঙ বেয়ে ক্যাম্পে ঢুকে তাদের আত্মসমর্পণের কথা বলে। অবশেষে ৫ ডিসেম্বর রাজাকারবাহিনী শক্তিশালী মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।[২১]

খুলনা বিজয়—১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনী ঢাকায় মিত্রবাহিনীর প্রধান মিঃ জগজিৎসিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করলেও খুলনায় পাকবাহিনী মিত্রবাহিনীর প্রধান দলবৎ সিংয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে নাই।[২২] সুতরাং ১৬ ডিসেম্বর খুলনায় মেজর জয়নুল আবেদীনের নেতৃত্বে তেরখাদার মুক্তিবাহিনী খুলনা আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। ক্যাপ্টেন ফহম উদ্দিন তার বাহিনী নিয়ে সেনহাটি হয়ে গোয়ালপাড়ার দিকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন। অন্যদিকে বোরহান উদ্দিনের নেতৃত্বে আর একটি দল চন্দনী মহল থেকে শৈলপুর, রাজাপুর হয়ে নেভাল বেস জেটি এবং হাসপাতাল রোডে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেন।[২৩] অবশ্য এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বেই ১৭ ডিসেম্বর পাকবাহিনী সম্মিলিত মিত্রবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ঐদিন খুলনা শত্রুমুক্ত হয়ে সার্কিট হাউস ময়দানে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলিত হয়।[২৪]

উপসংহার—কোন আন্দোলন বা সংগ্রাম একদিনে বা একটি মাত্র কারণে সংঘটিত হয় না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধও তাই কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। মুক্তিযুদ্ধ হল, দীর্ঘ ২৪ বছরের পাকিস্তানী উপনিবেশিক শোষণ আর নির্যাতনের বহিঃপ্রকাশ। এই যুদ্ধের ফলে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বুঝতে পারল যে, শুধুমাত্র সামরিক শক্তির দ্বারা জনশক্তিকে পর্যুদস্ত করা যায় না। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ এই যুদ্ধে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল। এই অর্থে এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধও বলা হয়।

সূত্রনির্দেশ

১।	আমিনুর রহমান সুলতান	বাংলাদেশে কবিতা ও উপন্যাস মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।	পৃষ্ঠা নং ১৩২-৩৩
২।	ঐ	ঐ	ঐ

৩।	প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহম্মদ মোনায়েম সরকার ডঃ নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত	বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১) ঢাকা, আগামী প্রকাশনী	পৃষ্ঠা নং ১৭৭
৪।	ঐ	ঐ	পৃষ্ঠা নং ১৯৭
৫।	ঐ	ঐ	পৃষ্ঠা নং ২৩৫
৬।	ঐ	ঐ	পৃষ্ঠা নং ২৪৪

সাক্ষাৎকার ঃ

	নাম	ঠিকানা	তারিখ
৭।	মুনসুর আহমদ	শিক্ষক ও মুক্তিযোদ্ধা তেরখাদা, খুলনা।	০৪-০৪-০৩
৮।	বোরহান উদ্দিন মোল্লা	শিক্ষক ও মুক্তিযোদ্ধা তেরখাদা, খুলনা।	০৩-০৩-০৩
৯।	দাউদ আলী রতন	মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তেরখাদা, খুলনা।	০৪-০৪-০৩
১০।	সর্দার আমীর আলী	শিক্ষক ও মুক্তিযোদ্ধা তেরখাদা, খুলনা।	১১-০৪-০৩
১১।	সুকুমার সাহা	সরকারী কর্মকর্তা ও মুক্তিযোদ্ধা তেরখাদা, খুলনা।	২৫-০৪-০৩
১২।	আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত	মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস (২য়খন্ড, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা)	পৃষ্ঠা নং ২০৬
১৩।	আবদুর রশীদ মোল্লা	রাজাকার কমান্ডার, তেরখাদা, খুলনা।	১৫-০৩-০৩
১৪।	হুমায়ুন কবীর	শিক্ষক ও মুক্তিযোদ্ধা তেরখাদা, খুলনা।	১৫-০৪-০৩
১৫।	এস, এম, মোস্তফা	ব্যাংক কর্মকর্তা ও মুক্তিযোদ্ধা তেরখাদা, খুলনা।	২৪-০৪-০৩
১৬।	স, ম, বাবর আলী	স্বাধীনতার দুর্জয় অভিযান খুলনা, ১৯৯০। ডরোথিরানা প্রকাশনী	পৃষ্ঠা নং ৬১-৬

১৭। আনন্দবাজার পত্রিকা	কলকাতা, ৬ অক্টোবর, ১৯৭১।	
১৮। বোরহান উদ্দিন মোল্লা	সাক্ষাৎকার।	
১৯। আবদুর রশীদ মোল্লা	সাক্ষাৎকার।	
২০। এস, এম, মোস্তফা	সাক্ষাৎকার।	
২১। আবদুর রশীদ মোল্লা	সাক্ষাৎকার।	
২২। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র (নবম খন্ড) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রনালয়	পৃষ্ঠা নং ৪৪১-৪২
২৩। বোরহান উদ্দিন মোল্লা	সাক্ষাৎকার।	
২৪। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র (১০ম খন্ড) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়	পৃষ্ঠা নং ৫৯৯-৬০০

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন ঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

খবীর উদ্দিন আহমেদ

ভূমিকা

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সাথে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। ১৯৪৭ সালের ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশ শাসনের পরিসমাপ্তিতে পাকিস্তানের জন্ম এবং তার আইনানুগ প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এ সময়কাল বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানের শাসনকাল ও ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও সংবিধানকে কার্যকরতা প্রদানের ঘটনাবলী বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নের দুটি ধারাবাহিক পর্যায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পটভূমি

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। স্বাধীনতার পূর্বে তা পাকিস্তানের একটি প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তান ছিল। ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে[১] পাকিস্তান ও ভারত নামের পৃথক দুটি রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পূর্বে ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন[২] দ্বারা তার শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হতো। ঐ আইনের অধীনে নির্বাচিত প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কনস্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেমব্লি ভারত ও পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করেছিল। স্বাধীনতার খুব কম সময়ে ভারতের সংবিধান প্রণীত হয়। ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাস থেকে তা কার্যকর হয়।[৩] কিন্তু পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন বিলম্বিত হয়।[৪] ১৯৫৬ সালের ৯ জানুয়ারী কনস্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেমব্লিতে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের বিল উত্থাপিত হয়। বিলটি ঐ বছরের ২৯ জানুয়ারী গৃহীত এবং ২৩ মার্চ কার্যকর হয়।[৫] এ সংবিধানের আওতায় পাকিস্তানের কেন্দ্র ও প্রদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী হয়।[৬] ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বরখাস্ত হয়। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বাতিল হয়। সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত হয়। পাকিস্তানের তৎকালীন

প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তান সেনা বাহিনী প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আইউব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন এবং তাঁর অধীনে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীসমূহ ন্যস্ত করেন।[৭] কিন্তু অক্টোবরের শেষে এক অভ্যুত্থানে জেনারেল মোহাম্মদ আইউব খান প্রেসিডেন্টের পদ থেকে ইস্কান্দার মীর্জাকে অপসারণ করে নিজেই সে পদ গ্রহণ করেন। একই সাথে তিনি রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান হন। তিনি সংবিধানের অনুপস্থিতি দূর করার জন্য সংবিধান কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনৈতিক অস্থিরতা বিদ্যমান থাকায় ভবিষ্যত সংবিধান বিষয়ে তিনি আগাম মতামত রেখেছিলেন যার আলোকে কমিশন রিপোর্ট পেশ করে। সে অনুযায়ী ১৯৬২ সালের ১ মার্চ পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন ও ৭ জুন বলবৎ করা হয়।[৮] সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে পাকিস্তানে প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এ সংবিধানের অধীনে দুটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দু'বারই আইউব খান রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর দাবী দাওয়া আদায়ের দৃঢ়তা আইউব খানের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্ষোভ ছড়াতে থাকে। এক পর্যায়ে তা গণ আন্দোলনে রূপ নেয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্যের ভিত্তিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভিতরের বৈষম্য দূরকরাসহ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে। এর তীব্রতায় ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় আইউব খান পদত্যাগ করে সেনা বাহিনী প্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের নিকট সকল ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। দেশে সে সময় বেসামরিক প্রশাসন[৯] অকার্যকর থাকায় ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারী করেন। তিনি প্রধান সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত হন এবং সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়কের ক্ষমতা গ্রহণ করেন।[১০] একই সময় তিনি প্রেসিডেন্টের পদেও সমাসীন হন।[১১] তিনি ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ থেকে কার্যকরতা দিয়ে পাকিস্তানে দি প্রোভিশনাল কনস্টিটিউশন অর্ডার ঘোষণা করেন।[১২] তিনি পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দি লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক অর্ডার ১৯৭০ প্রণয়ন ও জারী করেন।[১৩] এর মাধ্যমে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নসহ নির্বাচনের বিভিন্ন দিক উপস্থাপিত হয়। এ আদেশের অধীনে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকায় ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারী নির্বাচন হয়। নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান দল আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করে। দলটি পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৩১৩ আসনের পূর্ব পাকিস্তানের সংরক্ষিত ১৬৯ আসনের ১৬৭ এবং প্রাদেশিক পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানের ৩০০ আসনের ২৮৮ আসনে বিজয়ী হয়।[১৪] নির্বাচনের পর সংসদের অধিবেশন আহ্বান প্রশ্নে ইয়াহিয়া খান গড়িমসি শুরু করেন। তবুও তিনি ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু তা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হয়। তাতে পূর্ব পাকিস্তান প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। গণ বিক্ষোভের মুখে ইয়াহিয়া খান

২৫ মার্চ পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করেন। রাজনৈতিক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে তিনি ঢাকায় আসেন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা শুরু করেন। বিভিন্ন দল রাজনৈতিক মীমাংসার বিষয়ে নীতিগত ভাবে সমঝোতায় উপনীত হয়। পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নসহ রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন দিক তাতে স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়। কিন্তু ঐগুলি বাস্তবায়নের পূর্বেই তিনি আকস্মিকভাবে ২৫ মার্চ ঢাকা ত্যাগ করেন। আর তাঁর ঢাকা ত্যাগের পর পরই পূর্ব পাকিস্তানে নিরস্ত্র জনগণের উপর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।[১৫] রাতের আঁধারে শুরু হয় গণহত্যা, ধর্ষণ, ধরপাকড়। শেখ মুজিবুর রহমানকেও ঐ রাতে আটক করা হয়। এ অবস্থায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়।

বাংলাদেশের বিজয় অর্জন ও সংবিধান প্রণয়ন

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার পর বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন বিজয় অর্জনের মত জরুরী হয়ে পড়ে। ফলে ১৯৭০ ও ১৯৭১ সালের পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের বিজয়ী প্রতিনিধিগণ ভারতের কলিকাতায় মিলিত হন এবং পরবর্তী কর্মসূচী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেমতে ঐ বিজয়ী প্রতিনিধি সমন্বয়ে বাংলাদেশে গণপরিষদ গঠিত হয় এবং ঐ গণপরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র[১৬] জারী করা হয়।[১৭] স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ইহা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রদানসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ ও বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ভিত হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখে।[১৮]

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথ তলা আম্রকাননে (বর্তমান মেহেরপুরের মুজিব নগর) বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে পাঠ করে সকলকে শোনান হয়।[১৯] ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত সর্ব প্রথম বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সর্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। বাংলাদেশ ও ভারতের সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এক যৌথ কমান্ড গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান ঢাকায় আত্মসমর্পণ করেন।[২০] বাংলাদেশের বিজয় অর্জিত হয়।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকায় আসেন এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ১১ এপ্রিল দি প্রোভিশনাল কনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ অর্ডার ১৯৭২ তথা ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সাময়িক সংবিধান আদেশ প্রণয়ন ও জারী করেন।[২১] এ আদেশে

১৯৭০ ও ১৯৭১ সালের নির্বাচনে বিজয়ী প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত গণপরিষদকে স্বীকৃতি প্রদান করার পর ঐ পরিষদকে কার্যকর করার লক্ষ্যে তিনি দি কনস্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেমব্লি অব বাংলাদেশ অর্ডার ১৯৭২ তথা ১৯৭২ সালের গণপরিষদ আদেশ প্রণয়ন ও জারী করেন।[২২] এতেও গণপরিষদের গঠন ঠিক রাখা হয়। তবে শূন্য আসন পূরণের ব্যবস্থা দেয়া হয়। এ পরিষদের উপর বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পিত হয়।

১৯৭২ সালের ১০ ও ১১ এপ্রিল সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ গণপরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গণপরিষদের প্রস্তাবক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন ও রিপোর্টসহ তা গণপরিষদে পেশ করার উদ্দেশ্যে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়।

১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিল কমিটির ১ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এপ্রিল ও মে মাসে অনুষ্ঠিত কমিটির বিভিন্ন সভায় একটি খসড়া সংবিধান প্রণীত হয় যা ২৫ মের সভায় পূর্ণাঙ্গ খসড়ায় পরিণত হয়। টেকনিক্যাল ড্রাফট্সম্যান ও বাংলা ভাষার পণ্ডিতগণের অনুমোদনের পর তা কমিটির বিভিন্ন সভায় ব্যাপক আলোচনার পর চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর রিপোর্টসহ বিল আকারে তা গণপরিষদে পেশ করা হয়।[২৩] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান নামে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর তা গৃহীত,[২৪] ১৪ ডিসেম্বর স্পীকার কর্তৃক প্রমাণীকৃত[২৫] ও ১৬ ডিসেম্বর কার্যকর হয়।[২৬] সংবিধান কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে গণপরিষদ বিলুপ্ত হয়।

সংবিধান প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সার্বিক ব্যবস্থায় সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়েছে। এ সংবিধান বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন। সংসদের আইন দ্বারা তা সংশোধনযোগ্য। ইতিমধ্যে ১৩ বার সংশোধিত হয়েছে।

উপসংহার

সব দেশের প্রধান আইনের মত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানও বাংলাদেশের প্রধান ও সর্বোচ্চ আইন। দি লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক অর্ডার ১৯৭০ এর বিধানে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নসহ আনুষঙ্গিক প্রয়োজনে পাকিস্তানে ১৯৭০ ও ১৯৭১ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে পাকিস্তানের জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানের আসনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু আহবানকৃত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন উদ্দেশ্যমূলকভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণাসহ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ ও নিরস্ত্র জনগণের উপর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী অতর্কিত হামলা, হত্যা, ধর্ষণ, ধরাপাকড়, ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের জন্য নির্বাচিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণ ঐ অবস্থায় নিজেদের সমন্বয়ে গণপরিষদ

গঠন করেন এবং তাদের দেয়া ক্ষমতা বলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করা হয়। তারা বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করেন। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে। দি কনস্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেমব্লি অব বাংলাদেশ অর্ডার ১৯৭২ এর অধীনে নির্বাচিত ঐ প্রতিনিধিগণ কর্তৃক বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়।

সূত্রনির্দেশ

১। *দি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্টস এ্যাক্ট*, ১৯৪৭।

২। *দি গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট*, ১৯৩৫।

৩। কনস্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্‌ব্লিতে *দি কনস্টিটিউশন অব ইন্ডিয়া* ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গৃহীত ও প্রণীত।

৪। মাহমুদুল ইসলাম, *কনস্টিটিউশনাল ল অব বাংলাদেশ*, (ঢাকা, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ল এ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স, ১৯৯৫), পৃঃ ৪৫।

৫। *দি কনস্টিটিউশন অব দি ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান*।

৬। *প্রোক্লেমেশন* তারিখ ৭/১০/১৯৫৮, ১০ পি এল ডি (১৯৫৮), (সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিকস) , পৃঃ ৫৭৭।

৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭৯।

৮। *দি কন্‌স্টিটিউশন অব পাকিস্তান*, ১৯৬২।

৯। সিভিল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

১০। *প্রোক্লেমেশন অব মার্শাল ল রাওয়ালপিন্ডি*, ২৫ মার্চ ১৯৬৯, ঢাকা গেজেট, এক্সট্রা তারিখ ১৫/৪/১৯৬৯স ২১ ডি.এল আর (১৯৬৯), (সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিকস), পৃঃ ৬৫।

১১। *প্রোক্লেমেশন, রাওয়ালপিন্ডি*, ৩১ মার্চ ১৯৬৯, ঢাকা গেজেট, এক্সট্রা, তারিখ ১৭/৪/১৯৬৯, ২১ ডি এল আর (১৯৬৯), (সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিকস), পৃঃ ৭৪।

১২। *দি প্রোভিশনাল কনস্টিটিউশন অর্ডার*, রাওয়ালপিন্ডি, ১৪ এপ্রিল ১৯৬৯, ঢাকা গেজেট, এক্সট্রা, তারিখ ১৭/৪/১৯৬৯, ২১ ডি এল আর (১৯৬৯), (সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিকস), পৃঃ ৭৪।

১৩। *প্রেসিডেন্টস অর্ডার নং* - ২, ১৯৭০, ২২ ডি এল আর (১৯৭০), (সেন্ট্রাল স্ট্যাটিউট্স), পৃঃ ১৫৮, ঢাকা গেজেট এক্সট্রা, তারিখ ২৮/৫/১৯৭০।

১৪। খালেদা হাবীব, *বাংলাদেশ নির্বাচন, জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রী সভা ১৯৭০-৯১*, (ঢাকা, এ আর মুরশেদ), পৃঃ ৪২।

১৫। মাহমুদুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২। আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, (রংপুর, টাউন স্টোর্স, ১৯৯৫), পৃঃ ৯৮-১০১।

১৬. *দি প্রোক্লেমেশন অব ইন্ডিপেন্ডেন্স*, জারীর তারিখ ১০ এপ্রিল ১৯৭০, ২২ ডি এল আর (স্ট্যাটিউট্স), (১৯৭১-৭২), পৃঃ ১-২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (ঢাকা, বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়), পৃঃ ১৮২-১৮৫।

১৭. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০২।

১৮. এ, কে এম, ফজলুল হক বনাম রাষ্ট্র ২৬ ডি এল আর (১৯৭৪) (এসসি), পৃঃ ১১-১৪।

১৯. আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, ১০৬।

২০. *লে. জে. জে এফ আর জ্যাকব, সারেন্ডার এ্যাট ঢাকা ঃ বার্থ অব এ নেশন*, (ঢাকা, দি ইউনিভারসিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯৭), এ্যাপেন্ডিক্স-২, পৃঃ ১৭৬।

২১. দি প্রভিশনাল কনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ অর্ডার ১৯৭২, *বাংলাদেশ গেজেট এক্সট্রা*, ১১ জানুয়ারী ১৯৭২ ঃ ২৪ ডি এল আর (১৯৭২), (স্ট্যাটিউট্স), পৃঃ ২৪।

২২. ১৯৭২ সালের পিও নং-২২ ঃ ২৪ *ডি এল আর* (১৯৭২), (স্ট্যাটিউট্স), পৃঃ ৪৮-৫২।

২৩. খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট, *বাংলাদেশ গেজেট*, অতিরিক্ত সংখ্যা, ৪র্থ খন্ড (১২ অক্টোবর ১৯৭২), পৃঃ ২৪৭১-২৫৭৪।

২৪. *গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, প্রস্তাবনা।

২৫. *বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা*, ১ম খন্ড, (১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭২), পৃঃ ৩৩৯৫-৩৪৭৬।

২৬. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১৫৩ (১)।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক ঃ জাতিসংঘের ভূমিকা, ১৯৭১-৮১

আবু মো. দেলোয়ার হোসেন

১৯৭১-৮১ সময়কালে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সম্পর্ক শুধু দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এ সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্ব সংস্থা জাতিসংঘও বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। যদিও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের অমীমাংসিত ইসুকে কেন্দ্র করে জাতিসংঘ একটি জটিল সমস্যায় পড়ে যায়। দুটি দেশই পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন এবং সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা করে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ শরণার্থী সমস্যা সমাধান এবং বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা হ্রাসে তেমন ভূমিকা রাখলেও স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনসহ পাকিস্তানের সাথে অমীমাংসিত বিষয়ের নিষ্পত্তিতে জাতিসংঘ সীমিত অবদান রাখে।

মুক্তিযুদ্ধ ও জাতিসংঘ ঃ

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই জাতিসংঘের মহাসচিব বাংলাদেশ সমস্যাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সংকট হিসেবে অভিহিত করেন। শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খানের একাত্তরের জুন মাসে এবং সহকারী মহাসচিব ইসমত কিত্তানি'র জুলাই মাসে শত্রু অধ্যুষিত বাংলাদেশ ও ভারত সফরের পর বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের সুপারিশ করেন। যদিও নভেম্বর মাসে এ বিষয় মহাসচিব কিছুটা উদ্যোগী হন। পরের মাসেই পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধ বিরতিই জাতিসংঘের প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় যা বাংলাদেশ, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কাম্য ছিল না। ১৯৭১ সালের ৪-১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদে চলতে থাকে বৃহৎ শক্তিবর্গের যুদ্ধ বিরতি প্রশ্নে পক্ষ-বিপক্ষ বিতর্ক এবং ভেটো পাল্টা-ভেটো নাটক। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনী যখন বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে তখনও জাতিসংঘ বিতর্ক চলছে। অথচ বাংলাদেশ প্রশ্নে জাতিসংঘ কোনো সমাধানে পৌছাতে পারেনি। অবশ্য ভারত যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হওয়ার পরই ২১ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়।[১]

অতএব মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসে জাতিসংঘের ভূমিকা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশ সমস্যা তেমন গুরুত্ব পায়নি। বাংলাদেশের শরণার্থীদের নিয়ে জাতিসংঘের সমস্ত কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকায় বাঙালির স্বাধীনতা গৌণ ব্যাপারে পরিণত হয়। একাত্তরের বাংলাদেশ সংকটে জাতিসংঘ বাস্তবসম্মত কোনো সমাধান দিতে ব্যর্থ হয় এবং বাংলাদেশ নিজের পথে এগিয়ে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। তবে শরণার্থীদের সাহায্য এবং হানাদার বাহিনী অধ্যুষিত বাংলাদেশে সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ রোধে জাতিসংঘের অনন্য ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। শুধু ১৯৭১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাতিসংঘ শরণার্থীদের জন্য ১১১ মিলিয়ন ডলার (৮২.৫ কোটি রুপি) সাহায্য দেয়।[২]

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক ঃ জাতিসংঘের ভূমিকা, ১৯৭১-৭৫ ঃ

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা প্রধানত অমীমাংসিত ইসু কেন্দ্রিক ছিল। তবে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে বিশেষ করে জাতিসংঘের ঢাকাস্থ রিলিফ কার্যক্রমের আওতায় (UNROD) পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির জরিপ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারটিকে প্রতিষ্ঠা করে। বাংলাদেশে যুদ্ধের সময়কার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যকার অমীমাংসিত বিষয়াদি নিয়ে জাতিসংঘকে বেশি তৎপর থাকতে হয়। বিশেষ করে আটক পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি, বাংলাদেশে আটকেপড়া পাকিস্তানি ও পাকিস্তানে বন্দি বাঙালি ইসুতে জাতিসংঘের সহযোগিতা উভয় পক্ষই প্রত্যাশা করে। যদিও এক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা কেবল অনুরোধ, প্রতিনিধি প্রেরণ ও বিবৃতির সীমিত ছিল। তবে এটাও ঠিক যে, এরকম ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ক্ষমতাও সীমিত। যে কারণে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সকল শর্ত পূরণ করেও পাকিস্তান চীনের সহযোগিতায় বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভে বার বার বাধার সৃষ্টি করে।

পাকিস্তান অবশ্য অমীমাংসিত বিষয়গুলোর মধ্যে স্বভাবতই পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের মুক্তির উপরই বেশি জোর দেয়। যুদ্ধবন্দির বিচারে বাংলাদেশ সরকারের দৃঢ় প্রত্যয় পাকিস্তানকে ভাবিয়ে তোলে এবং প্রথম থেকেই যুদ্ধবন্দিদের মুক্তিতে জাতিসংঘের সহযোগিতার প্রত্যাশী হয়। একাত্তরের ২৪ ও ২৮ ডিসেম্বরই নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির কাছে দেয়া এক পত্রে পাকিস্তান ভারতীয় বাহিনী ও বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের 'পূর্ব পাকিস্তানে' পাকিস্তানিদের ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের প্রেক্ষিতে তাঁর হস্তক্ষেপ কামনা করে।[৩] জাতিসংঘের মহাসচিবকে দেয়া পত্রে পাকিস্তান বাংলাদেশ কর্তৃক পাক যুদ্ধবন্দিদের বিচারের উদ্যোগকে ১৯৪৯ সালের ২১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধী

আখ্যায়িত করে বিচার বন্ধে তার সহযোগিতা চান।[৪] ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ ঢাকার মিরপুরে বিহারি ক্যাম্পে পুলিশের সঙ্গে বিহারিদের সশস্ত্র সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি সংস্থাটির মহাসচিবকে দেয়া এক পত্রে ঢাকাসহ বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে অবাঙালি নির্যাতন বন্ধ এবং যুদ্ধবন্দিদের মুক্তির ব্যাপারে তাঁর সহযোগিতাও কামনা করেন।[৫] পাকিস্তানের প্রতিনিধির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের মহাসচিবের দূত হিসেবে ডেপুটি হাই কমিশনার ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রথমে ইসলামাবাদ ও পরে ঢাকা আসেন। মিরপুর ও মোহাম্মদপুরের বিহারি ক্যাম্প পরিদর্শন করে বিহারিদের খাদ্য সংকট, ক্ষুধায় মৃত্যু এবং তাদের ওপর সন্ত্রাসের খবরকে তিনি সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেন।[৬] তাঁর এই সফরের বড় সাফল্য এই যে, এর পর পরই ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধাহত ও অসুস্থ বন্দিদের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ফেরত দেয়ার যুগপৎ ঘোষণা দেয়।[৭]

অগ্রগতির এপর্যায়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মহাসচিবকে দেয়া এক পত্রে তাঁর প্রতিনিধিকে সরেজমিনে বাংলাদেশ সফর এবং পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের নিরাপত্তা বিধানে তার ভূমিকা রাখার আহবান জানান।[৮] তবে মার্চ মাসের প্রথম দিকে ভারতের বন্দি শিবিরে ১২ জন পাক যুদ্ধবন্দির প্রাণহানির প্রেক্ষিতে ১২ মার্চ পাকিস্তানের প্রতিনিধি মহাসচিবকে দেয়া এক পত্রে এ ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একই সাথে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধবন্দিদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার এবং অসুস্থ ও আহত বন্দিদের বিনিময়ের ব্যাপারে পূর্ব সমঝোতার বরখেলাপের অভিযোগ আনেন।[৯] একই মাসের ২৮ তারিখে পাকিস্তান সরকারকে দেয়া অপর পত্রে ভারতীয় বন্দি শিবিরে গুলিবর্ষণের তদন্তের জন্য একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠনের আহবান জানানো হয়।[১০] পাকিস্তানের এই তৎপরতায় যথেষ্ট কাজ হয় এবং সে যাত্রা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে পাকিস্তান সহানুভূতি লাভ করে। অনেক দেশ যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি দিতে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের শরণার্থী কমিশনার সদরুদ্দিন আগা খান ১ এপ্রিল ঢাকা সফর করেন। তাঁর সফরের পরে ৫ এপ্রিল পাকিস্তান নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির কাছে দেয়া এক পত্রে ভারত কর্তৃক পাক যুদ্ধবন্দিদের বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর বন্ধ ও বাংলাদেশের সঙ্গে অমীমাংসিত বিষয়গুলোর মীমাংসায় তাঁর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।[১১] মূলত সদরুদ্দিনের সফর শেষে বিহারি প্রত্যাবাসনে পাকিস্তানের ওপর চাপ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান এসময় অত্যধিক তৎপর হয়ে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় মে মাসের শেষদিকে পাকিস্তানের নতুন স্থায়ী প্রতিনিধি আই ই. আকন্দ ভারতের বিরুদ্ধে জেনেভা কনভেনশনের বরখেলাপ করে বন্দিদের ওপব নির্যাতন ও হত্যার অভিযোগ আনেন।[১২] অবশ্য জুন মাসে সিমলা বৈঠকের কারণে এ মাসের প্রথম

থেকে পাকিস্তান এই অপপ্রচার সাময়িকভাবে বন্ধ রাখে। অন্যদিকে জাতিসংঘও পাক-ভারত বৈঠকের মাধ্যমে উপমহাদেশে দ্বিপাক্ষিক শান্তি স্থাপনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে। সিমলা চুক্তির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে মহাসচিব ড. কুর্ট ওয়াল্ডহেইম চুক্তিকে উপমহাদেশের শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তবে ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির আবেদন পাকিস্তান ও তার মিত্রদের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়।

মূলত ১০ আগস্ট বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদে সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করলে প্রথম থেকেই পাকিস্তান এর বিরোধিতা করে। ২০ আগস্ট পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিকে জানিয়ে দেন যেহেতু বাংলাদেশ পাক যুদ্ধবন্দি ও পাকিস্তানপন্থীদের আটক রেখেছে তাই সদস্য হওয়ার পূর্বশর্ত বাংলাদেশ পূরণ করে না।[১৩] যদিও নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনের পূর্বে পাকিস্তানের এই ষড়যন্ত্র ও তৎপরতার বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশ প্রতিবাদ জানায় এবং ২৩ আগস্ট ওয়াশিংটনে বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ বাংলাদেশ-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক কোনো বিষয়ের উপর নির্ভর করে না বলে সদস্যপদ লাভের পূর্বশর্তও হতে পারে না।[১৪] ২৫ আগস্ট বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে উঠলে ১৫ সদস্যের মধ্যে ১১ জন বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন দিলেও চীনের ভেটোর কারণে তা নাকচ হয়ে যায়।[১৫] জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি-এর প্রতিবাদ জানান এবং একে সিমলা চুক্তিতে বর্ণিত জাতিসংঘের সনদের শর্তের বরখেলাপ বলে মন্তব্য করেন।[১৬] এভাবে পাক-চীন ষড়যন্ত্রের ফলে সকল শর্তপূরণ ও ব্যাপক সমর্থন সত্ত্বেও সে যাত্রা বাংলাদেশ সদস্য হতে পারেনি এবং বিষয়টি সাধারণ পরিষদে প্রেরিত হয়।

জাতিসংঘে চীন ও পাকিস্তান বাংলাদেশ-বিরোধী তৎপরতার পাশাপাশি পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের ওপর নির্যাতনের মাত্রাও এ সময়ে বাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশ স্বভাবতই এর জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘের শরণার্থী কমিশনকে আটক বাঙালিদের নিরাপদে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে সহযোগিতার অনুরোধ জানান।[১৭] ১৪ অক্টোবর একই আহবান জানিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মহাসচিবকে পত্র দেন।[১৮] বাংলাদেশ সরকারের এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মহাসচিব পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের অবস্থার পর্যবেক্ষণ এবং তাদের প্রত্যাবাসন সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাঁর বিশেষ দূত আন্ডার সেক্রেটারি রবার্ট জ্যাকসনকে ২৫ অক্টোবর পাকিস্তানে পাঠান। সফরের সাফল্য হিসেবে নভেম্বর মাসের ১৩ তারিখে ২২০ জন বাঙালির প্রথম দলটি দেশে এসে পৌঁছায়। এছাড়া ২১ নভেম্বর ভুট্টো তাঁর এক বক্তৃতায় ১০,০০০ জন বাঙালি মহিলা ও শিশুর মুক্তির ঘোষণা দেন।[১৯]

তবে জাতিসংঘের সদস্যভুক্তি সম্পর্কিত ব্যাপারে পাকিস্তানের বিরোধিতা সত্ত্বেও অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বেশকিছু অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৭ অক্টোবর স্থায়ী পর্যবেক্ষক হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘে আসন লাভ করে। এছাড়া ঐ দিনই প্যারিসে জাতিসংঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা ইউনেস্কোর ১৭তম সাধারণ সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বাংলাদেশের উল্লিখিত সংস্থায় সদস্যভুক্তির ব্যাপারে পাকিস্তানের নেতৃত্বে কয়েকটি সদস্য দেশ বাংলাদেশে বিরুদ্ধে ভোট দিলেও ৮৪টি দেশের সমর্থন নিয়ে বাংলাদেশ ঐদিনই ইউনেস্কোর সদস্য হয়। পাকিস্তানের জোর লবিং সত্ত্বেও বাংলাদেশ এক্ষেত্রেও কূটনৈতিক বিজয় অর্জন করে। এরপরও পাকিস্তান জাতিসংঘ বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা অব্যাহত রাখে এবং ২৩ নভেম্বর সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির ব্যাপারে ২১টি দেশের বৈঠকে পাকিস্তান বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। অধিকাংশ সদস্য দেশ পাকিস্তানের এই মনোভাবের বিরোধিতা করে। ২৯ নভেম্বর সাধারণ পরিষদে ২টি প্রস্তাব পাশ করা হয়। প্রথম প্রস্তাবটি কোনো বিতর্ক ছাড়াই ২২টি সদস্য দেশ সমর্থন করে। এতে বাংলাদেশকে অবিলম্বে সদস্যপদ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করে আর্জেন্টিনা, যা ২৫টি আরব ও মুসলিম দেশ সমর্থন করে। এতে উপমহাদেশের আঞ্চলিক সমস্যা সমূহের সমাধানে যুদ্ধবন্দিদের মুক্তির সুপারিশ করা হয়। সাধারণ পরিষদের সভাপতি স্তানিস্লাভ টেপজিমস্কি প্রস্তাব দুটিকে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল বলে মন্তব্য করলেও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তি ও যুদ্ধবন্দি মুক্তিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় বলে উল্লেখ করেন।[২০] ৩০ নভেম্বর ভারতীয় পার্লামেন্টের এক যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতাকালে রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরীও অনুরূপ মন্তব্য করেন। তবে পাকিস্তান এ ব্যাপারে তার বিবেচনায় অবিচল থাকে এবং যুদ্ধবন্দিদের মুক্তিকে বাংলাদেশের জাতিসংঘে সদস্যভুক্তির শর্ত হিসেবে তুলে ধরে তার তৎপরতা অব্যাহত রাখে। ১৯৭২ সালের মধ্যে ১০০টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেও একমাত্র পাকিস্তানের কারণে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হতে পারেনি। ১৯৭২ সালের মধ্যে উপমহাদেশের শান্তির ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় জাতিসংঘ স্বভাবতই উদ্বিগ্ন হয় এবং জাতিসংঘের মহাসচিব ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে উপমহাদেশ সফর করেন। ৫ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লি পৌঁছে তিনি সাংবাদিকদের জানান যে, তাঁর সফরের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। তবে উপমহাদেশের শান্তির জন্য তাঁর সহযোগিতা চাওয়া হলে তিনি তাতে সম্মত আছেন।[২১] যদিও তাঁর এই সফর তেমন কোনো প্রাপ্তিযোগ যে ঘটাতে পারেনি, ঢাকা থেকে ব্যাংককে ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর সফরের ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করেন তা থেকে পরিষ্কার হয়। তিনি বলেন, পাক যুদ্ধবন্দি ও আটকেপড়া বাঙালিদের প্রত্যাবাসনের বিষয় অত্যন্ত জটিল ও দ্বিপাক্ষিক। স্বীকৃতির পাশাপাশি এ

দু'টি বিষয় একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। যদিও তিনি আশাবাদী ছিলেন যে, এসব সমস্যা সমাধানের পথে তিনি এগিয়ে চলেছেন।[২২] তাই সঙ্গত কারণেই বলা যায় মহাসচিবের সফর মাইলফলক না হয়ে সৌজন্য সফরে পরিণত হয়েছে। ফলে তাঁর উপমহাদেশ সফরের প্রাক্কালে তিনি অমীমাংসিত বিষয়গুলোর সমাধানে যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন, তা সাফল্যের মুখ দেখেনি।

মহাসচিবের সফর কোনো ইতিবাচক সমাধান না দেয়ায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তান অমীমাংসিত ইস্যু নিয়ে আগের মতোই একে অপরকে দোষারোপ করা অব্যাহত রাখে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সফরকালেই ঘোষণা করেন, এই সফর যুদ্ধবন্দিদের বিচারের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বের সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্তন ঘটাবে না।[২৩] তবে এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ ও ভারতের পক্ষ থেকে পাকিস্তানকে দেয়া যুক্ত ঘোষণাকে অনেকেই মহাসচিবের উপমহাদেশ সফরের পরোক্ষ প্রভাব বলে মনে করেন। এই ঘোষণায় ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দি ছাড়া ত্রিমুখী প্রত্যাবাসনের প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু পাকিস্তান এই প্রস্তাবের অনুকূলে তাৎক্ষণিক কোনো সাড়া দেয়নি।

এভাবে মহাসচিবের সফরের পর বাংলাদেশ ও ভারত মানবিক সমস্যা সমাধানে তৎপরতা দেখালেও পাকিস্তান এরকমভাবেই বাংলাদেশ-বিরোধী তৎপরতা অব্যাহত রাখে। বাংলাদেশের কাছে ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর হস্তান্তরে নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য মে মাসের ১১ তারিখে বিশ্ব-আদালতে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান আনে। যদিও পাকিস্তান ভারতের অনুপস্থিতিতে একতরফাভাবে উল্লিখিত আদালতে বাংলাদেশ ও ভারতের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ একের পর এক পেশ করে চলে। বিশ্ব-আদালত ও জাতিসংঘের সংস্থায় পাকিস্তানের এই তৎপরতার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশ ও ভারতের যুক্ত ঘোষণার পক্ষে যে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, তাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা। এ সময় বাংলাদেশ ও ভারত পাকিস্তানের মোকাবিলায় তৎপরতাকে জোরদার করে। ২৩ মে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব নয়াদিল্লি সফরকালে সাংবাদিকদের জানান পাকিস্তানের বিশ্ব-আদালতে তৎপরতা সত্ত্বেও ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার কিংবা যুক্ত ঘোষণার কোনো পরিবর্তন করা হবে না।[২৪] এই পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ২৬ মে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার সদরুদ্দিন পিন্ডি এসে উপস্থিত হন এবং বাঙালি প্রত্যাবাসন ও যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তির ব্যাপারে ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা করেন। এরপর ২৮ মে তিনি ঢাকা সফর করেন। ঢাকায় অনুষ্ঠিত আলোচনাতেও একই বিষয় প্রাধান্য পায়। ঢাকা ও ইসলামাবাদে আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে তিনি ইতিবাচক মত প্রকাশ করেন।[২৫] যদিও আলোচনায় কী ধরণের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেটা প্রকাশ করেননি। বরং ১ জুন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং

পাকিস্তানের অভিযোগের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক আদালতের আইনগত অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করেন।[২৬] যদিও কমিশনের আইনগত অধিকার ও যৌক্তিকতা নিয়ে ভারতের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে ১৮ জুন কমিশনের পরের দিনের নির্ধারিত শুনানি মুলতবি করা হয়।

অবশ্য ২৯ জুলাই ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত পাক-ভারত বৈঠকে কোনো সিদ্ধান্ত না হলেও আগষ্ট মাসে দিল্লি বৈঠকে দুটি দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং এর ভিত্তিতে ত্রিমুখী প্রত্যাবসানের কাজ শুরু হয়। জাতিসংঘের মহাসচিব চুক্তিকে স্বাগত জানান।[২৭] দিল্লি-চুক্তি অনুযায়ী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে প্রত্যাবাসনের কার্যক্রম শুরু হলে জাতিসংঘ তাতে ভূমিকা রাখে। প্রত্যাবাসনের প্রাক্কালেই মহাসচিব জাতিসংঘের সদস্যদের প্রতি প্রত্যাবাসনের জন্য আর্থিক ও পরিবহন সাহায্য চেয়ে আবেদন জানান। জাতিসংঘ ও রেডক্রসের সহযোগিতায় প্রত্যাবাসন কাজ এগিয়ে গেলেও প্রত্যাবাসনের ২ মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ অভিযোগ করে যে, পাকিস্তান চুক্তি মোতাবেক বিহারিদের ফেরত নিতে ধীরে চলার নীতি অনুসরণ করছে। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে শরণার্থী কমিশনার ঢাকা ও ইসলামাবাদ সফর করেন এবং দুটি দেশের প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি আলোচনা করেন।[২৮] ফলে বিহারি প্রত্যাবাসনের কাজে কিছুটা গতির সঞ্চার হয়। এভাবে জাতিসংঘ ত্রিমুখী প্রত্যাবাসনে ভূমিকা রাখে এবং ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রত্যাবাসনের জন্য প্রয়োজনের ১৪ মিলিয়ন ডলারের ১১.৮ মিলিয়ন ডলার প্রদান করে।[২৯] অবশ ১৯৭৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত জাতিসংঘের শরণার্থী কমিশন প্রত্যাবাসনে বরাদ্দ করে ১৪ মিলিয়ন ডলার।[৩০] এসময় জাতিসংঘের পুনর্বাসন কার্যক্রম শেষ হয়। এছাড়া নভেম্বর মাসে জাতিসংঘ বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে গমনেচ্ছু বিহারিদের প্রত্যাবাসনে ১.১০ লক্ষ ডলার সাহায্য দেয়।[৩১]

দিল্লি চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হলে বাংলাদেশ ও ভারত এই মর্মে আশাবাদী ছিল যে, পাকিস্তান জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির ব্যাপারে কোনোরকম বাধার সৃষ্টি করবে না। ২১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর একটি বক্তব্য বাংলাদেশের আশা নিরাশায় পরিণত হয়। ঐ দিন সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশ ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দির বিচারের সিদ্ধান্ত বাতিল না করলে পাকিস্তান তার সদস্যভুক্তির বিরোধিতা করবে বলে পরিষ্কার জানিয়ে দেন।[৩২] এই বক্তব্যের মাধ্যমে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দির বিচারের ব্যাপারটি বাতিল করার জন্য বাংলাদেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পাকিস্তানের দৃঢ় সংকল্পকেই তুলে ধরে। ৩ অক্টোবর চীনের ভেটো প্রয়োগের মাধ্যমে পাকিস্তানের এই বক্তব্যের সত্যতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে। পাকিস্তান ও চীনের মনোভাব থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বাংলাদেশের জাতিসংঘে প্রবেশের পূর্বসর্ত হচ্ছে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দির মুক্তি।

যদিও ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি দেয়ার পর কূটনৈতিক মহল এই মর্মে আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন যে, অচিরেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হতে যাচ্ছে। মহাসচিব পাকিস্তানের স্বীকৃতিতে স্বাগত জানান এবং আশা-পোষণ করেন যে, এর ফলে দুটি দেশের মধ্যে গঠনমূলক সহযোগিতার মাধ্যমে অনেক সাধারণ সমস্যার সমাধানের ভিত্তি রচিত হবে।[৩৩] জাতিসংঘের একজন মুখপাত্র ২৬ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, এপ্রিল মাসের বৈঠকের সময়ই বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হতে পারবে। মহাসচিব নিজেও নিউইয়র্কে ৭ মার্চ মন্তব্য করেন যে, নিরাপত্তা পরিষদের কাছ থেকে যথার্থ সুপারিশ পাওয়া গেলে জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।[৩৪] মার্চ মাসে ভুট্টোর চীন সফর এবং চীনা নেতাদের সঙ্গে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির ব্যাপারে ইতিবাচক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় এ যাত্রা চীনের ভেটোর সম্ভাবনা নেই। করাচি থেকে প্রকাশিত 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকা ভুট্টোর চীন সফরের ওপর এই মর্মে মতামত ব্যক্ত করে যে, সাধারণ পরিষদের আসন্ন অধিবেশনের আগে চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে এবং জাতিসংঘে ভেটো প্রয়োগ থেকে বিরত থাকবে।[৩৫]

১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল দিল্লিতে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দির মুক্তির ফলে জাতিসংঘের সদস্যভুক্তি শুধু সময়ের ব্যাপারে পরিণত হয়। এই চুক্তির পরপর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, পাকিস্তান জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির ব্যাপারে কোনোরকম বাধা সৃষ্টি না করার জন্য চীনের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক তাই মনে করেন, জাতিসংঘে প্রবেশের জন্যই বাংলাদেশ ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে। ১০ জুন ভয়েস অব আমেরিকা জানায়, নিরাপত্তা পরিষদের সাধারণ সভায় বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির ব্যাপারে পরিষদের ১৫ সদস্য একমত হয়েছে এবং আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে তা অনুমোদন করা হবে।[৩৬]

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে অমীমাংসিত বিষয়ে জাতিসংঘে তৎপরতা শুরু করে জুলাই মাসে জাতিসংঘে পর্যবেক্ষক ওয়ালিউর রহমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ৫৭তম অধিবেশনে পাকিস্তান কর্তৃক ৪লক্ষ অবাঙালি ফেরত নেয়ার ব্যাপারে অনীহার কথা তুলে ধরেন এবং আশা পোষণ করেন যে, পাকিস্তান তাদের ফেরত নিয়ে পাকিস্তানের প্রতি তাদের আনুগত্যের সম্মান দেখাবে। অবশ্য এ সময় জাতিসংঘে সদস্যভুক্তির বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। জুন মাসে ভুট্টোর ব্যর্থ ঢাকা সফর, জুলাইয়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের পরস্পরবিরোধী অপপ্রচার সত্ত্বেও জাতিসংঘভুক্তির ব্যাপারে চীন ও পাকিস্তান যে বাধা দেবে না সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৭ সেপ্টেম্বর

বাংলাদেশ দীর্ঘ প্রতীক্ষিত জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এনাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে একে স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত জনগণের বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৩৭] জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি আনোয়ারুল করিম ঐদিনই মহাসচিবের কাছে তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করেন। পাকিস্তান এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করলেও ২৮ সেপ্টেম্বর পাক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বাগত জানান।[৩৮] যদিও কূটনৈতিক রীতি অনুযায়ী পাক প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর স্বাগত জানানোর কথা ছিল। এর থেকে মনে হয় পাকিস্তানের ইচ্ছের বিরুদ্ধে মে মাসে আবেদন, ভুট্টোর ব্যর্থ সফর, আগষ্টে বাংলাদেশের বন্যাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানে বাংলাদেশ-বিরোধী প্রচারভিযানের কারণে দুটি দেশের সম্পর্কের উন্নতির যে সম্ভাবনা স্বীকৃতির পর দেখা দিয়েছিল সেটা হয়নি। জাতিসংঘের সদস্য হয়েই বাংলাদেশ অমীমাংসিত ইসুগুলো উত্থাপন এবং পাকিস্তানকে বিব্রত করবে পাকিস্তান এমন আশংকাও করেছে। বাস্তব ২৫ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনের ভাষণে যুদ্ধবন্দি, বিহারি প্রত্যাবাসন ও সম্পদ বন্টন বিষয় তুলে ধরেন।[৩৯]

এই প্রথমবারের মতো বিশ্বসংস্থায় বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের অমীমাংসিত ইসু তুলে ধরা হয়। যদিও পাকিস্তান শেখ মুজিবের এই বক্তৃতার ব্যাপারে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। বাংলাদেশ এরপরও অন্যান্য সংস্থায় এসব বিষয় তুলে ধরতে থাকে। একই বছর ১ ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে বাংলাদেশের প্রতিনিধি ফজলুল করিম পাকিস্তানে প্রত্যাবাসনে ইচ্ছুক ৪ লক্ষ অবাঙালির প্রত্যাবসানের দাবি তুলে ধরেন।[৪০] বাংলাদেশের এই তৎপরতা, সেই সাথে কয়েকটি দেশের চাপের ফলে পাকিস্তান পূর্ব-ঘোষিত ক্যাটাগরির বাইরে আরো কিছু সংখ্যক বিহারিকে ফেরত নিতে রাজি হলেও সকল বিহারিকে ফেরত নেয়ার ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব এরপরও অব্যাহত রাখে।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক ঃ জাতিসংঘের ভূমিকা, ১৯৭৫-৮১

অবশ্য মুজিবের হত্যার পর বাংলাদেশের নতুন শাসকরা অমীমাংসিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে নমনীয় মনোভাব প্রকাশ করে এবং জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক ফোরামে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকে। এদিকে সোভিয়েত রাশিয়া ও ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের অবনতির কারণে ভারতের সঙ্গে অমীমাংসিত ইসু বিশেষত ফারাক্কা ইসুতে বাংলাদেশ সোচ্চার হয়। পাকিস্তান ও চীন বাংলাদেশকে এই ইসুতে অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়। যদিও ১৯৭৫ ও ১৯৭৮ সালে দুটি ইসুতে পাকিস্তান ও ভারত জাতিসংঘে ঐকমত্য প্রকাশ করে। ১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাসে নিরাপত্তা পরিষদের এশিয়া গ্রুপের নির্বাচনে ভারত ও পাকিস্তান প্রার্থী হয়। কিন্তু কুয়েতের রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে

আফ্রো-এশীয় দেশগুলোর অনুরোধে ভারত প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিলে পাকিস্তান দু'বছরের জন্য সদস্য হয়। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ইকবাল আকন্দ ভারতের এই মনোভাবকে স্বাগত জানান।[৪১] ভারতের এই সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশ একটি অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তি পায়। ১৯৭৮ সালের নভেম্বর মাসে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য পদে বাংলাদেশ জাপানকে হারিয়ে জয়ী হয়। এ সময় পাকিস্তান ও ভারত যৌথভাবে বাংলাদেশকে সমর্থন করে। ১৯৭১ সালের পর এই প্রথম তিনটি দেশ একটি আন্তর্জাতিক বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করে।

জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলে অমীমাংসিত ইসুতে বিশেষ অগ্রগতি না হলেও বিহারিদের ফেরত দেয়ার ব্যাপারে জাতিসংঘের শরণার্থী ১৯৭৮ সালে উদ্যোগ নেয় এবং বিহারিদের প্রত্যাবাসনের জন্য তহবিল সংগ্রহ করে। কিন্তু একই বছর ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হতাশা ব্যক্ত করে জানান যে, কমিশন এখাতে ২.৯ মিলিয়ন ডলার বাজেটের মধ্যে মাত্র ৯০০,০০০ ডলার সংগ্রহ করেছে। ফলে অর্থাভাব ও পাকিস্তানের অনীহার কারণে বিহারিদের প্রত্যাবাসন কাজ বাধাগ্রস্ত হয় এবং ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে মাত্র ৭০০০ জন বিহারিকে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।[৪২] অবশ্য এই স্লথগতির প্রত্যাবাসনের পিছনে অর্থাভাবের চেয়ে পাকিস্তানের অনীহা ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক উদ্যোগের অভাব অনেকাংশে দায়ী ছিল।

তবে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে পাকিস্তান সংশ্লিষ্ট ইসুতে জাতিসংঘে বাংলাদেশের অতি উৎসাহী ভূমিকা কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর হস্তক্ষেপের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ১৯৮০ সালের ৫ জানুয়ারি ৫টি দেশের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে অনতিবিলম্বে আফগানিস্তান থেকে রুশ সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য জাতিসংঘে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করে। রুশ ভেটোর কারণে সে যাত্রা প্রস্তাবটি নাকচ হলেও ৯ জানুয়ারি বাংলাদেশের সক্রিয় ভূমিকার কারণে বিষয়টি সাধারণ পরিষদে স্থানান্তরিত হয়। ১৫ জানুয়ারি প্রস্তাবটি সাধারণ পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে গৃহীত হয়। যেখানে মুসলিম বিশ্বের সকল সদস্য একমত ছিল না সেখানে পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রকে সন্তুষ্ট করতে বাংলাদেশের তৎকালীন একটি পরাশক্তির বিরাগভাজন হওয়া কূটনৈতিক বিচারে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ছিল না।

উপসংহারে বলা যায় যে, বহু জাতি, বিচিত্র রাষ্ট্র ও সরকার কাঠামোর সম্মিলিত সংস্থা জাতিসংঘ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণে ব্যর্থ হয়। যদিও স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অমীমাংসিত বিষয় ও বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের ক্ষেত্রে সংস্থাটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এ সময় বাংলাদেশ পাকিস্তানে আটক বাঙালি উদ্ধার এবং পাকিস্তান ভারতে আটক পাকিস্তানি যুদ্ধ বন্দিদের

বিচার বাতিল, তাদের মুক্তির জন্য জাতিসংঘের মধ্যস্থতার উপর প্রাধান্য দেয়। ১৯৭৩ সালের দিল্লি চুক্তির আওতায় ত্রিমুখী প্রত্যাবাসনে জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘ এ খাতে ব্যয় করে ১৪ মিলিয়ন ডলার। যদিও ত্রিমুখী প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের উদ্যোগ ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও পাকিস্তানের অনীহার কারণে সকল বিহারি পাকিস্তানে প্রত্যাবসিত হয়নি। তা সত্ত্বেও জাতিসংঘ আটকেপড়া বিহারিদের বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। পাকিস্তানের বহু বাধা অতিক্রম করে বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সদস্য হয়েছে। সদস্য হওয়ার পর পর বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে অমীমাংসিত বিষয়ের মধ্যে বিহারি প্রত্যাবাসন, সম্পদ বন্টন বিষয়ে জাতিসংঘে উত্থাপন করে। কিন্তু মুজিবের মৃত্যুর পর পরবর্তী সরকারগুলোর পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ক্ষেত্রে অতি উৎসাহী নীতির কারণে এ দুটি বিষয় এড়িয়ে যাওয়ায় পাকিস্তান এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পিছিয়ে যায়। জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় এ বিষয়কে বিক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত করলেও জাতিসংঘের মধ্যস্থতা বা সহযোগিতা কামনা না করায় স্বভাবতই এ বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল আসে নি। অথচ বাংলাদেশ জাতিসংঘে মুজিব আমলের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখলে পাকিস্তানের সঙ্গে অমীমাংসিত বিষয়ে ইতিবাচক ফল বয়ে আসতে পারতো।

সূত্রনির্দেশ

১। প্রস্তাবের পক্ষে ১০৪ টি ও বিরুদ্ধে ১১ টি দেশ ভোট দেয়। ১০ টি দেশ ভোট দানে বিরত থাকে। সাধারণ পরিষদের বিতর্কের জন্য দ্রষ্টব্য হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র*; খন্ড ১২ (ঢাকা ঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২), পৃ. ৯৬৮-৯৭৫।

২। Shri Ram Sharma, *India Foreign Policy Annual Survey 1971 (New Delhi . Sterling, 1971)*, p. 338

৩। *Year Book of the United Nations 1971*, p. 159.

৪। *Ibid*, op. cit.

৫। *Pakistan Horizon*, Documents, Vot. XXV, No. 1 1972. p. 127.

৬। *New York Times*, 13 February 1972.

৭। *Pakistan Horizon*, op. cit. p. 131.

৮। *The Subcontinent Documents of India Bangladesh-Relations*, (New Delhi : Indian Publication. n.d). p.15

৯। *Pakistan Horizon*, Chronology. op. cit., No. 2, 1972 p. 80.

১০। *Ibid,* p. 88.

১১। *Ibid,* p. 90.

১২। *দৈনিক বাংলা,* ২৮ মে ১৯৭২।

১৩। *Year Book of the United Nations 1972,* Vol. 26, op. cit., p.218.

১৪। *Ibid.,* op. cit.

১৫। সমর্থনদানকারী দেশগুলো হচ্ছে আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ভারত, ইতালি, যোগোস্লাভিয়া, জাপান, পানামা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য।

১৬। Shri Ram Sharma, *op. cit.,* p. 131.

১৭। *Pakistan Horizon,* Chronology, op. cit.. p. 94.

১৮। *The Subcontinent Documents of India Bangladesh-Pakistan Relations,* op. cit.. p. 31-32.

১৯। *Pakistan Times,* 22 November 1972.

২০। *দৈনিক পূর্বদেশ,* ২ ডিসেম্বর ১৯৭২।

২১। *দৈনিক গণকণ্ঠ,* ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩।

২২। *দৈনিক স্বদেশ,* ঐ।

২৩। *Morning News,* 10 February 1973.

২৪। *Pakistan Horizon,* Chronology. Vol. XXVI. No. 2 1973. p. 85.

২৫। *দৈনিক বাংলা,* ৩০ মে ১৯৯৩।

২৬। *Pakistan Horizon,* Chronology, NO. 3, 1973, p. 69. ভারত যুক্তি হিসেবে বলে ১৯৪৮ সালের জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী গণহত্যা সংক্রান্ত কোনো বিরোধের মীমাংসায় উভয় বা সকল পক্ষের উপস্থিত আবশ্যক। কিন্তু পাকিস্তান এককভাবে আদালতে অভিযোগ পেশ করেছে, যা বিধিসম্মত নয়।

২৭। *Pakistan Horizon.* op.cit., p. 87.

২৮। *Pakistan Horizon,* op.cit.. p. 66.

২৯। *Year Book of the United Nations 1974,* Vol. 28 (New York : Office Public Information, 1976), p. 151.

৩০। *Ibid,* Vol. XXVII. No. 3, 1974, pp. 92-93. এছাড়া জাতিসংঘ মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারীদের জন্য ১৯৭২ সালের মার্চ পর্যন্ত ১ মিলিয়ন ডলার বা ৭.২০ কোটি টাকা সাহায্য দেয়। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশকে ১, ৩১৮.৮৫ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দেয়। দ্রষ্টব্য Thomas W. Oliver, op. cit., p. 183.

৩১। *Pakistan Horizon,* Vol. XXVI. No. 4. 1974, p. 97.

৩২। *দৈনিক বাংলার বাণী,* ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩।

৩৩। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪।

৩৪। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ মার্চ ১৯৭৪।

৩৫। *Bangladesh Times*, 15 March 1974.

৩৬। *দৈনিক জনপদ*, ১১ জুন ১৯৭৪।

৩৭। *ঐ*, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬ তম সদস্য।

৩৮। মোহম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের তারিখ* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮), পৃঃ ৯৮।

৩৯। *Ten years of Bangladesh in the United Nations 1974-1984*. (Dhaka : Ministry of Foreign Affairs, 1984), p. 21.

৪০। *Pakistan Times*, 2 December 1974.

৪১। *ইত্তেফাক*, ২৫ অক্টোবর ১৯৭৫।

৪২। *Bangladesh Times*, 19 November 1981.

বাংলাদেশের ১৯৭৮ সালের রাজনীতি এবং জিয়াউর রহমান

মোঃ রেজাউল করিম

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭৮ সাল হচ্ছে রাজনৈতিক তৎপরতার বছর। ১৯৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা কাটিয়ে ১৯৭৮ সালে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সবচেয়ে তীব্রতর হয়। এ রাজনীতিতে নির্বাচন, রাজনৈতিক কোন্দল, কোন্দলের কারণে দল ভাঙ্গা, নতুন-নতুন দল গড়া, বিবৃতি-পাল্টা বিবৃতি, দল ত্যাগ, বহিষ্কার প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়েছে। রাজনীতির এই ডামাডোলে বহুধা বিভক্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেখিয়েছেন চরম দেউলিয়াপনা ও সুবিধাবাদী চরিত্র। অন্যদিকে, 'জাগদল', 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট' ও 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল' (বি.এন.পি) গঠনের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমান একজন সফল রাজনীতিবিদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে, গোটা '৭৮ সালের রাজনীতি, হোক সে সরকারী অথবা বিরোধী, হোক সে বাম অথবা ডান কিংবা মধ্যপন্থী—সবই আবর্তিত হয়েছে জিয়াউর রহমানকে কেন্দ্র করে। শুধু তাই নয়, এ আবর্তনের ফলে উদ্ভুত সংকটও তিনি সমাধান করেছেন দক্ষতা ও প্রজ্ঞার সাথে। উৎপাদনের মূল শক্তির সাথে সম্পর্কহীন, পরাশ্রয়ী রাজনৈতিক দলগুলোর দেউলিয়াপনা, ভ্রান্ত ও অযোগ্য নেতৃত্বই প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে ১৯৭৮ সালের আলোচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।[১]

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী যখন বাংলাদেশে ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞের সূচনা করে, গোটা জাতি যখন স্তম্ভিত, সন্ত্রস্ত, দিশেহারা ঠিক তখনই মেজর জিয়াউর রহমান তাঁর ব্যাটেলিয়ান নিয়ে ষোল ডিভিশন আর্মির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।[২] অতঃপর বাংলাদেশের ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই দেশপ্রেমের সুমহান চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশপ্রেমিক, সাহসী সেই মেজর চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মহান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।[৩] এভাবে সেনাবাহিনীর একজন অখ্যাত মেজর হিসেবে তিনি অসাধারণ এক ব্যঞ্জনা নিয়ে ইতিহাসের পাতায় আবির্ভূত হন। অর্থাৎ 'মেজর জিয়া' হিসেবেই তাঁর ঐতিহাসিক অভ্যুদয়। মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার গুরুত্ব সম্পর্কে '*টাইম*' জিয়ার মৃত্যুর পর লিখেছে[৪]—

Ten years ago this spring young Major Ziaur Rahman broadcast and electrifying message from a clandestine Radio in the East Pakistan city Chittagong proclaiming a rebellion against West Pakistan that ultimately created the Nation of Bangladesh.

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর সামরিক অভ্যুত্থান-প্রতিঅভ্যুত্থানের ফলে সৃষ্ট ক্ষমতা-শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে ৭ নভেম্বর 'সিপাহী-জনতা অভ্যুত্থানে'র মাধ্যমে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান 'উপ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক' হিসেবে ক্ষমতাসীন হন। অর্থাৎ সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের ফসল জেনারেল জিয়াউর রহমান। '৭১-এর মার্চের মত পুনরায় ৭৫ সালের ৭ নভেম্বর জাতির ক্রান্তিলগ্নে জাতির পাশে এসে দাঁড়ান জেনারেল জিয়া। জিয়াউর রহমানের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে শুরু হয় নতুন এক অধ্যায়। আবার নতুন ভাবে জন্ম নেয় বাংলাদেশ।[৫]

১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর 'প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক' এবং ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল 'রাষ্ট্রপতি' হিসেবে শপথ নিয়ে জিয়াউর রহমান একাধারে রাষ্ট্রপতি, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেই ২২ এপ্রিল এক ঘোষণা বলে সংবিধানের মূলনীতির 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র বিধানটি বাতিল করে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা' সংযোজন করেন এবং সংবিধানের শুরুতে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" কথাটি যুক্ত করেন। সেইসাথে বাংলাদেশের নাগরিকদের নতুন পরিচয়ে পরিচিত করে 'বাঙালী জাতীয়তাবাদে'র পরিবর্তে সংবিধানে "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ" প্রবর্তন করেন।[৬]

'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধে জিয়াউর রহমান বলেন[৭]—

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন এদেশের মাটি, পানি ও গণমানুষের সঙ্গে একাকার হয়ে রয়েছে এবং এর যে কোন বিচ্যুতি আমাদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। ... এ দর্শন এ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করবে, জাতিকে সুনিশ্চিতভাবে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেবে এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে মর্যাদা ও গুরুত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে।

বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিমূর্ত চেতনা হল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ যা তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং এ উপলব্ধিকে সাংবিধানিক রূপ দেন।

রাজনৈতিক শূন্যতা বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারত এবং ১৯৭৫ পরবর্তী রাজনৈতিক শূন্যতা বাংলাদেশের জন্য ছিল হুমকিস্বরূপ। এ সময় দেশের

মানুষও রাজনীতি বিমুখ হয়ে পড়ে। জিয়াউর রহমান এই রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের জন্য সত্যিকার কল্যাণমুখী রাজনীতি প্রবর্তনের উদ্যোগ নেন। তিনি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করেন মানুষকে এবং মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের বিষয়কে। এ লক্ষ্যে তিনি ১৯৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল '১৯ দফা কর্মসূচী' ঘোষণা করেন। ১৯ দফা নিম্নরূপ—[৮]

১. সর্বতোভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।

২. শাসনতন্ত্রের চারটি মুলনীতি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের অর্থে সমাজতন্ত্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলিত করা।

৩. সর্ব উপায়ে নিজেদেরকে একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে তোলা।

৪. প্রশাসনের সর্বস্তরে, উন্নয়ন কার্যক্রমে ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা।

৫. সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীন তথা জাতীয় অর্থনীতিকে জোরদার করা।

৬. দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং কেহ যেন ভুখা না থাকে, তার ব্যবস্থা করা।

৭. দেশে কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করে সকলের জন্য অন্তত মোটা কাপড় সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৮. সকল নাগরিক যেন গৃহহীন না থাকে, তার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা।

৯. দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ হতে মুক্ত করা।

১০. সকল নাগরিকের জন্য ন্যূনতম চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা।

১১. সমাজে নারীর যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এবং যুব সমাজকে সুসংহত করে জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা।

১২. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারী খাতকে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দান করা।

১৩. শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে সুষ্ঠু শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

১৪. সরকারী চাকরিজীবীগণের মধ্যে জনসেবা ও দেশ গঠনের মনোবৃত্তি উৎসাহিত করা এবং তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

১৫. জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করা।

১৬. সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং মুসলিম দেশগুলোর সহিত সম্পর্ক বিশেষ ভাবে জোরদার করা।

১৭. প্রশাসন ও উন্নয়ন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করা।

১৮. দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়নীতিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা।

১৯. ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার পূর্ণ সংরক্ষণ করা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করা।

জিয়াউর রহমান নিজের সাংবিধানিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালের ৩০ মে অনুষ্ঠিত গণভোট অনুষ্ঠান করেন। গণভোটে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও তাঁর ১৯ দফা কর্মসূচির প্রতি জনগণের প্রশ্নাতীত সমর্থন ও আস্থা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। নির্বাচনের এ রায়[৯] তাঁর কর্মসূচির প্রতি মানুষের শ্রমমুখী উদ্দীপনারই প্রতিফলন। এই গণভোটের রায়ের ভিত্তিতে তিনি পরবর্তী সামরিক শাসনের সমাপ্তি ঘটিয়ে অসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন।

জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রথম থেকেই অসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি ১৯৭৬ সালের ২৮ জুলাই "রাজনৈতিক দলবিধি'৭৬"[১০] নামে একটি আদেশ জারী করেন। এ আদেশে বলা হয়—কোন রাজনৈতিক দলের তৎপরতা শুরুর আগে সরকারের কাছে তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী সম্বলিত গঠনতন্ত্র দাখিল করতে হবে। সরকারের অনুমতি লাভের পর ঐ দলটি রাজনীতি শুরু করতে পারবে। এ আদেশের শর্তানুসারে দেশের ৬৩টি রাজনৈতিক দল সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য আবেদন করে। তন্মধ্যে সরকার ২১টি দলকে অনুমোদন দিয়ে "ঘরোয়া রাজনীতি" করার অনুমতি প্রদান করে।[১১] রাজনৈতিক দলবিধি প্রত্যাহার করা হয় ১৯৭৮ সালে এবং এ বছরই ১ মে খোলা রাজনীতির আবির্ভাব ঘটে। এভাবে জিয়াউর রহমান একদলীয় ব্যবস্থা বাতিল করে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করেন।

ঘরোয়া রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলগুলো তেমন কোন তৎপরতা দেখাতে পারেনি। তবে এ সময়ের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা হলো রাজনৈতিক দলগুলোর ভাঙ্গন। ৭৫ সালের পর থেকেই দল ভাঙ্গার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই ভাঙ্গন প্রক্রিয়ায় প্রথম ভাঙ্গন পরিলক্ষিত হয় আওয়ামী লীগের ভিতরে। এরপর অপরাপর সংগঠনগুলোও ভাঙ্গতে শুরু করে। রাজনৈতিক দলবিধির আওতায় ৬৩টি দলের আবেদনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক দলগুলোর ভাঙ্গন চিত্র পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এই ভাঙ্গনের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়—নতুন পরিস্থিতিতে সৃষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোর কোনটির সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা ছিল না। তাছাড়া রাজনৈতিক দলগুলির ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, জনবিচ্ছিন্নতা এবং রাজনীতিহীনতা জনগণকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ এ দুটি দলের ভাঙ্গনের চিত্র নিম্নে দেখানো হল।[১২]

ক) **আওয়ামী মুসলিম লীগ (১৯৪৯)**

আওয়ামী লীগ (১৯৫৫)

আওয়ামী লীগ
ন্যাপ (১৯৫৭)

সি. পি. এম (১৯৬৮)
আওয়ামী লীগ

আওয়ামী লীগ
জাতীয় লীগ (১৯৭০)

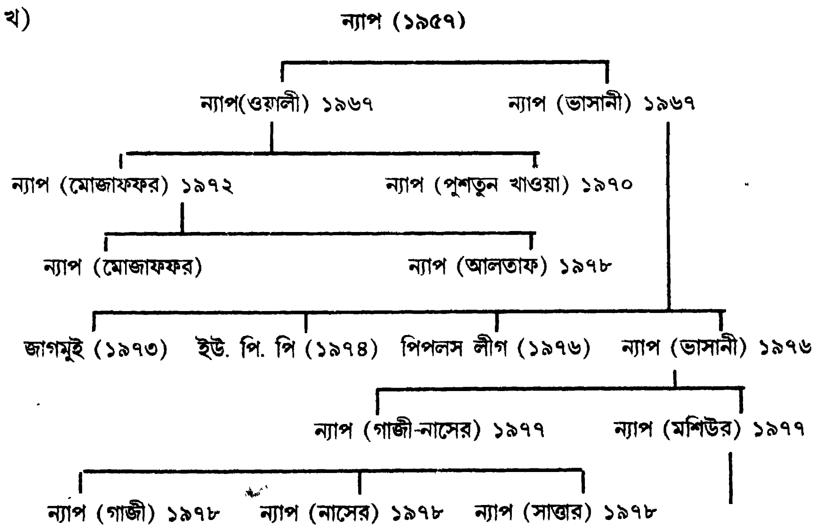
জাসদ (১৯৭২)
আওয়ামী লীগ

কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) ১৯৭৫

ডেমোক্রেটিক লীগ (১৯৭৬)
গণ আওয়ামী পার্টি (১৯৭৬)
জনতা পার্টি(১৯৭৬)
আওয়ামী লীগ

আওয়ামী লীগ (মিজান) (১৯৭৮)
আওয়ামী লীগ (মালেক) (১৯৭৮)

খ)



বি. এন পি তে যোগদান

রাজনৈতিক দলগুলির এ ভাঙ্গন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা' লিখেছিল-

রাজনৈতিক দলগুলো ক্রমাগত ভাঙ্গতে-ভাঙ্গতে, ক্ষয় হতে-হতে এমন এক জীর্ণ দশাগ্রস্থ হয়েছে যে, আজ তার ম্যাজিকওয়ালাদের পাশাপাশি (বায়তুল মোকাররমে) আসর জমাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে।[১৩]

দেশে বিরাজমান এই রাজনৈতিক সঙ্কট মোচনের জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একটি রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নেন। দেশে সামরিক শাসনের অবসান এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনেই তখন যুগোপযোগী এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারক-বাহক একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কারণ তখন বিবাদমান রাজনৈতিক দলগুলির সে শূন্যতা পূরণে সক্ষম ছিল না। আওয়ামী লীগ জনগণের কাছে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়েছিল। সি. পি. বি ও ন্যাপ (মোজাফফর) বাকশালে যোগ দিয়ে নিজেদের বিতর্কিত করে ফেলেছিল। ধর্মাশ্রয়ী দলগুলি ছিল নিষিদ্ধ। জাসদ, ন্যাপ (ভাসানী) সহ অন্যান্য দলগুলি আওয়ামী লীগের জুলুমে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।[১৪] এমতাবস্থায় জিয়াউর রহমান শূন্যতা পূরণে ও দ্বিধাবিভক্ত জাতিকে সমন্বয়ের রাজনীতির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য একটি জাতীয়তাবাদী দল গঠনের ঘোষণা দেন এবং এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

যারা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, যারা দুর্নীতির উর্ধ্বে, যারা সুযোগসন্ধানী নন শুধু তারাই এ ফ্রন্টের শামিল হতে পারবেন।[১৫]

এসময় জিয়াউর রহমানের এ সিদ্ধান্ত ছিল ঐতিহাসিক। এ ঘোষণার কিছুদিন পরই ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গঠিত হয় 'জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল' (জাগদল)। উপ-রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার জাগদল কেন্দ্রীয় কমিটির আহবায়ক ছিলেন এবং এ দলের ১৬ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটির বেশীর ভাগই ছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়ার উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য।[১৬] 'জাগদল' স্পষ্টত সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট দল হওয়া সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এ দলে যোগদান করেন নাই। জাগদল জিয়াউর রহমানের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে না পারায় পরবর্তীকালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের উন্মেষ ঘটে।

১৯৭৮ সালের রাজনীতির অন্যতম আকর্ষণ ছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। নয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দেশে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসন চালু রাখা হয়। ৩ জুন অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলো প্রধান দুটি ধারায় বিভক্ত হয়। একদিকে ৬টি দলের সমন্বয়ে গঠিত 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের'[১৭] নেতৃত্ব দেন এবং প্রার্থী হন জিয়াউর রহমান। অন্যদিকে ৫টি দলের সমন্বয়ে গঠিত 'গণতান্ত্রিক ঐক্য জোটে'র[১৮] নেতৃত্ব দেন আওয়ামী লীগের আব্দুল মালেক উকিল, কিন্তু এতে প্রার্থী হন এম. এ. জি ওসমানী।

এ নির্বাচনে মোট ১০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু মূলত জিয়াউর রহমান ও ওসমানীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। জিয়াউর রহমান ৭৬.৬৭% ভোট পেয়ে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ওসমানী ২১.৭০% ভোট পান।[১৯] নির্বাচন-রাজনীতির মাধ্যমে জিয়াউর রহমান জনগণের আরও কাছাকাছি চলে যান।

ভাঙ্গা-গড়ার এ রাজনৈতিক আবর্তে প্রেসিডেন্ট জিয়া ভাঙ্গনের চেয়ে গড়েছেন বেশী। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভের পর প্রেসিডেন্ট জিয়া জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট ভেঙ্গে দেন এবং নিজের নেতৃত্বে ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল' (বি.এন.পি) গঠন করেন। ফ্রন্টভুক্ত দলগুলির অধিকাংশই এ নতুন দলে একীভূত হয়। এভাবে সময়ের ব্যবধানে ক্ষমতার প্রয়োগ বা অপ-প্রয়োগকে ছাপিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যাপ্তি বা বিস্তৃতির সনাতন ধারণার উর্ধ্বে উঠে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ধারণ করার এক মহান সংস্থা রূপে জাতীয়তাবাদী দলের আবির্ভাব ঘটে।[২০] বি.এন.পি-র জন্ম হয় জাতীয় ঐক্যের প্রতীক রূপে। দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের দৃষ্টিতে বি.এন.পি কোন সাধারণ রাজনৈতিক দল নয়, বরং এটি হলো জাতীয়তাবাদীদের একটি অসাধারণ প্লাটফরম।[২১] জাগদল গঠনের ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমান নেপথ্য ভূমিকা রাখলেও জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টও জাতীয়তাবাদী দল গঠনের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমান একজন আলোচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

রাজনৈতিক সততা ছিল জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি ছিলেন সৎ, সাহসী, পরিশ্রমী, স্বল্পভাষী ও নিরহংকার। এক কথায় একজন আদর্শবাদী মানুষ। জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিগত সততা এবং সরল ও অনাড়ম্বর জীবন ধারণ প্রণালী তাঁকে জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা দান করে। এটি ছিল তাঁর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভের অন্যতম মুলভিত্তি। তাঁর সততা সম্পর্কে জনৈক বিদেশী সাংবাদিক মন্তব্য করেন—

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার মত সততা শুধু বাংলাদেশের রাজনীতিকদের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত নয়, বরং বিশ্বের অন্যান্য দেশের রাজনীতিকদের জন্যও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।[২২]

রাজনীতিবিদ হিসেবে জিয়াউর রহমান এদেশের শহর কেন্দ্রিক, রাজনীতিবিদদের জন্য ছিলেন চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। 'বিচিত্রা' কে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন,[২৩]—

> ''আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট।'' এ উক্তির ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, ''আমি বলেছি গণতন্ত্রকে গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দিব। সেক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়তে হবে শহর কেন্দ্রিক পেশাদার রাজনীতিবিদদের।''

রাজনৈতিক দলগুলোর ভাঙ্গাগড়া ও রাজনীতিবিদদের দেউলিয়াপনার মধ্য দিয়ে তাঁর এ উক্তির যথার্থতা পরিলক্ষিত হয়।

রাজনীতিবিদ হিসেবে জিয়াউর রহমানের দক্ষতা ও বিচক্ষণতা ছিল সন্দেহাতীত। সেই দক্ষতা ও বিচক্ষণতা বলেই তিনি ইতিহাসের রায়কে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন,[২৪]

> "... কোন নেতাই সম্পূর্ণ নন। নেতারা কথা জানেন, কথা বলেন, বেশী করেই বলেন। কিন্তু ড্রইং রুমে বসে। এরা কাজ করেন না। অনেকের কাজ করার আগ্রহ আছে। সংগঠন নেই বলে পারেন না। একদলের রাজনৈতিক পর্যায় শেষ হয়ে গেছে। আর এক দলের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সময় আসেনি। আমি জানি একদিন আমারও প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। তার অনেক আগেই আমার উপলব্ধিকে আমি গ্রামের মানুষের, সাধারণ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে নিতে চাই।"

প্রেসিডেন্ট জিয়া তাই ক্ষমতাকে জনতার খুব কাছাকাছি নিয়ে যান এবং জনতার কাছ থেকেই সমস্যার সমাধান চেয়েছেন।

১৯৭০ এর দশকের শেষের কয়েকটি বছর বাংলাদেশের রাজনীতি সামগ্রিকভাবে জিয়াউর রহমানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। তাঁর সর্বজনীন চরিত্র ও বিচক্ষণতার কারণে আওয়ামী লীগ সহ প্রায় সকল রাজনৈতিক দল ভেঙ্গেছে এবং প্রকারন্তরে জাতীয়তাবাদী দলের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় - ৭৮ সালের শুরুতে সাম্যবাদী দল (মাঃ লেঃ) ভাঙ্গনের প্রধান কারণ ছিল জিয়াউর রহমানের সাথে এ দলের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতার সুসম্পর্ক। তাছাড়া জিয়াউর রহমান 'দেশপ্রেমিক' না বিশ্বাসঘাতক' এ বিতর্কও ছিল ভাঙ্গনের অন্যতম কারণ। এ বছরের শেষদিকে মুসলিম লীগের ভাঙ্গনের কারণ ছিল জিয়াউর রহমানের পক্ষে বিপক্ষে অবস্থানকে কেন্দ্র করে। এ দুটি দল ছাড়াও প্রায় এক ডজনের মত দল জিয়াউর রহমানের সাথে সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে হয় ভেঙ্গেছে অথবা বিলুপ্ত হয়েছে।[২৫] জিয়াউর রহমানের এই সর্বজনীন নীতি, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বই তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ আসনে আসীন করেছে।

১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতির এক চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে যখন এদেশের রাজনীতি কোন লক্ষ্য স্থির করতে পারছিল না, সরকারের অনুমোদনপ্রাপ্ত দলগুলো ভিতরে-বাইরে ক্রমাগত কোন্দলে ভেঙ্গে যাচ্ছিল ঠিক তখনই উদ্ভুত সঙ্কট মোকাবেলায় যুগের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নেতা হিসেবে জিয়াউর রহমানের উত্থান ঘটে এবং প্রয়োজনের অনিবার্য তাগিদে গঠিত হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। জিয়াউর রহমান সফলভাবে সে সঙ্কট মোকাবিলা করে এক নতুন সম্ভাবনার সূত্রপাত করতে সক্ষম হন বলেই তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর রাজনৈতিক দল বি.এন.পি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম দল হিসেবে আজও তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্য সুত্র ঃ

১। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, বর্ষঃ, সংখ্যাঃ৩১, ৫ জানুয়ারী, ১৯৭৮, পৃ-৩

২। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, "একটি জাতির জন্ম", *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, বর্ষঃ ৬, সংখ্যা ৪৩, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা; ১৯৭৪, পৃ-২৬-৩২।

৩। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, "জনতার একজন হিসেবে যুদ্ধ করেছি", *প্রাগুক্ত*, পৃ-৩৩-৩৬;

এমাজউদ্দীন আহমদ (সম্পাঃ), *জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ*, ঢাকা, জুন ২০০২, পৃ-১০০-১০১

৪। *The Time*, 8 June, 1981.

৫। বজলুল করিম, দেশ প্রেমিক জিয়া, ঢাকা ১৯৯১, পৃ-১৭

৬। বিস্তারিত দেখুন ঃ আহম্মেদ মুসা (সম্পাঃ), *বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা ১৯৯৪।

৭। এমাজউদ্দীন আহমদ (সম্পাঃ) *প্রাগুপ্ত*, পৃ-৪৩-৬০।

৮। Golam Hossain, *General Ziaur Rahman and the B.N.P. : Political transformation of Military regime*, Dhaka: 1988; 125.

৯। বিস্তারিত দেখুনঃ A.S.M. Sayem, *Bangadhaban-The last phase*. Dhaka; 1988, p 42.

১০। বিস্তারিত দেখুন ঃ আবু সাইয়িদ, *জেনারেল জিয়ার রাজত্ব*, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ-২৫৬-২৬৫।

১১। *বিচিত্র* বর্ষ ঃ ৬, সংখ্যা ঃ ৪৯, ৫ নভেম্বর, ১৯৭৮, পৃ-১৯।

১২। ঐ, বর্ষ ঃ ৭, সংখ্যা ঃ ৩৭, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯, পৃ-২৮-৩০।

১৩। ঐ, বর্ষ ঃ ৬, সংখ্যা ঃ ৪৯, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮, পৃ-১৯।

১৪। আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া, "বি.এন.পি ঃ উত্থান ও বিকাশের দুই যুগ", *দৈনিক দিনকাল*, ১ সেপ্টেম্বর, ২০০২, পৃ-৫।

১৫। ইফতেখার রসুল জর্জ (সম্পাঃ), *জিয়ার নৃশংস হত্যাকান্ড, আমি জিয়া বলছি*, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ-৮৭।

১৬। আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৭০।

১৭। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের শরিক দলগুলো হল জাগদল, ন্যাপ (ভাসানী), মুসলিম লীগ, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (ইউ.পি.পি), লেবার পার্টি ও তপশিলী ফেডারেশন। বিস্তারিত দেখুন, মওদুদ আহমদ, *জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের নির্বাচনী ঘোষণা পত্র ও কর্মসূচী*, ঢাকা, জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট, মে, ১৯৭৮।

১৮। গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের শরিক দলগুলো হল - আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর), জাতীয় জনতা পার্টি, পিপলস্ লীগ ও গণআজাদী লীগ। বিস্তারিত দেখুন আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ-২৯০-২৯২।

১৯। বিস্তারিত দেখুন Talukder Maniruzzaman, *Bangladesh Revolution & Its Aftermath*, Dhaka 1980, P224-225.

২০। এমাজউদ্দীন আহমদ, "জাতীয় স্বার্থ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল", *দৈনিক দিনকাল*, ১ সেপ্টেম্বর, ২০০২, পৃ-১৬।

২১। ঐ

২২। *The Bangladesh Times*, 9 November, 1981.

২৩। *বিচিত্রা*, বর্ষ ঃ ৭ সংখ্যা ঃ ৩১, ৫ জানুয়ারী, ১৯৭৯, পৃ-১২।

২৪। ঐ

২৫। ঐ, পৃ-৯।

বাংলাদেশে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সংবাদপত্রের ভূমিকা

মহম্মদ ইউসুফ আলী

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে সামরিক স্বৈরশাসন ও বেসামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল মানুষের মৌলিক অধিকার, গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র নির্মাণের ক্ষেত্রে শাসক শ্রেণীর উদাসীনতা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে অবস্থান। অর্থনৈতিক স্থবিরতা, রাষ্ট্র পরিচালনায় শাসক শ্রেণীর কল্পনা বিলাস ও অভিনবত্ব ক্রমান্বয়ে জনসাধারণকে বিক্ষুদ্ধ করে তোলে। দীর্ঘ নয় বছর নানা নিস্পেষণ অত্যাচার, বঞ্চনা ও লাঞ্চনাগ্রস্ত মানুষের ক্ষোভ ৯০ সালে এসে তেতে ওঠে, ফুলে ফেঁপে একাকার হয়ে যায়। ৯০ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত গণআন্দোলন এরশাদের পতনে নানা সম্ভাবনায় বহুমাত্রিকতা যোগ করে। ফলে তরুণ প্রজন্ম ১৯৭১-এর যুদ্ধপূর্ব আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ না দেখলেও এতে তার আস্বাদ লাভ করে। "সে কারণেই অভূতপূর্ব এ গণআন্দোলনকে নিয়ে রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী ছাত্র, শিক্ষক সংগঠনসহ দেশের সচেতন মহলে ব্যাপক আশাবাদ পরিলক্ষিত হয়"।[১] এ আশাবাদকে পূর্ণতা দেয় দেশের প্রগতিশীল সংবাদপত্র ও সাময়িকী সমূহ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব অবস্থান থেকে গণআন্দোলন সম্পর্কে তাদের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটায়। আর এ অবস্থানকে আস্থার সাথে প্রকাশ করেছে উক্ত শ্রেণীর সংবাদপত্রসমূহ।

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে ফিরে তাকাতে হয় পেছনের ঘটনা-পর্বের দিকে। ১৯৭১ সালে সশস্ত্র যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়। যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে স্বনির্ভর অর্থনীতি বিনির্মাণে বাংলাদেশের যে অগ্রযাত্রা শুরু হয় ১৯৭৫ এর মর্মান্তিক পট-পরিবর্তনের মাধ্যমে তাতে আকস্মিক ছেদ পড়ে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বার বার ক্ষমতার পালা বদল হতে থাকে। অবশেষে নানা চড়াই-উৎরাই পার হয়ে ৭ নভেম্বর ক্ষমতায় আসেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায় ১৯৮১ সালের ৩০ মে তিনিও নির্মমভাবে নিহত হন। সে সময় দেশের রাজনীতিতে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এ অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়ে এরশাদ জিয়ার শূন্য আসনে বসতে পারতেন। কিন্তু তিনি

তখনই তা করেননি। অপেক্ষা করেছেন, সময় নিয়েছেন, সচেতনভাবে লক্ষ্য করেছেন রাজনৈতিক হালচাল, শূন্যতাকে শূন্যতায় ঘুরপাক খেতে দিয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্য তাঁর ঠিকই ছিল। নিজের মূল ক্ষেত্র ঠিক রেখে আর-প্রতিষ্ঠার এবং বেসামরিক প্রসাশনের ওপর খবরদারি করার কৌশল তিনি যথার্থই আয়ত্ত করেছিলেন। অথচ "দেশের রাজনৈতিক মহলে খর্বাকৃতি মধ্যমা মেধা নেতাদের কূট কলরব এবং উন্নত ব্যক্তিত্বের অভাব সামরিক কর্তাদের প্রশাসনের ওপর খবরদারি করার সুযোগ কেটে দিতে পারেনি।"[২]

রক্তপাতহীন এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে এরশাদ ১৯৮১'র অক্টোবর লন্ডনের গার্ডিয়ান ও ১৮ অক্টোবর ঢাকার পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকার দেন। এতে প্রকাশ হয়ে পড়ে ক্ষমতার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী। নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিচ্ছিন্ন অবস্থা, পরস্পরের প্রতি অনাস্থা-সন্দেহ ইত্যাদির কারণে ও নাজুক বিষয়ে জনমত তৈরিতে রাজনীতিকরা ব্যর্থ হয়েছে সন্দেহাতীতভাবে। কিন্তু সংবাদপত্র নানা বিধিনিষেধের বেড়া-জাল উপেক্ষা করে বিভিন্নভাবে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশে উৎকৃষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। সংবাদপত্র ব্যাপকভাবে প্রকাশ করেছে এরশাদের দুর্বৃত্তায়নের পরিকল্পনা।

সংবিধানের বাধ্যবাধকতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে সেনাবাহিনী প্রধান হয়েও হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ "ঐ বছর ২৮ নভেম্বর ঢাকার সংবাদপত্র সম্পাদকদের সাথে সরকারিভাবে সেনাবাহিনী প্রধানের জন্য বরাদ্দকৃত বাসভবনে মিলিত হয়ে তিনি ঐ বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করার নামে পুনর্বার এই ইঙ্গিত দেন যে তিনি ইচ্ছে করলে প্রচলিত ধারাকে অবজ্ঞা করতে পারেন"।[৩]

তাঁর মতে "সামরিক লোকজন রাজনীতিতে সামরিক অ্যাডভেঞ্চার কামনা করে না। কিংবা সশস্ত্র বাহিনীতে তারা রাজনৈতিক অ্যাডভেঞ্চার চায় না। তারা কেবল গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় জনগণকে সাহায্য করতে এবং যে-কোন ভবিষ্যৎ অভ্যুত্থান অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ভারসাম্য বজায় রাখতে চায়। ..."

প্রশাসনকে নীতিগত নির্দেশ দেয়ার জন্য তিনি সামরিক রাজনীতিকে ভিন্ন আঙ্গিকে ব্যবহার এবং এর জন্যে সাংবিধানিক ধারা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা রাখার কথা বলেন। একই সঙ্গে তিনি জানান যে "তিনি একজন সৈনিক, রাজনীতিবিদ নন এবং তাঁর কোনো ব্যক্তিগত উচ্চভিলাষ নেই।"

"রাজনৈতিক-সামরিক হঠকারিতা জওয়ানদের কাম্য নয় এবং সামরিক বাহিনীতেও তারা রাজনৈতিক হঠকারিতা চায় না। তারা শুধু জনগণের সঙ্গে থেকে গণতন্ত্র গড়ে তোলার সাহায্য করতে চান; যে-কোন ভবিষ্যত অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ ও ভারসাম্য গড়ে তোলায় সাহায্য করতে চান" বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

চিফ অফ স্টাফ হিসেবে তাঁর বাকি মেয়াদকালে কোন সামরিক অভ্যুত্থান হবে না,

এমন কি পাঁচ বৎসর পরে কিংবা দশ বছর পরে কিংবা আর কখনোই সামরিক অভ্যুত্থান ও হত্যাকান্ড রোধ করার ব্যাপারে তিনি নিশ্চয়তা দেন। তিনি বলেন, এই লক্ষ্যে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকাকে এখন বিস্তৃতভাবে বিচার করা যাক। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর মত নয়, এই বাহিনী জনগণের পাশে থেকে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছে। তাই আমাদের জনগণ এবং সামরিক বাহিনীর সম্পর্ক নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ঔপনিবেশিক সশস্ত্র বাহিনী নয়, বরং তা সত্যিকার অর্থে জনগণের সশস্ত্র বাহিনী। গত দশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে সমাজের ঘটনাবলীর আবর্ত থেকে আমাদের সৈনিকদের দূরে রাখতে কেউ সফল হয়নি। তা করা সম্ভব নয়। ...

আমাদের মত একটি গরিব দেশে এমন চমৎকার বাহিনীর শক্তিকে দেশরক্ষার ভূমিকা পালন ছাড়াও উৎপাদনমূলক এবং জাতিগঠনে ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগানো সম্ভব। মরহুম প্রেসিডেন্ট আমাদেরকে এই চমৎকার মতবাদটি দিয়েছেন। তাঁর এই মতবাদের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত এবং সেটাকে এগিয়ে নিতে ইচ্ছুক। এই মতবাদের কথা হলো সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার ক্ষেত্রে প্রচলিত পশ্চিমী ধ্যান-ধারণা থেকে আমাদের দূরে সরে থাকতে হবে। জাতি গঠন এবং দেশ রক্ষা — এই দুই ভূমিকাকে সার্বিক জাতীয় প্রতিরক্ষার একটি মাত্র ধারণায় একীভূত করতে হবে। ... এই করে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত না করে আমরা জাতীয় প্রতিরক্ষায় সামগ্রিক জাতীয় উদ্যোগ গড়ে তুলতে সক্ষম হব। সামরিক লোকেরা বেসামরিক চাকুরীগুলো নিয়ে নিচ্ছে — এই ধরণের কথাবার্তা তাই নিতান্তই বাজে। জাতীয় সামরিক বাহিনী এই মতবাদ অনুযায়ী যেহেতু শারীরিক দিক দিয়ে সক্ষম অধিকাংশ মানুষই সৈনিক হয়ে উঠবেন তাই সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না কিংবা থাকলেও তা হবে খুবই তুচ্ছ। ...

সেনাবাহিনী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ না করার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে অদূর ভবিষ্যতে যে কোন হঠকারীর পক্ষেই তা লঙ্ঘন করা সর্বদাই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আমি যা বলেছি এবং যেটা আন্তরিকভাবে মনে করি তা হচ্ছে সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করা এবং সামরিক অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডের বন্ধ করা জাতির প্রয়োজন। সে জন্যই জনগণের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার প্রেক্ষাপটে আমাদের অফিসার ও জওয়ানদের সমস্যা ও অসুবিধাগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে। এটাকেই আমি বলছি রাজনৈতিক সামরিক সমস্যা। ... সমস্যাটা হচ্ছে এতো দিন যাবৎ আমরা সামরিক বাহিনীর সমস্যাকে বিচারের মধ্যেই গ্রহণ করিনি এবং সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করিনি। বস্তুতপক্ষে বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থায় তা করা সম্ভব নয়। সমস্যাটি চিহ্নিত করে আমি প্রস্তাব দিয়েছি যে এটাকে একটা গভীর সমস্যা হিসেবে মেনে নিতে

হবে এবং সমস্যা সমাধানের জন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রেসিডেন্ট জিয়া বলতেন, আমাদের গণতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে। নিছক কথার তুবড়িতে শুধু গণতন্ত্রের খোলসই তৈরি হয়। ৩৩ বছর ধরে কথার তুবড়ি ফাটিয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়নি। আমাদের সত্যি সত্যিই এদেশে গণতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে''।[৪] ... তাঁর এ সাংবাদিক সম্মেলনের পর রাজনৈতিক বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে কোনো কোনো রাজনীতিকের পদস্খলন ঘটে এবং তাঁকে মহামনীষীদের সমতায় উপস্থাপন করেন। কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ (হা) প্রধান. শেখ হাসিনা ওয়াজেদ এ প্রসংগে বিবিসিকে দেয় এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ''১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট হইতে এই অবধি ক্ষমতা দখলের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হইয়াছে। কাজেই সেনাবাহিনীর এখন ক্ষমতার ভাগাভাগির দাবি খুবই স্বাভাবিক। তিনি বলেন, রাজনীতিতে সেনা বাহিনীর প্রবেশ কোনো গণতান্ত্রিক দেশের জন্যই কাম্য হইতে পারে না''।[৫]

কোনো কোনো রাজনীতিকের উচ্চাভিলাষী উচ্চারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নস্যাৎ করে লেঃ জেঃ হুসাইন মুহম্মদ এরশাদকে ক্ষমতা দখলে প্রলুব্ধ করেছিল। এ কথা নির্দ্ধিধায় বলা যায়। ক্ষমতা গ্রহণেরপূর্বে অবশ্য তিনি নিজের অবস্থানকে সুসংহত করেন এবং এর জন্য উপযুক্ত ভূমি তৈরি করেন, যদিও প্রগতিশীল রাজনীতিকরা তাঁর কূটকৌশল অনুধাবন করতে''[৬] ব্যর্থ হয়েছেন। সে সময় রাজনীতিদের মধ্যে আত্ম কেন্দ্রিকতা ও অহংমনোবৃত্তি এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে ''বিরোধী দলগুলো মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পারস্পরিক বিরোধিতায় লিপ্ত থাকে''।[৭] এ অবস্থায় ''সাধারণ মানুষের চোখে রাজনীতিকরা হয়ে ওঠেন বীত-গরিমা ও হৃতমান। রাজনৈতিক ভিত্তিভূমির অস্থিরতা ও রাজনীতিকদের প্রতি জনসাধারণের এ অনাস্থার সুযোগ তিনি পুরোপুরিই গ্রহণ করেন''।[৮] সুযোগ বুঝে ১৯৮২ সনের ২৪ মার্চ একটি নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ক্ষমতার সর্বোচ্চ রজ্জুতে নিজেকে বেঁধে নেন। রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় এলেন বটে কিন্তু তা নিষ্কন্টক করার মানসে তাঁকে প্রচুর রক্ত ঝরাতে হয়েছে। ৯০ সালে তাঁর ক্ষমতাচ্যুতির পূর্ব পর্যন্ত বহুবার আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলেও তা সম্ভাবনা জাগাতে ব্যর্থ হয়েছে রাজনীতিকদের স্বার্থবুদ্ধি-তাড়িত কর্মসূচির কারণে। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেই রাজনীতির উপর আরোপ করেন নানা বিধি নিষেধ। ফলে যে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গন মুখরিত থাকত রাজনীতির কোলাহলে তা নীরব হয়ে যায়। পত্রিকার শিরোনাম হয় ''বায়তুল মোকাররম এখন নীরব''।[৯] সংবাদপত্রের উপর প্রতিষ্ঠা করা হয় সরকারি নিয়ন্ত্রণ।

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯৮২ সালে। এরপর নানা চড়াই উৎরাইয়ের ভেতর আন্দোলন শিশু অবস্থা অতিক্রম করে। সূচনাতে ''বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের

একটি পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজনৈতিক মহলে পেশ করেন। তিনি এটি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন নেতাদের কাছেও পৌঁছে দেন এবং বৃহত্তর ছাত্র ঐক্যের জন্যে তাদের উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দেন"।[১০] সে অনুযায়ী ছাত্র নেতৃবৃন্দ প্রস্তুতি নেন এবং ১৯৮২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবসে শহীদ মিনারে নীরবে ফুল দিতে যান। কিন্তু পুলিশী বাধার কারণে তাঁরা পিছু হটেন এবং জগন্নাথ হলে শহীদ বেদীতে পুষ্প অর্পণ করেন। ১৯৮৩ সালের ২৭ অক্টোবর "সংবাদপত্রের উপর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার এবং সকল মত প্রকাশের দাবিতে সাংবাদিক সমাজ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের আহবানে সারাদেশে প্রতিবাদ দিবস পালন করে"।[১১] এরশাদ সরকারের স্বৈরাচারী চরিত্র আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৯৮৪-তে। সে সময় আওয়ামীলীগের নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট এবং জামাতের যুগপথ গণআন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এ আন্দোলনের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের ওপর সরকার নিষেধাজ্ঞা জারী করে। সাংবাদিক সমাজ এতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। "সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা কেন্দ্রীয় সংগ্রাম কমিটি .... বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞাকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকারের উপর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বলিয়া নিন্দা করে।"[১২]

এরপর আন্দোলনের সুত্রপাত হয় মজিদ খানের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে। এ আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে এরশাদ অবশেষে শিক্ষানীতি নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু আন্দোলন থমকে যায়নি। ছাত্র-জনতা ১৯৮৬, ৮৭ ও ৮৮ সালে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আন্দোলন চালিয়ে নেয়। ৮৭ সালের আন্দোলনে "বিবিসির ঢাকা সংবাদদাতা আতাউস সামাদকে গ্রেফতার করা হয়। বিবিসির পক্ষে ঢাকায় আগত ফিলিপ জোন্স তথ্যমন্ত্রী আনোয়ার জাহিদের সাথে দেখা করে এর প্রতিবাদ জানান"।[১৩] ১৯৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলের এক জনসভার জনতার জোয়ার দেখে এরশাদ ভীত-সন্ত্রস্ত্ হয়ে পড়েন এবং তার অনুগত পুলিশ বাহিনী চট্টগ্রামে জনতার মিছিলে গুলি চালায়। মিছিলের অগ্রভাগে থাকা শেখ হাসিনা অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন, কিন্তু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ১৯টি তাজা প্রাণ। এর পূর্বেও হত্যা করা হয় অসংখ্য ছাত্র-জনতাকে। বিরোধী দলগুলোর পক্ষে অবস্থান গ্রহণ ও আন্দোলনের তীব্রতা সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশনের দায়ে সরকার দৈনিক খবরের প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। দেশ-বিদেশের সংবাদ সংস্থাসহ সংবাদপত্রসমূহকে আটকানো হয় আরো কঠোর বেড়াজালে, সংবাদপত্রের উপর চালানো হয় অযাচিত হস্তক্ষেপ। এত সাংবাদিকরা আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সাংবাদিকদের সংগঠন "বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন সরকারের সংবাদপত্র দমননীতির প্রতিবাদে .... ৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৮৮) সকল সরকারি অনুষ্ঠান বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়"।[১৪]

হাতে রক্তের দাগ নিয়ে এরশাদ এগুতে থাকেন। "ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা করে, সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে ১১ মার্চ জাতীয় সংসদে একটি বিল উত্থাপিত হয়"।[১৫] এই সংবাদ শুনে প্রগতিশীল রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক কর্মী মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন পেশাজীবী ও ছাত্ররা রুদ্ররোষে ফেটে পড়েন এবং ঢাকা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। নানা জটিল আবর্তে এ আন্দোলন বেশীদূর এগোয়নি। সংবাদপত্র সমূহ বিভিন্ন কৌশলে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে পরামর্শ প্রদান ও আন্দোলনের খবর ছাপানোর ব্যবস্থা করে। ফলে সরকার প্রগতিশীল পত্রিকা সমূহে নিউজপ্রিন্ট ও বিজ্ঞাপনের কোটা কমিয়ে দেয়। সংবাদ পরিবেশনের ওপর আরোপ করা হয় আরো কঠোর সেন্সর। ধ্বংস করা হয় গণতান্ত্রিক অধিকার ও বাক স্বাধীনতা। উস্কে দেয়া হয় সাম্প্রদায়িক বিভেদ। জাতির চেয়ে সাম্প্রদায়িক পরিচয়ই বড় করে তোলা হয়। ফলে এরশাদ শাসনামলের শেষ পর্যায়ে তাঁর গোপন চক্রান্তে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এসব দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর ও সংবাদপত্রে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়।

১৯৯০ সালের ৪ জানুয়ারি চতুর্থ জাতীয় সংসদের পঞ্চম অধিবেশনেও রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি দীর্ঘ ভাষণ দেন। এই নিরিখে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা উপ-সম্পাদকীয় লেখে - "রাষ্ট্রপতি এরশাদ উজ্জ্বলতার নতুন দিনের অভিযাত্রী হিসেবে গোষ্ঠী ও দলীয় স্বার্থ ভুলে গিয়ে সকলকে জাতীয় ঐক্যের এক মিছিলে শামিল হওয়ার আহবান জানিয়েছেন।"

"কথাগুলো ভাল। কথাগুলো সত্য। জাতীয় উন্নয়নের জন্যে জাতীয় ঐক্য প্রয়োজন ....। কিন্তু কথা কথাই। কথা ও কাজের সমন্বয় যদি না হয় তাহলে কথার কোনো মূল্য নেই। ভালো কথা ও সুন্দর কথা কার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে, কে বলছেন সেটাও গুরুত্বপূর্ণ।

যারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে মেনে নিতে পারে না, যারা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তিকে মদত দিয়ে সমাজে ভেদাভেদ বাড়িয়ে তুলেছে, তারা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা জাতীয় ঐক্যকে নষ্ট করার জন্যেই সংবিধানকে কাটা ছেঁড়া করে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ উস্কে দিচ্ছে, জাতি পরিচয়ের চেয়ে যারা ধর্ম সম্প্রদায়ের পরিচয়কে প্রতিনিয়ত উস্কাচ্ছে তাদের মুখে জাতীয় ঐক্যের কথা শোভা পায় না ....।"

"গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কে ধ্বংস করেছে? কে ভোটাভুটিকে প্রহসনে পরিণত করেছে। .... কে জরুরি অবস্থা জারি করে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ রেখে গণভোট ও উপজেলা নির্বাচন করেছে? গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের কথা কার মুখে শোভা পায়?

তিনি একদিকে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন বিষয়ে ঐক্যমতে উপনীত হওয়ার

আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন, বিরোধী দলের সহযোগিতা কামনা করেছেন, আর একই নিঃশ্বাসে ৪র্থ জাতীয় সংসদই প্রশংসা করেছেন তাতো হয় না। এই সংসদই যদি তাঁর কাছে আদর্শ স্থানীয় হয় তবে তাঁর পুরো বক্তৃতাটাই বাগাড়ম্বর মাত্র। তাঁর সকল কথাই মিথ্যা হয়ে যায়।

বিগত কয়েক বছর পদত্যাগের আন্দোলন করে বিরোধী নেতারা সফল হয়নি। গণতন্ত্রের অভাবে দেশবাসী সর্বস্তরে পেশি শক্তির দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন। এরশাদ ক্ষমতা দখল করেছেন, তিনি পদত্যাগ করবেন না। বাঘের পিঠে চড়লে কেউ নামতে পারে না"।[১৬]

১৯৯০ এর প্রথমার্ধে সরকার বিরোধী আন্দোলন তেমন জমে উঠেনি। তবে আন্দোলনের প্রবাহমানতায় গতি সঞ্চার হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রদল থেকে বহিষ্কৃতদের সাথে সাধারণ ছাত্রদের বন্দুক যুদ্ধে। ছাত্র সংগঠন সমূহের জোট ছাত্রঐক্য ক্রমে আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়। তাদের বিভিন্ন কর্মসূচি আন্দোলনকে পরিণতির দিকে নিয়ে যায় এবং আন্দোলন ক্রমশ গণভিত্তি লাভ করে। এ ভিত্তি আরো দৃঢ় হয়, আন্দোলন স্ফুলিঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়ে ২৬ ও ২৭ নভেম্বর। সরকার সমর্থক অস্ত্রধারীদের গুলিতে একজন নিরীহ যুবক নিমাই ও ডা: শামসুল আলম খান মিলন নিহত হলে মানুষের রুদ্ররোষ দেখে ঐ দিন সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মিছিল সমাবেশের স্বাধীনতাসহ সংবিধানে স্বীকৃত এইসব মৌলিক অধিকার শুধু স্থগিত করা হয়নি বরং এই মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য হাইকোর্টে কোন মামলা রজু করা যাবে না এবং মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন সম্বলিত কোন বিচারাধীন মামলায় বিচারনুষ্ঠান স্থগিত রাখার নির্দেশ জারি করে। কিন্তু কারফিউ ও জরুরি অবস্থার মধ্যেও মানুষের প্রাণের আকুতি সবকিছু ছাপিয়ে যায়। রাজপথে সৃষ্টি হয় গণজোয়ার। জরুরি অবস্থা জারি করা হলে পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দেয়া হবে বলে এর পূর্বেই সাংবাদিক ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল। জরুরি অবস্থা জারির সাথে সাথে সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

"সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিবের দায়িত্ব ছিল খবরের কাগজ, সাময়িকী ও বার্তা সংস্থার প্রতিবেদন সেন্সর করা। প্রকাশের লক্ষ্যে রচিত সবরকম খবর ও মতামত সেন্সর কর্তৃপক্ষকে দেখানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। যেহেতু তখন জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে দেশের কোন সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশিত হচ্ছিল না, কাজেই সেন্সর কর্তৃপক্ষ একমাত্র বার্তা সংস্থাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন।

বার্তা সংস্থা থেকে সেন্সরের জন্যে প্রদত্ত খবরের বারো আনাই সেন্সর কর্তৃপক্ষ বাদ দিয়ে দেয়। এপির একটি রিপোর্টের সঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্য জুড়ে দিয়ে বলা হয়-আমাদের চৌদ্দ প্যারা খবরের দশ প্যারাই সেন্সর কর্তৃপক্ষ বাদ দিয়েছে"।[১৭]

সে সময় সংবাদপত্র কর্মীরা গোপনে প্রকাশ করেন সরকার বিরোধী বুলেটিন। মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি উচ্চকিত হয়। বলা হয় "আমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ আমাদের গতি নিয়ন্ত্রিত। আমাদের হাত বাঁধা। আমাদের কথা বলতে দিন। আমরা কথা বলতে চাই। আমরা সত্য কথা নির্বিঘ্নে লিখতে চাই। নিরপেক্ষভাবে পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে চাই। কোন কোন্দল নয়, কোন মত নয় — দেশের মানুষ যা চায় তাই লিখতে চাই। আমাদের লিখতে দিন"।[১৮]

সরকার সংবাদপত্র পরিষদ ও সম্পাদক সমিতিকে ডেকে পত্রিকা প্রকাশের অনুরোধ করলে অধিকাংশ মালিক ও সম্পাদক (দালাল মালিক ও সম্পাদক ছাড়া) অপারগতা প্রকাশ করেন।

"কয়েক সপ্তাহ ধরেই মিছিল ও বিক্ষোভে ঢাকা নগর পরিণত হচ্ছিল জনসমুদ্রে। আর তা স্পষ্টভাবে রূপ নিচ্ছিল গণঅভ্যুত্থানে এই উত্থানের কেন্দ্র ছিল জাতীয় প্রেস ক্লাব। জরুরি আইন জারির পর প্রতিদিন প্রেস ক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিক্ষোভ ও জনসভা। জরুরি আইন ও কার্ফ্যু লংঘন করে মৌন মিছিল বের করেছিলেন মহিলারা। পুলিশ মহিলাদের উপর লাঠিচার্জ করলে সাংবাদিকরা তা প্রতিরোধ করে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের মিছিলে প্রেসক্লাব প্রাঙ্গন গণসমুদ্রে রূপ নেয়"।[১৯] এমন অবস্থায় "সাংবাদিকরা তাদের দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন নীরব বিদ্রোহের মাধ্যমে"।[২০] এরশাদ অবশ্য সাংবাদিকদের ঐক্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করে এবং পত্র-পত্রিকার ওপর আরোপিত সেন্সর প্রথা তুলে নেবার ভাঁওতা দেয়। কিন্তু সরকার তাতে সফল হতে পারেনি। ফলে দৈনিক সাপ্তাহিক সব ধরণের সংবাদপত্র বন্ধ থাকে। সংবাদপত্র তার লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত আদর্শ বিচ্যুত না হয়ে যে উদাহরণ স্থাপন করেছে তা বিরল দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলাদেশের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে। অপরদিকে সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সাংবাদিকদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আন্দোলন সরকারকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে দাঁড় করাতে পেরেছিল বলেই জনতা স্বৈরাচার হটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অকুণ্ঠ চিত্তে প্রাণের সকল বিত্ত ঢেলে পেরেছিল। কেননা গণতন্ত্রহীন সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা ভুলুণ্ঠিত, আর সংবাদপত্রের অধিকার হয় ক্ষুণ্ণ। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ দুটো খুবই গুরুত্ববহ। "আইনের শাসন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারই সুফল এবং সংবাদপত্র গণতান্ত্রিক অধিকারের সনদপত্র"।[২১]

তাই গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন বাস্তবায়নের জন্যে সংবাদপত্রের স্বাধীন ভুমিকা অপরিহার্য। ... "যেহেতু গণতন্ত্রের সাথে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তাই যখনই গণতন্ত্রের উপর আঘাত আসে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের অধিকার থাকতে পারেনা। রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় চরিত্র সংবাদপত্রকে সবচেয়ে বেশি

প্রভাবান্বিত করে বলে আমাদের দেশে যখনই অসাংবিধানিক পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে তখন সংবাদপত্রের উপর আঘাত এসেছে"।[২২] এর প্রকৃত প্রমাণ এরশাদ শাসনের নয় বছরে বার বার প্রত্যক্ষ করেছে বাংলাদেশের মানুষ। সংবাদপত্রে আন্দোলন সংক্রান্ত খবর প্রকাশের উপর নানা বিধি নিষেধ আরোপ করা হলেও পত্রিকাসমূহ থেমে থাকেনি। কৌশলের আশ্রয় নিয়ে তুলে ধরে আন্দোলনের নানা গতি প্রকৃতি, বিস্তৃত প্রেক্ষাপট, নানা ব্যাপ্তি ও বহুমুখীন ঘটনার সামগ্রিক চিত্র ও অবয়ব। মানুষ যেখানে চেতনচিত্ত, সেখানে খুলে যায় চোখ, প্রসারিত হয় দৃষ্টির পরিধি, সেখানে বাধা-বন্ধ খুবই গৌণ। এ গৌণতা জ্ঞান জাগ্রত করে উষালগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সংবাদপত্র এ ভূমিকা পালন করে আসছে।

সূত্রনির্দেশ

১। ড. মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী—পটভূমি, অ্যালবাম গণআন্দোলন (৮২-৯০) সম্পাদনা - ইউসুফ মুহম্মদ।

২। অরুণ বাগচী, সামরিক বাহিনী ও জনগণের আশীর্বাদ, দেশ, ৬ আগস্ট, ১৯৮৬।

৩। আলী রিয়াজ, গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি ঃ কয়েকটি আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কারণ, ''গণঅভ্যুত্থান'৯০ বজ্রে চেরা আঁধার আমার,'' সম্পাদনা, আলী রিয়াজ ও জিল্লুর রহমান, পৃষ্ঠা-৩

৪। ইউসুফ মুহম্মদ, সম্পাদকীয়, অ্যালবাম গণআন্দোলন (৮২-৯৮)।

৫। পূর্বোক্ত,

৬। পূর্বোক্ত,

৭। পূর্বোক্ত,

৮। পূর্বোক্ত,

৯। দৈনিক দেশ, ১৪ এপ্রিল, ১৯৮২।

১০। মোহম্মদ খোশবু, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, (এরশাদের সময়কাল) পৃষ্ঠা - ৭,৮।

১১। দৈনিক বাংলা, ২৮ নভেম্বর, ১৯৮৩।

১১। দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ অক্টোবর, ১৯৮৪।

১৩। মোহাম্মদ খোশবু, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, (এরশাদের সময়কাল) পৃষ্ঠা-৭৭।

১৪। দৈনিক ইত্তেফাক, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮।

১৫। মোহম্মদ খোশবু, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (এরশাদের সময়কাল) পৃষ্ঠা ৯০।

১৬। সাপ্তাহিক একতা, ১২ জানুয়ারি, ১৯৯০।

১৭। মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত এরশাদের পতন বিবিসিসহ বিদেশী গণমাধ্যমের দৃষ্টিতে।

১৮। সম্পাদকীয়, বিদ্রোহ আজ বিপ্লব চারিদিকে, আন্দোলনরত সাংবাদিকদের বুলেটিন।

১৯। সরকার পতনের আন্দোলনে সাংবাদিকদের ভূমিকা, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯০।

২০। পূর্বোক্ত।

২১। ইকবাল সোবহান চৌধুরী, আইনের শাসন, গণতন্ত্র ও সংবাদপত্রের ভূমিকা, বার্তাজীবী (সিইউজের মুখপত্র), পৃষ্ঠা-৩১,৩২।

২২। পূর্বোক্ত।

বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চায় বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর

মোঃ আতাউর রহমান

ভূমিকা ঃ

বরেন্দ্র অঞ্চল ভারত উপমহাদেশের উত্তর কোণে অবস্থিত। বর্তমানে এটি বাংলাদেশের উত্তরপ্রান্তে বরেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত।[১] এই প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ স্থানের কিংবদন্তী গল্পগাথা, সংগীত, শিল্প সংস্কৃতির আলোচনায় মনে হয় বরেন্দ্রগণই এই কৃষ্টি (Culture) -র ধারক ও বাহক। এ ধারার উৎস কোথায়, কবে শুরু হয়েছিল তা কেউই সঠিকভাবে বলতে পারেনি। তবে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন বরেন্দ্র ভূমির মানব বসতির ইতিহাস প্রায় তিন হাজার বৎসরের। আর্যদের আর্বিভাবের পূর্বে এখানে মানব বসতি ছিল।[২] আর ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন, সংস্কৃতি ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের বহু প্রামাণ্য তথ্য ছড়িয়ে আছে এ বরেন্দ্রভূমিতে। তাই এই অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণসমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন এবং গবেষণার মহতী উদ্দেশ্যে ১৯১০ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর কিছু আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তির নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গের অন্যতম শহর রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত হলো Varendra Research Society বা "বরেন্দ্র অনুন্ধান সমিতি",[৩] যেটা পরবর্তীতে "বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর।"

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই সময় রাজশাহীতে সমাবেশ ঘটেছিল অসাধারণ দুই ব্যক্তিত্বের—দীঘাপতিয়ার রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, রায় বাহাদুর এম. এ. (পরে এফ. আর, এ. এস.; এম. এল. সি.) এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি. এল. (পরে সি. আই. ই.) তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন স্কুল শিক্ষক রমাপ্রসাদ চন্দ (পরবর্তী জীবনে লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; সুপারিন্টেন্ডেন্ট, আর্কিওলজিক্যাল সেকশন, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম; (এফ. আর. এ. এস. বি.; রায় বাহাদুর)।[৪] এই সমিতির সভাপতি কুমার শরৎ কুমার; পরিচালক, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং রমাপ্রসাদ চন্দ সম্পাদক মনোনীত হন।[৫] এর পর ১৯১৬ সালে লর্ড কারমাইকেল কর্তৃক বর্তমানে মূল ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় এবং ১৯১৯ সালে লর্ড রোনাল্ডসে কর্তৃক মিউজিয়ামের দ্বারোদঘাটিত হয়।[৬] ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর জাদুঘরের অবস্থা অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক দিয়ে শোচনীয় হয়ে পড়ে।[৭] ১৯৬৪ সালে ১০ই অক্টোবর জাদুঘরের ক্রান্তিকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এর দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে।[৮]

জাদুঘরের নাম কেন বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর ঃ

বরেন্দ্র অঞ্চলের বা উত্তরাজনপদ বহু প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি।[৯] ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের কথায় "বরেন্দ্রভূমি প্রাচীন ভূমি বলিয়া বরেন্দ্রভূমি, দেবমাতৃকা' বলিয়া, (মহানন্দার পূর্বতীর হইতে করতোয়ার পশ্চিম তীর পর্যন্ত) নানা স্থানে এখনও অনেক রাজদুর্গের অনেক রাজভবনের, অনেক দেবদেবীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু বিস্ময় বিজড়িত ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।[১০] প্রাচীন কালের অনেক জনপদ নিয়ে বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর এই দেশ গঠিত। এর উত্তরাংশে ছিল গৌড়, পুন্ড্র ও বরেন্দ্র — যেখানে বিপুল পরিমাণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে পরিপূর্ণ।[১১] তন্মধ্যে বরেন্দ্র হচ্ছে গৌড়দেশান্তর্গত প্রসিদ্ধ জনপদ।[১২] জনপদ হিসেবে বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রীয় প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় দশম শতকে, প্রসিদ্ধ কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'রামচরিতম' কাব্যের কবি প্রশস্তি অধ্যায়ে এবং গয়ারতুঙ্গদেবের তালচের পট্টোলীতে। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রকে পালরাজাদের জনকভূ অর্থাৎ পিতৃভুমি বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নির্দেশ করেছেন।[১৩] উত্তরবঙ্গ অতি প্রাচীন দেশ।[১৪] প্রকৃত পক্ষে এই উত্তরবঙ্গের প্রাচীন নামই বরেন্দ্রভূমি। এটি কোন রাজনৈতিক রাষ্ট্রের নাম নহে। আর এ অঞ্চলের অধিবাসীকে বলা হত বরেন্দ্র।[১৫] যেহেতু এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান হতে বিভিন্ন উপাদান (ভাস্কর্য, শিলালিপি, পান্ডুলিপি, পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত ইট ও ফলক, পুরাকীর্তি, নানাবিধ প্রত্নতত্ত্ব নৃতত্ত্ব প্রভৃতি) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে তা জাদুঘরে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেহেতু এ অঞ্চলের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য এই জাদুঘরটির নামকরণ হয়েছে "বরেন্দ্র জাদুঘর" এবং এর শুরু থেকেই এখানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশেষ করে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি ইত্যাদির গবেষণা চলে আসছে।[১৬] কুমার শরৎকুমার রায় ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র নেতৃত্বে বরেন্দ্র তথা বাংলার প্রত্নতত্ত্ব তথা ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার প্রবর্তন হলো। অর্থাৎ বাংলার ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হবে তার প্রত্নক্ষেত্রগুলিতে সেখানেই লুকিয়ে আছে তার অজ্ঞাত ইতিহাস এবং সত্যিই ১৯১০ সালের পর থেকে এই প্রত্নক্ষেত্রগুলির গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছে অনেক ইতিহাস।[১৭]

বরেন্দ্র জাদুঘরের সংগ্রহ ও তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

প্রায় শত বৎসরের পুরনো বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের সংগৃহীত উপকরণগুলিকে কয়েকটি শ্রেণী, বিভাগ ও কয়েকটি যুগে বিভক্ত করা হয়েছে। যুগ হিসেবে সংগ্রহগুলিকে প্রধানত প্রাগার্য সভ্যতার আমল থেকে আর্য ও আর্যোত্তর যুগের সব সভ্যতার এবং বুদ্ধদের আবির্ভাবের সময় থেকে মৌর্য, গুপ্ত, মৎস্যন্যায়, পাল, সেন ও মুসলমানী আমল এবং পরিশেষে ব্রিটিশ আমলেও কত প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন ও ঐতিহাসিক গবেষণার অজস্র উপকরণ এই মিউজিয়ামের সংগ্রহে রয়েছে।

শ্রেণীভাগ হিসেবে সংগ্রহগুলিকে মোট সতের ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণীর উপকরণের মোটামুটি নাম, প্রকার ও সংখ্যার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হলো- শুরু থেকে এ যাবৎ বরেন্দ্র গবেষণা যাদুঘরে সংগৃহীত প্রাচীন নিদর্শন (Antiquities) এর সংখ্যা প্রায় ৮৫০০টি।[১৮] এর মধ্যে রয়েছে—

১। প্রাচীন ভাস্কর্য বা প্রস্তরমূর্তি ঃ উল্লেখ্য যে, পূর্বভারতে যে দুটি স্থানে ভাস্কর্য শিল্পের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, তার একটি মগধ অপরটি বরেন্দ্র নামে পরিচিত বাংলাদেশের প্রাচীন এক জনপদ। পূর্ব শিল্পধারার অন্যতম কেন্দ্রস্থল বরেন্দ্রভুমির ভৌগলিক সীমার মধ্যে আবিষ্কৃত কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রাক-পাল সময় কালে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ এবং গুপ্ত আমলেও এখানে ধ্রূপদী শিল্পকলার চর্চা হতো। গুপ্ত আমলে বাংলা যে আমলাতন্ত্রের দ্বারা শাসিত হত, তার প্রমাণই হলো সমসাময়িককালে পাওয়া ভাস্কর্যের নিদর্শন।[১৯] এই জাদুঘরে রয়েছে পাথরের মূর্তি ও ভাস্কর্য সংখ্যা ১২০৩টি। এর মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু ধর্মের পূজিত বিভিন্ন দেব-দেবী ও তাদের বিভিন্ন অবতারের মূর্তি।

২। তাম্র শাসন (Copper plate) ঃ ২টি, তাম্রপটে ভূমি শাসন সংক্রান্ত দলিল।

৩। কাঠের মূর্তি ঃ ১৫টি, কাঠের মূর্তির মধ্যে হিন্দুদেব-দেবীর মূর্তির প্রাধান্য বেশী।

৪। ধাতব মূর্তি ঃ ১৩০ টি, এর মধ্যে রয়েছে হিন্দু ও বৌদ্ধ মূর্তি।

৫। শিলালিপি ঃ ৪০টি, এই শিলালিপির মধ্যে রয়েছে ইসলামী স্থাপত্যকলার নিদর্শনযুক্ত আরবী-ফার্সী শিলালিপি এবং সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় লিখিত কিছু শিলালিপি।

৬। ধাতব কামান ঃ ৪টি, এর ২টি ফার্সী লিপিযুক্ত শেরশাহের কামান। বাকি দুটির সনাক্তকরণ সম্ভব হয়নি।

৭। অলংকরণযুক্ত পোড়ামাটির ইট ও পোড়ামাটির ফলক ঃ ১০৭৩টি। এর মধ্যে রয়েছে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম আমলের ইট ও ফলক। বৌদ্ধ, হিন্দু ফলকের মধ্যে দেব-দেবী ও জনজীবনের চিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে, মুসলিম আমলের ইট ও ফলকে সাধারণত জ্যামিতিক ও লতাপাতা-ফুল মোটিফ যুক্ত।

৮। প্রাচীন ব্রোঞ্জ মূর্তি ঃ ১৩০টি, এর মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু মূর্তি উল্লেখযোগ্য।

৯। প্রাচীন মুদ্রা ঃ ৪৬৬৫টি, এর মধ্যে বিভিন্ন আমলের ৩৪টি স্বর্ণ, ৩৩৪৯টি রৌপ্য, ১২৩৩টি তামা, মিশ্র ধাতুর ১৫৮টি মুদ্রা রয়েছে (মৌর্য আমল থেকে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত)।

১০। চকচকে বা কাঁচ বসানো টাইলস্ ঃ ২৯টি, এর মধ্যে বেশীর ভাগই সুলতানী আমলের লতাপাতা ও জ্যামিতিক মোটিফযুক্ত ফলক রয়েছে।

১১। ধর্মীয়কাজে ব্যবহৃত উপকরণ (ধাতব) ঃ ১০১টি। এর বেশীর ভাগই বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম আমলের।

১২। অলংকার ঃ ১২৯ টি। এর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের অলংকার রয়েছে। যেমন-হাসুলি, কোমরবিছা, চন্দ্রহার, খাড়ু, অনন্ত, চুড়ি, কানবালা, মল, বাজুবন্দ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৩। পুঁথি ঃ সংস্কৃত-৩৪৩৮ খানা, বাংলা-১২০০ খানা। পুঁথিগুলি বেশীর ভাগই তালপাতায় লিখিত। তবে বাংলা পুঁথিগুলির মধ্যে বেশীর ভাগই তুলট কাগজে লিখিত।

১৪। পোষাক পরিচ্ছদ ঃ ৪টি, এগুলি নবাবদের ব্যবহৃত পোষাক পরিচ্ছদ।

১৫। চিনামাটির পাত্র ঃ সুলতানী আমলের কয়েকখানা চিনামাটির পাত্র ছাড়াও বেশ কিছু চিনামাটির পাত্র সংগ্রহে রয়েছে। এর বেশীর ভাগই বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের।

১৬। ধাতব উপকরণ ঃ ১০১টি। এর মধ্যে রয়েছে পুষ্প থালা, ঘটি-বাটি, সের বা কাঠা, গাড়ু, বদনা, হুক্কা, কলমদানী, দোয়াত, গ্লাস এবং কিছু হিন্দু ধর্মীয় মূর্তি ইত্যাদি।

১৭। বিবিধ ঃ এছাড়া উক্ত জাদুঘরে বিভিন্ন ধরণের সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে তুলটকাগজে হাতে লেখা পবিত্র কোরআন শরীফ, হাতির দাঁতের পাতের উপর অঙ্কিত মমতাজ মহলের প্রতিকৃতি, তরবারি, ব্যবহার্য ধাতবপাত্র, পেপিরাসে অংকিত ছবি ও পবিত্র কোরআনের আয়াত, মুসলিম স্থাপত্যের ছবি, মুসলিম চিত্রকলা, রাজা বাদশাদের প্রতিকৃতি প্রভৃতি। অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে সিন্ধু সভ্যতা (C. 2500 B.C.), মহাস্থান ও পাহাড়পুর (8^{th}–12^{th} A.D.), নালন্দা, বিহার, বক্সার প্রভৃতি স্থানে পাওয়া বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ যেমন- বিভিন্ন ধরণের পোড়ামাটির খেলনা, সীল, অলংকার, বিভিন্ন তৈজসপত্র, রানী ভবানীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং মুসলিম Monuments অঙ্কিত জলরং ছবিসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রদর্শিত রয়েছে।[২০]

উপরোক্ত উপকরণগুলি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের কর্তৃপক্ষ আটটি গ্যালারীতে পরিকল্পিতভাবে সুবিন্যস্ত (Display) করে রেখেছেন সাধারণ দর্শনার্থী ও গবেষকদের সুবিধার জন্য। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী গ্রন্থাগার রয়েছে। এই গ্রন্থাগার অনেক দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, জার্নাল, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক পত্র-পত্রিকা দ্বারা সমৃদ্ধ। জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা কুমারশরৎ কুমার রায় নিজ উদ্যোগে এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তকাদি ও এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল সমূহ দান করে এই লাইব্রেরীর যাত্রা শুরু করেন। বর্তমানে উক্ত লাইব্রেরীতে প্রায় ২০ হাজার দুষ্প্রাপ্য পুস্তক (Rare books) সংগ্রহে রয়েছে। এর মধ্যে প্রত্নতত্ত্ব সার্ভে রিপোর্ট, বার্ষিক রিপোর্ট এবং Archaeological Survey of India -র স্মারক গ্রন্থাবলী, Bengal District Gazetteers, মূর্তি সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি, মুদ্রার ক্যাটালগ, বেদ, পুরাণ, মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত, Epigraphia Indiaca, Epigraphia Indo

Moslemica; South Indian inscriptions, Catalogues of various museum collections Encyclopaedia, Encyclopaedia of Art, Encylopaedia Britanica প্রভৃতি। এ ছাড়া বাংলা, ইংরেজী পুস্তকের মধ্যে রয়েছে লোকশিল্প ও সংস্কৃতি, শিল্পকলা, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস ও ধর্মীয় গ্রন্থাদি অন্যতম।[২১] উল্লেখ্য যে, প্রতি বছরই নানা বিষয়ের গবেষণামূলক পুস্তকাদি সংগৃহীত হচ্ছে এই গ্রন্থাগারে।

জাদুঘরের গবেষণা ও প্রকাশনা ঃ

জাদুঘরের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এখানে সংগৃহীত গুরুত্বপূর্ণ ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ছাড়াও যে সমস্ত উপাদানসমূহ সংরক্ষিত আছে সেগুলির উপর বিভিন্ন বিষয়ে গবেষকদের গবেষণা কাজে সহায়তা দান করে থাকে। এই জাদুঘরের শুরু থেকেই বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, লোক-সংস্কৃতি, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে দেশী বিদেশী গবেষকগণ গবেষণা করে আসছেন। প্রকাশনার ক্ষেত্রেও এই জাদুঘর প্রথম থেকে সক্রিয়। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি থেকে ১৯১২ সালে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র "গৌড়লেখ মালা"।[২২] রমাপ্রসাদ চন্দের Gaudarajmala (1912) ও ১৯১৬ সালে Indo Aryan Races প্রকাশিত হয়।[২৩] এছাড়া বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয় আটটি জার্নাল (Journal of the Varendra Research Museum) প্রকাশিত হয়। যার সর্বশেষটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে। অন্যান্য প্রকাশনার মধ্যে Inscription of Bengal, Vol. III, edited with translation and notes by Nani Gopal Majumdar (1929); Inscription of Bengal, Vol. IV, edited with translation and notes by Maulvi Shamsuddin Ahmed (1960); Kasika Vivarana Panjika (NYASA) by Jinendra Buddhi; Bhasavaratti edited with Annotations by Srish Chandra Chakravarty (1998); Dhatupradipah edited Ibid (1919); Prayascitta Prakaranam by Bhatta Bhavadeva (1927); Alamkara Kaustubha by Kavi Kamapura with an old commentary I (1926), II (1934); Ramacharitam by Sandhyakaranandi (1939); Paribhasavritti, Jnapakasamucarta, Karakacakra by Purusottamadeva (1946); Taratantram by Girish Chandra Vedantatirha (1914); Bangla Puthir Talika (List of Bengali Manuscripts in the Varendra Research Museum) compiled by Pandit Manindramohan Chowdhury Kavyatirtha (1956); Tararahasyavrttika by Gaudiya Samkara (1961); Adyaparicaya (in Bengali) by Sheikh Zahid; Varendra Sahitya Parisad Patrika (1961); A descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts by S. Siddhanta (1979); এবং ১২টি বার্ষিক রিপোর্ট প্রতিবেদন ও ৯টি Monographs; 31, learned articles ইত্যাদি অন্যতম।[২৪] এছাড়া প্রত্নতত্ত্ববিদ মুখলেসুর রহমান এর Sculpture in the Varendra Research Museum : A Descriptive Catalogue, Rajshahi (1998) শীর্ষক সচিত্র বিবরণ মূলক গ্রন্থে সর্বমোট ১১৭৯টি ভাস্কর্য বিষয়ক বিবরণ বিবৃত হয়েছে। এটি একটি ঐতিহাসিক দলিল বা Monumental কাজ।

মূল্যায়ন ঃ

বরেন্দ্র অঞ্চলের মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন, মুসলিম এবং পরিশেষে ব্রিটিশ শাসন আমলের অনেক (ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, শিলালিপি প্রভৃতি) গবেষণার উপকরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তা, বরেন্দ্রর ইতিহাস পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠন এই লক্ষ্য সামনে রেখে সমিতি (পরবর্তীতে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর) প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল বহু অর্থ ব্যয়ে, অনেক পরিশ্রমে এবং অনেক অধ্যবসায়ে। সে সঙ্গে সংগৃহীত উপাদানের ব্যাখ্যার ব্যবস্থাও হয়েছিল।[২৫] যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তী সময়ে তার সফল কর্মকান্ডের দ্বারা বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চা তথা বাংলার ইতিহাস চর্চায় এবং সমাজ সভ্যতার পুনর্গঠনে মৌলিক অবদান রাখতে সহায়তা করে আসছে। উল্লেখ্য যে, ১১ই জুন ২০০২ বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের সম্প্রসারিত নতুন ভবনের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। জাদুঘরের দক্ষিণ চত্তরে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ফাইসুল ইসলাম ফারুকী এই ভিত্তি স্থাপন করেন। এই ভবনে মুদ্রা ও নৃতাত্ত্বিক প্রদর্শন গ্যালারী নামে দুটি নতুন গ্যালারী স্থাপন করা হবে। অনুষ্ঠানে জাদুঘর পরিচালক প্রফেসর সাইফুদ্দীন চৌধুরী জাদুঘরের পরিচিতি ও কর্মকান্ডসহ ভবিষ্যত উন্নয়ন পরিকল্পনা তুলে ধরেন।[২৬]

উপসংহার ঃ

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বলতে পারি যে, এই জাদুঘর নিঃসন্দেহে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। এই সংগ্রহশালায় রক্ষিত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বঙ্গজ ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলো সংখ্যায় বৈচিত্র্যে অনবদ্য এবং বাংলার এই প্রাচীন ভাস্কর্য শিল্পের বিভিন্ন ঘরানার এত নিদর্শন এশিয়া তথা পৃথিবীর কোন জাদুঘরে নেই বললেই চলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ঐতিহাসিক পারসী ব্রাউন ২৬শে জানুয়ারী ১৯৯৫ সালে এই জাদুঘর পরিদর্শনে এসে মন্তব্য করেছিলেন যে, "এই জাদুঘর বঙ্গীয় শিল্পকলার সংগ্রহে সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।[২৭] আর এই মিউজিয়ামে সংরক্ষিত উপাদান গুলি বিশ্লেষণ করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, এই জাদুঘরের বিপুল সংগ্রহ বঙ্গীয় শিল্পকলার ইতিহাসে কত বিচিত্র ও বহুমাত্রিক ভূমিকা রেখেছে।

সূত্রনির্দেশ

১। মোঃ আতাউর রহমানঃ "বাংলাদেশে প্রথম গবেষণা জাদুঘর" - *ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫*, ২০০১, পৃ-৯৫৭।

২। ধানসিঁড়ি, তানোর কলেজ/প্রকাশ-ফেব্রুয়ারী-২০০১, পৃ-৩২।

৩। ডঃ আবু ইমাম ঃ *"বরেন্দ্রভূমির প্রত্নচর্চার ইতিহাস"* বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, রাজশাহী, ১৯৯৮, পৃ-৫১০।

৪। পূর্বোক্ত, পৃ-৫১১।

৫। Firoz Mahmud and habibur Rahman : *The Museum in Bangladesh,* Bangla Academy, 1987. p. 117.

৬। কাজী মোহাম্মদ মিছের ঃ রাজশাহীর ইতিহাস, ১ম খন্ড, বগুড়া, ১৯৬৫, পৃ-১৪১।

৭। সম্পা ঃ সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, বাংলাদেশের জাদুঘর, ঢাকা, ২০০০, পৃ-৬৩।

৮। Mukhlesur Rahman : "Varendra Research Society & Museum" *IBS,* Vol. 2. Rajshahi, 1982, p. 280.

৯। *ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫,* পৃ-৯৫৭।

১০। মেহরাব আলী ঃ দিনাজপুর মিউজিয়াম, ১৯৭০, পৃ-১-২।

১১। মোঃ আতাউর রহমান ঃ "*বরেন্দ্র অঞ্চলের মুসলিম শিল্পকলা (রাজশাহী জেলা) ঃ একটি প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভৌগলিক সমীক্ষা*" *ইতিহাস অনুসন্ধান*-১৭, ২০০৩, পৃ-৬৬৬।

১২। নগেন্দ্র নাথ বসু ঃ *বিশ্বকোষ,* কলিকাতা, ১৩১৪, অষ্টাদশ ভাগ, পৃ-৩৯৬।

১৩। নীহাররঞ্জন রায় ঃ *বাঙ্গালীর ইতিহাস,* আদিপর্ব, কলিকাতা, ৩য় সংস্করণ-২০০১, পৃ-১১৬।

১৪। *পুরাবৃত্ত,* কলিকাতা, পৃ-৩২৬।

১৫। খান বাহাদুর হাকিম, সম্পা *বাংলা বিশ্বকোষ ঃ* (সম্পা), ১ম সংস্করণ, ৩য় খন্ড, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ-৩৬৩।

১৬। *ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫,* পৃ-৯৫৭।

১৭। ডঃ আবু ইমাম, পূর্বোক্ত, পৃ-৫১২।

১৮। *Varendra Research Museum's Accession book.* Vol. 5, Rajshahi. (01.01.2003).

১৯। ডঃ সাইফুদ্দীন চৌধুরী ঃ "*বঙ্গীয় শিল্পকলার ঐতিহ্য এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর*" *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি,* দ্বাদশ সম্মেলন, ১৯৯৯, পৃ-২৫।

২০। এই পত্র প্রস্তুত করতে আরও সহায়তা করেছেন জনাব মনিরুল হক, সহকারী পরিচালক (গবেষণা) এবং জনাব এম. এ. কাইয়ুম সিনিয়র প্রদর্শন অফিসার, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর।

২১। Mukhlesur Rahman : *Ibid.* pp. 271-274.

২২। ডঃ আবু ইমাম-পূর্বোক্ত, পৃ-৫১৪।

২৩। রমা প্রসাদ চন্দ, ডঃ সাইফুদ্দীন চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃ-১৬।

২৪। *Journal of the Varendra Research Museum,* Vol. No. 8, 1994. (List of Publication, 1-16), pp. 113-116; Mukhlesur Rahman : Ibid. pp. 274-276.

২৫। ডঃ আবু ইমাম, *বরেন্দ্র ভূমির প্রত্নচর্চার ইতিহাস,* পৃ-৫১৬।

২৬। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, আগষ্ট-২০০২, রাজশাহী, পৃ-২।

২৭। ডঃ সাইফুদ্দীন চৌধুরী ঃ "*রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর*" *ধান শালিকের দেশ,* ২০০১, পৃ-৩৮।

আরাকানে মুসলিম সমাজ ঃ উদ্ভব, প্রসার ও প্রভাব

মোহাম্মদ আলী চৌধুরী

বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ আরাকান রাজ্য বর্তমান মায়ানমারের অন্তগর্ত একটি প্রদেশ। আরাকানের দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে চীন পর্বত ও ভারত, পূর্বে ইয়োমা পর্বতমালা এবং উত্তর-পশ্চিমে নাফ নদী - যা বাংলাদেশ ও আরাকানের সীমারেখা হিসেবে চিহ্নিত। সাগর-নদী ও সবুজ পাহাড়-পর্বত বেষ্টিত এই দেশটি প্রাচীনকালে রাখাইন-পি নামে পরিচিত ছিল। সংস্কৃত 'রক্ষ' এবং পালি 'যকখো' শব্দ থেকে এর উৎপত্তি বলে অনেকের ধারণা। রখইঙ শব্দের অর্থ দৈত্য বা রাক্ষস। প্রাচীনকালে দেশটি রাক্ষসভূমি নামে পরিচিত ছিল, তাদের কোন নির্দিষ্ট ধর্ম বিশ্বাস ছিল না। কারণ বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের আগে এখানকার অধিবাসীরা জড় উপাসক ছিল। এ প্রসঙ্গে A. P. Phayre উল্লেখ করেন ঃ The word Rakhaing appears to be a corruption of Rekkhaik, derived from the pali word Yek-kha, Which in its popular signification, means a monster, half-man half-beast, which like the Cretan Minotaur, devoured human flesh. The country was named Yek-kha-pu-ra by the Budhist Missionaries from India, either because they found the tradition existing of a race monsters which committed devastations in a remote period, or because they found the myam ma people worshippers of spirits or demons.[১] বস্তুত রক্ষংঙ শব্দের অর্থ দৈত্য বা রাক্ষস হলে ও আরাকানের অধিবাসীরা নিজেদের মাতৃভূমিকে Rakhaing Tangyi বা রাক্ষসভূমি পরিচয় দিতে সংকোচবোধ করে না। অনেক পন্ডিতের মতে, ভারতীয় আর্যগণ দ্রাবিড়, মঙ্গোল, নিষাদ অধ্যুষিত আরাকানের প্রাচীন অধিবাসীদের অবজ্ঞাসূচক এ নামে অভিহিত করত। অপরদিকে, আরাকানের সংখ্যাগুরু বৌদ্ধসম্প্রদায় 'মগ' নামে সমধিক পরিচিত। মগ নামের উৎপত্তি নিয়েও ঐতিহাসিক ও পন্ডিতমহলে যথেষ্ট মত পার্থক্য বিদ্যমান। বর্মী 'মঙ'[২] ফরাসী 'মুঘ'[৩] এবং সংস্কৃত 'মগদু'[৪] শব্দ থেকে মগ নামের উৎপত্তি বলে অনেকের ধারণা। অধ্যাপক D. G. E. Hall এর মতে,[৫] মঙ্গোলীয় শব্দ থেকে মগ শব্দের উদ্ভব। এ প্রসঙ্গে তিনি মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আরাকানীদের চেহারাগত সাদৃশ্যের উপর জোর দেন। Dr. Francis Buchanan[৬] ও Sir William Hunter[৭] এর মতে, আরাকান ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সম্প্রদায় নিজেদেরকে মগধ ও আধুনিক বিহারের মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে

আগত উপনিবেশ স্থাপনকারীদের উত্তর পুরুষ বলে দাবী করেন। ফলে এতদঞ্চলে বৌদ্ধ ও মাগধী একার্থবোধক হয়ে উঠে। অর্থাৎ, একটি অপরটির প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। আরাকানের রাজ ইতিবৃত্ত 'রাজোয়াং' সূত্রে জানা যায় যে, খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে (১৪৬খ্রিঃ) চন্দ্রসূর্য (১৪৬-৯৮) নামে মগধের এক সামন্ত আরাকান ও চট্টগ্রাম অধিকার করে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আরাকানে সর্বপ্রথম মহামুনি বৌদ্ধমূর্তি তৈরি করেন এবং রাজধানী ধন্যাবতীতে নির্মিত প্যাগোডায় তা স্থাপন করেন।[৮] অতপর আরাকানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বৌদ্ধ ধর্ম আরাকানের রাজধর্মে পরিণত হয়।

তবে কখন, কিভাবে আরাকানে মুসলমানদের বসতি স্থাপিত হয় বা মুসলিম সমাজের উদ্ভব ঘটে তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে এটা ঠিক যে, বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই আরাকান - চট্টগ্রাম উপকূলীয় অঞ্চলে আরব বণিকদের যোগাযোগ ছিল। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে আরব ও পারস্য দেশীয় বণিকগণ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অবাধে যাতায়াত করত এবং বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ে জড়িত ছিল। বাণিজ্যিক ও বৈরী আবহাওয়ার কারণে অনেক সময় মুসলিম বণিকরা উপকূলীয় বন্দরসমূহে (চট্টগ্রাম-আরাকান) সাময়িক যাত্রা বিরতি করত। বায়ুর গতি পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তাদের বন্দরে অবস্থান করতে হতো বিধায় তারা বন্দরে বসতি স্থাপন করে ধর্ম প্রচারের কাজে নিয়োজিত হত। ক্রমে স্থানীয় অধিবাসীদের সংস্পর্শে এসে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করত মুসলিম সমাজের গোড়াপত্তন করেন। এ সম্পর্কে এম. সিদ্দিক খান বলেন, "আরব ও পারস্যদেশীয় লেখকদের বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, বার্মার বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষত আরাকান, ইরাবতীর বদ্বীপ অঞ্চল, পেগু এবং টেনাসরিমের উপকূলস্থ দেশসমূহ আরব ও পারসীয় নাগরিকদের নিকট সুপরিচিত ছিল; ফলে, অনুমান স্বাভাবিক যে, মিশর ও মাদাগাসকার হইতে মুসলিম বণিকগণ পূর্ব দিকের সমুদ্র দিয়া অষ্টম শতাব্দীতে চীন পর্যন্ত তাহাদের বাণিজ্য জাহাজ লইয়া অগ্রসর হইয়াছিল। পথে সুবিধাজনক স্থানে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনকালে তাহারা ব্রহ্মদেশেও কুঠি নির্মাণ করিয়াছিল। প্রথমত স্থায়ীভাবে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনে তাহাদের কোন পরিকল্পনা ছিল না। অবশ্য পরে নানা কারণে এগুলি স্থায়ী কুঠিতে পরিণত হয়।[৯]

আরাকানে প্রথম মুসলিম বসতি স্থপতি হয় বৈশালীর চন্দ্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা মহৎ ইঙ্গ চন্দ্রের রাজত্বকালে। আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস রাজোয়াং সূত্রে জানা যায় যে, রাজা মহৎ ইঙ্গ চন্দ্রের (৭৮৮-৮১০) রাজত্বর শেষদিকে রামরী দ্বীপে একটি আরব বাণিজ্য জাহাজ ডুবে যায়। বণিকদের মধ্যে যারা জীবিত ছিলেন তাদেরকে আরাকানরাজ মহৎ ইঙ্গ চন্দ্রের নিকট উপস্থিত করা হলে রাজা তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন

করত স্বীয় রাজ্যে বসবাসের অনুমতি প্রদান করেন।[১০] রাজার অনুমতি প্রাপ্ত এসকল আরব বণিকরাই আরাকানে বসতি স্থাপনকারী প্রথম মুসলিম জনগোষ্ঠী। পরবর্তীতে তারা স্থানীয় রমনীদের বিয়ে করে মুসলিম সমাজ বিস্তারে ভুমিকা রাখেন। এরপর খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরাকানে অভাবনীয় মুসলিম অনুপ্রবেশ পরিলক্ষিত হয় এবং মুসলিম প্রভাবিত এক নবযুগের সুচনা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের লঙ্গিয়েত বংশের শেষ রাজা মিনসুয়ামম ওরফে নরমিখলা বর্মীরাজ মেঙসুয়ে কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করত গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চব্বিশ বছর গৌড়ে নির্বাসিত জীবন যাপনের পর সুলতান জালাল উদ্দীন মুহম্মদ শাহের (১৪১৪-১৪৩১) সহায়তায় ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি আরাকানের সিংহাসন পুনর্দখল করেন। ফলে আরাকান বাংলার করদ রাজ্যে পরিণত হয়।[১১] সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর রাজা নরমিখলা বর্মী আগ্রাসন থেকে দেশকে রক্ষাকল্পে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমত, তিনি সুলায়মান শাহ্ নামে মুসলিম নাম গ্রহণ করত লেম্ব্রু নদীর তীরে প্রাচীন ম্রোহং এ রাজধানী স্থাপন করে ম্রাউক বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয়ত রাজ্যের নিরাপত্তা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে বর্মী সীমান্ত এলাকায় ও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সেনা ছাউনি করে গৌড়ীয় মুসলিম সৈন্যদের নিয়োগ প্রদান করেন। তৃতীয়ত, রাজধানী ম্রোহং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় গৌড় থেকে আগত মুসলমানদের জন্য বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন এবং তাদের প্রাত্যহিক ধর্মীয় কর্ম সম্পাদনের নিমিত্তে গৌড়ীয় স্থাপত্য রীতি অনুযায়ী আরাকানে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন যা সান্দিকান মসজিদ নামে খ্যাত।[১২]

ধীরে ধীরে আরাকানে মুসলিম প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। আরাকানের রাজারা নিজেদের বৌদ্ধ নামের পাশাপাশি মুসলিম নামও গ্রহণ করেন এবং মুদ্রার এক পিঠে বৌদ্ধ নাম ও পদবী, অপর পিঠে আরবীতে মুসলিম নাম, উপাধি ও কলেমা উৎকীর্ণ করার প্রথা চালু করেন। মুদ্রায় মুসলমানী নাম ও কলেমা উৎকীর্ণকরণ প্রথা আরাকানে প্রায় দুইশত বছরকাল পর্যন্ত চালু ছিল। বস্তুত আরাকান রাজদরবার ইসলামী প্রথায় পুনর্গঠিত করা হয়। G. E. Harvey এর মতে,[১৩] "It is common for the king, though Buddhist, to use Mahomedan designations in addition to their own names, and even to issue medallions bearing the Kalima, the Mahomedan confession of faith, in persian script." ফলে আরাকানে একটি নতুন মুসলিম সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ ঘটে এবং রাজধানী সংলগ্ন এলাকা ও আরাকানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক মুসলিম জনপদ গড়ে উঠে। রাজধানী সংলগ্ন এলাকার জনপদগুলো হলো রোয়ামা, নিদান পাড়া, মোয়াল্লেম পাড়া, সাম্পুচিক, কোয়ে পাড়া, কামার পাড়া,

এবং সেন্ডোয়ে জিলার অন্তর্গত সোয়েজুবী, চানবি, নাজাবি, চান্দায়েক, তাড়ে, সেডো, সিনবিন এবং চাপিউজেলার অন্তর্গত চকনেমু, চেনে জালিয়াপাড়া ও মেহেরবুন ইত্যাদি।[১৪] তাছাড়া, বাংলার সীমান্ত সংলগ্ন নদী তীরবর্তী (লেম্রু, মিনগেন, কালাডান, মায়ু ও নাফ) এলাকায়ও শতাধিক জনবসতি গড়ে উঠে এবং তারা কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্য সহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহের পথ সুগম করে।

আরাকানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুসলিম প্রভাব দৃষ্ট হয় বিচার বিভাগে। দিল্লী ও গৌড়ের অনুকরণে রাজা নরমিখলা বিচার বিভাগের সংস্কার সাধন করেন এবং সমগ্র বিচার বিভাগকে বেশ কয়েকটি ইউনিটে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক নিয়োগ করা হয়। বিচার বিভাগীয় প্রধান কাজী নামে পরিচিত ছিল। আরাকানের ইতিহাসে যে সকল মুসলিম কাজী প্রসিদ্ধি লাভ করে তাদের মধ্যে দৌলত কাজী, সালা কাজী, গাওয়া কাজী, সুজা কাজী, আবদুল করিম, মোহাম্মদ হোসাইন, ওসমান, আবদুল জব্বার, আবদুল গফুর, মোহাম্মদ ইউসুফ, রওশান আলী এবং নূর মোহাম্মদের নাম উল্লেখযোগ্য।[১৫]

নরমিখলার পরবর্তী রাজাদের আমলে বাংলার সংগে আরাকানের তেমন সুসম্পর্ক ছিল না। আরাকানের রাজারা প্রায়ই বাংলার অন্যতম সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম দখলের চেষ্টা করতেন এবং মাঝে মাঝে তারা চট্টগ্রামের কিয়দংশ দখলে রাখতে সক্ষম হতেন। এসময়ে চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে আরাকান রাজ, বাংলার সুলতান ও ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে ত্রিদলীয় সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। কিন্তু প্রায় সময় চট্টগ্রাম বাংলার সুলতানদের অধীনে থাকলেও ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় শতাব্দীকাল চট্টগ্রাম আরাকানের শাসনাধীনে ছিল। ফলে, মুসলিম অধ্যুষিত চট্টগ্রামের লোকজন চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকর্মের প্রয়োজনে অবাধে আরাকানে যাতায়াত করত। উপরন্তু, আরাকনের রাজারাও জনবসতি বিরল ও জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও বসতি স্থাপনের জন্য বহিরাগতদের উৎসাহ যোগাতেন। তাছাড়া, নিকটতম প্রতিবেশী ও অধিকৃত এলাকা হিসেবে চট্টগ্রামের মুসলিম জনসাধারণের জন্য আর্‌াকানে যাতায়াত এবং সেখানে বসতি স্থাপন সহজ হয়ে উঠে। আরাকান তাদের এ অভিবাসন ধারা অনেকদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। স্থানীয় রমনীদের বিয়ে করে তারা ক্রমে এক বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে সক্ষম হন। উল্লেখ্য যে, এ সময়ে দক্ষিণ দিকে মুঘল আধিপত্য রোধকল্পে আরাকানী মগরা ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। মগ-ফিরিঙ্গী এ জলদস্যুরা বাংলার উপকুলীয় এলাকায় দস্যুবৃত্তি, ডাকাতি ও অপহরণের মাধ্যমে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। চুক্তি অনুযায়ী লুণ্ঠিত দ্রব্য ও মানব সম্পদ তারা সমান ভাগে ভাগ করে নিত। আরাকানীদের ভাগে প্রাপ্ত

মানব সম্পদ আরাকানের অনুন্নত ও জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় চাষাবাদের কাজে নিয়োগ করে।[১৬] এভাবে বাংলার অসংখ্য মুসলিম জনবল আরাকানে নীত হয় এবং তারা জীবিকা নির্বাহের তাগিদে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থেকে মুসলিম সমাজ বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আরাকানে মুসলিম বসতি স্থাপনের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা হল মোঘল শাহ্জাদা ও সুবেদার শাহ সুজার অনুগামীসহ স্বপরিবারে আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ। উল্লেখ্য যে, ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে ৫ই এপ্রিল ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে আওরঙ্গজেব কর্তৃক শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে শাহ সুজা ঢাকা অভিমুখে পালিয়ে আসেন। সুজার ইচ্ছা ছিল মক্কা শরীফে গিয়ে হজব্রত পালন শেষে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন। কিন্তু বৈরী আবহাওয়ার কারণে তিনি আরাকানে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। আরাকানের রাজা তাকে মক্কা শরীফে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। অতঃপর নাফ নদী অতিক্রম করে শাহ সুজা আরাকানের মগ ও পর্তুগীজ সৈন্য কর্তৃক রাজকীয় অভ্যর্থনা সহকারে অসংখ্য অনুচরসহ রাজধানী ম্রোহং এ পৌছেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস সুজার সঙ্গে আনিত উষ্ট্র বোঝাই ধনরত্ন, তাঁর সুন্দরী তনয়া এবং মীর জুমলা কর্তৃক প্রতিশ্রুত টাকার লোভে আরাকান রাজ তার পূর্বপ্রদত্ত সকল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। অবশেষে সুজা ও তাঁর পরিবারবর্গকে নির্মমভাবে হত্যা করেন।[১৭] সুজার সঙ্গে প্রায় ৫০০ জন অশ্বারোহী সৈন্য ও তার পরিবার পরিজন, অনুচর ও দাসদাসী ছিল, এবং সৈন্যদের পরিবার পরিজন, দাসদাসী ও তাদের বহনকারীর সংখ্যাও কম ছিল না। সুজার মৃত্যুর পর তাঁর দেহরক্ষী ও তীরন্দাজ বাহিনীকে পরবর্তীতে আবাকানের রাজার দেহ ও প্রাসাদরক্ষী বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়—যারা আরাকানের ইতিহাসে কামানচি নামে সমধিক পরিচিত।[১৮] ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকানের রাজনীতিতে কামনচিদের প্রবল প্রভাব ছিল। ক্রমে উত্তর ভারত থেকে আগত অনেক মুসলিম যোদ্ধা দ্বারা তাদের শক্তি আরো বৃদ্ধি করা হয়। ম্রাউক রাজ বংশের পতনের পর কামানচিরা আরাকানের সিংহাসনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তারা আপন খেয়াল খুশি মত ক্রীড়নক রাজা বসাতেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী কামানচিদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৬৮৬ জন। এখানো রামরী ও আকিয়াব জেলার বিভিন্ন গ্রামে তাঁদের বংশধরদের বসতি রয়েছে।

এভাবে আরাকানে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে আগত মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত মুসলিম সমাজের বহুমুখী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কবি আলাওল বিরচিত পদ্মাবতী কাব্যেও নানাদেশ থেকে আগত ভিন্ন ভিন্ন জাতের লোকজনের আরাকানে অবস্থানের প্রমাণ পাওয়া যায়। কবি এ সম্পর্কে উল্লেখ করেন।[১৯]

নানা দেশে নানা লোক শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ
আইশন্ত নৃপ ছায়াতল।
আরবী, মিশরী, সামী, তুরকি, হাবশী, রুমি
খোরাসানী উজবেগী সকল।
লাহোরী, মুলতানী, সিন্ধি কাশ্মীরি, দক্ষিনী, হিন্দী
কামরুপী আর বঙ্গদেশী।
বহুশেখ সৈয়দজাদা মুগল পাঠানযোদ্ধা
রাজপুত হিন্দু নানাজাতি।
আতাই বরমা শ্যাম ত্রিপুরা কুকির নাম
কতেক কহিমু ভাতি ভাতি।

আরাকানের অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানরা ছিল সেখানকার দ্বিতীয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। বিভিন্ন স্থান থেকে আগত জাতি ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী তাদেরকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন - রোসাঙ্গা, থাম্বাইক্যা, কামানচি, জেরাবাদী ও দিন্নেত।

আরাকানের চট্টগ্রাম বংশোদ্ভূত চট্টগ্রাম আরাকানী বংশধর মুসলমান গোত্রটি সাধারণত রোসাঙ্গা নামে পরিচিত। রোসাঙ্গা গোত্রের উদ্ভব সম্পর্কে প্রচুর মতভেদ থাকলেও এটা সত্য যে, ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে রাজা নরমিখলা'র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ইংরেজ আমল পর্যন্ত আরাকানে হাজার হাজার চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনকারী ঔরসজাত বর্ণশংকর জনগোষ্ঠীই আরাকানের রোসাঙ্গা গোত্র। পরবর্তীকালে বর্মী শাসক কর্তৃক আরাকান অধিকার এবং সেখানকার জনসাধারণের উপর বর্মী নির্যাতনের ফলে অসংখ্য আরাকানী মগ-মুসলমান জনগোষ্ঠী চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। উত্তর চট্টগ্রামের অধিবাসীরা আরাকান থেকে আগত এ সকল মুসলমানদের রোয়াইঙ্গা মুসলিম নামে অভিহিত করে।

আরাকানে প্রথম বসতিস্থাপনকারী মুসলিম জনগোষ্ঠী হলো থাম্বাইক্যা (Thambukya)। থাম্বাইক্যা আরাকান শব্দ, যার অর্থ — জাহাজ ডুবি থেকে রক্ষা প্রাপ্ত। ইসলাম ধর্মের অনুসারী হলেও তারা মগী ভাষায় কথাবার্তা বলে এবং মগী পোষাক পরিধান করে।

চট্টগ্রামী বংশোদ্ভূত চট্টগ্রামী-আরাকানী ভাষী বর্ণসংকর মুসলিম গোত্রই দিন্নেত নামে পরিচিত। আরাকানের বুচিডং মহকুমার পাহাড়ী অঞ্চলে তাদের বসবাস ছিল। তাই তাদের পাহাড়ী উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তারা বিকৃত বাংলায় কথাবার্তা বলে। সম্ভবত তারা আরাকানের মুসলমান ক্রিতদাসদের বংশধর।

চট্টগ্রামী মুসলমান ব্যতীত উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমানদের সঙ্গে স্থানীয় মগ রমনীর বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে সৃষ্ট বর্ণসংকর গোত্রই জেরবাদী নামে খ্যাত।

আরাকানে মুসলিম প্রভাব কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু রাজ সভাসদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজ্যের প্রতিরক্ষা বাহিনী, বিচার বিভাগ, অর্থ বিভাগ এবং সর্বোপরি রাজার উপদেষ্টামণ্ডলীর প্রায়ই ছিলেন মুসলিম। এমনকি রাজার অভিষেক ও পৌরহিত্যে অনুষ্ঠানও মুসলিম অমাত্যদের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হত। বস্তুত রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলিম অমাত্য তথা রাজ সভাসদদের প্রাধান্য ছিল অপরিসীম। সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও এদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রাজা এবং মুসলিম অমাত্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরাকানে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হয়। বিশেষত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের লালন ও বিকাশের ক্ষেত্রে এদেশীয় কবি- সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা দানে আরাকান রাজ সভাসদ তথা অমাত্য সভার অবদান অবিস্মরণীয়। অমাত্যগণ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি রাষ্ট্রের অনুমোদন ও জনগণের সমর্থন ছিল। ঐতিহাসিক San Baw U এর মতে,[২০] "In those times not only the council of ministers in Arakan were powerful and independent but a strong popular public opinion existed that controlled the officers of the state and curbed the king's power." তাছাড়া, অমাত্যসভার উল্লেখযোগ্য সদস্যগণ ছিলেন মুসলমান এবং তাদের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা নিজেদের মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য যেমন রাজানুকূল্য লাভে সচেষ্ট ছিলেন, ঠিক তেমনি সভাসদ নির্ভর রাজারাও তাদের কর্মকাণ্ডে উদারচিত্তে সাড়া দিতেন। যার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ প্রসঙ্গে ''আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য (১৬০০-১৭০০)'' গ্রন্থ প্রণেতাগণ বলেন ঃ[২১] ''খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রোসাঙ্গ রাজসভায় যে মুসলমান প্রভাব প্রবল বেগে প্রবেশ করিল তাহা পূর্ববর্তী সাধারণ মুসলমান প্রভাবকে সঙ্গে লইয়া পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই বর্দ্ধন শক্তি ধীরে ধীরে এমনই প্রবল আকার ধারণ করিল যে, খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে আসিয়া এই শক্তি উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইল। এই শতাব্দীর বাঙালা সাহিত্য রোসাঙ্গ রাজসভায় মুসলমানদের চরম প্রভাবের পূর্ণছবি প্রদান করিতেছে।'' রাজ পৃষ্ঠপোষকতা বা অমাত্যসভার আনুকূল্যে তৎকালীন আরাকানে যে সকল মুসলিম কবি বাংলা সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাদের মধ্যে দৌলত কাজী, আলাওল, কবি মর্দন, কুরেশী মাঘন, সমশের আলী, ও কবি আবদুল করিম খন্দকারের নাম সবিশেষ উল্লেখ্য।

বাংলার সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজা নরমিখলার আরাকানের সিংহাসনে পুনঃ অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলিম সমাজ বিস্তারসহ প্রশাসনের সর্বস্তরে মুসলিম প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং ক্রমে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমন কি, আরাকানের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজারাও মুসলিম অমাত্যদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। অনেক আরাকানী রাজার

অভিষেক অনুষ্ঠানে মুসলিম অমাত্যের পৌরোহিত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। মূলত তাঁদের প্রভাবে আরাকানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়। বস্তুত মুসলিম অমাত্যদের প্রভাবেই আরাকানের রাজাদের উত্থান-পতন তরান্বিত হতো।

সূত্রনির্দেশ

১। A. P. Phayre; On the history of Arakan *Journal of the Asiatic Society of Bengal (JASB)*, no. 145, 1844, pp. 24-25.

২। মঙ হচ্ছে বর্মীদের ধর্মীয় উপাধি।

৩। মুঘ শব্দের অর্থ অগ্নি উপাসক। প্রাচীনকালে আরাকানের অধিবাসীরা জড় উপাসক ছিল। আহমদ শরীফ (সম্পাদিত); কোরেশীমাগন বিরচিত চন্দ্রাবতী, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ-৬।

৪। সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল (সম্পাদিত); কাজী দৌলত বিরচিত সতিময়না ও লোরচন্দ্রানী, পৃ-৫।

৫। D.G.E. Hall; *History of South East Asia*, London, 1968, p. 388

৬। দ্র. Montogomary Martin: *Eastern India*. Delhi, 1976, vol. I, pp. 22, 29; vol. II, pp. 18,114.

৭। W. W. Hunter; *A Statistical Account of Bengal*. vol. XI, pp. 41, 79.

৮। G. E. Harvey: *History of Burma*. London, 1925. p. 369.

৯। এম. সিদ্দিক খান; ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে মুসলমান, *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৮, পৃ-৪৩।

১০। A. P. Phayre; *Op. Cit.*, p.36.

১১। A. P. Phayre; *History of Burma*, London, 1884, p. 78.

১২। R. B. Smart: *British Burma Gazetteer*—District Akyab, vol. A, 1917, p. 64.

১৩। G. E. Harvey, *op. cit*, p. 140.

১৪। মাহাবুব উল আলম; *চট্টগ্রামের ইতিহাস (পুরানা আমল)* চট্টগ্রাম, ১৯৬৫, পৃ-৫৭।

১৫। তদেব, পৃ-৫৫-৫৬।

১৬। *History of Bengal*, vol. II, ed. J. N. Sarkar, Dhaka, pp. 378-79.

১৭। G. E. Harvey, The Fate of Saha Shuj, 1661, *Journal of the Burma Research Society (JBRS)* Rangoon. 1922, pp. 107-115

১৮। G. E. Harvey, *Op. Cit.*, p. 148.

১৯। ড. এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, *আরাকান রাজ সভায় বাঙলা সাহিত্য*, কলিকাতা, ১৯৩৫, পৃ-১২।

২০। San Bow U; My Rambles : among the ruins the golden city of Myank U. *Journal of the Burma Research society (JBRS)*, Vol. XXIII, Part. 1, 1933, p. 17.

২১। ড. এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃ-৯।

নয়া ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি ও তৃতীয় বিশ্ব

অরিন্দম দত্ত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করে। বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ আত্মপ্রকাশ ঘটে অসংখ্য নয়া জাতি রাষ্ট্রের। ১৯৪৫ সালে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০। আজকে সেই সংখ্যা পৌঁছেছে প্রায় ২০০টিতে। এর মধ্যে প্রায় ১১০টি নয়া রাষ্ট্রই এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অন্তর্গত। এই রাষ্ট্রগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একে একে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। উপনিবেশবাদ আর তার আগের চেহারায় নেই, কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে উপনিবেশবাদের অবসান হয়েছে বলে মনে হলেও বহু মার্কসবাদী ও নব্য মার্কসবাদী তাত্ত্বিকের মতে উপনিবেশবাদ এক নতুন রূপে এখনও বিরাজ করছে। শিল্পোন্নত বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি তাদের সাম্রাজ্য হারালেও এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার উত্তর উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির উপর তাদের শোষণ ও প্রভাব অব্যাহত রেখেছে এক নতুন প্রক্রিয়ায়। এই প্রক্রিয়াই নয়া উপনিবেশবাদ নামে পরিচিত। সহজ ভাষায় বলতে গেলে উপনিবেশ বিহীন সাম্রাজ্যবাদই হল নয়া উপনিবেশবাদ। মাইকেল ব্যারট ব্রাউন যথার্থই বলেছেন, আজকের দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা অর্থনৈতিক প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উপরই অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছে। নয়া উপনিবেশবাদের ধারণাটিকে সহজভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হলে বলতে হয়, এটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের এক নব্য রণকৌশল যার মাধ্যমে তারা এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উত্তর উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিতে নিজেদের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। এই সমস্ত রাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই এর মূল লক্ষ্য। এর পাশাপাশি নয়া উপনিবেশবাদ এই সমস্ত অনুন্নত বা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের উপর সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক ও সামারিক চাপও কায়েম করে।

নয়া উপনিবেশবাদ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির উপর কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাতেই ক্ষান্ত হয় না, এই কর্তৃত্বকে যথার্থ বৈধতা প্রদানের জন্য এই সমস্ত রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক কাঠামোকেও প্রভাবিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন বিদেশ সচিব জন ফস্টার ডালেস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অল্প পরেই "War or Peace" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তোর কালে মার্কিন বিদেশ নীতির চরিত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর লেখায় স্পষ্ট হয়েছে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন

আমেরিকার উত্তর উপনিবেশিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মার্কিন রণকৌশলের একটি দিক। সেখানে ডালেস বলেছেন, সাংস্কৃতিক হাতিয়ারের মাধ্যমেই এই সমস্ত রাষ্ট্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী জাল বিস্তৃত করতে হবে। বস্তুত তাঁদের নিজেদের দেশের অভিজ্ঞতা থেকেই এটি স্পষ্ট যে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষকে সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াতেই বিপ্লবের পথ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত স্রোতে চালিত করা সম্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে জার্মানীতে ফ্যাসিবাদের ব্যাপক প্রসারের ফলে সেখানকার ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের তাত্ত্বিকরা জার্মানী ছাড়তে বাধ্য হন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন। এখানে এসে তাঁদের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। এই স্কুলের প্রধান তাত্ত্বিক অ্যাডোর্নোর, হর্কহেইমার, মারকিউস বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিবাদ এমনভাবে সেখানকার সাংস্কৃতিক কাঠামো নির্মাণ করেছে, যার মাধ্যমে সেখানকার শ্রমজীবী মানুষ বিপ্লব থেকে নিজেদের অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং রাজনৈতিক ভাবে উদাসীন হয়ে পড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিতে।

পুঁজিবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের আলোচনায় ধ্রুপদী মার্কসবাদীরা বরাবরই অর্থনৈতিক প্রসঙ্গটিতেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সাংস্কৃতিক প্রশ্নটিও যে এক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তাতে অনেক মার্কসবাদী তাত্ত্বিকই তেমন আমল দেননি। এই বিষয়টি প্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে অনুধাবন করেন ইতালির বিশিষ্ট মার্কসবাদী তাত্ত্বিক এ্যান্টনিয় গ্রামসি তাঁর "Prison note book" -এ। গ্রামশির মতে বুর্জোয়া শ্রেণী কেবলমাত্র শাসনতন্ত্রে তাদের প্রভুত্বই প্রতিষ্ঠা করে না, সৃষ্টি করে এক সার্বিক সামাজিক স্বীকৃতি, যাকে গ্রামশি 'হেজেমনি' আখ্যা দিয়েছেন। গ্রার্মশির হেজেমনিক বুর্জোয়া শ্রেণী তার শাসনের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সম্মতিও আদায় করে নেয়। গ্রামশির এই বক্তব্যকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে বলতে হয়, বুর্জোয়া শ্রেণী তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কেবলমাত্র বল প্রয়োগের উপর নির্ভর করে না, বরং মানবিক চেতনা স্তরেই এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের তাত্ত্বিকরাও পুঁজিবাদের আলোচনায় সংস্কৃতির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বুর্জোয়া সামাজিক কাঠামোয় সংস্কৃতি কিভাবে শ্রমজীবী মানুষের বৈপ্লবিক চেতনাকে ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত করে তার যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই তাত্ত্বিকেরা। কালচার ইন্ড্রাস্ট্রি, মাস কালচার বা গণ-সংস্কৃতি যে বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থারই সৃষ্টি তার ব্যাখ্যা দিয়েছে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল। এর ফলে মার্কসীয় সন্দর্ভে এক নয়া সংযোজন ঘটেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সাম্রাজ্যবাদ সাংস্কৃতিক হাতিয়ারের মাধ্যমেই তৃতীয় বিশ্বে নিজেদের প্রভুত্ব অক্ষুন্ন রেখেছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে তৃতীয় বিশ্ব বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে একটি ধারণা থাকা প্রয়োজন।

'তৃতীয় বিশ্ব' শব্দটি এক অর্থে গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে ফ্রান্সে প্রথম ব্যবহৃত হয়। কোনোও কোনোও গবেষকের মতে এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন আলজেরিয়ার লেখক ফ্র্যান্টজ ফ্যানো (Frantz Fanon)। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে স্বাধীন হওয়া উত্তর উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিকে বোঝাতেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তৃতীয় বিশ্ব বলতে বিশ্বের কোনোও একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডকে বোঝায় না। তৃতীয় বিশ্ব বলতে আমরা বুঝি, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও উন্নয়নশীল এমন এক গুচ্ছ রাষ্ট্র, যেগুলি দীর্ঘদিন উপনিবেশিক শাসনাধীন ছিল। এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক পরিকাঠামোগত বিষয়ে ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন গত প্রশ্নে পার্থক্য থাকলেও এদের মধ্যে কতকগুলি একই ধরণের বৈশিষ্ট বিদ্যমান। যেমন এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশই দীর্ঘদিন উপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এরা উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তিলাভ করেছে। ফলে এই সমস্ত উত্তর উপনিবেশিক রাষ্ট্রে উপনিবেশিক শাসনের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উপনিবেশিক শাসকেরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির চরিতার্থতার নিমিত্ত এশিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করেছিল। আজ তা ভয়ানক রূপ নিয়েছে। ভারতে হিন্দু, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যের সম্পর্ক আরোও তিক্ততর হয়ে উঠেছে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের এক ও বিভাজন নীতি' (Divide and Rule) -র ফলে।

তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি অদ্ভুত প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। সেটি হল পূবর্তন উপনিবেশিক শাসকের সঙ্গে সংযোগ রাখার প্রয়াস। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় দীর্ঘ দিন ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনাধীনে থাকা দেশগুলি স্বাধীনতার পর অনেকেই কমনওয়েল্‌থ এ যোগদান করেছে। তবে তৃতীয় বিশ্বের সকল রাষ্ট্রই যে কোনোও প্রকার সাম্রাজ্যবাদের ঘোরতর বিরোধী এবং এদের মধ্যে অধিকাংশ রাষ্ট্রই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শরিক।

তৃতীয় বিশ্বের সকল রাষ্ট্রই আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে কতকগুলি একই ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়, যা উপনিবেশিক শাসনেরই অনিবার্য পরিণতি। যেমন, এই সমস্ত রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা দারিদ্র ও অশিক্ষা। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদদের মতে কোনোও রাষ্ট্রের সামগ্রিক বিকাশে (Development) র ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল দারিদ্র ও অশিক্ষা। তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রই এই সমস্যায় জর্জরিত। ফলে এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলি বহুজাতিক সংস্থার কাছে এক প্রকার ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি তৃতীয় বিশ্বে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এক সু-সংহত রণ-কৌশল অবলম্বন করে। নয়া উপনিবেশবাদ তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিতে তার নিয়ন্ত্রণ

প্রতিষ্ঠার নৈতিক ভিত্তি হিসেবে সেখানকার সাধারণ মানুষের সম্মতি আদায়ের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক মাধ্যমকেই তারা মুখ্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। জন ফস্টার ডালেস তাঁর গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে যেখানে দীর্ঘ দিন উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই সমস্ত দেশে আজও নয়া উপনিবেশবাদ 'বিভাজন নীতি' প্রয়োগ করে। দেশের মানুষ যাতে কখনই ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে না পারে, সেই জন্য দেশের বিভিন্ন জাত-পাত, বর্ণ, সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টিই ছিল সাম্রাজ্যবাদের মূলনীতি। এশিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রই এই নীতির শিকার। আজকে যখন সাম্রাজ্যবাদ তৃতীয় বিশ্বে এক নতুন রূপে প্রবেশ করেছে, তখনও তারা এই নীতিই অনুসরণ করছে। নয়া উপনিবেশবাদ অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ম ও সংস্কৃতিকে সমার্থক রূপে প্রতিষ্ঠিত করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষের পথ প্রশস্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে জাত-পাত ও ধর্মের উপর ভিত্তি করেই নয়া উপনিবেশবাদ তার মায়াজাল বিস্তার করেছে। উত্তর উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলি অবশ্য প্রথমদিকে এই সাংস্কৃতিক শোষণের বিষয়টিকে তেমন আমল দেয়নি। এমনকি এই সমস্ত দেশের তথাকথিত বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিগুলিও নয়া উপনিবেশিক সংস্কৃতির ফল যে অনেক ক্ষেত্রেই মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে তা প্রথমে বুঝতে পারেনি। কোনোও কোনোও কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক অবশ্য বিভিন্ন সময়ে এই বিষয়টিকে আলোচনার স্তরে নিয়ে এসেছিলেন, তবে যে কোনো কারণেই হোক সেগুলি তখন তেমন গুরুত্ব পায়নি। এই প্রসঙ্গে ভারতের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় নেতা অজয় ঘোষের বক্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। বহুদিন আগেই তিনি বলেছিলেন ভারতে ফ্যাসিবাদ আসবে ধর্মীয় মৌলবাদের ধ্বজা উড়িয়ে। তাঁর বক্তব্য যে কতটা সঠিক, আজ তা সম্পূর্ণ রূপে প্রমাণিত হয়েছে।

অফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকাতে ও পাঁচের দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে কিছু মার্কসবাদী তাত্ত্বিক উপনিবেশিক ও নয়া উপনিবেশিক সাংস্কৃতিক শোষণ বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য মার্টিনক্যান কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও বিশিষ্ট কবি এ্যামেসেজার (Aimecessair-)। তিনি তাঁর "Discourse on Colonialism এ এই বিষয় আলোচনা করেন এবং তিনি তাঁর এই আলোচনায় আফ্রিকার কালো মানুষদের উপনিবেশিক সাংস্কৃতিক শোষণের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রতিও গুরুত্ব দিয়ে ছিলেন। আলজেরিয়ার লেখক ফ্র্যান্টজ ফ্যানো (Frantz Fanon) -ও তাঁর উপনিবেশবাদের আলোচনায় সংস্কৃতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

বর্তমানে উত্তর উপনিবেশিক চিন্তাবিদ হোমি ভাবা গায়েত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, এডওয়ার্ড সেইড (Edword said) প্রমুখরা তাঁদের আলোচনায় উত্তর উপনিবেশিক সংস্কৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের মতে ইওরোপ 'আধুনিকতার নামে তাদের নিজস্ব কিছু মূল্যবোধ সংস্কৃতি যা একান্ত ভাবেই ইওরোপীয় তাকে সর্বজনীন অর্থে উপস্থাপিত করেছে। এই একপেষে ইউরোপ কেন্দ্রীকতা (Eurocentrism) -র বিরোধিতা করেন উত্তর উপনিবেশিক তাত্ত্বিকেরা এবং এর পাশাপাশি উত্তর উপনিবেশিক রাষ্ট্রের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল রচনার উপরও তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁদের মতে তৃতীয় বিশ্বে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দুটি পর্যায়ে প্রবাহিত। প্রথম পর্যায়ে তৃতীয় বিশ্বের পরাধীন জাতিগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভ করে, আর দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি জাতি গঠনের প্রক্রিয়া চলে মানবিক চেতনা স্তরে। এক্ষেত্রে সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের রূপকার মাওসেতুংও এই বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন। ঐতিহাসিক লং মার্চের মধ্য দিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের আত্মপ্রকাশের বহু পরেও সেখানে সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলেছিল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে।

আজকে উত্তর আধুনিকতাবাদ (Postmodernism) -এর প্রসারের সাথে সাথে সমাজ বিন্যাসে সাংস্কৃতিক উপাদানের দিকটি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। কিন্তু ভাবলে বিস্ময় লাগে এই বিষয়টি ঊনবিংশ শতাব্দীর এক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখায় সে যুগেও আলোচিত হয়েছিল। কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের "Swaraj in ideas- (পরবর্তীকালে যা বাংলায় অনুবাদ হয়েছে "মননে স্বরাজ" নামে) প্রবন্ধে এই বিষয় তিনি আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি এই কথাই বলতে চেয়েছেন, যে রাজনৈতিক স্বাধীনতাই শেষ কথা নয়, তার সঙ্গে প্রয়োজন মানুষের মননের স্বাধীনতা, স্বাধীন চিন্তার বিকাশ।

নয়া উপনিবেশিক সাংস্কৃতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা আজ তৃতীয় বিশ্বের সামনে এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেই নয়া উপনিবেশিক সাংস্কৃতিক শোষণের বীজ লুকিয়ে রয়েছে। যদি না এর বিরুদ্ধে কোনোও পালটা প্রতিরোধের ব্যবস্থা (অর্থাৎ গ্রামশির ভাষায় কাউন্টার হেজেমনি গড়ে তোলা না যায়) তবে আগামী দিনে এর ফল আরোও মারাত্মক হতে পারে।

সূত্রনির্দেশ

১। Colonialism / Post Colonialism - Ania Loomba

২। ইতিহাসের উত্তরাধিকার - পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

৩। *Swaraj in Ideas - Krishna Chandra Bhattacharjee.*

৪। John Foster Dulles - war or peace.

উনবিংশ শতাব্দীতে স্কটল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থায় চার্চ বিভক্তির প্রভাব

সামিনা সুলতানা নিশাত

অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ইউরোপে শিল্পে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন রকমের মেশিনের উদ্ভাবনে বয়ন শিল্প থেকে আরম্ভ করে ভারি শিল্প, জাহাজ নির্মাণ, ইঞ্জিন নির্মাণ, সর্বক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচীত হয়। এই শিল্প বিপ্লব ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বে সমাজ জীবন, অর্থনীতি, শিক্ষা সর্ব ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত স্কটল্যান্ডের সমাজ, অর্থনীতি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে এই শিল্প বিপ্লবের প্রভাব ছিল অপরিসীম। শিল্প বিপ্লবের পূর্বে স্কটল্যান্ডে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তা শিল্পোন্নত সমাজের জন্য অপর্যাপ্ত পরিলক্ষিত হয়। শিল্প বিপ্লবের পূর্বে স্কটল্যান্ডের সমাজ ব্যবস্থা ছিল ধর্ম ভিত্তিক এবং কমবেশি গীর্জার অধীনস্ত। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের ফলে সমাজ ব্যবস্থার চরিত্র সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই সমাজ ও শিক্ষার উপর এস্টাব্লিস্ট চার্চের পূর্ণ কর্তৃত্বে ভাঙ্গন ধরতে আরম্ভ করে।

উনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পরিবর্তিত সামাজিক মূল্যবোধ, মনুষ্যত্ব ও সর্বোপরি সমাজের উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার মানস স্কটল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। ব্যবসায়িক সম্প্রদায় অনুভব করে শিক্ষা মানুষের কর্ম ক্ষমতাকে উন্নত করবে এবং শিল্পের মান উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।[১] ইতোমধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়িক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন আরম্ভ হয়েছিল। স্কটল্যান্ডের পূর্বের গ্রামভিত্তিক সমাজের প্যারিশ স্কুল ব্যবস্থা যে শিল্পোন্নত সমাজের জন্য কার্যকরী নয় তা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কর্তৃক অনুভূত হয়। বিশেষ করে চার্চ বিভাজনের পর শিক্ষায় সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

শতাব্দীর প্রারম্ভে এস্টাব্লিস্ট চার্চ ও প্যারিশ বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বন্ধন ছিল সুদৃঢ়। ১৮০৩ সালের 'শিক্ষা আইন' সে বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে। চার্চের পাদ্রীগণ প্যারিশ স্কুল শিক্ষকের নিয়োগ, বেতন ও তার কর্তব্য নির্ণয় করতেন।[২] এতদব্যতীত স্কটল্যান্ডের প্রায় সর্বত্র সর্ব প্রকার স্কুলের - চার্চের অধীনস্ত প্যারিশ ও স্বাধীন স্কুল - শিক্ষক নিয়োগ চার্চের প্রেসবাইটারী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত। তাঁদের রায়ই ছিল চূড়ান্ত। ১৭৯৯ থেকে প্রত্যেক

প্রেসবাইটরীর দায়িত্বে ছিল এলাকার স্কুলের তালিকা, পাঠ্য বিষয়সমূহ, বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে চার্চের সাধারণ সভাকে অবহিত করা। সাধারণ সভার শিক্ষা কমিটি ই,সি,সি ১৮২৪ থেকে স্কুল পরিদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। প্রত্যেক প্যারিশ পাদ্রী প্রেসবাইটরী কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নের লিখিত উত্তর দিতে বাধ্য থাকতেন এবং সে তথ্য ই,সি,সি,-এর নিকট প্রেরিত হত।অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণকৃত তথ্যাদি প্রকাশিত হত না।[৩]

সুতরাং স্কুলগুলি বিভিন্ন সময়ে প্রেসবাইটরী কর্তৃক পরিদর্শন করা হত। এমনকি টাউন কাউন্সিলের অধীনস্ত স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ ও অন্যান্য কার্য পরীক্ষায় শহরের ম্যাজিস্ট্রেট, কাউন্সিলের সদস্য এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে চার্চের পাদ্রীগণও অংশগ্রহণ করতেন। অবশ্য সাবস্ক্রিপসন স্কুলগুলো এরূপ ব্যবস্থা অপছন্দ করত। গ্লাসগো শহরের নিকটবর্তী থর্নলিব্যাংক গ্রামের স্কুল শিক্ষক জে, হাটনের মতে (১৮৩৯) চার্চ অব স্কটল্যান্ডের পাদ্রী কর্তৃক স্কুল পরিদর্শন তিনি স্বীকার করেন না।[৪] এই পরিদর্শনের জন্য প্রেসবাইটরী চার্চের ২/৩ জন পাদ্রী ও কয়েকজন হেরিটরসহ - জমির উত্তরাধিকারী - একটি কমিটি গঠন করত। পরিদর্শনকালে ছাত্রদের পিতা-মাতা উপস্থিত থাকতেন। শিক্ষক সর্বসম্মুখে ছাত্রদের পাঠদান করতেন। যদিও তা পূর্ব নির্ধারিত থাকত, তথাপি অধিকাংশ সমাজ দরদীর মতে এ নিয়মের সুফল ছিল। স্কুলের ব্যাপারে অন্যদের আগ্রহ প্রদর্শনে শিক্ষকগণ দ্বিগুণ উৎসাহ লাভ করতেন।[৫]

সরকারী সাহায্য (১৮৩৩ থেকে শুরু) নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৮৩৯ সালে প্রিভি কাউন্সিলের কমিটি (সি,সি,ই)[৬] গঠিত হয়। কমিটি সরকারী স্কুল পরিদর্শক নিয়োগের সুপারিশ করে। কমিটির অতিরিক্ত ক্ষমতার কারণে অনেকেই এর বিরোধিতা করে। এস্টাব্লিস্ট চার্চ মনে করে সরকারী পরিদর্শন চার্চের প্রাধান্য ক্ষুন্ন করবে এবং মানুষের আধ্যাত্মিক ক্ষতি সাধন হবে। শেষ পর্যন্ত সরকার মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। স্কটল্যান্ডে ই,সি,সি কর্তৃক পরিদর্শক নিয়োগে চার্চের মতামত গ্রহণের প্রস্তাব সি,সি,ই, গ্রহণ করে। এরপর থেকেই ধর্ম ও শিক্ষা ক্ষেত্রে এস্টাব্লিস্ট চার্চের প্রভাব ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে শিক্ষায় সরকারীভাবে একটি বিরাট আইনগত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।[৭] শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের আগ্রহ স্কটল্যান্ডের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে ধর্ম বহির্ভূত শিক্ষা সংস্কারের জন্য সচেতন করে। অধিকন্তু এস্টাব্লিস্ট চার্চ জাতীয় চার্চ হবার অধিকার হারিয়েছে। কারণ ১৮৪৩ সালে চার্চে মত পার্থক্য দেখা দেয়। প্যাট্রোনেজ ও সাংগঠনিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে চার্চের পাদ্রীদের তিনজনের মধ্যে একজন চার্চের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন ফ্রি চার্চ গঠন করে।[৮] প্রকৃতপক্ষে এ বিভেদ আরও গাঢ় ছিল। "It was a cleavage between two incompitable philosophies of life". সর্ব ক্ষেত্রে এ সম্পর্কচ্ছেদ এক প্রকার ছিল না। হাইল্যান্ডের উত্তরে শতকরা হার ছিল ৬৫%-৭০%।[৯] বহু শিল্প এলাকায় যেমন, পোর্ট গ্লাসগো শহরে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের কারণে

বহু পাদ্রী সর্বস্ব ত্যাগ করেন। বহু স্থানে এস্টাব্লিস্ট চার্চ উপযুক্ত পাদ্রী নিয়োগে অপারগ হয়ে পড়ে। হাইল্যান্ডের উত্তরে সম্পর্কচ্ছেদের প্রকৃত কারণ জনসাধারণের অধিকাংশ ছিল অত্যন্ত দরিদ্র এবং জমিদার কর্তৃক উচ্ছেদকৃত। চার্চ অব স্কটল্যান্ড জমিদারদের পক্ষ অবলম্বন করে।[১০] গ্লাসগো, এয়ার, ডান্ডি ও এবারডিনের মত বৃহৎ শহরে বিচ্ছিন্নতার শতকরা হার ছিল ৪০ থেকে ১০০ ভাগ।[১১] পেইজলিতে ১৮৫০ এর মধ্যে ছয়টি ফ্রি চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। সে শহরের ফ্রি চার্চের পাদ্রী ইউলিয়াম ফ্রেজার শিক্ষাবিদ হিসেবে সুনাম অর্জন করেন এবং ১৮৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুল বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন।[১২] চার্চ বিভক্তির পর গ্রীনক শহরে দুটি ছাড়া সমস্ত চার্চের পাদ্রীর পদ শূন্য হয়ে যায়।[১৩] ১৬ জন পাদ্রীর মধ্যে ১২ জনই চার্চের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। শহরটিতে ১৮৪৪-৭৬ এর মধ্যে দশটি নতুন ফ্রি চার্চ সংগঠিত হয়। লোকসংখ্যার ১৩,৩৯৪ জনের মধ্যে ৯,১২৭ জন ফ্রি চার্চের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে।[১৪] জন্মলগ্নে ফ্রি চার্চকে প্রচন্ড বৈরী পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়। অর্থ সমস্যা অনেক ক্ষেত্রে প্রকটাকার ধারণ করে। বাসস্থানের অভাবে পার্শ্ববর্তী গোরস্থানে চার্চের কার্যাদি সম্পন্ন করতে হত।[১৫] সহৃদয় ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্যে বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য ফ্রি চার্চ স্থাপিত হয়। পোর্ট গ্লাসগো শহরে ক্যাপ্টেন হ্যামিলটন নামক একজন জাহাজ মালিক ফ্রি চার্চকে তাঁর বাড়ি ও ২,৫৮০ পাউন্ড দান করেন।[১৬]

নতুন চার্চ স্থাপিত হবার পরও এস্টাব্লিস্ট চার্চ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের বিরোধিতা চালিয়ে যায়। চার্চের সাধারণ সভা ১৮৪৯ সালে 'জাতীয় শিক্ষা' বিরোধী প্রতিবাদ লিপি প্রণয়ন করে।[১৭] অভিজাত ও জমিদার সম্প্রদায় চার্চের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। শিক্ষকদের ধর্ম পরীক্ষা ও অন্যান্য ব্যাপারে যাতে শিথিলতা না আসে সেজন্য চার্চ একটি কমিটি গঠন করে।

১৮৫৪ সালের শিক্ষা বিলে স্কটল্যান্ডে একটি শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাব ছিল। কমিটির মাধ্যমে বোর্ড স্কুল পরিদর্শক নিয়োগ ও সর্ব প্রকার নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করবে ও পার্লামেন্টের নিকট রিপোর্ট পাঠাবে। এস্টাব্লিস্ট চার্চের বিরোধিতায় বিলটি পাশ হয়নি। অবশেষে '১৮৬১ শিক্ষা আইন' চার্চের সামান্য অনুমোদন নিয়ে পাশ করা হয়।[১৮] নির্ধারিত হয় শিক্ষকদের আর বাধ্যতামূলক 'কনফেশন অব ফেইথ' পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে না। শিক্ষক পরীক্ষণের দায়িত্ব একটি পরীক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত হয় এবং শিক্ষকগণ শেরিফ কর্তৃক পরীক্ষিত হবেন। কেবল ইন্সপেক্টরগণ কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অপরাধভিত্তিক রিপোর্ট পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রেসবাইটারীর অনুমতি নেবেন। চার্চের পাদ্রী স্কুল পরিদর্শন করতে পারবেন এবং সেক্রেটারী অব স্টেটের নিকট ধর্ম শিক্ষা নিয়ে অভিযোগ করতে পারবেন। চার্চের সাধারণ সভা এ আইনের বিরোধিতা করে এবং হাউজ অব কমন্সের নিকট প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করে।[১৯]

স্কুল সিস্টেম

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন প্যারিশে (চার্চের অধীনস্ত এলাকা) এস্টাব্লিস্ট চার্চের একটি স্কুল ছিল। স্কুলগুলো হেরিটর বা জমির উত্তরাধিকারী কর্তৃক নির্মিত হত ও চার্চ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত। কোন কোন স্থানে চার্চ বিশেষ ধরণের স্কুল পরিচালনা করত। যেমন স্ত্রী শিল্প স্কুল, শিশু স্কুল, সেশনাল ও রোববার স্কুল। এগুলোর দু'চারটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের জন্য সরকারী অনুদান পেত।[২০] হাইল্যান্ডের প্রতি প্যারিশে একটি করে স্কুল এবং অন্যান্য প্যারিশে এসেম্বলী স্কুল স্থাপনের জন্য ১৮২৪ সালে স্কটল্যান্ডে ই,সি,সি, গঠিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল এসেম্বলী স্কুলের সহায়তায় প্যারিশ স্কুলগুলোকে বাইবেল স্কুলে পরিণত করা।[২১] হেরিটরগণ স্কুল ভবন, শিক্ষকের বাড়ি ও অন্যান্য ব্যয় বহন করবে। কমিটি শিক্ষকের বেতন প্রদান করবে। প্যারিশ স্কুল থেকে স্কুলগুলোর ব্যবধান হবে তিন মাইল। উদ্দেশ্য ছিল নাম মাত্র বেতনে সামান্য মৌলিক শিক্ষা দান করা।[২২] পেইজলিসহ বিভিন্ন শহরে ১৮৩৭ এর মধ্যে এরূপ বহু স্কুল পার্লামেন্টের গ্র্যান্টের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

চার্চ কর্তৃক পরিচালিত সেশনাল স্কুলের শিক্ষকগণ প্যারিশের কার্ক সেশন কর্তৃক নিয়োজিত ও বেতন-ভাতাদি পেতেন। বৃহৎ এ স্কুলগুলো মনিটর পদ্ধতিতে পরিচালিত হত। মনিটরগণ প্রতিদিন ভোরে গিয়ে শ্লেট, বই গুছিয়ে রাখার পাশাপাশি শিক্ষাদানও করতেন।[২৩] পেইজলি শহরে এ ধরণের তিনটি সেশনাল স্কুল ১৮৬০-৬১ সালে প্রিভি কাউন্সিলের অনুদান এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের জন্য অনুদান পেত।[২৪]

রোববারের স্কুলের প্রয়োজনীয়তা উনবিংশ শতাব্দীতে বেশি অনুভূত হয়। ১৮০৭ সালে সরকারী ইন্সপেক্টর ডেভিড স্টোর মতে পেইজলির সমগ্র জনসাধারণ পড়তে ও লিখতে জানত। দশ বছর পর দেখা যায় সে শহরে অশিক্ষিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন হাজারে।[২৫] সুতরাং কারখানার চাকুরীরত শিশু-কিশোরদের মৌলিক শিক্ষার জন্য রোববার স্কুলের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। এতদব্যতীত চার্চের অধীনস্ত সব প্যারিশ ও অন্যান্য স্কুলে ১৮৩৭ সালের মধ্যে 'রোববার স্কুল' চালু হয়। চার্চ জনবহুল এলাকা থেকে শিশুদের এসব স্কুলে আনার জন্য লোক নিয়োগ করত।

প্রথমে 'সাবাথ স্কুল সোসাইটি' অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে গঠিত হয় এবং সর্ব প্রকারের চার্চ এ সোসাইটিকে সহযোগিতা করত। ক্রমে এটি শুধু এস্টাব্লিস্ট চার্চ সোসাইটিতে পরিণত হয়। সাবাথ স্কুলের (রোববার স্কুল) উপস্থিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। গ্লাসগোতে ১৮৩৮ সালে ছাত্র সংখ্যা ৪,০০০ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৬০১৯ জনে এবং পেইজলিতে ২০০০ থেকে ৪১৯৮ জনে অর্থাৎ ছাত্র সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়।[২৬]

চার্চের স্ত্রী শিল্প স্কুলে মেয়েদের কাপড় সেলাই, উলের সেলাই, গান-বাজনার সাথে

সামান্য পঠন ও লিখনের ব্যবস্থা ছিল। ডঃ এনড্রু বেল ভারতে আর্মি ক্যাপ্টেন হিসেবে গমন করেন এবং মাদ্রাজ শহরের একটি এতিমদের স্কুলে মাদ্রাজ পদ্ধতি চালু করেন। এ পদ্ধতিতে ক্লাশের সবচাইতে মেধাবী ছাত্র শিক্ষককে পাঠদানে সহায়তা করত। এনড্রু বেল তাঁর উইলে বিরাট অঙ্ক মাদ্রাজ পদ্ধতিতে স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য দান করেন এবং ই,সি, সি, সে দানের কিয়দংশ লাভ করে।[২৭] ১৯৬১ সালে গ্লাসগোতে চার্চ মাদ্রাজ পদ্ধতিতে একটি স্কুল চালু করে।[২৮] ফ্রি চার্চ (১৮৪৩) প্রথম থেকেই স্কটল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ করে এবং এ ক্ষেত্রে চার্চের সাফল্য ছিল কিংবদন্তীর মত। বহু সুদক্ষ শিক্ষক ফ্রি চার্চের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ছ'মাস পর দেখা যায় ৩৬০ জন শিক্ষক ফ্রি চার্চ স্কুলে যোগদান করেছেন।[২৯] শিক্ষকগণ ফ্রি চার্চে যোগদানকৃত পাদ্রীদের অপেক্ষা অধিক ঝুঁকি গ্রহণ করেছিলেন। কারণ তাঁদের চাকুরী বা বেতনের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। প্রফেসর ওয়েলস্ বলেছিলেন, সর্বত্র ফ্রি চার্চ স্কুল খুলতে হবে। বিশেষ করে সেসব শিক্ষকদের জন্য যারা প্যারিশ বা প্রাইভেট স্কুল ত্যাগ করেছেন নতুন চার্চের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের কারণে।[৩০] প্যারিশ স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষা সন্তোষজনক থাকায় প্রথম ফ্রি চার্চ সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। তথাপি প্রতি চার্চের পার্শ্বে একটি করে স্কুল স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত চার্চের উদ্যোগ থামবে না বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৩১] এমনকি গ্লাসগো এবং এডিনবরায় চার্চের নিজস্ব ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয় ১৮৪৫-৪৬ সালের মধ্যে। কারণ ডেভিড স্টো গ্লাসগো টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং ওলিফান্ট এডিনবরা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে তাঁদের সকল ছাত্র ও স্টাফসহ ফ্রি চার্চে যোগদান করেন। অতি উদ্যমের সাথে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে অংশগ্রহণ করায় নতুন চার্চে অর্থাভাব দেখা দেয়। ডি, জে, উইদরিংটন 'দি ফ্রি চার্চ এডুকেশন স্কিম ১৮৪৩-৫০' নামক আর্টিকেলে বলেন, ফ্রি চার্চের উদ্যোগ দেখে বোঝা যায় ১৮৫০ থেকে শিক্ষার জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। তার অভিমতের সাথে অন্যান্য ঐতিহাসিকরাও একমত ছিলেন। অর্থাৎ সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় স্কটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা সচল রাখা সম্ভব ছিল না। ১৮৪৬ সালে সরকারের 'শিক্ষক সাহায্য' নীতি ফ্রি চার্চকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। বহু চিন্তা ভাবনার পর সংখ্যাধিক্যে চার্চ এসেম্বলী বাধ্যতামূলক পরিদর্শনের ভিত্তিতে সরকারী সাহায্য গ্রহণে সম্মত হয়।[৩২] সরকার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সহকারী ও পিউপিল শিক্ষকের বেতন-ভাতাদির কিয়দংশ প্রদান করবে। শিক্ষা কমিটির ডঃ রবার্ট ক্যান্ডলিশ ১৮৪৬ সালে মন্তব্য করেন যদি ফ্রি চার্চ শিক্ষকদের উচ্চ বেতন প্রদান করে এবং উচ্চ শিক্ষাগত মান বজায় রাখে, তবে চার্চের স্কুলগুলো সাফল্য অর্জন করবে। ১৮৫০ সালের মধ্যে ১৬০০০ ছাত্র চার্চের সাহায্যলব্ধ স্কুলে ও ১৪০০০ সাহায্য ছাড়া স্কুলে পড়াশুনা করছিল এবং সমগ্র স্কটল্যান্ডে এ বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান সর্বাপেক্ষা

উন্নত ছিল।[৩৩] ডঃ ক্যান্ডলিশ ১৮৫৬ সালে শিক্ষা কমিশনের সম্মুখে মন্তব্য করেন, আমাদের স্কুলগুলো সত্যিকার অর্থে মৌলিক শিক্ষাদানের স্কুল যা চার্চ বিভাজনের পূর্বে শ্রেষ্ঠ প্যারিশ স্কুলগুলোর মত।[৩৪] খ্রিস্টধর্ম বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও ফ্রি চার্চ এবং ইউনাইটেড প্রেসবাইটারিয়ান চার্চ শিক্ষকদের 'কনফেশনাল টেস্ট' এর বিরোধী ছিল। লর্ড এ্যাডভোকেট ও ফ্রি চার্চের অন্যতম সদস্য মিঃ মনক্রিফের পেশকৃত '১৮৫৪ শিক্ষা বিল' পার্লামেন্টে পাশ হয়নি।[৩৫] অবশেষে '১৮৬১ শিক্ষা আইন' (পূর্বে উল্লেখিত) পাশ হয় যা এস্টাব্লিস্ট চার্চ ও প্যারিশ স্কুলের মধ্যকার সম্পর্কের অবসান ঘটায়। অবশ্য আইনটির জন্য শিক্ষার সাথে ফ্রি চার্চের সম্পর্কের অবসান হয়নি। কিন্তু এর অধীনস্ত স্কুলের সংখ্যা কমে যায়। ফ্রি চার্চের শিক্ষকগণের প্যারিশ স্কুলে যোগ দিতে বাধা থাকল না। অর্থাৎ ফ্রি চার্চ ও প্যারিশ স্কুলের মধ্যে কোন পার্থক্য রইল না।[৩৬] তবুও চার্চ তার অধীনস্থ স্কুলগুলোর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় বাখতে সক্ষম হয়।

ফ্রি চার্চ স্কুলগুলো প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও পিউপিল শিক্ষকের জন্য সরকারী অনুদান পেত। প্রিভি কাউন্সিল কর্তৃক ১৮৩৩-৫৫ সাল পর্যন্ত রেনফ্রুশায়ারের বিভিন্ন চার্চকে প্রদত্ত অনুদানের তুলনামূলক বিবৃতি দেয়া হল (টেবিল-১)। ১৮৫৪-৫৬ সালে ফ্রি চার্চ কর্তৃক গৃহীত মঞ্জুরী বৃদ্ধি পেয়ে ৮০৪ পাউন্ডে উন্নীত হয়।[৩৭] অনুদান পাবার মানসে ফ্রি চার্চ অসংখ্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করে। এম, মনিজ[৩৮] বলেন, স্কুলগুলিতে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ না করে উপায় ছিল না। কারণ এগুলো প্রতি বছর পরিদর্শন করা হত। স্কটল্যান্ডের উত্তরে ফ্রি চার্চ অধিক সাফল্য অর্জন করে। ১৮৫১ সালে এবারডিনে ২৭টি ফ্রি চার্চ স্কুল ছিল, যেখানে এস্টাব্লিস্ট চার্চের স্কুল ছিল মাত্র ১৩টি।[৩৯] কিন্তু স্কটল্যান্ডের মধ্যভাগের নীচু এলাকায় ফ্রি চার্চের অবদান তুলনামূলকভাবে খুবই কম ছিল। (টেবিল-২)। আবার টেবিল-৩ প্রমান করছে গুরখ, হাউজটন ও কিল্লেলান প্যারিশে ফ্রি চার্চ স্কুলে ছাত্র সংখ্যা প্যারিশ স্কুলের ছাত্র সংখ্যার অধিক ছিল। এখানে স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে, ফ্রি চার্চ এস্টাব্লিস্ট চার্চের প্রায় ২৫০ বছর পর গঠিত হয়েছিল। পোর্ট গ্লাসগো এবং পেইজলিতে বারা স্কুলের টাউন কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত -- তুলনায় ফ্রি চার্চ স্কুলে অধিক ছাত্র অধ্যয়ন করত। (টেবিল-৪)। এয়ারশায়ার ও স্টারলিংশায়ারের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় ফ্রি চার্চ এয়ারশায়ারে অধিক সাফল্য অর্জন করেছিল। (টেবিল-৫)। যদিও এ দুটি প্রদেশে মোট স্কুলের তুলনায় ফ্রি চার্চ স্কুলের সংখ্যা কম ছিল, কিন্তু এয়ারশায়ারে ২৯টি ফ্রি চার্চ স্কুলের মধ্যে ২০টি স্কুল ও স্টারলিংশায়ারের ১১টি স্কুলের মধ্যে ১০টি স্কুলই সরকারী অনুদান প্রাপ্ত স্কুল ছিল। অর্থাৎ স্কুলগুলির মান বেশ উন্নত ছিল (টেবিল-৬)।

চার্চ স্কুলগুলোর শিক্ষার মান সম্পর্কে উপসংহারে উপনীত হতে গেলে দেখতে হবে কি ধরণের বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত। ইতোমধ্যে স্কুলগুলিতে কত জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন তার অনুপাত আমরা লক্ষ্য করেছি। প্যারিশ ও ফ্রি চার্চ স্কুলে ১৮৫০ সালের মধ্যে ইংরেজী, অঙ্ক, ব্যাকরণ, পাটিগণিত, ধর্ম, ল্যাটিন, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত। এছাড়া গুটি কয়েক স্কুলে হিসাব রক্ষণ, গ্রীক ও আধুনিক ভাষাসমূহ ছাড়াও নৌবিদ্যা ও ভূমি জরিপ শেখানো হত। সেশনাল, স্ত্রী শিল্প স্কুল ও রোববারের স্কুলগুলোতে সে যুগের প্রাথমিক চাহিদা যেমন লিখন, পঠন, পাটীগণিত, ধর্ম এবং অল্প কয়েকটিতে ইতিহাস, ভূগোল বিষয় শিক্ষাদান করা হত। সুতরাং বলা যায় চার্চ স্কুলগুলোতে শিক্ষার মান যুগোপযোগী পর্যায়ের ছিল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিভাজনের পরও ফ্রি ও এস্টাব্লিস্ট চার্চ শিক্ষায় তাদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিল। ফ্রি চার্চ ও এস্টাব্লিস্ট চার্চ ব্যতীত অন্যান্য চার্চ যেমন রোমান ক্যাথলিক, এপিসকোপাল চার্চ স্কটল্যান্ডের শিশুদের এবং বৃহৎ অংশকে শিক্ষাদান করত। অন্য চার্চগুলিও শিক্ষার মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য স্কুল পরিদর্শনের ব্যাপারে সচেতন ছিল। এতদসত্ত্বেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ চার্চ স্কুলগুলো গ্রহণ করতে পারছিল না। ফ্রি, এস্টাব্লিস্ট ও অন্যান্য চার্চের প্রচেষ্টার পরও দেখা গেছে স্কটল্যান্ডের শিশুদের অনেকেই স্কুলে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না। তাছাড়া ধর্মীয় স্কুলগুলোতে সব ধরণের চেষ্টার পরও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের অভাব ছিল। যার ফলে অনুপস্থিতির হার ছিল অত্যাধিক। সুতরাং শিক্ষা ক্ষেত্রে একক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। অনুপস্থিতির হার এবং তখনকার র‍্যাডিকেল সরকারের সদিচ্ছার ফল স্বরূপ ১৮৭২ সালে সরকারের পরিপূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে স্কটল্যান্ডে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হয়।

টেবিল-১

রেনশায়ারের বিভিন্ন চার্চকে ১৮৩৩-১৮৫০ পর্যন্ত প্রদেয় মঞ্জুরীর পরিমাণ

চার্চের নাম	মঞ্জুরীর পরিমাণ
এস্টাব্লিস্ট চার্চ	৮৫৮ পাঃ ১২ শিঃ ১০ পেঃ
ফ্রি চার্চ	৩৩১ পাঃ ১৪ শিঃ ৪ পেঃ
রোমান ক্যাথলিক চার্চ	২১ পাঃ ১৩ শিঃ ৪ পেঃ
এপিসকোপাল চার্চ	১১০ পাঃ ১০ শিঃ

সূত্র ঃ পিপি ১৮৫৪/৫xii, ৩১৬

টেবিল-২

মধ্যনিম্ন স্কটল্যান্ডে একটি প্রদেশের কয়েকটি প্যারিশে ফ্রি চার্চ ও মোট স্কুলের তালিকা (১৮৫৪)

প্যারিশের নাম	ফ্রি চার্চ স্কুল	মোট স্কুলের সংখ্যা
ক্যাথকার্ট	১	৩
এরস্কিন	১	৩
গুরখ	১	২
হাউজটন ও কিলেলান	১	৭
ইনভারকিপ	১	২
নেইলস্টন	১	১৭
	৬	৩৪

সূত্রঃ পিপি ১৮৬৭ xxvi, ২১২-১৭

টেবিল-৩

ফ্রি চার্চ ও প্যারিশ স্কুলে ১৮৬৫ সালে মোট ছাত্র সংখ্যা (কয়েকটি প্যারিশে ফ্রি চার্চ ও মোট স্কুলের তালিকা ১৮৫৪)

প্যারিশের নাম	ফ্রি চার্চ স্কুল (ছাত্র সংখ্যা)	প্যারিশ স্কুল
ক্যাথকার্ট	৬২	১৩০
এরস্কিন	৫১	৯৩
গুরখ	১৫৯	৬৯
হাউজটন ও কিলেলান	১০২	৬৬
ইনভারকিপ	৬৭	১৪১
নেইলস্টন	৫০	২৩৭
	৪৯১	৭৩৬

সূত্রঃ পিপি, ১৮৬৭ xxvi, ২১২-১৭

টেবিল-৪

পোর্ট গ্লাসগো ও পেইজলিতে ফ্রি এবং বারা স্কুলের সংখ্যা ১৮৬৫-৬৭

বারার নাম	ফ্রি চার্চ স্কুল		বারা স্কুল	
	স্কুল	ছাত্র	স্কুল	ছাত্র
পোর্ট গ্লাসগো	২	২৬২	১	৫৬
পেইজলি	১	৫৭৯	১	৫০০
	৩	৮৪১	২	৫৫৬

সূত্রঃ ইবিড-২১২

টেবিল-৫

এয়ারশায়ার ও স্টারলিংশায়ারে ফ্রি চার্চ স্কুলের সংখ্যা (১৮৬০)

প্রদেশের নাম	ফ্রি চার্চ স্কুল	মোট স্কুল	শতকরা হিসাব
এয়ারশায়ার	২৯	২৪৯	১২%
স্টারলিংশায়ার	১১	১৬৫	৭%

সূত্র ঃ পিপি ১৮৬৫ xxvi, (৩৮৪৫) পিপি ১৮৫৪ ix, ৫৭২, এ, বেইন, অপসিট, ১৪৭ ডব্লিউ বয়েড, অপসিট, ১৩৬।

টেবিল-৬

এয়ারশায়ার ও স্টারলিংশায়ারে ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের জন্য অনুদান প্রাপ্ত ফ্রি চার্চ স্কুলের তালিকা

প্রদেশের নাম	অনুদানপ্রাপ্ত স্কুল	মোট স্কুল	শতকরা হার
এয়ারশায়ার	২০	২৯	৬৯%
স্টারলিংশায়ার	১০	১১	৯১%

সূত্র ঃ পিপি ১৮৬৩ xivi ১০০-১০৩

সংক্ষিপ্তকরণ ঃ

ই,সি,সি,	-	এডুকেশন কমিটি অব দি চার্চ অব স্কটল্যান্ড
এন, এস, এ,	-	নিউ স্ট্যাটিসটিক্যাল এ্যাকাউন্টস
টি, এস, এ,	-	থার্ড স্ট্যাটিসটিক্যাল এ্যাকাউন্টস
পি, পি,	-	পার্লামেন্টরী পেপারস্
সি, সি, ই,	-	কমিটি অব দি প্রিভি কাউন্সিল অব এডুকেশন ইন স্কটল্যান্ড

সূত্রনির্দেশ

১। এম, মনিজঃ *দি ইমপ্যাক্ট অব দি ১৮৭২ এডুকেশন (স্কটল্যান্ড) এ্যাক্ট অন স্কটিশ ওয়ারকিং ক্লাশ এডুকেশন আপ টু* ১৮৯৯, পিএইচডি থিসিস, এডিনবরা ইউনিভার্সিটি, ১৯৪৭, ৮-১০।

২। এ, বেইন, *এডুকেশন ইন স্টারলিংশায়ার,* ১৫২।

৩। *পিপি,* ১৮৪১ xix এ্যানসার মেড বাই স্কুল মাস্টার্স ইন স্কটল্যান্ড টু কোয়েরিজ সারকুলেটেড ইন ১৮৩৮। ২৬২-৬৭ এবং ৬৫৩-৮৩।

৪। *ইবিড*-৬৫৪

৫। টি, আর, *বোন-স্কুল ইন্সপেকশন ইন স্কটল্যান্ড* ১৮৪০-১৯৬৬, ১২

৬। *দি টাইমস,* ১৮ জুন, ১৯৩৯

৭। জে, ডি, *মায়ারস—স্কটিশ ন্যাশনালিজম এ্যান্ড দি এ্যান্টিসিডেন্টস্ অব দি ১৮৭২ এডুকেশন এ্যাক্ট,* স্কটিশ এডুকেশন স্টাডিজ, ভলিউম-৪, নং-২, নভেম্বর ১৯৭২, ৭৪

৮। আর, রাইট ও জি, পি, প্রাইড *স্কটল্যান্ড*-২৬২

৯। এ, এ্যালেন ম্যাকলরেন, *রিলিজিয়ন এ্যান্ড সোসাল ক্লাশ* ২৯

১০। *পিপি* ১৮৮৪, xxxii-vi রিপোর্টস্ অব দি কমিশন অব ইনকোয়ারি অন কন্ডিশন অব ক্রফটার্স এ্যান্ড কটার্স ইন দি হাইল্যান্ডস এ্যান্ড লোলান্ডস।

১১। এ, এ, ম্যাকলারেন, *অপ সিট,* ২৯-৩০

১২। আর, ব্রাউন- *হিস্ট্রি অব পেইজলি,* ভলিউম-২, ৩৫৯-৬২

১৩। এফ, ম্যাকারথার- *হিস্ট্রি অব পোর্ট গ্লাসগো,* ২২২

১৪। *সেনসাস অব গ্রেট বৃটেন-* ১৮৫১, রিলিজিয়াস, এডুকেশন এ্যান্ড ওয়ারশিপ, স্কটল্যান্ড, রিপোর্ট ও টেবিলস্।

১৫। আর, এম, স্মিথ- *দি হিস্ট্রি অব গ্রিনক,* ৩৬৫।

১৬। এফ, ম্যাকারথার- *অপ সিট,* ১৪।

১৭। জে, সি, মায়ারস্ *অপ সিট* ৭৮।

১৮। ইবিড, ৮৬

১৯। এ, বেইন- *অপ সিট*- ১৫৩

২০। *পিপি* ১৮৬৩ xlvi রিটার্ন অব এ্যামাউন্ট অব সাবস্ক্রিপশন ডোনেসন্স এ্যান্ড কালেকসন্স এ্যান্ড প্লেসেস অব ওয়ারশিপ অব এলমহোয়ার-১৮৬০-৬১, হাউজ অব কমন্স, ১০০

২১। *ই, সি, আর*- জেনারেল এ্যাসেম্বলী ১৮৪৪, ২৪

২২। *পিপি* ১৮৪ xix ৬৭৮

২৩। *টি, এস, এ*- ভলিউম iii এবং vi

২৪। *পিপি* ১৮৬৩ xlvi রিটার্ন অব এ্যামাউন্ট অব গ্রান্ট পেইড টু ইচ প্যারিশ অর প্লেসেস ইন ১৮৬০-৬১, ১০১

২৫। ডেভিড স্টো—*দি ট্রেনিং সিস্টেম ইন এডুকেশন*, ইনটেলেক্টচুয়াল এ্যান্ড মরাল এ্যাজ এস্টাব্লিস্ট ইন দি গ্লাসগো নরম্যাল ট্রেনিং সেমিনারী, ২-৫

২৬। *এন, এস, এ*, ভলিউম vii ৭৫

২৭। *মাদ্রাজ সিস্টেম*—মনিটর সিস্টেম, দি ব্রাইট বয় অব দি ক্লাশ বিকেম টিচার - টু হেল্প দি টিচার্স টু টিচ এ্যা ক্লাশ অব ৮০-১০০ স্টুডেন্ট্

২৮। ডি. প্রাইড, *হিস্ট্রি অব দি প্যারিশ অব নেইলস্টোন*, ১৭৫

২৯। এন, এল. ওয়াকার, *চ্যাপ্টার ফ্রম দি হিস্ট্রি অব দি ফ্রি চার্চ অব স্কটল্যান্ড* ১১৪

৩০। এ, এল, ড্রুমন্ড এবং জে, বুলক, *দি চার্চ ইন ভিক্টোরিয়ান স্কটল্যান্ড* ১৮৪৩-৭৪, ৯২

৩১। জে. সি, প্যাটন - *অটোবায়োগ্রাফী* - ৮ ১-২

৩২। ড্রুমন্ড এবং বুলক, *অপ সিট*, ১২৩

৩৩। এন, সি, ওয়াকার, *অপ সিট*, ১১৯

৩৪। ডব্লিউ বয়েড *এডুকেশন ইন এয়ারশায়ার থ্রু সেভেন সেনচুরিস্*, ১৩৭

৩৫। এন, এল, ওয়াকার, *অপ সিট*, ২৩

৩৬। ড্রুমন্ড এবং বুলক, *অপ সিট*, ৯৮

৩৭। সি, সি, এম, ১৮৫৫/৬, কিউমিং, জেমস্, *রিপোর্টস্ অন স্কুলস্ ইন্সপেক্টড*, ৫৯৬-৭

৩৮। এম, মোনিস, *অপ সিট*, ৩৬-৭, সেকশন-১, চ্যাপ্টার - ১

৩৯। এ, এ, ম্যাকলারেন, *অপ সিট*, ৪৭

সারাংশ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাভিমুখী সম্প্রসারণ

জয়ন্ত দাশগুপ্ত

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের মধ্যবর্তী আটলান্টিক মহাসাগরের তীরসংলগ্ন ভূখন্ডে ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে ভার্জিনিয়ায় ইংরেজরা প্রথমে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেখানে মোট ১৩টি উপনিবেশ গড়ে ওঠে। এই ১৩টি উপনিবেশকে মূল উপনিবেশ বলে অভিহিত করা হয়।

উপনিবেশ স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক। তাঁরা ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আমেরিকাবাসীদের আকাঙ্ক্ষা ছিল পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর হতে পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত তাঁদের দেশের সীমানা সুবিস্তৃত হবে।

মূল উপনিবেশসমূহ আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব উপকূলের উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হতে তা ক্রমশ পশ্চিমদিকে সম্প্রসারিত হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগর অবধি বিস্তৃত হয়।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব হতেই এই পশ্চিমাভিমুখী সম্প্রসারণ পর্ব আরম্ভ হয়। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই পশ্চিমাংশের মোট ১০টি প্রদেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়।

বিভিন্ন ধরণের অভিযাত্রীরা বিভিন্ন পর্যায়ে এই সম্প্রসারণ কার্যটি সম্পন্ন করেন। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন পেশাজীবী ও বৃত্তিজীবী ব্যক্তিরা বিদ্যমান।

এর ফলে রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ বাঁধে। রেড ইন্ডিয়ানরা পরাজিত হন এবং তাঁদের উপর অত্যাচার করা হয়।

নতুন অঞ্চলসমূহে আগত অভিযাত্রীরা কিন্তু সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেননি। তাঁরা ক্রমশ আরো পশ্চিমদিকে সরে যান।

এই সম্প্রসারণের প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।